*

ষষ্ঠ খণ্ড।

ভারতবর্ষ।

(প্রাচীন ভারতবর্ষ।)

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত।

প্রকাশক,
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী।
"পৃথিবীর ইতিহাস" কার্য্যালয়, হাওড়া (কলিকাতা)।

"পৃথিবীর ইতিহাস প্রিন্টিং ওয়ার্কস্", ২নং অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
লেন, হাওড়া, হইতে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী
কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Raja Jogendra Kissore Roy Choudhuri Rai Bahadur

রামগোপালপুরাধিপতি রাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী রায় বাহাদুর।

শ্রীশ্রীহরিঃ—শরণং।

উৎসর্গ।

আমার অকৃত্রিম সুহৃৎ অশেষগুণসম্পন্ন,

রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী রায় বাহাদুর

সমীপে।

মহোদয়,

আপনি বাঙ্গালা-সাহিত্যের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং আমার অকৃত্রিম সুহৃৎ। আমার "পৃথিবীর ইতিহাস" প্রকাশের সঙ্কল্প অবগত হইয়া আপনি আমাকে উৎসাহিত করেন এবং উহার এক খণ্ড প্রকাশ সম্বন্ধে কিছু সাহায্য করিতেও সম্মত হন। আমার প্রতি আপনার অনুরাগ এবং এই গ্রন্থ প্রকাশ-বিষয়ে আপনার সহৃদয়তার বিষয় স্মরণ করিয়া এই খণ্ড "পৃথিবীর ইতিহাস" আপনার নামে উৎসর্গ করা হইল। আপনি সুখস্বাস্থ্য সহ দীর্ঘজীবী হইয়া আমার এই আরব্ধ ব্রত সম্পাদনে সহায় হউন। ইতি—

'পৃথিবীর ইতিহাস' কার্য্যালয়,
হাওড়া।
২৭এ ফাল্গুন, ১৩২৪ সাল।

বিনীত,
শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।

সূচনা।

বড় জটিল রহস্যময়—প্রাচীন ভারতের সেই অনন্ত অতীতের ইতিহাস! সে রহস্য যতই উদ্ঘাটিত হইবে, ইতিহাসের ধারা ততই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। বর্ত্তমান ইউরোপীয় মহাসমরে পৃথিবীর মানচিত্র যেমন নূতন রঙে রঞ্জিত হইবে, নিঃসন্দেহ; সেইরূপ অনুসন্ধানের পর অনুসন্ধানের ফলে, ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত,—শুধু ভারতবর্ষেরই বা বলি কেন, পৃথিবীর পুরাবৃত্ত,—এক নূতন অবয়ব পরিগ্রহ করিবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিল্প-বাণিজ্যে, শৌর্য্য-বীর্য্যে, শিক্ষা-সৌকর্য্যে,—যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি না কেন,—ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত সর্ব্ববিষয়েই পৃথিবীর ইতিহাসে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। জ্ঞান-বারিধির অভ্যন্তরে যিনি যতই অতল-তলে অবগাহন করিতে সমর্থ হইবেন, অতীত গৌরবের অনন্ত রত্নরাজি ততই তাঁহার নয়ন-পথে উদ্ভাসিত হইবে,—আর তাঁহার সেই জ্ঞান-গবেষণার ফলে, কত কত অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়া, ইতিহাস নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে।

ইতিহাস নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে।

কি ভ্রান্ত বিশ্বাসই বদ্ধমূল হইতে বসিয়াছিল! অসভ্য বর্ব্বর ছিলাম—প্রাচীন ভারতের আদিবাসিবর্গ আমরা;—মধ্য-এসিয়ার এক অজানিত সভ্যজাতি আসিয়া উদ্ধার-সাধন করিয়া গেল—আমাদিগের;—আর, সেই আগন্তুক জাতির বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব অনুভব করিতে শিক্ষা পাইলাম—আমরা! এ কলুষিত শিক্ষা—কি অধঃপতনের পথেই আমাদিগকে আকৃষ্ট করিয়া লইয়া চলিয়াছিল! শুভক্ষণে জ্ঞানের নবীন আলোক-রশ্মি হৃদয়ে প্রবেশ করিল;—শুভক্ষণে শুভ-সাধনার ফলে সে আলোকে সত্য-তত্ত্ব প্রতিভাত হইল! দূরদর্শী বিজ্ঞজন এখন আর তাই আপনাদিগের অতীত-গৌরবে সন্দিহান নহেন। এই "পৃথিবীর ইতিহাস" প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে, অনেকেই এখন অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে, কোন্ জাতির সন্তান আমরা কি ছিলাম—আর কি হইতে চলিয়াছি! ভ্রান্ত বিশ্বাস পরিহার কর; এ অনুভাবনা নিশ্চয়ই শুভফলপ্রসূ হইবে।

ভ্রান্তবিশ্বাস পরিহার কর।

এক শ্রেণীর কর্ম্মী পুরুষগণ কতকটা বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁহারা কহেন,—'কোন্ কালে কি ছিলাম, সে গৌরবে আস্ফালন বৃথা প্রয়াস মাত্র! এখন কিসে গরীয়ান্ প্রতিষ্ঠাবান্ হইতে পারি, অতীত-কথা বিস্মৃত হইয়া কেবল সেই চেষ্টা করাই শ্রেয়ঃসাধক।' এ উপদেশ, পাশ্চাত্যের পক্ষে—অতীত অন্ধকারময় নব-অভ্যুত্থিত জাতির প্রতি—প্রযোজ্য হইতে পারে। কিন্তু এ উপদেশ প্রাচ্যের উপযোগী;—যাঁহাদের অতীত-স্মৃতি চির-দীপ্যমান্ রহিয়াছে, তাঁহাদের উপযোগী কখনই নহে। যাহাদের অতীত-গৌরব আদৌ নাই, অতীতের স্মৃতি বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন করিবার

গৌরব-স্মৃতিই সুপ্রতিষ্ঠার মূল।

চেষ্টা পাওয়াই তাহাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ বটে; কেন-না, তাহাতে সহজেই তাহাদের হৃদয়ে আত্ম-শ্লাঘার সঞ্চার হইবে, এবং ঐহিক উন্নতিকেই চরম উন্নতি মনে করিয়া তাহারা আত্ম-সন্তোষ লাভ করিবে। কিন্তু যাঁহাদের অতীত-পরিচয় উজ্জ্বল হইয়া আছে, তাঁহাদের চক্ষের সমক্ষে পুনঃপুনঃ সেই দৃশ্য প্রতিভাত হইলে, অনুতাপের অন্তর্দাহে সে দৃশ্য তাঁহাদের হৃদয়ে উদ্দীপনার অভিনব অনল প্রজ্বালিত করিয়া দিবে; আর, তাহাতে তাঁহারা উন্নতির পর উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিতে সমর্থ হইবেন। তখন, কিবা ইহ-লৌকিক, কিবা পারলৌকিক,—সর্ব্ববিধ সুখই তাঁহাদের অধিগত হইয়া আসিবে; সংসার দেখিবে—গৌরব-স্মৃতিই সুপ্রতিষ্ঠার মূল।

কর্ম্ম—অনুভাবনার অনুসারী। অগ্রে মনন—আদর্শের অনুধ্যান; পরে অনুষ্ঠান—কর্ম্ম-সম্পাদন-প্রয়াস। যাঁহার আদর্শ যত মহান্, তিনি প্রায় তদনুরূপ মহত্ত্বেরই অধিকারী হইয়া থাকেন। "আমার পিতৃপিতামহ পুণ্যপূত আদর্শ-চরিত ছিলেন; আমি কেন ভ্রষ্টাচারী হই?"—এ অনুশোচনা যাঁহারই মনে উপস্থিত হইবে, সম্পূর্ণরূপ আয়ত্তাধীন না হউক, তিনি নিশ্চয়ই কিয়ৎ-পরিমাণেও সে গুণ-গৌরবের অধিকারী হইতে পারিবেন। সেই চিন্তা—সেই ভাবনা মানুষের মনে কিরূপে উদয় হইতে পারে, ইতিহাসের পুরাবৃত্তের তাহা এক লক্ষ্যস্থল হওয়া আবশ্যক। এই "পৃথিবীর ইতিহাসে" প্রাচীন ভারতের সেই গৌরব-কথা কীর্ত্তনে, এই জাতীয়-জীবনের উৎকর্ষ-সাধনের যে মহতী স্পৃহা, ভগবান করুন, তাহা পূর্ণ হউক। সূচনায় সেই আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়াই এই "পৃথিবীর ইতিহাস" প্রণয়নে প্রবৃদ্ধ হইয়াছি। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী",—এ দৈববাণী কি কখনও নিষ্ফল হয়?

যাদৃশী ভাবনা, তাদৃশী সিদ্ধি।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে কোনরূপ যাঁহাদের সাহায্য পাইয়াছি, উপসংহারে তাঁহাদের প্রতি অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমার প্রধান সাহায্য-কারী—শ্রীমান্ প্রমথনাথ সান্যাল। এ বিষয়ে শ্রীমান্ আমার দক্ষিণহস্ত-স্থানীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অধ্যয়নে তিনি আমার সহকারী, বিষয়-নির্ব্বাচনে তিনি আমার সহকারী, অনুসন্ধানে তিনি আমার সহকারী; অধিক বলিব কি, এই খণ্ডের কয়েকটী পরিচ্ছেদ তিনিই লিখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় কৃতী সহকারী লাভ করিয়াছি বলিয়া আশা হয়, আমার অভীপ্সিত এই গ্রন্থ অচিরে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইব। ভগবান! আশা পূর্ণ করুন।

প্রধান সাহায্যকারী।

'পৃথিবীর ইতিহাস' কার্য্যালয়,
হাওড়া।
২১এ ফাল্গুন, ১৩২৪ সাল।

নিবেদক—
শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।

ভারতবর্ষ।

—০॰০—

সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র।

———•———

ভারতবর্ষ।

—০:*:০—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

— * —

নবধর্ম্মে নবজীবন।

[বৌদ্ধ-প্রাধান্যে নূতন শক্তি ;—জৈনধর্ম্ম ভারতের প্রতিষ্ঠা-রক্ষায় সহায় ;—বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ও জৈন-ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মেরই অঙ্গীভূত ;—হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন তিন ধর্ম্মের সম্বন্ধ ;—ত্রিবিধ কারণে এ তত্ত্ব নির্দ্ধারিত ;—ধর্ম্মের লক্ষণালোচনায় হিন্দুধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের ঐক্য,—প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি প্রভৃতি লক্ষণাদির বিষয় ;—বুদ্ধদেব নিবৃত্তিমার্গাবলম্বী ;—বৌদ্ধধর্ম্মের ভিক্ষুত্ব, সন্ন্যাস, নির্ব্বাণ ও মুক্তি প্রভৃতির প্রসঙ্গ ;—হিন্দুধর্ম্মের আচার-অনুষ্ঠানের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের আচার-অনুষ্ঠানের ঐক্য,—বৌদ্ধধর্ম্মে দোষখ্যাপনে পাপক্ষালনের প্রসঙ্গ, মনুর উক্তির সহিত সাদৃশ্য-সম্পন্ন,—খৃষ্টধর্ম্মেও সেই ভাব ;—এক সনাতন ধর্ম্ম হইতে সকল ধর্ম্মের উৎপত্তি-প্রসঙ্গ ;—হিন্দুধর্ম্মের নীতির ও উপদেশের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের নীতির ও উপদেশের সাদৃশ্য,—ব্রাহ্মণাদি সম্বন্ধে ও বিবিধ বিষয়ে সে ঐক্য ;—উপসংহারে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে ভ্রান্ত-বিশ্বাসের নিরসন,—জৈনধর্ম্ম সম্বন্ধেও সেই উক্তি।]

ঊষা-সমাগমে অরুণোদয়ে নৈশ অন্ধকার অপসৃত হইল! নবীন আলোকে দিবাগমে সুপ্তোত্থিত প্রাণিজগৎ নবজীবন লাভ করিল! বুদ্ধদেবের আবির্ভাবে অজ্ঞান-অন্ধকার দূরীভূত হইল ; সঙ্গে সঙ্গে নবজাগরণের নবীন উদ্দীপনা প্রকাশ পাইল। এক-দিকে মানুষের চিত্ত ধর্ম্মচিন্তায় উদ্বুদ্ধ হইল ; অন্যদিকে সেই ধর্ম্ম-প্রাণতার প্রভাবে বলবীর্য্য কেন্দ্রীভূত হইয়া আসিল। যে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা-কল্পে, যে শক্তির স্ফূর্ত্তি-বিধানে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন ; প্রকারান্তরে সেই ধর্ম্মই প্রতিষ্ঠিত, সেই শক্তিই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইল। সার্দ্ধদ্বিসহস্রাধিক বর্ষব্যাপী পরিবর্ত্তনের অভিঘাতে সদ্ধর্ম্ম বিকৃত এবং কেন্দ্রশক্তি বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছিল। এক্ষণে, নবধর্ম্মের নবীন উন্মাদনা নূতন পথে নূতন শক্তি সঞ্চিত করিয়া দিল। ভারতের ইতিহাস যে ধর্ম্মের ইতিহাস, আর নব নব ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে ইতিহাসের ধারা যে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে ; বৌদ্ধধর্ম্মের নবীন উদ্দীপনায় বৌদ্ধ-প্রাধান্যের উজ্জ্বল আলোকে, আবার তাহা সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষীভূত হইল।

ঊষার আলোক।

জৈন-ধর্ম্মও পরম হিতসাধক।

যেমন বৌদ্ধধর্ম্ম, তেমনই জৈনধর্ম্ম—সে বিপ্লব-বিভীষিকার দিনে ভারতের প্রতিষ্ঠা-রক্ষার পক্ষে সমভাবে সহায়তা করিয়াছিল। শুভক্ষণে জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী আবির্ভূত হন; শুভক্ষণে জৈনধর্ম্মের তত্ত্বকথাসমূহ প্রচারিত হয়। জৈনধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম অগ্রজ-অনুজ-রূপে একযোগে মানবের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ঐ দুই ধর্ম্মের সাদৃশ্য এত অধিক ছিল যে, অনেক সময়ে উহাদের পরস্পরের প্রভাব অভিন্ন-রূপে পরিকীর্ত্তিত দেখি। বৌদ্ধধর্ম্মের পুরা-বৃত্তানুসন্ধানে বৌদ্ধধর্ম্মকে যেমন বহুকালের প্রাচীন ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে পারি, জৈনধর্ম্মের ইতিহাসেও সেই নিদর্শন প্রত্যক্ষ করি। গৌতম-বুদ্ধের পূর্ব্বে যেমন বহু বুদ্ধের আবির্ভাবের সমাচার প্রাপ্ত হই, মহাবীর স্বামীর পূর্ব্ববর্ত্তী সেইরূপ তীর্থঙ্করগণের প্রভাব জৈনধর্ম্মের ইতিহাসে দেখিতে পাই। এমন কি, পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধগণের ও তীর্থঙ্করগণের সংখ্যায় ঐক্য দেখি; তাঁহাদের বিশেষণে ও নাম-সংজ্ঞায়ও ঐক্য দেখি। * উভয় সম্প্রদায়ের কীর্ত্তি-স্মৃতির মধ্যেও অপরিদৃশ্য ঐক্য রহিয়া গিয়াছে। তদনুসারে, কাহারও কাহারও মতে, বুদ্ধদেবকে মহাবীর স্বামীর শিষ্য বলিয়া অভিহিত হইতে দেখি; অপিচ, বুদ্ধদেব যে জৈনতীর্থঙ্করগণের প্রদর্শিত পথে 'অহিংসা পরম-ধর্ম্মের' বীজমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া-ছিলেন, সে প্রসঙ্গও বহু ক্ষেত্রে উত্থাপিত হয়। কে গুরু, কে শিষ্য—তদ্বিষয়ক বিচার-বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হওয়া এ প্রসঙ্গের অঙ্গীভূত নহে। তবে বুদ্ধদেব যখন নির্ব্বাণ-পথ অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছিলেন, মহাবীর স্বামী তখন জৈন-ধর্ম্মের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া দিয়াছিলেন; সারনাথে মৃগদাবে বুদ্ধদেব যখন প্রথম বৌদ্ধসঙ্ঘ সংগঠন করেন, কাশীধামে মহাবীর স্বামী তখন জৈন-ধর্ম্মের মহান্ সত্য প্রচার করিতেছিলেন। ফলতঃ, প্রায় একই সময়ে, একদিকে মহাবীর স্বামী, অন্যদিকে বুদ্ধদেব—দুই দিকে দুই শক্তি মোহপঙ্কনিপতিত মানবসমাজের উদ্ধার-সাধনে সহায়তা করিয়াছিল।

হিন্দুধর্ম্মে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম।

কি জৈন-ধর্ম্ম, কি বৌদ্ধ-ধর্ম্ম—উভয়ই সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের অঙ্গীভূত। কি তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী, কি শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব—উভয়েই যে সদ্ধর্ম্মের, প্রকারান্তরে অভিন্ন ধর্ম্মের, প্রচার করিয়া গিয়াছেন; তাহাও স্বতঃপ্রতিপন্ন হয়। সত্য এক—জ্ঞান অভিন্ন হইলেও, মানুষ বিভিন্ন প্রকৃতির; সুতরাং বিভিন্ন পথে মানুষ সত্যের—জ্ঞানের অনুসন্ধান করিয়া ফিরিয়াছে। শ্রীভগবান তাই সময় ও সমাজের গতি-প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়া, বিভিন্ন মূর্ত্তির মধ্য দিয়া, সত্যতত্ত্ব জ্ঞান-তত্ত্ব প্রকাশ করেন। একটী দৃষ্টান্তে বিষয়টী বোধগম্য হইতে পারে।

---

* কোনও মতে বুদ্ধের সংখ্যা ২৪ জন, কোনও মতে ২২ জন। তীর্থঙ্করগণের সংখ্যাও কোনও মতে ২৪ জন, কোনও মতে ২২ জন। ২৪ জন তীর্থঙ্করের সংক্ষিপ্ত বিবরণ "পৃথিবীর ইতিহাস" ২য় খণ্ডে প্রদত্ত হইয়াছে। বিশেষণের বিষয় অধিক কি বলিব? বুদ্ধদেব যে যে বিশেষণে বিশেষিত হন, তীর্থঙ্কর-গণও সেই সেই বিশেষণে পরিচিত। তীর্থঙ্করগণ জিন, অর্হৎ, সুগত, বুদ্ধ, সম্বুদ্ধ, তথাগত, সর্ব্বজ্ঞ প্রভৃতি নামে পরিচিত। বুদ্ধদেবও যে ঐ সকল নামে অভিহিত হন, তাহা পূর্ব্বেই প্রকাশ করা হইয়াছে। বৌদ্ধ স্তূপ, বৌদ্ধমন্দির এবং বৌদ্ধ মূর্ত্তি প্রভৃতিও জৈনদিগের স্তূপাদির সহিত সাদৃশ্যসম্পন্ন। আর, সেই কারণেই অনেক সময়, জৈনদিগের মন্দির প্রভৃতি বৌদ্ধকীর্ত্তির মধ্যে ভ্রান্তিবশে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

সাগরগামিনী স্রোতস্বিনী সকলেই সাগর-উদ্দেশে প্রধাবিতা। পথ বিভিন্ন হইলেও লক্ষ্য অভিন্ন। ভারতের এই সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-সম্বন্ধেও সেই ভাব মনে আসিয়া থাকে। কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, কি জৈন—মূল লক্ষ্য কাহারও বিভিন্ন নয়। দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে কর্ম্ম-পদ্ধতি বিভিন্ন হইতে পারে; কিন্তু উদ্দেশ্য যে এক, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং কিবা বৌদ্ধধর্ম্ম, কিবা জৈনধর্ম্ম, উভয়ই সমভাবে ভারতের বিপত্তি-দূরীকরণে, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উৎকর্ষ বিধানে, সহায়তা করিয়াছে। সে পক্ষে, যেমন বৌদ্ধধর্ম্মের, তেমনই জৈনধর্ম্মের কার্য্যকারিতা স্বীকার করিতে হয়। সেই সনাতন ধর্ম্ম, সেই ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম, এই জৈনধর্ম্মের ও বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যেও আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া কেমনভাবে ভারতের আধ্যাত্মিক ও লৌকিক উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছে, তাহা অনুধাবন করিলে বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইতে হয়। ভ্রান্তিবশে অনেকে জৈনধর্ম্মকে ও বৌদ্ধধর্ম্মকে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের বিরোধী বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু ভারতের এক দুর্দ্দিনে, সমাজবিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইলে, জৈনধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম কেমনভাবে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিয়াছিল, পরবর্ত্তী সহস্রাধিক বর্ষের ইতিহাসে তাহা প্রত্যক্ষীভূত হয়। যাঁহাদের সূক্ষ্মদৃষ্টি ইতিহাসের সেই স্তরে নিপতিত, তাঁহাদের সকল ভ্রম নিশ্চয়ই দূরীভূত। জৈনধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম উভয়েই যে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের অঙ্গীভূত, সূক্ষ্মদর্শিগণ স্বতঃই তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন।

হিন্দু, বৌদ্ধ-জৈন তিন ধর্ম্মের সম্বন্ধ।

যে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হইয়াছিল, যে জৈনধর্ম্ম বিচ্ছিন্ন-ভাবে স্থানবিশেষে আশ্রয়-গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিল; সেই দুই ধর্ম্ম যে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের—ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের অঙ্গীভূত, কিছুকাল পূর্ব্বে অনেকে এ কথা বিশ্বাস করিতে সঙ্কুচিত হইতেন। বিশেষতঃ, মূলধর্ম্মে অনেক সময়ে বিকৃতি সঙ্ঘটিত হওয়ায়, সহজদৃষ্টির সম্মুখে ঐ সকল ধর্ম্ম পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। অথচ, উহারা একই মহান্ মহীরুহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রাণ-স্থানীয়। বিষয়টী বোধগম্য হইলে, বহু বিরোধ-বিতণ্ডা বিদূরিত হয়। সুতরাং এতৎপ্রসঙ্গে প্রথমে আমরা সনাতন হিন্দুধর্ম্মের সহিত জৈন-ধর্ম্মের ও বৌদ্ধধর্ম্মের সম্বন্ধ-তত্ত্ব বুঝাইবার প্রয়াস পাইতেছি। পরে ঐ দুই ধর্ম্ম কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, আর তদ্দ্বারা ভারতের প্রতিষ্ঠা কতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহা আলোচনা করা যাইবে। ভারতীয় ধর্ম্মমত-সমূহের সম্বন্ধ-তত্ত্বের বিষয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ড "পৃথিবীর ইতিহাসে" কিছু কিছু আভাষ দেওয়া হইয়াছে।* এক্ষণে তৎসংক্রান্ত কয়েকটী প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তের অবতারণা করা যাইতেছে। ত্রিবিধ কারণে একের সহিত অন্যের সাদৃশ্যের—এক হইতে অন্যের উদ্ভবের বিষয় বোধগম্য হয়। প্রথম,—লক্ষণ (মৌলিক তত্ত্ব)। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মেরই বা লক্ষণ কি, আর জৈন-বৌদ্ধাদি ধর্ম্মেরই বা লক্ষণ কি, তাহা অনুধাবন করিলে, পরস্পরের সম্বন্ধ-তত্ত্ব উপলব্ধি হয়। দ্বিতীয়,—বিশেষ বিশেষ আচার-অনুষ্ঠান। এক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের আচার-ব্যবহার-পদ্ধতির সহিত অন্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের

† "পৃথিবীর ইতিহাস" তৃতীয় খণ্ডের প্রথম ও তৃতীয় প্রভৃতি পরিচ্ছেদে এবং পঞ্চম খণ্ডে এতদ্বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

আচার-ব্যবহার পদ্ধতি-প্রভৃতির কিরূপ সাদৃশ্য আছে, তাহা বুঝিতে পারিলেও পরস্পরের সম্বন্ধ বোধগম্য হইয়া থাকে। তৃতীয়,—নীতি ও উপদেশ-পরম্পরা। নীতি ও উপদেশের ঐক্য দেখিয়াও পরস্পরের সম্বন্ধ খ্যাপন করা যায়। এ ভিন্ন, আরও যে সকল কারণে বিভিন্ন ধর্ম্মের সম্বন্ধ সূচিত হয়, তাহার মধ্যে দেশ-কাল-পাত্র প্রভৃতির বিবিধ প্রসঙ্গই উত্থাপিত হইতে পারে। যাহা হউক, সেই সকল কারণের কি কি কারণে আমরা ঐ তিন ধর্ম্মের মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান দেখি, বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে তাহার একটু আলোচনা করিব।

বিভিন্ন পণ্ডিতগণ ধর্ম্মের বিভিন্ন-রূপ বিভাগ বা লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তদনুসারে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের—সনাতন হিন্দুধর্ম্মের—প্রধানতঃ দুইটী লক্ষণ বা বিভাগ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। (১) প্রবৃত্তি-লক্ষণ; (২) নিবৃত্তি-লক্ষণ। প্রবৃত্তি-মার্গ ও নিবৃত্তি-মার্গ অভিধায়েও উহা অভিহিত হয়। কেহ কেহ আবার ঐ লক্ষণ বা বিভাগকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি উভয় ভাবমূলক তৃতীয় লক্ষণের নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাহা হউক, প্রবৃত্তিমূলক ও নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্মের অর্থ উপলব্ধি করিলেই বিভাগাদির সার্থকতা বুঝা যায়। মহর্ষি মনু প্রবৃত্তি-মূলক ও নিবৃত্তি-মূলক কর্ম্মের (ধর্ম্মের) এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,—

ধর্ম্মের লক্ষণ আলোচনায় ঐক্য।

'সুখাভ্যুদয়িকঞ্চৈব নৈঃশ্রেয়সিকমেব চ। প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকম্॥
ইহ চামুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে। নিষ্কামং জ্ঞানপূর্ব্বন্তু নিবৃত্তমুপদিশ্যতে॥
প্রবৃত্তং কর্ম্মসংসেব্য দেবানামেতি সাম্যতাম্। নিবৃত্তং সেবমানস্তু ভূতান্যত্যেতি পঞ্চবৈ॥"

অর্থাৎ,—"বৈদিক কর্ম্ম যতিষ্টোমাদি যজ্ঞ দুই প্রকার—প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত। প্রবৃত্ত কর্ম্মফলে সুখ ও অভ্যুদয়াদি লাভ হয় এবং নিবৃত্ত কর্ম্মফলে মুক্তিলাভ হয়। ইহলোক সম্বন্ধে অথবা পরলোক-সম্বন্ধে কোনও কামনা করিয়া যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাকে প্রবৃত্ত কর্ম্ম বলে; কিন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক নিষ্কাম যে কর্ম্ম, তাহাকে নিবৃত্ত কর্ম্ম বলে। প্রবৃত্ত কর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠানে দেবতাদিগেরও সমান হওয়া যায়। আর নিবৃত্ত-কর্ম্মাভ্যাসে পঞ্চ-ভূতকে অতিক্রম করা যায় অর্থাৎ মোক্ষলাভ হয়।" বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান-প্রসঙ্গে মহর্ষি মনু প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মূলক কর্ম্ম-সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করেন, তদ্দ্বারা ঐ দুইয়ের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। কাম্যকর্ম্ম প্রবৃত্তিমূলক আর নিষ্কাম কর্ম্ম নিবৃত্তি-মূলক,—মনুর উক্তিতে তাহা বেশ বুঝিতে পারি। তদনুসারে প্রবৃত্তি-মূলক ধর্ম্মই বা কি, আর নিবৃত্তি-মূলক ধর্ম্মই বা কি, তাহাও নির্দ্দিষ্ট হয়। এ মতে, এই দুই বিভাগের বহির্ভূত কর্ম্ম—ধর্ম্ম-মধ্যে গণ্য নহে। কিন্তু যাঁহারা তিন ভাগে ধর্ম্ম-লক্ষণ নির্দ্ধারণ করেন, তাঁহাদের মতে, লক্ষণত্রয়—(১) প্রবৃত্তিমূলক, (২) প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-মূলক, (৩) নিবৃত্তি-মূলক। প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম্ম—একমাত্র কামনার তৃপ্তিসাধন উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ,—যাঁহারা লোকালোক স্বীকার করেন না, ইহলোকের সুখকে একমাত্র সুখ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারাই প্রবৃত্তিলক্ষণাক্রান্ত ধর্ম্মের অনুসরণকারী। এ মতে অস্মদ্দেশের চার্ব্বাকাদি এবং পাশ্চাত্যের এপিকিউরাস্ প্রভৃতি প্রবৃত্তি-মার্গাবলম্বী; নামান্তরে নাস্তিক্যবাদী। ইঁহাদের মত এই যে,—'দেহ ভস্মীভূত হইলে আর ফিরিয়া আসিবে না;

সুতরাং যত দিন বাঁচ, সুখ করিয়া লও; ঋণ করিয়াও ঘৃত পান কর।' * ইঁহারা আরও বলেন,—'সুখের অনুসরণে যদি কষ্ট পাইতেও হয়, তাহাও স্বীকার; কিন্তু সুখের চেষ্টা করিতেই হইবে।' দৃষ্টান্তস্বরূপ ইঁহারা বলেন,—'বিষয়সঙ্গজাত সুখ দুঃখমিশ্রিত বলিয়া কদাচ পরিত্যাজ্য নহে; মূর্খেরাই সে কথা বলিয়া থাকে। তুষকণাচ্ছাদিত ধান্য সিতোত্তম উৎকৃষ্ট তণ্ডুলপূর্ণ থাকে। কিন্তু তুষাচ্ছাদিত বলিয়া কেহ কি তাহাকে পরিত্যাগ করে?' যথা,—

"ত্যাজ্যং সুখং বিষয়সঙ্গমজন্ম পুংসাং দুঃখোপসৃষ্টমিতি মূর্খবিচারণৈষা।
ব্রীহিন্ জিহাসতি সিতোত্তমতণ্ডুলাঢ্যান্ কো নাম ভোস্তুষকণোপহিতান্ হিতার্থী?"

এই প্রকার বহু উৎকট উক্তি এই সম্প্রদায়ের প্রবচন-রূপে পরিব্যক্ত হইয়া থাকে। কাঁটা দেখিয়া মৎস্যভক্ষণে বিরত হওয়া বাতুলের কার্য্য। ইহাও ইঁহাদের উপদেশ। নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্মের পরিচয় নিষ্কাম কর্ম্মের আলোচনায় গীতোক্ত ধর্ম্ম-তত্ত্বের ব্যাখ্যায় প্রকাশ করিয়াছি। যোগী মহাপুরুষগণই নিবৃত্তিমার্গের আদর্শস্থানীয়। শ্রীকৃষ্ণে নিবৃত্তি-ধর্ম্মের—নিষ্কাম কর্ম্মের—পূর্ণস্ফূর্ত্তি দেখিতে পাই। মহাযোগী মহেশ্বর নিবৃত্তিধর্ম্ম পালনের এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। যাঁহারা প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-মূলক তৃতীয় লক্ষণের নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারা নিবৃত্তিলক্ষণাক্রান্ত পুরুষকে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি মধ্যপথাবলম্বী জনগণ বৈদিক ধর্ম্মের অনুসরণকারী, অর্থাৎ স্বর্গাদিলাভের জন্য যে যাগযজ্ঞানুষ্ঠান, তাহা ঐ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি উভয় লক্ষণাক্রান্ত। এ মতে, সংসারবন্ধনছিন্নকারী পুরুষগণই নিবৃত্তি-পন্থী। মহর্ষি মনু বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানকে যে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, সেই দুই ভাগের এক ভাগকে এ ক্ষেত্রে 'প্রবৃত্তি-মূলক কর্ম্ম' না বলিয়া প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিমূলক কর্ম্ম' বলা হইয়াছে। ফলতঃ, মনু যাহাকে ধর্ম্মের মধ্যে গণ্য করেন নাই, তাহা প্রবৃত্তি-পর্য্যায়ভুক্ত এবং তৎকথিত প্রবৃত্তি ধর্ম্ম এস্থলে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি মধ্যধর্ম্মরূপে নির্দ্দিষ্ট।

পূর্ব্বে যে দ্বিবিধ বা ত্রিবিধ ধর্ম্ম-লক্ষণ বিবৃত হইল, বুদ্ধদেব উহার কোন্ লক্ষণের অনুসরণ করিয়াছিলেন? তাঁহার জীবনবৃত্ত আলোচনায় নিশ্চয়ই বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি কখনই চার্ব্বাকদিগের ন্যায় ঐহিক সুখের অভিলাষী ছিলেন না। 'ঋণ করিয়া ঘৃত পান' নীতির অনুসরণ তো দূরের কথা; তিনি অতুল রাজৈশ্বর্য্য অবহেলায় পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে কখনই প্রথমোক্ত পর্য্যায়ে গণ্য করা যায় না। দ্বিতীয় পন্থাবলম্বী বলিয়াও তিনি অভিহিত হইতে পারেন না। কেন-না, যাগ-যজ্ঞানুষ্ঠানে তাঁহাকে কখনই নিরত দেখিতে পাই নাই। তিনি সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্তিমার্গের অনুসরণকারী ছিলেন। হিন্দুশাস্ত্র যে মার্গের উপযোগিতার বিষয় উচ্চকণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন; আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থে যে মার্গের প্রকৃষ্টতা তারস্বরে বিঘোষিত হইয়াছে, একটু অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যায়, বুদ্ধদেব সেই পথেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। ভারতীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্রে নিবৃত্তি-মার্গের—নিষ্কাম কর্ম্মের প্রাধান্য কোথায় না পরিকীর্ত্তিত? বেদে, উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, তন্ত্রে,

বুদ্ধদেব নিবৃত্তিমার্গাবলম্বী।

* প্রথম খণ্ডে, চার্ব্বাক-দর্শন প্রসঙ্গে, এ বিষয়ের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ইতিহাসে, উপাখ্যানে সর্ব্বত্র নিবৃত্তি-ধর্ম্মের প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়াছে। কামনা-নাশে, তৃষ্ণার মূলোচ্ছেদ-সাধনে, জ্ঞানান্বেষণে বুদ্ধদেব জীবন-যাপন করিয়াছিলেন। ভারতের ইতিহাসে এ কি আর অভিনব দৃষ্টান্ত? সন্ন্যাসমূলক ধর্ম্ম হইলেও তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মেরই অঙ্গীভূত; জ্ঞানমূলক ধর্ম্ম হইলেও তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মেরই অঙ্গীভূত। ললিতবিস্তরে দেখি, তিনি শুনিতেছেন—সংসারের আর্ত্তনাদ; তিনি দেখিতেছেন,—সংসারের জ্বালা-মালা, সংসারীর অনিত্যতা, চতুর্দ্দিকের প্রলোভন এবং জন্ম-জরা-মরণের বিভীষিকা। তাঁহার কর্ম্মে তৎসমুদায়ের প্রতিকার চেষ্টাই প্রত্যক্ষীভূত হয়। তিনি যে ভাবে যে দৃশ্য দর্শন করিয়া যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, শাস্ত্র-গ্রন্থে সে দৃষ্টান্তের অভাব নাই। (ললিতবিস্তরে প্রকাশ) তিনি দেখিতেছেন,—

> "জ্বলিতং ত্রিভবং জরব্যাধিদুঃখৈর্ম্মরণাগ্নিপ্রদীপ্তমনাথমিদং।
> ন চ নিঃসরণে সদমূঢ় জগদ্‌ভ্রমতি ভ্রমরো যথ কুম্ভগতো॥
> অধ্রুবং ত্রিভবং শরদভ্রনিভং নটরঙ্গসমা জগি জন্মি চ্যুতি।
> গিরিনদ্যসমং লঘুশীঘ্রজবং ব্রজতায়ু জগে যথ বিদ্যু নভে॥
> ভুবি দেবপুরে ত্রি অপায়পথে ভবতৃষ্ণ অবিদ্যবশা জনতা।
> পরিবর্ত্তিষু পঞ্চগতিষ্ববুধাঃ যথ কুম্ভকারস্য হি চক্রভ্রমি॥
> প্রিয়রূপবরৈঃ সদস্নিগ্ধরুতৈঃ শুভগন্ধরসৈরর্ব্বস্পর্শসুখৈঃ।
> পরিবিক্তমিদং কলিপাশ জগৎ মৃগলুব্ধকপাশি যথেব হি বদ্ধকমপি॥
> সভয়া মরণাঃ সদ বৈরকরা বহুশোকউপদ্রব কামগুণাঃ।
> অসিধারসমা বিষযন্ত্রনিভা ত্যজ হিতার্য্যজনৈর্যথ মীঢ়ঘটঃ॥
> স্মৃতি শোককরাস্তমসীকরণা ভয়হেতুকরা দুঃখমূল সদা।
> ভবতৃষ্ণালতায় বিবৃদ্ধিকরাঃ সভয়াঃ শরণাঃ সদ কামগুণাঃ॥
> যথ অগ্নিখদা জ্বলিতাঃ সভয়াঃ তথ কাম ইমে বিদিতার্য্যজনৈঃ।
> মহপঙ্কসমা অসিসিন্ধুসমা মধুদিগ্ধ ইব ক্ষুরধার যথা॥"

অর্থাৎ,—'জরা-ব্যাধি-দুঃখের মরণাগ্নিতে প্রদীপ্ত এই অনাথ ত্রিভুবন জ্বলিতেছে। কুম্ভগত ভ্রমরের ন্যায় নিঃসরণে অসমর্থ মূঢ় জগৎ ভ্রাম্যমাণ। ত্রিভুবন শরদভ্রনিভ অধ্রুব; জগতের জন্মমৃত্যু নটরঙ্গসম। গিরিনিঃসৃত দ্রুতগতি নদীর ন্যায় অথবা আকাশে বিদ্যুদ্বৎ জগজ্জনের আয়ু ক্ষয় পাইতেছে। কি পৃথিবীতে, কি দেবপুরে, কি ত্রিবিধ ধ্বংসের পথে, ভবতৃষ্ণা অবিদ্যার বশে কুম্ভকারের চক্রের ন্যায় ভ্রাম্যমাণ মানুষ, পঞ্চবিধ অগতি প্রাপ্ত হইয়া, ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। প্রিয়রূপবরে মনোহর শব্দে সুগন্ধরসস্পর্শসুখে পরিবিক্ত হইয়া জগৎ কলিপাশে আবদ্ধ হইতেছে। প্রলুব্ধক মৃগ যেমন ব্যাধের জালে আবদ্ধ হয়, জগজ্জনের সেই অবস্থা। মরণভীতিপ্রদ ও পরম বৈর কামনা বহু শোকের উপদ্রবের হেতুভূত; উহা অসিধারা সমা ও বিষযন্ত্রনিভা পরিত্যাজ্য। হিতাকাঙ্ক্ষী আর্য্যগণ যেরূপ অপবিত্র ঘটকে দূরে নিক্ষেপ করেন, কামনাও সেইরূপ পরিত্যাজ্য। উহার স্মৃতি শোকজনক। উহা মহাপকারী, ভীতি-উৎপাদক, এবং সদা দুঃখের মূল। উহাতে ভবতৃষ্ণার বৃদ্ধি করে, উহাতে

শরণাগতজন নিয়ত ভীতিবিহ্বল থাকে। উহাকে প্রজ্বলিত অগ্নি-কুণ্ডবৎ ভয়াবহ জানিয়া আর্য্যগণ সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকেন। কামনা—মহাপঙ্কসমা, অসিসিদ্ধসদৃশা এবং মধুদিগ্ধ ক্ষুরধারতুল্য।' এই যে দৈববাণী শুনিয়া বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ-পথের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এ বাণী কি হিন্দু-শাস্ত্রের সনাতন বাণী নহে? সৃষ্টি অনিত্য, সৃষ্ট-পদার্থ শরৎকালীন মেঘ-সদৃশ ক্ষণস্থায়ী, জীবন নাট্যশালার রঙ্গমাত্র,—এ তত্ত্বজ্ঞান গৌতম-বুদ্ধের জন্মগ্রহণের বহু পূর্ব্বেও প্রচারিত ছিল না কি? কামনা যে মুক্তি-পথের অন্তরায়; তৃষ্ণাই যে সর্ব্বনাশের মূল,—এ উপদেশই বা হিন্দু-শাস্ত্রের কোথায় না পরিদৃষ্ট হয়! ত্রিতাপের জ্বালা নিবারণের জন্যই তো, জন্ম-জরা-মৃত্যুর বিভীষিকা হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্যই তো, বেদ, উপনিষৎ, দর্শন প্রভৃতির প্রবর্ত্তনা! ত্রিতাপের জ্বালা নিবারণের জন্যই তো, সাঙ্খ্য নিঃশ্রেয়স পথ অনুসন্ধান করিয়াছেন; নৈয়ায়িকগণ জন্ম-নিবারণের উপায় অন্বেষণ করিতেছেন! পতঞ্জলির যোগ-দর্শন অথবা মীমাংসকগণের মীমাংসা-প্রক্রিয়া ঐ একই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত নহে কি? মায়াময় সংসারের মায়া-প্রহেলিকা ছিন্ন করিয়া বেদান্ত যে আত্মজ্ঞানের স্বরূপ-তত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহাই বা কি? সেই দুঃখ, সেই দুঃখের কারণ, সেই দুঃখ-নিবৃত্তি, সেই দুঃখনিবৃত্তির উপায়,—এই যে চারি আর্য্য-সত্য বুদ্ধদেব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন; তাহার কোনটাই নূতন নহে। ত্রিতাপের যে জ্বালা নিবারণের জন্য বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শান্তির প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছেন; যে জ্বলন নিবৃত্তির অভিপ্রায়ে দিকে দিকে আবশ্যকানুরূপ জলনিষেক ব্যবস্থিত হইয়াছে; তাহা ভিন্ন বুদ্ধদেব নূতন কোনও শান্তির নির্ঝর উন্মুক্ত করেন নাই। যাহা ছিল, অথচ দৃষ্টিপথের অন্তরালে অন্ধকারে অচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; তাহাই তিনি আবিষ্কার করেন। যে নিবৃত্তি-মার্গের নিষ্কাম কর্ম্মের উপযোগিতা পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে; বুদ্ধদেব যখন আবির্ভূত হন, তখন সে নিবৃত্তি-পথ একরূপ রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল; অধিকন্তু প্রবৃত্তি-মার্গের প্রশস্ততা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছিল। নাস্তিক্য-বাদ সংসারকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিয়াছিল। সুতরাং সে সময়ে নিবৃত্তিমার্গের সংস্কারসাধনোদ্দেশ্যে শ্রীভগবানের মর্ত্ত্যে অবতরণ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ-সাধন উদ্দেশ্য মাত্র লক্ষ্য করিয়া মানুষ তখন যে সকল ক্রিয়া-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছিল; তদ্দ্বারা সমাজ-মধ্যে বিষম বিপ্লব-ব্যভিচার সংঘটিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ফলে, যে জ্বালা নিবৃত্তির জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান আরব্ধ হইয়াছিল, সেই জ্বালাই বৃদ্ধি পাইতেছিল। সুতরাং সে অবস্থায় আবার একবার নিবৃত্তি-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। বুদ্ধমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, শ্রীভগবান সেই আবশ্যকতা পূরণ বা অভাব দূর করেন। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্ম যে সনাতন হিন্দুধর্ম্মেরই অঙ্গীভূত, তাহা বলাই বাহুল্য। বুদ্ধদেব সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অনুসরণকারী ছিলেন। সন্ন্যাস-প্রথা চিরদিনই উন্মুক্ত ছিল। সুতরাং সন্ন্যাস-পথ অবলম্বন করিয়া তিনি সেই চিরন্তন প্রথারই পোষকতা করিয়া গিয়াছেন। তৎপ্রবর্ত্তিত ভিক্ষুর ধর্ম্মও যাহা, নিষ্কামকর্ম্মী সন্ন্যাসীর ধর্ম্মও তাহাই। সন্ন্যাসী ও ভিক্ষু শব্দদ্বয় একই অর্থবাচক। হিন্দুর যে চতুরাশ্রম—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস,—

তাহারই সন্ন্যাস বৌদ্ধদের ভিক্ষুত্ব।* নাম-সংজ্ঞার ইতর-বিশেষে কি আসে যায়, বস্তু-পক্ষে যখন একই সামগ্রী বুঝাইয়া থাকে! নিবৃত্তিমার্গাবলম্বী সন্ন্যাসিগণের মধ্যে বহু সম্প্রদায় বহুভাবে মুক্তিপথ অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছেন। বুদ্ধদেব তাঁহাদেরই মধ্যের এক প্রকৃষ্ট পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ, লক্ষণ বিষয়ে বিচার করিতে গেলে, পরস্পরের মধ্যে কোনই বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না। তার পর সকল জ্বালা নিবৃত্তিরূপ যে নির্ব্বাণ অবস্থা, তাহাও অভিনব নহে। নির্ব্বাণও যাহা, মুক্তিও তাহা; নিঃশ্রেয়স্, কৈবল্য প্রভৃতি সকলই অভিন্ন।† সুতরাং সর্ব্বত্রই সনাতন পুরাতনেরই প্রতিষ্ঠার প্রয়াস।

লক্ষণ-বিচারে যেমন পরস্পরের মধ্যে অভিন্ন ভাব দৃষ্ট হয়, বিশেষ বিশেষ বিধি-বিধানে এবং আচার-অনুষ্ঠানেও সে ঐক্য দেখিতে পাই। বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রহণে যে আদি অনুষ্ঠান—ত্রিশরণ গ্রহণের পর যে দশশীল বা দশবিধ সঙ্কল্প, তাহা মনু-কথিত দশধর্ম্ম বা দশ-পাপের অনুস্মৃতি ভিন্ন অন্য আর কিছুই নহে।‡ মহর্ষি মনু দশবিধ ধর্ম্মের বিষয় যাহা বলিয়াছেন এবং দশবিধ পাপের বিষয় যাহা খ্যাপন করিয়াছেন, বৌদ্ধধর্ম্মান্তর্গত দশশীল তাহারই প্রকারান্তর মাত্র।§ খৃষ্টধর্ম্ম-গ্রন্থোক্ত দশবিধ আজ্ঞাও মনুর মতের সহিত সাদৃশ্য-সম্পন্ন।** সাধারণভাবে যেমন বিধি-বিধানের ঐক্য দেখি, বিশেষ বিশেষ আচার-অনুষ্ঠানেও সেই ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধগণের মধ্যে একটী প্রথা আছে যে, তাঁহারা আপনাদের কৃত পাপের বিষয় প্রতি অমাবস্যায় ও পূর্ণিমায় ভিক্ষুমণ্ডলীর সমক্ষে ব্যক্ত করেন। বৌদ্ধগণের বিশ্বাস, তাহাতে পাপের ক্ষালন হয়। পক্ষান্তে সঙ্ঘস্বামী ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া আপনাপন পাপ-পুণ্য বিবৃত করিতে বলেন। সেই এক পক্ষের মধ্যে যদি কোনও ভিক্ষু পাপকর্ম্ম করিয়া থাকেন,

আচার-অনুষ্ঠানে ঐক্য।

---

* কোথাও 'সন্ন্যাস', কোথাও 'যতি', কোথাও ভিক্ষু শব্দ শাস্ত্রাদিতে দৃষ্ট হয়। যথা, মনুসংহিতা,—

"ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বাণপ্রস্থো যতিস্তথা। এতে গৃহস্থভবাশ্চত্বারঃ পৃথগাশ্রমঃ॥"

অন্যত্র,—"ব্রহ্মচর্য্যম্ গার্হস্থ্যম্ বাণপ্রস্থম্ সন্ন্যাসঃ।"

অমরকোষে,—"ব্রহ্মচারী গৃহী বাণপ্রস্থ ভিক্ষু।"

অতএব সন্ন্যাস, যতি ও ভিক্ষু যে একই ভাবাপন্ন মনুষ্যকে বুঝাইতেছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

† 'পৃথিবীর ইতিহাস' পঞ্চম খণ্ডে নির্ব্বাণ প্রসঙ্গে নির্ব্বাণ অবস্থার সহিত মুক্ত অবস্থা প্রভৃতির সাদৃশ্য বিষয়ক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

‡ 'পৃথিবীর ইতিহাস', তৃতীয় খণ্ডে ১৯০ পৃষ্ঠায় এ সকল বিষয়ের আলোচনা দেখুন। 'পৃথিবী ইতিহাস', পঞ্চম খণ্ড, ৩১৮ পৃষ্ঠায় ত্রিশরণ গ্রহণের ও দশ সঙ্কল্পের বিষয় কথিত হইয়াছে।

§ বিনয়-পিটকে দশশীল সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, মহাযান সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদিতে (প্রজ্ঞা-পারমিতা অষ্টসাহস্রিকা, মহাবস্তু অবদান প্রভৃতিতে) তাহার একটু রূপান্তর দেখা যায়। তদনুসারে (১) প্রাণাতিপাত, (২) অদত্তাদান, (৩) কামেষু মিথ্যাচার, (৪) সুরামৈরেয় মদ্যপান, (৫) মৃষাবাদ, (৬) পিশুন বাক, (৭) সম্ভিন্ন প্রলাপ, (৮) অভিধ্যা, (৯) ব্যাপাদ, (১০) মিথ্যাদৃষ্টি,—এই দশ কার্য্যে বিরতি দশশীল। মূলতঃ, পার্থক্য নাই বলিলেও বলা যাইতে পারে।

** মনুসংহিতার ষষ্ঠ অধ্যায় ৯১-৯৪ শ্লোক এবং দ্বাদশ অধ্যায় ৫ম-৭ম শ্লোক প্রভৃতির সহিত বাইবেলের অন্তর্গত এক্সোডাস (Exodus, Ch XX. 3—17) বিংশ অধ্যায় প্রভৃতির বর্ণনায় সম্পূর্ণ ঐক্য দৃষ্ট হয়।

তিনি তাহা প্রকাশ করেন। কচিৎ কোনরূপ পাপ করিয়া সঙ্ঘের সমক্ষে প্রকাশ করিলে, সে পাপ যে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়,—বৌদ্ধগণের ইহাই প্রধান বিশ্বাস। যিনি নিষ্পাপ বলিয়া আপনাকে মনে করিতে পারেন, তিনি নীরব থাকেন। অনেকে মনে করেন, এবম্বিধ পাপ-ক্ষালন প্রথা বৌদ্ধগণের নিজস্ব। পাতি-মোক্থ (প্রাতিমোক্ষ) পাঠের বিধি এই উদ্দেশ্যেই বিহিত দেখি। কিন্তু খ্যাপনে যে পাপের ক্ষয় হয়, মহর্ষি মনু বহু পূর্ব্বে তাহা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে মনুর উক্তি; যথা,—

"খ্যাপনেনানুতাপেন তপসাধ্যায়নেন চ। পাপকৃন্মুচ্যতে পাপং তথা দানেন চাপদি॥
যথা যথা নরোঽধর্ম্মং স্বয়ং কৃত্বানুভাষতে। তথা তথা ত্বচেবাহিস্তেনাধর্ম্মেণ মুচ্যতে॥
যথা যথা মনস্তস্য দুষ্কৃতং কর্ম্ম গর্হতি। তথা তথা শরীরং তৎ তেনাধর্ম্মেন মুচ্যতে॥
কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে। নৈবং কুর্য্যাৎ পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ॥"

অর্থাৎ,—"লোকসমাজে নিজের পাপজ্ঞাপন, পাপের জন্য অনুতাপ, তপস্যা এবং অধ্যয়ন দ্বারা পাপকারী পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে, এবং আপৎপক্ষে দানের দ্বারাও পাপের নিষ্কৃতি হয়। পাপ করিয়া পাপী স্বয়ং যে পরিমাণে লোক সম্মুখে তাহা প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়, সর্প যেমন নির্ম্মোকমুক্ত হয়, তেমনি সেও পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে; এবং যে পরিমাণে সেই পাপকারীর মন দুষ্কৃত কর্ম্মকে নিন্দা করিতে থাকে, সেই পরিমাণে তাহার জীবাত্মাও দুষ্কৃতি হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। পাপ করিয়া যদি সন্তাপ উপস্থিত হয়, তবে সেই পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। পরন্তু পুনর্ব্বার আর এরূপ করিব না— এং বলিয়া সেই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইলে—তবে সে সেই পাপ হইতে মুক্ত হয়।" সুতরাং বুঝিতে পারি, পাপ-খ্যাপন বিষয়েও বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের অনুসারী। কেবল বৌদ্ধধর্ম্মই বা বলি কেন? খৃষ্টধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেও পাপ-খ্যাপনে, পাপক্ষালনের বিষয় উক্ত হইয়া থাকে। ধর্ম্ম-যাজকের নিকট কৃত পাপের বিষয় গোপনে জ্ঞাপন করিলে, পাপ ক্ষয় হয়,—রোমানকাথলিক সম্প্রদায়-ভুক্ত খৃষ্টানগণের এইরূপ বিশ্বাস আছে। মনু পাপ-খ্যাপনে কোনরূপ গণ্ডী নির্দ্দেশ করেন নাই। বৌদ্ধগণের পিটক গ্রন্থ সঙ্ঘভুক্ত ভিক্ষুগণের মধ্যে মাত্র সে কথা প্রকাশ করিতে উপদেশ দিলেন। খৃষ্টধর্ম্ম গ্রন্থ বাইবেলে সে পাপ খ্যাপন প্রথা অধিকতর সীমাবদ্ধ হইয়া আসিল; বাইবেল কেবলমাত্র প্রধান ধর্ম্মযাজকের নিকট সে কথা প্রকাশ করিতে উপদেশ দিলেন। এতদ্দ্বারা এক আদি-ধর্ম্ম হইতে—সনাতন হিন্দুধর্ম্ম হইতে—যে অন্যান্য ধর্ম্মের উপাদান-সমূহ সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা স্বতঃই অনুমিত হইয়া থাকে।

সত্য সর্ব্বকালে সর্ব্ব অবস্থায় সকল দেশেই অভিন্ন। অগ্নির দাহিকাশক্তি, জলের শৈত্যভাব অথবা লৌহ-প্রস্তরাদির কাঠিন্য, কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলিয়া যিনি ধারণা করেন, তিনিই ভ্রান্ত বা বিকারগ্রস্ত বলিয়া অভিহিত হন। ধর্ম্মমতের পরস্পর সাদৃশ্য দেখিয়া সুতরাং যাহা আদিভূত তাহারই প্রাধান্য মান্য করিতে হয়। অতএব কিবা বৌদ্ধধর্ম্মে, কিবা খৃষ্টধর্ম্মে, কিবা অন্যান্য ধর্ম্মে যে সকল সদ্ভাব, সন্নীতি বা সত্য-তত্ত্ব

সনাতন এক হইতে।

প্রচারিত হইতে দেখি, তাহার সহিত তৎপূর্ব্ববর্ত্তী পুরাতন সনাতন হিন্দুধর্ম্মের ঐক্য দেখিতে পাইলে, প্রথমোক্ত মত-সমূহকে শেষোক্তের সন্ততিস্থানীয় বলিয়াই বিশ্বাস করি। বেদানুগত সনাতন হিন্দুধর্ম্মের ক্রোড়ে যখন বৌদ্ধধর্ম্ম উৎপন্ন পরিপুষ্ট হইল; অপিচ, যখন তাহার উদ্দেশ্য-লক্ষ্য ও আচার-ব্যবহার প্রথমোক্তের সহিত সাদৃশ্যসম্পন্ন প্রতীত হইল; তখন একের সহিত অন্যের সম্বন্ধ-বন্ধনের বিষয় কখনই অস্বীকার করা যায় না। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতিঃ যীশুখৃষ্টে প্রভাববিশিষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি; আর এই জন্যই পৌর্ব্বাপৌর্য্য-জ্ঞানহীন অন্ধবিশ্বাসী কেহ কেহ যীশুখৃষ্টের প্রভাব শ্রীকৃষ্ণে দেখিতে পান।* কাহারও কাহারও মত আবার মধ্যপথাবলম্বী। তাঁহারা বলেন, প্রাকৃতিক সাম্যভাব হেতু অভিন্ন ভাব-প্রবাহ বিভিন্ন বিভাগে স্বতঃপ্রবাহিত হয়; অর্থাৎ,—একের

---

* বিভিন্ন ধর্ম্মের সাদৃশ্য-তত্ত্ব আলোচনায় এক হইতে অন্যের উৎপত্তি প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়; এবং তাহার বাদ-প্রতিবাদ চলিয়া থাকে। ত্রিত্ব (Trinity), ত্রিমূর্ত্তি, ত্রিতত্ত্ব, ত্রিশরণ প্রভৃতি যে একই পর্য্যায়-ভুক্ত, অনেকে তাহা স্বীকার করেন এবং কেহ কেহ তাহা স্বীকার করেনও না। অবতার বিষয়ে এবং পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধেও এই-রূপ মতান্তর আছে। একের সহিত অন্যের সাদৃশ্য সত্ত্বেও, সে সাদৃশ্য কি ভাবে উপেক্ষিত হয়, খৃষ্টানদিগের এক-খানি গ্রন্থ হইতে তদ্বিষয়ক কয়েকটী যুক্তি এস্থলে উল্লেখ করিতেছি। সেই গ্রন্থে প্রকাশ—'খৃষ্টানগণের যে ত্রিত্ব (Trinity), তাহা অতুলনীয়। অন্যান্য ধর্ম্মে ঐ তত্ত্বে তিন ঈশ্বরের পরিকল্পনা; তদ্দারা বহু ঈশ্বরবাদ আসিয়া পড়ে। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্যভাব। খৃষ্টধর্ম্মে একেই ত্রিত্ব—একেই তিনের সমাবেশ।' এইরূপ অবতার সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলেন,—কৃষ্ণের ও খৃষ্টের জীবনে ঘটনার অনেক সাদৃশ্য দেখিয়া, কেহ কেহ যে খৃষ্টে কৃষ্ণের অনুসরণ বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহাও ভ্রমসঙ্কুল। দুই কারণে সে ভ্রান্তি উপলব্ধি হয়। প্রথম খৃষ্টের জীবন-বৃত্ত লইয়া কৃষ্ণচরিত্র পরিকল্পিত; অর্থাৎ,—বাইবেলের বর্ণনা বিকৃত হইয়া কৃষ্ণচরিত্রে সমাবিষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, যদি কেহ কৃষ্ণকে খৃষ্টের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলেও, কৃষ্ণের প্রভাব খৃষ্টের উপর পতিত হওয়া অসম্ভব। কেন-না, কৃষ্ণের জন্মভূমি ভারতবর্ষ হইতে খৃষ্টের জন্মভূমি প্যালেষ্টাইন বহু শত ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অত দূরে কৃষ্ণের প্রভাব বিস্তৃত হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। তার পর কৃষ্ণের যে সকল অলৌকিক-কার্য্য ও উচ্চ উপদেশ, তৎসমুদায় কুনীতি-সংসর্গ-দোষযুক্ত। কিন্তু বাইবেলে সে কলঙ্ক আদৌ নাই। লুক গ্রন্থের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যীশু-খৃষ্ট একটী বিকৃতাঙ্গী নারীকে রূপসম্পন্না করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কুব্জাকে রূপসীতে পরিণত করেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার সচ্চরিত্রতা প্রকাশ পায় নাই। এইরূপ অন্যান্য ঘটনাতেও, কৃষ্ণের ও খৃষ্টের জীবনের সাদৃশ্য থাকিলেও, কৃষ্ণ অপেক্ষা খৃষ্টের নৈতিক উৎকর্ষ লক্ষিত হয়। মানবের হিতসাধনে ঈশ্বরের প্রযত্নের বিষয় সকল দেশে সকলেই কোনও-না-কোনরূপে অনুভব করেন। অলৌকিক ভাবে ব্যাধিমুক্তি, আশাতীত সুখসম্পত্তি-প্রাপ্তি প্রভৃতি ঈশ্বরের কল্পিত অবতারের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকে। অন্যত্র তৎসমুদয় সন্নীতির অন্তরায়ভূত; কিন্তু যীশুখৃষ্টে সর্ব্বপ্রকার কলুষতাশূন্য।' এ মতে একমাত্র যীশুখৃষ্টই অবতার (Incarnation) মধ্যে পরি-গণিত। তার পর পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে যীশুখৃষ্টের সহিত সাদৃশ্য গ্রন্থকার অন্য কোথাও দেখিতে পান নাই। তিনি বলেন,—মধ্যস্থরূপে পাপভার গ্রহণের দৃষ্টান্ত এক যীশুখৃষ্টেই আছে। প্রাচীনের মধ্যে তদ্রূপ প্রসঙ্গ বাবিলনের ইতিহাসে এবং মিশরের ইতিহাসে যদিও দৃষ্ট হয়; কিন্তু তাহা খৃষ্টের জ্যোতিঃর নিকট সম্পূর্ণ পরিম্লান। বাবি-লোনীয়ায় ইয়া (Ea) নামক পরমেশ্বর এবং তাঁহার পুত্র মোরোডাক (Morodach) প্রসিদ্ধ। মনুষ্যের এবং ঈশ্বরের মধ্যবর্ত্তী-রূপে ঈশ্বরপুত্র সেই মোরোডাক (Morodach), মনুষ্যের প্রার্থনা ঈশ্বরের নিকট পৌঁছাইয়া দিতেন। অর্থাৎ,—মনুষ্যগণ তাঁহার নিকট যে প্রার্থনা করিতেন, পিতা পরমেশ্বরকে তাহা জানাইতেন। এক হিসাবে, যীশুখৃষ্ট যেরূপ ঈশ্বরের এবং মনুষ্যের মধ্যবর্ত্তী ছিলেন, মোরোডাকও সেইরূপ। প্রাচীন মিশরের হোরাস (Horus) দেবতার পৌরাণিক কাহিনী যীশুখৃষ্টের জীবন-বৃত্তের সহিত আরও যেন অধিক সাদৃশ্য-

ভাবস্ফুরণে অন্যের ভাবস্ফূর্ত্তির অপেক্ষা রাখে না। এ সিদ্ধান্ত অনেক পরিমাণে যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীত হইলেও, সকলেই যখন এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করেন; আর সকলেই যখন তাঁহাকে সৎস্বরূপ সনাতন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছেন; তখন যেখানে যে কিছু সত্য-তত্ত্ব নিষ্কাসিত হইতেছে, সকলেরই মূল যে তিনি—সেই এক, তাহাতে কোনই সংশয় আসিতে পারে না। জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যদেব; সকল জ্যোতিঃ তাঁহা হইতে বিনিঃসৃত হইতেছে; সুতরাং সকল জ্যোতিঃই তাঁহার অঙ্গীভূত। অথবা সে যেন পূতগঙ্গোদক,—কেহ মৃৎপাত্রে রাখিয়াছে; কেহ তাম্রপাত্রে পূরিয়াছে; কেহ কাংস্যহিরণ্ময় পাত্রে ঢালিয়াছে। সেই একই সনাতন সত্যধর্ম্ম,—দেশবিশেষে, সমাজবিশেষে, জাতিবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকট রহিয়াছে। অথচ, ভ্রান্তিবশে মানুষ মনে করে, আমার ধর্ম্মমতের অন্যে অনুসরণ করিয়াছে। গোঁড়া খৃষ্টানগণ এবং তাঁহাদের অনুসরণকারিগণ তাই মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণে খৃষ্টের অনুসরণ; তাই কেহ বা প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে বুদ্ধদেবকে ও বৌদ্ধধর্ম্মকে ইরাণের ও জোরওয়াষ্টার

সম্পন্ন। প্রাচীন মিশরের পরমেশ্বরের নাম ওসিরিস্ (Osiris)। হোরাস্ (Horus) তাঁহার একমাত্র পুত্র। মানুষগণের পৃথিবীতে আসিবার অনেক পূর্ব্বে, তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অন্যায়ের উপর ন্যায়ের প্রাধান্য বিস্তারে, অসত্যের আঁধারে সত্যের আলোক বিকীরণে এবং যাহা কিছু উচ্চ সদ্ভাব-সম্পন্ন, তৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে তিনি ধরাধামে আসিয়াছিলেন। মানবজাতির সম্বন্ধে তিনি মুক্তিদাতা ও ন্যায়-পথ-প্রদর্শক বলিয়া কথিত হন। মৃত্যুর পর আত্মা বিষম পরীক্ষা-ক্ষেত্রে পতিত হন। হোরাসের সাহায্যে সেই বিপদ-পারাবার হইতে আত্মা উত্তীর্ণ পায়। অবশেষে ওসিরিসের সম্মুখে আত্মা বিচারার্থ আনীত হইলে সদাত্মার মুক্তির জন্য হোরাস্ মধ্যস্থতা করেন। এ বিষয়ে যেমন যীশুখৃষ্টের কার্য্যের সহিত তাঁহার কার্য্যের সাদৃশ্য দেখি, তাঁহার উপাধি সম্বন্ধে সে সাদৃশ্য আরও অধিক বলিয়া বুঝিতে পারি। তিনি ঈশ্বরের একমাত্র জাত পুত্র (Only begotten son of God), তিনি 'অনন্ত-স্বরূপ পিতার পুত্র' (The son of the Eternal father), তিনি ঈশ্বরের বাক্য (The word of God), তিনি 'কুমারীর পুত্র (The son of a Virgin)। তাঁহার পিতা পরমেশ্বর—ওসিরিস; তাঁহার মাতা কুমারী—আইসিস্ (Isis)। ফলতঃ, যীশুখৃষ্ট যেমন ঈশ্বরের পুত্র এবং কুমারী মেরীর সন্তান; হোরাসেরও পিতা-মাতা সেইরূপ।" কিন্তু এবম্বিধ সাদৃশ্য দেখিয়া গোঁড়া খৃষ্টানগণ বলেন,—'হোরাস চরিত্র মিশরীয়দিগের কল্পনা মাত্র। প্রাচীন মিশরীয়গণ ঈশ্বরের ন্যায়পরতার বিষয় সম্পূর্ণরূপ অনুভব করিয়াছিল; মনুষ্যের অমরত্ব, তাহার দায়িত্ব এবং তাহার পাপ-প্রবণতা প্রভৃতি বিষয়ও তাহাদের অনুভূতিতে আসিয়াছিল। সুতরাং তাহারা আপনাদের পাপমুক্তি সম্বন্ধে মধ্যস্থের অনুসন্ধান করিয়াছিল। সেই অনুসন্ধানের ফলই তাহাদের মনে হোরাস দেবতার পরিকল্পনা।' জল-বায়ু এবং জাতি-প্রকৃতির প্রভাব বশতঃ ধর্ম্মের সমতা বা বিভিন্নতা ঘটিতে পারে,—যাঁহারা এই মতের পোষকতা করেন, তাঁহাদের উক্তির প্রতিবাদে ঐ শ্রেণীর খৃষ্টানগণ বলিয়া থাকেন,—'যাহা সত্য, তাহা সকল স্থলেই সত্য। আরবেই হউক, আর তিব্বতেই হউক, খৃষ্টধর্ম্ম সর্ব্বত্রই সমান। অভিজ্ঞজনের নিকট সত্য কখনই বিকৃত হয় না। যিনি জ্যোতিষ-শাস্ত্রে প্রকৃত অভিজ্ঞ, তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, পৃথিবী যে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহাই বলিবেন; সূর্য্য যে পৃথিবীকে পরিভ্রমণ করিয়া বিঘূর্ণিত হইতেছে, ইহা কখনই বলিবেন না।' যুক্তি সকল পক্ষেই আছে। তবে সত্য এক, জ্ঞান এক; সুতরাং যেখানে যে ভাবেই তাহা বিকাশপ্রাপ্ত হউক না কেন, এক হইতেই সকলের উদ্ভব, তাহা মানিতেই হইবে।

প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের অনুসরণকারী বলিয়া ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হন না। অথচ, সামান্য একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, কোন্‌টী পূর্ব্বের ও কোন্‌টী পরের, কোন্‌টী মূল ও কোন্‌টী শাখা, তাহা বুঝিতে বাকি থাকে না।

নীতি ও উপদেশের সাদৃশ্য পৃথিবীর প্রায়ই সকল ধর্ম্মের মধ্যেই দেখিতে পাই। জৈনধর্ম্মে ও বৌদ্ধধর্ম্মে সে সাদৃশ্যের অন্ত নাই। অনেকের বিশ্বাস, বুদ্ধদেব ঈশ্বর মানিতেন না। বুদ্ধদেব বেদ মানিতেন না, বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণগণের প্রতি বিদ্বেষ্টা ছিলেন; কিন্তু সে সকলই ভ্রান্ত বিশ্বাস। বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রন্থ-সমূহ আলোড়ন করিলে, ঐ সকল সংশয়ের অনায়াসেই মীমাংসা হয়। বুদ্ধদেবের উক্তি সমূহকে এবং বৌদ্ধশাস্ত্রের নীতি-সমূহকে ত্রিবিধ বিভাগে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করিলে এ বিষয়ের ভ্রম দূর হইতে পারে। প্রথম, ব্রাহ্মণগণের সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের যে উক্তি দেখিতে পাই, তাহাতে অভিনবত্ব কিছুই নাই। মম্বাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে ব্রাহ্মণগণ সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, বুদ্ধদেবে তাহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। তাহাতে তাঁহার ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ আদৌ প্রতিপন্ন হয় না। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার ঈশ্বর-স্বীকার ও বেদমান্য করার প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৃতীয়তঃ, তিনি যে সকল নীতি-তত্ত্ব প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রায় সকলই হিন্দু শাস্ত্রোক্ত নীতিকথার অনুসারী। একে একে এই ত্রিবিধ বিষয়ের সাদৃশ্য প্রদর্শন করিতেছি। ব্রাহ্মণগণের সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের উক্তি পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। মহর্ষি মনু ব্রাহ্মণের লক্ষণাদির বিষয়ে কি অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। এই দুই মত মিলাইয়া পাঠ করিলে, একের সহিত অন্যের যে পার্থক্য নাই, তাহা বেশ উপলব্ধি হইবে। ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে মহর্ষি মনুর উক্তি (মনুসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়); যথা,—

নীতি ও উপদেশে সাদৃশ্য।

"ন হায়নৈর্ন পলিতৈর্ন বিত্তেন ন বন্ধুভিঃ। ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্ম্মং যোঽনূচানঃ স নো মহান্॥
বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠং ক্ষত্রিয়ানান্তু বীর্য্যতঃ। বৈশ্যানাং ধান্যধনতঃ শূদ্রাণামেব জন্মতঃ॥
ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ। যো বৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ॥
যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ। যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি॥
যথা ষণ্ডোঽফলঃ স্ত্রীষু যথা গৌর্গবি চাফলা। যথা চাজ্ঞেঽফলং দানং তথাবিপ্রোঽনৃচোঽফলঃ॥
অহিংসয়ৈব ভূতানাং কার্য্যং শ্রেয়োঽনুশাসনম্। বাক্ চৈব মধুরা শ্লক্ষ্ণা প্রযোজ্যা ধর্ম্মমিচ্ছতা॥
যস্য বাঙ্মনসী শুদ্ধে সম্যগ্‌গুপ্তে চ সর্ব্বদা। স বৈ সর্ব্বমবাপ্নোতি বেদান্তোপগতং ফলম্॥
নারুন্তুদঃ স্যাদার্ত্তোঽপি ন পরদ্রোহকর্ম্মধীঃ। যয়াস্যোদ্বিজতে বাচা নালোক্যাং তামুদীরয়েৎ॥
সম্মানাদ্ ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব। অমৃতস্যেব চাকাঙ্ক্ষেদবমানস্য সর্ব্বদা॥
সুখং হ্যবমত শেতে সুখঞ্চ প্রতিবুধ্যতে। সুখং চরতি লোকেঽস্মিন্নবমন্তা বিনশ্যতি॥
অনেন ক্রমযোগেন সংস্কৃতাত্মা দ্বিজঃ শনৈঃ। গুরৌ বসনসঞ্চিনুয়াদ্ ব্রহ্মাধিগমিকং তপঃ॥"

অর্থাৎ,—'বয়সে, শুক্ল কেশে, ধনে কিম্বা সম্বন্ধে অথবা এতৎসমুদয় একত্র থাকিলেও বড় হওয়া যায় না। ঋষিরা এই ধর্ম্ম-নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন যে, যিনি সাঙ্গবেদবিৎ, আমাদের মধ্যে তিনিই মহৎ পদবাচ্য। জ্ঞানের উপর ব্রাহ্মণদিগের জ্যেষ্ঠত্ব নির্ভর করে; অধিক বীর্য্যশালী হইলে ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হয়; যিনি ধন-ধান্যে বড়, বৈশ্যদিগের

মধ্যে তিনি জ্যেষ্ঠ; আর অগ্রপশ্চাৎ জন্ম-বিবেচনায় যে জ্যেষ্ঠত্ব, সে কেবল শূদ্রদিগের মধ্যে। মস্তকের কেশ পাকিলেই যে বৃদ্ধ হয়, এমন নহে; কিন্তু যিনি যুবা হইয়াও বিদ্বান, দেবতারা তাঁহাকেই বৃদ্ধ বলেন। কাষ্ঠনির্ম্মিত হস্তী যেমন, চর্ম্মনির্ম্মিত মৃগ যেমন,—বেদহীন ব্রাহ্মণও তদ্রূপ। ইহারা তিন জনেই কেবল নামমাত্র ধারণ করে। ক্লীবের স্ত্রী-সহবাস যেমন নিষ্ফল; গাভীতে গাভীতে সঙ্গম যেমন কোনও ফলদায়ক নহে; পাগলকে দান যেমন কোনও কার্য্যেরই নয়; তদ্রূপ বেদাধ্যয়নহীন ব্রাহ্মণও কোনও কর্ম্মেরই নহে। অতি তাড়না সহকারে শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিবে না। ধর্ম্ম-কামনায় যিনি শিক্ষা দান করেন, শিষ্যের প্রতি তিনি মধুর এবং নম্র বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কারণ, পরুষ অথবা মিথ্যাকথনাদি হইতে যাঁহার বাক্য এবং রাগ-দ্বেষাদি হইতে যাঁহার মন বিমুক্ত হইয়াছে; যিনি বাক্য এবং মনকে অসদৃশ কর্ম্ম হইতে সর্ব্বদা সম্যকরূপে রক্ষা করেন, তিনি বেদান্তোপগত সমুদায় ফলই লাভ করেন। একান্ত পীড়িত হইলেও অন্যের মর্ম্ম-পীড়ন করা উচিত নয়। যাহাতে পরের অনিষ্ট হয়, এমন কোনও কর্ম্ম বা চিন্তা করিতে নাই এবং যে কথা বলিলে লোকের উদ্বেগ জন্মে, পরলোক-বিরোধী এমন বাক্য উচ্চারণ করিতে নাই। ব্রাহ্মণ ঐহিক সম্মানকে যাবজ্জীবন বিষের ন্যায় জ্ঞান করিবেন এবং অবমাননাকে সর্ব্বদা অমৃতের ন্যায় আকাঙ্ক্ষা করিবেন। কারণ, অবমাননা সহ্য করিতে অভ্যস্ত হইলে অপমান-জনিত ক্ষোভ আর উদয় হয় না; সুতরাং সুখে নিদ্রা যাওয়া যায়, সুখে জাগরিত হওয়া যায়, স্বচ্ছন্দে সংসারে কর্ত্তব্য-কর্ম্মে বিচরণ করা যায়; পরন্তু অপমানকারীরই আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়া থাকে। পাপবশতঃ তাহার ইহ-পর উভয় লোকই নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ ক্রম-কথিত উপায় দ্বারা সংস্কৃতাত্মা অর্থাৎ উপনীত দ্বিজ গুরুকুলে বাসকালীন ক্রমে ক্রমে বেদ-প্রাপ্তির যোগ্য তপস্যা সঞ্চয় করিবেন।' অন্যান্য শাস্ত্র-গ্রন্থেও ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে যে উক্তি দৃষ্ট হয়, তাহারও একটু আভাষ দিতেছি। যথা,—

"ন ক্রোধেন্ন প্রহৃষ্যেচ্চ মানিতোঽমানিতশ্চ যঃ। সর্ব্বভূতেষ্বভয়দস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥
যেন কেন চিদাচ্ছন্নো যেন কেন চিদাশিতঃ। যত্র কচন শায়ী চ তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥
বিমুক্তং সর্ব্বসঙ্গেভ্যো মুনিমাকাশবৎ স্থিতম্। অস্বমেকচরং শান্তং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥
জীবিতং যস্য ধর্ম্মার্থং ধর্ম্মোরত্যর্থমেব চ। অহোরাত্রাশ্চ পুণ্যার্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥
নিরাশিষমনারম্ভং নির্নমস্কারমস্তুমিতং। অক্ষীণং ক্ষীণকর্ম্মানং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥
কর্ম্মানা ব্রাহ্মণো জাতঃ করোতি ব্রহ্মভাবনাম্। স্বধর্ম্ম নিরতং শুদ্ধস্তস্মাদ ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥"

অর্থাৎ,—'সম্মানিত বা অপমানিত হইলে কোনও অবস্থাতেই যিনি ক্রুদ্ধ বা প্রহৃষ্ট হন না, যিনি সর্ব্বভূতে অভয় প্রদান করেন, দেবগণ তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। অশন বসন শয়নে যাঁহার কোনও প্রলোভন নাই; অর্থাৎ যিনি যাহা পান তাহাই পরিধান করেন, যাহা পান তাহাই ভোজন করেন, এবং যেখানে সেখানে শয়ন করেন; দেবতাগণ তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। যিনি সর্ব্বসঙ্গবিমুক্ত অর্থাৎ নির্লিপ্ত অথচ আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত; যিনি মুনি, যিনি বিমুক্ত, যিনি নির্জ্জনবাসী, যিনি শান্ত, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। যিনি আশীর্ব্বাদের অতীত, যিনি আরম্ভ বহির্ভূত, যিনি

কাহারও স্তুতি-পরায়ণ নহেন, যিনি অক্ষীণ অথচ যাঁহার কর্ম্মভোগ ক্ষীণপ্রাপ্ত, দেবতারাই তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। কর্ম্মের দ্বারা ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। যিনি ব্রহ্মভাব-পরায়ণ, স্বধর্ম্মনিরত, শুদ্ধসত্ত্ব, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়।" বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণের যে সকল লক্ষণ নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন, সে সকল কি, এ সকল লক্ষণ হইতে বিভিন্ন? কখনই নহে। ভাষার বিভিন্নতা থাকিতে পারে; কিন্তু ভাবের ঐক্য সর্ব্বত্র।* তার পর, বুদ্ধদেব যে স্রষ্টার সৃষ্টি-কর্তৃত্বে বিশ্বাসবান ছিলেন না বলিয়া—তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই বলিয়া—যে একটা কিংবদন্তী আছে, তাহাও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া, তিনি যে প্রথম বাক্য উচ্চারণ করেন, তিনি যে উদান গান করিয়া আত্ম-তৃপ্তি থ্যাপন করেন, তাহাতে সৃষ্টি-কর্ত্তার অস্তিত্ব স্পষ্ট স্বীকার করিতেছেন দেখিতে পাই। তিনি যখন বলিলেন,—"গহকারক! দিট্‌ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি।" অর্থাৎ,—'হে গৃহনির্ম্মাতৃ (হে সৃষ্টিকর্ত্তা)! আজ আমি তোমাকে দেখিয়াছি; আর তুমি এ গৃহ-নির্ম্মাণে আমায় বন্ধনে সমর্থ হইবে না'; তখনই বুঝা যায়, তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিয়াছিলেন। হইতে পারে, প্রথমে তিনি সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি-নৈপুণ্যে সন্দিহান ছিলেন; হইতে পারে, প্রথমে নিরীশ্বরবাদ তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু সাধনার পর তিনি যে স্রষ্টাকে সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া তদ্দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন; তাঁহার ঐ উক্তিতে তাহা সপ্রমাণ হয়। এইরূপ সর্ব্বভূতে সমদর্শন-জ্ঞান প্রভৃতির দ্বারাও তিনি যে জগৎ পাতা জগৎস্রষ্টা জগদীশ্বরের বিশ্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাও বুঝিতে পারা যায়। বুদ্ধদেব যে বেদ কখনও অমান্য করেন নাই, পরন্তু তিনি যে বেদের জ্ঞান মার্গের অনুসরণ করিয়াছিলেন, এ বিষয় আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং সর্ব্বপ্রকারেই প্রতিপন্ন হয়,—বৌদ্ধধর্ম্ম সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গস্থানীয়।

ভ্রান্ত-বিশ্বাস। নিরসনে।

যে বৌদ্ধধর্ম্ম ও জৈন-ধর্ম্ম ভারতের মৃতকল্প অসার দেহে এক সময়ে নব-জীবন সঞ্চার করিয়া গিয়াছে, সেই দুই ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সম্বন্ধে কি ভ্রম ধারণা ও ভ্রান্ত বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াই রহিয়াছে! ঐ দুই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পৌর্ব্বাপৌর্য্য লইয়া কতই বাদ-বিতণ্ডা ও মতান্তর চলিয়াছে। কেহ বলিতেছেন,—"জৈন ধর্ম্মই আদি, তাহা হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি; "কেহ বলিতেছেন,—বৌদ্ধধর্ম্মই আদি, তাহা হইতেই জৈন-ধর্ম্মের উৎপত্তি।" প্রধানতঃ উভয় ধর্ম্মের সাদৃশ্য-তত্ত্ব অনুধাবন করিয়াই, এই বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। অথচ এ বিতণ্ডা নিরসনের যে এক প্রকৃষ্ট উপায় আছে, তৎপ্রতি অতি অল্প জনেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। উহারা উভয়েই যে মূল-বৃক্ষের কাণ্ডস্থানীয়—প্রধান শাখার অন্তর্ভূত, জানি-না—তৎপ্রতি কয়জনের দৃষ্টি-নিপতিত হইয়াছে! এ বিষয়ে আমরা একজন নিরপেক্ষ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের গবেষণা আলোচনা করিয়া দেখিতে পারি। জগতে যখন যে ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রাধান্য বিস্তৃত হয়, তখন সেই ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের বা তৎপ্রবর্ত্তিত মত-পরম্পরার আদিমত্ব প্রচারের একটা চেষ্টা

* পৃথিবীর ইতিহাস পঞ্চম খণ্ডে ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার সহিত শাস্ত্রোক্তির সাদৃশ্য সহজেই উপলব্ধি হইবে।

দেখিতে পাই। এই কারণে জৈন-ধর্ম্ম যখন রাজকীয় ধর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল, তখন উহার প্রাচীনত্ব বিষয়ে অনেকের অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। এইরূপ বৌদ্ধধর্ম্ম যখন রাজকীয় ধর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হয়, প্রাধান্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উহার মৌলিকত্ব অনেকের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, প্রথমে একজন জৈন নৃপতি এবং পরিশেষে কয়েকজন বৌদ্ধ নৃপতি ভারতবর্ষে একছত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। আমরা যথাক্রমে রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্তকে এবং রাজচক্রবর্ত্তী অশোকবর্দ্ধনকে জৈন ও বৌদ্ধনৃপতি-প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। সুতরাং ঐ দুই নৃপতির রাজত্বকালে যথাক্রমে জৈন ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রাধান্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস করি। পরবর্ত্তী ঘটনার আবরণে অনেক সময় পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা আবৃত হইয়া থাকে। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধানে এ বিষয়টী আমরা বেশ উপলব্ধি করিতে পারি। আমাদের মনে হয়, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জৈন-ধর্ম্মকে বৌদ্ধধর্ম্মের সন্ততিস্থানীয় বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করিতেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে অনুসন্ধিৎসু প্রফেসার লাসেন্ প্রভৃতিও ঐ মতের অনুবর্ত্তী ছিলেন। কিন্তু ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে হারম্যান জ্যাকবি এ ক্ষেত্রে এক নবীন আলোক সঞ্চার করেন। আমরা যে সত্য পুনঃপুনঃ ঘোষণা করিয়া আসিতেছি, সেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতের গবেষণায় তাহারই প্রতিধ্বনি ফুটিয়া উঠে। কি যুক্তি বলে জৈন ধর্ম্মকে বৌদ্ধধর্ম্মের সন্ততি মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছিল, আর কি কারণে সে যুক্তি ভিত্তিহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, এতৎপ্রসঙ্গে সংক্ষেপে তদ্বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে। * তাহা হইতে মূল-তত্ত্ব স্বতঃই অধিগত হইতে পারিবে। বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে যে জৈন-ধর্ম্মের উৎপত্তি, তাহার চারিটী কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। প্রথম কারণ—বৌদ্ধ ও জৈন উভয় সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকদ্বয়ের উপাধি বা নাম-সংজ্ঞা প্রায়ই অভিন্ন; যথা,—জিন, অর্হৎ, মহাবীর, সর্ব্বজ্ঞ, সুগত, তথাগত, সিদ্ধ, বুদ্ধ, সম্বুদ্ধ, পরিনিবৃত, মুক্ত ইত্যাদি। উভয় সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদির মধ্যে প্রায় সর্ব্বদাই এই সকল নাম-বিশেষণ প্রযুক্ত দেখি। সুতরাং এক হইতে অপরের উৎপত্তি বিষয়ে সাধারণতঃ সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে। তবে এইটুকু বিশেষত্ব লক্ষ হয় যে, 'জিন' এবং সম্ভবতঃ 'শ্রমণ' ভিন্ন অন্য উপাধিগুলির কয়েকটীর প্রাধান্য বৌদ্ধগণের মধ্যে এবং অপর কয়েকটীর প্রাধান্য জৈনগণের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। বুদ্ধ, তথাগত, সুগত এবং সম্বুদ্ধ সংজ্ঞা-চতুষ্টয় সাধারণতঃ শাক্য-মুনি সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ঐ সকল উপাধি জৈন-তীর্থঙ্কর মহাবীর সম্বন্ধে সময়ে সময়ে ব্যবহার হইতে দেখা যায় বটে; কিন্তু প্রধানতঃ শাক্য-বুদ্ধ সম্বন্ধেই উহাদের প্রয়োগ। এইরূপ বীর, মহাবীর প্রভৃতি শব্দদ্বয় জৈনতীর্থঙ্কর 'বর্দ্ধমান' সম্বন্ধেই প্রধানতঃ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তবে একটি শব্দ প্রয়োগ বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে কিন্তু বিশেষ অর্থানৈক্য দেখিতে পাই। সে শব্দটি—তীর্থঙ্কর (তীর্থকর)। জৈনগণ ঐ শব্দে আপনাদের ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাত্মাকে নির্দ্দেশ করেন; কিন্তু বৌদ্ধগণের নিকট ঐ শব্দ "নাস্তিক্য-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক" অর্থ সূচিত করে। এই একটি মাত্র শব্দের আলোচনায় বুঝিতে পারা যায়, জৈন-ধর্ম্ম কখনই বৌদ্ধধর্ম্মের সন্ততি নহে। যে শব্দ বৌদ্ধগণের নিকট ঘৃণ্য বা যাহার

* Professor Lassen—"Indische Alterthumskunde, IV, P. 763.

অর্থ নিন্দনীয়, সেই শব্দ কি কেহ কখনও আপনার দেবতার উদ্দেশে প্রয়োগ করিতে পারে? কখনই না। তবে কি প্রকারে একই শব্দের এতাদৃশ অর্থ-বিপর্য্যয় সংঘটিত হইল? প্রতিপন্ন হয়, তীর্থঙ্কর শব্দ বহু পূর্ব্ব হইতে ভাষায় প্রচলিত ছিল এবং ঐ শব্দের দ্বারা "ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক", "অবতার" প্রভৃতি অর্থ উপলব্ধি হইত। সেই অর্থের অনুসরণেই জৈনগণ ঐ শব্দটীকে আপনাদের দেবতার সম্বন্ধে পরিগ্রহণ করেন। পরিশেষে বৌদ্ধগণের সহিত যখন জৈনগণের শত্রুতা আরম্ভ হয়, তখন জৈনধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের প্রতি অবজ্ঞার ভাব দেখাইবার জন্য বৌদ্ধগণ ঐ শব্দের কদর্থ প্রচারে ব্রতী হন। এক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রতি অপর ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ঈর্ষাদ্বেষের পরিচয়—কেবল ভারতবর্ষে নহে, পৃথিবীর সকল দেশে সকল সময়ে পরিদৃষ্ট হয়। বৌদ্ধগণ যেমন জৈন-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের নাম বিশেষণে কদর্থের আরোপ করিয়াছিলেন, জৈনগণও সে পক্ষে ত্রুটি করেন নাই। যিনি বুদ্ধ, বৌদ্ধ-শাস্ত্রে তিনি 'মুক্ত' নামে অভিহিত হন। তদনুসারে বুদ্ধদেব অনেক সময়ে 'মুক্ত' সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু ঐ 'মুক্ত' বিশেষণ জৈনদিগের নিকট শব্দার্থমূলক 'ত্যক্ত' অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যাঁহারা জ্ঞান-মার্গের উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত, তাঁহারা জৈনই হউন আর বৌদ্ধই হউন, কখনও কাহারও উপাস্য দেবতার প্রতি বিদ্রূপোক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন না। সুতরাং বিশেষণ-বিশেষের যে ঐরূপ অর্থান্তর ঘটিয়া থাকে, তাহার কারণ অন্য প্রকার মনে করা যাইতে পারে। যাহা হউক, একটু সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাই, এই যে সকল নাম-বিশেষণ, ইহাদের মূল অন্য কিছু আছে। সে মূল—সনাতন হিন্দু-ধর্ম্ম। সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের উপাস্য দেবতার যে সকল নাম-বিশেষণ প্রচলিত ছিল, জৈনগণ ও বৌদ্ধগণ তাহারই অনুসরণ করিয়াছিলেন। পরিশেষে তাঁহাদের বিরোধের ফলে, ঐ সকল শব্দের অর্থ-বিপর্য্যয় ঘটিয়া আসিয়াছে। একই মহান্ মহীরুহের শাখা-প্রশাখা যখন বিভিন্ন দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তখন তাহাদের সম্বন্ধের মধ্যে স্বতঃই এক ব্যবধান আসিয়া উপস্থিত হয়। ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বিশেষের ব্যবধান সম্বন্ধেও সেই ভাব মনে আসিতে পারে।

অন্যান্য বিষয়ে ভ্রান্তি-সম্বন্ধে।

বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে জৈন-ধর্ম্মের উৎপত্তি বিষয়ে যে দ্বিতীয় যুক্তি প্রদর্শিত হয়, তাহা প্রতিমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা ও মন্দির-নির্ম্মাণ প্রভৃতি বিষয়ক। বৌদ্ধগণ বুদ্ধদেবের এবং তাঁহার শিষ্যগণের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণে তাঁহাদের উদ্দেশে মন্দিরাদি উৎসর্গ করিয়া থাকেন। জৈনগণের মধ্যেও এই প্রথা পরিদৃষ্ট হয়। তাই অনেকের বিশ্বাস, জৈন-ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের অনুসরণ। কিন্তু এ তত্ত্ব বিশ্লষণেও সেই একই সত্য আবিষ্কৃত হয়। কি বুদ্ধদেব, কি মহাবীর, কেহই আপনাদের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ [illegible]রিতে উপদেশ প্রদান করেন নাই। তাঁহাদের বাক্যে বা চিন্তায় কখনও তেমন ভাব [illegible]শ পাইয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে কোথা হইতে কি প্রকারে এ [illegible] প্রবর্ত্তনা হইল? ভারতের সনাতন হিন্দুধর্ম্ম—কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তির মিলন-ক্ষেত্র। [illegible] মিলন ভিন্ন যে মুক্তি নাই, সনাতন হিন্দুধর্ম্মের তাহাই প্রধান শিক্ষা। সে শিক্ষার [illegible] সাধিত হয় না,—যদি ভক্তিকে বর্জ্জন করিয়া মানুষ শুধুই জ্ঞানের অনুসরণ করিতে [illegible]! ভক্তি ভারতের অস্থিমজ্জায় শোণিত-প্রবাহরূপে প্রবহমানা। কি জৈন-ধর্ম্ম, কি বৌদ্ধ-

ধর্ম্ম উভয়েই এ ক্ষেত্রে সনাতন হিন্দুধর্ম্মেরই অনুসরণ করিয়াছে বলিতে পারি। আপন ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের বা ইষ্টদেবতার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও তদুদ্দেশ্যে মন্দির উৎসর্গীকরণ প্রভৃতি প্রথা নিশ্চয়ই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম হইতে অন্যান্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছেন। ফলতঃ, দ্বিতীয় যুক্তির মূলেও হিন্দুধর্ম্মেরই প্রাধান্য পরিকীর্ত্তিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের ও জৈন-ধর্ম্মের মধ্যে তৃতীয় সাদৃশ্য—পৃথিবীর সৃষ্টিকাল সম্বন্ধে। বৌদ্ধগণের গ্রন্থে যেমন কোটী কোটী বৎসর পূর্ব্বে বহু বহু বুদ্ধের অবতার গ্রহণের উল্লেখ আছে, জৈনদিগের গ্রন্থেও সেইরূপ কোটী কোটী বৎসর পূর্ব্বে বহু বহু জৈন-তীর্থঙ্করের আবির্ভাবের বিষয় বিঘোষিত হয়। * ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মে যুগ-বিবর্ত্তনের, কাল-পরিমাণের ও অবতারগণের আবির্ভাবের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ দেখি, বৌদ্ধ ও জৈন-গ্রন্থাদির কাল-বিবরণ তাহার অনুসরণ ভিন্ন অন্য কোনরূপ মনে হয় না। জৈনগণের মধ্যে উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণী কাল বিভাগ এবং তদন্তর্গত ষড়বিধ 'আড়া' বা উপবিভাগ আছে। বৌদ্ধগণের মধ্যেও সেইরূপ চারিটি প্রধান এবং আশীটি অপ্রধান ক্ষুদ্র কল্পবিভাগ দৃষ্ট হয়। পর্য্যায়ক্রমে বিশ্বের উৎপত্তি ও লয়, নাটকের অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগের ন্যায়, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবর্ত্তিত আছে বুঝিতে পারি। কিন্তু কাল-বিভাগের এ সাদৃশ্যে কি জৈন, কি বৌদ্ধ কোনও সম্প্রদায়েরই মৌলিকত্ব সূচিত হয় নাই। কেন-না, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের যুগ ও কল্প বহু পূর্ব্ব হইতেই আদর্শ-ক্ষেত্রে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া মিঃ জ্যাকোবি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—'ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের যুগ-বিভাগ প্রভৃতির আদর্শে বৌদ্ধগণের কাল-বিভাগ এবং ব্রহ্মার দিবা ও রাত্রির আদর্শে জৈনগণের উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণী কালের পরিকল্পনা।' † বৌদ্ধ-ধর্ম্ম হইতে জৈন-ধর্ম্মের উৎপত্তি-সংক্রান্ত চতুর্থ যুক্তি অহিংসা-মূলক। বৌদ্ধগণ 'অহিংসা পরম-ধর্ম্ম' নীতি সর্ব্বতোভাবে মান্য করিয়া থাকেন। জৈনগণ অহিংসা-ধর্ম্মকে বৌদ্ধগণের অপেক্ষাও যত্নের সহিত পালন করিয়া চলেন। অহিংসা-ধর্ম্ম-পালনে বৌদ্ধগণ অপেক্ষাও জৈনগণের দৃঢ়তা দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহা হইলেও জৈনগণ যে বৌদ্ধগণের নিকট হইতে অহিংসা ধর্ম্ম-নীতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা কখনই বলিতে পারা যায় না। কেন-না, আমরা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি, সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মে এ শিক্ষা আবাহমান্‌কাল প্রচলিত আছে। "মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ"—যজুর্ব্বেদের এই উক্তি এবং বৌধায়ন সূত্রের নীতি যে জৈনধর্ম্মের ও বৌদ্ধধর্ম্মের মূল, তাহা নানারূপেই প্রতিপন্ন হয়। যাহা হউক, বৌদ্ধগণের মধ্যে এবং জৈন-গণের মধ্যে অহিংসা-ধর্ম্ম কি ভাবে প্রচলিত আছে এবং সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের সহিত উহা কিরূপ সম্বন্ধ-সম্পন্ন, তাহা একটু আলোচনা করিলেই বিষয়টী বোধগম্য হইবে। বৌদ্ধ-গণের দশশীল, অষ্টাঙ্গশীল বা পঞ্চশীল প্রভৃতির মধ্যে যে সকল উক্তি দৃষ্ট হয়, জৈনগণের 'মহাব্রত' প্রতিজ্ঞা-পঞ্চকের সহিত

* পৃথিবীর ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড উনত্রিংশ পরিচ্ছেদে জৈন-তীর্থঙ্করগণের ও তাঁহাদের আবির্ভাব-কালের এবং পঞ্চম খণ্ডে ৩৩৬ পৃষ্ঠায় বুদ্ধগণের ও তাঁহাদের আবির্ভাবের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

† Hermann Jacobi writes in his translation of *Gaina Sutras*,—"I am of opinion that the Buddhists have improved on the Brahmanic system of the Yugas, while the Gainas invented their Utsarpini and Avasarpini eras after the model of the day and night of Brahma."

তাহা সম্পূর্ণ সাদৃশ্য-সম্পন্ন। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ প্রতিজ্ঞা করেন,—'(১) প্রাণিহত্যা করিব না, (২) চুরি করিব না, (৩) অপবিত্রতা পরিহার করিব, (৪) মিথ্যা কহিব না, (৫) ধর্ম্মোন্নতির হানিকর মাদকদ্রব্য ভক্ষণ করিব না, (৬) অনির্দ্দিষ্ট সময়ে আহার করিব না, (৭) নৃত্য-গীত-বাদ্য বা অভিনয়ে বিরত থাকিব, (৮) মাল্য গন্ধদ্রব্য অলঙ্কার প্রভৃতি ব্যবহার করিব না, (৯) উচ্চ কিংবা প্রশস্ত শয্যায় শয়ন করিব না, (১০) কাহারও নিকট স্বর্ণ বা রৌপ্য গ্রহণ করিব না।' অষ্টাঙ্গশীল এই দশশীলেরই অনুরূপ; অপিচ, উহার প্রথম পাঁচটী পঞ্চশীল অভিধায়ে অভিহিত হয় এবং ঐ নিয়ম প্রত্যেক বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতিপাল্য। অষ্টাঙ্গশীলের শেষোক্ত তিনটী বিধি কেবল ধার্ম্মিক বৌদ্ধগণের প্রতি প্রযুক্ত হয়। অষ্টাঙ্গশীল এই;—'(১) কেহ প্রাণিহত্যা করিবে না, (২) কেহ অদত্ত গ্রহণ করিবে না, (৩) কেহ মিথ্যা কথা কহিবে না, (৪) কেহ মাদকদ্রব্য পান করিবে না, (৫) কেহ অগম্য গমন করিবে না, (৬) কেহ রাত্রিতে অসিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ করিবে না, (৭) কেহ মাল্য ধারণ বা গন্ধ ব্যবহার করিবে না, (৮) সকলকে মৃত্তিকায় মাদুর পাতিয়া শয়ন করিতে হইবে।' বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণকে যে পাঁচটী প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে হয়, জৈন নির্গ্রন্থগণেরও সেইরূপ প্রতিজ্ঞার বিধি দৃষ্ট হয়। জৈনগণের পঞ্চ প্রতিজ্ঞা;—'(১) অহিংসা অর্থাৎ প্রাণিহত্যা না করা, (২) অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা কথা না বলা, (৩) অস্তেয় অর্থাৎ অদত্ত গ্রহণ না করা, (৪) ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযম, (৫) অপরিগ্রহ অর্থাৎ সাংসারিক সকল পদার্থে নিস্পৃহা।' পুনঃপুনঃ নানা আকারে নানা ভাবে এই একই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে দেখিতে পাই। যাহা হউক, বৌদ্ধগণের ও জৈনগণের এবম্বিধ প্রতিজ্ঞা-বিষয়ে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞা-পঞ্চকের অন্তর্গত পঞ্চম প্রতিজ্ঞাটী সামান্য পার্থক্য-বিশিষ্ট হইলেও, প্রথম চারিটী প্রতিজ্ঞার সহিত উভয় ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। প্রতিজ্ঞা কয়টীর পর্য্যায়-সম্বন্ধে মতান্তর থাকিলেও, মূলতঃ কোনও পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। বৌদ্ধগণের প্রথম হইতে চতুর্থ প্রতিজ্ঞার মধ্যে যে ভাব পরিব্যক্ত, জৈনগণের প্রথম প্রতিজ্ঞা-চতুষ্টয়ে সেই ভাবই অভিব্যক্ত; পার্থক্যের মধ্যে প্রথমটী দ্বিতীয় স্থান অথবা দ্বিতীয়টী তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। পঞ্চম প্রতিজ্ঞাটী জৈন-শাস্ত্রে একটু অধিক ভাবমূলক; পার্থক্য এইটুকু মাত্র। নচেৎ, সাদৃশ্য প্রায় পোনের আনা। এই সাদৃশ্য দেখিয়াই এক ধর্ম্মমত অন্য ধর্ম্মমত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া সাধারণতঃ সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে। তবে কোন্ সম্প্রদায় যে কাহার নিকট ঋণী, তাহাই বিশেষভাবে বিবেচনার বিষয়। একটু অনুসন্ধান করিলেই এ সম্বন্ধে নূতন আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ বিষয়ে নিরপেক্ষ পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের গবেষণার আলোচনা করিয়া দেখিতে পারি। * তাহাতে বেশ উপলব্ধি হয়,—কি বৌদ্ধ, কি জৈন, কোনও

* জৈন-সূত্রের ইংরাজী অনুবাদক হারমান্ জ্যাকোবি ঠিক এই কথাই লিখিয়া গিয়াছেন। যথা,—"It can be shown, however, that neither the Bhuddhists nor the Gainas have in this regard any claim to originality, but that both have only adopted the five vows of the Brahmanic ascetics. (Sannyasin)"—Introduction to *Gaina Sutras* by Harmann Jacobi.

সম্প্রদায়ই এই বিষয়ে মৌলিকত্বের দাবী করিতে পারেন না; পরন্তু তাঁহাদের পঞ্চশীল পঞ্চ-প্রতিজ্ঞা বা পঞ্চ-মহাব্রত ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মানুসারী সন্ন্যাসিগণেরই প্রতিপাল্য বিধি-বিধানের অনুবর্ত্তী। বৌধায়ন-সূত্রে (বৌধায়ন গৃহ্য সূত্র) সন্ন্যাসিগণের সম্বন্ধে অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। তদনুসারে সন্ন্যাসিগণকে দশটী প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে হয়। তাহার মধ্যে পাঁচটী প্রতিজ্ঞা প্রধান, আর পাঁচটী অপ্রধান বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। প্রথম প্রতিজ্ঞা পঞ্চক,—'(১) জীবিত প্রাণী মাত্রকে কষ্টদানে বিরতি, (২) সত্য-বাক্, (৩) অন্যের সম্পত্তি গ্রহণে বিরতি, (৪) মাদক-দ্রব্য গ্রহণে বিরতি, (৫) দান।' অপ্রধান পাঁচটী প্রতিজ্ঞা,—'(৬) ক্রোধ পরিহার, (৭) গুরুর আজ্ঞানুবর্ত্তিতা, (৮) ঔদ্ধত্য পরিহার, (৯) পরিচ্ছন্নতা, (১০) পবিত্র আহার।' হিন্দু-সন্ন্যাসিগণের প্রতিজ্ঞার প্রথম চারিটী প্রতিজ্ঞার সহিত জৈন-নিগ্রন্থগণের প্রথম প্রতিজ্ঞা-চতুষ্টয়ের সম্পূর্ণ ঐক্য দৃষ্ট হয়। বৌধায়ন গৃহ্য সূত্রে যে পর্য্যায়ে প্রতিজ্ঞা-চতুষ্টয় সজ্জীকৃত, জৈন-শাস্ত্রেও উহারা সেই পর্য্যায়ে সেইভাবে অবস্থিত। ইহাতে মনে হয়, জৈন ভিক্ষুগণের প্রতিজ্ঞা, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের সন্ন্যাসিগণের প্রতিজ্ঞার অনুসরণ ভিন্ন অন্যরূপ নহে। এ প্রসঙ্গে আরও মনে হয়, বৌদ্ধগণই আদি ধর্ম্ম-শাস্ত্র হইতে পর্য্যায়ের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন। এইখানে একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। পঞ্চম প্রতিজ্ঞাটী—(মহাব্রত) হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ত্রিবিধ ধর্ম্মে কেন ত্রিবিধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল? ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পঞ্চম মহাব্রত,—দান। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মানুসারী জন-সাধারণের সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণকালে দাতৃত্ব দানশক্তি প্রদর্শনের অবসর উপস্থিত হইত। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ যখন সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিতেন, তখন তাঁহাদের দানের অবসর আসিত। কিন্তু বৌদ্ধ বা জৈন ভিক্ষুগণের জীবন-গতি স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে পরিচালিত। সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-আশ্রমে বহির্গত হইলে তাঁহারা কচিৎ দানশীলতা প্রকাশের অবসর পাইতেন। সুতরাং বৌধায়ন্-কথিত পঞ্চম মহাব্রত তাঁহাদের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। জৈনতীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী প্রথমে চতুর্ব্বিধ মহাব্রত প্রতিপালনের ব্যবস্থাই বিহিত করিয়াছিলেন। পঞ্চম মহাব্রত শেষকালে রূপান্তরে প্রবর্ত্তিত হয়। তাঁহার মতে পঞ্চম মহাব্রত অপরিগ্রহ অর্থাৎ দ্রব্য-ক্ষেত্র-কাল-ভাব-রূপ সকল বিষয়ের মোহ পরিত্যাগ। এ ভাবের মধ্যে অনেক মহান্ উপদেশ গ্রথিত আছে। জ্ঞানবান্ হইয়া যখন শরীরের প্রতি পর্য্যন্ত মমত্ব পরিহার করিতে সামর্থ্য জন্মে, তখনই অপরিগ্রহ সার্থক হয়। যাহা হউক, ঐ অবস্থার মধ্যে অনেকগুলি ভাবকে আশ্রয়দান করিয়া জৈনগণ বৌধায়ন্-কথিত পঞ্চম মহাব্রতের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধগণের মধ্যেও সেই ভাবই দেখিতে পাই।

ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মানুসারী—সন্ন্যাসিগণের আদর্শে জৈন ও বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের জীবন-গতি নির্ণীত হইয়াছিল,—এ সিদ্ধান্ত কেবল আমাদের নহে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের যিনিই নিরপেক্ষ-ভাবে এ সকল বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, তিনিই এই মত মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। বৌধায়ন-সূত্রে ও গৌতম-সূত্রে সন্ন্যাসিগণের সম্বন্ধে সে সকল বিধি-বিধান নিহিত আছে দেখিতে পাই, তাহা প্রায় বর্ণে বর্ণে জৈনগণের প্রতিপাল্য বিধি-বিধানের অন্তর্ভূত হইয়া রহিয়াছে। জ্যাকোবি—পঞ্চবিংশতি

দ্বিবিধ সাদৃশ্য-তত্ত্ব।

প্রতিপাল্য বিধি-বিধানের অবতারণার বিষয়টী বিশদ্‌ভাবে বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। পুর্ব্বোক্ত প্রধান ও অপ্রধান প্রতিজ্ঞা-দশকের পর সন্ন্যাসিগণের প্রতিপাল্য কতকগুলি বিধি-বিধান কি ভাবে জৈন-ভিক্ষুক কর্তৃক প্রতিপালিত হয়, তাহার কয়েকটী উদাহরণ নিম্নে প্রকটন করা যাইতেছে,—

(১) 'সন্ন্যাসীর কোনরূপ সঞ্চিত ভাণ্ডার থাকিবে না।' গৌতমসূত্রে এবং বৌধায়ন্ সূত্রে এই নিয়ম বিধিবদ্ধ আছে। অথচ, জৈন ও বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের পক্ষে এই নিয়ম সর্ব্বথা প্রতিপাল্য। ঐ উভয় সম্প্রদায়ের ভিক্ষুগণকেই পরদ্রব্য গ্রহণে ও সঞ্চয়ে বিরত থাকিতে হইবে। জৈনগণের পঞ্চম্ মহাব্রত 'অপরিগ্রহের' অভ্যন্তরে এই ভাবই নিহিত রহিয়াছে। জৈন ভিক্ষুগণ যে আপনাদের পরিধেয় বস্ত্র, ভিক্ষাপাত্র এবং যষ্টি প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া পরিভ্রমণ করেন; জৈন-শাস্ত্রমতে, তৎসমুদায় তাঁহাদের নিজস্ব নহে; পরন্তু সে সকল তাঁহাদের 'ধর্ম্মোপকরণ' মধ্যে পরিগণিত।

(২) 'সন্ন্যাসীর ব্রহ্মচর্য্য আবশ্যক।' বৌধায়নের এবং জৈন-শাস্ত্রের মতে সন্ন্যাসিগণের পক্ষে ইহা চতুর্থ ব্রত বা প্রতিজ্ঞা হওয়া আবশ্যক। বৌদ্ধগণ ইহাকে ভিক্ষুগণের পঞ্চম্ প্রতিজ্ঞার অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া লইয়াছেন।

(৩) 'সন্ন্যাসিগণ কখনও বর্ষাকালে আশ্রম পরিবর্ত্তন করিবেন না।' বৌধায়ন্ সূত্রে সন্ন্যাসিগণ সম্বন্ধে এইরূপ বিধি আছে। বৌদ্ধগণের এবং জৈনদিগের মধ্যে বর্ষা-বাস প্রথা ইহারই অনুসরণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়।

(৪) 'ভিক্ষা ভিন্ন অন্য কারণে সন্ন্যাসিগণ কখনও গ্রামাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবেন না।' জৈনশাস্ত্র এ পক্ষে বিশেষ প্রতিবাদী নহে। তদনুসারে, ভিক্ষুগণ একরাত্রি কোনও গ্রামে বা নগরে বসবাস করিতে পারেন। তবে কোথাও অধিক দিন কাহারও অবস্থিতির বিধি নাই। মহাবীর স্বামী—গ্রামে এক রাত্রি এবং নগরে পাঁচ রাত্রির অধিক কখনও অবস্থিতি করেন নাই।

(৫) 'অপরাহ্নে (অর্থাৎ লোকের আহারাদি সম্পন্ন হইলে (সন্ন্যাসীকে ভিক্ষার্থ বাহির হইতে হইবে; দুই বার ভিক্ষায় বাহির হওয়া নিষেধ।' জৈনভিক্ষুগণ প্রাতে বা মধ্যাহ্নে ভিক্ষা সংগ্রহ করেন। সম্ভবতঃ প্রতিযোগী ভিক্ষুকগণের সঙ্গ পরিহার করাই তাঁহাদের লক্ষ্য। সাধারণতঃ তাঁহারা একবার মাত্র ভিক্ষা করেন। উপবাসের পর কচিৎ দুই বার ভিক্ষার বিধি দৃষ্ট হয়।

(৬) 'সর্ব্বপ্রকার (সুখাদ্যের) আকাঙ্ক্ষা পরিহার।' জৈনগণের পঞ্চম মহাব্রতের চতুর্থ অংশে ঐ একই ভাব পরিব্যক্ত। ভিক্ষা-গ্রহণ ও পরিবর্জ্জন বিষয়ে যে সকল বিধি-বিধান আছে, তাহাতেও আহার্য্যের লোভ পরিহারের বিষয় অবগত হওয়া যায়।

(৭) 'সন্ন্যাসীর বাক্য, দৃষ্টি ও কার্য্য সংযত হওয়া আবশ্যক।' জৈনগণের মধ্যে ত্রিবিধ গুপ্তির বিষয় প্রবর্ত্তিত আছে। মন, বাক্য ও দেহ সংযত করাই সেই ত্রিগুপ্তি।

(৮) 'সন্ন্যাসী লজ্জা নিবারণের জন্য বস্ত্র পরিধান করিবেন।' পরিচ্ছদ ব্যবহার সম্বন্ধে জৈনগণের বিধি এতাদৃশ সরল নহে। কেন-না, জৈন ভিক্ষুগণ উলঙ্গ অবস্থায় বিচরণ

করিতে অথবা একাধিক পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে পারেন। তবে যুবক ও দৃঢ়কায় জৈন ভিক্ষুর পক্ষে এক বস্ত্র ব্যবহার করাই বিধি। মহাবীর স্বামী প্রায়ই উলঙ্গ অবস্থায় পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। জিনকল্পিকগণ অর্থাৎ যাঁহারা মহাবীর স্বামীর অনুসরণকারী ছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই যথাসম্ভব মহাবীর স্বামীর অনুকরণ করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, তাঁহাদের সকলেরই পক্ষে উলঙ্গদেহ আবৃত করা বিধি ছিল।

(৯) 'কোনও কোনও মতে, পুরাতন বস্ত্র ধৌত করিয়া পরিধানের বিধি আছে।' বৌধায়ন বলেন,—সন্ন্যাসিগণ হরিতাভ রক্তবস্ত্র (গৈরিক বসন) পরিধান করিবেন। এ বিষয়ে জৈনগণের অপেক্ষা বৌদ্ধগণের বস্ত্র-ব্যবহারে অধিক সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। জৈনগণ বস্ত্র ধৌত বা রঞ্জিত করার বিরোধী। যে অবস্থায় বস্ত্র প্রাপ্ত হন, জৈন ভিক্ষুগণ সেই অবস্থায়ই তাহা পরিধান করেন। ইহাতে মনে হয়, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের বিধি-বিধানের উপরেও তাঁহারা কঠোরতা রক্ষার চেষ্টা পাইয়াছেন। সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ জাঁকজমক-পরিশূন্য হইবে; ইহারই চরম চিত্র দেখাইতে গিয়া তাঁহারা অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ ব্যবহারের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধগণের কঠোরতা এ সম্বন্ধে কিছু শিথিল দেখিতে পাই।

(১০) 'যাহা অপনা-আপনি বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তদ্ভিন্ন বৃক্ষ-লতাদি ছিন্ন করিয়া সন্ন্যাসিগণ তাহার কোনও অংশ ব্যবহার করিতে পারিবেন না।' জৈনগণের সম্বন্ধেও এইরূপ বিধি বলবৎ দেখি; পরন্তু, যে সকল শাক্-সবজীতে বা ফল প্রভৃতিতে জীবনী-শক্তির কোনও চিহ্ন নাই, কেবল সেই সকল ফল ও শাক্সবজী প্রভৃতি জৈনগণ আহার করিতে অধিকারী।

(১১) 'কাল অতীত হইলে সন্ন্যাসিগণ কোনও গ্রামে দ্বিতীয় রাত্রি বাস করিতে পারিবেন না।' মহাবীর স্বামী এবং প্রায় সকল জৈন-ভিক্ষুগণই এই নিয়মের অনুবর্ত্তী ছিলেন।

(১২) 'সন্ন্যাসিগণ মস্তক-মুণ্ডন করিতে বা মস্তকে জটা রক্ষা করিতে পারিবেন।' জৈনগণ এ নিয়মের উৎকর্ষ-সাধনে ভিক্ষুমাত্রকেই মস্তক মুণ্ডনে বাধ্য করিয়াছিলেন। বৌধায়ন সূত্র মতে, সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণকালে ব্রাহ্মণমাত্রেরই মস্তকের কেশ, শ্মশ্রু, গুম্ফ এবং হস্তপদের নখাদি কর্ত্তন করা আবশ্যক। ভিক্ষুত্ব গ্রহণ কালে জৈনগণের মধ্যেও ঐ প্রথা দেখিতে পাই। জৈনগণের মধ্যে একটী প্রবাদ-বাক্য আছে,—মস্তক-মুণ্ডন, গৃহত্যাগ, নিরাশ্রয়ে বাস, জৈন-ভিক্ষুর লক্ষণ।

(১৩) 'যাহাতে কোনও বীজ ধ্বংস হয়, সন্ন্যাসিগণ কখনও এরূপ কার্য্য করিবেন না।' এ পক্ষে জৈন ভিক্ষুগণের বিশেষ সতর্কতা দৃষ্ট হয়। ডিম্ব অথবা কোনও প্রাণী অথবা বীজ বা অঙ্কুর প্রভৃতি কোনরূপে নষ্ট না হয়, আচারাঙ্গ সূত্রের দ্বিতীয় খণ্ডে তৎসম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ আছে। হিন্দু সন্ন্যাসিগণের প্রতিপাল্য বীজরক্ষাবিষয়ক বিধির প্রবর্ত্তনায় বুঝা যায়, জৈনগণ সর্ব্বপ্রকার ক্ষুদ্র প্রাণীর প্রতি এবং উদ্ভিদ্-রাজ্যের প্রতি বিশেষরূপ কারুণ্য-দৃষ্টি সম্পন্ন হন।

(১৪) 'অপকারী বা উপকারী সর্ব্বপ্রকার প্রাণীর প্রতিই সন্ন্যাসিগণ নির্লিপ্ততায় প্রকাশ করিবেন।'

(১৫) 'আপনার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য সন্ন্যাসিগণ কোনও কার্য্য করিবেন না।' হিন্দু সন্ন্যাসিগণের প্রতিপাল্য শেষোক্ত দুই বিধি জৈনধর্ম্মের প্রাণস্থানীয়। জৈনধর্ম্মশাস্ত্রে এ বিষয়ে বিশেষ উপদেশ পরিদৃষ্ট হয়। মহাবীর স্বামী ঐ দুই বিধি সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনবৃত্তালোচনায় দেখিতে পাই, এক সময়ে চারি মাসের অধিক কাল তাঁহার গাত্রে নানা-জাতীয় প্রাণী পুঞ্জীকৃত হইয়া ছিল, কীট সকল তাঁহার দেহের উপর গতিবিধি করিয়াছিল এবং তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। আর এক সময়ে তৃণ, শৈত্য, অগ্নি প্রভৃতিতে এবং মাছি মশা প্রভৃতির দংশনজনিত যন্ত্রণায় তাঁহাকে কষ্ট দিয়াছিল। আর এক সময়ে দৈবশক্তির অধীন হইয়া মনুষ্যের এবং প্রাণীর নিকট তাঁহাকে নানাপ্রকার সুখকর ও দুঃখকর ঘটনার আবর্ত্তে নিপতিত হইতে হইয়াছিল। মহাবীর স্বামী সম্বন্ধে আরও কথিত আছে, তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতির শেষ সময়ে তিনি কি জীবন কি মৃত্যু কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। সুতরাং হিন্দু-সন্ন্যাসিগণের প্রতিপাল্য বিধি-বিধান জৈন-ভিক্ষুগণের নিকট যে বিশেষভাবে আদরণীয় হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

অন্যান্য সাদৃশ্য।

ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের ও জৈন-ধর্ম্মের বিধি-বিধানের মধ্যে আরও বিবিধ বিষয়ে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। সন্ন্যাসিগণের পক্ষে বৌধায়ন সূত্রের বিধি এই যে, বাক্য, চিন্তা এবং কার্য্য—এই ত্রিবিধ দণ্ড প্রয়োগে তাঁহারা কখনও কোনও সৃষ্ট প্রাণীকে কষ্ট প্রদান করিবেন না। বৌদ্ধগণের ও জৈনগণের যে প্রথম প্রতিজ্ঞা (শীল বা ব্রত), এ বিধি তাহা হইতে স্বতন্ত্র কি? দণ্ডপ্রদানের যে উপায়-পরম্পরা, জৈনশাস্ত্র তৎসমুদায়কে 'শস্ত্র' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বৌধায়নসূত্রে বিধি আছে, সন্ন্যাসিগণ স্থান পরিষ্কারের জন্য আর্দ্র-বস্ত্রে জল লইয়া যাইবেন। পুষ্করিণী বা কূপ হইতে কাপড় ভিজাইয়া জল লইয়া তাহা নিঙড়াইয়া স্থান পরিষ্কার করা তাঁহাদের নিয়মের অন্তর্ভূত। জৈন ভিক্ষুগণ সম্পূর্ণরূপে এই নিয়মের অনুবর্ত্তী। তাঁহারাও সিক্ত বস্ত্র নিঙড়াইয়া স্থান পবিত্র করেন। জৈনশাস্ত্রের টীকাকার গোবিন্দ 'পবিত্র' শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে, সিক্ত-বস্ত্রের জলসেচনে ও কুশতৃণের সম্মার্জ্জনী ব্যবহারে জৈন-ভিক্ষুগণ পথের কীট-পতঙ্গাদি অপসারণ করেন। এইভাবে গতাগতির পথ ও আশ্রয় স্থান পরিষ্করণের পদ্ধতি হিন্দু-সন্ন্যাসিগণের মধ্যে পূর্ব্বাপর প্রচলিত আছে। সুতরাং এ বিষয়ে জৈন ভিক্ষুগণকে হিন্দুসন্ন্যাসিগণের অনুসরণকারী বলা যাইতে পারে। হিন্দুসন্ন্যাসিগণের সঙ্গে যে কয়েকটী দ্রব্য সর্ব্বদা রক্ষিত হয়, জৈন-ভিক্ষুগণের মধ্যেও সেই কয়েকটী দ্রব্য সচরাচর দেখিতে পাই। যথা,—যষ্টি, রজ্জু, জল-সংগ্রহের বস্ত্র, জলপাত্র, ভিক্ষাপাত্র। জৈন-ভিক্ষুগণের ন্যায় যষ্টিগ্রহণের বিধি যদিও বৌদ্ধগণের পিটক-গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না, কিন্তু তাঁহাদের ব্যবহারে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকন্তু জল ছাঁকিবার জন্য 'মুখ-বস্ত্রিকা' বস্ত্র ব্যবহারের প্রথা তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। ফলতঃ, সন্ন্যাসিগণের ও ভিক্ষুগণের ব্যবহার্য্য দ্রব্য অভিন্ন। আহার্য্য-গ্রহণ সম্বন্ধে বৌধায়ন-সূত্রের বিধি এই যে,—সন্ন্যাসিগণ অযাচিতভাবে প্রাপ্ত খাদ্য-মাত্র গ্রহণ করিবেন। তাঁহাদের আহার্য্যের বিষয় পূর্ব্বে কোনরূপ স্থির থাকিবে না;

যাহা ঘটনাচক্রে প্রাপ্ত হইবেন, মাত্র জীবনধারণের উপযোগী তদ্রূপ খাদ্য তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারিবেন। জৈন ভিক্ষুগণের ভিক্ষা গ্রহণ বিষয়ে যে সকল বিধি আছে, তাহা ঐ বৌধায়ন সূত্রেরই অনুসারী নহে কি? বলা বাহুল্য, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ আহার গ্রহণ সম্বন্ধে এতাদৃশ কঠোর নিয়মের অধীন নহেন। তাঁহাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিলেই তাঁহারা সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। যাহা হউক, সর্ব্বপ্রকার বিধি-বিধানের ও আচার-ব্যবহারের সাদৃশ্য-তত্ত্ব আলোচনায় বেশ উপলব্ধি হয়,—কি জৈন, কি বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের মূল-সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম। তবে কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন,—জৈনগণের নির্গ্রন্থ সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে কোন্ ভাবে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মানুসারী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের অনুকৃতি? কেহ কেহ এইরূপও সিদ্ধান্ত করেন যে, সন্ন্যাসিগণ হইতে বৌদ্ধভিক্ষুগণের এবং বৌদ্ধভিক্ষুগণ হইতে নির্গ্রন্থগণের আচার-ব্যবহার পরিগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত কদাচ যুক্তিমূলক নহে। জৈন-সম্প্রদায় ও বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয় সর্ব্বজনবিদিত। প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ের অনুসরণ কখনই যুক্তিযুক্ত নহে। তার পর, বৌদ্ধভিক্ষু বা জৈন নির্গ্রন্থের আদর্শ যে হিন্দুসন্ন্যাসিগণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কখনও সম্ভাব্যই নহে। প্রধানতঃ ত্রিবিধ কারণে এ মতের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হয়। প্রথমতঃ, সন্ন্যাস ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের চতুরাশ্রমের অন্তর্ভূত। আশ্রম-ব্যবস্থা যদিও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের আদিভূত বলিয়া কেহ কেহ স্বীকার করিতে না পারেন; কিন্তু ঐ প্রথা বৌদ্ধধর্ম্মের ও জৈন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার যে বহু পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দু-সন্ন্যাসিগণ বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অথচ, বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পরবর্ত্তী কয় শতাব্দী কাল, অন্ততঃ দুই শতাব্দীর কম নহে, বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ ভারতবর্ষে তাদৃশ বিস্তৃতিলাভ করিতে পারেন নাই; মাত্র প্রদেশ-বিশেষে তাঁহাদের গতিবিধি সীমাবদ্ধ ছিল। সুতরাং দেশব্যাপী সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের সৃষ্টি কদাচ তাঁহাদের দ্বারা সাধিত হয় নাই। তৃতীয়তঃ, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তনার বহু পূর্ব্বে হিন্দু-শাস্ত্রকার গৌতমের আবির্ভাব-কাল নির্দ্দিষ্ট হয়। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের অভিমত উল্লেখ করিলেও সংশয় দূরীভূত হইতে পারে। অধ্যাপক বুলার সিদ্ধান্ত করেন যে, অতি আধুনিক বলিয়া মনে করিলেও খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে আপস্তম্ব-সূত্র রচিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। বৌধায়ন—আপস্তম্বেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। বুলারের গণনায় আপস্তম্বের কয় শতাব্দী পূর্ব্বে গৌতম-সূত্রের প্রবর্ত্তনা প্রতিপন্ন হয়। তার পর, গৌতম আবার বৌধায়নেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। অতএব গৌতম এবং খুব সম্ভব বৌধায়ন, বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী কালে বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মাবলম্বী সন্ন্যাসিগণের প্রতিপাল্য বিধিবিধান যখন গৌতম-সূত্রে দৃষ্ট হয়, তখন সন্ন্যাসিগণকে কদাচ ভিক্ষুগণের অনুসরণকারী বলিয়া মনে করা যায় না। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মগ্রন্থে বহু স্থানে বৌদ্ধভিক্ষুগণের অপযশ পরিকীর্ত্তিত আছে। যাহারা নিন্দনীয় হয়, কেহ কি কখনও তাহাদের অনুসরণ করে? অন্যপক্ষে আবার বৌদ্ধগণ ও জৈনগণ উভয় সম্প্রদায়কেই ব্রাহ্মণগণের সম্মান করিতে দেখি। এমন কি, ব্রাহ্মণ শব্দটী পর্য্যন্ত উঁহাদের মধ্যে গৌরববাচক শব্দ মধ্যে পরিগণিত আছে। ব্রাহ্মণ না হইলেও উঁহারা

আপনাদের সম্প্রদায়ভুক্ত জ্ঞানী ও গুণী জনকে 'ব্রাহ্মণ' আখ্যায় অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। যাহাকে সৎ বলিয়া মনে করে, মানুষ তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে। সুতরাং এ যুক্তি-মূলেও জৈনগণ ও বৌদ্ধগণ ব্রাহ্মণগণেরই আদর্শের অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে পারি। *

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম হইতে যে জৈনধর্ম্ম উৎপন্ন হয় নাই, তৎসম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে। শেষ জৈনতীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী 'ঞাতপুত্ত' নামে অভিহিত হন, এবং জৈনসন্ন্যাসিগণ নিগ্রর্ন্থ নামে পরিচিত হইয়া থাকেন। কিন্তু বৌদ্ধদিগের প্রাচীনতম ধর্ম্মগ্রন্থে ঞাতপুত্তের এবং নিগ্রর্ন্থ সম্প্রদায়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বুদ্ধদেবের সমসময়ে নিগ্রর্ন্থগণের বিদ্যমানতার এবং ঞাতপুত্ত কর্তৃক জৈনসম্প্রদায়ের সংস্কার-সাধনের উল্লেখ আছে। ত্রয়োবিংশতি তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মসম্প্রদায় তৎকর্তৃক সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়াও প্রচারিত দেখি। সুতরাং জৈনধর্ম্ম যে বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা বেশ বুঝা যায়। মহাবীর বা বর্দ্ধমান স্বামীর নাম যে ঞাতপুত্ত (জ্ঞাতৃপুত্র) এবং তিনি যে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ছিলেন, আর নিগন্থগণ (নিগ্রর্ন্থগণ) জৈন বা অর্হৎ নামে পরিচিত হইয়া বৌদ্ধসম্প্রদায় গঠনের সমসময়ে যে প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদ্বিষয়ে এবং জৈনগণের আদি মত কি ছিল, সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ সঙ্কলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে মতের কোনরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে কি না, তৎসম্বন্ধে প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থে ও জৈনশাস্ত্রে কি বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক। অঙ্গুত্তরনিকায়ে (তৃতীয়, ৭৪) বৈশালীর লিচ্ছবী-বংশীয় যুবরাজ সুবিদ্বান অভয়ের প্রসঙ্গ আছে। তিনি নিগন্থগণের নীতি-সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন;—'নিগন্থ ঞাতপুত্ত সকলই জানেন এবং সকলই দেখিতে পান। তাঁহার পূর্ণজ্ঞান এবং ধর্ম্মবিশ্বাস আছে বলিয়া তিনি দাবী করেন। তাঁহার উক্তিতে প্রকাশ—কিবা ভ্রমণে, কিবা দণ্ডায়মানে, কিবা নিদ্রায়, কিবা জাগরণে সকল সময়েই তিনি পূর্ণজ্ঞানের এবং পূর্ণ-বিশ্বাসের অধিকারী। তিনি আরও শিক্ষা দেন যে, কঠোর সাধনায় পুরাতন কর্ম্ম লোপ পাইতে পারে এবং নূতন কর্ম্ম নিষ্কর্ম্ম মধ্যে গণ্য হইতে পারে। কর্ম্মের নিবৃত্তি হইলে দুঃখের নিবৃত্তি হয়; দুঃখের নিবৃত্তি হইলে অনুভূতির নিবৃত্তি ঘটে; অনুভূতির নিবৃত্তি ঘটিলে সকল প্রকার দুঃখের অবসান হইয়া আসে। এইরূপে মানুষ সর্ব্বপাপ মুক্ত (নির্জ্জর) অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পরিত্রাণ লাভ করে।' জৈন-শাস্ত্র উত্তরাধ্যয়ন (ত্রিংশ অধ্যয়ন) অনুরূপ বাণী ঘোষণা করেন;—'কৃচ্ছ্র সাধনায় মানুষ কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন করে' (২৭ সূত্র); 'কর্ম্ম পরিত্যাগ দ্বারা মানুষ নৈষ্কর্ম্ম-অবস্থা প্রাপ্ত হয়; নৈষ্কর্ম্ম অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আর কোনও নূতন কর্ম্ম সঞ্জাত হয় না, অধিকন্তু পূর্ব্ব-উপার্জ্জিত কর্ম্মও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।' (৩৭ সূত্র এবং ৭১—৭২ সূত্রে

জৈনধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বে।

---

* প্রফেসর ম্যাক্সমুলার (Professor Maxmuller in his Hibbert-Lectures), প্রফেসর বুলার (Professor Buhler in his Translation of the Boudhayana Sutra) এবং প্রফেসর কার্ন (Professor Kern in his History of Buddhism in India) এবং পরিশেষে হারমান্ জ্যাকোবি (Hermann Jacobi in his Translation of Gaina Sutras) এ বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন।

এই অবস্থার পরিণতির বিষয় বিবৃত আছে। পুনরায় অন্যত্র (দ্বাত্রিংশ অধ্যয়নে, সপ্তম সূত্রে) দেখি,—'কর্ম্মই জন্ম ও মৃত্যুর মূল; জন্ম ও মৃত্যুই দুঃখ!' এই একই ভাবের উক্তি ঐ অধ্যয়নের বহু সূত্রে (৩৪শ, ৪৭শ, ৬০শ, ৭৩শ, ৮৬ম, ৯৯ম প্রভৃতিতে) দৃষ্ট হয়। তৎসমুদায়ের স্থূল মর্ম্ম এই যে,—'ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত পদার্থ-সমূহ হইতে এবং মানসিক সর্ব্বপ্রকার (সুখ-দুঃখের) অনুভূতি হইতে যিনি উদাসীন থাকিতে পারেন; * তিনি সর্ব্বপ্রকার দুঃখ হইতে বিমুক্ত। যদিও তিনি সংসারে অবস্থিতি করেন, তথাপি সংসারের দুঃখ প্রবাহ কখনও তাঁহাকে অভিঘাত করিতে পারে না; জলমধ্যগত হইলেও পদ্মপত্র যেমন আর্দ্রতা পরিশূন্য, তাঁহারও অবস্থা তদ্রূপ।' জৈন-শাস্ত্রের উক্তি,—'জ্ঞাতপুত্ত' পূর্ণজ্ঞানসম্পন্ন ও সম্পূর্ণ ধর্ম্মবিশ্বাসী ছিলেন। এ বিষয়ের অধিক প্রমাণ অনাবশ্যক; কেন-না, জৈনধর্ম্মের উহাই মেরুদণ্ড। নিগ্রন্থগণের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে, 'মহাবগ্‌গ' (ষষ্ঠ, ৩১শ) হইতে আর একটু বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাবগ্‌গে লিখিত আছে,—'লিচ্ছবীদিগের একজন সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার নাম—সিহ। সিহ জ্ঞাতপুত্তের শিষ্য, অথচ বিষয়ী বলিয়া পরিচিত। সিহ এক সময়ে বুদ্ধদেবকে দর্শন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু জ্ঞাতপুত্ত তাহাতে বাধা দেন। তাঁহার বাধা দেওয়ার কারণ এই যে, নিগ্রন্থগণ ক্রিয়াবাদ ও বৌদ্ধগণ অক্রিয়াবাদ মান্য করেন। যাহা হউক, সিহ কিন্তু গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া বুদ্ধদেব সমীপে গমন করেন; আর, তাহার ফলে, তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন।' মহাবগ্‌গের এই আখ্যায়িকায় আমরা যে ক্রিয়াবাদের উল্লেখ দেখি, সত্যই উহা নিগ্রন্থগণের আদরণীয়। সূত্রকৃতাঙ্গে (প্রথম শ্রুতস্কন্ধ, ১২শ অধ্যয়ন, ২১শ সূত্রে) স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে,—যিনি পূর্ণ সন্ন্যাসী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ নিগ্রন্থ, তিনিই ক্রিয়াবাদ ব্যাখ্যার অধিকারী। আচারাঙ্গ সূত্রে (প্রথম শ্রুতস্কন্ধ, ১ম অধ্যয়ন, চতুর্থ সূত্র) ক্রিয়াবাদের মত ব্যাখ্যাত আছে; যথা,—তিনি আত্মায় বিশ্বাসবান, পুরস্কারে বিশ্বাসবান, কর্ম্মে বিশ্বাসবান; আত্মকৃত কর্ম্মের ফল বিশ্বাস করিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করেন,—'আমি ইহা করিয়াছি'; 'আমি ইহা অপরকে করাইয়াছি'; 'আমি ইহা করিতে প্রশ্রয় দিব।' ফলতঃ, নিগ্রন্থগণের যে ক্রিয়াবাদের উল্লেখ মহাবগ্‌গে দৃষ্ট হয়, তাহা যে জৈনশাস্ত্রের মত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। 'মজ্‌ঝিম্‌নিকায়' (৫৬ম) গ্রন্থে উক্তরূপ আর এক ঘটনা দৃষ্ট হয়। উপালী নামে মহাবীরের আর এক শিষ্য (তিনিও বিষয়ী ছিলেন) বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। উপালীর প্রাণে একটা বিষম আন্দোলন উপস্থিত হয়। সে আন্দোলন—কোন্ পাপের গুরুত্ব অধিক? বুদ্ধদেব শিক্ষা দিয়াছেন,—মানসিক পাপেরই গুরুত্ব অধিক; আবার নিগ্রন্থ জ্ঞাতপুত্তের মতে,—দৈহিক পাপেরই গুরুত্ব অধিক। 'কম্ম' (কর্ম্ম) শব্দের পরিবর্ত্তে তাঁহার গুরু 'দণ্ড' শব্দ ব্যবহার করিতেন,—উপালীর উক্তিতে প্রকাশ আছে। সর্ব্বত্র না হইলেও, জৈনসূত্রে 'কম্ম' শব্দ দণ্ড অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে দৃষ্ট হয়। সূত্রকৃতাঙ্গ (দ্বিতীয় শ্রুতস্কন্ধ, ২য় অধ্যয়ন, ৪র্থ সূত্র) ত্রয়োদশবিধ পাপ-কর্ম্মের পরিচয় দিয়াছেন; তাহার প্রথম পাঁচটীর উল্লেখে 'দণ্ড সমাধানে' এবং শেষ কয়টীর উল্লেখে 'কিরিয়াথানে'

* বৌদ্ধদর্শনের 'বেদনা' (অনুভূতি) এই অবস্থার সহিত সাদৃশ্য-সম্পন্ন।

(ক্রিয়াস্থান) শব্দ দৃষ্ট হয়। তৃতীয় সূত্রে প্রাণিগণের 'দণ্ড সমাধান' অর্থাৎ 'পাপোপাদান' কি, তাহারই বিষয় বলা হইতেছে, এইরূপ আভাষ আছে। সুতরাং বৌদ্ধগ্রন্থোক্ত (মজ্ঝিম-নিকায়ে) উপালীর উপাখ্যানে যে 'দণ্ড' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ জৈনশাস্ত্রের অনুসারী। কায়িক, বাচিক, মানসিক—ত্রিবিধ দণ্ডের বিষয় নিগ্রন্থ উপালী উল্লেখ করিয়াছেন। জৈনধর্ম্মশাস্ত্র, স্থানাঙ্গসূত্রে (৩য় উদ্দেশকে) অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। * তার পর, উপালী যে বলিয়াছিলেন—নিগ্রন্থগণ মানসিক পাপ অপেক্ষা কায়িক পাপকে গুরুতর বলিয়া মনে করেন, এতদুক্তিও জৈনশাস্ত্রের সম্পূর্ণ অনুগত। সূত্রকৃতাঙ্গ (২য় শ্রুতস্কন্ধ, ৪র্থ অধ্যয়ন) বিশেষভাবে এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছেন। অজ্ঞানতঃ যে কর্ম্ম কৃত হয়, তাহা পাপজনক কি না,—এই প্রশ্নের মীমাংসায়, জৈনশাস্ত্র দৃঢ়তার সহিত ঐ কর্ম্মকে পাপজনক বলিয়া উত্তর দিয়াছেন (সূত্রকৃতাঙ্গের ২য় শ্রুতস্কন্ধের ৬ষ্ঠ অধ্যয়ন দ্রষ্টব্য)। বৌদ্ধগণ এ বিষয়ে জৈনগণকে উপহাস করিয়াছেন। তাঁহাদের মত এই যে, উদ্দেশ্য লইয়াই পাপের আরোপ হওয়া সঙ্গত। ফলতঃ, বৌদ্ধগ্রন্থে যে জৈন-শাস্ত্রোক্ত মতের আলোচনা আছে, এতদ্দ্বারা তাহা বেশ উপলব্ধি হয়। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্ম-সম্প্রদায় গঠনের পূর্ব্বে জৈনধর্ম্মের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে।

যদিও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম হইতে জৈন-ধর্ম্মের ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উৎপত্তি প্রতিপন্ন হয়, কিন্তু কয়েকটী বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে বেশ একটু পার্থক্যও দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম হইতে ঐ দুই ধর্ম্মের একটী প্রধান পার্থক্য এই যে, ঐ দুই ধর্ম্ম-সম্প্রদায় মূলতঃ যেন ক্ষত্রিয়ের জন্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। বুদ্ধদেব যখন আপন ধর্ম্মমত প্রকাশ করেন, যখন উহা ধনী ও সম্ভ্রান্ত জনগণকে, সাধারণতঃ ক্ষত্রিয়গণকে সম্বোধন করিয়াই প্রতিষ্ঠিত হয়। † বারাণসীতে বুদ্ধদেব যখন ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন, তাঁহার প্রথম উপদেশে শ্রেষ্ঠিপুত্র 'যস' এবং তাঁহার আত্মীয় স্বজন বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কয়েক জন ক্ষত্রিয় নৃপতি এবং ধনী ক্ষত্রিয় প্রথম বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণে বুদ্ধদেবের সহায় হন। প্রথমে পঞ্চব্রাহ্মণ-শিষ্য (কোণ্ডঞ্ঞ প্রভৃতি) প্রাধান্যলাভ করিলেও ধনী ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে তাঁহার মত বিশেষভাবে প্রবর্ত্তিত হয়। তাহাতে ক্ষত্রিয়ের জন্যই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অভ্যুদয় মনে আসে। জৈন-ধর্ম্মেও এই ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য দেখিতে পাই। জৈন-শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণী দেবানন্দার গর্ভ হইতে ভ্রূণ অবস্থায় মহাবীর ক্ষত্রিয়ানী ত্রিশলার গর্ভে সঞ্চালিত হন; ‡ কেন-না, ব্রাহ্মণীর বা কোনও নীচজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে তীর্থঙ্করের উৎপত্তি সম্ভবপর নহে। এবম্বিধ কিম্বদন্তীতে জৈন-ধর্ম্ম যে ক্ষত্রিয়ের

অনৈক্যেও ঐক্য।

---

* Indian Antiquary, IX, page 139.

† প্রফেসার ওলডেনবার্গ (Professor Oldenberg in his Buddha, P. 157, Seq) এই বিষয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

‡ দিগম্বরগণ এই উপাখ্যানকে অসম্ভব বলিয়া ঘোষণা করেন; কিন্তু শ্বেতাম্বরগণ ইহাকে সত্য ঘটনা বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করেন। আচারাঙ্গে ও কল্পসূত্রে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে; সুতরাং এই কিম্বদন্তী অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত আছে, স্বীকার করিতে হয়। জ্যাকোবি এ সম্বন্ধে এক অভিনব মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি

প্রাধান্ত বিস্তার পক্ষে সহায়তা করিয়াছিল, তাহা বেশ মনে হইতে পারে। অন্তপক্ষে আবার দেখিতে পাই, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মানুসারী সন্ন্যাসিগণ অন্য ধর্ম্ম-মতাবলম্বী সন্ন্যাসিগণকে সমান সম্মানের চক্ষে দেখিতেন না। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণের পক্ষে চতুরাশ্রম গ্রহণের নিষেধ প্রভৃতি বিধি-বিধান দৃষ্টেও এ কথা মনে করা যাইতে পারে। শাস্ত্রগ্রন্থ অনুসন্ধানে উপলব্ধি হয়, পরবর্ত্তিকালে ব্রাহ্মণের চতুরাশ্রম, ক্ষত্রিয়ের ত্রিবিধ আশ্রম, বৈশ্যের দ্বিবিধ এবং শূদ্রের একবিধ আশ্রম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এই সকল ব্যবস্থায় বেশ বুঝা যায়, অতি প্রাচীনকাল হইতেই ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসিগণের সহিত অন্য বর্ণের সন্ন্যাসিগণের একটা পার্থক্য রক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। ব্রাহ্মণেতর বর্ণের সন্ন্যাস-গ্রহণের ফলে, স্বতঃই স্তর-বিভাগ সঙ্ঘটিত হয়। তদনুসারে ক্রমেই অবরোহণের ভাব প্রকাশ পায়। সন্ন্যাসী নামে ভণ্ড-সন্ন্যাসিদলের সৃষ্টি হয়। বশিষ্ঠ সেই বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তখন সন্ন্যাসোচিত ক্রিয়াকর্ম্ম আচার-ব্যবহার লোপ প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, এবং বেদোচ্চারণে পর্য্যন্ত তাহারা বিরত হইয়াছিল। বশিষ্ঠ বলেন,—'সন্ন্যাসী যাগ-যজ্ঞ পরিত্যাগ করিলেও করিতে পারেন; কিন্তু বেদোচ্চারণে বিরত হইতে পারেন না। বেদ পরিত্যাগে শূদ্র হইতে হয়; সুতরাং বেদ পরিত্যাগ কখনই কর্ত্তব্য নহে।' বশিষ্ঠের এবম্বিধ উক্তিতে বুঝা যায়, পূর্ব্ব হইতেই সন্ন্যাসিগণের মধ্যে ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। সন্ন্যাস-আশ্রমে বেদোচ্চারণ পরিত্যাগ প্রভৃতি হেতু ঐ সময়ে যে এক বিপরীত শক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা বেশ মনে হয়। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের অনুসারী নহে—এবম্বিধ সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় জৈন-বৌদ্ধাদি সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসিগণের বীজস্থানীয় বলা যাইতে পারে। অতএব জৈন ধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম সহসা উদ্ভূত হইয়াছিল মনে না করিয়া ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রতিক্রিয়ার ফলে উহারা উৎপন্ন হইয়াছে সিদ্ধান্ত হয়। এইরূপে স্বতঃ-উৎপন্ন হওয়া ভিন্ন জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের একটী যে অপরটি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা মনে করা যায় না। কেন-না, ঐ দুই ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রধান শিক্ষা যাহা, তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্নভাবদ্যোতক। বুদ্ধদেব যে নির্ব্বাণ অবস্থার বিষয় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, জৈনমত তাহার সহিত সাদৃশ্য-সম্পন্ন নহে। বুদ্ধের নির্ব্বাণ অস্তি-নাস্তি ভাবমূলক। উহা সম্পূর্ণ অবিদ্যমানতা অথবা ধ্যান-ধারণার অতীত বিদ্যমানতা। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের আত্মবাদতত্ত্ব, নির্ব্বাণের ঐরূপ ব্যাখ্যায় উপেক্ষিত হয়। আত্মা—অক্ষয় অনন্ত অবিমিশ্র; কি অদ্বৈতবাদে, কি বৈশেষিক মতে, আত্মার এই স্বরূপ নির্দ্ধারিত হয়। বুদ্ধ-কথিত নির্ব্বাণে কিন্তু আত্মার স্বরূপ-তত্ত্ব এ ভাবে ব্যক্ত নহে। অথচ, জৈনগণ ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের এই আত্মবাদ-তত্ত্বে সম্পূর্ণরূপ একমতাবলম্বী। তবে, জৈনগণের

বলেন.—সিদ্ধার্থের (মহাবীরের পিতা) দুই পত্নী ছিল; ব্রাহ্মণী দেবানন্দা এবং ক্ষত্রিয়ানী ত্রিশলা। দেবানন্দাই প্রকৃতপক্ষে মহাবীরের জননী; ত্রিশলা বিমাতা। ক্ষত্রিয়ানীর প্রাধান্য রক্ষার জন্য মহাবীরকে ত্রিশলার গর্ভ-সম্ভূত বলিয়া ঘোষণা করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধেও ঐরূপ এক পৌরাণিক আখ্যান আছে। দেবকীর ভ্রূণ রোহিণীর গর্ভে সঞ্চালিত হইয়াছিল, এইরূপ প্রবাদ। জৈন-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তনার প্রথম শতাব্দীতে উহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা প্রচলিত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। দ্বাবিংশতি জৈন-তীর্থঙ্কর ও অরিষ্টনেমির জীবনবৃত্ত শ্রীকৃষ্ণের আদর্শে পরিকল্পিত সপ্রমাণ হয়।

মতের সহিত ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের সাঙ্খ্য, স্থায়, বৈশেষিক মতের যে একটু সামান্য পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহা এই ;—শেষোক্ত মতে আত্মা বিশ্বের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে বিদ্যমান; কিন্তু জৈনমতে আত্মা সীমাবদ্ধ। অন্য পক্ষে আবার বৌদ্ধদিগের শাস্ত্রে যে পঞ্চস্কন্ধ ও তাহার উপবিভাগসমূহ দৃষ্ট হয়, জৈন-মনোবিজ্ঞানে তাহার প্রতিরূপ নাই। জৈনদিগের একটি প্রধান মত—যে মত তাঁহাদের দর্শন-শাস্ত্রে ও নীতি-শাস্ত্রে বিশেষরূপে বিঘোষিত—বিশ্ব জীবময়; কেবল জীব-জন্তুতে ও উদ্ভিদে বলিয়া নহে, ভূত-সমূহের অতিক্ষুদ্র পরমাণুতে—মৃত্তিকায়, অনলে, অনিলে, সলিলে—জীবন সর্ব্বত্র। এই জীব-বাদ বৌদ্ধ-দর্শনের কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। ভারতীয় দার্শনিকগণের গবেষণা সর্ব্বজ্ঞতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। যে সম্প্রদায় যে ভাবেই শ্রেয়ঃপ্রার্থী হউন না কেন, জ্ঞানান্বেষণেই সকলের চিন্তা প্রধাবমানা। জৈন-দর্শনও জ্ঞানকেই সার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন বটে; তবে হিন্দু-দর্শনের ও বৌদ্ধ-দর্শনের অবলম্বিত পন্থা হইতে তাঁহাদের অবলম্বিত পন্থার একটু স্বাতন্ত্র্য দৃষ্ট হয়। তাঁহাদের পরিভাষাই আর একরূপ। জৈন দর্শন মতে—সত্যজ্ঞান পঞ্চবিধ; (১) মতি অর্থাৎ সত্য অনুভব, (২) শ্রুত অর্থাৎ নির্ম্মল-জ্ঞান—যে জ্ঞান মতির ভিত্তির উপর সম্প্রাপ্ত, (৩) অবধি অর্থাৎ একপ্রকার লোকাতীত জ্ঞান, (৪) মনঃপর্য্যায় অর্থাৎ অপরের চিন্তা সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান, (৫) কেবল অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান—সর্ব্বজ্ঞতা যাহার অন্তর্ভুক্ত। জৈন মনোবিজ্ঞানের ইহাই প্রধান অঙ্গ। ইহার সাদৃশ্য বৌদ্ধ-দর্শনে মিলিবে না। এইরূপ পার্থক্য আরও বিবিধ বিষয়ে পরিদৃষ্ট হয়। আবার, সাদৃশ্যও অনেক বিষয়ে দেখিতে পাই। আত্মার দেহান্তর-গ্রহণ, কর্ম্মবাদ অর্থাৎ কর্ম্মগুণে সুখ-দুঃখ ভোগ প্রভৃতি বিষয়ে জৈনগণ ও বৌদ্ধগণ উভয়েই ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের মতাবলম্বী। কাল-বিষয়ে, অবতার-সংখ্যা বিষয়ে এবং অন্যান্য বিবিধ বিষয়ে সাদৃশ্যের আভাষ পূর্ব্বেই আমরা প্রকাশ করিয়াছি। সংসারে নূতন যে কিছু উদ্ভূত হইতেছে, তাহা প্রতিপন্ন হয় না। যাহা সত্য, তাহা চিরদিনই সমভাবে বিদ্যমান আছে। শশধর মেঘাচ্ছন্ন হইলে বায়ুপ্রবাহ উথিত হইয়া যেমন মেঘাপসরণ করে; নানারূপে ভ্রান্তমতের আবরণে সত্য ধর্ম্ম আচ্ছন্ন হইলে, সেইরূপ অবতারগণ আবির্ভূত হইয়া সে আবরণ উন্মোচন করিয়া দেন; তখন মেঘমুক্ত শশধরের ন্যায় সত্য-ধর্ম্মের দিব্য-জ্যোতিঃ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। আমরা কোনও ধর্ম্মেরই বিরুদ্ধবাদী নহি; শুভ-সঙ্কল্প-প্রণোদিত সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ই জনহিতসাধক। সুতরাং, কিবা জৈন-ধর্ম্ম কিবা বৌদ্ধ-ধর্ম্ম উভয় ধর্ম্মেরই উপযোগিতা আমরা স্বীকার করি। কি জৈনধর্ম্ম, কি বৌদ্ধধর্ম্ম উভয়েই স্বতঃ-প্রসূত; পরন্তু ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের অঙ্কে উহাদের উদ্ভূতি। উহাদের দর্শন, নীতি, সৃষ্টি, বিজ্ঞান—সকলেরই ভিত্তি—ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম। যাহা হউক, এক ধর্ম্ম হইতে অপর ধর্ম্মের উৎপত্তিই হউক অথবা সকল ধর্ম্মই স্বতঃপ্রসূত হউক, ধর্ম্মভাবের প্রভাব অসাধারণ। যখন যে ধর্ম্মে নবীন জীবন সঞ্চারিত হয়, তখন সে ধর্ম্মের প্রভাবে দেশ জাতি সম্প্রদায় নূতন শক্তি লাভ করে। জৈনধর্ম্মের ও বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয় তাহারই পরিচয় প্রদান করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

——:‡:——

জৈন-ধর্ম্ম-শাস্ত্র।

[আদি-ধর্ম্মের অনুসন্ধানে ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রভাবের বিষয়;—জৈনশাস্ত্র লিপিবদ্ধ হওয়ার কাল.—তৎসম্বন্ধে বিচার-বিতর্ক;—'পূর্ব্ব'-শাস্ত্রের প্রসঙ্গ,—জৈন সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র—আগম ও কল্পশাস্ত্র—বিভাগ ও উপবিভাগ প্রভৃতি;—প্রধান প্রধান জৈন ধর্ম্মগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয়;—জৈনগ্রন্থকারগণ।]

বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিবৃত্তানুসন্ধানে আমরা দেখিয়াছি, ঐ ধর্ম্মের উপদেশ-পরম্পরা প্রথমে লিপিবদ্ধ ছিল না; তখন উহার বিধি-বিধান সমস্তই ভিক্ষুগণের কণ্ঠে কণ্ঠে বিদ্যমান থাকিত।

ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রভাবের বিষয়।

বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-লাভের বহু বর্ষ পরে তৎপ্রবর্ত্তিত বিধি-বিধান লিপিবদ্ধ হয়। জৈনধর্ম্মের ইতিহাসও সেই কথাই ঘোষণা করে। মহাবীর স্বামীর অভ্যুদয়ের পর বহু কাল পর্য্যন্ত ঐ সম্প্রদায়ের বিধি-বিধান উপদেশ-পরম্পরা কণ্ঠস্থ রাখিবারই বিধি ছিল। পরিশেষে তৎসমুদায় লিপিবদ্ধ হয়। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গীভূত শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতির প্রকটনে আদর্শরূপে ঐ পদ্ধতি পরিদৃশ্যমান। শ্রুতি নামেই ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মানুসারীর কণ্ঠে কণ্ঠে অবস্থিত অর্থ উপলব্ধি করি। আজিও সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী সাধুগণ বেদমন্ত্র লিপিবদ্ধ করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন। ফলতঃ, প্রথম কিছুকাল কণ্ঠে কণ্ঠে অবস্থিত থাকিয়া পরিশেষে লিপির আকারে শ্রুতি স্মৃতি যেমন লিখিত হইয়াছিল; জৈনগণের এবং বৌদ্ধগণের শাস্ত্রগ্রন্থ-নিচয় সেইভাবেই বর্ত্তমান লিপির আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রন্থ সমূহের ঐ ভাবে উৎপত্তির পরিচয় পূর্ব্বেই আমরা প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে এতৎপ্রসঙ্গে জৈনধর্ম্ম-গ্রন্থ-সমূহের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিবার প্রয়াস পাইতেছি। পূর্ব্বে বলিয়াছি, এক এক ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ইতিহাস নূতন নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। হিন্দুর গৌরব-রবি অস্তামত হইলে, সনাতন-ধর্ম্মের তেজোগর্ব্ব পরিম্লান হইয়া আসিলে, বৈদেশিক আক্রমণের করাল কবল হইতে ভারতবর্ষ যে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল; তাহার কারণ—জৈন-ধর্ম্মের ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের নবীন উদ্দীপনা। ঐ দুই ধর্ম্মের নবীন আলোক ভারতবর্ষকে নব-জীবন দান করিয়াছিল। সুতরাং কি ধর্ম্ম-নৈতিক, কি সমাজনৈতিক, কি রাজনৈতিক, ভারতবর্ষের সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তনের মধ্যে ঐ দুই ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রভাব লক্ষ্য করিবার বিষয়। বৌদ্ধ-সাহিত্যে বৌদ্ধ-প্রভাবের বিষয় এবং জৈন-সাহিত্যে জৈন-প্রভাবের বিষয় পরিকীর্ত্তিত আছে। ঐ দুই সাহিত্যের মূল—উহাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্র। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-শাস্ত্রের বিষয় পূর্ব্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে জৈন-ধর্ম্ম-শাস্ত্রের একটু পরিচয় দিবার চেষ্টা পাইতেছি।

জৈন-ধর্ম্ম-শাস্ত্রের সাধারণ সংজ্ঞা—'সিদ্ধান্ত' বা 'আগম'। এই সিদ্ধান্ত বা আগম কোন্ সময়ে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে নানা মতবিরোধ আছে। কোনও মতে মহাবীর স্বামীর জীবিতকালে, কোনও মতে তাঁহার জন্মগ্রহণের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে, আবার কোনও মতে তাঁহার নির্ব্বাণলাভের সহস্র বৎসর পরে, সিদ্ধান্ত বা আগম গ্রন্থ-সমূহ সঙ্কলিত হইয়াছিল। জৈনশাস্ত্র কল্পসূত্রে মহাবীর স্বামীর যে জীবন-চরিত আছে, তাহার উপসংহারে ঐ সম্বন্ধে একটু আভাষ পাই। কল্পসূত্রের (পঞ্চম বাচনে, ১৪৮ম সূত্রে) ঐ অংশে উল্লেখ আছে,—'মহাবীর স্বামীর নির্ব্বাণলাভের পর নয় শতাব্দী অতীত হইয়া যায়। দশম শতাব্দীর অশীতি বর্ষে অথবা ত্রিনবতি বর্ষে জৈন-সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।' কল্পসূত্রের এই উক্তির অনুসরণে সাধারণতঃ ৪৫৪ বা ৪৬৭ খৃষ্টাব্দে সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সে মতে, দেবর্দ্ধি জ্ঞানী জৈনধর্ম্মশাস্ত্র-সমূহ লিপিবদ্ধ করান। কাহারও কাহারও মতে উহাই প্রথম লিখন-চেষ্টা। কল্পসূত্রের ঐ উল্লেখ ভিন্ন এ পক্ষে অন্য প্রমাণ বিশেষ কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পরন্তু দেবর্দ্ধি কর্ত্তৃক সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বেও উহা যে লিপিবদ্ধ অবস্থায় বিদ্যমান ছিল, নানাপ্রকারে তাহা প্রতিপন্ন হয়। অপিচ, একটু অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারি যে, নানাস্থানে প্রাপ্ত পুঁথি-পত্র হইতে পাঠোদ্ধার করিয়া দেবর্দ্ধি সিদ্ধান্ত-শাস্ত্রের বহুল-প্রচার পক্ষে প্রযত্নপর হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে ঐরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। ফলতঃ, দেবর্দ্ধির সময়ে জৈন-ধর্ম্মশাস্ত্র যে প্রথম লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা না বলিয়া ঐ সময়েই সর্ব্ব-প্রথম জৈন-শাস্ত্র-সমূহ বিশেষভাবে প্রচারিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র লিপিবদ্ধ হওয়া সম্বন্ধে এরূপ সিদ্ধান্তের কয়েকটী কারণ নিম্নে উল্লেখ করিতেছি। তাহাতে বিষয়টী বোধগম্য হইতে পারে। প্রথমতঃ,—সিদ্ধান্ত-শাস্ত্রের ভাষা। যে প্রাকৃত ভাষায় উহা লিপিবদ্ধ, তাহা খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর ভাষা নহে। একদিকে জৈন-প্রাকৃত ও প্রাচীনতম পালিভাষা রাখিয়া তুলনায় আলোচনা করিলে এবং আর একদিকে জৈন-প্রাকৃত ও হাল সেতুবন্ধ প্রভৃতির প্রাকৃত-ভাষা রাখিয়া তুলনায় আলোচনা করিলে, প্রাচীনতম পালিভাষার সহিতই সিদ্ধান্ত-শাস্ত্রের প্রাকৃত-ভাষার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইবে। সুতরাং যে সময়ে দক্ষিণ-দেশীয় বৌদ্ধ-গণের ধর্ম্ম-শাস্ত্র-সমূহ সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহারই সমসময়ে সিদ্ধান্তগ্রন্থ-সমূহ সঙ্কলিত হওয়ার বিষয় মনে আসিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ,—জৈন-ধর্ম্মশাস্ত্রে, আচারাঙ্গ সূত্রে এবং সূত্রকৃতাঙ্গ সূত্রে, মধ্যে মধ্যে যে ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিতে পাই, তাহা অতি প্রাচীনকালের ছন্দ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সূত্রকৃতাঙ্গ সূত্রের সকল অধ্যয়নই (পাঠ) বৈতালীয় ছন্দে গ্রথিত। ধম্মপদে এবং দক্ষিণ-দেশীয় বৌদ্ধগণের ধর্ম্ম-গ্রন্থে প্রায়ই ঐ প্রাচীন ছন্দের প্রাধান্য দেখি। 'ললিত-বিস্তরে' প্রাচীন গাথার মধ্যে যে বৈতালীয় ছন্দ দৃষ্ট হয়, সিদ্ধান্ত-শাস্ত্রের শ্লোকগুলি তদপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী কালের রচনা বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ নির্দ্দেশ করেন। আরও, ধম্মপদ প্রভৃতি প্রাচীন পালি-গ্রন্থে আর্য্যাছন্দের শ্লোক দৃষ্ট হয় না; কিন্তু আচারাঙ্গসূত্রে ও সূত্রকৃতাঙ্গ-সূত্রে সেই প্রাচীন আর্য্যাছন্দ দৃষ্ট হয়। এমন কি, ঐ দুই গ্রন্থের আর্য্যাছন্দকে

জৈনশাস্ত্র লিপিবদ্ধ।

প্রচলিত সাধারণ আর্য্যাছন্দের অনন্বিতা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। প্রচলিত সাধারণ আর্য্যাছন্দ, সিদ্ধান্তশাস্ত্রের কোনও কোনও পরবর্ত্তী অংশে, প্রাকৃত-ভাষার ও সংস্কৃত-ভাষার শাস্ত্রাদিতে এবং উত্তর-দেশীয় বৌদ্ধদিগের ধর্ম্ম-গ্রন্থে (ললিতবিস্তর প্রভৃতিতে) দৃষ্ট হয়। অন্য পক্ষে, ললিত-বিস্তরে যে সকল আধুনিক ছন্দ দেখিতে পাওয়া যায়, জৈন-সিদ্ধান্তে তৎসমুদায়ের প্রবর্ত্তনার অভাব। এই সকল কারণে ললিতবিস্তর প্রভৃতি লিখিত হইবার পূর্ব্বে যে জৈন-সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা মনে করা যাইতে পারে। এই সকল বিষয় অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারি, প্রাচীন পালির এবং ললিত-বিস্তর প্রভৃতির রচনার মধ্যবর্ত্তীকালে জৈন-শাস্ত্র-সমূহ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন,—রাজা বত্তগামিনীর সময়ে পালি পিটক-গ্রন্থসমূহ লিপিবদ্ধ হয়। বত্তগামিনী ৮৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য,—ঐ সময়ে লিপিবদ্ধ হইলেও পালি পিটক-গ্রন্থ-সমূহের বিদ্যমানতা উহার কয়েক শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ঐ সম্বন্ধে বহু আলোচনার পর ম্যাক্সমূলার সিদ্ধান্ত করেন যে, ৩৭৭ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বৌদ্ধসঙ্ঘে বৌদ্ধধর্ম্ম-শাস্ত্রসমূহ সঙ্কলিত হয়। পরবর্ত্তিকালে উহার মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন সাধিত হইলেও খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীই বৌদ্ধ-পিটক-সাহিত্য লিপিবদ্ধ হওয়ার কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই হিসাবে জৈন-সিদ্ধান্ত-শাস্ত্রও খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীরই গ্রন্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ললিত-বিস্তর ৬৫ খৃষ্টাব্দে চীনা-ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। জৈনসিদ্ধান্তশাস্ত্র যে ললিতবিস্তরের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের রচনা, তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু সে কত পূর্ব্বের রচনা, তাহাও একটু অনুসন্ধান করা যাইতে পারে। শ্বেতাম্বর জৈনগণের মধ্যে একটী কিম্বদন্তী আছে,—এক সময়ে দ্বাদশবর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ভদ্রবাহু তখন প্রথম ধর্ম্মাধ্যক্ষের 'পট্টচর' পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেই সময়ে পাটলিপুত্রে একটী সঙ্ঘ আহূত হয়, এবং সেই সঙ্ঘে অঙ্গ-শাস্ত্রসকল সংগৃহীত হইয়াছিল। ভদ্রবাহুর লোকান্তর সম্বন্ধে শ্বেতাম্বরগণ ১৭০ বল্লবী অব্দ এবং দিগম্বরগণ ১৬২ বল্লবী অব্দ নির্দ্দেশ করেন। এই হিসাবে, শ্বেতাম্বরগণের নির্দ্দেশক্রমে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ভদ্রবাহুর বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হয়। চন্দ্রগুপ্ত ১৫৫ বল্লবী অব্দে সিংহাসনারোহণ করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার ৩১৫—২৯১ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল নির্দ্দেশ করেন। ওয়েষ্টারগার্ড এবং কার্ণ প্রভৃতির মতে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-প্রাপ্তির অব্দ ৩২০ পূর্ব্ব-খ্রীষ্টাব্দ নির্দ্দিষ্ট হয়। যাহা হউক, এ গণনার পার্থক্য অতি সামান্য; অপিচ, এ গণনামতে জৈন-ধর্ম্ম-শাস্ত্র (অঙ্গ) খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে সঙ্কলিত হইয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। এতৎপ্রসঙ্গে আর একটী বিষয় লক্ষ্য করা আবশ্যক। পাটলিপুত্র নগরে প্রোক্ত সঙ্ঘে ভদ্রবাহুর সহায়তা ব্যতীত একাদশ অঙ্গ সঙ্কলিত হওয়ার বিষয় প্রচারিত আছে। দিগম্বরগণ ভদ্রবাহুকে আপনাদের নেতৃস্থানীয় বলিয়া মনে করেন বটে; কিন্তু শ্বেতাম্বরগণ ভদ্রবাহুর সহচর স্থবির 'সম্ভূত' হইতে 'স্থবির'-পদের গণনা করিয়া থাকেন। তদনুসারে পাটলিপুত্রের সঙ্ঘে যে অঙ্গনিচয় সংগৃহীত হয়, তাহা কেবলমাত্র শ্বেতাম্বরগণের ধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল; অর্থাৎ—

সমগ্র জৈন-সম্প্রদায় সে অঙ্গ সমুদায় একবাক্যে মান্য করেন নাই। পরিশেষে খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে স্থূলভদ্রের অধিনায়কত্বে ধর্ম্মশাস্ত্র সঙ্কলিত হওয়ায় অপর পক্ষের অভাব বিদূরিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। অতএব জৈন-শাস্ত্র-সাহিত্য ৩০০ পূর্ব্ব-খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ জৈন-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার ২০০ বৎসর পরে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তার পর, উহারও পূর্ব্বে জৈনদিগের যে কোনও শাস্ত্র লিপিবদ্ধ ছিল না, তাহাও মনে করা যায় না। শ্বেতাম্বর এবং দিগম্বর উভয় জৈন-সম্প্রদায় মধ্যেই প্রবাদ আছে যে, অঙ্গ-শাস্ত্র ভিন্ন তাঁহাদের আরও এক প্রাচীন শাস্ত্র-গ্রন্থ ছিল। তাহার নাম,—'পূর্ব্ব'। সেই 'পূর্ব্ব' শাস্ত্রের সংখ্যা চতুর্দ্দশ বলিয়া উক্ত হয়। সেই পূর্ব্ব-শাস্ত্রের জ্ঞান ক্রমে ক্রমে লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। শ্বেতাম্বরগণ কিন্তু বলেন,—

পূর্ব্ব-শাস্ত্র।

চতুর্দ্দশ পূর্ব্বশাস্ত্র এখন দ্বাদশ 'অঙ্গের' মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে। আর সেই দ্বাদশ অঙ্গের অঙ্গীভূত 'দৃষ্টিবাদ' এখন লোপপ্রাপ্ত। ১০০০ বল্লবী অব্দ হইতে দৃষ্টিবাদ অদৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। তবে দৃষ্টিবাদের সুতরাং 'পূর্ব্বশাস্ত্রের' আলোচ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সমবায়াঙ্গ নামক চতুর্থ অঙ্গে এবং নন্দী-সূত্রে কিছু কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'পূর্ব্বশাস্ত্র' সমুদায়, দৃষ্টিবাদ সহ, একই গ্রন্থ ছিল বা উহাতে বহু গ্রন্থের সার-সঙ্কলন ছিল, তাহা এখন নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে। তবে সে সম্বন্ধে নানা মতান্তর আছে। যাহা হউক, পূর্ব্বশাস্ত্রের বিদ্যমানতার বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। আপন ধর্ম্ম-শাস্ত্রের প্রাচীনত্ব খ্যাপন ব্যপদেশে উহার পরিকল্পনা বলিয়া মনে করা যায় না। কেন-না, যাবৎ সৃষ্টি, তাবৎ অঙ্গ-শাস্ত্রের বিদ্যমানতা,—এই বাণীই যখন তারস্বরে বিঘোষিত হইয়া আসিতেছে, তখন পূর্ব্বশাস্ত্রের ঐরূপ পরিকল্পনা নিরর্থক। তবে 'পূর্ব্ব' এই নামে, সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র লিপিবদ্ধ হওয়ার পূর্ব্ববর্ত্তিকালের কোনও শাস্ত্র-গ্রন্থকে বুঝাইতেছে, তাহা নিঃসন্দেহ। পাটলিপুত্রের সঙ্ঘে অঙ্গশাস্ত্র সঙ্কলিত হওয়ার সময় 'পূর্ব্ব'-শাস্ত্রের স্মৃতি মলিন হইয়া আসিতেছিল। ভদ্রবাহুর পরে, চতুর্দ্দশ 'পূর্ব্বের' পরিবর্ত্তে দশটী মাত্র 'পূর্ব্বের' পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তার পর ক্রমেই তাহারা লোপ পাইল বা অপরের অঙ্গে অঙ্গ মিশাইল। পূর্ব্বশাস্ত্রের এরূপভাবে বিলোপ-প্রাপ্তির কারণ অবশ্যই আছে। উহার একটী প্রধান কারণ এই মনে হয় যে, উহার আবশ্যকতা লোপ পাইয়াছিল। দৃষ্টিবাদ নামের বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারি, উহাতে জৈনগণের এবং অপর ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের দার্শনিক মত আলোচিত হইয়াছিল। 'পূর্ব্ব' শব্দের সহিত 'প্রবাদ' শব্দের সংযোগ ঘটিয়াছিল বলিয়া যখন জানিতে পারি, তখন আরও মনে হয়, উহাতে মহাবীর স্বামীর সহিত তাঁহার বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বিগণের বিচার-বিতণ্ডা বিবৃত ছিল। মহাবীর স্বামী কোনও নব-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা করেন নাই। তিনি পুরাতনের—সনাতনেরই—এক অঙ্গের সেবায় ব্যাপৃত ছিলেন। সুতরাং, বিরুদ্ধবাদিগণের প্রতিবাদে তিনি যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা পুরাতন বা পুরাতনেরই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। তিনি 'পূর্ব্ব' শাস্ত্রে যদি নূতন কিছু প্রচার করিতেন, তাহা হইলে তাহার আর এক প্রকারের মূল্য থাকিত। কিন্তু যখন তাহা বাদ-প্রতিবাদ মূলক, তখন বাদ-প্রতিবাদের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার আবশ্যকতার অবসান

ঘটিল। মহাবীরের বিরুদ্ধবাদীরা যখন বিলুপ্ত হইল, তাঁহার বিরুদ্ধ সম্প্রদায় যখন লোপ পাইল, তখন আর বিতর্কমূলক সে দার্শনিক গ্রন্থের কি আবশ্যকতা রহিল? ঐতিহাসিকের নিকট, সমালোচকের নিকট, প্রত্নতাত্ত্বিকের নিকট তাহার মূল্য থাকিতে পারে; কিন্তু ধর্ম্মানুগত জনের তাহাতে কি প্রয়োজন? খুব সম্ভব, সেই অপ্রয়োজনীয়তা নিবন্ধনই 'পূর্ব্ব'-শাস্ত্র গ্রন্থ-নিচয় লোপ পাইয়াছে। ফলতঃ, আর কোনও কারণই নয়; জৈনধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাবীর স্বামীর নির্ব্বাণ-লাভের পরবর্ত্তী দুই শতাব্দীর মধ্যে জৈনধর্ম্ম-সম্প্রদায় এতই শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছিল যে, তখন আর বৃথা বিতণ্ডার বিষয়ে মনোনিবেশ করা তাঁহারা আবশ্যক বলিয়া মনে করেন নাই। যখন ধর্ম্মশাস্ত্র-সমূহ নূতন আকারে সুসম্বদ্ধ হইয়া আসিল, তখন আর পূর্ব্ব-শাস্ত্রের আবশ্যকতাই রহিল না। এইরূপে বুঝা যায়, পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহা কালের গর্ভে বিলুপ্ত হইলেও, এখনও যে সকল জৈন-শাস্ত্র প্রবর্ত্তিত আছে, খুব অল্প দিনের হইলেও, তাহার মধ্যে অনেকগুলি খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষে বা তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। সিদ্ধান্তই তাহার আদি।

সিদ্ধান্ত বা আগম-শাস্ত্র কল্পসূত্র নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। উহার সংখ্যা সম্বন্ধে নানা মতান্তর আছে। কোনও মতে সিদ্ধান্ত-শাস্ত্রের সংখ্যা—পঁয়তাল্লিশ খানি; কোনও মতে আগম বা কল্পসূত্র নামে উহার সংখ্যা—পঞ্চাশ খানি।* কিন্তু অনুসন্ধানে সংখ্যার ন্যূনাধিক্য এবং নামের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, সিদ্ধান্ত বা আগম-শাস্ত্র-সমূহকে সাধারণতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে; যথা,—(১) অঙ্গ, (২) উপাঙ্গ, (৩) পয়ন্ন অর্থাৎ প্রশ্ন, (৪) ছেদসূত্র, (৫) মূলসূত্র, (৬) সূত্র। ইহাদের মধ্যে অঙ্গের সংখ্যা দ্বাদশ বলিয়া উক্ত হয়। যথা,—আচারাঙ্গ, সূত্র-কৃতাঙ্গ, স্থানাঙ্গ, সমবায়াঙ্গ, ভগবত্যঙ্গ, জ্ঞাতৃধর্ম্মকথাঙ্গ, উপাসক-দশাঙ্গ, অন্তকৃদ্দশাঙ্গ, অনুত্তরোপপাতিকাঙ্গ, প্রশ্নব্যাকরণাঙ্গ, দীপকাঙ্গ, দৃষ্টিবাদাঙ্গ। ইহার মধ্যে শেষোক্ত অঙ্গ অর্থাৎ দৃষ্টিবাদ লোপ পাইয়াছে; এবং আচারাঙ্গ ও সূত্রকৃতাঙ্গ বিশেষভাবে প্রচারিত আছে। উপাঙ্গের সংখ্যাও দ্বাদশ; যথা,—উপপাতিক, কল্পাবতংসিকা, চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তি, জম্বুদ্বীপ-প্রজ্ঞপ্তি, জীবাভিগম, নিরয়াবলী, পুষ্পচূলিকা, পুষ্পিকা, প্রজ্ঞাপনা, সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তি, রাজপ্রশ্নীয়, বৃষ্ণিদশা, কল্পিকা (কপ্পিয়া)। এইরূপ পয়ন্নের সংখ্যা দশ খানি; যথা,—আতুর, গণিবীজ, চতুঃশরণ, চন্দাবীজ, দেবেন্দ্র-স্তব, প্রত্যাখ্যান, ভক্তপরিজ্ঞা, মহাপ্রত্যাখ্যান, বীরস্তব। ছেদসূত্রের সংখ্যা ছয় খানি; যথা,—দশশ্রুতস্কন্ধ, নিশীথ, মহানিশীথ, ব্যবহার, বৃহৎকল্প, পঞ্চকল্প। মূলসূত্রের সংখ্যা চারিখানি; যথা,—উত্তরাধ্যয়ন, আবশ্যক, দশবৈকালিক, পিণ্ডনির্য্যুক্তি। কোনও কোনও মতে সূত্রগ্রন্থের সংখ্যা আরও অনেক অধিক। কল্প, দশবৈকালিক, ক্ষেত্রসমাস, চতুর্বিংশতি, নবতত্ত্ব, প্রতিক্রমণ, সংগ্রহণী, স্মরণ, পক্ষী প্রভৃতি গ্রন্থ সে মতে প্রসিদ্ধ। সিদ্ধান্তধর্ম্মসার মতে—মূলসূত্র, কল্পসূত্র ও পয়ন্নের সংখ্যা ও সংজ্ঞা অনুরূপ লিখিত আছে। সে মতে, দশখানি পয়ন্নের নামের একটু পরিবর্ত্তন দেখি! গণিবীজের পরিবর্ত্তে

জৈন সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র।

---

* সিদ্ধান্ত-ধর্ম্মসারে ৫০ খানি আগম বা কল্পসূত্রের উল্লেখ আছে। কিন্তু রত্নসাগরের মতে আগমের সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ। বলা বাহুল্য, শেষোক্ত মতই এখন জৈনগণ মান্য করেন।

গণিবিদ্যা, চন্দাবীজের পরিবর্তে চন্দাবিজয়; সংস্তার পরিবর্তে সংস্থার নাম দৃষ্ট হয়; এবং আতুর নামের পরিবর্তে মরণসমাধি নাম দেখিতে পাই। মূলসূত্রের মধ্যে উত্তরাধ্যয়ন স্থলে বিশেষাবশ্যক এবং পিণ্ডনির্য্যুক্তি স্থলে পাক্ষিক নাম প্রযুক্ত আছে। সিদ্ধান্ত-ধর্ম্মসার মতে—কল্পসূত্র পাঁচখানি, মূল সূত্র চারিখানি এবং সাধারণ সূত্র ছয়খানি। সে মতে, উত্তরাধ্যয়ন, নিশীথ, কল্প, ব্যবহার ও জিতকল্প এই পাঁচখানি কল্পসূত্র; এবং মহানিশীথ-বৃহদ্বাচনা, মহানিশীথ-লঘুবাচনা, মধ্যমবাচনা, পিণ্ডনির্য্যুক্তি, ওঘনির্য্যুক্তি, পর্য্যুষণাকল্প—সাধারণ সূত্রের অন্তর্ভুক্ত। সিদ্ধান্ত, আগম বা কল্পসূত্র ভিন্ন জৈনগণের মধ্যে আরও তিন শ্রেণীর প্রাচীন গ্রন্থ দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ,—জ্ঞান-কাণ্ডের অন্তর্গত অনেকগুলি গ্রন্থ আছে; আত্মানুশাসন, আরাধনাপ্রকার, উপদেশমালা, উপাধানবিধি, একবিংশতিস্থান, প্রশ্নোত্তররত্নমালা প্রভৃতি; দ্বিতীয়তঃ,—স্তবগ্রন্থ, ঋষভস্তব, কল্যাণমন্দিরস্তব, পার্শ্বনাথস্তব, বৃহৎশান্তিস্তব, শান্তিজিনস্তব প্রভৃতি; তৃতীয়তঃ,—পুরাণপরম্পরা; হিন্দুপুরাণের আদর্শে রচিত; পদ্মপুরাণ, মহাবীর-চরিত, নেমিরাজর্ষিচরিত, চিত্রসেনচরিত প্রভৃতি। জৈনদিগের মধ্যে এইরূপ প্রচার আছে যে, তাঁহাদের আগমসমূহ মহাবীর স্বামী তাঁহার প্রধান দুই জন শিষ্যের নিকট প্রথম ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই দুই শিষ্যের এক জনের নাম গৌতম বা ইন্দ্রভূতি, অন্য জনের নাম সুধর্ম্মস্বামী। মহাবীরের বিদ্যমান কালেই ইন্দ্রভূতি নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হন। সুতরাং মহাবীরের পর সুধর্ম্মস্বামীই ধর্ম্মোপদেষ্টার আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুধর্ম্মস্বামীর নিকট জম্বুস্বামী আগমশাস্ত্রের উপদেশ প্রাপ্ত হন। তৎপরে পর্য্যায়ক্রমে প্রভব, শয্যম্ভব, যশোভদ্র, সম্ভূতি, বিজয় এবং পরিশেষে ভদ্রবাহু আগমশাস্ত্র লাভ করেন। ইহার পর স্থূলভদ্র আগমশাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্থূলভদ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী আগমশাস্ত্রবিৎ মহাত্মগণ 'শ্রুতকেবলী' সংজ্ঞায় অভিহিত হন এবং স্থূলভদ্র হইতে তৎপরবর্ত্তী জৈনাচার্য্যগণ 'পট্টধর' (প্রধানাচার্য্য) সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। জৈনশাস্ত্র মতে, যিনি কেবলী, কেবলজ্ঞানী, তিনি শুদ্ধজ্ঞানী, তিনি তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন। 'কেবল' অবস্থাই মুক্ত অবস্থা। সাংখ্যের যে নিঃশ্রেয়স্ মুক্তি, পতঞ্জলির যে কৈবল্যলাভ, কেবলীর সেই নির্ব্বাণ-মুক্তির অবস্থা। কথিত হয়, মহাবীর স্বামীর প্রধান শিষ্য গৌতম বা ইন্দ্রভূতি সম্পূর্ণরূপ আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সুতরাং কেবলী হইয়াছিলেন; অতএব তাঁহাকে আর আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত হইতে হয় নাই। সুতরাং সুধর্ম্মস্বামী হইতেই পট্টধর সংজ্ঞা প্রবর্ত্তিত হয়। সেই পট্টধরগণের মধ্যে ভদ্রবাহু পর্য্যন্ত শ্রুতকেবলী অর্থাৎ তাঁহাদের সময় পর্য্যন্ত জৈন আগমশাস্ত্র শ্রুতিরূপে বিদ্যমান ছিল, মনে করা যাইতে পারে। পরবর্ত্তিকালে পট্টধরগণ নানারূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহ আগমশাস্ত্র সঙ্কলন করিতে আরম্ভ করেন। জম্বুস্বামীর সময়ে কোনও কোনও বিষয়ে মতান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। শয্যম্ভবস্বামীর সময়ে দশবৈকালিক সূত্র প্রণয়নে বিরোধ নিবারণের চেষ্টা হয়। এইরূপে বিভিন্ন পট্টধরের সময়ে বিভিন্ন গ্রন্থরত্ন সঙ্কলিত হওয়ায় জৈনসাহিত্য সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিল। পূর্ব্বে যে সিদ্ধান্ত বা আগমশাস্ত্রের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রথমে উহা জৈনসাধারণের মান্য ছিল বটে; কিন্তু পরিশেষে জৈনসম্প্রদায় শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর দুই শাখায় বিভক্ত হইলে শাস্ত্রগ্রন্থের অনুসরণ সম্বন্ধেও মতদ্বৈধ ঘটে।

দিগম্বর জৈনগণ আপনাদের জন্য কয়েকখানি শাস্ত্রগ্রন্থ বিশেষরূপে চিহ্নিত করিয়া লন।* তাঁহারা আপনাদের মান্য শাস্ত্রগ্রন্থকে (শ্রুতজ্ঞানকে) তিন ভাগে বিভক্ত করেন। সেই তিন ভাগ,—অঙ্গ, পূর্ব্ব, অঙ্গবাহ্য। ইঁহাদের মধ্যেও অঙ্গের সংখ্যা দ্বাদশ নির্দ্দিষ্ট। তবে, নামের কিছু পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। পঞ্চম অঙ্গে সিদ্ধান্তশাস্ত্রের ভগবত্যঙ্গ নাম আছে; কিন্তু দিগম্বরদিগের শ্রুতজ্ঞানে ঐ পঞ্চম অঙ্গের নাম—ব্যাখ্যাপ্রজ্ঞপ্ত্যঙ্গ। অন্য অঙ্গের নাম সম্বন্ধে বিশেষ পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় না; মাত্র 'উপাসক-দশাঙ্গ' নাম 'উপাসকাধ্যয়নাঙ্গ' নামে এবং 'বিপাকাঙ্গ' 'বিপাকসূত্রাঙ্গ' নামে অভিহিত হইয়াছে দেখি। অপিচ, দৃষ্টিবাদ সম্বন্ধে উহার অঙ্গস্বরূপ পাঁচ খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ পরিচিত হয়; যথা,—পরিকর্ম্ম, পরিকর্ম্ম-পঞ্চক, সূত্র, প্রথমানুযোগ, চতুর্দ্দশ সংখ্যক পূর্ব্বগত, চুলিকা-পঞ্চক। ঐ মতে অঙ্গ-বাহ্যের সংখ্যা চতুর্দ্দশ। এই হিসাবে মোট গ্রন্থসংখ্যা চল্লিশ।

অধুনা জৈনশাস্ত্রগ্রন্থের সংখ্যা যতই হউক না কেন, সিদ্ধান্ত বা আগমশাস্ত্রের অন্তর্গত আচারাঙ্গ ও সূত্রকৃতাঙ্গ যে প্রাচীন গ্রন্থ, তাহাতে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না।

আচারাঙ্গ সূত্র।

কি শ্বেতাম্বর, কি দিগম্বর, উভয় জৈন-সম্প্রদায়ই ঐ দুই গ্রন্থকে এক-বাক্যে মান্য করেন। আচারাঙ্গ জৈনধর্ম্মের প্রাণভূত। আচারাঙ্গ-সূত্র যেমন অঙ্গশাস্ত্রের প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে, তেমনি উহা জৈন-ধর্ম্ম-সৌধের মূলস্তম্ভস্বরূপ যতি-সন্ন্যাসিগণের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে ভিত্তিস্থানের দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়া গিয়াছে। ঐ গ্রন্থের আর এক নাম—সামায়িক। আচার বা চরিত্রের বিষয়, চারি অনুযোগে বা শিরোনামায় উহাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই চারি অনুযোগের নাম,—ধর্ম্মকথা, গণিত, দ্রব্য, চরণ-করণ। আচারাঙ্গ-সূত্র দুই খণ্ডে বা শ্রুতস্কন্ধে বিভক্ত। ঐ দুই খণ্ডের রচনা-পদ্ধতি এবং বিবৃতি-পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দ্বিতীয় খণ্ডে উপবিভাগ-সমূহ চুলা অর্থাৎ পরিশিষ্টরূপে সংগ্রথিত। তাহাতে, প্রথম খণ্ডের তুলনায় শেষ খণ্ডের আধুনিকত্ব অনুভূত হয়। আচারাঙ্গ-সূত্রের যে সকল টীকা অধুনা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে শীলাঙ্ক-বিরচিত টীকাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। আচারাঙ্গ সূত্রের দ্বিতীয় খণ্ড যে পরবর্ত্তী কালের রচনা, শীলাঙ্ক এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক মত এই যে, গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ—গ্রন্থের প্রারম্ভে, মধ্যস্থলে এবং উপসংহারে সন্নিবিষ্ট থাকে। কিন্তু শীলাঙ্ক দেখাইয়াছেন যে, প্রথম শ্রুতস্কন্ধের অন্তর্গত প্রথম অধ্যয়নের প্রথম উদ্দেশকের প্রথম পংক্তিতে, পঞ্চম অধ্যয়নের পঞ্চম উদ্দেশকের প্রথম পংক্তিতে এবং অষ্টম অধ্যয়নের চতুর্থ উদ্দেশকের ষোড়শ কবিতার শেষার্দ্ধে মঙ্গলাচরণ দৃষ্ট হয়। এতদ্দ্বারা বেশ উপলব্ধি হয় যে, অষ্টম অধ্যয়নই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি। তাহার পর যে দ্বিতীয় খণ্ড, তাহা প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টরূপে পরবর্ত্তী সময়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল, নানা কারণে তাহা সিদ্ধান্ত হয়। কেন-না, প্রথম খণ্ডকেই সম্পূর্ণ গ্রন্থ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ধর্ম্মবিশ্বাসী জন কেমন করিয়া আত্মোন্নতির পথে অগ্রসর হয় এবং পরিশেষে চরম পরিণতি নির্ব্বাণ লাভ করে, এই

* মহাবীর স্বামীর নির্ব্বাণ-লাভের পরবর্ত্তী ৬০৯ম বর্ষে শিবভূতি কর্ত্তৃক দিগম্বর মত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; শিবভূতি কৃষ্ণস্বামীর শিষ্য। বিশেষাবশ্যকাদিতে দিগম্বর মতের বিবরণ আছে।

অংশে প্রহেলিকাপূর্ণ ভাষায় তাহা বিবৃত আছে। প্রথম শ্রুতস্কন্ধের শেষ অধ্যয়নটী একরূপ সাধারণ গাথার আকারে লিখিত; ঐ অংশে জৈনধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাবীর স্বামীর গৌরবময় জীবনের ভীষণ পরীক্ষার বিষয় বিবৃত আছে। কেহ কেহ ঐ অংশকে পরবর্ত্তী কালের রচনা বলিয়া মনে করিলেও, ঐ অংশে প্রকৃত সন্ন্যাস-জীবনের যে উচ্চ আদর্শ অঙ্কিত রহিয়াছে, জৈন-জীবন-গঠনের পক্ষে তাহা অশেষ সহায়তা করে। প্রথম খণ্ডের অধিকাংশ গদ্যে লিখিত—বিশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত। অনেকত্র বাক্যের অংশমাত্র আছে এবং কোথাও কোনও বাক্যের অর্থ পরিগ্রহ করাই দুঃসাধ্য। এই অংশ দেখিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সূত্রগ্রন্থের বিষয় মনে পড়ে। কিন্তু পার্থক্য এই যে, সূত্রগ্রন্থের সূত্রসমূহের কোথাও ক্রমভঙ্গ হয় নাই; তথায় সর্ব্বথা চিন্তার গতি ন্যায়ানুগত শ্রেণিবদ্ধভাবে চলিয়াছে। কিন্তু আচারাঙ্গ-সূত্রে সে ক্রম-রক্ষার—চিন্তার পৌর্ব্বাপৌর্য্যের সম্পূর্ণ অভাব। এই গ্রন্থের কোথাও কবিতাংশ, কোথাও বা সম্পূর্ণ একটী কবিতা পর্য্যন্ত গদ্যের মধ্যে মিশিয়া আছে। সেই সকল কবিতার বা পদের অনুরূপ কবিতা বা পদ, সূত্রকৃতাঙ্গে, উত্তরাধ্যয়নে এবং দশবৈকালিক সূত্রে পরিদৃষ্ট হয়। এতদ্দৃষ্টে সিদ্ধান্ত হয় যে, ঐ সকল পদ পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও প্রাচীনতম গ্রন্থের আদর্শ পদ, ঐ ভাবে পূর্ব্বাপর প্রযুক্ত হইয়া আসিয়াছে। কেবল পদ বা কবিতা সম্বন্ধে নহে; অসম্পূর্ণ বাক্যাংশ-বিশিষ্ট কতকগুলি গদ্যও ঐরূপ বিক্ষিপ্তভাবে আছে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, টীকাকারগণ ঐ সকল অসম্বদ্ধ পদ ভাঙিয়া চুরিয়া উহার একরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন; আর, তদনুসারে এখন উহার ভাষান্তর হইতেছে। ভাষান্তরে অনেক স্থলে পুনরুক্তি দৃষ্ট হয়। তাহার কারণ, টীকাকারগণকে সূত্র-গ্রন্থের অনেক অসম্পূর্ণ অংশ পূরণ করিয়া লইতে হইয়াছে। কথিত হয়, আচারাঙ্গ-সূত্রের প্রথম শ্রুতস্কন্ধে পূর্ব্বে নয়টী অধ্যয়ন ছিল; তদন্তর্গত মহাপরিন্না অধ্যয়নটী এখন লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন, সেই নবম অধ্যয়নটী এখন সমবায়াঙ্গ, নন্দী, আবশ্যক, নিরুক্তি, বিদ্ধি ও প্রভা প্রভৃতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে। কিন্তু অন্যান্য মতে, উহা অষ্টম অধ্যয়নেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কেহ কেহ আবার এইরূপ মনে করেন যে, মহাপরিন্নার অধ্যয়নে বর্ণিত বিষয় দ্বিতীয় শ্রুতস্কন্ধে বিশেষভাবে আলোচিত আছে; সুতরাং প্রথম শ্রুতস্কন্ধ হইতে ঐ অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। আচারাঙ্গ-সূত্রের দ্বিতীয় খণ্ড চারি অংশে (চুলায়) বিভক্ত। প্রথমে উহাতে পাঁচটী 'চুলা' ছিল বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু পঞ্চম চুলাটী এক্ষণে 'নিসীহিযাজ্ঝন' নামে স্বতন্ত্র গ্রন্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। আচারাঙ্গ সূত্রের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম দুই অংশে আচার-সংক্রান্ত নিয়মাবলী লিখিত আছে। প্রথম খণ্ডের ভাষা হইতে এই দ্বিতীয় খণ্ডের ভাষার স্বাতন্ত্র্য দৃষ্ট হয়। উহা সূত্রাকারে লিখিত নহে; পরন্তু বড়ই জটিল ভাষায় নিবদ্ধ। ঐ অংশে এমন কতকগুলি শব্দ আছে, যাহার অর্থবোধ সন্ন্যাসী ভিন্ন অন্যের পক্ষে দুরূহ; কেন-না, সন্ন্যাসীদের বিশেষ ক্রিয়াপদ্ধতির পরিচয়ে ঐ সকল শব্দ ব্যবহৃত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশে (চুলায়) যে সকল বিষয় লিখিত আছে, সীমন্ধর-নামধেয় পূর্ব্ববিদেহ-নিবাসী অনেক জিন কর্তৃক স্থূলভদ্রের জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর নিকট উহা বিবৃত হইয়াছিল। আচারাঙ্গ-সূত্রের শেষাংশের রচনা সম্বন্ধে যেরূপ উক্তি দেখিতে পাই, কল্পসূত্রের কিয়দংশ সম্বন্ধেও তদ্রূপ

উক্তির প্রচার আছে। বর্ণিতব্য বিষয়ও উভয়ত্র প্রায় অভিন্ন। আচারাঙ্গ-সূত্রের দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় অংশে (চুলায়) মহাবীর স্বামীর জীবন-চরিতের উপাদান আছে। ঐ উপাদান হইতে কল্প-সূত্র লিখিত হইয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। আচারাঙ্গ-সূত্রের অনেক গদ্যাংশ নামমাত্র পরিবর্তিত আকারে কল্প-সূত্রে উদ্ধৃত হইয়াছে দেখিতে পাই। কল্প-সূত্রে বর্ণনার বাহুল্যতা দৃষ্ট হয়; কিন্তু ঐতিহাসিক উপাদান উহাতে বড়ই অল্প। আচারাঙ্গসূত্রের যে সকল অংশ কল্প-সূত্রে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তদতিরিক্ত আচারাঙ্গ-সূত্রের গাথা বা কবিতাগুলি কল্প-সূত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। অপিচ, আচারাঙ্গ-সূত্রের প্রথম শ্রুতস্কন্ধে, অষ্টম অধ্যয়নে আর্য্যাছন্দের যে সকল গাথা আছে, তাহার সহিত শ্রুতস্কন্ধের অন্তর্গত আর্য্যাছন্দে লিখিত গাথা-সমূহের তুলনায় আলোচনা করিলে, উভয়ের মধ্যবর্ত্তী কাল-ব্যবধান বহুবিস্তৃত বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। তৃতীয় চুলার শেষাংশে জৈনগণের পঞ্চ মহাব্রত এবং তাহাদের পঞ্চবিংশতি উপবিভাগ আছে। চতুর্থ চুলায় দ্বাদশ শ্লোকে আত্মার মুক্তি-প্রসঙ্গ উত্থাপিত। ঐ অংশের রচনা প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। আচারাঙ্গ সূত্রের যে সকল টীকা ও ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে শীলাঙ্ক-কৃত টীকাই প্রাচীন বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। ৭৯৮ শকে (৮৭৬ খৃষ্টাব্দে) ঐ টীকা রচনা শেষ হইয়াছিল। টীকার নাম—তত্ত্বখ্যা; বাহরি সাধু ঐ টীকা-রচনায় শীলাঙ্ককে সাহায্য করিয়াছিলেন। আচারাঙ্গ-সূত্রের দ্বিতীয় টীকার নাম—'দীপিকা'। ঐ টীকার রচয়িতার নাম 'জিনহংস সুরি।' 'বৃহৎ খরতরগচ্ছ' নামধেয় জৈন-সম্প্রদায়ের তিনি গুরু ছিলেন। শীলাঙ্কের টীকা এই 'দীপিকায়' যেন বর্ণে-বর্ণে উদ্ধৃত হইয়াছে। দীপিকায় সংক্ষেপে টীকার সারভাগ লিপিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু সে সংক্ষিপ্তীকরণ নামে মাত্র; কেন-না, প্রতি অধ্যয়ন ও উদ্দেশক আরম্ভের সূচনায় নিরুক্তি গাথার উপর শীলাঙ্ক যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, দীপিকায় মাত্র তাহাই পরিত্যক্ত হইয়াছে। আচারাঙ্গ-সূত্রের তৃতীয় টীকা—পার্শ্ব-চন্দ্রের লিখিত 'বালাববোধ'। উহা গুজরাটী ভাষায় লিখিত নির্ঘণ্ট-বিশেষ। দ্বিতীয় অধ্যয়নের কোনও কোনও অংশ পূর্ব্ববর্ত্তী টীকাকারগণ ব্যাখ্যা করিয়া যান নাই। এই নির্ঘণ্ট সেই সকল অংশের ব্যাখ্যায় বিশেষ সহায়তা করে। ইহা প্রাচীন টীকা-সমূহের, বিশেষতঃ 'দীপিকার' অনুসরণকারী।

আচারাঙ্গ-সূত্রের পরই সূত্র-কৃতাঙ্গের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। উহা অঙ্গ-গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্য্যায়ভুক্ত। সূত্র-কৃতাঙ্গের প্রধান লক্ষ্য এই যে, বিভিন্ন বিরুদ্ধ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের গুরুগণের কবল হইতে যুবক যতিগণের আত্মরক্ষায় সামর্থ্যদান। তাঁহারা যাহাতে সত্য-ধর্ম্মে আস্থাবান হন এবং চির-শান্তির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, তৎ-পক্ষে সহায়তা করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। চতুর্থ অঙ্গ-গ্রন্থে যে সার-সঙ্কলন পরিদৃষ্ট হয়, তাহাতে সূত্র-গ্রন্থের ঐরূপ পরিচয়ই দেখিতে পাই। মূলতঃ, ঐরূপ লক্ষ্য থাকিলেও সূত্রকৃতাঙ্গের আলোচ্য বিষয়-সমূহ পর্য্যালোচনা করিলে, উহাতে অন্যান্য নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশ আছে দেখিতে পাই। সূত্র-কৃতাঙ্গে প্রথমে বিভিন্ন বিরুদ্ধ ধর্ম্ম-মতের প্রতিবাদ দৃষ্ট হয়। তৎপরে সাধারণভাবে পবিত্র জীবন-যাপনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত।

সূত্র-কৃতাঙ্গ।

সন্ন্যাস জীবনে কিরূপ বিষম বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিতে হয়, সন্ন্যাসের পথে কিরূপ প্রবল প্রলোভন পরম্পরা বিদ্যমান আছে, অপবিত্র জীবন-যাপনের জন্য কি কঠোর শাস্তি পুরোভাগে অপেক্ষা করিতেছে, আর ধর্ম্মপ্রাণতার আদর্শ-স্থানীয় মহাবীর স্বামীর গুণানুকীর্ত্তন কিরূপভাবে করিতে হয়, প্রথম শ্রুতস্কন্ধে এবম্প্রকার উপদেশ-সমূহ বিন্যস্ত আছে। দ্বিতীয় শ্রুতস্কন্ধে প্রধানতঃ গদ্য প্রবন্ধে প্রথম শ্রুতস্কন্ধে বর্ণিত বিষয়ই কতকটা অবিচ্ছিন্নভাবে লিপিবদ্ধ দেখি। তজ্জন্য এই দ্বিতীয় শ্রুতস্কন্ধকে কেহ কেহ প্রথম শ্রুতস্কন্ধের পরিশিষ্টরূপে পরবর্ত্তী কালের সংযোজিত অংশ বলিয়া মনে করেন। সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণের পরবর্ত্তী চতুর্থ বর্ষে সূত্র-কৃতাঙ্গ পাঠের কিম্বদন্তী প্রচারিত থাকিলেও সূত্র-কৃতাঙ্গের শেষাংশ যুবক যতিগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করেন। ঐ অংশে নানা প্রকার ছন্দ এবং নানা বিষয়ের বর্ণনা দেখিয়া উহা যতিগণের প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিহিত হইয়াছিল বলিয়াও মনে হইতে পারে। তদনুসারে প্রথমাংশের রচয়িতা স্বতন্ত্র ও একাধিক বলিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন। সূত্র কৃতাঙ্গের যে সকল টীকা ও ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে ভদ্রবাহুর নিরুক্তি-সংযুক্ত শীলাঙ্ক-কৃত টীকা প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। শীলাঙ্কের পূর্ব্বেও যে প্রাচীন টীকা প্রচলিত ছিল, শীলাঙ্ক তাহা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। শীলাঙ্ক খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বিদ্যমান ছিলেন, আচারাঙ্গ-সূত্রের টীকা-পরিসমাপ্তি-প্রসঙ্গে তাহার আভাস পাই। 'দীপিকা' নামে সূত্র কৃতাঙ্গের আর এক সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা হর্ষকুল কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল। ১৫৮৩ সম্বতে (১৫১৭ খৃষ্টাব্দে) ঐ টীকা লিখিত হয়। ঐ টীকা ব্যতীত পার্শ্বচন্দ্রের লিখিত 'বালাববোধ' নামক গুজরাটী ভাষার নির্ঘণ্ট সূত্রকৃতাঙ্গের আর এক টীকা-মধ্যে পরিগণিত।

উত্তরাধ্যয়ন—সিদ্ধান্ত-গ্রন্থের শেষ পর্য্যায়ভুক্ত। সূত্রকৃতাঙ্গে যে সকল বিষয় যে উদ্দেশ্যে বর্ণিত হইয়াছে, উত্তরাধ্যয়ন তাহার সহিত সাদৃশ্য-সম্পন্ন। সূত্রকৃতাঙ্গে যাহা সংক্ষেপে আলোচিত, উত্তরাধ্যয়নে তাহা একটু বিশদভাবে ও নৈপুণ্য-সহকারে বিন্যস্ত। যুবা যতিগণকে তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য পালনে উপদেশ দান—উত্তরাধ্যয়নের প্রধান লক্ষ্য। সন্ন্যাস-জীবনের উপযোগিতার উপদেশ-প্রদান ও দৃষ্টান্ত-পরম্পরা-প্রদর্শন, আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশের পথে যে বিঘ্ন-বিপত্তি তাহা হইতে সতর্কী-করণ, যুক্তি-যুক্ত জ্ঞান-বিতরণ প্রভৃতি উত্তরাধ্যয়নের আলোচ্য বিষয়। এই গ্রন্থে কখনও কখনও বিধর্ম্মী সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-নীতির বিষয় উল্লেখ আছে বটে; কিন্তু তৎসম্বন্ধে বাদানুবাদ নাই। ইহাতে মনে হয় যে, ঐ সময়ে বিরুদ্ধবাদী ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা কিছু কমিয়া আসিয়াছিল, এবং জৈন সম্প্রদায়ের ভিত্তি একটু দৃঢ় হইয়াছিল। উত্তরাধ্যয়নের আর একটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়, চেতন ও অচেতন পদার্থ বিষয়ে যুবা যতিগণকে যথার্থ-জ্ঞান দান। গ্রন্থের শেষভাগে ঐ বিষয়ে বিস্তৃত প্রবন্ধ প্রকটিত আছে। উত্তরাধ্যয়নের বিষয়-বিন্যাস-পদ্ধতি অনেকটা শৃঙ্খলা-সম্পন্ন হইলেও ঐ অংশ একই সময়ে একই ব্যক্তির দ্বারা লিখিত হইয়াছিল কিনা, তদ্বিষয়ে মতান্তর আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, যে সকল ভাব-পরম্পরা লিখিত বা

উত্তরাধ্যয়ন।

কথিত আকারে জৈনগণের মধ্যে প্রচারিত ছিল, উত্তরাধ্যয়নে তাহা একটু শ্রেণিবদ্ধ-রূপে সঙ্কলিত হইয়াছে। উত্তরাধ্যয়ন কোন্ সময়ে লিখিত বা বর্ত্তমান আকারে সঙ্কলিত হয়, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। জ্যাকোবি নির্দ্ধারণ করেন যে, খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে উহার সঙ্কলন হওয়া সম্ভবপর। দেবর্দ্ধি জ্ঞানী ৪৫৪ খ্রীষ্টাব্দে জৈনধর্ম্ম-গ্রন্থের সংস্করণ-সঙ্কলন করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে পরিবর্ত্তন-পরিবর্দ্ধন যাহা ঘটিবার ঘটিয়াছিল। কিন্তু সেই হইতে আর পরিবর্ত্তনের কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। উত্তরাধ্যয়নের টীকা-ব্যাখ্যা প্রভৃতির মধ্যে দেবেন্দ্র কৃত টীকাই প্রসিদ্ধ। ১১৭৯ সম্বতে (১১২৩ খ্রীষ্টাব্দে) ঐ টীকা লিখিত হইয়াছিল বলিয়া প্রচার। শান্ত্যাচার্য্য-কৃত বৃত্তির সার-সঙ্কলনে ঐ টীকা লিখিত হয়। উত্তরাধ্যয়নে গুজরাটী নিঘণ্টু এবং লক্ষ্মীবল্লভ-কৃত সূত্রদীপিকা বিশেষ প্রচলিত। 'খরতরগচ্ছ' সম্প্রদায়ভুক্ত লক্ষ্মীকীর্ত্তি জ্ঞানীর শিষ্য বলিয়া লক্ষ্মীবল্লভ পরিচিত। 'অবচূরি' নামে আর এক টীকা উত্তরাধ্যয়নের তাৎপর্য্য-গ্রহণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উত্তরাধ্যয়ন আর সূত্রকৃতাঙ্গ এই দুই গ্রন্থ জৈন-দর্শনের দুই প্রধান সম্পৎ মধ্যে পরিগণিত।

কল্পসূত্র—জৈন-শাস্ত্রের এক ইতিহাস মধ্যে গণ্য বলা যাইতে পারে। কল্পসূত্রে জিনগণের জীবন-বৃত্তান্ত লিখিত আছে; মহাবীর স্বামীর জীবনচরিত তাহাতে পরিবর্ণিত হইয়াছে। পার্শ্ব-দেবের, অরিষ্টনেমীর ও ঋষভদেবের জীবন-গাথা উহাতে লিপিবদ্ধ দেখি। তীর্থঙ্করগণের কাল-ব্যবধান বিষয়ে, স্থবিরগণের নামপর্য্যায় সম্বন্ধে, যতিগণের প্রতিপাল্য বিধি-বিধান বিষয়ে, নানা জ্ঞাতব্য-তত্ত্বে কল্পসূত্র পরিপূর্ণ। ছেদ-সূত্রের অন্তর্গত চতুর্থ গ্রন্থ 'দশশ্রুতস্কন্ধের' অষ্টম অংশে, কল্পসূত্রখানি যেন প্রকারান্তরে অঙ্গীভূত রহিয়াছে। প্রফেসার ওয়েবারের মত এই যে, কল্পসূত্র—দশশ্রুতস্কন্ধের অনুসারী। তিনি আরও বলেন,—কল্পসূত্রে যতিগণের সম্বন্ধে যে বিধিবিধান দৃষ্ট হয়, তাহা ভদ্রবাহু কর্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। স্থবিরদিগের তালিকা বিষয়ে যে কয়েকটী প্রসঙ্গ আছে, তাহা এবং জিনগণের জীবনী প্রভৃতি সম্পাদক দেবর্দ্ধি কর্তৃক সংযোজিত হইয়াছিল মনে করা যাইতে পারে। জিনদিগের জীবন-চরিতের ভাষা এবং যতিদিগের প্রতিপাল্য নিয়মাবলীর ভাষা তুলনায় আলোচনা করিলে, প্রথমোক্ত হইতে শেষোক্তের আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন হয়। আচারাঙ্গ-সূত্রের প্রথম দুইটী 'চুলার' ভাষার সহিত তৃতীয় 'চুলার' ভাষার যে পার্থক্য, এ ক্ষেত্রেও তদ্রূপ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। জিনদিগের জীবন-বৃত্তান্ত কল্পসূত্রে অতি সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত বলিয়া কেহ কেহ কল্পসূত্রের আধুনিকত্ব খ্যাপন করেন। কিন্তু তাহা যুক্তি-যুক্ত বলিয়া মনে হয় না। কেন-না, ঐ অংশ জীবন-চরিত বর্ণন উদ্দেশ্যে লিখিত হয় নাই; পরন্তু উপাসনার সময় তীর্থঙ্করগণকে সম্বোধন করাই ঐ অংশের লক্ষ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। শুভ মুহূর্ত্তে 'কল্যাণক' আবৃত্তির প্রথা আছে। জিন জীবন চরিত আবৃত্তি সেই কল্যাণকের অন্তর্গত। 'চতুর্বিংশতি-তীর্থঙ্কর-নাম-পূজা' নামক গ্রন্থে জিনগণের পূজাপদ্ধতি এবং স্তোত্র প্রভৃতি নিবদ্ধ আছে। তাহা স্মরণ করিলে, পূর্ব্বোক্ত সংক্ষিপ্ত

জীবনবৃত্তের উপযোগিতা উপলব্ধি হয়। কল্পসূত্র জৈনদিগের বড়ই আদরের গ্রন্থ। জৈনদিগের মধ্যে একটি প্রথা আছে যে, প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে আট দিবস কাল জৈনসঙ্ঘ ক্ষেত্রে জৈনাচার্য্যগণকে প্রসিদ্ধ জৈনগ্রন্থ সকল পাঠ করিতে হয়। সেই আট দিনের মধ্যে পাঁচ দিবস কাল কল্পসূত্র পাঠ বিধেয়। কল্পসূত্র-পাঠের যে ফলশ্রুতি লিখিত আছে—তাহার মর্ম্ম এই যে, কল্পসূত্রের অধ্যয়নই মুক্তিপ্রদ। সে ফলশ্রুতিতে আরও প্রকাশ, জগতের গ্রন্থ-সমূহের মধ্যে কল্পসূত্রই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। কল্পসূত্র তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন, সংসারে অর্হতের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা নাই, মুক্তির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদ নাই, আর কল্পসূত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ নাই। কল্পসূত্রের চারিখানি টীকা বিশেষ প্রচলিত। যশোবিজয়-কৃত সংস্কৃত টীকা এবং দেবীচন্দ্রকৃত গুজরাটী অনুবাদ কল্পসূত্র পাঠের প্রধান সহায়। 'জ্ঞান-বিমল' ও 'সময়-সুন্দর' নামে কল্পসূত্রের অপর দুইটি টীকা গুজরাট অঞ্চলে প্রচলিত আছে। প্রধানতঃ সেই দুই টীকার উপর নির্ভর করিয়াই দেবীচন্দ্রের গুজরাটী অনুবাদ লিখিত হইয়াছিল।

অন্যান্য অঙ্গ-গ্রন্থের মধ্যে স্থানাঙ্গ, জ্ঞাতৃধর্ম্মকথাঙ্গ, অন্তকৃর্দ্দশাঙ্গ, প্রশ্নব্যাকরণাঙ্গ, বিপাকসূত্রাঙ্গ, উপাসকদশাঙ্গ (উপাসক-অধ্যয়নাঙ্গ) প্রভৃতি গ্রন্থ শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় সম্প্রদায়েরই আদরণীয়। ঐ সকল গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইরূপ প্রদত্ত হইয়া থাকে;—(১) স্থানাঙ্গ-সূত্রে দ্রব্য ও বস্তুর বিচার-পদ্ধতি, (২) জ্ঞাতৃধর্ম্মকথাঙ্গ-সূত্রে ধর্ম্ম সম্বন্ধে তীর্থঙ্করগণের ও গণধর-গণের আলোচনা, (৩) উপাসকদশাঙ্গ-সূত্রে দিগম্বরগণের ধর্ম্মকর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ, (৪) অন্তকৃর্দ্দশাঙ্গে চতুর্ব্বিংশ তীর্থঙ্করের অনুসরণে কেবলীদশকের ইতিবৃত্ত, (৫) অনুত্তরোপপাতিক দশাঙ্গে যোগিদশকের ইতিবৃত্ত, (৬) প্রশ্নব্যাকরণাঙ্গে দ্বিবিধ প্রশ্নোত্তর, (৭) বিপাক-সূত্রাঙ্গে সদসৎ কর্ম্মফল-বিবৃতি প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা আছে। আর আর যে সকল জৈনধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রচলিত, তৎসমুদায়ে বিবিধ বিদ্যার বিবরণ বিবৃত দেখি। আত্মার বিষয়, কর্ম্মের বিষয়, মুক্তির বিষয়, গ্রহনক্ষত্রাদির বিষয়, ছন্দ অলঙ্কার কাব্যাদির বিষয় এবং তন্ত্রমন্ত্র ইন্দ্রজাল ঔষধাদির বিষয় পূর্ব্বাদি বিভাগ-সমূহে বিবৃত রহিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ তন্ত্রাদির মধ্যে যেমন সকল জ্ঞাতব্য বিষয়েরই আলোচনা দৃষ্ট হয়, জৈন-শাস্ত্রের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যেও তদ্রূপ আবশ্যক বিষয়ের আলোচনা আছে।

অন্যান্য অঙ্গ গ্রন্থ।

জৈনধর্ম্ম-সংক্রান্ত আর আর যে সকল গ্রন্থ আছে, তৎসমুদায় পট্টাচার্য্যগণের এবং পট্টধর সূরিগণের লিখিত। পট্টাচার্য্যগণ ও সূরিগণ জৈনধর্ম্ম সম্প্রদায়ের আচার্য্য মধ্যে পরিগণিত। ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইলে, বিভিন্ন শাখার পট্টাচার্য্য, পট্টধর বা সূরি পদে বিভিন্ন মহাপুরুষ অভিষিক্ত হইয়া-ছিলেন। মহাবীরের পরবর্ত্তী ভদ্রবাহু পর্য্যন্ত ছয় জন জৈনাচার্য্য 'শ্রুতকেবলী' সংজ্ঞায় অভিহিত হইতেন। শ্রুতকেবলী নামের সার্থকতায় এই বুঝা যায় যে, তাঁহারা কেবল-জ্ঞান (পূর্ণজ্ঞান) লাভ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের নিকট শ্রুত বাক্যই শ্রুতি বা শাস্ত্র মধ্যে গণ্য হইয়াছিল। যাঁহারা কেবলী, তাঁহারা পূর্ণতাসম্পন্ন;

জৈনাচার্য্য ও জৈনগ্রন্থকারগণ।

তাঁহাদের বাক্যই শ্রুতি; তাঁহারা অপরের নিকট হইতে যে কোনও জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, তাহা বলেন না। তাঁহাদের বাক্য জ্ঞানাধার। শ্রুতকেবলিগণ পূর্ব্বরর্ত্তী জিনগণের নিকট শ্রুত জ্ঞান প্রকাশ করেন না; তাঁহাদের বাক্য আপ্তবাক্য। মহাবীর স্বামীর পাটে যাঁহারা উপবেশন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সাধারণতঃ পট্টাচার্য্য বলিয়া পরিচিত হন। সেই পট্টাচার্য্যগণের প্রথম ছয় জন শ্রুতকেবলী। * তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী মহাবীরের প্রথম শিষ্য ইন্দ্রভূতি বা গৌতম 'কেবলী' হইয়াছিলেন। মহাবীর-প্রমুখ তীর্থঙ্করগণ কেবলীর আদর্শ। 'সূরি' সংজ্ঞা-লাভের ইতিবৃত্ত এই যে, পট্টধরগণের মধ্যে সুহস্তী, সুস্থিত ও সুপ্রতিবদ্ধ কোটি 'সূরি' মন্ত্র জপ করিয়া পট্টধর পদ প্রাপ্ত হন। তদবধি পট্টধরগণের মধ্যে সূরি সংজ্ঞা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পট্টাচার্য্যগণ ও সূরিগণ বহু শাস্ত্রগ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কৃত টীকা ও ব্যাখ্যা প্রভৃতির দ্বারাও জৈনশাস্ত্রসম্পৎ বহুগুণে পরিপুষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সকল গ্রন্থ এখন অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। যাহা প্রচলিত আছে, তাহারও অনেকগুলি দুষ্প্রাপ্য। সুতরাং এতৎপ্রসঙ্গে কয়েক জন গ্রন্থকারের নাম এবং তাঁহাদের রচিত গ্রন্থের উল্লেখ মাত্র করিয়াই আমাদিগকে তৃপ্ত হইতে হইবে। শয্যম্ভব স্বামী, পঞ্চম পট্টাচার্য্য বলিয়া পরিচিত। "দশবৈকালিক-সূত্র" তাঁহারই রচিত। ভদ্রবাহু ষষ্ঠ পট্টাচার্য্য ও শেষ শ্রুতকেবলী ছিলেন। প্রচার আছে, কল্পসূত্র তাঁহারই রচিত। ব্যবহার-সূত্র ও দশশ্রুতস্কন্ধ, ধর্ম্মশাস্ত্রদ্বয় তৎকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়। আচারাঙ্গ, সূত্রকৃতাঙ্গ, আবশ্যকসূত্র, দশবৈকালিক সূত্র, উত্তরাধ্যয়নসূত্র, সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তি উপাঙ্গ, ব্যবহার ছেদসূত্র প্রভৃতির নির্য্যুক্তি প্রণয়ন করিয়া তিনি জৈনসাধারণের পূজ্য হন। তাঁহার রচিত বৃহজ্জ্যোতিষ, উপসর্গহর-স্তোত্র, ভদ্রবাহু-সংহিতা প্রভৃতিও সুপ্রসিদ্ধ। তাঁহার পর, স্থূলভদ্রের নাম উল্লেখ হয়। তিনি সপ্তম পট্টধর। উত্তরাধ্যয়ন-সূত্রের এবং আবশ্যক ছেদশাস্ত্রের বৃত্তি প্রণয়ন করিয়া তিনি অশেষ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। জৈনগণের সম-সাময়িক ইতিহাস তাহার পরিশিষ্ট-পর্ব্বে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অষ্টম এবং নবম পট্টাচার্য্যদ্বয় (উমাস্বাতী ও শ্যামাচার্য্য) যথাক্রমে তত্ত্বার্থাদি সূত্র ও পন্নবণাসূত্র রচনা করিয়াছিলেন। শ্যামাচার্য্য প্রথম কালিকাচার্য্য নামে প্রখ্যাত ছিলেন। কালিকাচার্য্যের পর কিছুকাল পট্টাচার্য্য-পদ লইয়া বিরোধ-বিতণ্ডা চলিয়াছিল। পরিশেষে চাণক্য-চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয় হয়। তখন জৈনশাস্ত্র-সাহিত্য আর এক অভিনব পথ পরিগ্রহ করে। একাল পর্য্যন্ত জৈনশাস্ত্রসমূহ সাধারণতঃ অর্দ্ধ-মাগধী বা প্রাকৃত ভাষায় রচিত হইয়া আসিতেছিল। ইহার পর সংস্কৃত ভাষায় জৈনশাস্ত্র রচনার প্রতি অনেকের আগ্রহ জন্মিয়াছিল। জৈনদিগের মধ্যে একটী কিম্বদন্তী আছে যে, সাধু সিদ্ধসেন সংস্কৃত ভাষায় জৈনশাস্ত্র সঙ্কলন করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে সে কার্য্য দোষাবহ বোধে, তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। এই সিদ্ধসেন, এক শক-রাজ্যের উচ্ছেদকারী বিক্রমাদিত্যের গুরু ছিলেন বলিয়া প্রকাশ। কিম্বদন্তীর মূলে যাহাই থাকুক, জৈনগণের পূজা-মন্ত্রাদিতে যে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার আছে, তাহা অতি প্রাচীন কাল হইতে দেখিতে পাই। অপিচ, বৌদ্ধধর্ম্ম

* কোনও মতে,—সুধর্ম্ম ও তাঁহার শিষ্য জম্বুস্বামী পর্য্যন্ত আচার্য্যগণ 'কেবলী' ছিলেন। তারপর, প্রভব স্বামী, শ্যামভদ্র সূরি, যশোভদ্র সূরি, সম্ভূতিবিজয় সূরি, ভদ্রবাহু সূরি, স্থূলভদ্র সূরি—এই ছয় জন শ্রুতকেবলী।

যেমন পালি-ভাষার মধ্য দিয়া প্রচলিত হইয়াছিল, জৈন-ধর্ম্ম সেইরূপ প্রাকৃত-ভাষার সহায়তায় জন-সাধারণের মধ্যে প্রসার-লাভ করিয়াছিল। সেই প্রাকৃত-ভাষা অর্দ্ধ-মাগধী ভাষা নামেও অভিহিত হয়। একই ভাষা বিভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রচলিত দেখিতে পাই। ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ভাষা যে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, তাহা স্বতঃ-প্রত্যক্ষীভূত। পরন্তু, একই সময়ে দেশ-ভেদে এবং উচ্চ-নীচ বর্ণভেদে ভাষার রূপান্তর দৃষ্ট হয়। সেই কারণে পালি-ভাষারও বিভিন্ন মূর্ত্তি, এবং প্রাকৃত-ভাষারও বিভিন্ন মূর্ত্তি দেখিতে পাই। কালিদাসের শকুন্তলা প্রভৃতি নাটকে যে প্রাকৃত-ভাষা ব্যবহৃত, শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক নাটকের প্রাকৃত-ভাষা তাহা হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন। সেই হিসাবে জৈন-শাস্ত্রের প্রাকৃত আরও অধিক পার্থক্য-সম্পন্ন। এক সময়ে পালি ও প্রাকৃত দুইটী প্রাদেশিক ভাষা ছিল। প্রাদেশিক ভাষা যেমন সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ভাবে উচ্চারিত হয়, ঐ দুই ভাষার বিভিন্নরূপ আকৃতি-গঠন দেখিয়া সেইরূপ বিভিন্ন স্তরে প্রচলিত ভাষা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। জৈন-ধর্ম্মের কোনও কোনও গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত হইলেও প্রাকৃত ভাষাই জৈনধর্ম্ম-গ্রন্থের সহিত বিশেষভাবে সম্বন্ধযুক্ত। বৌদ্ধধর্ম্ম যেমন পালি-ভাষাকে রক্ষা করিয়া গিয়াছে, জৈন-ধর্ম্ম সেইরূপ প্রাকৃত-ভাষাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। অতীতসাক্ষী কাল কত দেশের, কত জাতির, কত ভাষার অভ্যুত্থান ও তিরোধান প্রত্যক্ষ করিল; কিন্তু ধর্ম্মের সহিত যে সকল ভাষা অঙ্গীভূত হইতে পারিল, তাহারাই রহিয়া গেল। অপর যে সব জলবুদ্বুদ, কাল-সাগরে বিলীন হইল।

জৈন সাহিত্যের যে সকল গ্রন্থ এখন আদর প্রাপ্ত হইতেছে, তাহার প্রায় সকলগুলিই ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। আর সে সকল গ্রন্থ প্রায়ই জৈনাচার্য্যগণ লিখিয়া গিয়াছেন। অতি প্রাচীন তদ্রূপ কয়েকখানি গ্রন্থের উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। উপসংহারে সংক্ষেপে জৈন-গ্রন্থকারগণের একটী ধারাবাহিক বিবরণ প্রদান করিবার চেষ্টা পাইতেছি।

অন্যান্য জৈন-ধর্ম্ম-গ্রন্থ।

মহাবীর স্বামী কোনও গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ নাই। গৌতম, সুধর্ম্ম, জম্বু, প্রভব প্রভৃতি কর্ত্তৃক যে কোনও গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহারও উল্লেখ দেখি না। গ্রন্থ-রচনা সম্বন্ধে প্রথম উল্লেখ দেখি— শয্যম্ভব স্বামীর নাম; (১) শয্যম্ভব স্বামী দশবৈকালিক সূত্র রচনা করেন। রাজ-গৃহে বাৎস্য গোত্রে তাঁহার জন্ম। মহাবীর স্বামীর মোক্ষলাভের পরবর্ত্তী ৯৮ম বর্ষে তাঁহার মোক্ষলাভ হয়। তাঁহার আয়ুষ্মান বাষট্টি বৎসর। তন্মধ্যে ২৮ বৎসর গৃহবাস, ১১ বৎসর ব্রতস্থ এবং ২৩ বৎসর 'কেবলী' বা 'যুগপ্রধান' বা 'আচার্য্য' পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মহাবীর হইতে ইনি পঞ্চম এবং সুধর্ম্ম হইতে চতুর্থ পর্য্যায়ে অবস্থিত। (২) ভদ্রবাহু বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; তৎসমুদায়ের উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। কল্পসূত্র তাঁহারই রচনা বলিয়া প্রকাশ। ইঁহার আয়ুষ্মান্ ৭৬ বৎসর; তন্মধ্যে ইনি ৪৫ বৎসর গৃহবাসী, ১৭ বৎসর ব্রতস্থ এবং ১৪ বৎসর আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মহাবীর স্বামীর মোক্ষলাভের ১৭০ম বর্ষে ইঁহার মোক্ষলাভ হয়। ইনি প্রাচীন গোত্রজ বলিয়া বৃহৎ খরতরগচ্ছের * পট্টাবলীতে

* পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জৈনগণের মধ্যে বিভিন্ন গচ্ছ বা শাখা আছে। আদিভূত কয়েক জন আচার্য্যের

প্রকাশ আছে। (৩—৪) উমাস্বাতী এবং শ্যামাচার্য্যের তত্ত্বার্থাদিসূত্র ও পন্নবণাসূত্র গ্রন্থদ্বয়ের নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। (৫) আর্য্যরক্ষিত সূরি—জৈনশাস্ত্র-সমূহের চারি অনুযোগ নির্দ্ধারণ করেন। সেই চারি অনুযোগ বা বিভাগের নাম—কালিকশ্রুত, ঋষি-ভাষিত, সূর্য্য-প্রজ্ঞপ্তি ও দৃষ্টিপদ। (৬) মানদেব 'শান্তিস্তব' প্রণয়ন করেন। ইনি একবিংশ পট্টধর পর্য্যায়ে অবস্থিত, এবং মালবাধিপতি বয়র সিংহের অমাত্য বলিয়া অভিহিত। (৭) মানতুঙ্গ সূরি 'ভক্তামরস্তোত্র' প্রণয়ন করেন। (৮) কালিকাচার্য্য বা শ্যাম; ইনি 'প্রজ্ঞাপনা' রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। (৯) জিনেচন্দ্র—চল্লিশ পর্য্যায়ভুক্ত পট্টধর, 'সংবেগ-রঙ্গশালা' গ্রন্থের রচয়িতা। (১০) অভয়দেব—তৃতীয় হইতে একাদশ অঙ্গের টীকাকার বলিয়া প্রসিদ্ধ। (১১) জিনবল্লভ—৪২ পট্টধর পর্য্যায়ে অবস্থিত; ইনি পিণ্ড বিশুদ্ধি-প্রকরণ, বর্দ্ধমানস্তব, কর্ম্মগ্রন্থ, কর্ম্মাদি-বিচারসার, ষড়শীতি প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইনি ছয় মাস সূরি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। (১২) জিনদত্ত—ইনি ৪৩শ পর্য্যায়ে সূরি পদে অধিষ্ঠিত হন। বিবেক-বিলাস, সন্দেহ-দোহাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ রচনায় ইনি প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। (১৩) জিনপ্রবোধ—৪৭ সূরি পর্য্যায়ভুক্ত। পঞ্জিক-দুর্গপদ-প্রবোধ টীকা রচনায় ইনি 'কাতন্ত্রবৃত্তিবিবরণপঞ্জিকার' ব্যাখ্যা করেন। (১৪) মুনিচন্দ্র সূরি—মতান্তরে ইনি ৪২শ পট্টধর; ইঁহার প্রণীত উপদেশপদবৃত্তি, যোগবিন্দুবৃত্তি এবং অনেকান্ত-জয়পতাকা প্রভৃতির টীকা প্রসিদ্ধ। (১৫) হেমচন্দ্র সূরি—ইনি শান্তিপাপচরিত্র রচয়িতা দেবেন্দ্র-সূরির শিষ্য। ইনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহার বিরচিত অভিধান-চিন্তামণি, প্রাকৃত ব্যাকরণ, ত্রিষষ্টি-শলাকা, পুরুষচরিত প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ। হেমচন্দ্র কৃত রামায়ণ, লিঙ্গানুশাসন ও শীলঙ্ক প্রভৃতিও আদরণীয়। হেমচন্দ্র কৃত অভিধান-চিন্তামণি—সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এবং উহাতে জৈন-ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যবহৃত সমস্ত শব্দ সংগৃহীত। জৈনশাস্ত্র পাঠ করিতে হইলে ঐ অভিধান বিশেষ প্রয়োজনীয়। হেমচন্দ্র শ্বেতাম্বর-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার দ্বারা জৈন-ধর্ম্মের বহুল প্রচার হয়। ৮৪ বৎসর বয়সে তিনি নির্ব্বাণ লাভ করেন। পাটলিপুত্র তাঁহার জন্মস্থান এবং গুজরাট তাঁহার লীলাক্ষেত্র। গুজরাটের ইতিহাস 'রাসমালায়' হেমচন্দ্রের জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। তদনুসারে তাঁহার প্রকৃত নাম—চংদেব; তাঁহার পিতার নাম চাচিঙ্গ ও মাতার নাম পাহিনী দেবী। মাতৃদেবীর অভিপ্রায়ক্রমে হেমচন্দ্র জৈন-ধর্ম্মে দীক্ষিত

প্রাধান্য সকল শাখাই মান্য করেন। পরিশেষে, শাখা-বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে, বিভিন্ন গচ্ছের বিভিন্ন আচার্য্যের (পট্টধরের) প্রাধান্য পরিকীর্ত্তিত হয়। বৃহৎ খরতরগচ্ছ, তপাগচ্ছ, সরস্বতীগচ্ছ, সুবিহিতগচ্ছ, বনবাসী গচ্ছ, বৃহৎ-গচ্ছ প্রভৃতি বিভিন্ন গচ্ছের বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। ষোড়শ পট্টধর বজ্রসেন সূরির সময়ে, নগেন্দ্র, চন্দ্র, নিবৃত্ত ও বিদ্যাধর—তাঁহার এই চারিটী শিষ্যের অধিনায়কত্বে চারিটী গচ্ছ সৃষ্ট হয়। চন্দ্রসূরির পদে সামন্তভদ্র অভিষিক্ত হইলে চন্দ্রগচ্ছের নাম 'বনবাসী গচ্ছে' পরিবর্ত্তিত হয়। সামন্তভদ্র বনবাসে জীবনযাপন করিতেন; তদনুসারে ঐ নাম হইয়াছিল। উদ্যোতন যখন সূরিপদে অধিষ্ঠিত, তখন আটটী প্রধান আচার্য্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সম্প্রদায় বনবাসী গচ্ছ 'বৃহৎ গচ্ছ' নামে পরিচিত হয়। পট্টধর অজিতদেবের সময়ে খরতর-গচ্ছের উৎপত্তি হইয়াছিল। ১২০৪ সম্বতে এই গচ্ছের উৎপত্তি হয়। জগচ্চন্দ্র সূরির সময়ে, তাঁহার দ্বাদশবর্ষব্যাপী তপস্যার ফলে, বৃহৎগচ্ছ-সম্প্রদায় তপাগচ্ছ নামে পরিচিত হইয়াছিল। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন গচ্ছের উৎপত্তির বিবরণ অবগত হওয়া যায়।

হন। জৈন-ধর্ম্ম-গ্রহণে গৃহত্যাগী হওয়ায় পিতা চংদেব তাঁহার অনুসন্ধানের জন্য রাজ-দরবারে আবেদন করেন। রাজা কুমারপাল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, মন্ত্রী উদয়ন তাঁহাকে রাজসকাশে উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু মন্ত্রীর গৃহে জৈন-শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া হেমচন্দ্র এতদূর অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন যে, তাঁহার বাক্যাবলী শ্রবণে রাজা বিমুগ্ধ হন; আর সেই সময় হেমচন্দ্র আচার্য্যপদে অভিষিক্ত হন। যাহা হউক, জৈন-গ্রন্থকারগণের মধ্যে হেমচন্দ্র যে এক প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছেন, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। ১২২৯ সংবতে হেমচন্দ্র নির্ব্বাণ লাভ করেন। (১৬) দেবেন্দ্র সুরি—৪৫শ পট্টধর বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন; ঋষভবর্দ্ধনপ্রমুখ-স্তবন, সুদর্শনচরিত্র, বৃন্দারু-বৃত্তি, ত্রিভাষ্য প্রভৃতি। (১৭) ধর্ম্মঘোষ সুরি—চব্বিশ তীর্থঙ্করের স্তব এবং কায়স্থিতি-ভবস্থিতি প্রভৃতি গ্রন্থ রচনায় ইনি প্রসিদ্ধ। (১৮) সোমপ্রভ সুরি—ইনি আরাধনাসূত্র, জিনকল্পসূত্র প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থের রচয়িতা। (১৯) সোমতিলক সুরি; ইনি কতকগুলি স্তবের বৃত্তি রচনায় যশস্বী হন। আর আর সুরিগণের মধ্যে (২০-২৬) চন্দ্রশেখর, জয়ানন্দ, জ্ঞানসাগর, কুলমণ্ডন, সোমসুন্দর, মুনিসুন্দর, রত্নশেখর, প্রমুখ জৈনাচার্য্যগণ নানা ধর্ম্মগ্রন্থ ও টীকা প্রভৃতি প্রণয়ন করেন। জিনকীর্ত্তি, জিনকুশল, জিনচন্দ্র, জিনচন্দ্রগণি, জিনপতি, জিনপুত্র, জিনসেন সুরি প্রভৃতি আরও বহু জৈন-গ্রন্থকারগণের প্রতিষ্ঠা আছে। যাহা হউক, সকল জৈন-শাস্ত্রের সার—আগম, সিদ্ধান্ত বা কল্পশাস্ত্র; আবার তদন্তর্গত কতকগুলি বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের নিকট বিশেষভাবে সম্পূজিত। উপসংহারে একখানি গ্রন্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে পারি। সেখানি শ্বেতাম্বর জৈনগণের আরাধনার সামগ্রী—'ভগবত্যঙ্গ'। ব্রাহ্মণগণের বেদের ন্যায় উহা জৈনগণের পূজনীয়।* ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদ-সাধনের পর বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রন্থসমূহকে বিদেশে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। অধুনা বৃটিশ রাজত্বের সাম্যনীতির সহায়তা প্রভাবে, অপিচ, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনুসন্ধিৎসার ফলে, তৎসমুদায় পুনরায় ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। অঞ্চলের ধন হারানিধি ফিরিয়া পাইলে জননীর যেমন আনন্দের অবধি থাকে না, ভারতের বিলুপ্তপ্রায় রত্নের—বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-গ্রন্থসমূহের—পুনরাবির্ভাবে ভারতের এখন সেই আনন্দ। জৈনশাস্ত্র-সাহিত্য সম্পর্কেও অনেকাংশে সেই আনন্দেরই অনুভূতি হয়। ধর্ম্ম-বিপ্লবের পর ধর্ম্ম-বিপ্লবের অভিঘাতে জৈনশাস্ত্র-সাহিত্য বহুকাল পর্য্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া ছিল। ভারতের বহির্ভাগে বিক্ষিপ্ত না হইলেও বিভিন্ন ধর্ম্মবিপ্লবের মধ্যে জৈনধর্ম্মকে যে অতি মলিনভাবে দিন-যাপন করিতে হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু বলিয়াছি তো, বৃটিশ রাজত্বের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনুসন্ধানের ফলে, খনি-গর্ভস্থ মণির ন্যায় প্রকাশ পাইয়া, উহা আবার জ্যোতিঃ-বিস্তারে সমর্থ হইয়াছে।

* ভগবত্যঙ্গের অন্ত পরিচয় স্থানান্তরে দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:§:—

জৈনধর্ম্মের আদি-স্তর।

[আদি-ধর্ম্মের অনুসন্ধানে ;—জৈন-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাকালে বিভিন্ন দার্শনিক মত—জৈন-ধর্ম্মশাস্ত্রে তৎকাল-প্রচলিত চতুর্ব্বিধ দার্শনিক মতের উল্লেখ ;—বিরুদ্ধ মতের সামঞ্জস্য-সাধনে স্যাদ্বাদের প্রতিষ্ঠা ;—স্যাদ্বাদ,—তাহার মূল তত্ত্ব ;—জৈন-ধর্ম্মের আদি-স্তর ;—ক্রিয়াবাদ ও অক্রিয়াবাদ প্রসঙ্গে ভারতীয় দর্শনের সম্বন্ধ-তত্ত্ব নিরূপণ।]

জৈনধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম উভয়ে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইলেও প্রকৃত কোন্ সময়ে ঐ দুই ধর্ম্মের বীজাঙ্কুর উদ্গত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কাল অনন্ত, মানুষের ধারণাশক্তি সীমাবদ্ধ। অনন্ত কালসাগরে যে অনন্ত প্রবাহ বহিয়াছে, কে তাহার পরিমাণ করিতে সমর্থ? সান্ত হৃদয়ে অনন্তের ধারণা হয় না বলিয়াই মানুষ পূর্ব্বাপর পর্য্যায় অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে না। এ ক্ষেত্রে প্রায়ই নিকটের একটা রেখা বা স্তর অবলম্বন করিয়া মানুষ অতীতের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে। জৈনধর্ম্মের ও বৌদ্ধধর্ম্মের আদি অনুসন্ধান করিতে গিয়া গবেষণা পর্য্যুদস্ত হওয়ায়, প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহাসিকগণ মহাবীর স্বামী হইতে জৈনধর্ম্মের এবং শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অথচ, ঐ দুই ধর্ম্মের বীজাঙ্কুর অতীতের বহু দূরে স্বতঃমুঞ্জরিত দেখিতে পাই। আর, সেই জন্যই, কোন্‌টী পূর্ব্ববর্ত্তী ও কোন্‌টী পরবর্ত্তী, কোন্‌টী মূল ও কোন্‌টি কাণ্ড, তাহা নির্দ্ধারণ পক্ষে সর্ব্বদা বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। সে বিতণ্ডা সর্ব্বথা নিরসন হইবার নহে। সুতরাং, স্থূলভাবে সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া, সর্ব্বপ্রকার দৃষ্টির অন্তরালভূত অবস্থা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য বৃথা প্রয়াস না পাইয়া, অধুনা যাহা সাধারণের জ্ঞান-গম্য হইতে পারে, তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে। ফলতঃ, জৈনধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম, উভয়েই অতি প্রাচীন-কালের ধর্ম্ম হইলেও উহাদের শেষ অভ্যুদয়-কাল হইতে ক্রমবিকাশ ও বিস্তৃতির বিষয় মাত্র আলোচ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দৃষ্টি-সীমার অন্তর্ভূত, ধ্যান-ধারণার বিষয়ীভূত উভয় ধর্ম্মের সেই শেষ অভ্যুদয়-কালের ইতিবৃত্ত যদি তুলনায় সমালোচনা করি, তাহা হইলে একটী বিষয় বিশদ বোধগম্য হয়। জৈন-ধর্ম্ম আদি, কি বৌদ্ধ-ধর্ম্ম আদি, তাহাতে সে সংশয় দূরীভূত হইয়া যায় ; অপিচ, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম হইতে যাঁহারা জৈন-ধর্ম্মের উৎপত্তির বিষয় নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদের ভ্রম-সংশয় অপনীত হয় ; এবং পরিশেষে সেই সনাতন হিন্দু ধর্ম্মই সকলের মূলীভূত বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।

যুগে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব বিদ্যমান থাকিলেও জৈনধর্ম্মের ও বৌদ্ধধর্ম্মের ক্রম-বিকাশ-তত্ত্ব গভীর অনুসন্ধানের বিষয়। পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে নানা প্রকার গবেষণার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। কি প্রকারে, কি অবস্থায়, জৈনধর্ম্ম প্রতিষ্ঠান্বিত হয়, তাহা অনুসন্ধান করিতে হইলে তাৎকালিক সমাজ-ধর্ম্মের অবস্থার বিষয় অনুসন্ধান করা আবশ্যক। জৈনশাস্ত্র-গ্রন্থ আলোড়ন করিয়াই অনুসন্ধিৎসুগণ তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের প্রয়াস পাইয়াছেন। বুদ্ধদেবের আবির্ভাব কালে ভারতবর্ষে তাঁহার বিরুদ্ধবাদী যে কত ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ছিল, বৌদ্ধধর্ম্ম শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ আছে। জৈনধর্ম্ম-শাস্ত্রেও তৎকাল-প্রচলিত বিরুদ্ধ দার্শনিক মতের আভাষ পাই; যে সকল বিরুদ্ধ দার্শনিক মত খণ্ডন করিয়া জৈনধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়, সূত্রকৃতাঙ্গে তৎসমুদায়কে চারি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে দুইটীকে জড়বাদ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সেই দুই শ্রেণীর একের মত এই যে, দেহ এবং আত্মা অভিন্ন এবং একই বস্তু। অপর শ্রেণীর মত এই যে, পঞ্চভূত অনন্ত এবং তাহাতেই সমস্ত সংগঠিত। এই দুই মতের অনুবর্ত্তী জনের বিশ্বাস,—প্রাণিহত্যায় কোনও পাপ নাই। 'সামঞ্ঞফল-সুত্ত' গ্রন্থে প্রকাশ,—পূরণকশ্যপ এবং অজিত-কেশকম্বলি যথাক্রমে ঐ দুই মতের প্রচারক ছিলেন। পূরণকশ্যপ পাপ-পুণ্য অস্বীকার করিতেন। অজিতকেশকম্বলি বলিতেন যে, উৎকর্ষ লাভ সম্বন্ধে দেশ-প্রচলিত মত ভিত্তিহীন, অর্থাৎ তিনি অদৃষ্ট বা জন্মান্তর উড়াইয়া দিতেন। অধিকন্তু তিনি ঘোষণা করিতেন,—'মনুষ্যের উপাদান—ভূতচতুষ্টয়; যখন মৃত্যু হয়, মৃত্তিকার অংশ মৃত্তিকায়, জলীয় অংশ জলে, অগ্নির অংশ অগ্নিতে, বায়ুর অংশ বায়ুতে এবং ইন্দ্রিয়-গ্রাম ব্যোমে (আকাশে) বিলীন হয়। মৃত্যুর পর, বাহক-চতুষ্টয়ে শবাধারে রক্ষিত মৃত দেহ সৎকারার্থ লইয়া যায়; কত বিলাপ করে; পরিশেষে, সকলই ভস্ম হইয়া যায়।' সূত্রকৃতাঙ্গে বিভিন্ন জড়বাদী সম্প্রদায়ের পরিচয়-প্রসঙ্গে অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। * এক সম্প্রদায়ের জড়বাদিগণ, আত্মাকে পঞ্চভূতের অতীত এক অক্ষয় বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ

জৈনধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা-কালে বিভিন্ন দার্শনিক মত।

---

* দেহ-নাশের সঙ্গে সঙ্গে যে সকলই শেষ হয়, এই মতের পরিচয় উপলক্ষে সূত্রকৃতাঙ্গে যাহা লিখিত আছে, তাহার ইংরাজী অনুবাদ এইরূপ দৃষ্ট হয়,—"Upwards from the soles of the feet, downwards from the tips of the hair on the head, within the skin's surface is (what is called) Soul, or what is the same, the Atman, The whole soul lives; when this (body) is dead, it does not live. It lasts as long as the body lasts, it does not outlast the destruction (of the body). With it (*viz*, the body) ends life. Other men carry it (the corpse) away to burn it. When it has been consumed by fire, only dove-coloured bones remain, and the four bearers return with the hearse to their village. Therefore there is and exists no (soul different from the body). Those who believe that there is and exists no such (soul), speak the truth. Those who maintain that the Soul is something different from the body cannot tell whether the Soul (as separated from the body) is long or small, whether globular or circular or triangular or square or sexagonal or

করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত এই যে,—উহা এক আদি দার্শনিক মতের পরিণতি। যাহা এখন বৈশেষিক মত বলিয়া পরিচিত, ঐ মত তাহারই অন্তর্গত। কিন্তু ঐ দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে পাকুধ কচ্চায়ন বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রতিষ্ঠান্বিত। তিনি বলেন, সংসারে সপ্তবিধ অনন্ত অপরিবর্ত্তনীয় স্বাধীন পদার্থ আছে। সেই সপ্ত-পদার্থ—চারি ভূত, সুখ, দুঃখ এবং আত্মা। উহারা পরস্পর কেহ কাহারও উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না। সুতরাং তাহাদের একের দ্বারা অন্যের ক্ষতি হওয়া অসম্ভব। অনন্ত সুখ-দুঃখের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইলে, আত্মার উপর তাহাদের প্রভাব অস্বীকার করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু এ পক্ষে বৌদ্ধগণ আদি-মতের রূপান্তর ঘটাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। পাকুধ কচ্চায়ন যে মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, তাহা জৈন-শাস্ত্রোক্ত অক্রিয়াবাদ সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। ঐ মতের সহিত প্রকৃত বৈশেষিক মতের প্রভেদ আছে; বৈশেষিক মত এই হিসাবে ক্রিয়াবাদের অন্তর্গত। ক্রিয়াবাদ এবং অক্রিয়াবাদ সংজ্ঞাদ্বয় বৌদ্ধশাস্ত্রে ও জৈনশাস্ত্রে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইতে দেখি। ক্রিয়াবাদ বলিতে এই মত ব্যক্ত করে যে, আত্মাই কর্ম্মশীল অথবা কর্ম্ম দ্বারাই আত্মা বিচালিত। জৈনধর্ম্ম এই ক্রিয়াবাদ সংজ্ঞার অন্তর্ভুত। ব্রাহ্মণ্য-দর্শন, বৈশেষিক এবং ন্যায়, এই ক্রিয়াবাদই ব্যক্ত করে। সংসারে আরও বহু ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ক্রিয়াবাদ মতের অনুবর্ত্তী। বৌদ্ধগণের এবং জৈনগণের শাস্ত্রগ্রন্থে যদিও বৈশেষিক দর্শনের ও ন্যায় দর্শনের সংজ্ঞাদি যথাযথ উল্লিখিত হয় নাই; কিন্তু ক্রিয়াবাদের ভিত্তি উভয়ত্রই পূর্ব্বোক্ত হিন্দু-দর্শনদ্বয়ের উপাদানের উপর প্রতিষ্ঠিত। অক্রিয়াবাদ মত, বলা বাহুল্য, ক্রিয়াবাদ মতের বিপরীত। ঐ মতের শিক্ষা এই যে, হয়—আত্মার অস্তিত্ব নাই, নয়—আত্মা কর্ম্মশীল নয়, অথবা আত্মা কর্ম্ম দ্বারা অভিহত হয় না। এই উপবিভাগের মধ্যে জড়বাদ-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখার সমাবেশ দৃষ্ট হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করেন (আমাদের মত স্বতন্ত্র) * বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ—এই তিন হিন্দুদর্শন ও বৌদ্ধদর্শন সমূহ এই পর্য্যায়ের অন্তর্নিবিষ্ট। বৌদ্ধসম্প্রদায়ের অন্তর্ভূত ক্ষণিকবাদ ও শূন্যবাদ মতাবলম্বীদিগের উল্লেখ সূত্রকৃতাঙ্গে দৃষ্ট হয়। জৈন সিদ্ধান্ত-শাস্ত্রে প্রায়ই বেদান্ত-মতের উল্লেখ দেখিতে পাই। সূত্রকৃতাঙ্গে বেদান্তবাদিগণকে তৃতীয় শ্রেণীর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় শ্রুতখণ্ডে প্রথম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে

---

octagonal or long, whether black or blue or red or yellow or white, whether hard or soft or heavy or light or cold or hot or smooth or rough. Those, therefore, who believe that there is and exists no soul, speak the truth. Those who maintain that the soul is something different from the body, do not see the following (objection):—'As a man draws a sword from the scabbard and shows it (you, saying)—"Friend, this is the sword, and that is the scabbard,' so nobody can draw (the soul from the body) and show it (you, saying):—"Friend, this is the soul, and that is the body."

* পৃথিবীর ইতিহাস প্রথম খণ্ডে ষড়দর্শন আলোচনা প্রসঙ্গে এই মত প্রবিব্যক্ত দেখুন।

বেদান্ত মত ব্যখ্যাত আছে। তবে, জৈনগণের মধ্যে কোনও বৈদান্তিক প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি নাই। বেদান্ত ব্রাহ্মণগণেরই আলোচ্য বিষয় ছিল। সুতরাং বেদান্তবাদীরা জৈনধর্ম্মের বিরুদ্ধ পক্ষ বলিয়াই পরিচিত হইয়াছেন। জৈনধর্ম্মের বিরুদ্ধবাদী চতুর্থ শ্রেণীর ধর্ম্ম-সম্প্রদায় দৈববাদ (Fatalism) ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সূত্রকৃতাঙ্গে প্রথম শ্রুতখণ্ডে প্রথম অধ্যয়নের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঐ সম্প্রদায়ের পরিচয় আছে। সামঞ্ঞফল-সূত্তে এই সম্প্রদায়ের মত-পরম্পরা মক্ষলি গোসাল কর্ত্তৃক বিবৃত হইয়াছে। গোসালের উক্তিতে এই মতের আভাষ পাওয়া যায়। গোসাল কহিয়াছেন যে, 'প্রাণিগণের উৎপত্তির বা সুখ-দুঃখের কোনই কারণ নাই। সকলই স্বভাব হইতে উৎপন্ন। সুখ-দুঃখ জীবন-মরণ সকলই স্বভাব-নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে সাধিত হইতেছে।' * সূত্রকৃতাঙ্গের প্রথম অধ্যয়নে দৈববাদী সম্প্রদায়ের মত সঙ্ক্ষেপে বিবৃত আছে। সে মত,—নিয়তি দ্বারা সকলই উৎপন্ন (নিয়তি ভাবন আগয়া)। † যদিও ঐ মত বিবৃতি প্রসঙ্গে গোসালের নাম উল্লিখিত হয় নাই; কিন্তু তৎকথিত মত যে উহাতে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা স্বতঃই মনে হয়। জৈনগণ চতুর্ব্বিধ দার্শনিক মতের উল্লেখ করেন;—(১) ক্রিয়াবাদ, (২) অক্রিয়াবাদ, (৩) অজ্ঞানবাদ, (৪) বৈনায়িকবাদ। ক্রিয়াবাদিগণ আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসবান; অক্রিয়াবাদিগণ প্রোক্ত মতের বিপরীত মত পোষণ করেন; বৈনায়িকগণ, ভক্তির দ্বারা মুক্তিফল প্রাপ্তির কামনা করিয়া থাকেন; অজ্ঞানবাদিগণ মুক্তির জন্য জ্ঞানের আবশ্যকতা স্বীকার করেন না। পাশ্চাত্য-দর্শনে যে য়্যাগ্‌নষ্টিক্ (Agnostics) সম্প্রদায়ের উল্লেখ দেখি, অস্মদ্দেশের অজ্ঞানবাদ তাহারই নামান্তর বা রূপান্তর। সঞ্জয় বেলাত্তিপুত্ত যে মত প্রকাশ করেন, সামঞ্ঞফল-সূত্তে তাহার একটু পরিচয় দৃষ্ট হয়। অজ্ঞানবাদ সেই সূত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সঞ্জয় বলেন,—যদি তুমি আমায় ভবিষ্য বিষয়ে প্রশ্ন কর, আমি কি উত্তর দিব? ভবিষ্য অবস্থা বিষয়ে যদি আমার অভিজ্ঞতা লাভ হয়, তাহা হইলে আমি সে অবস্থা বুঝাইতে পারি। যদি কেহ আমায় জিজ্ঞাসা কর,—'ভবিষ্যৎ কি এই প্রকার?' তাহা হইলে আমি উত্তর দিব,—'তাহার সহিত আমার কোনই সংশ্রব নাই!' তথাপি যদি কেহ জিজ্ঞাসা কর—'সে কি এই প্রকার?' আমি তখনও সেই একই উত্তর প্রদান করিব। তার পর যদি জিজ্ঞাসা কর—'সে কি ইহা হইতে পৃথক?' তাহাতেও আমার একই উত্তর। যদি জিজ্ঞাসা কর,—'উহা আছে কি না।' তাহাতেও সেই উত্তর। তথাপি যদি জিজ্ঞাসা কর—'তবে কি ভবিষ্যৎ নাই?' তখনও আমি সেই একই উত্তর দিব—'তাহার সহিত আমার কোনও সম্বন্ধ ঘটে নাই।' বৌদ্ধশাস্ত্রে দেখি,—'মৃত্যুর পর তথাগত বিদ্যমান আছেন কিনা'—এবম্বিধ

* গোসালের উক্তির ইংরাজী অনুবাদ,—'Every sentient being, every insect, every living thing, whether animal or vegitable, is destitute of intrinsic force, power, or energy, but, being held by the necessity of its nature, experiences happiness, or misery in the six forms of existence. etc.'

† দৈববাদীদের মত সূত্রকৃতাঙ্গে এই ভাবে ব্যক্ত,—
'All things are eternal by their very nature.'

প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি আছেন কিনা, তাহার প্রকৃত উত্তর মিলে নাই। অজ্ঞানবাদের ইহাই ভিত্তি। যাহা অদৃষ্ট, যাহা অলৌকিক, অজ্ঞানবাদীরা তৎসম্বন্ধে অজ্ঞতাভাবমূলক উত্তর প্রদান করেন। জৈনশাস্ত্রে প্রকাশ,—এই প্রকার বিভিন্ন দার্শনিক মতের মধ্যে জৈনধর্ম্ম বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

মহাবীর এবং বুদ্ধদেব যে সময়ে আপন আপন ধর্ম্ম প্রচার করেন, তখন যে সকল দার্শনিক মত ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মগ্রন্থে তাহার অল্পমাত্র পরিচয় প্রাপ্ত হইলেও তদ্দ্বারা মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণীত হইতে পারে তাহাতে বুঝিতে পারি, কিরূপ ভিত্তির উপর কিরূপ উপাদান সাহায্যে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাত্মগণ বিরাট ধর্ম্ম-সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন।

বিরুদ্ধ মতে স্যাদ্বাদ।

বিরুদ্ধবাদী বিভিন্ন ধর্ম্মমতের সহিত জৈনমতের বা বৌদ্ধমতের সাদৃশ্য অনুধাবন করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, মহাবীর এবং বুদ্ধদেব উভয়েই আপনাপন ধর্ম্মমত সংগঠনে, প্রত্যক্ষভাবেই হউক বা পরোক্ষভাবেই হউক, বিরুদ্ধমতাবলম্বী দার্শনিক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে কিছু-না-কিছু সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রতিপক্ষদলের সহিত বিচার-বিতর্কে তাঁহাদের ধর্ম্মমত কতকটা পরিস্ফুট হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কেহ কেহ তাই মনে করেন, সঞ্জয়-প্রবর্ত্তিত অজ্ঞানবাদের প্রতিবাদে মহাবীর কর্ত্তৃক স্যাদ্বাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। * যেহেতু, অজ্ঞানবাদ ঘোষণা করে যে, আমাদের বহুদর্শিতার বহির্ভূত কোনও বিদ্যমানতা বা অবিদ্যমানতা অথবা বিদ্যমানতা ও অবিদ্যমানতা উভয়ই আমরা কখনও অঙ্গীকার বা অস্বীকার করিতে পারি না। অথচ, উহারই বিপরীত ফল প্রদর্শন-ছলে স্যাদ্বাদ ঘোষণা করেন যে, একদিক দিয়া দেখিলে তুমি পদার্থের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিতে পার (স্যাদ্ অস্তি); আবার অপরদিক হইতে দেখিলে অস্বীকার করিতে পার (স্যাদ্ নাস্তি); অপিচ, সময়ান্তরে আবার বিদ্যমানতা ও অবিদ্যমানতা উভয়ই অঙ্গীকৃত হইতে পারে। একই সময়ে, একই দৃশ্যপথে, যদি তুমি বিদ্যমানতা ও অবিদ্যমানতা উভয়ই যুগপৎ অঙ্গীকার করিতে প্রবৃদ্ধ হও, তাহা হইলে তোমাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, সে অবস্থা ব্যক্ত করা যায় না (স্যাদ্ অবক্তব্য)। এইরূপ অবস্থা বিশেষে, কি বিদ্যমানতা কি অবিদ্যমানতা, কি উভয় অবস্থা, সকলই অবক্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়; তখন, 'স্যাদ্ অস্তি অবক্তব্য', 'স্যাদ্ নাস্তি অবক্তব্য', 'স্যাদ্ অস্তিনাস্তি অবক্তব্য'। এই স্যাদ্বাদ জৈনগণের 'সপ্তভঙ্গীনয়' বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই স্বতঃসিদ্ধ সত্য উচ্চারণ করিতে না পারিলে কোনও দার্শনিক, বিষম বিরুদ্ধবাদীদিগকে কদাচ নিরুত্তর করিতে সমর্থ হইতেন না। অজ্ঞানবাদীদিগের সেই সূক্ষ্ম বিতর্কে অনেককে বিভ্রান্ত করিয়াছিল; অনেক সহযোগী সম্প্রদায় বিপথগামী হইয়াছিলেন। পরিশেষে স্যাদ্বাদের প্রচারে অজ্ঞানবাদের ব্যূহ হইতে অনেকে উদ্ধারের পথ দেখিতে পাইয়াছিলেন। ফলতঃ, যে অস্ত্র দ্বারা অজ্ঞানবাদিগণ আপনাদের আততায়ীকে

* জ্যাকোবির এই সিদ্ধান্ত,—'I think, that in opposition to the Agnosticism of Sangaya, Mahabira has established the Syadvada.'

আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই অস্ত্রই পরিশেষে তাঁহাদের আপনাদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইয়াছিল। 'সপ্তভঙ্গীনয়' সত্যে পরাভূত হইয়া অজ্ঞানবাদের অনুবর্ত্তী কত জন যে মহাবীর স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে সমর্থ হইবে? *

অজ্ঞানবাদ স্যাদ্বাদের অন্তর্ভূত হওয়ায় মহাবীর স্বামীর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতের মধ্যে সঞ্জয়-প্রচারিত ধর্ম্মমতের ছায়াপাত ঘটিয়াছিল বলিয়া অনুভব হইতে পারে। এইরূপ দৈববাদের প্রভাবও মহাবীর স্বামীর ধর্ম্ম-মতের উপর নিপতিত হইয়াছিল, সপ্রমাণ হয়। মক্ষলির পুত্র গোসাল ছয় বৎসর কাল মহাবীর স্বামীর শিষ্যরূপে সন্ন্যাস-ক্রিয়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। পরিশেষে তিনি গুরুর দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বয়ং এক ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সংগঠন করেন। সেই সম্প্রদায় 'অজীবক' নামে পরিচিত হয়। গোসাল অজীবিক সম্প্রদায়ের নেতৃরূপে আপনাকে 'জিন' বলিয়া ঘোষণা করেন। বৌদ্ধদিগের গ্রন্থে এই গোসালকে কিন্তু নন্দবচ্ছের ও কিসা সংকিচ্চার উত্তরাধিকারী এবং বহুদিনের প্রবর্ত্তিত 'অচেলক পরিব্রাজক' সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। বৌদ্ধগ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত মত ব্যক্ত থাকিলেও, মহাবীর ও গোসাল যে কিছুকাল একত্রে কঠোর সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অভ্যাস করিয়াছিলেন— জৈন-শাস্ত্রের এবম্বিধ উক্তিতে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। তবে, এ সম্বন্ধে জৈনগণের যে ধারণা, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত তাহা হইতে স্বতন্ত্র। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, মহাবীর এবং গোসাল যে একত্র মিলিত হইয়াছিলেন, তাহার উদ্দেশ্য অন্যরূপ ছিল। তাঁহাদের দুই জনের দুইটী সম্প্রদায়কে একসূত্রে গ্রথিত করাই সে মিলনের লক্ষ্য বলিয়া অনুমিত হয়। ঐ দুই ধর্ম্ম-প্রচারকের ধর্ম্মমতের মধ্যে বহু সাদৃশ্য বিদ্যমান ছিল বলিয়া উঁহারা বহুকাল একত্র অবস্থান করিয়াছিলেন। 'সব্বে সত্তা সব্বে পাণা সব্বে ভূত সব্বে জীব'—এই উক্তি গোসালের এবং জৈনগণের মধ্যে অভিন্নভাবে প্রচারিত। ঐ উক্তির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে টীকাকারগণ প্রাণি-পর্য্যায়কে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন;

স্যাদ্বাদ।

---

* বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ সম্বন্ধে যে মত পালিগ্রন্থে লিখিত আছে, তন্মধ্যে অজ্ঞানবাদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। নির্ব্বাণের পর 'তথাগত' বিদ্যমান আছেন, কি বিদ্যমান নাই—এই প্রশ্নে বুদ্ধদেব যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা অজ্ঞানবাদের অনুসৃতি বলিয়া অনেকে মনে করেন। রাজা প্রসেনজিৎ (প্রসেনদি) এবং ভিক্ষুণী ক্ষেমা (খেমা) প্রশ্নোত্তর-ছলে তথাগতের বিদ্যমানতা অবিদ্যমানতা বিষয়ে যে ভাব ব্যক্ত করেন, তাহাতে অজ্ঞানবাদের আঘ্রাণ পাওয়া যায়। সামঞ্ঞ ফল-সুত্তে সঞ্জয় যে পদ্ধতিতে প্রশ্নোত্তরের অবতারণা করিয়াছিলেন, সম্যুত্তনিকায়ে ক্ষেমা-প্রসেনজিৎ-প্রশ্নোত্তরে তাহারই অনুসরণ দেখি। মহাবগ্গে (প্রথম, ২৩।২৪) যে একটী ঘটনার উল্লেখ আছে, তদ্দ্বারাও বুদ্ধদেবের সমসাময়িক অজ্ঞানবাদীদিগের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সারিপুত্ত ও মোগ্গল্লায়ন নামক বুদ্ধদেবের দুই জন প্রসিদ্ধ শিষ্য, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে, অজ্ঞানবাদী সঞ্জয়ের অনুগত ছিলেন। পূর্ব্বগুরু সঞ্জয়কে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা যখন বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তখন তাঁহাদের সঙ্গে সঞ্জয়ের প্রায় ২৫০ জন শিষ্য নবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বোধিমূলে অবস্থানের প্রথম অবস্থায়, নূতন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সংগঠনের প্রারম্ভে এই ব্যাপার সংঘটিত হয়। ঐ সকল লোককে বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার সময় বুদ্ধদেব দেশ-প্রচলিত মতের অনাদর করেন নাই বলিয়াই মনে হয়। ওল্‌ডেনবার্গ এবং জ্যাকোবি এই সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে অজ্ঞানবাদের প্রভাব কীর্ত্তন করিয়াছেন।

সেই ভাগ সমূহের নাম—একেন্দ্রিয়, দ্বীন্দ্রিয় ইত্যাদি। কিবা জৈন-গ্রন্থে, কিবা গোসালের উক্তিতে উভয়ত্রই প্রাণি-পর্য্যায়ের ঐরূপ বিভাগ পরিদৃষ্ট হয়। গোসাল মানব-জাতিকে ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। জৈনগণের 'লেশ্যা' বিভাগ তাহার সহিত সম্পূর্ণরূপ সাদৃশ্য-সম্পন্ন। * কেহ কেহ মনে করেন, আজীবক-সম্প্রদায়ের ভাব জৈনগণ গ্রহণ করিয়া এ ক্ষেত্রে আবশ্যকানুরূপ পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন। গোসালের সম্প্রদায়ে যে সকল কঠোর বিধি-বিধান প্রবর্ত্তিত ছিল, মহাবীর তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াও কাহারও কাহারও সিদ্ধান্ত। জ্যাকোবি এ সম্বন্ধে কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, উত্তরাধ্যয়ন (৩৩-১৩) গ্রন্থে পার্শ্বদেবের বিধি-বিধানে দৃষ্ট হয় যে, তিনি নির্গ্রন্থগণকে অন্তর্বাহ্য উভয়বিধ পরিচ্ছদ পরিধান করিতে সম্মতি দিয়াছিলেন। কিন্তু বর্দ্ধমানের বিধি-বিধান সম্পূর্ণ বিপরীত; উহাতে একেবারে বস্ত্র পরিধান নিষিদ্ধ। উলঙ্গ সন্ন্যাসীদিগের উল্লেখে জৈন-সূত্রে সর্ব্বদা একটী শব্দ দৃষ্ট হয়। সেই শব্দ 'অচেলক' অর্থাৎ বিবস্ত্র। বৌদ্ধ-গ্রন্থে অচেলকগণের এবং নির্গ্রন্থগণের পার্থক্যের বিষয় উল্লেখ আছে। 'ধম্মপদের' টীকায় বুদ্ধঘোষ লিখিয়া গিয়াছেন,—এক সম্প্রদায়ের ভিক্ষুগণ অচেলকগণ অপেক্ষা নিগন্থগণের প্রাধান্য কীর্ত্তন করেন। 'অচেলক'গণ সম্পূর্ণরূপ উলঙ্গ (সব্বসো অপতিচ্ছন্না); কিন্তু শীলতা রক্ষার জন্য নিগন্থগণ পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন। অবগত হওয়া যায়, জিনকল্পিক নামে উলঙ্গ জৈন-সন্ন্যাসীর অস্তিত্ব পূর্ব্বে ছিল। তাঁহারা জিনগণের আদর্শ অনুসরণ করিতেন বলিয়া ঐ সংজ্ঞা লাভ করেন। শ্বেতাম্বরগণ বলেন,—জিনকল্পগণের স্থান পরবর্ত্তী কালে স্থবিরকল্পগণ অধিকার করিয়াছেন। তাঁহারা বস্ত্র-ব্যবহারের অনুজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন। যাহা হউক, বৌদ্ধগণের বর্ণনাক্রমে মক্ষলি গোসালের অনুবর্ত্তিগণই অচেলক আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী গুরুগণের আচার-অনুষ্ঠান পালন করিয়া চলিতেন। নিগন্থপুত্র সচ্চক 'কায়ভাবনা' অর্থে শারীরিক পবিত্রতা নির্দ্দেশ করিয়া অচেলকগণের আচার বিষয়ে লক্ষ্য করিয়াছেন। সচ্চকের বিবরণ হইতে জৈন-গণের ও অচেলকগণের সাদৃশ্য উপলব্ধি হয়। জৈন সন্ন্যাসিগণের ন্যায়ই অচেলকগণ নিমন্ত্রণ-গ্রহণে পরাঙ্মুখ ছিলেন। 'অভিহত বা উদ্দিস্‌সকত' শব্দ তাঁহাদের পরিবর্জ্জনীয় খাদ্য সম্বন্ধে ব্যবহৃত দেখি। ঐ শব্দদ্বয়ের অনুরূপ 'অধ্যাকৃত' এবং 'ঔদ্দেশিক' শব্দদ্বয় জৈনশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়। ঐ দুই শব্দের অর্থ,—বিষয়ী ব্যক্তির প্রস্তুত খাদ্য গ্রহণে বা দূর

* টীকাকারগণ 'লেশ্যা' শব্দের অর্থ 'অধ্যবসায়-বিশেষ' নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিভিন্ন কর্ম্মের দ্বারা আত্মার উপর যে প্রভাব বিস্তৃত হয়, তাহাই লেশ্যা নামে জৈন-শাস্ত্রে অভিহিত। লেশ্যা আত্মার স্বভাবানুবর্ত্তী নহে; পরন্তু, আত্মার সহিত সম্বন্ধযুক্ত কর্ম্মে প্রতিবিম্বরূপে অবস্থিত। অবচুরি গ্রন্থের দুই পঙ্‌ক্তি কবিতায় লেশ্যার স্বরূপ এইরূপ বিবৃত হয়;—'কৃষ্ণাদিদ্রব্যসাচিব্যাৎ পরিণামো য আত্মনঃ। স্ফটিকস্যেব তত্রায়াম্ লেশ্যাশব্দঃ প্রবর্ত্ততে॥' অর্থাৎ,—স্ফটিকে পতিত কৃষ্ণ বস্তুর প্রতিবিম্ব যেমন তাহার বর্ণ-পরিবর্ত্তন সাধিত করে, লেশ্যা শব্দে কর্ম্মের দ্বারা আত্মার সেই পরিবর্ত্তনের অবস্থা বুঝাইয়া থাকে। লেশ্যা অথবা যাহা লেশ্যার উৎপাদক, তাহা আত্মার সহচররূপে অবস্থিত সূক্ষ্ম-বস্তু-বিশেষ। শব্দতাত্ত্বিকগণ ক্লেশ হইতে লেশা এবং তাহা হইতে লেশ্যা শব্দের উৎপত্তি নির্দ্ধারণ করেন। এক হিসাবে ঐ অর্থ যুক্তিযুক্ত; কেন-না, লেশ্যা আত্মার ক্লেশদায়ক পদার্থ। উহা মিশ্র শব্দ; বর্ণ অর্থেও (সূত্রকৃতাঙ্গে) উহার ব্যবহার দেখা যায়।

হইতে কোনও খাদ্যদ্রব্য আহরণে জৈন ভিক্ষুগণ বিরত থাকিবেন; কোনরূপ মাংস আহারে বা মদ্যপানে তাঁহাদের অধিকার থাকিবে না।' ভিক্ষা গ্রহণ এবং আহার সম্বন্ধে জৈনগণের ও অচেলকগণের পদ্ধতি প্রায়ই অভিন্ন। কল্পসূত্রে যতিগণের প্রতিপাল্য বিধি যাহা লিখিত আছে, অচেলকগণের প্রতিপাল্য বিধিবিধানের সহিত তাহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। সচ্চক স্বয়ং নিগন্থের পুত্র ছিলেন; অথচ, তিনি দৈহিক পবিত্রতার দৃষ্টান্তে অচেলকগণের প্রসঙ্গই উত্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এবম্বিধ বিবিধ সাদৃশ্য-তত্ত্ব আলোচনায় উপলব্ধি হয় যে, অচেলক বা অজীবক সম্প্রদায় হইতে মহাবীর স্বামী আপন সম্প্রদায়-গঠনের বহু উপাদান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জৈনগণের বিবরণ হইতেই বুঝিতে পারি, গোসালের সংসর্গে আসিয়া মহাবীরের দল পরিপুষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু গোসাল আপনার প্রাধান্য হারাইয়াছিলেন। গোসালের শোচনীয় মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। অচেলক অথবা অজীবক সম্প্রদায় ভিন্ন তাৎকালিক অপরাপর সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের প্রভাবও জৈনসম্প্রদায়ে নিপতিত হইয়াছিল, মনে হয়; কেন-না, অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ন্যাসিদল ঐ সময়ে জৈনসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

যে প্রভাবে যে ভাবে জৈনধর্ম্ম সৃষ্ট-পরিপুষ্ট হউক না কেন, ঐ ধর্ম্মের আদি স্তর যে মহাবীরের অথবা বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে সঞ্জাত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কি নিদর্শন প্রাপ্ত হই, একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত এই যে,—'সমাজের আদি অবস্থায়, অসভ্য সমাজে মনুষ্যকে জীববাদে বিশ্বাসবান দেখি। তখন তাহারা বিশ্বাস করে যে, প্রত্যেক পদার্থেই আত্মা আছে। কেবল উদ্ভিদের মধ্যেই যে আত্মা বা প্রাণ বিদ্যমান, তাহা নহে; পরন্তু মৃত্তিকায়, জলে, অনলে এবং বায়ু মধ্যেও আত্মা ক্রিয়াশীল। আধুনিক জাত্যুৎপত্তি-বিজ্ঞান জীববাদকে অসভ্যজাতির দর্শন বলিয়া ঘোষণা করেন; সেই জীববাদ, সভ্যতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ অবতারবাদে পরিণত হয়। জৈন-ধর্ম্মমত অনেকাংশে আদিম জীববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতের যে সমাজে জীববাদের প্রাধান্য ছিল, জৈনধর্ম্ম সেই সমাজে প্রথম উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। সে অবশ্য অতি দূর অতীতের কথা; তখন উচ্চতর ধর্ম্মবিশ্বাস এবং উচ্চতর-ভাবাপন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় ভারতবাসীদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল না।' যে সকল যুক্তি দ্বারা জৈনধর্ম্মকে মহাবীর স্বামীর এবং বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্ম বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ঘোষণা করেন, তৎপক্ষে ইহাই একটী প্রধান যুক্তি। তবে, দুঃখের বিষয়, এই যুক্তির প্রয়োগপক্ষে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ একটী বড়ই গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। অন্য দেশে অসভ্য জাতির মধ্যে জীববাদ (Animism) সংজ্ঞায় যে ধর্ম্মমত প্রচলিত, ভারতবর্ষের সমাজে উহা সে ভাবে প্রচলিত ছিল না। সর্ব্বব্রহ্মময় জগৎ—ভারতীয় সমাজ যখন এই ভাবে ব্রহ্মের অস্তিত্ব অনুভব করিত, তখন ভারতের পূর্ণ সভ্যতার দিন। অন্য দেশ দিন দিন সভ্য সমুন্নত হইয়া জ্ঞান-মার্গের যে সোপানে আরোহণ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছে, জগদ্রূপে ব্রহ্মের বিদ্যমানতা সেই উন্নত অবস্থায় পূর্ণ জ্ঞানের অনুভূতি। অন্য সমাজের ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ

জৈন-ধর্ম্মের আদি-স্তর।

করিয়া, ভারতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অভ্যুদয় পরিকল্পনা করিতে যাইলে বিষম বিভ্রম-আবর্ত্তে নিপতিত হইতে হয়। ফলতঃ, আধুনিক 'য়্যানিমিজম্' বা জীববাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিয়া সংজ্ঞান্তরে সেই অবস্থার তুলনা করিলেই সমীচীন হয়। যে প্রাচীন দার্শনিক সত্য হইতে 'সর্ব্বে সত্তা সর্ব্বে পাণা সর্ব্বে ভূত সর্ব্বে জীব' প্রভৃতি বাণী বিঘোষিত হইয়াছে, তাহা সনাতন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রাণভূত। প্রমাণ হয় বটে, সনাতনের অনুসরণ; কিন্তু প্রমাণ হয় না কখনই—অসভ্য বর্ব্বর জাতির অনুকরণ। জৈন-ধর্ম্মের প্রাচীনত্বের আর এক নিদর্শন, উল্লেখ হয়, বেদান্ত ও সাঙ্খ্য এই দুই প্রাচীনতম ব্রাহ্মণ্য-দর্শনের বিষয়-বিশেষের সহিত উহার সাদৃশ্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত এই যে, প্রাচীনকালে মনোবিজ্ঞান তাদৃশ বিকাশ-প্রাপ্ত হয় নাই। পদার্থ-বর্গ হইতে তখন গুণ-বর্গ মাত্র বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে; কিন্তু উহা তখনও পরিষ্কাররূপে অনুভূতি-গম্য হয় নাই; অধুনা যাহা গুণবর্গ বলিয়া আমরা ধারণা করিতে সমর্থ, তখন তৎসমুদায় ভ্রান্তভাবে পদার্থ-বর্গের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। এইরূপে দেখিতে পাই,—বেদান্তে যিনি পরম ব্রহ্ম, সত্তা জ্ঞান ও আনন্দ তাঁহাতে তদীয় প্রকৃতির গুণ-মধ্যে গণ্য নহে; পরন্তু ব্রহ্ম স্বয়ং সৎস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ। সাঙ্খ্যেও সেই ভাব; তদন্তর্গত পুরুষ বা আত্মা, জ্ঞান বা জ্যোতিঃ রূপে পরিকীর্ত্তিত। যদিও তাঁহাকে ত্রিগুণসম্পন্ন দেখি; যদিও তিনি সৎস্বরূপ শক্তিস্বরূপ এবং মায়াস্বরূপ অর্থাৎ যদিও তাঁহাতে জ্যোতিঃ বর্ণ বিভ্রম তিনেরই সমাবেশ দেখি; তথাপি ঐ ত্রিগুণ গুণ-বর্গ মধ্যে গণ্য নহে; উহা 'আদি পদার্থ' বলিয়া পরিগণিত। প্রাচীন জৈন শাস্ত্রেও দার্শনিক চিন্তার গতি ঐ ভাবে সংন্যস্ত দেখি। তাঁহারা প্রধানতঃ 'দ্রব্য' অর্থাৎ পদার্থ-বিষয়ে এবং তাহাদের বিকাশ বা পরিবর্ত্তনের পর্য্যায়-বিষয়ে মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়া গিয়াছেন। গুণ-দ্রব্য বিষয়ে আলোচনা জৈনসূত্রে কচিৎ দৃষ্ট হয়। যাহাও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা আধুনিক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। পরবর্ত্তিকালে ন্যায়-বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনের পরিভাষা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যেরূপভাবে হিন্দুগণের বিজ্ঞান-রাজ্য অধিকার করিয়াছে, এ ক্ষেত্রেও তাহারই প্রতিচ্ছায়া লক্ষ্য করি। জৈন-দর্শনের 'পর্য্যায়' শব্দে বিকাশ বা পরিবর্ত্তন বুঝায় বটে; কিন্তু তাহা হইতে স্বাধীনভাবে গুণ-বর্গের কোনই প্রতিষ্ঠা নাই। 'পর্য্যায়' শব্দে দ্রব্যের একটি অবস্থামাত্রকে বুঝায়; সকল মুহূর্ত্তে 'দ্রব্য' সেই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। 'গুণ' বলিয়া জৈনগণ কোনও পদার্থ স্বীকার করেন না। যাহা গুণবর্গের অন্তর্গত, জৈনগণ তাহাকে 'দ্রব্য' মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। ক্ষমতা ও অক্ষমতা, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম প্রভৃতির সহিত আত্মার সম্বন্ধ বটে; কিন্তু তৎসমুদায় গুণ না হইয়া দ্রব্যমধ্যে গণ্য হইয়াছে। যদি গুণ এবং পদার্থের সংজ্ঞা যথাযথ নির্দ্ধারিত হইত, তাহা হইলে এরূপ সমস্যা উপস্থিত হইবার আশঙ্কা ছিল না। যাহা হউক, এ বিষয়ে নানা বিতর্ক-বিতণ্ডা দেখিতে পাই। কেহ বিশ্বাস করেন, জৈনদর্শনে বৈশেষিক দর্শনের অনুসরণ আছে; কেহ মনে করেন, একদিকে সাঙ্খ্য ও বেদান্ত মত এবং অন্যদিকে বৈশেষিক মত, এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তিরূপে জৈনদর্শন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। * কিন্তু

* এই মত ডক্টর ভাণ্ডারকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—Bhanderkar's Report for 1883-1884.

জ্যাকোবি ঐ দুই মতের কোনও মতেরই সমর্থন করেন না। তিনি বলেন,—এ সম্বন্ধে কয়েকটী প্রশ্ন উঠিতে পারে; (১) জৈনমত ও বৈশেষিক মত উভয়েই ক্রিয়াবাদের অন্তর্ভূত, অর্থাৎ আত্মা যে কর্ম্ম ও কামনা প্রভৃতির দ্বারা অভিভূত হন, উভয় মতেই তাহা অঙ্গীকৃত; (২) উভয় মতই সদসৎ কার্য্য ও নীতি মান্য করেন, অর্থাৎ মূল কারণ হইতে কার্য্যের ফল যে স্বতন্ত্র, তাহা উভয়ত্র স্বীকৃত হয়। কিন্তু বেদান্ত ও সাংখ্য সকলই অভিন্ন (সৎ) বলিয়া ঘোষণা করে। (৩) জৈন মত এবং বৈশেষিক মত উভয়ই দ্রব্য হইতে গুণের পার্থক্য অনুধাবন করেন। যাহা হউক, এ সকল সাদৃশ্য দেখিয়া এক হইতে অন্যের উৎপত্তি সিদ্ধান্ত করা যায় না। কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ সত্য সর্ব্বকালে সকলেরই মনে উদয় হইতে পারে। কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ, বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি, ভূয়ো দর্শন প্রভাবে সকল মানুষই পরিজ্ঞাত হয়। সুতরাং ঐরূপ জ্ঞানকে দর্শন-বিশেষের উদ্ভাবিত জ্ঞান বলিয়া মনে করা যায় না। তবে যদি একের উদ্ভাবিত কোনও অভিনব মত অন্যের মধ্যে বিবৃত দেখি, তাহা হইলে, শেষোক্তে প্রথমোক্তের অনুসরণ বলিতে পারি। বৈশেষিক-দর্শনের একটি অভিনব সিদ্ধান্ত—দিক ও আকাশ দুইটি স্বতন্ত্র পদার্থ; কিন্তু বলা বাহুল্য, জৈন-দর্শনে সে মত দেখিতে পাই না; অথচ, বেদান্ত ও সাংখ্য, প্রাচীনতর দুই দার্শনিক সম্প্রদায়, দিক্ ও আকাশকে অভিন্ন পদার্থ নির্দ্দেশে একই আকাশ সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া গিয়াছেন; এবং জৈন-দর্শনে সেই মতই পরিব্যক্ত দেখি। সুতরাং, জৈন-দর্শন যে বৈশেষিক-দর্শনের অনুসরণ নহে, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। তার পর, যে বিষয়টিতে উহাদের পরস্পরের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য, অর্থাৎ বৈশেষিক যে চতুর্ব্বিধ 'রূপ' স্বীকার করেন এবং জৈনগণের মধ্যে যে তাহার সাদৃশ্য দেখি; তাহার কারণ অন্যরূপ। সর্ব্বভূতে প্রাণ—এই মত জীববাদ হইতে জৈন-ধর্ম্মে ও বৈশেষিক-দর্শনে প্রবেশ করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন, উভয়ত্র সাদৃশ্যের সম্ভাবনা মনে হয় না। তবে, একটা কথা এই যে, বেদান্তের ও সাংখ্যের সহিত জৈন-মতের যেরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হয়, বৈশেষিকের সহিত উহার সেরূপ বিরোধ নাই; পরন্তু উভয়ে যেন একই পথে পাশাপাশি প্রধাবিত। অধিক কি, ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক জৈন-গ্রন্থকারের নাম পরিদৃষ্ট হয় এবং বৈশেষিক-দর্শন তাঁহাদেরই একজন বিরুদ্ধবাদী গুরু কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহারা ঘোষণা করেন। সে মতে, কৌশিক-গোত্রজ চালুর রোহগুপ্ত বৈশেষিক-দর্শনের প্রবর্ত্তক। জৈন-ধর্ম্মের বিরুদ্ধবাদী যে সকল মত-প্রবর্ত্তকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তদনুসারে রোহগুপ্ত ষষ্ঠ পর্য্যায়ভুক্ত। তাঁহার মত 'ত্রৈরাশিক মতম্' বলিয়া উল্লিখিত। তিনি ৫৪৪ বল্লভী অব্দে (১৮ খৃষ্টাব্দে) বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন।* তাঁহার মত-পরম্পরা 'আবশ্যক' গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। ঐ গ্রন্থকে কণাদের বৈশেষিক-দর্শনের প্রতিলিপি বলিলেও বলা যাইতে পারে। ঐ গ্রন্থে ছয় পদার্থের (সাত নহে) উল্লেখ আছে এবং সপ্তদশ গুণের (চব্বিশ নহে) উল্লেখ আছে; আর ঐ সকল গুণ ও পদার্থ বৈশেষিক-দর্শনের সহিত সম্পূর্ণরূপ সাদৃশ্যসম্পন্ন। যাহা হউক, এবম্বিধ দার্শনিক তত্ত্বের

---

* Indische Studien, Vol. XVII, P 116.

গবেষণায় জৈনগণ যে অশেষ সম্মানের দাবী করেন, তাহা বলাই বাহুল্য। তবে, কাশ্যপ-গোত্রজ কণাদ এবং কৌশিক-গোত্রজ রোহগুপ্ত যে অভিন্ন-ব্যক্তি, তাহা কখনই মনে করা যায় না। এক ব্যক্তি ভিন্ন নামে পরিচিত থাকিতে পারেন; কিন্তু তাহা হইলেও গোত্র কখনও ভিন্ন হয় না। কণাদের এক নাম উলূক; তদনুসারে বৈশেষিক-দর্শন ঔলূক্য-দর্শন নামে অভিহিত হয়। রোহগুপ্তের (রোহগুত্তের) ঐরূপ আর একটি নাম 'ছলুক'; ঐ নাম যড়্ উলূক শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। বৈশেষিকের ছয় পদার্থ গ্রহণ সম্বন্ধে ঐ নাম প্রযুক্ত হইয়াছিল মনে হইতে পারে। ফলতঃ, বৈশেষিক-দর্শনের অনুসরণে যে রোহগুত্তের দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাতে সংশয় নাই। যাহা হউক, এ সকল বিষয় স্বীকার করিলেও জৈন-ধর্ম্মের প্রাচীনত্ব অবিসম্বাদিতরূপে সুপ্রমাণ হয়। ঐ ধর্ম্ম যে বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার হইবার পূর্ব্বে, এমন কি—মহাবীর স্বামীরও আবির্ভাবের পূর্ব্বে, বিদ্যমান ছিল, তাহা সর্ব্বথা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

ভারতে ব্রিটিশ-রাজত্বের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে, ভারতের বিলুপ্তপ্রায় ভাষা-সমূহের উদ্ধার-সাধন আরম্ভ হয়। কি সংস্কৃত, কি পালি, কি প্রাকৃত, কি বাঙ্গালা, কি মহারাষ্ট্রী, কি দ্রাবিড়ী, কি গুজরাটী—প্রায় সকল ভাষারই লুপ্ত-রত্নসমূহ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনুসন্ধানের ফলে, আবিষ্কৃত ও সংরক্ষিত হইবার ব্যবস্থা হয়। জৈনশাস্ত্র-সাহিত্য অধুনা যে শিক্ষিত জন-সাধারণের দৃষ্টি-সীমায় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তাহাও সেই অনুসন্ধিৎসারই ফল বলিতে পারি। কোন্ কোন্ মনীষীর প্রযত্নে কি ভাবে জৈনশাস্ত্র-সাহিত্য দেশে বিদেশে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার পৌর্ব্বাপর্য্য নির্দ্ধারণ করা আমাদের লক্ষ্য নহে। তবে, যাহা সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ হয়, তাহাতে বুঝিতে পারি, উনবিংশ-শতাব্দীর প্রারম্ভে জৈনশাস্ত্রসমূহ একে একে ইউরোপে প্রতিষ্ঠা বিস্তার করিতেছিল। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে লিপ্‌জিগ্ সহরে ভদ্রবাহুর 'কল্পসূত্র' প্রকাশিত হইয়াছিল। * ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনসহরে শ্বেতাম্বর জৈনদিগের আদরণীয় আচারাঙ্গ-সূত্র প্রকাশ পায়। † ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে, হারম্যান জ্যাকোবি কর্ত্তৃক আচারাঙ্গ-সূত্র ও কল্পসূত্র ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। জ্যাকোবির ঐ গ্রন্থ প্রণয়নে, তিনি যে সকল গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছিলেন, তাহাতে তৎকালে ইউরোপে জৈন-শাস্ত্র-সাহিত্যের আলোচনা সম্বন্ধে বহু তত্ত্বই অবগত হওয়া যায়। ‡ প্রফেসার লাসেন্, ওয়েবার, ম্যাক্সমূলার, ক্ল্যাট প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ঐ সময়ে জৈনধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে বহু গবেষণার পরিচয় দিতেছিলেন। § ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে, জ্যাকোবি উত্তরাধ্যয়ন ও সূত্রকৃতাঙ্গের ইংরাজী অনুবাদ সম্পন্ন করেন। ঐ

জৈনশাস্ত্র-সাহিত্যের উদ্ধার-সাধন।

---

* The Kalpasutra of Bhadrabahu, Leipzig, 1819.

† The Ayaranga Sutta of the Cvetambara Jainas, London, 1882.

‡ *Gaina Sutras* translated from Prakrit by Hermann Jacobi in the Sacred Books of the East, Vols XXII & XLV.

§ *Vide*, Professor Lassen, *Indische Alterthumkunde*, iv., P. 763 &c.; Professor Weber's *Indische Studien*, XVI, P. 241, 251; Professor Max Muller's Hibbert Lectures, P. 351; Dr. Klatt, Indian Antiquary, XI.

সময়ের মধ্যে ইউরোপে ও ভারতে নানা আকারে জৈনশাস্ত্র-সাহিত্যের আলোচনা চলিয়াছিল। এ বিষয়ে তাঁহারই উক্তির মর্ম্মানুবাদ আমরা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। তাঁহার দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—'দশ বৎসর অতীত হইল, জৈনসূত্রের অনুবাদ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই দশ বৎসরের মধ্যে কয়েক জন বিজ্ঞ পণ্ডিতের সহায়তায় জৈনধর্ম্ম ও তাহার ইতিবৃত্ত বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবার সুযোগ আসিয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় এবং গুজরাটী ভাষায় লিখিত উৎকৃষ্ট টীকার সহিত জৈনশাস্ত্র-গ্রন্থের মূলাংশের এক সুন্দর সংস্করণ এক্ষণে ভারতের কয়েক জন পণ্ডিত কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। সেই মূলগ্রন্থের দুইখানির সমালোচনা-মূলক সংস্করণ এক্ষণে প্রফেসার লিউম্যান্ * ও প্রফেসার হোর্ণল্ † কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। শেষোক্ত পণ্ডিতের সংস্করণে সতর্কতার সহিত অনুবাদের ও প্রচুর উদাহরণের সমাবেশ আছে। বার্লিন পাণ্ডুলিপির তালিকা-গ্রন্থে এবং জৈনশাস্ত্র-সাহিত্য সম্বন্ধে আপনার গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে, প্রফেসার ওয়েবার সাধারণভাবে সমগ্র জৈনসাহিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ‡ এই সময়েই প্রফেসার লিউম্যান্ জৈনগণের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ-পদ্ধতি অধ্যয়ন করেন; আর এই সময়েই তৎকর্ত্তৃক কতকগুলি জৈন-উপাখ্যানের সহিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ও বৌদ্ধধর্ম্মের সম্বন্ধ-তত্ত্ব অনুসন্ধানে সমর্থ হন। ¶ শ্বেতাম্বর-সম্প্রদায়ের প্রাচীন ইতিবৃত্তে অভিজ্ঞতা-জনক এক আবশ্যক প্রমাণ এই সময়ে জ্যাকোবি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হয়। § ধর্ম্মোপদেষ্টাগণের তালিকা মধ্য হইতে এই সময় হোর্ণল ও ক্ল্যাট 'গচ্ছ' গঠনের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করেন। এই সময়ের মধ্যে ডক্টর ক্লাট কর্ত্তৃক জৈন-লেখকগণের এবং ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনীমূলক এক অভিধান প্রস্তুত হয়; আর সেই বৃহৎ অভিধানের আদর্শে হোফ্রাট বুলার কোষকার হেমচন্দ্রের বিস্তৃত জীবনবৃত্তান্ত প্রণয়ন করেন। ** কতকগুলি প্রাচীন খোদিত-লিপির পাঠোদ্ধারে এই সময়ে পূর্ব্বোক্ত বুলারের কৃতিত্ব প্রকাশ পায়; অপিচ, তিনি ডক্টর ফারার কর্ত্তৃক ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত মথুরায়-প্রাপ্ত প্রস্তরমূর্ত্তি সমূহের বিষয় আলোচনা

---

* Prof. Leumann :—Das Aupapatik Sutra, in the *Abhandlungen fur die Kunde des Morgenlandes*, vol VIII, and Dasa Vaikalika'Sutra and Nirukti in the Journal of the German Oriental Society, XLVI.

† Prof. Hoernole :—The Uvasaga Dasao : (in the Bibliotheca), vol. I. Text and Commentary, Calcutta, 1890 ; Vol ii, Translation 1898.

‡ Prof. Weber in his Catalogue of the Berlin Manuscripts (Berlin 1888 and 1892) and in the *Indische Studien*, Vol XVI, p 211ff, and XVII. p 1ff ; translated in the Indian Antiquary and edited separately, Bombay, 1893.

§ The *Parisisetaparven* by Humakandro : Bibliotheca Indica.

¶ In the Actes du VI Congres International des Orientalistes, section Arienne, p 469 ff., in the 5th and 6th vols. of the Wiener Zeischrift fur die Kunde des Morgenlandes, and in the 48th. vol. of the Journal of the German Oriental Society.

** Hofrat Buhler :—Denkschriften der philos-histor. Classe der Kaiserl. Akademic der Wissenchaften, vol XXXVII, p 171 ff.

করেন। * এই সময়েই 'শ্রাবণ বেলগোলায়' প্রাপ্ত অতি প্রয়োজনীয় খোদিত-লিপির সম্পাদন কার্য্যে মিষ্টার লিউইস্ রাইস্ সমর্থ হন; † এই সময়েই এম্ এ বার্থ কর্ত্তৃক জৈনধর্ম্ম সংক্রান্ত আমাদের জ্ঞানের বিষয় সমালোচনা হয় ‡; আর বুলারও তৎসম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকটন করেন। § পরিশেষে ভাণ্ডারকার সমগ্র জৈনধর্ম্মের এক মূল্যবান সার সঙ্কলন করিয়াছেন।** এ সকল ভিন্ন থিয়োডোর অফ্রেক্ট কর্ত্তৃক ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে লিপজিগ সহর হইতে 'ক্যাটালগস ক্যাটালোগোরম' নামক যে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তাহার মধ্যেও জৈন গ্রন্থকারগণের জৈন-সাহিত্যের বহুল বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। সেই গ্রন্থে সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের পরিচয় বর্ণানুক্রমে সজ্জিত আছে। তাহারই মধ্যে জৈন-সাহিত্যের পরিচয় প্রাপ্ত হই। †† এই সকলের উপর, সর্ব্ববিধ আলোচনার সহায়তা লাভ করিয়া মিষ্টার জ্যাকোবি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের লিখিত জৈনধর্ম্ম-সংক্রান্ত মতের মধ্যে তাহাই এখন সর্ব্বত্র আদরণীয়। ভিন্সেণ্ট স্মিথের প্রণীত 'প্রাচীন ভারতের ইতিহাস' গ্রন্থে জৈনধর্ম্ম বিষয়ে কতকগুলি নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। §§ ফরাসী-রাজ্য হইতে ডক্টর এ গারিনো জৈনধর্ম্ম সম্বন্ধে এক অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ঐ গ্রন্থ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে এবং উহার উপসংহারভাগ ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। উহাতে জৈনধর্ম্মসংক্রান্ত সকল গ্রন্থের পরিচয় আছে। *** ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে বম্বে সহর হইতে জৈনধর্ম্মের ইতিহাস ও সাহিত্য সম্বন্ধে এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ড সহর হইতে বর্ত্তমান জৈনধর্ম্ম সম্বন্ধে আর এক গ্রন্থ প্রকাশ পায়। ††† ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ডক্টর হোর্ণল বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি-রূপে যে অভিভাষণ পাঠ করেন, জৈনধর্ম্মের ইতিহাস সঙ্কলনে তাহাও এক প্রধান সহায়। §§§ তার পর অধুনা জৈনধর্ম্ম সংক্রান্ত যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে, তদ্দ্বারাও অনেক নূতন তত্ত্ব অবগত হওয়া যাইতেছে।

* Dr. Fuhrer : Winer Zistscrift fur die Kunde des Morganlandes, vols. ii and iii ; Epigraphia India. vols i and ii.

† Mr. Lewis Rice, in his Bangalore, 1889.

‡. M. A. Barth : The Religions of India. Bulletin des Religions I Indie, 1889-94.

§ Buhler : Uber die Indische Secteder Jaina, Wien, 1887.

** Bhandarkar's Report for 1883-84.

†† Aufrecht (Theodor), *Catalogus Catalogorum*, an Alphabetical Register of Sanscrit Works and Authors, Leipzig, 1891.

§§ Dr. A. Guerinot ;—*Essai de Bibliographic Jaina, repartoire analytique et methodique des travaux relatifs an Jainisme* (Paris, Leroux, 1906), and the supplement entitled '*Notes de Bibliographie Jaina*' (J. A. S., Juillet-Aout, 1909).

*** Barodia :—*History and Literature of Jainism*, Bombay, 1909 ; Mrs. Sinclair Stevenson :—*Notes on Modern Jainism*, Oxford, 1910.

††† Dr. Hoernle's Address to the Asiatic Society of Bengal (*Proc. A. S. B.*, 1898)

§§§ *Vide*, V. A. Smith's *Early History of India*.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

জৈন-দর্শন।

[জীবের মূল লক্ষ্য ;—মুক্তির পথ-চতুষ্টয় ;—প্রথম পথ—জ্ঞান,—তাহা পঞ্চবিধ ;—দ্বিতীয় পথ—বিশ্বাস ও ভক্তি,—তাহা দশবিধ ; তৃতীয় পথ—আচার,—তাহা পঞ্চবিধ ;—চতুর্থ পথ—ধর্ম্মপালনে কৃচ্ছ্রতা,—তাহার দুই ভাগ ;—পথ চতুষ্টয়ের স্থূল মর্ম্ম ;—মুক্তির পথে বিঘ্ন-বিপত্তি,—দ্বাবিংশ পরিসহ ;—সম্যক্ত্ব লাভে ত্রিসপ্ততি অধ্যবসায়,—তৎসমুদায়ের প্রকৃতি পরিচয় ;—কর্ম্মের স্বরূপ—কর্ম্ম অষ্টবিধ ; কর্ম্মত্যাগে জ্ঞানীর বিবিধ কর্ত্তব্য ;—জৈন-দর্শন-শাস্ত্রের অন্যান্য শিক্ষা।]

জীব অনন্ত দুঃখ-সমুদ্রের মধ্যে নিমগ্ন। সে চিরজীবন ভাবিতেছে—তাহার উদ্ধারের উপায় কি ? অনন্তকাল হইতে মানুষ আপন উদ্ধারের উপায় অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। মানুষের যত কিছু কর্ম্মানুষ্ঠান, মানুষের যত কিছু জ্ঞান-গবেষণা, সকলেরই মূল লক্ষ্য—আপন উদ্ধারের উপায় অন্বেষণ। কি করিয়া দুঃখ-পারাবার হইতে উত্তীর্ণ হইবে, কি করিয়া পরম সুখময় অনন্ত-শান্তিনিলয় প্রাপ্ত হইবে, সর্ব্বকালে ও সর্ব্ব-প্রকারে মানুষের সেই আকাঙ্ক্ষা—সেই আকিঞ্চন—সেই অধ্যবসায়। কিবা ইহলৌকিক, কিবা পারলৌকিক, সকল কর্ম্মের মধ্যেই সেই এক অভিন্ন আশার অনুসরণ দেখিতে পাই। নবীন বিজ্ঞান যে অভিনব আলোকে বিশ্ব পুলকিত করিয়াছে, তাহারই বা লক্ষ্যস্থল কোথায় ? আবার ঐ যে জ্ঞান-রাজ্যে জীবন্মুক্ত পুরুষগণের পুণ্যচিত্র প্রতিভাত হইতেছে, তাহার মধ্যেই বা কি শিক্ষা নিহিত রহিয়াছে ! এইরূপে একদিকে ইহলৌকিক সুখের ও অন্যদিকে পারলৌকিক সুখের অনুসন্ধান চলিয়াছে ; আর সেই অনুসন্ধানে অগ্রসর হইতে হইতে কচিৎ কেহ অনন্ত সুখের সন্ধান পাইতেছেন। জগতে যত ধর্ম্ম ও ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে, স্থূল-সূক্ষ্মভাবে সকলেরই লক্ষ্য—সেই পরম পথ প্রদর্শন।

মূল লক্ষ্য।

দর্শন-শাস্ত্রের বিচার-বিতণ্ডায় সেই পথ প্রদর্শিত। সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ই আপন আপন দর্শনশাস্ত্র সাহায্যে, সেই পথ প্রদর্শনের প্রয়াস পাইয়াছেন। আমাদের সাংখ্য, বৈশেষিক, পাতঞ্জল, ন্যায়, বেদান্ত, মীমাংসা—ষড়্দর্শন সেই পথই প্রদর্শন করিয়াছেন। অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের দর্শন-শাস্ত্রেরও সেই একই লক্ষ্য। সেই দুঃখনাশ-প্রয়াস, সেই অনন্ত সুখ-সন্ধান;—ইহা ব্যতীত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতের অন্য কি আর লক্ষ্য থাকিতে পারে ? কিসে অনন্তসুখময় অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়, অথবা শব্দান্তরে ভাবান্তরে কি উপায়ে নির্ব্বেদ নিষ্ক্রিয়

পথ-চতুষ্টয়।

নিরবলম্ব্য নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ হয়, সর্ব্বত্রই সেই অনুধ্যান। হিন্দু-দর্শনে কি ভাবে চিন্তার গতি প্রবাহিত, তাহার আভাষ পূর্ব্বেই আমরা প্রদান করিয়াছি। বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে, জৈনদর্শনের কতকগুলি সার শিক্ষার উল্লেখ করিতেছি। সেই যে পরম মুক্তির অবস্থা, সেই যে নির্ব্বেদ নিস্ক্রিয় অব্যক্ত অবস্থা, জৈনশাস্ত্র মতে সে অবস্থার নাম—'কেবল' অবস্থা। যিনি সেই অবস্থা লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, তিনি 'জিন' অথবা 'কেবলী' সংজ্ঞায় অভিহিত হন। কিন্তু সে অবস্থা কিরূপে পাওয়া যায়? যিনি সংসারকে জয় করিতে পারিয়াছেন, তিনিই 'জিন' (সংসারং জয়তীতি জিনঃ); যিনি রাগ-দ্বেষাদি দোষ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, অথবা যিনি কর্ম্মরূপ শত্রুকে সম্পূর্ণরূপ জয় করিতে পারিয়াছেন, তিনিই জিন (রাগদ্বেষাদিদোষান্ বা কর্ম্মশত্রূন্ জয়তীতি জিনঃ)। কিন্তু সে জিন পদ, সে মুক্ত অবস্থা কিরূপে অধিগত হয়? জৈনশাস্ত্র বলিতেছেন,—সৎ-জ্ঞান, সৎবিশ্বাস, সদাচার এবং ধর্ম্মবিধি প্রতিপালন—সেই পদপ্রাপ্তির পথস্বরূপ। উক্ত চতুর্ব্বিধ পথে অগ্রসর হইতে পারিলেই জিন-পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাই মুক্ত পুরুষ জিন-গণের উপদেশ।

প্রথম পথ জ্ঞান।

সেই যে মুক্তির প্রথম পথ—জ্ঞান, জৈনদর্শন মতে, তাহা পঞ্চবিধ;—(১) 'শ্রুত' অর্থাৎ ধর্ম্মগ্রন্থ-সমূহ হইতে প্রাপ্ত জ্ঞান; (২) 'অভিনিবোধিকা' অর্থাৎ অনুভূতি, স্মৃতি, বা চিন্তা; (৩) 'অবধি' অর্থাৎ অলৌকিক জ্ঞান; (৪) 'মনঃপর্য্যায়' (মননম্) অর্থাৎ অপরের চিন্তা-বিষয়ে জ্ঞান; (৫) 'কেবল' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ অনন্ত জ্ঞান। এই যে পঞ্চবিধ জ্ঞান, জৈনশাস্ত্র ইহার স্বরূপ-তত্ত্ব নিম্নলিখিত রূপে বুঝাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। মুক্ত-পুরুষগণ যথাক্রমে দ্রব্য, গুণ ও পর্য্যায় সম্বন্ধে জ্ঞান প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে, দ্রব্যমাত্রই গুণের আধার, গুণসমূহ দ্রব্যে অবস্থিত। কিন্তু পর্য্যায় বা বিকাশের প্রকৃতি এই যে, উহা দ্রব্যসমূহে বা গুণসমূহে স্বভাবতঃ বিদ্যমান। ধর্ম্ম অধর্ম্ম দিক কাল পদার্থ ও আত্মা—দ্রব্য এই ষড়্বিধ। এতদ্দ্বারাই পৃথিবী বিগঠিত। পরম জ্ঞানী জিনগণ এই জ্ঞান শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্ম অধর্ম্ম এবং দিক্—ইহারা প্রত্যেকে এক একটী দ্রব্য মাত্র; কিন্তু কাল পদার্থ এবং আত্মা—অগণিত সংখ্যক দ্রব্য বলিয়া উক্ত হয়। ধর্ম্মের প্রকৃতি—গতি; অধর্ম্মের প্রকৃতি—অচলত্ব। দিক্ আকাশ বা নভঃ অন্য সকল দ্রব্যই ধারণ করে, এবং সকল দ্রব্যেরই স্থান সঙ্কুলান করে। কালের প্রকৃতি—বর্ত্তন্ অর্থাৎ স্থিতি। আত্মার প্রকৃতি—জ্ঞান বিশ্বাস সুখ ও দুঃখ প্রভৃতির উপযোগ অর্থাৎ অনুভূতি। পদার্থের প্রকৃতি—শব্দ, অন্ধকার, দ্যুতি (মণি প্রভৃতির), আলো, ছায়া, সূর্য্যকিরণ; বর্ণ, আস্বাদন আঘ্রাণ, স্পন্দন। পর্য্যায়ের প্রকৃতি—একত্ব (এক বস্তুর ন্যায় অনুভব), পৃথকত্ব (বিভিন্ন বস্তুর ন্যায় স্বাতন্ত্র্য অনুভব), সংখ্যা, অবয়ব, সংযোগ এবং বিয়োগ। (১) জীব অর্থাৎ আত্মা; (২) অজীব অর্থাৎ অচেতন পদার্থ; (৩) বন্ধ অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারা আত্মার বন্ধন; (৪) পুণ্য অর্থাৎ যোগ্যতা; (৫) পাপ অর্থাৎ অযোগ্যতা; (৬) আস্রব অর্থাৎ যাহাতে পাপ কর্ত্তৃক আত্মা অভিহত হয়; (৭) সম্বর অর্থাৎ সতর্কতা দ্বারা

আস্রবের নিবারণ; (৮) কর্ম্মনাশ; (৯) পরমমুক্তি;—এই নয়টী সত্য অর্থাৎ সমান বর্গ। যিনি সম্পূর্ণরূপে পূর্ব্বোক্ত নয়বিধ মূল সত্য সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞান-সম্পন্ন।

দ্বিতীয় পথ বিশ্বাস বা ভক্তি।

মুক্তির দ্বিতীয় পথ—ভক্তি বা বিশ্বাস। জৈন দর্শনশাস্ত্র মতে উহা দশবিধ উপায়ে উৎপন্ন হয়;—(১) নিসর্গ বা প্রকৃতি; (২) উপদেশ অর্থাৎ শিক্ষালাভ; (৩) আজ্ঞা অর্থাৎ আদেশাদি পালন; (৪) সূত্র অর্থাৎ সূত্র-গ্রন্থাদি অধ্যয়ন; (৫) বীজ অর্থাৎ সঙ্কেত; (৬) অভিগম অর্থাৎ শাস্ত্রার্থের অনুধাবন; (৭) বিস্তার অর্থাৎ অনুশীলনের সম্পূর্ণ পাঠ, (৮) ক্রিয়া অর্থাৎ ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠান; (৯) সঙ্ক্ষেপ অর্থাৎ স্থূলভাবে ব্যাখ্যা; (১০) ধর্ম্ম অর্থাৎ বিধি। উপরোক্ত যে দশবিধ উপায়ে বিশ্বাস বা ভক্তি উৎপন্ন হয়, তাহা আরও একটু বিশদভাবে বুঝান হইয়াছে; যথা:—নিসর্গের বা প্রকৃতির কার্য্য তাঁহাতেই যথার্থ হইয়াছে, যাঁহার অন্তরের স্বয়ং-সমুদিত চেষ্টার ফলে আত্মা সম্বন্ধে, অচেতন পদার্থ বিষয়ে, পুণ্যপাপ সংক্রান্ত সত্য ধারণা জন্মিয়াছে এবং যিনি আস্রব-সম্বর অবস্থা লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ যে কারণে পাপ উৎপন্ন হইয়া আত্মাকে অভিহত করে, সতর্কতার দ্বারা সে কারণ রোধ করিয়াছেন; এইরূপ ব্যক্তির উপরই নিসর্গের প্রকৃত ক্রিয়া হইয়াছে। আত্মা, অচেতন পদার্থ, পাপ ও পুণ্য বিষয়ে জিনগণ যাহা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, সেই শিক্ষায় যিনি বিশ্বাসবান, পরন্তু অন্য ভ্রম-শিক্ষা যাঁহার মনে কদাচ স্থান পায় না, তাঁহারই উপর 'নিসর্গের' ক্রিয়া হইয়াছে। এই উপদেশ দ্বারা বোধগম্য হয় যে, যিনি কোনও জিনের নিকট অথবা 'ছদমস্থের' (যিনি 'কেবল' বা পূর্ণজ্ঞান লাভ করেন নাই, পরন্তু কতক দূর অগ্রসর হইয়াছেন) নিকট উপদেশ লাভ করিয়াছেন ও তাহাতেই বিশ্বাসবান আছেন, কখনও সত্যভ্রষ্ট নহেন, তাঁহারই উপর 'উপদেশ' প্রকৃত কার্য্যকরী হইয়াছে। 'আজ্ঞার' কার্য্যকারিতা তাঁহারই উপর সাধিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে, যিনি স্নেহ, ঘৃণা, বিভ্রম ও অজ্ঞতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন এবং সে বিষয়ে যাহা আদেশ পাইয়াছেন, তদনুসারে বিশ্বাসবান আছেন। সেইরূপ ব্যক্তিরই উপর 'আজ্ঞার' সার্থকতা। এইরূপ, 'সূত্র' তাঁহারই উপর প্রকৃত কার্য্যকরী হইয়াছে, যিনি সূত্র অঙ্গ বা অন্যান্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া সদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই রূপ, 'বীজ' সম্বন্ধে উক্ত দেখি,—যিনি একটী সত্য যথার্থরূপে ধারণা করিতে সমর্থ হইয়া অধিকের ধারণায় অগ্রসর হন, জলোপরি ভাসমান তৈলবিন্দু-বিস্তারবৎ তাঁহার জ্ঞানবীজ অঙ্কুরিত মুকুলিত ও বিস্তৃত হয়। এইরূপ, 'অভিগম' তাঁহাতেই সার্থক, যিনি প্রকৃতরূপে ধর্ম্মগ্রন্থ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ অর্থাৎ একাদশ অঙ্গ প্রকীর্ণসমূহ এবং দৃষ্টিবাদ অবগত আছেন। এইরূপ, 'বিস্তার' বা সকল ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ তাঁহারই হইয়াছে, যিনি প্রকৃতরূপে প্রমাণ ও ন্যায় প্রভৃতির সাহায্যে সকল পদার্থের প্রকৃত প্রকৃতি অবগত হইয়াছেন। এইরূপ, 'ক্রিয়া' বা ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠান তাঁহারই সার্থক, যিনি প্রকৃত জ্ঞান বিশ্বাস এবং আচার দ্বারা, সন্ন্যাস ও বিনয় দ্বারা এবং সর্ব্বপ্রকার সমিতি ও গুপ্তি দ্বারা একাগ্রচিত্তে সকল ধর্ম্মকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন। এইরূপ, 'সঙ্ক্ষেপ' তাঁহারই উপর সার্থকতা লাভ করিয়াছে, যিনি পবিত্র

প্রবচন বা নীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভ্যস্ত না হইলেও, ভ্রান্ত মত পরিগ্রহ করেন নাই বা অন্য প্রথা অবগত নহেন। এইরূপ, ধর্ম্ম বা বিধি তাঁহারই উপর কার্য্যকরী হইয়াছে, যিনি দ্রব্য গুণ প্রভৃতি ধর্ম্মের স্বরূপ-তত্ত্ব, সূত্রসমূহ- এবং আচার বিষয়ে, জিনগণের নিকট উপদেশ পাইয়া তাহাতে বিশ্বাসবান আছেন। ফলতঃ, যে দশবিধ উপায়ে বিশ্বাস বা ভক্তি উৎপন্ন হয়, সেই দশটী বিষয়ের বিশ্লেষণ ব্যাখ্যায় অনেক ভাব মনে আসে।

মুক্তির তৃতীয় পথ—আচার। এতদ্দ্বারা কর্ম্ম ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সে আচার কি প্রকারে উৎপন্ন হয়? জৈনশাস্ত্র বলেন,—পঞ্চবিধ উপায়ে সে অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়;

তৃতীয় পথ আচার।

(১) সামায়িক অর্থাৎ যে কোনও কার্য্যে পাপ উৎপন্ন হয়, সে সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ; (২) ছেদোপস্থাপন অর্থাৎ শিক্ষার্থীকে দীক্ষা দান; (৩) পরিহার বিশুদ্ধিকা * অর্থাৎ বিশেষ প্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য ধর্ম্মবিধি-পালনে পবিত্রতা লাভ; (৪) সূক্ষ্মসম্পরায় অর্থাৎ কামনার হ্রাসকরণ; (৫) অকষায়-যথাখ্যাত অর্থাৎ অর্হৎগণের অথবা কোনও ছদ্মস্থের বা জিনের উপদেশ অনুসারে পাপ অবস্থার ধ্বংস-সাধন। অতএব, সদাচারলাভ কি কঠোর আয়াসসাধ্য, তাহা তৎপ্রাপ্তি পক্ষে উল্লিখিত উপায়-পঞ্চকের আলোচনার দ্বারাই বোধগম্য হইতে পারে।

মুক্তির যে চতুর্থ পথ, তাহা ধর্ম্মপালনে কৃচ্ছ্রব্রত-গ্রহণ। জৈন-দর্শন সেই কৃচ্ছ্রতাকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন;—(১) বাহ্য; (২) আভ্যন্তর। সেই বাহ্য ও

চতুর্থ পথ ও স্থূল মর্ম্ম।

আভ্যন্তর কৃচ্ছ্রতা আবার ছয় ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। সে সকল অনেক বিচার-বিতর্কের বিষয়। এ ক্ষেত্রে তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। তবে, মুক্তির যে চতুর্ব্বিধ পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা হইতে স্থূলতঃ এই বুঝিতে পারা যায় যে, জ্ঞান দ্বারা বস্তুকে জানিতে পারা যায়, বিশ্বাস দ্বারা তাহার স্বরূপে আস্থা জন্মিতে পারে, আচার দ্বারা কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ ঘটে, ধর্ম্মকর্ম্মে কৃচ্ছ্রব্রতসাধনে পবিত্রতা আসে। আত্ম-সংযম এবং কৃচ্ছ্রব্রতসাধন দ্বারা কর্ম্ম-বীজ ধ্বংস করিয়া মুমুক্ষু জ্ঞানিগণ পূর্ণত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। সেই পূর্ণত্ব লাভ করিবার পথে, কি বিঘ্ন-বিপত্তি বিদ্যমান, মুক্তি অভিলাষী মানবের প্রথমে তাহা সন্ধান করা প্রয়োজন। আর সন্ধান করা প্রয়োজন, সত্ত্বগুণ কিরূপে উৎপন্ন হয়, কর্ম্মের লক্ষণ কি, আর কি করিয়াই বা কর্ম্মকে ক্ষয় করিতে পারা যায়। মুক্তিকামী

---

* পরিহার-বিশুদ্ধিকা অবস্থার একটী উদাহরণ টীকাকারগণ উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ,—নয় জন সন্ন্যাসী এক সময়ে আঠার মাস কাল একত্রে বাস করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে একজনকে 'কল্পস্থিত' বা সর্ব্বপ্রধান নির্দ্ধারণ করিয়া চারি জন পরিহারিক এবং অপর চারি জন তাঁহাদের সেবাপরায়ণ অনুপরিহারিক মধ্যে গণ্য হন। ছয় মাস পরে পরিহারিক ও অনুপরিহারিকগণ পরস্পর আপনাদের সংজ্ঞা ও কর্ত্তব্য পরিবর্ত্তন করিয়া লন। আর ছয় মাস পরে 'কল্পস্থিত' সন্ন্যাসী কঠোর প্রায়শ্চিত্তে প্রবৃত্ত হন। তখন, পরিহারিক ও অনুপরিহারিক উভয় দলই সেবাপরায়ণ অনুপরিহারক মধ্যে পরিগণিত হন ধর্ম্ম-পালনের কৃচ্ছ্রতা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। সেই কৃচ্ছ্রতার প্রভাবে যে পবিত্রতা সঞ্চিত হয়, তাহাই পরিহার-বিশুদ্ধিকা।

জ্ঞানের জন্ম চারিটি পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই পথের পরিচয় সংক্ষেপে প্রদান করা হইল। এখন পথে যে সকল বিঘ্ন-বিপত্তি অন্তরায় আছে, সংক্ষেপে তাহাদের বিষয়েও অভিজ্ঞ হইবার চেষ্টা করা যাউক।

মুক্তির পথে অগ্রসর হইবার সময়, মুমুক্ষু সন্ন্যাসীকে বহু বিঘ্ন-বিপত্তি অতিক্রম করিতে হয়। জৈনশাস্ত্রে সে বিঘ্ন-বিপত্তি 'পরিসহ' নামে অভিহিত। সন্ন্যাসীকে আনন্দ মনে নির্ব্বিকারভাবে যে সকল ক্লেশ সহ্য করিয়া মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে হয়, সে ক্লেশ-সহিষ্ণুতা 'পরিসহ' দ্বাবিংশ বিভাগে বিভক্ত। মহাবীর স্বামী উপদেশ দিয়াছেন,—সন্ন্যাসী মাত্রকেই দ্বাবিংশ পরিসহ বিষয়ে অভিজ্ঞ হইতে হইবে; তৎসমুদায়কে জয় করিতে পারিলেই সন্ন্যাসী-জীবনের সার্থকতা। সন্ন্যাসী মাত্রের জেতব্য সেই দ্বাবিংশ পরিসহ, যথা;—(১) দিগঞ্ছা বা জুগুপ্সা পরিসহ অর্থাৎ ক্ষুধা; ক্ষুধায় শরীর অবসন্ন হউক, তথাপি আত্ম-সংযমশীল সন্ন্যাসী কদাচ কোনও বস্তু আহারার্থ ছেদন করিবেন না অথবা কাহাকেও ছেদন করিয়া দিতে বলিবেন না, কোনও বস্তু রন্ধন করিবেন না অথবা কাহাকেও রন্ধন করিয়া দিতে বলিবেন না। ধর্ম্ম-পালন সম্বন্ধে এবম্বিধ আত্মসংযম, এবম্বিধ প্রায়শ্চিত্ত-পালন দিগঞ্ছা পরিসহ বলিয়া উক্ত হয়। (২) 'পিভাসা' অর্থাৎ পিপাসা পরিসহ। যদিও দেহ ক্ষুৎ-পিপাসায় কাকের চরণাস্থির ন্যায় বিশীর্ণ হইয়া আসে, শরীরের শিরা-সমূহ জালের ন্যায় প্রত্যক্ষীভূত হয়, তথাপি শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট খাদ্য ও পানীয় ভিন্ন সন্ন্যাসী অন্য কিছুই গ্রহণ করিবেন না। (৩) 'সিয়' অর্থাৎ শীত পরিসহ; শীতে অস্থি-কঙ্কাল অবশেষ হইলেও সন্ন্যাসী কখনও কর্ত্তব্য-পালনের সীমা উল্লঙ্ঘন করিবেন না। (৪) 'উসিন' অর্থাৎ উষ্মা পরিসহ; যদি উষ্ণতায় দেহ বিদগ্ধ হয়, আপন ধর্ম্মপালনে, সন্ন্যাসীকে তৎপ্রতি উপেক্ষা করিতে হইবে। (৫) 'দংসমসয়' বা দংশ-মশক পরিসহ; মশক ও মক্ষিকা প্রভৃতির দংশন অবাধে সহ্য করিতে হইবে। মহাযোগী কখনও কীট-পতঙ্গের দংশনে বিচলিত হইবেন না। মত্তহস্তী যুদ্ধকালে, শত্রুকে যে ভাবে বিনষ্ট করে, আপন রিপু-শত্রুকে মানুষ সেই ভাবে নির্ম্মূল করিবে বটে; কিন্তু কীট-পতঙ্গে মেদমাংস-রক্ত মোক্ষণ করিতেছে বলিয়া কদাচ বিচলিত হইবে না। প্রাণী হইতে কষ্ট পাইতেছে মনে করিয়া প্রাণিবধ পরম অধর্ম্ম। (৬) 'অচেল পরিসহ' অর্থাৎ দিগম্বরভাব; পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন হইতেছে, সুতরাং নূতন বস্ত্র সংগ্রহ করিব,—এ ভাব কখনও সন্ন্যাসীর মনে আসিবে না। পরিধেয় মিলে, মিলিবে; না মিলে, নাই মিলিবে;—এই যে সহিষ্ণুতা, ইহারই নাম—অচেল-পরিসহ। (৭) 'অরতি পরিসহ'; কোনও বিষয়েই রতি বা আকাঙ্ক্ষা নাই,—ইহাই অরতি-পরিসহ। (৮) 'ইথি-পরিসহ' অর্থাৎ স্ত্রীর বা রমণীর প্রতি লালসা-পরিশূন্যতা। (৯) 'চরিয়া' অর্থাৎ চর্য্যা পরিসহ; যথা-প্রাপ্ত খাদ্যে জীবনধারণ পূর্ব্বক দেশে বিদেশে পরিভ্রমণ ও শ্মশানে কবরস্থানে প্রান্তরে অবিস্থিতিরূপ কষ্টজনিত সহিষ্ণুতা। (১০) 'নিসীহিয়া' অর্থাৎ নৈষেধিকী-পরিসহ; পরিত্যক্ত স্থানে অবস্থিতিপূর্ব্বক কাহাকেও উত্যক্ত না করিয়া আত্মোৎকর্ষসাধন এই পরিসহের প্রতিপাদ্য। (১১) 'সেজ্জা' অর্থাৎ শয্যা-পরিসহ; শয্যা যেমনই হউক, বাস-

দ্বাবিংশ পরিসহ।

স্থান যেমনই হউক, তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই। (১২) 'অক্কোস' অর্থাৎ আক্রোশ-পরিসহ; কেহ গালি-বর্ষণ করিলেও ক্রোধ নাই, সরল বালকের ন্যায় স্তুতি-নিন্দায় উপেক্ষার ভাব। (১৩) 'বহ' অর্থাৎ বধ-পরিসহ; কেহ প্রহার করিলেও রাগ নাই অথবা প্রহারকালিক অমঙ্গল চিন্তার উদয় হয় না। সহিষ্ণুতাই শ্রেষ্ঠগুণ মনে করিয়া ধর্ম্ম-চিন্তায় প্রবৃত্ত হওয়া, এবং কেহ পুনঃ পুনঃ প্রহার করিলেও 'আমি তো মরিয়া যাই নাই' মনে করিয়া নিশ্চিন্ত ভাব। (১৪) 'জায়ণা' অর্থাৎ যাচ্ঞা-পরিসহ; ভিক্ষা কেহ প্রদান করুন বা নাই করুন, তৎপ্রতি অণুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই; পরন্তু তজ্জন্য গৃহস্থাশ্রমেও অনুরাগ নাই। (১৫) 'অলাভ-পরিসহ' মধ্যাহ্নে গৃহস্বামীর নিকট ক্ষুধার অন্ন প্রার্থনা করিয়াও না পাইলে ক্ষোভ নাই; অপিচ, 'আজ না পাই, আর এক দিন পাইব' মনে করিয়া তৃপ্তিলাভ। (১৬) 'রোগ-পরিসহ'; পীড়ায় কষ্ট-সহিষ্ণুতা, ঔষধের জন্য ব্যাকুলতা নাই; আত্মার শান্তিলাভই চরম লক্ষ্য। (১৭) 'তন-ফাস' অর্থাৎ তৃণস্পর্শ-পরিসহ; বসনের ও আসনের অভাব; সূচী-মুখ তৃণের উপর শয়ন ও উপবেশন; সূর্য্যতাপে বিদগ্ধ-দেহ; তথাপি সাধনায় চাঞ্চল্য আসে না। (১৮) 'জল্ল-পরিসহ'; দেহে ধূলি-বৃষ্টি, কর্দ্দম-বৃষ্টি, হিমশিলা পতন হইতেছে; কিন্তু তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই; পরন্তু কিসে কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হয়, সর্ব্বদা সেই প্রয়াস। (১৯) 'সকার-পুরকার' অর্থাৎ সৎকার-পুরস্কার-পরিসহ; কেহ সদয় ব্যবহার করিলেও নিরুদ্বেগ; কেহ নির্দ্দয় ব্যবহার করিলেও উদ্বেগ নাই। (২০) 'পন্না' অর্থাৎ প্রজ্ঞা পরিসহ; পূর্ব্ব-কর্ম্মের ফলে কষ্টপ্রাপ্তি বিষয়ে অভিজ্ঞতা, এবং বর্ত্তমান কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিবার পক্ষে জ্ঞান-সঞ্চয়। (২১) 'অন্নাণ' অর্থাৎ অজ্ঞান-পরিসহ; অজ্ঞানতা আসিয়া নানা প্রকারে প্রলুব্ধ করে, সেই প্রলোভন হইতে সাবধানতা অবলম্বন। (২২) 'সম্মত্ত' অর্থাৎ সম্যকত্ব; সত্ত্ব-ভাবের বিকাশ। সন্ন্যাসী কখনও মনে করিবেন না যে, পরজন্ম নাই অথবা প্রায়শ্চিত্ত প্রভাবে শ্রেষ্ঠ মুক্ত অবস্থা লাভ করিতে পারে না; জিনগণ বিদ্যমান ছিলেন, বিদ্যমান আছেন এবং বিদ্যমান থাকিবেন। এ সত্য যাঁহারা অস্বীকার করেন, সন্ন্যাসিগণ কখনও তাঁহাদের কথায় প্রত্যয় করিবেন না। এতদ্বিষয়ক বিভ্রম হইতে যিনি বিমুক্ত হইতে পারিয়াছেন, তাঁহারই সম্যকত্ব-পরিসহ সিদ্ধ হইয়াছে। মুক্তির পথে এই যে দ্বাবিংশ বিঘ্ন বা পরিসহ বিদ্যমান রহিয়াছে, সন্ন্যাসীর প্রধান কর্ত্তব্য, তাহা হইতে উদ্ধারলাভের চেষ্টা করা।

সম্যকত্ব বা সত্ত্বগুণের বিকাশ অবস্থা কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এক্ষণে তাহা আলোচনা করা যাইতেছে। কি চেষ্টা করিলে, কি প্রকার প্রয়াস পাইলে, সেই পরিপূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ মুক্তির স্বরূপ মুক্তির পরম সুন্দর, সর্ব্বদুঃখের শেষকর অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়, মহাবীর স্বামী তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। সেই উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকটন করা যাইতেছে। যে অধ্যবসায় বা যে উপায়ের দ্বারা সন্ন্যাসী সম্যকত্ব বা সৎ-স্বরূপত্ব-লাভে সমর্থ হইবেন, তৎসমুদায় ত্রিসপ্ততি বিভাগে বিভক্ত। যথা;—(১) "সম্বেগ" অর্থাৎ মুক্তির জন্য ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষার ফলে, আত্মা ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইবার জন্য ব্যাকুল হয়। ধর্ম্ম-বিষয়ক ব্যাকুলতা হইতে মুক্তির

সম্যকত্ব লাভের উপায়।

আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। তাহার ফলে, ক্রোধ অহঙ্কার কপটতা লোভ বা তৃষ্ণা বিধ্বংস হয়। ক্রোধ অহঙ্কার প্রভৃতির ফলে অনন্তকাল হইতে জন্মজন্মান্তরের জ্বালা ভোগ করিতে হইতেছে। যাঁহাদের মুক্তির জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মে, তিনি কুকর্ম্ম-জনিত বন্ধনে আর নূতন আবদ্ধ হন না; অহঙ্কারাদি-জনিত ভ্রান্ত বিশ্বাস হইতেও তিনি মুক্তিলাভ করেন। ক্রমশঃ তাহাতে সদ্বিশ্বাস সঞ্জাত হয়। সেই সদ্বিশ্বাসের ফলে, একজন্মের পরেই তিনি পূর্ণত্বলাভে সমর্থ হন। যাঁহার বিশ্বাস পবিত্র হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি সদ্বিশ্বাসের অধিকারী হইয়াছেন, তিন জন্মের মধ্যেই তাঁহার পূর্ণত্বলাভ অবসম্ভাবী। সুতরাং যাঁহাদের সম্ভেগ বা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে, তাঁহাদের পূর্ণত্ব-লাভের পথ ক্রমেই সরল হইয়া আসিতেছে। (২) "নির্ব্বেদ" অর্থাৎ পার্থিব পদার্থে অশ্রদ্ধা; জন্মচক্রে ঘৃণার উদ্রেক হইলে, পার্থিব পদার্থে অরতি জন্মিলে, দেবগণ মনুষ্যগণ বা প্রাণিগণ, সংসারে যে সুখ আস্বাদন করেন, তৎপ্রতি ঘৃণা বা বিরক্তির ভাব আসে; সকল পদার্থের প্রতি নির্বেদ উপস্থিত হয়। এইরূপে যখন সকলেরই সহিত সম্বন্ধের অভাব ঘটে, সংসার-পথ পরিত্যাগ করিয়া মানুষ তখন পূর্ণত্বের পথে প্রবেশ করে। (৩) "ধর্ম্মশ্রদ্ধা" অর্থাৎ ধর্ম্মের প্রতি ঐকান্তিকতা। ধর্ম্মের প্রতি ঐকান্তিকতার ফলে, সংসারের সকল প্রকার সুখের ও আনন্দের প্রতি নিস্পৃহভাব আসে। তখন মানুষ গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করে এবং গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া শারীরিক ও মানসিক সর্ব্ববিধ ক্লেশের অবসান করে। কর্ত্তনে, বিদ্ধকরণে বা সংযোগ-সাধনে যে কষ্ট উৎপন্ন হয়, এ অবস্থায় তাহা দূরে যায়, অবাধ-সুখের অধিকারী হয়। (৪) "গুরুসাধর্ম্মিকশুশ্রূষণ" অর্থাৎ সমধর্ম্মীদিগের এবং গুরুর আজ্ঞানুবর্ত্তিতা। এতদ্দ্বারা আত্মা 'বিনয়' * অর্থাৎ সৎশিক্ষা লাভ করে। বিনয় প্রভাবে এবং অনাচার পরিত্যাগে পুনর্জ্জন্মের পথ রুদ্ধ হয়। অন্ধতম নরকে, পশুপক্ষিরূপে, নীচ মনুষ্য মধ্যে অথবা অপদেবতা পর্য্যায়ে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। পরন্তু, গুরুর প্রতি অনুরক্তি প্রদর্শনে তাঁহার প্রশংসা-কীর্ত্তনে তাঁহার সম্মাননার ফলে, সৎ-মনুষ্যরূপে অথবা দেবতারূপে জন্মপরিগ্রহ হয়। এইরূপে বিনয়-নির্দ্দিষ্ট প্রশংসনীয় কর্ম্ম-পরম্পরা সম্পন্ন করিতে করিতে পূর্ণত্বের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। (৫) "আলোচনা" অর্থাৎ গুরু-সমক্ষে কৃতপাপ স্বীকার। এতদ্দ্বারা প্রতারণা, ভ্রমবিশ্বাস, বৃথা শারীরিক ক্লেশ-স্বীকার প্রভৃতিরূপ কণ্টক-বেধ হইতে আত্মা মুক্তিলাভ করেন। পূর্ণমুক্তির পথে বিঘ্নস্বরূপ ঐ কণ্টকসমূহ আত্মাকে অসংখ্য জন্মের পথে বিঘূর্ণিত করে। গুরুর নিকট আপন কৃত-পাপস্বীকারে যে সরলতা সঞ্জাত হয়, তাহাতে আত্মা কপটতা-সংস্রব-শূন্য হওয়ায় আর নূতন কর্ম্ম উৎপাদন করে না; পরন্তু পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্ম ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। (৬) "নিন্দা" অর্থাৎ কৃতপাপ বিষয়ে অনুশোচনা। তদ্দ্বারা পাপকর্ম্মে অননুরাগ হেতু আত্মকর্ম্ম ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়। (৭) 'গর্হা' অর্থাৎ পাপ-সম্বন্ধে গুরুর নিকট অনুশোচনা-প্রকাশ। ইহাতে বিনয়ের বা অনাত্মিকাভাবের উদয় হয়। তজ্জন্য পুনরায় দোষাবহ কার্য্যে প্রবৃত্তি আসে না; পরন্তু,

* 'বিনয়' শব্দ বহুভাবদ্যোতক। বিনয়—নির্ব্বাণের মূলীভূত। বিনয় শিক্ষার অধিকারী যে-কোনও ব্যক্তি হইতে পারে না। বিনয় কাহাকে বলে, আর কোন্ জন বিনয় শিক্ষার অধিকারী, উত্তরাধ্যয়ন-সূত্রে প্রথম অধ্যয়নে তাহার আলোচনা আছে। আমরা স্থানান্তরে তাহার আভাষ প্রদান করিলাম।

প্রশংসনীয় কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী জন্মহেতুভূত কর্ম্মে বিরত হন। (৮) 'সামায়িক' অর্থাৎ আত্মার নৈতিক ও মানসিক পবিত্রতা। এতদ্দ্বারা আত্মা পাপ-জনক কার্য্যে বিরত হন। (৯) 'চতুর্ব্বিংশতি স্তব' অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতি জিনের উপাসনায় আত্মার সদ্‌বিশ্বাসসম্পন্নতা। (১০) বন্দনা অর্থাৎ গুরুর প্রতি ভক্তি ও সম্মান-প্রকাশ। এতদ্দ্বারা নীচবংশে জন্মগ্রহণ-মূলক কর্ম্ম ধ্বংস-প্রাপ্ত হয় এবং উচ্চবংশে জন্মগ্রহণের মূলীভূত কর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া থাকে। এরূপ ব্যক্তিকে সকলেই শ্রদ্ধা করেন ও সম্মানের চক্ষে দেখেন; অপিচ, তাঁহার প্রতি সকলেরই সদিচ্ছা-সদ্ভাব প্রকাশ পায়। (১১) 'প্রতিকর্ম্মণ' অর্থাৎ পাপ কার্য্য হইতে বিরতি বা পাপকার্য্যের প্রতি বিতৃষ্ণা। এতদ্দ্বারা প্রতিজ্ঞাভঙ্গের আশঙ্কা থাকে না, আশ্রব ধ্বংস হয়, সচ্চরিত্রতা রক্ষা পায়, অষ্ট-মায়া (মাতা বা মাত্রা) * অনুশীলন হয়, আত্মসংযমে অবহেলা আসে না, পরন্তু দৃঢ়তা জন্মে। (১২) 'কায়োৎসর্গ'; ইহাকে এক প্রকার যৌগিক-ক্রিয়া বলিলেও বলা যাইতে পারে। এতদ্দ্বারা অতীত ও বর্ত্তমান প্রায়শ্চিত্ত হইতে মুক্তিলাভ হয়। ভারবাহীর মস্তকের গুরু-ভার অপসৃত হইলে, সে যেমন সুস্থতা বোধ করে, কায়োৎসর্গ দ্বারা মানুষের অন্তর সেইরূপ প্রশান্তভাব প্রাপ্ত হয়; তখন, একমাত্র সচ্চিন্তায় মন নিবিষ্ট হওয়ায় যোগী পুরুষ আনন্দ অনুভব করে। (১৩) 'প্রত্যাখ্যান' অর্থাৎ আত্ম-সংযম। এতদ্দ্বারা আশ্রবের পথ রুদ্ধ হয়, কামনা লোপ পায়; আর তাহার ফলে, সকল পদার্থের প্রতি অরতি ও প্রশান্ত ভাব জন্মে। (১৪) 'স্তবস্তুতি মঙ্গল' অর্থাৎ প্রার্থনা ও উপাসনা। এতদ্দ্বারা উন্নত অবস্থায় উপনীত হওয়ায় পার্থিব বিস্ময়মানতা লোপ পায়; কল্পে এবং বিমানে (স্বর্গ বিশেষে) স্থান হয়। (১৫) 'কালস্য প্রত্যুপেক্ষণা।' অর্থাৎ,—সময়ের সদ্ব্যবহার। এতদ্দ্বারা সংজ্ঞানের বাধা প্রদানকারী কর্ম্ম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। (১৬) প্রায়শ্চিত্তকরণ; এতদ্দ্বারা পাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়; কোনও অন্যায় আচরণে প্রবৃত্তি আসে না। যিনি যথাযথ প্রায়শ্চিত্ত করেন, তিনি প্রকৃত পথ ও পথের পুরস্কার প্রাপ্ত হন। পথ বলিতে, সংজ্ঞান লাভের উপায়, পুরস্কার বলিতে সংজ্ঞান; সংজ্ঞানই মুক্তি। (১৭) 'ক্ষমাপণ' অর্থাৎ ক্ষমা-প্রার্থনা। ইহাতে মনের আনন্দ জন্মে। সর্ব্বপ্রকার প্রাণীর † প্রতি করুণার ভাব আসে; আর তাহাতে চরিত্রের পবিত্রতা ও ভয় হইতে মুক্তি লাভ হয়। (১৮) 'স্বাধ্যায়' অর্থাৎ শাস্ত্রানুশীলন; সংজ্ঞান-অবরোধকারী কর্ম্ম ইহাতে লোপ পায়।

* এই 'মায়া' শব্দ সংস্কৃতে 'মাতা' বা 'মাত্রা' রূপে পরিব্যক্ত হয়। জৈনদর্শন-মতে পঞ্চবিধা 'সমিতি' ও ত্রিবিধা 'গুপ্তি' এই অষ্টবিধা 'মায়া'। সমিতির ও গুপ্তির বিষয় আলোচনা করিতে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ প্রকটনের প্রয়োজন। প্রথম সমিতি 'ঈর্য্যা'-সমিতি। ঈর্য্যা-সমিতির অর্থ—মনুষ্য, পশু বা রথাদি যে পথে গমন করে, সেই পথে গমন করিতে হইবে; অথচ, তৎপথে গমন-জনিত কোনও প্রাণী নিহত না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এইরূপ এক এক সমিতির এক এক ক্রিয়া। গুপ্তি ও সমিতির মূল তথ্য অন্যত্র আলোচিত হইল।

† মূলে আছে, 'সব্বপাণভূয়জীবসত্ত'। জৈন মতে, যাহারা দুই হইতে পাঁচ ইন্দ্রিয়ের অধিকারী, তাহারাই প্রাণ-সম্পন্ন। জীবগণ পঞ্চেন্দ্রিয়ের অধিকারী। উদ্ভিদগণ ভূত নামে অভিহিত। অন্যান্য প্রাণী সত্ত্বা পর্য্যায়ভুক্ত।

(১৯) 'বাচনা' অর্থাৎ পবিত্র পাঠ উচ্চারণ; শাস্ত্রোক্তি-সমূহ আবৃত্তির ফলে কর্ম্ম ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়, ধর্ম্মশাস্ত্র সংরক্ষিত হয়, পার্থিব অস্তিত্বের অবসান হইয়া আইসে। (২০) 'পরিপৃচ্ছনা' অর্থাৎ গুরুর নিকট প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা; ইহাতে সূত্রের ধারণা ও সদর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সন্দেহ ও ভ্রমজনিত যে কর্ম্ম, তাহা এতদ্দ্বারা লোপ পায়। (২১) 'পরাবর্ত্তনা' অর্থাৎ পুনঃপুনঃ উচ্চারণ; শাস্ত্রবাক্য পুনঃপুনঃ উচ্চারণে শব্দ জ্ঞান হয় এবং তাহার স্মৃতিমধ্যে সম্বদ্ধ থাকে। (২২) 'অনুপ্রেক্ষা' অর্থাৎ শিক্ষিত বিষয় পুনঃপুনঃ চিন্তা করা। সপ্তবিধ কর্ম্মের যে বন্ধন, এতদ্দ্বারা তাহা শ্লথ হইয়া আসে। ইহাতে আয়ুষ্ক (অর্থাৎ যে কর্ম্ম দ্বারা মানুষ নির্দ্দিষ্ট সময় নির্দ্দিষ্ট কাল জীবিত থাকিবার আকাঙ্ক্ষা করে, তাহা ভিন্ন।) আয়ুষ্ক কর্ম্ম উৎপন্ন হউক বা না হউক, কিন্তু ক্লেশপ্রদ কর্ম্ম-মাত্রই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। (২৩) 'ধর্ম্মকথা' অর্থাৎ ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা। (২৪) 'শ্রুতস্যারাধনা'—ধর্ম্মগ্রন্থ সংক্রান্ত পবিত্র জ্ঞান লাভ। (২৫) 'একাগ্রমনঃসন্নিবেশনা'—সচ্চিন্তা কেন্দ্রীভূতীকরণ। (২৬) 'সংযম'—সংযম দ্বারা পাপ হইতে মুক্তি লাভ ঘটে। (২৭) 'তপস্'; তপস্যার প্রভাবে কর্ম্ম ছিন্ন হয়। (২৮) 'ব্যবধান'—এতদ্দ্বারা কর্ম্ম ছিন্ন হয়। (২৯) 'সুখা-শাত'; সুখের আশা পরিত্যাগ—কর্ম্ম-ধ্বংসের এক প্রধান উপাদান। (৩০) 'অপ্রতি-বদ্ধতা'—মানসিক স্বাধীনতা; পার্থিব পদার্থের প্রতি আকর্ষণ ছিন্ন করিয়া স্বাধীনভাবে ধর্ম্ম-চিন্তায় মনোনিবেশ। (৩১) 'বিচিত্রশয়নাসনসেবনা'—জনসমাগমশূন্য স্থানে বাস ও শয়ন। ইহাতে খাদ্যের ও আচারের সংযম থাকে; অষ্টবিধ কর্ম্ম হইতে মুক্তি ঘটে। (৩২) 'বিনিবর্ত্তনা'—পৃথিবীর সহিত সম্বন্ধ-ত্যাগকল্পে সর্ব্বপ্রকার কুকর্ম্মে বিরতি, পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মের ধ্বংস-সাধন। (৩৩) 'সম্ভোগ-প্রত্যাখ্যান'—একস্থানে বা এক প্রদেশে ভিক্ষা-গ্রহণে বিরতি। একস্থানে অবস্থিতি হেতু নানারূপ লোভ মোহ সুখেচ্ছা সঞ্জাত হয়। সেই জন্য একস্থানে অধিক দিন অবস্থিতি-পূর্ব্বক ভিক্ষা গ্রহণও নিষেধ। (৩৪) 'উপাধি-প্রত্যাখ্যান'—ব্যবহার্য্য দ্রব্য পরিত্যাগ। ব্যবহারের উপযোগী কোনও দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে তজ্জনিত অভাব বোধ হয় না। তাহাই সুখ। এইরূপ (৩৫—৪১) প্রত্যাখ্যান—আহার, কষায়, যোগ, শরীর, সাহায্য, ভক্ত, সদ্ভাব সম্বন্ধে আবশ্যক। আহারের জন্য আকাঙ্ক্ষা নাই, রিপুশত্রুবিমর্দ্দিত, নৈষ্কর্ম্মভাব, দেহে মমতাশূন্যতা, সহচরে আকাঙ্ক্ষাভাব, সর্ব্ববিধ খাদ্য-গ্রহণে বিরতি, সর্ব্বভাব বিবর্জ্জন—সম্যকত্ব লাভের পথে পরম সহায়। (৪২) 'প্রতিরূপতা'—স্থবিরগণ ও সাধুগণ যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই পথের অনুসরণ। (৪৩) 'বৈয়াবৃত্য'—তীর্থঙ্করের নাম ও গোত্র লাভ জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান। (৪৪) 'সর্ব্বগুণ-সম্পূরণতা'; পূর্ণরূপে সকল গুণের অধিকারী হইলে পুনর্জ্জন্ম হয় না; শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ নাশ হয়। (৪৫) বীতরাগতা—কামনায় আকর্ষণ হইতে মুক্তি; শব্দ, স্পর্শ, বর্ণ, গন্ধ—প্রীতিপ্রদ হউক বা অপ্রীতিপ্রদ হউক, তৎপ্রতি বীতরাগ। (৪৬) ক্ষান্তি—সর্ব্ব-বিপদে সহিষ্ণুতা। (৪৭) মুক্তি; তৃষ্ণা হইতে পরিত্রাণ লাভ। (৪৮) আর্জব—সরলতা। (৪৯) মার্দব—অহঙ্কার পরিত্যাগ, নম্রভাব। (৫০—৫২) ত্রিবিধ সত্য—ভাব, করণ, যোগ। এই ত্রিবিধ সত্যের সাধনায় মনের সরলতা, বাক্যের সরলতা

এবং কর্ম্মের সততা আসে। (৫৩—৫৫) ত্রিবিধ গুপ্ততা—মন, বাক্, কায়; এতদ্দ্বারা মন বাক্য কায় সর্ব্বকর্ম্মে সতর্কতা অবলম্বনে সমর্থ হয়। (৫৬—৫৮) ত্রিবিধ সমাধারণা—মনঃ, বাক্, কায়, এতদ্দ্বারা মন বাক্য ও দেহ বিনয়-সম্পন্ন নিয়মানুগত হয়। (৫৯-৬১) ত্রিবিধ সম্পন্নতা—জ্ঞান, দর্শন, চরিত্র; এতদ্দ্বারা আচার, বিশ্বাস ও জ্ঞান অধিকৃত হয়। (৬২—৬৬) পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহ—শ্রোত্র, চক্ষু, ঘ্রাণ, জিহ্বা, স্পর্শ; এতদ্দ্বারা পঞ্চেন্দ্রিয়ের লালসা দমিত হয়। (৬৭—৭১) বিজয়-পঞ্চক—ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ, প্রেমোদ্দেশ-মিথ্যাদর্শন; এই পঞ্চ অভিজয়ে রাগ অহঙ্কার, ভ্রান্তি, আকাঙ্ক্ষা বিজিত হইবে; অপিচ, প্রেম, দ্বেষ, মিথ্যা বিশ্বাস তিরোহিত হইবে। (৭২) শৈলেশী অর্থাৎ সর্ব্ববিধ কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া 'কেবলী' অবস্থায় উপস্থিতি। এ অবস্থায় সাধকের সকল কর্ম্ম লোপ পাইয়াছে, তিনি পবিত্র চিন্তায় নিমজ্জিত রহিয়াছেন; ক্রমে ক্রমে তাঁহার অবশিষ্ট কর্ম্ম-চতুষ্টয় (বেদনীয়, আয়ুষ্ক, নামন ও গোত্র) লোপ পাইতেছে। (৭৩) অকর্ম্মতা—অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মুক্ত সম্ভাব। এখন দেহরূপ তৈজস্ পরিত্যাগ করিয়া আত্মা ঋজু পথে বিমানে উপনীত হইয়া পরম মুক্তির অবস্থা লাভ করিয়াছে। সেই অবস্থাই সৎ অবস্থা। ত্রিসপ্ততি অধ্যবসায় প্রভাবে কি প্রকারে সেই অবস্থায় উপস্থিত হওয়া যায়, তাহা যে গভীর গবেষণার বিষয়, উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনাতেই তাহা বোধগম্য হয়।

যে কর্ম্মের কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য শাস্ত্রগ্রন্থের অশেষ উপদেশ, সে কর্ম্মের প্রকৃতি-পরিচয় জৈন ধর্ম্মগ্রন্থে কিরূপভাবে প্রদত্ত হইয়াছে, অতঃপর তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার চেষ্টা পাইতেছি। যে কর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া আত্মা জন্মচক্রে পুনঃপুনঃ বিঘূর্ণিত হইতেছে, জৈন ধর্ম্মশাস্ত্র মতে সে কর্ম্ম অষ্টবিধ; যথা;—(১) জ্ঞানাবরণীয় অর্থাৎ যে কর্ম্ম দ্বারা সত্য-জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে। (২) দর্শনাবরণীয়—অর্থাৎ, যে কর্ম্ম দ্বারা সত্য-বিশ্বাসকে আচ্ছন্ন রাখে। (৩) বেদনীয়—অর্থাৎ, যে কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত দুঃখ বা সুখ অন্বেষণে অনুধাবিত হয়। (৪) মোহনীয়—অর্থাৎ, যে কর্ম্ম দ্বারা ভ্রান্তি উৎপাদন করে, ভ্রান্তি পথে লইয়া যায়। (৫) আয়ুঃকর্ম্মন্ অর্থাৎ যে কর্ম্ম দ্বারা আয়ুঃকাল বৃদ্ধির পক্ষে চেষ্টা আসে। (৬) নামন্ অর্থাৎ যে কর্ম্ম দ্বারা দেহস্থ আত্মাকে নাম-রূপে পরিচিত করিতে প্রয়াস হয়। (৭) গোত্র অর্থাৎ যে কর্ম্ম দ্বারা গোত্র নির্দ্ধারণে আগ্রহ আসে। (৮) অন্তরায় অর্থাৎ অনন্ত সুখের পথে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে যে কর্ম্ম বিঘ্নস্বরূপ বিদ্যমান থাকে। কর্ম্ম সাধারণতঃ এই অষ্টবিধ; কিন্তু এই অষ্টবিধ কর্ম্মের আবার নানা বিভাগ ও উপবিভাগ আছে। যাহা 'জ্ঞানাবরণীয় কর্ম্ম', তাহা পঞ্চবিধ; 'শ্রুত'—ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন-জনিত জ্ঞান; 'অভিনিবোধিকা'—অনুভূতিজনিত জ্ঞান; 'অবধিজ্ঞান'—অমানুষিক অতীন্দ্রিয় জ্ঞান; 'মনঃপর্য্যায়'—অপর ব্যক্তির চিন্তা বিষয়ে জ্ঞান; 'কেবল'—শ্রেষ্ঠ অনন্ত জ্ঞান। এইরূপ দর্শনাবরণীয় কর্ম্ম আবার নববিধ। সেই নববিধ কর্ম্ম সদ্বিশ্বাসে বাধা প্রদান করে। সেগুলি এইরূপ;—যথা,—(১) নিদ্রা; নিদ্রার যাহা সাধারণ অর্থ, 'দীপিকা'-কার তাহার এক সূক্ষ্ম অর্থ নির্দ্দেশ করেন। তদনুসারে নিদ্রা শব্দে—জাগরণের আনন্দময় অবস্থা। (২) প্রচলা—

অষ্টবিধ কর্ম্ম।

কর্ম্মশীলতা; দীপিকার মতে, দণ্ডায়মান বা উপবেশন অবস্থায় তন্দ্রাভাব। (৩) নিদ্রানিদ্রা—অতি প্রগাঢ় নিদ্রার অবস্থা। (৪) প্রচলাপ্রচলা—অতিরিক্ত মাত্রায় কর্ম্মশীলতা; দীপিকার মতে—গতিশীল মনুষ্যের নিদ্রাভাব। (৫) গভীরভাবে অন্তর্নিহিত প্রবল তৃষ্ণা। (৬) চক্ষু। (৭) অচক্ষু। জ্ঞানাবরণীয় কর্ম্মের মধ্যে 'অভিনিবোধিকা' ও 'শ্রুত' বিভাগদ্বয় যে অর্থে প্রযুক্ত, টীকাকারগণের মতে, চক্ষু ও অচক্ষু তদ্ভাবদ্যোতক। (৮—৯) প্রথমোক্ত তিনটী বিষয়ে বিশ্বাস এবং তৎপরবর্ত্তী দুইটি বিষয়ে জ্ঞান।

জ্ঞানাবরণীয় ও দর্শনাবরণীয় কর্ম্ম যেমন যথাক্রমে পাঁচ ও নয় ভাগে বিভক্ত; বেদনীয় মোহনীয় প্রভৃতি কর্ম্মও সেইরূপ বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত দেখি। বেদনীয় কর্ম্ম দ্বিবিধ; সুখ ও দুঃখ। সুখ ও দুঃখ যে আবার নানাভাগে বিভক্ত হইতে পারে, তাহা বলাই বাহুল্য। মোহনীয় কর্ম্ম 'বিশ্বাস' ও 'আচার' বিধায় প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। বিশ্বাস-বিষয়ক মোহনীয় কর্ম্ম আবার ত্রিবিধ; (১) সত্য বিশ্বাস, (২) অসত্য বিশ্বাস, (৩) আংশিক সত্য বিশ্বাস ও আংশিক অসত্য বিশ্বাস। আচার-বিষয়ক মোহনীয় কর্ম্ম আবার দ্বিবিধ;—(১) চারিটী প্রধান রিপু দ্বারা কৃত; (২) তদতিরিক্ত অনুভাবনা দ্বারা সঞ্জাত। রিপু কর্তৃক উৎপন্ন যে কর্ম্ম, তাহা আবার ষোড়শবিধ; অনুভাবনাজনিত কর্ম্ম সপ্তবিধ বা নববিধ;—ক্রোধ, অহঙ্কার, প্রতারণা, আকাঙ্ক্ষা, বিরক্তি, স্ত্রীসংসর্গের কামনা প্রভৃতি মোহনীয় কর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। আয়ুষ্ক অর্থাৎ আয়ুঃবৃদ্ধির পক্ষে চেষ্টাজনিত কর্ম্ম চতুর্ব্বিধ;—নরকের অধিবাসী, পশু জন্মগ্রহণ, মনুষ্য জন্মগ্রহণ, দেব জন্মগ্রহণ। নামন্ কর্ম্ম দুই প্রকার; সৎ ও অসৎ। উহার মধ্যে যে অনেক উপবিভাগ আছে, তাহা বলা বাহুল্য। গোত্র কর্ম্ম দ্বিবিধ; উচ্চ ও নীচ। তাহারা আবার আট ভাগে বিভক্ত হয়। অন্তরায় পাঁচ ভাগে বিভক্ত; দান, লাভ, সাময়িক সুখভোগ, ধারাবাহিক সুখভোগ, শক্তি। এই যে অষ্টবিধ কর্ম্ম, ইহারা সকলেই পরমাণু, স্থান, কাল ও স্ফূর্ত্তির সহিত সম্বন্ধযুক্ত। এই কর্ম্ম পরমাণু-সম্বন্ধে আত্মার উপর আধিপত্য বিস্তার করে, এই কর্ম্ম স্থান-সম্বন্ধে আত্মাকে আবদ্ধ করে, এই কর্ম্ম কালবিষয়ে আত্মাকে জড়িত করে, এই কর্ম্ম স্ফূর্ত্তি-সম্বন্ধে আত্মাকে অভিভূত করে। প্রত্যেক কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত পরমাণু অসংখ্য—অনন্ত। বদ্ধ আত্মার পক্ষে কর্ম্মগ্রন্থি-রূপ পরমাণু অনেক অধিক; কিন্তু মুক্ত আত্মার তুলনায় তাহা অকিঞ্চিৎ। কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত থাকিলে, সেই কর্ম্ম আত্মাকে বেষ্টন করিয়া বসে; কিন্তু যিনি কর্ম্মের গণ্ডী উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে কর্ম্ম কিছুই করিতে পারে না। অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে তাহার সংশ্লিষ্ট পদার্থ ভস্মীভূত হয়; কিন্তু তৎসংস্রবশূন্য পদার্থের উপর তাহার প্রভাব প্রকাশ পায় না। সেইরূপ, যে আত্মা কর্ম্মসংস্রব ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার উপর পরমাণু বা স্থান কাল স্ফূর্ত্তি কোনই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। অপিচ, বিভিন্ন কর্ম্মের স্থায়িত্ব-কাল অবস্থান ও স্ফূর্ত্তি বিভিন্নরূপ নির্দ্দিষ্ট হয়। কোনও কর্ম্ম স্মরণাতীত কাল স্থায়ী, কোনও কর্ম্ম মুহূর্ত্তান্ত; কোনও কর্ম্ম অধিক স্থানব্যাপী, কোনও কর্ম্ম অল্পস্থানে কার্য্যকরী; কোনও কর্ম্ম সমধিক স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত, কোনও কর্ম্ম কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত। জ্ঞানিগণ কর্ম্মের বিভিন্ন-বিভাগ-সমূহ অবগত হইয়া কর্ম্মবন্ধন

বেদনীয় মোহনীয় প্রভৃতি কর্ম্ম।

হইতে মুক্তি লাভের জন্য যথাশক্তি যত্নবান হইবেন। জ্ঞানাবরণীয় দর্শনাবরণীয় প্রভৃতি কর্ম্মসমূহের স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইয়া, সন্ন্যাসী যখন সেই সকল কর্ম্মত্যাগে সমর্থ হইবেন, তখনই তাঁহার সংসার-বন্ধন ছিন্ন হইবে। সেই বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিলে, সঙ্গে সঙ্গে দ্বাবিংশ পরিসহ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলে, জীবনের মূল লক্ষ্য পরম সুখময় মুক্তির পথে তিনি অগ্রসর হইতে পারিবেন। ইহাই জৈনদর্শনশাস্ত্রের মূল শিক্ষা।

জৈনদর্শনের অন্যান্য শিক্ষা।

[জৈনদর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়,—জিনদত্ত সূরির অভিমত;—'বিনয়',—জৈন যতিগণের প্রথম প্রতিপাল্য;—মুক্তির পথে বাধা-বিপত্তি—প্রায়শ্চিত্ত;—সামতি ও গুপ্তি,—তাহার মুখ্য লক্ষ্য;—জীবতত্ত্ব,—একেন্দ্রিয় দ্বীন্দ্রিয় প্রভৃতি;—পূজা, মন্ত্র,—উপসংহার।]

জৈনদর্শন সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় আরও অনেক আছে। তাঁহাদের তর্ক-পদ্ধতি, প্রমাণ-পরম্পরা, পাপপুণ্য, বন্ধন-মুক্তি, পূজা-পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করিলে, হিন্দু দর্শনের সহিত জৈনদর্শন কিরূপ সাদৃশ্যসম্পন্ন, তাহা উপলব্ধি হইতে পারে। তাহাতে হিন্দু-দর্শনের ও বৌদ্ধ-দর্শনের অন্তর্গত একটা বিরোধ-ভঞ্জনের প্রয়াস দেখিতে পাই। স্যাদ্বাদ—সেই চেষ্টার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। জৈনদর্শনের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় জিনদত্ত সূরি প্রদান করিয়া গিয়াছেন, প্রসঙ্গতঃ নিম্নে তাহা একটু উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে স্থূলভাবে জৈনদর্শনতত্ত্ব উপলব্ধ হয়। যথা;—

জৈন-দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

"জিনদত্তসূরিণা জৈনং মতমিথমুক্তম্—
বলভোগোপভোগানামুভয়োর্দ্দানলাভয়োঃ।
অন্তরায়স্তথা নিদ্রা ধী-রজ্ঞানং জুগুপ্সিতম্,
হিংসারত্যরতী রাগদ্বেষৌ রতিরতিঃ স্মরঃ॥
শোকো মিথ্যাত্বমেতেঽষ্টাদশ দোষা ন যস্য সঃ।
জিনো দেবো গুরুঃ সম্যক্তত্ত্বজ্ঞানোপদেশকঃ।
জ্ঞানদর্শনচারিত্রাণ্যপবর্গস্য বর্ত্মনি॥
স্যাদ্বাদস্য প্রমাণে দ্বে প্রত্যক্ষমনুমাপি চ।
নিত্যানিত্যাত্মকং সর্ব্বং নব তত্ত্বানি সপ্ত বা।
জীবাজীবৌ পুণ্যপাপে চাশ্রবঃ সংবরোঽপিচ
বন্ধো নির্জরণং মুক্তিরেষাং ব্যাখ্যাধুনোচ্যতে।
চেতনালক্ষণো জীবঃ স্যাদজীবস্তদন্যকঃ।
সৎকর্ম্মপুদ্গলঃ পুণ্যং পাপং তস্য বিপর্য্যয়ঃ
আশ্রবঃ কর্ম্মণাং বন্ধো নির্জরস্তদ্বিয়োজনম্
অষ্টকর্ম্মক্ষয়ান্মোক্ষোঽথান্তর্ভাবশ্চ কৈশ্চন।
পুণ্যস্য সংশ্রবে পাপস্যাশ্রবে ক্রিয়তে পুনঃ
লব্ধানন্তচতুষ্কস্য লোকা গূঢ়স্য চাত্মনঃ

ক্ষীণাষ্টকর্ম্মণো মুক্তির্নির্ব্যাবৃত্তির্জিনোদিতা ॥
সরজোহরণা ভৈক্ষ্যভুজো লুঞ্চিতমূর্দ্ধজাঃ।
শ্বেতাম্বরাঃ ক্ষমাশীলা নিঃসঙ্গা জৈনসাধবঃ ॥
লুঞ্চিতাঃ পিচ্ছিকাহস্তাঃ পাণিপাত্রা দিগম্বরাঃ।
উর্দ্ধাশিনো গৃহে দাতুর্দ্বিতীয়াঃ স্যুর্জিনর্ষয়ঃ ॥
ভুঙ্‌ক্তে ন কেবলং ন স্ত্রীং মোক্ষমেতি দিগম্বরঃ।
প্রাহুরেষাময়ং ভেদো মহান্ শ্বেতাম্বরৈঃ সহ ॥" ইতি।

অর্থাৎ,—'জিনদত্তসূরি এই মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। যাঁহার বল, ভোগ, উপভোগ, দান, লাভ সম্বন্ধে অন্তরায় উপস্থিত হয় নাই; নিদ্রা, ভীতি, অজ্ঞানতা, জুগুপ্সা, হিংসা, রতি, অরতি, রাগ, দ্বেষ, রমণ, কাম, শোক, মিথ্যা প্রভৃতি অষ্টাদশ দোষ যাঁহার নাই; তিনিই জিন, দেব, গুরু, সম্যক্‌তত্ত্বজ্ঞানের উপদেষ্টা। জ্ঞান, দর্শন, চরিত্র—অপবর্গের অর্থাৎ মোক্ষের পথস্বরূপ। স্যাদ্বাদ তাঁহাদের তর্কপদ্ধতি; প্রত্যক্ষ ও অনুমান দুই প্রমাণ। সর্ব্ব অর্থাৎ বিশ্ব নিত্যানিত্যাত্মক; তত্ত্ব সপ্তবিধ বা নববিধ। জীব, অজীব, পুণ্য, পাপ, আস্রব, সংবর, বন্ধ, নির্জরণ, মুক্তি,—এই নব-তত্ত্বের ব্যাখ্যা অধুনা কথিত হইতেছে। 'জীব' চেতনালক্ষণাক্রান্ত; 'অজীব' তাহার বিপরীত-ভাবাত্মক; সৎকর্ম্ম-সমূহই 'পুণ্য'; তাহার বিপর্য্যয় 'পাপ'; 'আস্রব' কর্ম্মের বন্ধন; 'নির্জর'—সে বন্ধের ছেদন; অষ্ট কর্ম্মের ক্ষয় 'মোক্ষ'; ইহাই নবতত্ত্বের নিগূঢ় অর্থ। (মতান্তরে) 'পুণ্য' সংস্রবের ও 'পাপ' আস্রবের অন্তর্ভুক্ত হয়। অষ্টকর্ম্ম ক্ষীণ হইলে, নির্ব্বাণ-মুক্তি জিনত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। (শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর দুই সম্প্রদায়ের পরিচয় অতঃপর প্রদত্ত হইয়াছে।) শ্বেতাম্বর-জৈনসাধুগণ ক্ষমাশীল নিঃসঙ্গ কেশ-শ্মশ্রুধারী ও ভিক্ষাজীবী। দিগম্বরেরা পাণিপাত্র ও পিচ্ছিকাধারী (চামর বিশেষ) এবং উলঙ্গ। শ্বেতাম্বরেরা স্ত্রী-সংসর্গে বিরত, দিগম্বরেরা স্ত্রী-সংসর্গে বিরত নহেন।' জিনদত্তসূরি সংক্ষেপে যে ভাবে জৈন-ধর্ম্মের পরিচয় দিয়াছেন, অধুনা তৎসম্বন্ধে সামান্য মতান্তর দৃষ্ট হয় বটে; কিন্তু স্থূলতঃ ঐ কয়েকটী বিষয়ই জৈনদর্শনের মেরুদণ্ড-স্থানীয়। সেই কর্ম্মের কথা, সেই কর্ম্মক্ষয়ের বিষয়, সেই পাপ-পুণ্য, সেই তত্ত্বজ্ঞান,—সকল প্রসঙ্গই ইহাতে সংক্ষেপে বিবৃত আছে। উহাদের এক একটী বিষয় বিশেষভাবে বুঝিতে গেলে অশেষ আয়াস আবশ্যক করে। পূর্ব্বে আমরা স্যাদ্বাদ বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়াছি। স্যাদ্বাদ—তর্করীতি—জৈনন্যায়। উহা অনেকান্তবাদ নামেও অভিহিত হয়। সকল মতের বিবাদ-বিতণ্ডা স্যাদ্বাদে সমাহিত হইয়াছে; জৈনদার্শনিকগণ ইহাই ঘোষণা করেন। 'সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ'কার স্যাদ্বাদ সম্বন্ধে অনন্তবীর্য্যের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে স্থূলভাবে স্যাদ্বাদের পরিচয় পাওয়া যায়। অনন্তবীর্য্যের সে মত;—

'তদ্বিধানবিবক্ষায়াং স্যাদস্তীতিগতির্ভবেৎ। স্যান্নাস্তীতি প্রয়োগঃ স্যাত্তন্নিষেধে বিবক্ষিতে ॥
ক্রমেণোভয়বাঞ্ছায়াং প্রয়োগঃ সমুদায়ভাক্। যুগপত্তদ্বিবক্ষায়াং স্যাদবাচ্যমশক্তিতঃ।
আদ্যাবাচ্যবিবক্ষায়াং পঞ্চমো ভঙ্গ ইষ্যতে। অন্ত্যাবাচ্যবিবক্ষায়াং ষষ্ঠভঙ্গসমুদ্ভবঃ
সমুচ্চয়েন যুক্তশ্চ সপ্তমো ভঙ্গ উচ্যতে ॥'

অর্থাৎ,—'বস্তুবিশেষের বিধান বা বিদ্যমানতা বুঝাইবার ইচ্ছা করিলে, 'স্যাদস্তি' বলিতে হইবে। তাহার নিষেধ বা অভাব বুঝাইতে 'স্যান্নাস্তি' প্রয়োগ আবশ্যক। পর্য্যায়ক্রমে যদি উভয়ের অর্থাৎ বিদ্যমানতার ও অভাবের আকাঙ্ক্ষার শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা হইলে, 'স্যাদস্তি চ নাস্তি চ' শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু যুগপৎ উভয় ভাব ব্যক্ত করিতে হইলে, 'স্যাদবক্তব্য' বলিতে হইবে। এইরূপ আদি অস্তি ভাব অবাচ্য বুঝাইতে হইলে 'স্যাদস্তি চ অবক্তব্য'; নাস্তিভাব বুঝাইতে হইলে 'স্যান্নাস্তি চ অবক্তব্য'; এবং অস্তি-নাস্তি-ভাব বুঝাইতে হইলে, 'স্যাদস্তি চ নাস্তিচ অবক্তব্য' বলিতে হইবে।' ইহাই 'সপ্তভঙ্গীনয়'। ন্যায়দর্শনের যাহা 'প্রতিজ্ঞা,' জৈনদর্শনের 'নয়' তাহাই। ন্যায়দর্শনের 'উদাহরণ' মধ্যে দুই ভাব আছে; (১) অন্বয়ী, (২) ব্যতিরেকী অর্থাৎ বিদ্যমানতা ও অবিদ্যমানতা। এক্ষেত্রে 'অস্তি'-'নাস্তি'ও অনেকটা তদ্ভাবমূলক। 'স্যাদ্‌ঘটোঽস্তি' বলিলে ঘট আছে কিন্তু অন্য কিছু নাই, ইহাই বুঝাইয়া থাকে। 'আছে' বলিলেই থাকা ও না-থাকার ভাব আসে; 'অস্তি' বলিলে অস্তি ও নাস্তি উভয় ভাব জাগরূক হয়। অপিচ, অস্তি ও নাস্তি দুই বিরুদ্ধ ভাব যে ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, সেই জন্যই 'অস্তি নাস্তি চ অবক্তব্য' বলা যায়। এইরূপে সৎ ও অসৎ, বিদ্যমানতা ও অবিদ্যমানতা—অবক্তব্য হইয়া পড়ে। বেদান্তবাদের বিরুদ্ধ-বিতর্কে জৈনদর্শনের 'সপ্তভঙ্গী নয়' সৃষ্ট হইয়াছিল, মনে করা যাইতে পারে। বেদান্ত 'সৎ' ভিন্ন অন্য কিছুই নাই বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বেদান্ত মতে, সকল পদার্থের মধ্যেই সেই এক সত্ত্বা বিদ্যমান। কিন্তু স্যাদ্বাদ বুঝাইলেন,—অস্তি স্বীকার করিতে হইলেই নাস্তি স্বীকার করিতে হইবে। অস্তি-নাস্তি পরস্পরের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। অপিচ, অস্তি-নাস্তি যুগপৎ উভয়ভাব অবক্তব্য। বেদান্তের 'সৎ' এবং বৌদ্ধগণের 'ক্ষণিকবাদ',—এই দুইএর সামঞ্জস্য-বিধানে স্যাদ্বাদের সূচনা হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন। বেদান্ত বলেন,—'নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত সত্যস্বভাব চৈতন্যই জগদ্বস্তু সৎ; তদ্ভিন্ন পরিদৃশ্যমান সকল বস্তুই—(নামরূপ) মায়া বা মিথ্যা। যাহা সৎ, তাহা চিরদিনই সৎ; তাহা কখনই পরিবর্ত্তনের অধীন নহে। যাহা পরিবর্ত্তনশীল, তাহা অসৎ।' ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধগণ বলেন,—'সংসারের সকলই পরিবর্ত্তনশীল। সংসারে এমন কিছুই নাই, যাহা পরিবর্ত্তন-প্রবাহে নিপতিত নহে। যাহা আজ আছে, তাহা কাল নাই; যাহা ক্ষণপূর্ব্বে ছিল, তাহা ক্ষণপরে বিধ্বংসপ্রাপ্ত। সুতরাং নিত্য বলিয়া কোনও পদার্থ স্বীকার করা যায় না।' 'স্যাদ্বাদ' ঐ দুই মতের (বেদান্তের সৎ এবং ক্ষণিকবাদের অসৎ) সামঞ্জস্য-সাধন-প্রয়াসী। 'সপ্তভঙ্গী নয়' বুঝায়, অস্তি-নাস্তি উভয়েই কি প্রকারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। বেদান্তের মূল লক্ষ্যে যাঁহাদের বিভ্রম ঘটে, অথবা ক্ষণিকবাদের একদেশদর্শী তর্কে যাঁহারা বিভ্রান্ত হন, স্যাদ্বাদ ভাষান্তরে ভাবান্তরে তাঁহাদের সে ভ্রান্তি অপনোদন করিয়া আত্ম প্রাধান্য খ্যাপন করে। সৃষ্ট-পদার্থ দেখিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। জগৎ আছে বলিয়াই, জগৎকারণ জগদীশ্বরের অনুভাবনা। জৈনগণ কিন্তু এ ভাবে ঈশ্বর অঙ্গীকার করেন না। সে মতে—যিনি রাগদ্বেষবিমুক্ত অর্হৎ, তিনিই ত্রৈলোক্য-পূজিত সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর। সেই অর্হৎগণের আরাধনা করিয়াই যতিগণ মুক্তির পথে [illegible]

যিনি মুক্তির অভিলাষী, তাঁহার প্রথম প্রতিপাল্য—বিনয়। 'বিনয়' কি, তাহা বুঝিতে হইলে, 'উত্তরাধ্যয়ন' প্রথম অধ্যয়ন অভিনিবেশ সহকারে অনুশীলন করিবার প্রয়োজন।

বিনয়।

বিনয়ের মধ্যে যে মহান্ ভাব নিহিত আছে, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলেই মুক্তি অধিগত হয়। বিনয় কি, তাহা বুঝাইবার পূর্ব্বে বিনয় সম্বন্ধে উপদেশ প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত ব্যক্তি কে, উত্তরাধ্যয়ন-সূত্রে তাহার একটু পরিচয় আছে। উত্তরাধ্যয়নের প্রথম অধ্যয়নে প্রথম সূত্রে সেই বিষয় বলা হইয়াছে। বিনয় যে কি কঠোর অনুশীলন, তাহাতে তাহা বুঝা যায়। যথা;—

"সংজোগা বিপ্পমুক্কস্‌স অনগারস্‌স ভিখ্‌খুণো।
বিনয়ং পাউকরিস্‌সামি আনুপুব্বিং সুণেহমে॥"

সূত্রটী প্রাকৃত ভাষায় লিখিত। সংস্কৃতভাষায় এবং বঙ্গভাষায় উহার যে অর্থ হয়, নিম্নে তাহা প্রকাশ করিতেছি। 'সংজোগা' শব্দ সংস্কৃতে 'সংযোগাৎ' অর্থাৎ 'সংযোগ হইতে' অর্থ সূচিত করে। কিন্তু 'সংজোগা' বলিলেই কোনও কিছুর সহিত সম্বন্ধ-সংশ্রবের বিষয় মনে আসে। সে কি প্রকার? টীকাকার বলিতেছেন,—"সংজোগা......সংযোগাৎ; বাহ্য-সংযোগাঃ ধন-ধান্য-পুত্রকলত্রাদয়ঃ তথা আভ্যন্তর-সংযোগাঃ মিথ্যাত্ব-ক্রোধ-মান-মায়া-লোভাঃ তেভ্যঃ।' অর্থাৎ,—বাহ্য-সংযোগ ও আভ্যন্তর-সংযোগ দ্বিবিধ; ধন-ধান্য-পুত্র-কলত্র প্রভৃতির সহিত যে সংযোগ, তাহা বাহ্য-সংযোগ; আর মিথ্যাত্ব-ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ প্রভৃতির সহিত যে সংযোগ, তাহা আভ্যন্তর সংযোগ। সুতরাং, 'সংজোগা' শব্দে ঐ উভয়বিধ 'সংযোগ হইতে' অর্থ নিষ্পন্ন হয়। তার পর, সূত্রের দ্বিতীয় শব্দ—'বিপ্পমুক্কস্‌স'; অর্থ—'বিপ্রমুক্তস্য, বিশেষেণ নির্ম্মুক্তস্য'; অর্থাৎ বিশেষভাবে মুক্ত। সুতরাং 'সংজোগা বিপ্পমুক্কস্‌স' যে কি অবস্থা, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখুন। যাঁহার ধন-ধান্য-পুত্র-কলত্রাদির সহিত বাহ্য-সংযোগ এবং মিথ্যাত্ব-ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ প্রভৃতির সহিত আভ্যন্তর-সংযোগ বিশেষভাবে লোপ পাইয়াছে, তাঁহারই বিষয় এখানে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আর তিনি কেমন? না—'অণগারস্‌স'; অর্থাৎ,—'অণগারস্য, গৃহরহিতস্য'। তিনি গৃহত্যাগী, সন্ন্যাস-ব্রতধারী। আর কেমন? না—'ভিখ্‌খুণো' অর্থাৎ 'ভিক্ষোঃ; মধুকরবৃত্ত্যাহারাং গৃহীত্বা শরীরধারকস্য'। তিনি মধুকরবৃত্তি অবলম্বনে বিভিন্ন স্থান হইতে কণা কণা আহার ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ করেন। এমন যে ব্যক্তি, তিনিই বিনয় শিক্ষার অধিকারী। মহাবীর স্বামী তেমনই ব্যক্তিকে বিনয় সম্বন্ধে উপদেশ দিতে বলিয়াছিলেন। জম্বুস্বামীর নিকট সুধর্ম্মস্বামী সেই কথাই উক্ত সূত্রে ব্যক্ত করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,—'ঐরূপ সাধুর নিকটই 'বিণয়ম্' (বিনয়ম্), 'পাউকরিস্‌সামি' (প্রকটী করিষ্যামি) অর্থাৎ বিনয় বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিব; 'আণুপুর্ব্বিং' (আনুপূর্ব্ব্যা) 'সুণেহমে' (মম সকাশাৎ শৃণুত); আমার নিকট যথাক্রমে শ্রবণ করুন।' এই উক্তিতেই বুঝিতে পারা যায়, বিনয় শ্রবণের অধিকারী কোন্ জন! যিনি ধনধান্যপুত্রকলত্রাদি বাহ্য-সংযোগ এবং মিথ্যা-ক্রোধ-মান-মায়া প্রভৃতি আভ্যন্তর সংযোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন; যিনি বিশেষভাবে সংসার বন্ধন ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন; যিনি মধুকর-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কণাকণা

আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া জীবন-ধারণ করিতেছেন; সেই গৃহত্যাগী সন্ন্যাস-ব্রতধারী সাধুই বিনয়-শিক্ষার প্রকৃত অধিকারী। বেদান্ত-দর্শনের প্রথম সূত্রে 'অথ' শব্দের ব্যাখ্যায়, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য যে ভাষ্য * প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, ব্রহ্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর পক্ষে যে অধিকার অনধিকারের প্রসঙ্গ খ্যাপন করিয়া গিয়াছেন, এখানে তাহারই আভাষ দেখিতে পাই। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—"বিধিবদধীতবেদবেদাঙ্গত্বেনাপাততোধিগতাখিলবেদার্থঃ অস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্যনিষিদ্ধ-বর্জ্জনপুরঃসর নিত্যনৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গতনিখিলকল্মষতয়া নিতান্তনির্ম্মলস্বান্তঃ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন প্রমাতা অধিকারী।" এইরূপ, বিনয় সম্বন্ধে উপদেশ পাইবার অধিকারীর কঠোর ব্রহ্মচর্য্য প্রয়োজন। প্রোক্ত সূত্রে তাহাই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূত্রে অধিকন্তু বিনয়সম্পন্নের ও দুর্ব্বিনীত জনের পরিচয় আছে। তাহাতে দেখি,—

"আণা-নিদ্দেস-করে গুরূণমুববায়কারএ। ইংগিয়াগারসংপন্নে সে বিনীএত্তি বুচ্চঈ॥
জহা সুণী পুইকন্নী নিকসিজ্জই সব্বসো। এবং দুস্সীল পড়িণীএ মুহরী নিকসিজ্জঈ॥"

অর্থাৎ,—'গুরুর আজ্ঞাই যাঁহার নিকট প্রমাণ, গুরুর ইঙ্গিতমাত্রই যাঁহার জ্ঞান, গুরুর দৃষ্টি-গোচরে যাঁহার অবস্থান, তিনিই প্রকৃত বিনয়-সম্পন্ন। যে দুঃশীল, গুরুদ্বেষী, বাচাল, অমিতভাষী, তাহাকে পূতিকর্ণি কুকুরীর মত বিতাড়িত করা কর্ত্তব্য।' ফলতঃ, গুরুর আদেশানুবর্ত্তী হইয়া যে জন কঠোর সংযম অবলম্বন করিতে সমর্থ হয়, বিনয় প্রতিপালনে তাঁহারই অধিকার।

মুক্তির পথ যে কি ঘোর সঙ্কট-সমাকুল, সে পথে যে কি ভীষণ বাধা-বিপত্তি বিদ্যমান, পথের পরিচয় ব্যপদেশে, অষ্টবিধ কর্ম্ম ও দ্বাবিংশ পরিসহ প্রসঙ্গে, তাহার আভাষ দিয়াছি।

পথে বাধা-বিপত্তি।

বিনয় যাহার প্রারম্ভ, সে পথ কি কঠোর! মূল লক্ষ্য—কর্ম্মধ্বংস। রতি ও বিরতির ফলে কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। অতি কঠোর সংযম-সাধনা ভিন্ন কর্ম্ম ধ্বংস হয় না। নূতন কর্ম্ম যাহাতে উৎপন্ন না হয়, তৎপক্ষে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অপিচ, পুরাতন কর্ম্ম যাহাতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তৎপক্ষে যত্নবান হইতে হইবে। জলাশয়ের জল-সঞ্চারের পথ রোধ হইলে, কিয়দংশ বাষ্পাকারে বিলীন হয়, আর কিয়দংশ মনুষ্য ও পশুপক্ষী প্রভৃতির ব্যবহারে নিঃশেষ হইয়া আসে। কর্ম্মক্ষয় বিষয়েও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। নূতন কর্ম্ম যাহাতে সঞ্চিত না হয়, পরন্তু সঞ্চিত কর্ম্ম যাহাতে লোপ পায়, সন্ন্যাসীর তাহাই প্রধান লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক। কিন্তু কি উপায়ে সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে? কঠোর সংযম-সাধনা ভিন্ন সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া সম্ভবপর নহে। জৈনদর্শন সেই কঠোর সংযম-সাধনাকে প্রধানতঃ বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সেই বিবিধ সংযম-সাধনা আবার প্রত্যেকে ষড়্বিধ উপবিভাগে বিভক্ত। বাহ্য-সংযম-সাধনা,—(১) অনশন, (২) অবমোদারিকা অর্থাৎ ক্রমোপবাসানুশীলন; সন্ন্যাসী প্রথমে যে আহার গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাহাকে দ্বাত্রিংশতি ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রতিদিন এক এক বিভাগ

* পৃথিবীর ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, বেদান্ত দর্শন,—অধিকার-তত্ত্ব-প্রসঙ্গে ১২০ পৃষ্ঠায় এতদ্বিষয়ক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

কমাইয়া আনিবেন; (৩) ভিক্ষাচর্য্যা অর্থাৎ ভিক্ষাগ্রহণ, (৪) রস পরিত্যাগ, অর্থাৎ সুরস খাদ্য পরিবর্জ্জন, (৫) কায়ক্লেশ অর্থাৎ দৈহিক কষ্ট-সহিষ্ণুতা, (৬) সংলীনতা অর্থাৎ নিঃসঙ্গ-বাস। এই যে ষড়বিধ বাহ্য সংযম-সাধনা, ইহার মধ্যে বিবিধ জ্ঞাতব্য তত্ত্ব আছে। অনশন বিষয়ে বিধান দেখিতে পাই,—কেহ বা নির্দ্দিষ্ট কাল অনশন-ব্রতধারী, কেহ বা অনশনে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। অবমোদারিকা কেবল খাদ্য সম্বন্ধে নহে; ভিক্ষা গ্রহণে, বেশ-ভূষা-পরিগ্রহেও প্রতিপাল্য। ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য বিষয়ে অথবা দাতা সম্বন্ধে তাঁহার কোনও চাঞ্চল্য আসিবে না, যথাপ্রাপ্ত খাদ্যে জীবন ধারণ করিয়া নিঃসঙ্গ অবস্থায় তিনি জ্ঞানান্বেষণে রত থাকিবেন, ইহাই বাহ্য-সংযম সাধনার উদ্দেশ্য। আভ্যন্তর সংযম সাধনা আরও কত কঠোর, তাহা বিচার করিয়া দেখুন। আভ্যন্তর সংযম সাধনা,—(১) প্রায়শ্চিত্ত; উহা দশবিধ, প্রধানতঃ কৃতপাপ বিষয়ে গুরুর নিকট অকপটে আত্মখ্যাপন। (২) বিনয়; ইহাও দশবিধ; সম্যক শীলতাই ইহার প্রধান লক্ষ্য। (৩) বৈয়াবৃত্য অর্থাৎ গুরুর পরিচর্য্যা। (৪) স্বাধ্যায়; উহা পঞ্চবিধ; নির্দ্দিষ্ট পাঠ শিক্ষা ও আবৃত্তি, তদ্বিষয়ে আচার্য্যের উপদেশ গ্রহণ, পুনরাবৃত্তি, অভিনিবেশ, ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ। (৫) পাপকর ও কষ্টকর চিন্তা হইতে মনকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া একাগ্রচিত্তে ধর্ম্ম-বিষয়ে চিন্তাভিনিবেশ। (৬) ব্যুৎসর্গ অর্থাৎ শয়নে, উপবেশনে অথবা দণ্ডায়মানে স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল—প্রশান্তভাব। যে মহাপুরুষ উক্তবিধ বাহ্য ও আভ্যন্তর সংযম-সাধনায় সমর্থ হইয়াছেন, জন্মচক্রের আবর্ত্তে তাঁহাকে আর কখনও বিঘূর্ণিত হইতে হইবে না।

জৈন-ধর্ম্মের কঠোরতা পালনে আর যে সকল বিধি-বিধান আছে, তন্মধ্যে 'সমিতি' ও 'গুপ্তি' বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার বিষয়। উহারা 'অষ্টমাত্রা' নামে অভিহিত। পঞ্চসমিতি

সমিতি ও গুপ্তি।

যথা;—(১) ঈর্য্যাসমিতি; যে পথ দিয়া মনুষ্য পশু বা রথাদি গতি-বিধি করে, অতি সতর্কতার সহিত সেই পথে চলাচল করিতে হইবে; যেন কোনও প্রাণিহত্যা না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এ বিষয়ে অনেক কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়; পরিভ্রমণকাল, আলম্বন কাল, পথ, জাযণা (যত্ন)—এই চারিটি বিষয়ে প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। (২) 'ভাষা-সমিতি'; মৃদু অভিবাদন-মূলক মিষ্ট সত্য বাক্য কথন; এ অবস্থায় রাগ, অহঙ্কার, প্রতারণা, আকাঙ্ক্ষা, হাস্য, বাচালতা এবং গালি—এই অষ্টবিধ দোষ পরিহার করিতে হইবে। উপযুক্ত সময়ে নির্দ্দোষ ও সার বাক্য উচ্চারণ এই নিয়মের অন্তর্গত। (৩) ঈষণা-সমিতি; ভিক্ষা গ্রহণে যে দ্বিচত্বারিংশবিধ দোষ আছে, তাহা পরিহার করিয়া ভিক্ষাগ্রহণ; সেই দোষ নানারূপে সঞ্জাত হয়। যিনি দাতা তৎকর্ত্তৃক কৃতদোষ 'উদ্গম' নামে এবং যিনি গৃহীতা তৎকৃত দোষ 'উৎপাদন' নামে এবং ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য ব্যবহার বিষয়ক দোষ 'পরিভোগৈষণা' নামে অভিহিত হয়। * সেই সকল দোষ পরিহার পূর্ব্বক ভিক্ষাগ্রহণ

---

* উদ্গমদোষ ষোড়শ বিধ। সে দোষ থাকিলে জৈন-ভিক্ষু খাদ্য দ্রব্য ভিক্ষা করিতে পারিবেন না। ষোড়শবিধ উদ্গম দোষ, যথা,—(১) 'আধাকরজিক'; অপর কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত ভিক্ষুকের জন্য গৃহস্থ যে খাদ্য প্রস্তুত করে, তাহা এই দোষ-বিশিষ্ট; জৈন-ভিক্ষুগণ সেরূপ খাদ্য গ্রহণ করিবেন না। 'ঔদ্দেশিক'-

করিতে হইবে;—ইহাই 'ঈষণা-সমিতির' লক্ষ্য। (৪) 'আদান-সমিতি'; ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য যে সকল দ্রব্য আবশ্যক, বিশেষ পরীক্ষার পর তৎসমুদায় পরিগ্রহণ ও সংরক্ষণ। (৫) 'উচ্চার-সমিতি'; লোকালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক জনশূন্য স্থানে মলত্যাগ। এই পঞ্চবিধ 'সমিতি' সম্বন্ধে প্রতিপাল্য কঠোর বিধি-বিধান আছে; সন্ন্যাসীদের তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। গুপ্তি ত্রিবিধ। স্থূলভাবে সেই ত্রিবিধ গুপ্তি সমিতিরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। সেই গুপ্তিত্রয়;—(১) মনোগুপ্তি; অনুশীলন এবং অনুধ্যান প্রভৃতিতে চিন্তার গতি যেন ইন্দ্রিয়-সুখ সাধনে পরিচালিত না হয়, তৎসম্বন্ধে মনকে দৃঢ়ীকরণ। সংসারে সত্য আছে, অসত্য আছে, সত্যের ও অসত্যের মিশ্রণ আছে, আবার যাহা সত্য নয় ও যাহা অসত্য নয়, তাহারও মিশ্রণ আছে। গুপ্তিই মনকে সেই সকল বিষয়ে সতর্ক করিয়া দেয়। (২) 'বাগ্‌গুপ্তি'; জিহ্বা যেন কদাচ কুবাক্য উচ্চারণ না করে, বাগ্‌-গুপ্তিরূপ বাক্য-সংযম তাহাই শিক্ষা দেয়। সত্য, অসত্য, সত্যাসত্য, সত্য নয় ও অসত্য নয়—এই চতুর্ব্বিধ অবস্থায় সতর্কতা অবলম্বন বাগ্‌গুপ্তির লক্ষ্য। (৩) 'কায়গুপ্তি'; কায়োৎসর্গ অবস্থায় দেহ যেমন নিশ্চল নিস্পন্দভাবে অধিষ্ঠিত থাকে, কায়গুপ্তি তাহাই উপদেশ দেয়। কিবা দণ্ডায়মানে, কিবা উপবেশনে, কিবা উল্লম্ফনে, কিবা গমনাগমনে, কিবা ইন্দ্রিয়-পরিচালনে সন্ন্যাসীর দেহ কখনও কুচিন্তার অনুসরণ করিবে না, কখনও কোনও প্রাণীর কষ্টের বা বিনাশের কারণ হইবে না; কায়গুপ্তির ইহাই নিগূঢ় লক্ষ্য। ধর্ম্ম-জীবনের অনুশীলনে সমিতি-পঞ্চক এবং পাপ-কর্ম্মের বিনিবর্ত্তনে গুপ্তি-ত্রিতয়ের উপযোগিতা। এই সমিতির ও গুপ্তির গূঢ়-তত্ত্ব যাঁহাদের অধিগত হইয়াছে, অপিচ যাঁহারা তাহা কর্ম্মে নিয়োজিত করাইতে পারিয়াছেন, সেই জ্ঞানিগণই জন্মচক্র হইতে উত্তীর্ণ হইবেন, জিন-পদ লাভ করিবেন।

কোনও বিশেষ ভিক্ষুর জন্য যে খাদ্য প্রস্তুত হয়, তাহা এই দোষ সংশ্লিষ্ট। জৈন-ভিক্ষুগণ এবম্বিধ খাদ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন না। এইরূপ পূতিক, উম্মিশ্র, স্থাপনা-কর্ম্মিক, প্রাভৃতিক, প্রাদুঃকরণ, ক্রীত, প্রামিত্য, পরাভৃত্তি, অধ্যাহৃত, উদ্ভিন্ন, মালাহৃত, আচ্ছিদ্য, অনিঃসৃত, অধ্যবপূর প্রভৃতি ভেদে ষোড়শ-দোষ উদ্গমদোষ পর্য্যায়ভুক্ত। এই সকলের অর্থে বুঝিতে পারা যায়, জৈন-ভিক্ষু ক্রয় করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিবেন না; জোর করিয়াও কাহারও নিকট হইতে খাদ্য লইবেন না। পাঁচ জন অংশীদারের মধ্যে একজন অংশীদার কোনও খাদ্য প্রদান করিলেও তাহাও লইতে পারিবেন না। উৎপাদন দোষও ষড়বিধ। যথা,—(১) ধাতৃ-কর্ম্মণ, (২) দূতকর্ম্মণ, (৩) নিমিত্ত, (৪) আজীবিকা, (৫) বণনীকা, (৬) চিকিৎসা, (৭) ক্রোধপিণ্ডা প্রভৃতি। এই সকল উপাদক-দোষের মূল লক্ষ্য এই যে, সন্ন্যাসী কাহারও সন্তানাদি প্রতিপালন পূর্ব্বক অথবা কোনও সংবাদ আদান-প্রদান পূর্ব্বক অথবা কাহারও ব্যাধি-চিকিৎসাপূর্ব্বক, অথবা আত্ম-পরিচয় খ্যাপনপূর্ব্বক অথবা ক্রোধাদি প্রদর্শনপূর্ব্বক ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন না। তাহা হইলে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য উৎপাদন-দোষ-দুষ্ট হইবে। গ্রহণৈষণা-দোষ দশবিধ; শঙ্কিত, ম্রক্ষিত, নিক্ষিপ্ত ইত্যাদি; ভীত ব্যক্তির নিকট ভিক্ষা গ্রহণ প্রভৃতি এই পর্য্যায়ের অন্তর্গত। 'পরিভোগৈষণা' চতুর্ব্বিধ; যথা,—সংযোজনা, অপ্রমাণ, ইঙ্গলি, অকারণ সুখাদ্যের উপাদান সমূহ সংগ্রহ, নির্দ্দিষ্ট খাদ্যের অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ, সুখাদ্য প্রাপ্তির জন্য ধনীর প্রশংসাবাদ, মন্দ খাদ্যের জন্য দরিদ্রের নিন্দাবাদ, শাস্ত্র-কথিত খাদ্যের পরিবর্ত্তে অন্য খাদ্য গ্রহণ। এইরূপে ভিক্ষা গ্রহণ সম্বন্ধে বিচত্বারিংশ দোষের বিষয় অনুধ্যান করিলে কি কঠোর সংযম-সাধনা জৈন যতিগণের জন্য বিহিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

জৈন-দর্শনের আর এক জ্ঞাতব্য বিষয়—জীবতত্ত্ব। যে ভিক্ষু সম্যক্‌রূপে জীবতত্ত্ব অবগত হইতে পারিয়াছেন এবং জীব ও অজীব এতদুভয়ের পার্থক্য উপলব্ধি করিয়া যথাবিহিত পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছেন; তিনিই আত্ম-সংযমশীল, তাঁহারই আত্ম-সংযম-সাধনা সিদ্ধ হইয়াছে। জীব ও অজীব লইয়াই 'লোক' (পৃথিবী); আর যেখানে কেবলমাত্র অজীব, তাহার নাম 'অলোক' (পৃথিবীর অতীত স্থান)। পদার্থ, স্থান, কাল ও স্ফূর্ত্তি—ইহাদের সহিত জীব ও অজীব সম্বন্ধযুক্ত। অজীব সাধারণতঃ দুই প্রকার;—(১) আকৃতি বিশিষ্ট, (২) নিরবয়ব। নিরবয়ব জীব দশবিধ ও আকৃতি-বিশিষ্ট জীব চতুর্ব্বিধ। দশবিধ নিরবয়ব অজীব যথা;—(ক) ধর্ম্ম, (খ) উহার বিভাগ-সমূহ, (গ) উহার অদৃশ্য অংশ-সমূহ, (ঘ) অধর্ম্ম, (ঙ) উহার বিভাগ-সমূহ, (চ) উহার অদৃশ্য অংশ-সমূহ, (ছ) আকাশ, (জ) উহার বিভাগ-সমূহ, (ঝ) অদৃশ্য অংশ-সমূহ, (ঞ) কাল (আত্ম সময়)। ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম এই লোক অর্থাৎ পৃথিবীর সহিত সমভাবে বিস্তৃত। আকাশ,—লোক ও অলোক ব্যাপিয়া আছে। কাল অনন্তকাল বিদ্যমান আছে। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এবং আকাশ—চিরদিন আদি-অন্তহীন। কালও তদ্রূপ;—বস্তুগত বা ব্যক্তিগত ভাবে ইহার আদি অন্ত উপলব্ধি হয়। অতঃপর অবয়ব-বিশিষ্ট অজীব পদার্থের বিষয় এইরূপ-ভাবে কথিত আছে; উহারা চতুর্ব্বিধ;—(ক) মিশ্র পদার্থসমূহ; (খ) তাহাদের বিভাগসমূহ; (গ) তাহাদের অদৃশ্য অংশ-সমূহ; (ঘ) পরমাণু-সমূহ। মিশ্রপদার্থ-সমূহ এবং তাহাদের পরমাণু-সমূহ লোকে বা লোকাংশে একাবয়বে অথবা পৃথকভাবে অবস্থিত। সূক্ষ্ম পদার্থ-সমূহ সমগ্র লোক ব্যাপিয়া আছে। স্থূল পদার্থ-সমূহ কেবলমাত্র পৃথিবীর পরিদৃশ্যমান অংশে বিদ্যমান রহিয়াছে। কাল বিষয়ে সেই অবয়ব-বিশিষ্ট পদার্থের অপ্রতিহত ধারা প্রবাহিত হইতেছে। উহার আদ্যন্ত নাই। কিন্তু ব্যক্তিগত ও বস্তুগত বিষয়ে দেখিতে গেলে, উহার আদি এবং অন্ত উভয়ই আছে। উহাদের স্ফূর্ত্তি পঞ্চবিধ; বর্ণ, গন্ধ, আস্বাদ, স্পর্শ ও আকৃতি দ্বারা অনুমেয়। শ্বেত, কৃষ্ণ, নীল, লোহিত, হরিৎ ভেদে বর্ণ পঞ্চবিধ। সুগন্ধ, দুর্গন্ধ ভেদে গন্ধ দ্বিবিধ। তিক্ত, অম্ল, মধুর, কষায়, কটু ভেদে আস্বাদ পঞ্চবিধ। কঠিন, কোমল, গুরু, লঘু, শীতল, উত্তপ্ত, মসৃণ, বন্ধুর ভেদে স্পর্শ অষ্টবিধ। বর্ত্তুলাকার, গোলাকার, ত্রিকোণাকার, চতুষ্কোণাকার এবং দীর্ঘাকার ভেদে আকৃতি পঞ্চবিধ। বলা বাহুল্য, বর্ণ গন্ধ প্রভৃতির পূর্ব্বোক্ত বিভাগ-সমূহের আবার উপবিভাগ আছে। সেই সকল আলোচনা করিয়া অজীব-তত্ত্ব নির্দ্ধারিত হয়।

জীব ও অজীব।

'জীব' শব্দে জৈনদর্শনে অনেক গভীর ভাব ব্যক্ত হইয়া থাকে। জীব প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত;—(১) সংসারী, (২) সিদ্ধ। যাঁহারা সিদ্ধ সম্যকত্ব প্রাপ্ত বা মুক্ত পুরুষ, দ্রব্য, স্থান, কাল, স্ফূর্ত্তি ভেদে তাঁহাদের নানা পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। মুক্ত বা সিদ্ধ আত্মা—স্ত্রীলোকের হইতে পারে, পুরুষের হইতে পারে, নপুংসকের হইতে পারে, প্রচলিত ধর্ম্মমতানুগত ব্যক্তির হইতে পারে, অথবা তদ্বিরুদ্ধবাদীরও হইতে পারে, গৃহীর হইতে পারে, গৃহত্যাগীর হইতে পারে;

জীব—দ্বিবিধ; (১) সিদ্ধজীব।

বৃহত্তমের, ক্ষুদ্রতমের, নাতিক্ষুদ্র নাতিবৃহজ্জনেরও সে অবস্থা আসিতে পারে; উচ্চস্থানে, সমতলক্ষেত্রে, সমুদ্রে, নদী প্রভৃতির জলে, সে অবস্থায় উপনীত হইবার পথে কোনই বিঘ্ন ঘটে না। তবে সংসারের সকলেই যে, সে মুক্ত অবস্থায় উপনীত হইতে পারে, তাহা নহে। নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক স্ত্রী-পুরুষ, গৃহী বা সন্ন্যাসী, সে অবস্থা প্রাপ্ত হন মাত্র। সকল স্থানেই যে সমভাবে মুক্তি-লাভের ব্যবস্থা আছে, তাহা নহে। এই মুক্তিলাভ সম্বন্ধে জৈনদর্শনে একটা অনুপাতের উল্লেখ আছে। কুড়ি জন স্ত্রীলোক, ১০৮ জন পুরুষ, ১০ জন নপুংসক, ৪ জন গৃহী, ১০ জন প্রচলিত ধর্ম্মমতের বিরোধী এবং ১০৮ জন স্বধর্ম্ম-পরায়ণ ভিক্ষু এক সময়ে মুক্তিলাভ করেন। বৃহত্তমাকৃতির দুই জন, ক্ষুদ্রতম আকৃতির ৪ জন এবং মধ্যাকৃতির ১০৮ জন এককালে মুক্তির অধিকারী হন। উচ্চ স্থানের ৪ জন, সমুদ্রের ২ জন, জলের ৩ জন, ভূগর্ভের ২০ জন এবং পৃথিবীর অধিবাসী ১০৮ জন এক সময়ে মুক্তিলাভ করেন। কত জনের মধ্যে যে ঐ কয় জন উদ্ধার-লাভের অধিকারী, তাহার বিশেষ উল্লেখ নাই। সুতরাং জগতে ঐ অনুপাতে জীব মুক্তি-লাভ করিতেছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু মুক্ত আত্মা কোথায় কি ভাবে অবস্থিতি করেন? কোন্ স্থান তাঁহার অধিগম্য নহে? সম্যকত্ব-লাভের পর, আত্মাই বা কোথায় গমন করেন, দেহই বা কোথায় অবস্থিত থাকে? এ সম্বন্ধে জৈন দর্শনের উক্তি এই যে, মুক্ত আত্মা অলোকে গমন করেন না। তিনি এই লোকেই উর্দ্ধদেশেই অবস্থিত থাকেন, দেহ এখানে পৃথিবীতে নিম্নে পড়িয়া থাকে; আত্মা মুক্ত হইয়া উর্দ্ধদেশে গমন করেন। দ্বাদশ যোজন উর্দ্ধে 'সর্ব্বার্থ' নামা বিমানে 'ঈষৎ-প্রাগভাব' নামক ছত্রাকৃতি স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। মুক্ত আত্মা তথায় গমন করেন। সেই স্থানের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার উভয়ই ৪৫ সহস্র যোজন। তাহার পরিধি দৈর্ঘ্য-বিস্তারের ত্রিগুণ। সে স্থান কত ভাগে কি প্রকারে বিভক্ত এবং তাহার কোথায় কোন্ আত্মার স্থান নির্দ্দিষ্ট, অতঃপর তাহার বর্ণনা দৃষ্ট হয়। তাঁহাদের পরিদৃশ্যমান্ কোনও আকৃতি নাই। তাঁহারা প্রাণরূপে সর্ব্বত্র ওতঃপ্রোতঃ অবস্থিত। জ্ঞানে ও সৎবিশ্বাসে তাঁহাদের স্ফূর্ত্তি। তাঁহারা অতুলনীয় অনন্ত সুখের অধিকারী। সংসারের সীমা উত্তীর্ণ হইয়া, শ্রেষ্ঠ মুক্ত অবস্থায় উপনীত হইয়া, সদ্‌জ্ঞান ও সদ্বিশ্বাসের স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া, তাঁহারা এই লোকের এক অংশে নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছেন।

যাঁহারা মুক্ত-সিদ্ধ-পূর্ণত্বপ্রাপ্ত, তাঁহারা ভিন্ন অন্য যে আর এক শ্রেণীর জীবের বিষয় বলা হইয়াছে, অর্থাৎ যাহারা সংসারী, তাহারা আবার প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত;—(১) গতিবিশিষ্ট, (২) গতিহীন। গতিহীন জীব আবার ত্রিবিধ; (ক) পৃথিবী-জীব, (খ) জলজীব, (গ) উদ্ভিদ। গতিহীন জীব সাধারণতঃ এই তিন ভাগে বিভক্ত হয়; কিন্তু ইহাদের মধ্যে আবার নানা উপবিভাগ আছে। প্রথম—পৃথিবী-জীব; উহারা স্থূলসূক্ষ্ম ভেদে দ্বিবিধ। সেই দুই বিভাগ আবার স্ফুট অস্ফুট ভেদে বিভিন্ন উপবিভাগে বিভক্ত। স্থূল অথচ পূর্ণস্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত পৃথিবী-জীব দ্বিবিধ; মসৃণ অথবা বন্ধুর। মসৃণতা সপ্তবিধ; কৃষ্ণ, নীল, লোহিত, হরিৎ, শ্বেত, পাংশুল, ধূসর।

সংসরী-জীব।

বন্ধুর অবস্থায় উহা ষট্‌ত্রিংশৎ প্রকার। মৃত্তিকা, কঙ্কর, বালুকা, প্রস্তর, পাহাড়, শৈলজ লবণ, লৌহ, তাম্র, টীন, সীসক, রৌপ্য, স্বর্ণ, হীরক, হরিতাল, সিন্দুর, সাসক (ধাতু বিশেষ) রসাঞ্জন, বিষমিশ্রিত লাল রং, প্রবাল, অভ্র-পতল, অভ্র-বালুকা; এইগুলি বিভিন্ন জাতীয় স্থূল পৃথিবী দেহের অন্তর্ভুক্ত। এতদ্ভিন্ন নানা জাতীয় মূল্যবান প্রস্তর আছে; যেমন—স্ফটিক, লোহিতাক্ষ, মরকত, মশারগল্ল, সূর্য্যকান্ত, চন্দ্রপ্রভা, হংসগর্ভ, চন্দন, জলকান্ত, লালখড়ি ইত্যাদি। এইরূপ ষট্‌ত্রিংশবিধ স্থূল পৃথিবীর উল্লেখ হয়। সূক্ষ্ম পৃথিবী একবিধ; উহার কোনও প্রকারান্তর নাই। এই সূক্ষ্মভাব সমগ্র লোকে পরিব্যাপ্ত। স্থূলভাব কেবল এই লোকেই পরিদৃষ্ট হয়। বলা বাহুল্য, স্থান বিষয়ে এবং কাল বিষয়ে এই পৃথিবী-জীবের অবস্থান্তর ঘটিয়া থাকে। অবিচ্ছিন্ন কাল-প্রবাহের বিষয় স্মরণ করিতে হইলে, এই পৃথিবী-দেহের আদি অন্ত নাই। কিন্তু যদি বর্ত্তমান কাল-বিষয়ক ব্যবধানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বিচার করা হয়, তাহা হইলে উহার আদি ও অন্ত স্বীকার করিতে হয়। তদনুসারে পৃথিবী-জীবের অতি দীর্ঘ আয়ুঃকাল দ্বাবিংশ সহস্র বর্ষ এবং ইহার অতি-সূক্ষ্ম আয়ুঃকাল মুহূর্ত্তেরও অনধিক। যেমন কাল সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত করিয়া পৃথিবী-জীবের আয়ুঃকাল নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে, সেইরূপ বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ, স্পর্শ, অবয়ব, স্থান প্রভৃতি সম্বন্ধেও উহার সহস্র সহস্র পর্য্যায়ভেদ পরিকল্পিত হইতে পারে। পৃথিবী-জীব যেরূপ সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হয়, জলজীবও সেইরূপ সূক্ষ্ম স্থূল দুই ভাগে বিভক্ত, এবং তাহারা পূর্ণস্ফুট অস্ফুট দুই ভাবে অবস্থিত। স্থূল এবং পূর্ণস্ফুট জল-জীব পঞ্চবিধ; পরিশ্রুত জল, শিশির, ঘর্ম্ম, কুয়াসা, হিমশিলা। সূক্ষ্ম জলজীব একবিধ; তাহার প্রকার-ভেদ নাই। সূক্ষ্মভাবে উহা সর্ব্বলোকে বিস্তৃত; কিন্তু স্থূলভাবে উহা এই পৃথিবীর এক অংশে মাত্র অবস্থিত। কালাদি বিষয়ে পৃথিবী-জীবের যেমন প্রকার-ভেদ পরিলক্ষিত হয়, জলজীবেরও সেই অবস্থা বুঝিতে হইবে। তৃতীয়তঃ—উদ্ভিদজীব। উহারাও পূর্ব্ববৎ স্থূল-সূক্ষ্ম দুই ভাগে এবং পূর্ণস্ফুট অস্ফুট দুই ভাবে অবস্থিত। স্থূল এবং পূর্ণপরিস্ফুট উদ্ভিদের আবার দুই বিভাগ আছে। প্রথম,—একজাতীয় আকৃতিবিশিষ্ট; দ্বিতীয়,—পরস্পর বিভিন্ন-আকৃতি-বিশিষ্ট। যাহাদের আকৃতির স্বাতন্ত্র্য আছে, সেই শ্রেণীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লিখিত হয়; যথা,—বৃক্ষ, গুচ্ছ, গুল্ম, লতা, বল্লী, তৃণ, বলয় (তাল-জাতীয় বৃক্ষ), পরবগ (ইক্ষুজাতীয় বৃক্ষ), কুষণ (সর্পছত্র ভেকছত্র ইত্যাদি), ওষধি, হরিতকায় ইত্যাদি। এই সকল উদ্ভিদের স্বতন্ত্র দেহ আছে। সেইজন্যই ইহারা স্বতন্ত্র-দেহবিশিষ্ট উদ্ভিদ পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। অভিন্ন সাধারণ-দেহবিশিষ্ট উদ্ভিদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লিখিত হয়;—আলু, মূলা, আদা, কদলী, রশুন, পেঁয়াজ, হরিদ্রা ইত্যাদি। উদ্ভিজ্জীবের স্থূল অবস্থা উক্ত দুই ভাগে বিভক্ত। উহার সূক্ষ্ম অবস্থা একই প্রকার; তাহার মধ্যে কোনও ভেদভাব পরিদৃষ্ট হয় না। এই উদ্ভিদ জীবের মধ্যে স্থান-কালাদির যে বিভাগ আছে, তাহা পৃথিবী-জীব প্রভৃতির সহিত সাদৃশ্য-সম্পন্ন। জৈনশাস্ত্রে উদ্ভিদকে যে জীব মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে, হিন্দুশাস্ত্রেও তদ্রূপ উক্তি দেখিতে পাই। আধুনিক বিজ্ঞান উদ্ভিদের জীবত্ব প্রমাণ পক্ষে যে গবেষণার পরিচয় প্রদান করিতেছে, সে প্রমাণ ভারতবর্ষে বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান আছে।

গতিহীন জীব যেরূপ ত্রিবিধ, গতিবিশিষ্ট জীবও সেইরূপ ত্রিবিধ। যথা;—(১) অগ্নি-জীব, (২) বায়ুজীব, (৩) প্রাণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীব। এই ত্রিবিধ গতিবিশিষ্ট জীবের মধ্যে আবার বিভিন্ন বিভাগ আছে। অগ্নিজীব-সমূহ প্রথমতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত;—স্থূল ও সূক্ষ্ম। ঐ দুই বিভাগই আবার পূর্ণস্ফুট ও অস্ফুট দুই ভাবে অবস্থিত। স্থূল এবং পূর্ণস্ফুট অগ্নিজীব নানাবিধ; পাথুরে কয়লা, অগ্নি, অগ্নিশিখা, অগ্নিসংযুক্ত তুষ, বিদ্যুৎ, উল্কা প্রভৃতি এই বিভাগের অন্তর্গত। সূক্ষ্ম অগ্নিজীবের কোনও প্রকার-ভেদ নাই; উহা এক ও অভিন্ন। স্থান-কালাদি-ভেদে অগ্নিজীবের যে অবস্থান্তর হয়, তাহা পৃথিবীজীব প্রভৃতির সহিত সাদৃশ্য-সম্পন্ন। বায়ুজীবও স্থূল-সূক্ষ্মভেদে দ্বিবিধ। উহার সূক্ষ্মভাব অগ্নিজীবেরই অনুরূপ। স্থূল ও পূর্ণ পরিস্ফুট অবস্থায় উহা পঞ্চবিধ বিভাগে বিভক্ত হয়। যথা,—উৎকলিকা (বার্ত্তা-প্রবাহ), মুণ্ডলিকা (ঘূর্ণীবায়ু), হিমশিলা-সংযুক্ত বায়ু-প্রবাহ, সম্বর্ত্তিকা (তূর্ণদ বায়ু প্রভৃতি)। প্রাণেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট গতিশীল জীব সাধারণতঃ চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। যথা,—(১) দ্বীন্দ্রিয় অর্থাৎ যাহাদের দুইটী ইন্দ্রিয় আছে; (২) ত্রীন্দ্রিয় অর্থাৎ যাহাদের তিনটী ইন্দ্রিয় আছে; (৩) চতুরিন্দ্রিয় অর্থাৎ যাহাদের চারিটি ইন্দ্রিয় আছে; (৪) পঞ্চেন্দ্রিয় অর্থাৎ যাহাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে। দ্বীন্দ্রিয় জীব স্থূল-সূক্ষ্ম-ভেদে দ্বিবিধ; আর তাহারা পূর্ণস্ফুট ও অস্ফুট দ্বিবিধ ভাবে অবস্থিত। কতকগুলি দ্বীন্দ্রিয় জীবের উপবিভাগ নিম্নে উল্লিখিত হইল; যথা,—কীট, কড়ি, শঙ্খ, শঙ্খাক্ষ, শম্বুক, শুক্তি, জলৌকা ইত্যাদি। এই সকল এবং বহু দ্বীন্দ্রিয় জীব পৃথিবীর এক অংশে অবস্থিতি করে। সর্ব্বত্র তাহাদের স্থান নাই। এই দ্বীন্দ্রিয় জীবগণের জীবনকাল অতি উর্দ্ধ সংখ্যায় দ্বাদশ বৎসর এবং অতি ন্যূনকল্পে এক মুহূর্ত্তেরও অল্প সময়। তাহাদের দেহের বিদ্যমানতা বিষয়ে ঐ একই রূপ কাল-পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয়। ত্রীন্দ্রিয় বিশিষ্ট জীবও স্থূল-সূক্ষ্ম-ভেদে দ্বিবিধ। পূর্ণস্ফুট বা অস্ফুটভাবে তাহাদের অবস্থিতি। তাহাদের উপবিভাগ-সমূহ; যথা,—কুন্থু অর্থাৎ কীটাণু, পিপীলিকা, ছারপোকা, উই, বৃশ্চিক প্রভৃতি। ত্রীন্দ্রিয় জীব পৃথিবীর স্থান-বিশেষে অবস্থিতি করে। ত্রীন্দ্রিয় জীব উর্দ্ধ সংখ্যায় ৪৯ দিন জীবিত থাকে। চতুরিন্দ্রিয়-বিশিষ্ট জীবও স্থূল-সূক্ষ্মভেদে দুই ভাগে এবং পূর্ণস্ফুট অস্ফুট দুই ভাবে অবস্থিত। তাহাদের বিভাগ-সমূহ; যথা,—মক্ষিকা, মশক, পতঙ্গ, বৃশ্চিক প্রভৃতি জাতীয় নানা জীব এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের আয়ুঃকাল মুহূর্ত্ত হইতে ছয় মাস পর্য্যন্ত।

গতিবিশিষ্ট জীব।

অতঃপর পঞ্চেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট জীবের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতেছে। পঞ্চেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট জীব চারি ভাগে বিভক্ত। (১) নরকের অধিবাসিগণ, (২) তির্য্যক্‌গণ, (৩) মনুষ্যগণ, (৪) দেবগণ। নরকের অধিবাসিগণ সাত শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া সপ্তবিধ নরকে অবস্থিতি করে। তাহাদের নাম—রত্নাভ, শর্করাভ, বালুকাভ, পঙ্কাভ, ধূমাভ, তমা, তমতমা। এই সাত শ্রেণীর নরকবাসী জীব পৃথিবীর এক অংশে বসতি করে। ইহাদের জীবন-কাল ন্যূনকল্পে দশ সহস্র বর্ষ হইতে বহু 'সাগরোপমা' বর্ষ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। পঞ্চেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট যে তির্য্যক্-জাতীয় জীব, তাহারাও

পঞ্চেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট জীব।

দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। উহাদের এক জাতীয় জীব 'সম্মূর্চ্ছিম' নামে অভিহিত হয়। তাহারা পারিপার্শ্বিক পদার্থের সংযোগে সমুৎপন্ন ও সংবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পঞ্চেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট অপর শ্রেণীর তির্য্যক্ জীব উদরাভ্যন্তরে জন্মগ্রহণ করে। এবম্বিধ তির্য্যক্ জীব তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; (১) জলচর, (২) ভূচর, (৩) খেচর। মৎস্য, কচ্ছপ, কুম্ভীর, মকর, শিশুক প্রভৃতি পঞ্চবিধ জলচর এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। চতুষ্পদ এবং সরীসৃপ-ভেদে পঞ্চেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট ভূ-চর তির্য্যক জীব দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। চতুষ্পদ চতুর্ব্বিধ। (১) একক্ষুর বিশিষ্ট অশ্বাদি, (২) দ্বিক্ষুরবিশিষ্ট গবাদি, (৩) বহুক্ষুরবিশিষ্ট গজাদি (৪) নখবিশিষ্ট জন্তু সিংহাদি। সরীসৃপ দ্বিবিধ। যথা,—(১) যাহারা বাহুতে ভর দিয়া গতিবিধি করে, যেমন টিক্‌টিকি প্রভৃতি; (২) যাহারা বক্ষের উপর ভর দিয়া গতিবিধি করে, যেমন সর্পাদি; পঞ্চেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট তির্য্যক্ জাতীয় জীবের মধ্যে আর এক শ্রেণীর যে জীব আছে, তাহারা পক্ষ-বিশিষ্ট। এই পক্ষ বিশিষ্ট তির্য্যগ্ জীব আবার চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। এক শ্রেণীর পক্ষ পরস্পর সংলগ্ন, যেমন বাদুড় প্রভৃতি। আর এক শ্রেণীর পক্ষ পরস্পর বিচ্ছিন্ন; যেমন সাধারণ পক্ষী জাতি। আর এক শ্রেণীর পক্ষ বাক্সের আকৃতি-বিশিষ্ট। চতুর্থ শ্রেণীর পক্ষ-বিস্তার—সেই জীবের আসন মধ্যে পরিগণিত হয়। *

পঞ্চেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট গতিশীল জীবের পর্য্যায়ে মনুষ্য উচ্চতর বলিয়া অভিহিত হয়। মনুষ্য প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণী "সম্মূর্চ্ছিম" এবং অন্য শ্রেণী জননী-জঠর-সম্ভূত। "সম্মূর্চ্ছিম" শব্দে স্বতঃ-উৎপন্ন ভাব প্রকাশ পায়। পদার্থবিশেষ হইতে মনুষ্যের উৎপত্তির বিবরণ পুরাণাদি শাস্ত্রে দেখিতে পাই। ক্রমবিকাশবাদিগণের এক সম্প্রদায়ের মত এই যে, পারিপার্শ্বিক পদার্থবিশেষের সম্বন্ধ-সংশ্রবে মনুষ্যের উৎপত্তি ঘটিয়াছিল। জৈন-শাস্ত্রের "সম্মূর্চ্ছিম" বিভাগ সেই আভাষ প্রদান করে। কোনও কোনও টীকাকার শব্দার্থের আলোচনায় এই মতেরই পোষকতা করিয়া গিয়াছেন বটে; কিন্তু অন্য শ্রেণীর টীকাকারগণ ঐ শব্দের অন্যরূপ অর্থও নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন যে, যাহাদের মানসিক বৃত্তিসমূহ স্ফূর্ত্তি লাভ করে নাই, শাস্ত্র তাহাদিগকেই "সম্মূর্চ্ছিম" পর্য্যায়-ভুক্ত করিয়া গিয়াছেন। এ ব্যাখ্যা সমীচীন হইলেও অপরাপর জীবজন্তু বিষয়ে যখন ঐ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তখন ঐ অর্থের সার্থকতা উপলব্ধি হয় না। যাহা হউক, শেষোক্ত পর্য্যায়ভুক্ত অর্থাৎ জননী-জঠরোৎপন্ন মনুষ্য সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত হইয়াছে, এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে। উত্তরাধ্যয়ন জৈনশাস্ত্র মতে সেই পর্য্যায়ের মনুষ্য ত্রিবিধ বিভাগে বিভক্ত।

মনুষ্য-পর্য্যায়।

* শেষোক্ত দ্বিবিধ পক্ষবিশিষ্ট তির্য্যক্ জীবের বিশেষ পরিচয় টীকাকারগণ প্রদান করিতে পারেন নাই। উত্তরাধ্যয়ন লিখিত হইবার সময় চতুর্ব্বিধ পক্ষবিশিষ্ট তির্য্যক্ জীব এতদ্দেশে বিদ্যমান ছিল, সপ্রমাণ হইলেও টীকা-রচনার সময় তাহাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। যাহাদের পক্ষ বাক্সের আকৃতি, তাহারা 'সমুদ্গ' নামে পরিচিত হইয়াছে। উহারা 'মানসোত্তর' দেশে অর্থাৎ মনুষ্যের আবাস-স্থানের বাহিরে অবস্থিতি করে।

প্রথম, যাঁহারা কর্ম্মভূমিতে বাস করেন। দ্বিতীয়, যাঁহারা অকর্ম্ম-ভূমিতে বাস করেন। তৃতীয়, যাঁহারা অনুল্লেখযোগ্য মহাদেশ-সমূহে বাস করেন। এখন, কর্ম্মভূমি কাহাকে বলে, বুঝিতে হইবে। জৈনশাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—পৃথিবীর যে অংশের মনুষ্যগণ ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিয়ত ব্যাপৃত থাকেন, সেই অংশের নাম—কর্ম্মভূমি। তদনুসারে জম্বু-দ্বীপের মধ্যে ভারত, ঐরাবত ও বিদেহ কর্ম্মভূমি মধ্যে পরিগণিত। আর যে অংশের মনুষ্যগণ ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান-পরায়ণ নহেন, সেই অংশ অকর্ম্মভূমি মধ্যে পরিগণিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহাদেশের মধ্যে হিমালয়ের পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত সপ্তদ্বীপপুঞ্জকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সেই সকল স্থানে উপকথা-কথিত অদ্ভুত প্রকৃতির জাতিরা বাস করে। যেমন জননীজঠরসম্ভূত মনুষ্য-জীবের, তেমনই "সম্মূর্চ্ছিম" পর্য্যায়ভুক্ত মনুষ্যজীবেরও বিভাগ উপবিভাগ আছে। "সম্মূর্চ্ছিমগণ" পৃথিবীর কোনও এক অনির্দ্দিষ্ট অংশে বাস করে।

পঞ্চেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট গতিশীল জীবের মধ্যে দেবগণ উচ্চতম পর্য্যায়ে অবস্থিত। তাঁহারা চারি বিভাগে বিভক্ত। যথা,—(১) ভৌমেয়িক, (২) ব্যন্তর, (৩) জ্যোতিষ্ক, (৪) বৈমানিক। ভৌমেয়িক অর্থাৎ ভবনবাসী দেবতা—দশবিধ; ব্যন্তর অর্থাৎ অরণ্যবাসী দেবতা—অষ্টবিধ; জ্যোতিষ্ক—পঞ্চবিধ; বৈমানিক—দ্বিবিধ। দশবিধ ভবনবাসী; যথা,—অসুর, নাগ, সুবর্ণ, বিদ্যুৎ, অগ্নি, দ্বীপ, উদধি, বাত, ঘনিক এবং কুমার। টীকাকারগণ বলেন,—'কুমার' শব্দ অসুর নাগ প্রভৃতি শব্দের সহিত যুক্ত হইবে; অর্থাৎ, ভবনবাসী-দশকের নাম যথাক্রমে অসুর-কুমার নাগ-কুমার ইত্যাদি। অষ্টবিধ 'ব্যন্তর' দেবগণ; যথা,—পিশাচগণ, ভূতগণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ, কিন্নরগণ, কিম্পুরুষগণ, মহোরগগণ, গন্ধর্ব্বগণ। জ্যোতিষ্কদেবগণের অবস্থান পঞ্চবিধ; সূর্য্যলোকসমূহ, চন্দ্রলোকসমূহ, নক্ষত্রলোকসমূহ, অন্যান্য গ্রহলোকসমূহ এবং অসংখ্য তারকালোকসমূহ। বৈমানিক দেবগণ দ্বিবিধ; (১) যাঁহারা স্বর্গীয় কল্পলোকে জন্মগ্রহণ করেন, (২) যাঁহারা তদূর্দ্ধলোকে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ দুই লোক যথাক্রমে 'কল্পোপগ' ও 'কল্পাতীত' নামে পরিচিত। কল্পলোকের দ্বাদশ বিভাগে তন্নামধেয় দ্বাদশ দেবতার বসতি আছে। সেই কল্পলোকের দ্বাদশ বিভাগের নাম;—সৌধর্ম্ম, ঈশান, সনৎকুমার, মাহেন্দ্র, ব্রহ্মলোক, লন্তক, মহাশুক্র, সহস্রার, আনত, প্রাণত, আরণ্য, অচ্যুত। এই সকল কল্পের নামানুসারে উহাদের অধিবাসী দেবগণের নামকরণ হইয়াছে। কল্পাতীত-লোক দুই ভাগে বিভক্ত; গ্রৈবেয়ক ও অনুত্তর। গ্রীবা হইতে গ্রৈবেয়ক শব্দের উৎপত্তি। যাঁহারা গ্রীবার উপর অর্থাৎ বিশ্বের ঊর্দ্ধভাগে বসতি করেন, তাঁহারা 'গ্রৈবেয়ক'; এবং যাঁহারা নিম্নদেশে বাস করেন, তাঁহারা 'অনুত্তর'। গ্রৈবেয়ক এবং অনুত্তর দেবগণ কি ভাবে কোথায় কতকাল অবস্থিতি করেন, প্রহেলিকার ছন্দে 'উত্তরাধ্যয়ন-সূত্র' তাহার পরিচয় দিয়াছেন। বাহুল্য-ভয়ে এখানে আর সে পরিচয় প্রদান করা হইল না। কর্ম্মফলে জীব এক এক স্থান প্রাপ্ত হয়। উত্তরাধ্যয়নে তাহারই আভাষ আছে। কর্ম্মফলে যে জন্মমৃত্যুর অধীন হইতে হয়, কর্ম্মফলই যে সুখদুঃখের নিয়ন্তা, ঐ অংশে সে কথাও স্পষ্টভাবে

দেব-পর্য্যায়।

পরিকীর্ত্তিত। যে আত্মা ধর্ম্মানুরাগী, পাপ-প্রবৃত্তির বশীভূত নহে, মৃত্যুর পর সেই আত্মাই মুক্তিলাভ করে। আর যে আত্মা ধর্ম্মবিশ্বাসহীন, পাপানুরত, তাহাকে জন্মচক্রে পড়িয়া নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

'কেবল' জ্ঞানলাভ চরম লক্ষ্য হইলেও সৎকর্ম্মের মধ্য দিয়া সে জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হইবে। জৈনধর্ম্মে তাই পূজা-মন্ত্র প্রভৃতির প্রবর্ত্তনা দেখিতে পাই। জৈন-যতিগণের মধ্যে পঞ্চবিধ তপস্যা প্রচলিত আছে। তাঁহাদিগকে জৈনশাস্ত্রসম্মত গায়ত্রী-মন্ত্র জপ করিতে হয়। জিনগণের এবং ঋষভদেবের পূজা, তাঁহারা যথারীতি মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া সম্পন্ন করেন। পূজার্হ জিনগণের দ্বিবিধ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়; খড়্গাসন-মূর্ত্তি ও পদ্মাসন মূর্ত্তি। পদ্মাসন-মূর্ত্তি উপবিষ্ট অবস্থায় এবং খড়্গাসন-মূর্ত্তি দণ্ডায়মান অবস্থায় অবস্থিত থাকেন। হিন্দু-দেবদেবীর পূজার ন্যায় ধূপ-দীপ-নৈবেদ্যাদি-দানে পূজা হইয়া থাকে। হোমের প্রথাও প্রচলিত আছে। তবে, নিবেদিত নৈবেদ্যাদি কেহ ভক্ষণ করেন না। তৎসমুদায় নির্ম্মাল্য নামে অভিহিত হয়। নির্ম্মাল্য গ্রহণে পাপ স্পর্শে—ইহাই জৈনগণের বিশ্বাস। জৈন-যতিগণের পঞ্চবিধ তপস্যা; যথা,—চৈত্যপরিপাঠ অর্থাৎ দেবমন্দির-সংস্কার, সাধুবন্দনা, সাম্বৎসরিক তীর্থ-পরিভ্রমণ, মিত্রভাবে অবস্থান, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ। উঁহাদের গায়ত্রী মন্ত্র; যথা,—"নমো অরিহংতাণং নমো সিদ্ধাণং, নমো আয়রিয়াণং, নমো উবজ্ঝায়াণং, নমো লোএ সব্বসাহূণং।" পাঁচ বার এই গায়ত্রী-মন্ত্র জপ করিলে সকল পাপ নাশ হয়, এবং সকল মঙ্গল আনয়ন করে। "এসো পংচনমুক্কারো, সব্বপাবপ্পণাসণো, মংগলাণং চ সব্বেসিং পঢ়মং হবই মংগলং।" জিনগণের সাধারণ পূজা-পদ্ধতি এইরূপ;—"ওঁ শ্রীবর্দ্ধমানায় নমঃ। ওঁ শ্রীং ঋষভেভ্য স্বস্তি। ওঁ হ্রীং হং। ওঁ হ্রীং শ্রীসুধর্ম্মচার্য্যাদি গুরুভ্যোঃ নমঃ। ওঁ হ্রীং শ্রীজীনেন্দ্রেভ্যোঃ নমঃ।" ইত্যাদি। অঙ্গপূজা, অগ্রপূজা, ভাবপূজা—পূজা প্রধানতঃ তিন প্রকার। অঙ্গপূজা বলিতে—অঙ্গ প্রক্ষালন, জিন প্রতিমাগঠন, চন্দনাদি বিলেপন, পুষ্পাদি আভরণ-ভূষণ প্রভৃতি দেবতা-প্রতিষ্ঠার ভাব বুঝায়। অগ্রপূজা বলিতে—বাদ্য, গীত, নৃত্য, নৈবেদ্য, আরতি প্রভৃতি আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান বুঝায়। ভাবপূজা বলিতে—স্তব, বন্দনা, অর্চ্চনা প্রভৃতি বুঝাইয়া থাকে। স্তবের মধ্যে চৈত্য-স্তব, সিদ্ধস্তব প্রভৃতি ভাবপূজার অন্তর্ভুক্ত। বিঘ্ননাশ, পুণ্যসঞ্চয় ও মুক্তি—পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ পূজার ত্রিবিধ ফল বলিয়া কথিত হয়। জিনগণের পূজায় জল-ব্যবহার সম্বন্ধে একটু অভিনবত্ব দৃষ্ট হয়। সুগন্ধ জল ও লবণ-জল তাঁহারা প্রধানতঃ ব্যবহার করেন। দেবতার স্নানের সময় সুগন্ধজল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আরতির সময় লবণ-জল ব্যবহার প্রসিদ্ধ। আরতির সময় পুষ্পে লবণ-জল প্রক্ষেপ-পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রসহ পুষ্প-প্রদান করা হয়।—

"উবণেউ মংগলং বো জিণাণমুহ লালি জাল সঞ্চলিয়া।
তিত্থ পবত্তণ সময় তিয়সবি ব মুক্কা কুসুমবুট্‌ঠী॥" ১।

জৈনধর্ম্মে পূজা-মন্ত্র।

---

* জৈনদর্শনের জীব ও অজীব তত্ত্ব আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, ভারতবর্ষ ভূবিদ্যায়, প্রাণিবিদ্যায়, উদ্ভিদবিদ্যায় কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল! বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান যে সকল তত্ত্বের আবিষ্কারে বিজয়-দুন্দুভি বাজাইতেছেন, সে সকল তত্ত্বের আবিষ্কার ভারতবর্ষে বহু পূর্ব্বে সাধিত হইয়াছিল; জৈনদর্শনের জীব-অজীব-প্রসঙ্গে তাহার নিদর্শন দেখিতে পাই।

"উঅহ পড়িভগ্‌গাপসরং পয়াহিনং মুনিবঙ্গী করে উণং।
পড়ইস লোণত্তন লজ্জিঅং চ লোণং হু অবহংমি॥" ২।

প্রথমোক্ত মন্ত্রে পুষ্প-প্রক্ষেপ এবং শেষোক্ত মন্ত্রে পুষ্পে লবণ-জল প্রক্ষেপ করিতে হয়। এইরূপ অলঙ্কার উন্মোচনের মন্ত্র, নির্ম্মাল্য-পরিষ্কারের মন্ত্র, স্নানের মন্ত্র, দীপদানের মন্ত্র প্রভৃতি মন্ত্র আছে। বলা বাহুল্য, সে সকল মন্ত্রই প্রাকৃতভাষায় লিখিত। পূজা-পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দুধর্ম্মের সহিত জৈনধর্ম্মের এতই সাদৃশ্য যে, অনেক সময় জৈন-যতিগণকে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মানুসারী সন্ন্যাসী বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। আচার-অনুষ্ঠানে বা ক্রিয়া-কর্ম্মে উভয়ের পরস্পরের পার্থক্য অনুধাবন করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। তাই, জৈন-যতিগণের কয়েকটী প্রধান লক্ষণ সাধারণতঃ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সকল বিষয়েই সাধারণ ভাবে সাদৃশ্য আছে; কেবল কয়েকটী অসাধারণ লক্ষণ,—

"যত্ত্বসাধারণো মুখমণ্ডলীকরণাদিঃ কেশোল্লুঞ্চনাদিশ্চ নাসৌ সর্ব্বৈরনুষ্ঠীয়তে।"

ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের ও জৈনধর্ম্মের সাদৃশ্যের বিষয় পুনঃপুনঃ আলোচনা করিয়াছি। উপসংহারে আর একবার সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছি। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের মূল তথ্যানুসন্ধানে আমরা উপলব্ধি করিয়াছি—অহিংসাও ধর্ম্ম, হিংসাও ধর্ম্ম। কিন্তু জৈনগণ একমাত্র অহিংসাকেই ধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অহিংসার গণ্ডী এত দূর-প্রসারী যে, তাঁহারা দৃশ্যমান্ পদার্থ-মাত্রেই অহিংসার আশঙ্কায় আশঙ্কিত। বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা-ছেদনে বা পত্র-পুষ্প ছিন্নকরণে তাঁহারা অহিংসার আশঙ্কা করেন। দীপশিখায় কীট-পতঙ্গ দগ্ধীভূত হইবার আশঙ্কায় তাঁহারা নিশাকালে অগ্নি-প্রজ্বালনে পরাঙ্মুখ হন। রাত্রিতে জৈন-যতিগণ আহার করেন না; সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাঁহাদের আহার সম্পন্ন হয়। তাঁহাদের আশঙ্কা—দীপ-প্রজ্বালনে পাছে প্রাণিহত্যা ঘটে। মধুচক্র হইতে মধুসংগ্রহ জৈনাচার-বিরুদ্ধ; কেন-না, মধু-সংগ্রহ-কালে মক্ষিকার ডিম্ব নষ্ট হওয়া সম্ভবপর। জৈনদর্শনে যে জীবতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহাতেই বুঝা যায়, জীবের পর্য্যায় কিরূপ; সুতরাং অহিংসার গণ্ডী কতদূর! এ পক্ষে বৌদ্ধগণের অহিংসার নীতি পরাভূত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। হিংসার যে সংজ্ঞা জৈনশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, তাহাতে বুঝিতে পারি, যত কিছু অসৎকর্ম্ম আছে, সকলই হিংসার অন্তর্ভূত। যথা,—

সাদৃশ্য অসাদৃশ্য।

"আত্মপরিণাম-হিংসন-হেতুত্বাৎ সর্ব্বমেব হিংসৈতৎ।
অনৃত-বচনাদি কেবলমুদাহৃতং শিষ্যবোধায়॥
কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বদা।
অক্লেশজননং প্রোক্তমহিংসত্বেন যোগিভিঃ॥"

অসত্য, চৌর্য্য প্রভৃতি যে কোনও কার্য্যে অশান্তির সম্ভাবনা আছে, তাহাই হিংসার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এই সব দেখিয়াও, অনেকেই ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের সহিত জৈনধর্ম্মের সাদৃশ্য-ভাব উপলব্ধি করেন। কেন-না, এই অহিংসা প্রভৃতির অনুষ্ঠান-বিষয়েও জৈনধর্ম্মে যে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয় না, তাহা বলিতে পারা যায় না। জৈনশাস্ত্রে পঞ্চাণুব্রতের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। সেই পঞ্চাণুব্রত,—"অহিংসাসত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যা-পরিগ্রহাঃ।" পাতঞ্জল-

যোগসূত্রে যমনিয়মাদির যে সংজ্ঞা দৃষ্ট হয়, এই পঞ্চাসুব্রত তাহারই প্রতিধ্বনি নহে কি? যথা, যোগসূত্রে,—"অহিংসাসত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ যমা।" কেবল উহাই নহে। যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য অহিংসার যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, জৈনগণের অহিংসার ধারণার নিকট তাহা কোনও অংশেই হীন নহে। যথা,—"কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বদা। অক্লেশজননং প্রোক্তমহিংসত্বেন যোগিভিঃ।" ইহার উপর আর বক্তব্য থাকিতে পারে না। চরিত্রের ঔৎকর্ষ-সাধনে রাগ-দ্বেষ-মোহ বিদূরিত হইবে। তাহার ফলে, সম্যগ্‌দর্শন লাভ হইবে। সম্যগ্‌দর্শনের ফলে তত্ত্বার্থে শ্রদ্ধা জন্মিলে এবং সম্যগ্‌জ্ঞানের উপদেশ প্রাপ্ত হইলে, সংশয়-বিপর্য্যয় দূরে যাইবে; তত্ত্বার্থের যথার্থ-জ্ঞানোদয়ে মুক্তিলাভ হইবে। সম্যগ্‌চারিত্র্য সম্যগ্‌দর্শন ও সমগ্‌জ্ঞান—জৈন "ত্রিরত্ন" নামে অভিহিত হয়। বৌদ্ধদর্শনের সহিত ইহার সাদৃশ্য—বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। * ফলতঃ, যে দিক দিয়া যে ভাবেই আলোচনা করা যাউক না কেন, কর্ম্ম-বন্ধনই যে সকল অনর্থের মূল, আর সেই কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিবার জন্যই যে শাস্ত্রের যত কিছু উপদেশ,—এই সার সত্যের সাম্যভাব ভারতীয় সকল ধর্ম্মেই পরিলক্ষিত হয়। জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয় প্রভৃতি অষ্টবিধ কর্ম্মের স্বরূপ-তত্ত্ব পূর্ব্বেই আমরা বিবৃত করিয়াছি। † সেই অষ্টবিধ কর্ম্মের দ্বারা 'কার্ম্মণ শরীর' গঠিত হইয়া আত্মা জন্মচক্রে বিঘূর্ণিত হয়। সেই কার্ম্মণ-শরীর ধ্বংস করিতে হইলে, কর্ম্মের পথ রোধ করা আবশ্যক। সে পথ রোধ করার একমাত্র উপায়, জৈনশাস্ত্র মতে, "সংবর"। 'আশ্রব' দ্বারা বন্ধ ঘটে; 'সংবর' আশ্রবের গতি নিরুদ্ধ করে। আশ্রবের দ্বারা নূতন নূতন কর্ম্মের সংযোগ বা আগম ঘটে। সংবর—সে আগমের গতি রোধ করে। কর্ম্মসঞ্চয়ের প্রধান কারণ—কামনা; 'সংবর' কামনাকে সম্বরণ করে। রাগ দ্বেষ, অহঙ্কার, আসক্তি—কেবলই আত্মাকে বন্ধনের পর নূতন বন্ধনে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইতেছে—তাহাই 'আশ্রব'; 'সংবর'—আসক্তির সম্বরণ দ্বারা সে বন্ধন শিথিল করার প্রয়াস পাইতেছে। আসক্তির শৈথিল্য-করণই অনাসক্ত বা নিষ্কামভাব। সুতরাং, মূলে নিষ্কাম কর্ম্মের সেই একই সিদ্ধান্ত আসিয়া দাঁড়াইতেছে। নিষ্কাম কর্ম্মেই কর্ম্ম-বন্ধন শিথিল করে, নিষ্কাম কর্ম্মেই মোক্ষের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। 'আশ্রব' ও 'সংবর' শব্দদ্বয়ে জৈনদর্শন সেই নিষ্কাম কর্ম্মেরই প্রাধান্য খ্যাপন করিতেছে। ফলতঃ, মূল লক্ষ্য সকলেরই অভিন্ন; কেবল গন্তব্য-পথ বিভিন্ন মাত্র। সেই বাণীই সত্য—সার সত্য,—

"যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো,
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ,
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ।"

---

* 'পৃথিবীর ইতিহাস' পঞ্চম খণ্ডে বৌদ্ধদর্শন প্রসঙ্গে এই বিষয়ের আলোচনা দ্রষ্টব্য। জৈনদর্শন মতে—সত্তা, বন্ধ, উদয়—কর্ম্মের এই ত্রিবিধ বিভাগ। অদৃষ্ট বা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম 'সত্তা' নামে অভিহিত হয়। সেই কর্ম্মের ফলভোগ—উদয়। নূতন কর্ম্মের সংযোগই—বন্ধ। বেদান্ত-দর্শনে কর্ম্মের যে ত্রিবিধ বিভাগ আছে, ইহা তাহারই অনুরূপ। বেদান্ত মতে কর্ম্মের সেই বিভাগত্রয়—সঞ্চিত, ক্রিয়মাণ, প্রারব্ধ। বেদান্ত-মতে ও সাঙ্খ্য-মতে যে সূক্ষ্মশরীর পরিকল্পিত, জৈনদর্শনোক্ত 'কার্ম্মণ শরীর' তাহারই নামান্তর মাত্র।

† এই খণ্ডের ৭৫ পৃষ্ঠায় অষ্টবিধ কর্ম্মের বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:•:—

মহাবীর স্বামী।

[তীর্থঙ্করগণের মর্ত্ত্যে অবতরণ ;—মহাবীরের অলৌকিক জন্ম-কাহিনী ;—মহাবীরের ভ্রূণ অবস্থা ;—মহাবীরের জন্মগ্রহণ ;—জন্মোৎসব ;—জাতকর্ম্ম-নামকরণাদি ;—পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি ;—মহাবীরের সংসারবাস ;—মহাবীরের গুণ-গ্রাম ;—তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণ ;—কঠোর সংযম-সাধনা ;—প্রতিবন্ধক দূর ;—দেহ ত্যাগ ;—জৈন-বৌদ্ধ অগ্রজ-অনুজ ;—দুই ধর্ম্মে সাদৃশ্য-অসাদৃশ্য]

তীর্থঙ্করের মর্ত্ত্যে অবতরণ।

জৈনধর্ম্মের এবং তাহার প্রভাবের বিষয় আলোচনা করিতে হইলে, জৈনধর্ম্ম-সৌধের ভিত্তিস্তম্ভ-সমূহের বিষয় অনুধাবন করার আবশ্যক হয়। সেই জিনগণ, সেই অর্হৎগণ, সেই স্থবিরগণ, সেই যতিগণ—তাঁহারাই জৈনধর্ম্মের প্রাণস্থানীয়। জৈন-ধর্ম্মের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে হইলে, তাঁহাদের মহীয়সী মহিমার বিষয় সর্ব্বাগ্রে স্মৃতিপটে উদ্ভাসিত হয়। জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তক জিনগণ কোন্ অনন্ত অতীতের ক্রোড়ে আবির্ভূত হইয়া জ্ঞানের অনন্ত ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? * চতুর্ব্বিংশতি জিনের বিদ্যমান-কাল-বিষয়ক ধারণায় মানুষের গবেষণা পর্য্যুদস্ত হয়। সুতরাং ধ্যান-ধারণার অতীত সে অতি-দূরের প্রসঙ্গ পরিহার করিয়া, প্রথমে আমরা শেষ তীর্থঙ্কর সম্বন্ধে অল্পকিছু আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইতেছি মাত্র। শেষ তীর্থঙ্কর—চতুর্ব্বিংশতিতম তীর্থঙ্কর বা জিন—মহাবীর। তিনি বর্দ্ধমান, মহাবীর স্বামী, জ্ঞাতপুত্র, জ্ঞাতৃপুত্র প্রভৃতি নামে অভিহিত হন।

মহাবীরের অলৌকিক জন্মকাহিনী।

যেমন অন্যান্য তীর্থঙ্করগণের, তেমনই মহাবীর স্বামীর আবির্ভাব ও তিরোভাব সম্বন্ধে নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচারিত আছে। মহাবীর স্বামীর জীবনচরিত-সংক্রান্ত প্রধান গ্রন্থ—কল্পসূত্র ও সূত্রকৃতাঙ্গ। মহাবীর স্বামীর তিরোভাবের অব্যবহিত পরবর্ত্তিকালে ভদ্রবাহু কল্পসূত্র সঙ্কলন করেন। সূত্রকৃতাঙ্গের বহু সূত্র মহাবীর স্বামীর মুখকমলনিঃসৃত বলিয়াই প্রচারিত আছে। সুতরাং মহাবীর স্বামীর জীবনচরিত-বিষয়ে ঐ দুই গ্রন্থকেই প্রাচীন ও প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার

* জৈনগণের আদি-তীর্থঙ্করের নাম—ঋষভদেব। শ্রীমদ্ভাগবতে তিনি ভগবানের অবতার বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। স্বায়ম্ভুব মনুর প্রপৌত্র নাভি। ঋষভ নামে তাঁহার পুত্ররূপে ভগবান জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবত, পঞ্চম স্কন্ধ, ৩য় অধ্যায় প্রভৃতিতে এই ঋষভ দেবের বিবরণ পরিদৃষ্ট হয়। যজুর্ব্বেদে ঋষভ দেবের পূজার বিষয় লিখিত আছে; "ওঁ নমঃ অর্হন্তো ঋষভঃ।" ফলতঃ হিন্দুর যিনি অবতার মধ্যে পরিগণিত, তিনিই জৈনধর্ম্মের আদিভূত। কত কাল পূর্ব্বে ভগবান যে ঋষভদেব-রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা কল্পনায়ও গণনা করা যায় না।

করিতে হয়। কল্পসূত্রে ও সূত্রকৃতাঙ্গে তাঁহার জীবন-চরিত সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, উভয়ের ভাষা-ভাব প্রায়ই অভিন্ন। সুতরাং ঐ বিষয়ে ঐ দুইএর যে কোনও একের অনুসরণেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। আমরা কল্পসূত্রের অনুসরণেই মহাবীর স্বামীর জীবন-চরিত প্রকটন করিবার প্রয়াস পাইতেছি। কল্পসূত্রের প্রথম সূত্রে আভাষ পাই, মহাবীর স্বামীর জীবন-নাটক অঙ্ক-ষটকে বিভক্ত। তাহার অঙ্ক-পঞ্চকে মর্ত্ত্য-লীলা; আর ষষ্ঠ অঙ্কে নির্ব্বাণ-লাভ। সূত্রের বজ্র-বন্ধনে তদ্বিবরণ এইরূপ পরিদৃষ্ট হয়;—

"তেণং কালেণং তেণং সমএণং সমণে ভগবং মহাবীরে পংচহত্থুত্তরে হুত্থা, তংজহা, হত্থুত্তরাহিং চুএ—চইত্তা গব্ভং বকংতে? হত্থুত্তরাহিং গব্ভাও গব্ভং সাহরিএ হত্থুত্তরাহিং জাএ হত্থুত্তরাহিং মুংডে ভবিত্তা অগারাও অণগারিঅং পব্বইএ পডিপুন্নে কেবলবরনাণদংশণে সমুপ্পন্নে সাইণা পরিনিব্বুএ ভয়বং।" *

মহাবীর স্বামীর জীবনের পাঁচটী প্রধান মুহূর্ত্তের বিষয় ঐ সূত্রে পরিবর্ণিত। সেই পাঁচ প্রধান মুহূর্ত্তের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার জীবনের পাঁচটী প্রধান অবস্থার সহিত গ্রহ-নক্ষত্রাদির এক অপূর্ব্ব অভিন্ন সমাবেশ ঘটিয়াছিল। সংসারের এক স্তর হইতে অন্য স্তরে যখনই তিনি অগ্রসর হন, গ্রহ-নক্ষত্রের তখনই সেই অপূর্ব্ব সমাবেশ সঙ্ঘটিত হয়। চন্দ্রের সহিত উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রের সংক্রমণ—তাঁহার জীবনাঙ্ক-পরিবর্ত্তনের এক এক বিশিষ্ট লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত। তিনি মর্ত্ত্যে অবতরণ করিলেন, মাতৃ-গর্ভে (দেবা-নন্দার গর্ভে) জন্মগ্রহণ করিলেন—সেই উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রের সংক্রমণকালে। তিনি গর্ভ (দেবানন্দার গর্ভ) হইতে গর্ভান্তরে (ত্রিশলার গর্ভে) সঞ্চালিত হইলেন—সেই উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রের সংক্রমণ-কালে; তাঁহার জন্ম হইল—সেই উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রের সংক্রমণ-কালে; তিনি মুণ্ডিত-মস্তকে গৃহ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন—সেই উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রের সংক্রমণ-কালে; তাঁহার সেই অনন্ত শ্রেষ্ঠ অবাধ পূর্ণ 'কেবল' জ্ঞান লাভ হইল—সেও সেই উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রের সংক্রমণ-কালে। কেবল, তাঁহার যে চরম মুক্তি, মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ—সে কেবল স্বাতী-নক্ষত্রের সংক্রমণ-কালে। এবম্বিধ অবস্থা-ষটকের মধ্য দিয়া মহাবীর স্বামীর মর্ত্ত্য-জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। অলৌকিক জীবনের আদি-অন্ত-মধ্য সকলই এইরূপ অলৌকিক ব্যাপারে পরিপূর্ণ। তিনি জন্মগ্রহণ করিলেন—ব্রাহ্মণী দেবানন্দার গর্ভে; আর, ভ্রূণ অবস্থায় গর্ভ হইতে গর্ভান্তরে—ব্রাহ্মণী দেবানন্দার গর্ভ হইতে ক্ষত্রিয়াণী ত্রিশলার গর্ভে—সঞ্চালিত হইলেন। এ ব্যাপার মনুষ্য-জীবনে ইহলোকে পরিদৃষ্ট হয় না। মহাবীর অলৌকিক অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন; সুতরাং তাঁহাতেই এ অলৌকিক ব্যাপার সম্ভবপর বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দেখিতে পাই, এই মানুষেরই একের কার্য্যকলাপ অন্যের নিকট অলৌকিক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়; সুতরাং মানুষের অতীত যিনি, তাঁহাতে যে অলৌকিকত্ব দেখিব, তাহা

---

* 'কল্পসূত্রের' পাঁচটী 'বাচনে' (পাঠে) মহাবীর স্বামীর জীবন-চরিত বর্ণিত আছে। তাহার এই প্রথম সূত্রটীই প্রথম 'বাচন'। অন্যান্য বাচনে সূত্র-সংখ্যা বিভিন্ন রূপ দৃষ্ট হয়; যথা,—দ্বিতীয়ে ২১, তৃতীয়ে ১৬, চতুর্থে ৫০, পঞ্চমে ৬২।

আর আশ্চর্য্য কি? যাহা হউক, প্রথম সূত্রে তাঁহার জীবনের যে আভাষ প্রদত্ত হইল, পরবর্ত্তী সূত্র-সমূহে তাহারই বিশ্লেষণ-বিবৃতি পরিদৃষ্ট হয়। তিনি কি অবস্থা হইতে কোন্ সময়ে কোন্ কুলে জন্মগ্রহণ করেন, দ্বিতীয় সূত্রে তাহার উল্লেখ দেখি। সে সূত্রটী এই;—

"তেণং কালেণং তেণং সমএণং সমণে ভগবং মহাবীরে জে সে গিম্হাণং চউথে মাসে অট্ঠমে পক্‌খে আসাঢ়সুদ্ধে তস্‌সণং আসাঢ়সুদ্ধস্‌স ছট্ঠিপক্‌খেণং মহাবিজয়-পুপ্‌ফুত্তরপবরপুংডরীয়াও মহাবিমাণাও বীসংসাগরোবমট্ঠিইয়াও আউক্‌খএণং ভব-ক্‌খএণং টিইক্‌খএণং অণংতরং চয়ং চইত্তা ইহেব জংবুদ্দীবে দীবে ভারহে বাসে দাহিণড্ঢভরহে ইমীসে ওসপ্পিণীএ সুসমসুসমাএ সমাএ বিইকংতাএ সুসমাএ সমাএ বিইকংতাএ সুসমদুসমাএ সমাএ বিইকংতাএ দুসমসুসমাএ সমাএ বহুবিইকংতাএ—সাগরোবমকোডা-কোডীয়ে বায়ালীসবাসসহস্‌সেহিং উণিআএ পংচহত্তরিবাসেহিং অদ্ধনবমেহি য মাসেহিং সেসেহিং ইকবীসাএ তিথয়রেহিং ইক্‌খাগকুলসমুপ্পন্নেহিং কাসবগুত্তেহিং, দোহি য হরিবংসকুলসমুপ্পন্নেহিং গোঅমসগুত্তেহিং, তেবীসাএ তিথয়রেহিং বিইকংতেহিং, সমণে ভগবং মহাবীরে চরমতিথয়রে পুব্বতিথয়রনিদ্দিট্ঠে, মাহণকুংডগ্‌গামে নয়রে উসভদত্তস্‌স মাহণস্‌স কোডালসগুত্তস্‌স ভারিআএ দেবাণংদাএ মাহণীএ জালংধরসগুত্তাএ পুব্বরত্তাবরত্তকালসময়ংসি ইথুত্তরাহিং নক্‌খত্তেণং জোগমুবাগএণং আহারবকংতীএ ভববকংতীএ সরীরবকংতীএ কুচ্ছিংসি গব্ভত্তাএ বকংতে।"

মর্ম্মার্থ,—'ভগবান মহাবীর গ্রীষ্মের চতুর্থ মাসে অষ্টম পক্ষে অর্থাৎ আষাঢ় মাসের ষষ্ঠ দিবসে শুক্লপক্ষে সর্ব্ববিজয়ী সর্ব্ব-ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন পুষ্পোত্তর নামা মহাবিমান হইতে অবতরণ করেন। শ্রেষ্ঠ সামগ্রীর মধ্যে যেমন পদ্ম, স্বর্গলোকের মধ্যে সেইরূপ পুষ্পোত্তর-বিমান। পুণ্ডরীকসদৃশ সেই দেবলোকে, নির্দ্দিষ্ট বিংশ সাগরোপম কাল অবস্থিতি করিয়া, এই জম্বুদ্বীপে ভারতক্ষেত্রে তিনি অবতীর্ণ হইলেন। তখন, বর্ত্তমান অবসর্পিণী-কালের অন্তর্গত সুসমসুসমা, সুসমা এবং সুসমা-দুঃসমা কালত্রয় অতীত হইয়া দুঃসমা-সুসমা কালের অধিকাংশ অতীত হইয়াছিল। তখন, শেষোক্ত কালাংশের মাত্র বাহাত্ত বৎসর সাড়ে আট মাস অবশিষ্ট ছিল। তাঁহার পূর্ব্বে ইক্ষ্বাকু-বংশের কাশ্যপ-গোত্র-সম্ভূত একবিংশতি তীর্থঙ্কর এবং হরিবংশীয় গৌতম-গোত্রজ দুইজন তীর্থঙ্কর আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে শেষ তীর্থঙ্কর ভগবান মহাবীর জালন্ধরায়ণ গোত্রজা দেবানন্দার গর্ভে ভ্রূণের আকার পরিগ্রহ করেন। দেবানন্দা কোড়াল-গোত্রজা; তিনি ব্রাহ্মণ ঋষভদত্তের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। কুন্দগ্রাম নামক নগরে ব্রাহ্মণ-পল্লীতে তাঁহাদের বসতি ছিল। দেবলোকে অবস্থিতির নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইলে, চন্দ্রের সহিত উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রের সংক্রমণ-কালে মধ্য রাত্রিতে ভগবান মহাবীর দেবানন্দার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিলেন।' দ্বিতীয় সূত্রের এই মর্ম্মার্থের অনুসরণে মহাবীর স্বামীর জন্মকাল নির্দ্দিষ্ট হয়। পুরণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে যেরূপ যুগবিভাগ দেখিতে পাই, সুসম-সুসমা প্রভৃতি সেইরূপ এক একটী যুগবিশেষ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। যুগ, চতুর্যুগ, কল্প প্রভৃতি যে কাল-বিভাগ হিন্দুশাস্ত্রে দেখিতে পাই, এই কালবিভাগে তাহারই অনুসরণের ভাব মনে আসে। চতুর্যুগ যেমন সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি চারিভাগে বিভক্ত,

অবসর্পিণী-কাল সেইরূপ সুসমসুসমা, সুসমা, সুসমদুঃসমা, দুঃসমসুসমা এই চারিভাগে বিভক্ত। বৈবস্বত মন্বন্তরের সত্য ত্রেতা দ্বাপর অতীত হইয়া এখন যেমন কলির নির্দ্দিষ্ট আয়ুঃকাল চারি লক্ষ বত্রিশ হাজার বর্ষের মধ্যে পাঁচ সহস্রাধিক বর্ষ অতীত হইয়াছে এবং কলি পূর্ণ হইতে অনধিক চারি লক্ষ আটাশ হাজার বৎসর অবশিষ্ট আছে, এস্থলেও সেইরূপ একটী ভাব ব্যক্ত হইতেছে। জৈনগণের একটী কাল-পরিমাণের সংজ্ঞা—'সাগরোপম'; সুসমসুসমা কালে চারি 'কোড়া কোড়ী' সাগরোপম আছে। সুসমাকালে তিন 'কোড়া কোড়ী' সাগরোপম আছে। সুসমদুঃসমকালে দুই 'কোড়া কোড়ী' সাগরোপম আছে। মহাবীরের জন্মপ্রসঙ্গে পূর্ব্বোক্ত স্থানে বলা হইয়াছে যে, তখন দুঃসমসুসমকালের এক 'কোড়া কোড়ী' সাগরোপমের বিয়াল্লিশ হাজার বৎসর কম ছিল। এক কোড়া কোড়ীতে কোটী কোটী বৎসর (অর্থাৎ ১০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০ বৎসর) নির্দ্দিষ্ট হয়। তাহারই ৪২ হাজার বৎসর কম দুঃসমসুসমা কালাংশের পরিমাণ। কিন্তু যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন দুঃসমসুসমা কালাংশ শেষ হইতে মাত্র ৭২ বৎসর সাড়ে আট মাস অবশিষ্ট ছিল। যাহা হউক, ঐরূপ কাল-পরিমাণ গণনা করিয়া পণ্ডিতগণ মহাবীর স্বামীর জন্মকাল সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, অদ্য হইতে ২৪৪৫ বর্ষ পূর্ব্বে ভগবান মহাবীর মর্ত্ত্যলোকে প্রকট হইয়াছিলেন, এবং বায়াত্তর বৎসর বয়সে তিনি মহানির্ব্বাণ লাভ করেন। *

ভগবান মহাবীর যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁহাতে ত্রিবিধ জ্ঞান বিদ্যমান ছিল। সেই তিন জ্ঞান—মতি, শ্রুতি, অবধি। তিনি জানিয়াছিলেন,—তাঁহাকে অবতরণ করিতে হইবে; তিনি জানিয়াছিলেন,—তিনি অবতরণ করিয়াছেন; তিনি জানিয়াছিলেন না,—কখন তিনি অবতরণ করিলেন। মহাযোগী মাতৃগর্ভে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। শক্রদেবের আদেশে হরিণগমেষীর কৌশলে তিনি এতই ক্ষিপ্রগতিতে গর্ভান্তরে সঞ্চালিত হন যে, সে সময় তিনি তাহা জানিতেই পারেন নাই।

মহাবীরের ভ্রূণ অবস্থা।

* মূল কল্পসূত্রের একখানি হিন্দি অনুবাদ শ্রীমান্ মণিক মুনিজী কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়া আজমীর সহর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই গ্রন্থে হিন্দিভাষায় ঐ সূত্রের যে মর্ম্মানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা গেল। তাহা পাঠে বিষয়টী হৃদয়ঙ্গম হইবে;—"আজ যে ২৪৪২ বর্ষ পহলে মহাবীর প্রভু কা নির্ব্বাণ হুবা উনকে ৭২ বর্ষ পহিলে কে সময় মে গ্রীষ্ম (গর্ম্মী) ঋতু কে চোথে মাস বা আটবেং পক্ষ কে ছট্ঠে দিন অর্থাৎ আষাঢ় সুদি ৬ কে রোজ শ্রীমন্ বীর প্রভু কা জীব মহা বিজয় পুষ্পোত্তর পুংডরিক নাম কে বড়ে বিমান সে বীসসাগরোপম কী স্থিতি পূরী করকে অর্থাৎ দেবভব পূরা করকে সীধে দেবলোক সে ইস জম্বুদ্বীপ কে ভরতক্ষেত্র কে দক্ষিণ ভাগ মেং ইস বর্ত্তমান অবসর্পিণী কাল কে (১ সুখম্ সুখম্ ২ সুখম্ ৩ সুখম দুখম্ ৪ দুখম্ সুখম ইন চার আরোং কে বীত জানে মেং কুছ পিচোত্তর বর্ষ সাড়ে আট মাস বাকী রহে তব [চার আরোং কা সময় প্রমাণঃ ১ চার কোড়া কোড়ী সাগরোপম কা, ২ তিন কোড়া কোড়ী সাগরোপম কা, ৩ দো কোড়া কোড়ী সাগরোপম কা, ৪ এক-কোড়া কোড়ী সাগরোপম মেং বয়ালীস হাজার বর্ষ কম কা]) চোথে আরে কে অংত মেং মাতা কে উদর মেং আয়ে, উনকে পহলে ২১ তীর্থকংরোংনে ইক্ষবাকুকুল ওর কাশ্যপ গোত্র মেং ওর ২ তীর্থংকরোংনে হরিবংশ কুল ওর গৌতম গোত্র মেং জন্ম লিয়া, ইন ২৩ তীর্থকরোং নে কেবলজ্ঞান দ্বারা পহলে হী কহা থা কি (২৪) চৌবীসবেং তীর্থংকর শ্রীমহাবীর প্রভু ব্রাহ্মণ কুংড নগ্র মেং কোডাল গোত্র কে ব্রাহ্মণ ঋষভদত্ত কী জালংধর গোত্র কী ব্রাহ্মণী দেবানংদা নাম্নী স্ত্রী কে কুখ মেং মধ্যরাত কে সময় উত্তরা ফাল্গুনী নক্ষত্র মেং চন্দ্র যোগ মেং দেবতা কে শরীর কো. ছোড়কর মনুষ্য সম্বন্ধী আহার ওর ভব গ্রহণ কর (মাতা কে উদর মেং) আবেংগে উসী মুজব মহাবীর স্বামী কা জীব মাতা কে উদর মেং আয়া।" তিন বর্ষ পূর্ব্বে ঐ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সুতরাং এখন ২৪৪৫ বর্ষ অতীত।

তাই তিনি তাঁহার অবতরণের ও অবস্থানের বিষয় মাত্র জ্ঞাত ছিলেন; কিন্তু গর্ভান্তরে সঞ্চালিত হওয়ার সময়টা তাঁহার অপরিজ্ঞাত ছিল। যাহাহউক, যে রাত্রিতে, যে সময়ে ভগবান মহাবীর জালন্ধরায়ণ গোত্রজা দেবানন্দার গর্ভে ভ্রূণরূপে আবির্ভূত হইলেন, ব্রাহ্মণী দেবানন্দা তখন পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া ছিলেন; অর্দ্ধনিদ্রিত অর্দ্ধজাগ্রৎ অবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। স্বপ্নে তিনি চতুর্দ্দশবিধ মঙ্গল-লক্ষণ দেখিতে পান। সে স্বপ্ন—সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন, চাকচিক্যময়, শুভসূচক, শান্তিপ্রদ, মাঙ্গলিক সৌভাগ্যজ্ঞাপক। দেবানন্দা দেখিলেন—তাঁহার সম্মুখে গজ, বৃষভ, সিংহ, অভিষেক (লক্ষ্মীদেবীর), মাল্য, চন্দ্র, সূর্য্য, ধ্বজা, কলস, পদ্মসরোবর, ক্ষীরসাগর, বিমানভবন, রত্নসম্ভার, নির্ধূম অগ্নিশিখা। * দেবানন্দা যখন স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিলেন, তখন তাঁহার আনন্দের অবধি রহিল না। বর্ষার বারিধারায় কদম্বপুষ্প যেমন প্রফুল্ল-শ্রী ধারণ করে, দেবানন্দার হৃদয় সেইরূপ আনন্দে উৎফুল্ল হইল। তিনি পুলক-রোমাঞ্চ প্রাণে পালঙ্ক হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। নাতি-দ্রুত নাতি-কম্পিত মরালগমনে, ক্ষিপ্রগতিতে অথচ সন্তর্পণে, পতি সুব্রাহ্মণ ঋষভদত্ত-সমীপে উপনীত হইয়া তিনি আনন্দের বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। প্রশান্ত স্থিরভাবে পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া যুক্তকরে প্রণতিজ্ঞাপন-পূর্ব্বক কহিলেন,—"হে স্বামিন্! হে দেবতা! আজ আমি পালঙ্কে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইবার সময়, অর্দ্ধনিদ্রিত অর্দ্ধজাগরিত অবস্থায়, বড় শুভসূচক স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি। স্বপ্নে গজ বৃষভ সিংহ প্রভৃতি যে চতুর্দ্দশ মাঙ্গলিক চিহ্ন দর্শন করিয়াছি, তাহাতে কি শুভফল লাভ হইবে, আমার তাহার স্বরূপ-তত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়া নিশ্চিন্ত করুন।" সহধর্ম্মিণী দেবানন্দার স্বপ্নবৃত্তান্ত অবগত হইয়া ঋষভদত্ত অনুরূপ আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। স্বপ্ন-বৃত্তান্তের বিষয় অনুধ্যান-পূর্ব্বক দেবানন্দাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"প্রিয়তমে! তুমি দেবগণেরও প্রিয়। তাই তুমি অতি উত্তম কল্যাণকর স্বপ্ন দেখিয়াছ। তুমি যে সৌন্দর্য্যময় আনন্দময় মঙ্গলময় সৌভাগ্যসূচক স্বপ্ন দর্শন করিয়াছ, তাহার ফলে, স্বাস্থ্য, আনন্দ, দীর্ঘজীবন, শান্তি ও সৌভাগ্য আনয়ন করিবে। হে দেবপ্রিয়ে! তোমার ঐ স্বপ্নের ফলে, আমরা সর্ব্বকার্য্যে সাফল্য-লাভ করিব,—সুখের এবং আনন্দের অধিকারী হইব। প্রিয়ে! ঐ স্বপ্নের ফলে শীঘ্রই আমরা এক সর্ব্বসুলক্ষণা-ক্রান্ত পুত্র-সন্তান লাভ করিব। নয় মাসের পর সপ্তার্দ্ধ দিবস অতীত হইলে, তোমার গর্ভে সেই সুকুমার সুন্দর শিশু জন্মগ্রহণ করিবে। তাহার কোমল হস্তপদে, পূর্ণপঞ্চেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট পূর্ণায়তন দেহে, সদ্গুণের ও সৌভাগ্যের লক্ষণসমূহ বিদ্যমান থাকিবে। সে শিশুর সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুগঠিত এবং তাহার দৈর্ঘ্য-বিস্তার-পরিমাণ পূর্ণতাসম্পন্ন হইবে। সে শিশু শশধরের ন্যায় সুন্দর কান্তি-বিশিষ্ট থাকিবে। আর, বাল্য অতিক্রম করিয়াই বুদ্ধিবৃত্তির পরিপক্কতার সঙ্গে সঙ্গে সে শিশু চতুর্ব্বেদে পারদর্শী হইবে। অনায়াসেই সে ইতিহাস অধিগত করিবে। অনায়াসেই অঙ্গ উপাঙ্গ ও রসায়-সহ নিঘণ্টু তাহার আয়ত্ত হইবে।

* প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের জননী প্রথম স্বপ্নে বৃষ দর্শন করিয়াছিলেন। অন্তিম তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর মাতা প্রথম স্বপ্নে সিংহ-দর্শন করেন। যে যে তীর্থঙ্কর স্বর্গ হইতে অবতরণ করেন তাঁহাদের মাতৃদেবীগণ দ্বাদশ-স্বপ্নে বিমান দর্শন করিয়াছিলেন; আর যে যে তীর্থঙ্করগণ নরক হইতে আগমন করেন, তাঁহাদের জননীগণ ভবন দর্শন করেন।

ষড় অঙ্গে, ষষ্টি প্রতিজ্ঞায়—সাংখ্যাদি দর্শনে এবং গণিত-বিজ্ঞানে, স্বর-বিজ্ঞানে, শব্দ-বিজ্ঞানে ব্যাকরণে, ছন্দে ও জ্যোতিষে, সর্ব্ববিধ ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রে, সহজেই সে পারদর্শিতা লাভ করিবে। প্রিয়ে! তুমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছ, তাহা বড়ই শুভ-ফলপ্রদ।" পত্নীকে এইরূপে স্বপ্নফল-বৃত্তান্ত অবগত করাইলে, পতির মুখে ভাবী পুত্রের শুভ লক্ষণের বিষয় পরিজ্ঞাত হইলে, সতী আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন; পতির চরণে পুনঃপুনঃ প্রণতি জানাইয়া কহিতে লাগিলেন,—"হে দেব! আপনার বাক্যই সফল হউক।"

ভাবী পুত্ররত্নের আশায় ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী যখন আনন্দ-বিহ্বল, সহসা শক্রদেবের আসন কম্পিত হইল। শক্র—দেবগণের অধিপতি, বজ্রধর, সহস্রাক্ষ, দৈত্যত্রাসকারী। তাঁহার ঐশ্বর্য্য-বিক্রমের পরিসীমা নাই। তিনি যখন জানিতে পারিলেন,—ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর গৃহে তীর্থঙ্কর জন্মগ্রহণ করিতেছেন, তখন আর তাঁহার ক্রোধের অবধি রহিল না। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"এরূপ ঘটনা কখনই ঘটিতে দেওয়া হইবে না।" তাঁহার স্মৃতিপটে জাগরূক হইল—"অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ, কোনও কালে এ পর্য্যন্ত কখনও কোনও অর্হৎ, চক্রবর্ত্তী, বলদেব বা বাসুদেব কোনও নীচ বংশে, পতিত-বংশে, দরিদ্র-বংশে, ভিক্ষুকের বংশে, বা ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই।' তাঁহার মনে পড়িল,—'পূর্ব্ববর্ত্তী ত্রয়োবিংশতি তীর্থঙ্কর ইক্ষ্বাকুবংশে ও হরিবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ রীত্যনুসারে কোনও তীর্থঙ্কর কখনই ব্রাহ্মণ-গৃহে জন্মগ্রহণ করিতে পারিবেন না।' অতএব, তিনি স্থিরসঙ্কল্প করিলেন,—'ব্রাহ্মণী দেবানন্দার গর্ভ হইতে ভগবান্ মহাবীরকে গর্ভান্তরে সঞ্চালিত করিতে হইবে।' চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্থির হইল—'কাশ্যপগোত্রজ ক্ষত্রিয় সিদ্ধার্থের পত্নী বাশিষ্ঠগোত্রজা ক্ষত্রিয়ানী ত্রিশলার গর্ভে ভ্রূণাবস্থায় তীর্থঙ্করকে সঞ্চালিত করিতে হইবে।' অতঃপর কুন্দগ্রামের ব্রাহ্মণ-পল্লীস্থ জালন্ধরায়ণ-গোত্রজা ব্রাহ্মণী দেবানন্দার গর্ভ হইতে ক্ষত্রিয়পল্লীস্থ বাশিষ্ঠগোত্রজা ত্রিশলার গর্ভে ভ্রূণ-সঞ্চালনের জন্য শক্রদেব বদ্ধপরিকর হইলেন। শক্রদেবের আদেশে তাঁহার সেনাপতি (হরিণেগমেষী) কর্ত্তৃক সেই ভ্রূণ-সঞ্চালন-কার্য্য সম্পাদিত হইল। এইরূপে, আশ্বিন মাসে, কৃষ্ণপক্ষের মধ্যরাত্রে, চন্দ্রের সহিত উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রের সংক্রমণ-কালে, ত্রিশলার গর্ভে ভগবান মহাবীর ভ্রূণ-অবস্থায় সঞ্চালিত হইলেন। নিদ্রাকালে স্বপ্নাবস্থায় দেবানন্দা যে সকল শুভচিহ্ন দর্শন করিয়াছিলেন, ভগবান গর্ভে আসিয়া অবস্থিতি করিবা মাত্র, ত্রিশলাও সেইরূপ স্বপ্নপরম্পরা দেখিতে লাগিলেন। ত্রিশলা স্বপ্নে দেখিলেন,—এক সুন্দর সুবৃহৎ কুঞ্জর—সর্ব্বসুলক্ষণ-সমন্বিত, বৃহৎ চতুর্দ্দন্তবিশিষ্ট; তাহার শ্বেতবর্ণ—যেন শুভ্র-মেঘের ন্যায়, যেন মুক্তাস্তূপের ন্যায়, যেন দুগ্ধসমুদ্রের ন্যায়, যেন চন্দ্ররশ্মির ন্যায়, যেন নির্ঝরের সলিলোৎক্ষেপের ন্যায়, যেন রৌপ্যের পর্ব্বতের ন্যায় শুভ্র। ত্রিশলা দেখিলেন—সেই গজবরের মস্তক হইতে যে মদ নির্গত হইতেছে, তাহার সুগন্ধে মধুলোভী মক্ষিকাগণ আকৃষ্ট। তিনি দেখিলেন—ইন্দ্রের ঐরাবতের ন্যায় সেই গজবরের বিশাল দেহ। শুনিলেন—মেঘমন্দ্রবৎ তাহার গম্ভীর স্বর। স্বপ্নের দ্বিতীয় দৃশ্য ত্রিশলার নয়ন-পথে নিপতিত হইল—সুলক্ষণাক্রান্ত গৃহপালিত

মহাবীরের জন্মগ্রহণ।

বৃষভ। কমলদলের ন্যায় তাহার শুভ্র-বর্ণে—চতুর্দ্দিকে যেন শুভ্র আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত। ত্রিশলা স্বপ্নে যে চতুর্দ্দশ শুভলক্ষণ দর্শন করিলেন, সকলই সৌন্দর্য্যের আধার। স্বপ্ন-দর্শনের পর, ত্রিশলা পতির নিকটে আসিয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। স্বপ্ন-সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা চলিল। দৈবজ্ঞগণ সকলেই একবাক্যে স্বপ্নের শুভ-ফল প্রকাশ করিলেন। অবশেষে চৈত্রমাসের চতুর্দ্দশ দিবসে মধ্যরাত্রে, চন্দ্রের সহিত উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রের সংক্রমণ-কালে, ভগবান মহাবীর সংসারে আবির্ভূত হইলেন।

জন্মোৎসব।

নবকুমারের জন্ম-উপলক্ষে নগরী আনন্দ-উৎসবে নিমগ্ন হইল। সিদ্ধার্থের প্রাসাদে সেদিন—স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা, বস্ত্র, অলঙ্কার, পত্র, পুষ্প, ফল, বীজ, মাল্য, সুগন্ধ, চন্দন ও ধনরত্ন বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হইতে লাগিল। তীর্থঙ্করের জন্মদিন উপলক্ষে ভবানীপতি, ব্যন্তর, জ্যোতিষ্ক এবং বৈমানিক দেবগণ দেবলোকে মহোৎসবের আয়োজন করিলেন। রাজা সিদ্ধার্থ প্রত্যুষেই নগরপালগণকে আহ্বান করিয়া বিবিধ আনন্দ-উৎসবের আদেশ দিলেন। কুন্দপুর নগরে কারাগারে যে সকল কয়েদী ছিল, তাহাদিকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। বিক্রেয় দ্রব্যাদির পরিমাপ বৃদ্ধি করিবার জন্য রাজাদেশ প্রচারিত হইল। নগর এবং নগর-উপকণ্ঠসমূহ গোময়-সংযুক্ত পবিত্রজলে পবিত্রীকৃত হইতে লাগিল। রাজপথসমূহ, রাজ-অট্টালিকাসমূহ—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিবার ব্যবস্থা হইল। স্থানে স্থানে মঞ্চসমূহ নির্ম্মিত হইতে লাগিল। রাজধানী ধ্বজপতাকায় শোভিত এবং সুরঞ্জিত বস্ত্রাবাসে সুসজ্জিত হইয়া, মনোহারী মূর্ত্তি ধারণ করিল। প্রাচীর-গাত্রসমূহ চন্দন-বর্ণে রঞ্জিত হইতে লাগিল। শুভলক্ষণযুক্ত পূর্ণকলস-সমূহ দ্বারে দ্বারে স্থাপিত হইবার ব্যবস্থা হইল। পুষ্পমাল্যসমূহ এবং পতাকাসমূহ চারিদিকে দোদুল্যমান রহিল। দেবালয়ে দেবার্চ্চনার ব্যবস্থা হইল। কোথাও নাট্য, কোথাও নৃত্য, কোথাও ছায়াবাজী, কোথাও সঙ্গীত, কোথাও ব্যায়াম, কোথাও প্রদর্শনী—কত দিকে কত আনন্দের ধুম পড়িয়া গেল। নানা স্থানে স্তম্ভসকল প্রোথিত ও তোরণ-দ্বারসমূহ নির্ম্মিত হইল। আনন্দের শতধারা চতুর্দ্দিকে প্রবহমান হইতে লাগিল। এই রূপে দশ দিন কাল অবিচ্ছেদে নগর যখন আনন্দ-কোলাহলে পরিপূর্ণ রহিল; রাজা সিদ্ধার্থ সপরিজন সুমনোহর বেশে সুসজ্জিত হইয়া উৎসব-ক্ষেত্রসমূহ পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। কুমারের জন্ম-উপলক্ষে যে দশ দিন কাল উৎসব-সমারোহ চলিল, সে দশ দিন রাজা ও রাজ-পরিজনবর্গ বহুমূল্য বেশভূষায় ভূষিত রহিলেন; পুষ্পসম্ভারে তাঁহাদের অঙ্গ সুশোভিত রহিল; বহুমূল্য গন্ধদ্রব্যে তাঁহাদের বসনাদি সুবাস বিস্তার করিতে লাগিল। সপরিজন রাজা সিদ্ধার্থ যখন নগরভ্রমণে বহির্গত হইলেন, জয়ঢক্কা-নিনাদে সে সংবাদ চারিদিকে সংবাহিত হইল; তাঁহাদের শোভাযাত্রার জন্য সৈন্যশ্রেণী শ্রেণিবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। পুরবাসিগণ শঙ্খ-ধ্বনিতে মাঙ্গল্য-ঘোষণা করিলেন; তুরি, ভেরী, মুরজ, মৃদঙ্গ, দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্য-নিনাদে দিক্ প্রতিধ্বনিত হইল। রাজকর বাণিজ্য-কর রহিত হইয়া গেল। যাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকে তাহা ফিরাইয়া দেওয়া হইল। ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ, অধমর্ণকে ঋণমুক্ত, দণ্ডপ্রাপ্ত অর্থ প্রত্যর্পিত হইতে লাগিল। রাজকর্ম্মচারিগণ

কাহারও গৃহে প্রবেশ করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেন। তখন সর্ব্বত্রই আনন্দ-ধ্বনি। সকলেই নূতন বসনে ও পুষ্পমাল্যে বিভূষিত। নগরের সকল নরনারী আনন্দ-মগ্ন। সমগ্র-দেশ আনন্দে পূর্ণ হইল। এইরূপে দশ দিন কাল উৎসব-সমারোহে অতিবাহিত হইলে, রাজা সিদ্ধার্থ শত শত সহস্র সহস্র উপঢৌকন দেবগণের উদ্দেশে উৎসর্গ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

জাতকর্ম্ম নাম-করণাদি।

প্রথম দিনে কুমারের জাতকর্ম্ম সম্পন্ন হইল; তৃতীয় দিনে কুমারকে চন্দ্রসূর্য্য প্রদর্শন করান হইল; ষষ্ঠ দিবস ধর্ম্মসাধনার্থ উপবাসে ও জাগরণে কাটিয়া গেল। একাদশ দিবসে শুদ্ধি-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। দ্বাদশ দিবসে প্রচুর খাদ্য, পানীয়, মিষ্টান্ন প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া, আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব ও অনুচর প্রভৃতিকে এবং জ্ঞাতৃক ক্ষত্রিয়গণকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান হইল। অতঃপর পিতামাতা উভয়ে স্নান করিয়া গ্রহ-দেবতার পূজা সম্পন্ন করিলেন, এবং যাবতীয় মাঙ্গল্য-কার্য্যে ব্রতী রহিলেন। ঐ সময় তাঁহারা মূল্যবান অথচ অল্প বেশ-ভূষায় ভূষিত ছিলেন। এইরূপে পূজা প্রভৃতি সম্পন্ন হইলে, পূর্ব্বোক্ত আত্মীয়-স্বজন-সহ তাঁহারা ভোজন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। ভোজনান্তে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সম্বর্দ্ধনাপূর্ব্বক পুষ্প, বস্ত্র, সুগন্ধ, মাল্য ও অলঙ্কারাদি তাঁহাদিগকে দান করা হইল। অতঃপর পিতামাতা উভয়েই বন্ধুবান্ধবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"নবকুমারের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সংসারে স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। তজ্জন্য কুমার 'বর্দ্ধমান' নামে অভিহিত হইবে।" এইরূপে কাশ্যপ-গোত্রজ ভগবান মহাবীরের তিনটি নাম নির্দ্দিষ্ট হইল। তাঁহার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সংসারের ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি পাইতেছে, সুতরাং পিতামাতা তাঁহাকে 'বর্দ্ধমান' নামে অভিহিত করিলেন। তিনি স্তুতি-নিন্দার অতীত ও তপস্যা-নিরত ছিলেন বলিয়া, তাঁহার দ্বিতীয় নাম হইল—"শ্রমণ"। কিবা বিপদে, কিবা বিভীষিকায়, তিনি অটল অচল ছিলেন বলিয়া, কিবা দুর্দ্দৈবে, কিবা দুঃখকষ্টে, তাঁহার সহিষ্ণুতা অপরিসীম ছিল বলিয়া, ধর্ম্মবিধি-পালনে ঐকান্তিকতা, সুখ-দুঃখে সমজ্ঞান, অপিচ, আত্মসংযমে তাঁহার অশেষ শক্তি ও বীরত্ব ছিল বলিয়া, তিনি "মহাবীর" নামে অভিহিত হইলেন।

পিতামাতা আত্মীয় প্রভৃতি।

ভগবান মহাবীরের পিতামাতার এবং নিকট-আত্মীয়গণের একটু পরিচয় এই স্থলে প্রদান করা যাইতেছে। তাঁহার পিতা কাশ্যপ-গোত্রজ এবং তিনটী নামে পরিচিত; (১) 'সিদ্ধার্থ', (২) 'শ্রেয়াংশ' (৩) 'যশাংশ' (যশস্বী) *। তাঁহার মাতা বাশিষ্ঠগোত্রজা; তিনিও তিনটী নামে পরিচিতা; (১) 'ত্রিশলা', (২) 'বিদেহদত্তা', (৩) প্রিয়কারিনী'। † তাঁহার এক খুল্লতাত 'সুপার্শ্ব' নামে পরিচিত। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম—'নন্দিবর্দ্ধন'। তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী 'সুদর্শনা' নামে পরিচিত। মহাবীরের পত্নীর নাম—যশোদা; তিনি কৌণ্ডিণ্য-গোত্রজা। তাঁহার এক কন্যা; সে 'অণোজ্জা' ও 'প্রিয়দর্শনা' নামে পরিচিতা; কৌশিক গোত্রে

* কল্পসূত্রের ভাষায় ঐ নাম,—"সিদ্ধত্তো ই বা, সিজ্জংসে ই বা, জসংসে ই বা।"

† কল্পসূত্রে তাঁহার মাতৃনাম—"তিসলা ই বা, বিদেহদদিন্না ই বা, পিঅকারিণী ই বা।"

তাহার বিবাহ হয়। তাহার আবার দুই কন্যা; শেষবতী ও যশোবতী।* মহাবীরের জনক-জননী পার্শ্বদেবের উপাসক ছিলেন এবং শ্রমণগণের উপদেশ মান্য করিতেন। তাঁহাদের পূর্ব্ববৃত্তান্ত অলৌকিক ঘটনাপূর্ণ। তাঁহারা জন্মজন্মান্তরে যে অমানুষিক ত্যাগ-স্বীকার ও ধর্ম্মপালন করেন, তাহারই ফলে, মহাবীরকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, পিতৃপক্ষে ও মাতৃপক্ষে ভগবান মহাবীর ইহজগতে কোন্ কোন্ বংশের সহিত কি ভাবে সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন, নিম্নোদ্ধৃত বংশলতায় তাহা বোধগম্য হইতে পারে। সে বংশপর্য্যায় এই,—
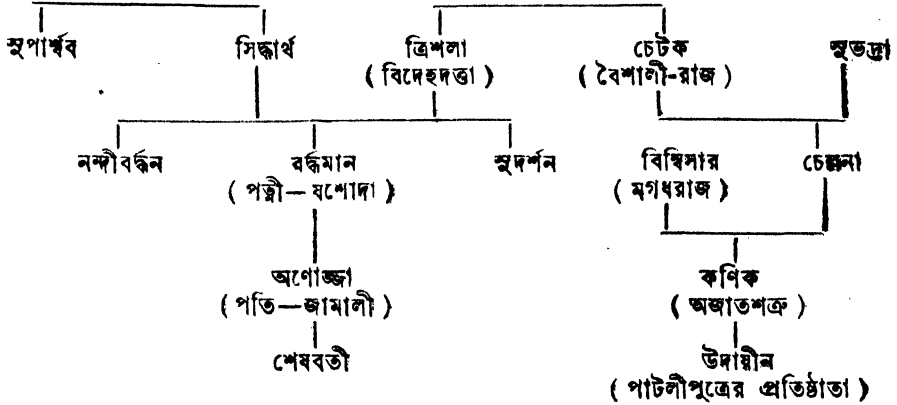
বংশ-পর্য্যায়ে বুঝিতে পারা যায়, মাতৃসম্পর্কে মহাবীর স্বামী মগধ-রাজবংশের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন। তাঁহার মাতা ত্রিশলা—বৈশালীর রাজা চেটকের ভগ্নী। আবার চেটকের কন্যা 'চেল্লনা'—মগধের অধিপতি বিম্বিসারের পত্নী ছিলেন। সুতরাং ত্রিশলা—মগধাধিপতি বিম্বিসারের পিতৃষসা হইতেছেন। রাজা বিম্বিসার, বৌদ্ধধর্ম্ম ও জৈনধর্ম্ম উভয় ধর্ম্মেরই পৃষ্ঠপোষণ জন্য প্রতিষ্ঠান্বিত হন। 'চেল্লনার' পুত্র—কুণিক; ইনিও ইতিহাসে প্রখ্যাতনামা ব্যক্তি। অপিচ, রাজা সিদ্ধার্থও যে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন, সমসাময়িক বর্ণনায় তাহা উপলব্ধি হয়।

ভগবান মহাবীর ত্রিশ বৎসর সংসার-আশ্রমে অবস্থিতি করেন। আটাশ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার পিতামাতা জীবিত ছিলেন। জনক-জননীর অচ্ছেদ্য স্নেহডোর সে দীর্ঘকাল তাঁহাকে সংসারে আবদ্ধ রাখিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই বন্ধনের মধ্য হইতেও তিনি যে লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা হয় না। তিনি সংসারে কর্ম্মজীবনের মধ্যে থাকিয়াও নৈষ্কর্ম্ম্যের আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। সংসারে নানা প্রলোভনের সামগ্রী পরিবেষ্টিত থাকিয়াও তিনি তৎসমুদায়ে সর্ব্বতোভাবে নির্লিপ্ত ছিলেন। বিদ্যা-বিনয়াদি ভূষণে বিভূষিত হইয়াই তিনি যেন মর্ত্ত্যভূমে অবতরণ করিয়াছিলেন। শৈশবে তাঁহার এমন বীরত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল যে, অতি-বড় বীরও তাঁহার সহিত মল্লযুদ্ধে সমর্থ হইত না। আবার ধৈর্য্যগুণ এমন ছিল যে, সর্ব্বংসহা পৃথ্বীমাতাও বুঝি সে ধৈর্য্যের নিকট নতমুখী হইতেন। তাঁহার জ্ঞান-বারিধির গভীরতা নির্ণয়ে—মনুষ্য

মহাবীরের সংসার-বাস।

* কল্পসূত্রের ভাষায় মহাবীরের খুল্লতাত প্রভৃতির নাম,—"ভগবত্ত মহাবীরস্ পিতিজ্জে সুপাসে, জিটে ভায়া নংদিবদ্ধণে. ভগিণী সুদংশনা, ভারিয়া জশোয়া কোডিন্না গুত্তেণং।" তাঁহার কন্যা,—"অণোজ্জা ই বা প্রিয়দংশনা ই বা।' দৌহিত্রী—"সেসবই ই বা, উসবই ইবা।"

তো দূরের কথা—দেবগণেরও জ্ঞান-গবেষণা পর্য্যুদস্ত হইত। অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় পিতামাতা তাঁহাকে গুরুগৃহে বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরণ করেন। যেদিন তিনি বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরিত হইবেন, সেদিন রাজ-ভবনে বিপুল উৎসব-সমারোহের আয়োজন হইয়াছিল। সেদিন, কুমারকে যথারীতি স্নান করাইয়া বসন-ভূষণে অলঙ্কৃত করা হয়; তিলকচন্দনে চর্চ্চিত করিয়া তাঁহার হস্তে শ্রীফল ও সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করা হয়; এবং সুসজ্জিত গজপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। পণ্ডিতগণ ও বিদ্যার্থিগণ, মিষ্টান্নে পরিতুষ্ট হইয়া ও বসন-ভূষণে সুসজ্জিত হইয়া, কুমারের অনুসরণ করেন। যাত্রাকালে বাদ্যধ্বনিতে ও সঙ্গীতস্বরে রাজপথ মুখরিত হয়। কুমার বিদ্যাশিক্ষার্থ গুরুগৃহে গমন করিলেন বটে; কিন্তু গুরু তাঁহাকে কি বিদ্যা শিখাইবেন? যিনি ত্রিলোকের জ্ঞানস্বরূপ, তাঁহাকে আবার নূতন জ্ঞান কে শিখাইবে? সুতরাং দেবলোকে ইন্দ্রের আসন টলিল। ইন্দ্রদেব, ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া, কুমারের গুরুগৃহে (বিদ্যামন্দিরে) উপস্থিত হইলেন। কুমারের গুরুগৃহে আসিয়া, ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্রদেব ব্যাকরণ-সংক্রান্ত দুই একটী জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন। সে প্রশ্নের সমাধানে পণ্ডিতের মস্তক বিঘূর্ণিত হইল। কিন্তু অষ্টমবর্ষীয় বালক বর্দ্ধমান যথাযথ সে প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিলেন। পণ্ডিতের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। ইন্দ্রের প্রশ্নে বালক বর্দ্ধমান অবধি-জ্ঞানের পরিচয় দিলেন। বিস্ময়ের উপর বিস্ময় জাগিল। পণ্ডিত, বালকের আশ্চর্য্য প্রতিভা দেখিয়া, সংশয়ান্দোলিত চিত্তে, ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্রের নিকট বালকের স্বরূপতত্ত্ব জানিতে চাহিলেন। ইন্দ্রের মুখে ভগবানের অবতার-তত্ত্ব বিবৃত হইল। বর্দ্ধমান যে বালক নহেন—ত্রিলোকনাথ, পণ্ডিত ক্রমশঃ মর্ম্মে মর্ম্মে তাহা উপলব্ধি করিলেন। তখন, যিনি শিক্ষক ছিলেন, তিনি ছাত্র হইলেন। যিনি শিক্ষার্থী হইয়া আসিয়াছিলেন, তিনিই গুরুর আসন লাভ করিলেন। গুরু প্রশ্ন করেন; ছাত্র সমাধান করিয়া দেন। এই ভাবে অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইল। এই সময়ে গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তরের ফলে, 'জিনেন্দ্র-ব্যাকরণ' সঙ্কলন হইয়া গেল। সংজ্ঞাসূত্র, পরিভাষাসূত্র, বিধিসূত্র, নিয়মসূত্র, প্রতিষেধসূত্র, অধিকারসূত্র, অতিদেশসূত্র, অনুবাদসূত্র, বিভাষাসূত্র, বিপাকসূত্র—দশ অধিকার বিশিষ্ট সওয়া লক্ষ শ্লোক-সমন্বিত মহান্ ব্যাকরণ এইরূপে লিখিত হয়। অতঃপর ব্রাহ্মণের সজ্জনতায় প্রসন্ন হইয়া, ব্রাহ্মণকে যথেষ্ট পারিতোষিক প্রদানানন্তর, ইন্দ্রদেব স্বধামে প্রস্থান করিলেন। গুরুগৃহে বিদ্যালাভ করিয়া ভগবান মহাবীর যখন রাজভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, পুত্রের বিদ্যাবত্তার বিষয় অবগত হইয়া জনক-জননীর আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। যৌবনাগমের শুভমুহূর্ত্তে তাঁহারা মহা-উৎসবে কুমারের বিবাহ দিলেন। নরবীর সামন্ত-কন্যা যশোদার সহিত মহাবীরের পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন হইল।* তাঁহার প্রিয়দর্শনা নাম্নী কন্যা সেই যশোদারই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মহাবীরের ভগ্নীর জামালী নামে এক পুত্র ছিল। তাঁহারই সহিত প্রিয়দর্শনার পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন হয়।

* ভগবান মহাবীরের বিবাহ প্রভৃতির এ বিবরণ কল্পসূত্রে প্রদত্ত হয় নাই। অরিষ্টনেমী পুরাণের অন্তর্গত জৈন হরিবংশে মহাবীর স্বামীর যে জীবন-চরিত আছে, সেখানেও বিবাহাদির প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় না।

মহাবীর প্রভুর যেমনই রূপ, তেমনই গুণ। পিতামাতার লোকান্তর গমনের পর ত্রিংশ বর্ষ বয়সে তিনি যখন সংসার-ত্যাগ করেন, তখন লোকান্তিক দেবগণ তাঁহার স্তব উচ্চারণ করিয়াছিলেন। সেই স্তব উপলক্ষে কল্পসূত্রে তাঁহার কয়েকটী মাত্র গুণের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছিল। লোকান্তিক দেবগণ কি বলিয়া তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন, আর কল্পসূত্রে তাঁহার কি পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছিল, এ প্রসঙ্গে তাহারই একটু আভাষ দিতেছি। তাহাতেই বুঝা যাইবে—তিনি কি উন্নত পদবীতেই আরূঢ় ছিলেন! তাঁহার গুণ-জ্ঞান-বিষয়ে, কল্পসূত্রে,—

মহাবীরের গুণগ্রাম।

"সমণে ভগবং মহাবীরে দক্খে দক্খপইন্নে পডিরূবে আলীণে ভদ্দএ বিণীএ নাএ নায়পুত্তে নায়কুলচংদে বিদেহে বিদেহদিন্নে বিদেহজচ্চে বিদেহসুমালে তীসং বাসাইং বিদেহংসি কট্টু অম্মাপিউহিং দেবত্তগএহিং গুরুমহত্তরএহিং অব্ভণুন্নাএ সমত্তপইন্নে।"

মহাবীর প্রভু কেমন ছিলেন? তিনি দক্ষ; অর্থাৎ সর্ব্বকলাবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি দক্ষপ্রতিজ্ঞ; অর্থাৎ যাহা বলিতেন, তাহাই সম্পন্ন করিতেন। তিনি প্রতিরূপ; অর্থাৎ সুন্দর রূপ-সম্পন্ন। তিনি আলীন; অর্থাৎ সর্ব্বগুণময়। তিনি ভদ্র; অর্থাৎ সরল। তিনি বিনীত; অর্থাৎ মানীর মান রক্ষায় সমর্থ। তিনি জ্ঞাত; অর্থাৎ প্রখ্যাত, প্রতিষ্ঠান্বিত। তিনি জ্ঞাতপুত্র; অর্থাৎ জ্ঞাতক্ষত্রিয়বংশীয় সিদ্ধার্থের পুত্র। তিনি জ্ঞাতকুলচন্দ্র; অর্থাৎ জ্ঞাতক্ষত্রিয়কুলে চন্দ্রের সমান জ্যোতিঃ-মাধুর্য্য-সম্পন্ন। তিনি বিদেহ; অর্থাৎ বজ্র, ঋষভ, নারাচ, সংঘয়ন সমচতুরস্র শক্তি-সম্পন্ন। তিনি বিদেহদিন্ন; অর্থাৎ ত্রিশলার পুত্র। ইত্যাদি। মাতাপিতার স্বর্গলাভের পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমতি লইয়া আপন প্রতিজ্ঞা-পূরণার্থ তিনি সংসার-আশ্রম ত্যাগ করেন। তাঁহার সেই সংসার-ত্যাগ-কালে লোকান্তিক দেবগণ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া মধুর বচনে তাঁহার স্তব উচ্চারণ করিয়াছিলেন। সেই স্তব,—

"জয় জয় নংদা! জয় জয় ভদ্দা! ভদ্দং তে, জয় জয় খত্তিঅবরবসহা! বুজ্ঝাহি ভগবং লোগনাহা! সয়লজগজ্জীবহিয়ং পবত্তেহি ধম্মতিত্থং, হিয়সুহনিস্সেয়সকরং সব্বলোএ সব্বজীবাণং ভবিস্সইত্তিকট্টু জয় জয় সদ্দং পউংজংতি।"

অর্থাৎ,—"হে জগতের আনন্দদাতা! আপনার জয় হউক। হে কল্যাণবন্ত! আপনার জয় হউক। হে ক্ষত্রিয়কুলের শ্রেষ্ঠ বৃষভ-প্রধান! আপনার জয় হউক। হে ভগবান্ লোকনাথ! দীক্ষা-গ্রহণে আপনি জগৎকে জাগ্রৎ করুন। হে ভগবান! আপনি কেবল-জ্ঞান লাভ করিয়া সকললোকহিতকর ধর্ম্মতীর্থ প্রকাশ করুন। আপনার ধর্ম্মসকল লোকের সুখকারী ও মোক্ষপ্রদ। সেইজন্য নিরন্তর আপনার জয়-ঘোষণা করি।"

যে জ্ঞানালোক বিতরণ করিবার জন্য, যে দিব্যজ্যোতিঃ বিচ্ছুরণ করিবার জন্য, মহাবীর মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হন, সে জ্ঞান—'কেবল'-জ্ঞান—তাঁহাতে বীজরূপে আশৈশব বিদ্যমান ছিল। এখন সে জ্ঞান স্ফূর্ত্তি লাভ করিবার অবসর আসিল। অগ্নি ভস্মে আচ্ছাদিত ছিল; ঝঞ্ঝায় ভস্ম উড়িয়া গেল; বহ্নি স্বরূপ-মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইল। অনল প্রজ্বলিত হইলে বায়ু সহায় হয়; সে তখন ইন্ধন আপনা-আপনিই অন্বেষণ করিয়া লয়। পিতামাতার লোকান্তরের পর, মহাবীরের সাধনার

মহাবীরের সন্ন্যাস-গ্রহণ।

পথ প্রশস্ত হইয়া আসিল। তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে পারিলেন যে, এইবার তাঁহার প্রকৃত নিষ্ক্রমণকাল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এইবার তিনি স্বর্ণ-রৌপ্য পরিত্যাগ করিলেন। এইবার তিনি ধনধান্ত পরিত্যাগ করিলেন। এইবার তিনি রাজ্য-ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিলেন। এইবার তাঁহার সৈন্তদল পরিত্যক্ত হইল। এইবার তাঁহার শস্তভাণ্ডার ধনভাণ্ডার পরিত্যক্ত হইল। সৌভাগ্যপূর্ণ নগর, সুখময় অট্টালিকা, সুখ-সৌভাগ্য-বর্দ্ধক প্রজাকুল—এইবার তিনি সকলই পরিত্যাগ করিলেন! স্বর্ণ-রৌপ্য ও মণি-মাণিক্য-মুক্তা—সংসারে মূল্যবান সামগ্রী বলিতে যাহা কিছু ছিল, কিছুরই প্রতি তিনি আর ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে দাতৃত্বভার ন্যস্ত করিয়া, অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে আপন ধন-সম্পত্তি দান করিয়া, তিনি সন্ন্যাস-গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সন্ন্যাসাবলম্বনের—দীক্ষা গ্রহণের দিন, নগরে মহা-সমারোহে শোভা-যাত্রার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ, অসুরগণ এবং রাজ্যের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নরনারী সকলেই সে শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়াছিলেন। দীক্ষা-গ্রহণের পূর্ব্বে, দেবরাজ ইন্দ্র এবং অগ্রজ নন্দীবর্দ্ধন, তাঁহাকে যথারীতি স্নান করাইয়া, চন্দনাদিতে তাঁহার দেহ অনুরঞ্জিত করিয়া, মুকুট-কুণ্ডলে তাঁহাকে ভূষিত করিয়া, তাঁহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরিশেষে, চন্দ্রপ্রভ নামক প্রখ্যাত শিবিকায় মহাবীর অধিষ্ঠিত হইলে, নগর মধ্য দিয়া শোভাযাত্রা বাহির হয়। শঙ্খ-ধ্বনিতে, ঘণ্টাধ্বনিতে ও বিবিধ বাদ্যধ্বনিতে নগর আনন্দ-মুখরিত হইয়া উঠে। স্তুতিপাঠক-গণ স্তুতিপাঠ করিতে আরম্ভ করেন। চারণগণ জয়জয়-নাদে দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তোলে। মাঙ্গলিক গীতে চারিদিক মঙ্গলময় হইয়া উঠে। আকাশ হইতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করেন। উগ্রকুল, ক্ষত্রিয়কুল, সেনাপতিগণ, নগরবাসিগণ, সকলেই ভক্তিভরে জয় জয় স্বরে অনুগমন করেন। সে সময় যাঁহারা তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই পলক ফিরাইতে পারেন নাই। সহস্র সহস্র তৃষিত নেত্রের অন্তর্ব্বর্ত্তী হইয়া, সহস্র সহস্র কণ্ঠের প্রশংসা-গীতে পরিবৃত হইয়া, সহস্র সহস্র লোকের অন্তরে আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া, সহস্র সহস্র লোকের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়া, সহস্র সহস্র লোকের অঙ্গুলির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া, সহস্র সহস্র নর-নারীর অভিবাদনে প্রত্যভিবাদন করিয়া, তিনি যখন প্রাসাদের পর প্রাসাদ অতিক্রম পূর্ব্বক অগ্রসর হইলেন; সম্বর্দ্ধনাসূচক মধুর সঙ্গীতে, বীণাধ্বনিতে ও তূর্য্য-নিনাদে, জয়-ধ্বনিতে ও ঢক্কানিনাদে, জনসাধারণের আনন্দব্যঞ্জক মৃদু মধুর কলকলস্বরে, তাঁহার শোভাযাত্রায় অনুপম শোভার সঞ্চার করিল। সকল সৈন্তদল সহ, সকল আত্মীয়-অন্তরঙ্গ সহ, সকল সেবক-অনুচর সহ, সর্ব্ববিধ সমারোহ সহ, মহাবীর কুন্দপুরের সুপ্রসিদ্ধ উদ্যানে উপনীত হইলেন। জ্ঞাতৃক-গণের সেই উদ্যান 'সাণ্ডবন' নামে প্রখ্যাত ছিল। উদ্যানে প্রবেশ করিয়া, শিবিকা তত্রত্য অতি-সুদৃশ্য অশোক-তরুতলে উপস্থিত হইল। তরুমূলে শিবিকা উপনীত হইলে, মহাবীর শিবিকা হইতে অবতরণ করিলেন। তার পর, আপন হস্তে আপনার গাত্রালঙ্কারসমূহ উন্মোচন করিলেন,—আপন হস্তে আপনার মাল্য-চন্দন ছিন্ন বিশৃঙ্খল করিয়া ফেলিলেন,—আপন হস্তে আপনার মস্তকের কেশরাশি উৎপাটন করিয়া উড়াইয়া দিলেন। অবশেষে, সকলকে বিদায় দিয়া, আড়াই দিবস কাল নির্জ্জল উপবাসী থাকিয়া,

চন্দ্রের সহিত উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রের সংক্রমণ-কালে সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিলেন। তদবধি সংসারের সহিত আর তাঁহার কোনই সম্বন্ধ রহিল না।

সংসার-আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া ভগবান মহাবীর এক বৎসর এক মাস পর্য্যন্ত বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতেই তিনি নগ্ন অবস্থায় দিনযাপন করিতে লাগিলেন। কোথায় বস্ত্র—কে পরিবে? কোথায় আহার্য্য—কে মুখে দিবে? অশন-সম্বন্ধে, বসন-সম্বন্ধে, তিনি কি কৃচ্ছ্র ব্রতই অবলম্বন করিয়াছিলেন! আপন হস্ততালু মধ্যে যে ভিক্ষান্ন ধারণ করা যাইত, সেই পরিমাণ ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিয়াই তিনি জীবন-ধারণ করিতেছিলেন। দ্বাদশ বৎসর কাল আপন দেহের প্রতি তিনি কি উপেক্ষাই দেখাইয়াছিলেন! কি দেবতা হইতে, কি মনুষ্য হইতে, কি পশু-পক্ষী হইতে, যে প্রকারে, যে সুখ বা যে কষ্টই প্রাপ্ত হউন না কেন, কোনও দিকেই তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। রৌদ্র-বৃষ্টি ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত দেহের উপর দিয়া অবিরাম চলিয়া যাইতেছে; দেহের উপর দিয়া কীট-পতঙ্গের গতাগতি-হেতু দংশনের পর দংশনের যন্ত্রণায় দেহ জর্জ্জরিত হইতেছে; কিন্তু কিছুতেই গ্রাহ্য নাই। এ সময় এমনই নিস্পৃহ নির্লিপ্তভাবে তিনি জীবন যাপন করিতে অভ্যস্থ হন। এই প্রকারে মহাবীর যে সংযম-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন; সে সংযম-সাধনায় একমাত্র তিনিই পারদর্শী—সে সিদ্ধিলাভে একমাত্র তিনিই অধিকারী ছিলেন। পাদচারণে সংযম, বাক্য-কথনে সংযম, ভিক্ষাকরণে সংযম, দান-গ্রহণে সংযম, পানপাত্র ও বর্ত্তনাদি গ্রহণে সংযম, মলমূত্র পরিত্যাগে ও দেহ-সংস্কারে সংযম, চিন্তায় সংযম, বাক্যে সংযম, কার্য্যে সংযম;—সে সংযমের তুলনা নাই। পূর্ব্বে যে সমিতির ও গুপ্তির বিষয় বলিয়াছি, * তাহাদের সার্থকতা মহাবীরের জীবনে এই সময় সাক্ষাৎ-প্রত্যক্ষ হয়। চিন্তায় সতর্কতা, বাক্যে সতর্কতা, ইন্দ্রিয়-পরিচালনে সতর্কতা, চরিত্রে সতর্কতা—এই সময়ই তাঁহাতে প্রকাশ পায়। রাগ নাই, অহঙ্কার নাই, ঈর্ষা নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই; স্থির, প্রশান্ত, উন্মত্ততা-বিরহিত, সন্তাপ-রহিত, তৃষ্ণাশূন্য, মমতাশূন্য, অবলম্বনশূন্য;—তখন তাঁর সে এক অব্যক্ত অব্যয় ভাব। সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে!—সাংসারিক কোনও সম্বন্ধহেতু চিত্ত কলঙ্কিত নহে!—সে এক অপূর্ব্ব অব্যক্ত অবস্থা! তাম্রপাত্রে যেমন জলের দাগ পড়ে না, শঙ্খে যেমন অঞ্জন লিপ্ত থাকিতে পারে না; সেইরূপ, পাপ তাঁহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারে নাই। জীবনের গতি যেমন কেহ রুদ্ধ করিতে পারে না, তাঁহার গতি সেইরূপ অনবরুদ্ধ ছিল। আকাশের যেমন আধার আবশ্যক হয় না, তাঁহারও তদ্রূপ আশ্রয়ের আবশ্যক ছিল না। বায়ুপ্রবাহ যেমন বাধা মানে না, তাঁহাকেও সেইরূপ কোনও বাধা মানিতে হইত না। তাঁহার অন্তর—শরতের স্বচ্ছ সলিলের ন্যায় নির্ম্মল ছিল। পদ্মপত্রে যেমন জল লিপ্ত হয় না, তাঁহাতেও সেইরূপ কিছুই লিপ্ত হইতে পারিত না। তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ মৃত্তিকা-সংশ্লিষ্ট কচ্ছপের ন্যায় অনাসক্ত ছিল। গণ্ডারের শৃঙ্গের ন্যায় তিনি একাকী সংগ্রামে প্রবৃত্ত

কঠোর সংযম-সাধনা।

* এই খণ্ডের ৮২ পৃষ্ঠায় সমিতির ও গুপ্তির বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে।

ছিলেন। পক্ষীর স্থায় তাঁহার স্বাধীনতা ছিল। উপকথা-কথিত ভারণ্ড-পক্ষীর * ন্যায় তিনি অবাধে ভ্রমণ করিতেন। তিনি হস্তীর ন্যায় পরাক্রান্ত, বৃষের ন্যায় বলিষ্ঠ, সিংহের ন্যায় দুরাক্রম্য, মন্দার-পর্ব্বতের ন্যায় অচল ও দৃঢ়, মহাসাগরের ন্যায় গভীর, চন্দ্রের ন্যায় মৃদু, সূর্য্যের ন্যায় খরকর, স্বর্ণের ন্যায় নির্ম্মল, ধরিত্রীর ন্যায় সর্ব্বংসহা, প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় ঔজ্জ্বল্য-সম্পন্ন ছিলেন। একটী প্রাচীন গাথায় তাঁহার ঐ সকল গুণের বিষয় সংগ্রথিত আছে ;—

"কংসে সংখে জীবে, গগণে বাউ য সরযসলিলে অ।
পুক্‌খরপত্তে কুম্ভে, বিহগে স্বগ্‌গে য ভারংডে॥
কুংজর বসহে সীহে, নগরায়া চেব সাগর মখোহে।
চংদে সূরে কণগে, বসুংধরা চেব হুয়বহে॥"

ভগবান মহাবীর স্বামীর কোনদিকেই কোনও প্রতিবন্ধক ছিল না। প্রতিবন্ধক সাধারণতঃ চতুর্ব্বিধ ; দ্রব্য, স্থান, কাল ও ভাব—এই চারি বিষয়ের সহিত তাহারা সম্বন্ধযুক্ত। † দ্রব্য-বিষয়ে তাঁহার সর্ব্ববিধ প্রতিবন্ধক দূরীভূত হইয়াছিল। কি জীব, কি অজীব, অথবা কি জীবাজীব, অর্থাৎ চেতন অচেতন চেতনাচেতন—কোনও বিষয়ের সহিতই তাঁহার সম্বন্ধ ছিল না। স্থান বা ক্ষিতি বিষয়েও তাঁহার সর্ব্বপ্রকার প্রতিবন্ধক দূরীভূত হইয়াছিল। কিবা গ্রামে, কিবা নগরে, কিবা অরণ্যে, কিবা প্রান্তরে, কিবা গৃহে, কিবা অঙ্গনে—কিছুরই সহিত তিনি সম্বন্ধ রাখেন নাই। এইরূপ কাল-বিষয়েও তাঁহার সর্ব্ববিধ প্রতিবন্ধক দূরীভূত হইয়াছিল। অর্থাৎ, সময়, আবলিকা, শ্বাসোশ্বাস, দিবা, রাত্রি, বৎসর, পক্ষ, মাস, ঋতু, মুহূর্ত্ত—কিছুরই প্রতি তাঁহার মমত্ব ছিল না। এইরূপ ভাব-বিষয়ক প্রতিবন্ধকও তিনি সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত করিয়াছিলেন ; অর্থাৎ, ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ, ভয়, হাস্য, প্রেম, দ্বেষ, কলহ, কলঙ্ক, পরনিন্দা, রতি, অরতি, মিথ্যাত্ব প্রভৃতি কোন ভাবই তাঁহাতে আর স্থান পায় নাই। বর্ষা ঋতু ভিন্ন, শীত গ্রীষ্মের আট মাস কাল তিনি কোনও গ্রামে এক রাত্রির অধিক বসতি করিতেন না ; কোনও নগরে পঞ্চ রাত্রির অধিক আশ্রয় লইতেন না। পাছে আসক্তি আসে, তজ্জন্যই এই আদর্শ তিনি পালন করেন। চন্দনে ও বিষ্ঠায়, তৃণে ও জহরতে, মৃত্তিকায় ও সুবর্ণে, সুখে ও দুঃখে, তাঁহার সমজ্ঞান ছিল। ইহলোক বা পরলোক,

প্রতিবন্ধক দূর।

---

* উপকথা কথিত ভারণ্ডা-পক্ষী ত্রিপদবিশিষ্ট ও দ্বিগ্রীব। এরূপ পক্ষী অধুনা দৃষ্ট হয় না বলিয়া উহাকে কল্পনার সামগ্রী বলা হয়।

† মহাবীর স্বামী যে সকল প্রতিবন্ধক হইতে মুক্তিলাভ করেন, তদ্বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে ;—"নত্থি ণং তস্‌স ভগবংতস্‌স কথই পডিবংধে—সে অপডিবংধে চউব্বিহে পন্নত্তে, তংজহা, দব্বও, খিত্তও, কালও, ভাবও।" অর্থাৎ, জৈনশাস্ত্র-মতে, দ্রব্য, ক্ষিতি, কাল ও ভাব—এই চতুর্ব্বিধ প্রতিবন্ধক। এই প্রতিবন্ধক দূরীকরণে মহাবীর স্বামী যে অবস্থায় উপনীত হন, কল্পসূত্রে তাহার এইরূপ বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয় ;—"দব্বও, ণং সচিত্তাচিত্তমীসেসু দব্বেসু, খিত্তও ণং গামে বা নগরে বা অরন্নে বা খিত্তে বা খলে বা ঘরে বা অংগনে বা নহে বা, কালও ণং সমএ বা আবলিআএ বা আণাপাণুএ বা থোবে বা খণে বা লেবে মুহুত্তে বা অহোরত্তে পক্‌খে বা মাসে বা উউএ বা অয়ণে বা সংবচ্ছরে বা অন্নয়রে বা দীহকাল-সংজোএ, ভাবও ণং কোহে বা মাণে বা মায়াএ বা লোভে বা ভয়ে বা পিজ্জে বা দোসে বা কলহে বা অব্ভক্‌খাণে বা পেসুন্নে বা পরপরিবাএ বা অরইরই বা মায়ামোসে বা মিচ্ছাদংসণসল্লে বা তস্‌স ণং ভগবংতস্‌স নো এবং ভবই।"

জীবনে বা মরণে—কিছুরই প্রতি তাঁহার আসক্তি ছিল না। কর্ম্মশত্রুকে বিনষ্ট করিয়া, তিনি যেন সংসারের পরপারে বিরাজ করিতেছিলেন। দ্বাদশ বৎসর কাল, ভগবান মহাবীর আত্মতত্ত্বে নিমগ্ন ছিলেন। অনুত্তর জ্ঞান, অনুত্তর দর্শন, অনুত্তর চরিত্র, অনুত্তর (নির্দ্দোষ) আলয়, অনুত্তর (নির্দ্দোষ) বিহার, অনুত্তর বীর্য্য, অনুত্তর সরলতা, অনুত্তর কোমলতা, অনুত্তর লঘুতা, অনুত্তর ক্ষান্তি, অনুত্তর মুক্তি, অনুত্তর গুপ্তি, অনুত্তর সন্তোষ, অনুত্তর সত্য, অনুত্তর সংযম, অনুত্তর সদাচরণ প্রভৃতির অধিকারী হইয়া, তিনি অনুত্তর মুক্তি-পথের পথিক হইয়াছিলেন। সততা, সংযম, সচ্চারিত্র্য, সহিষ্ণুতা প্রভৃতির ফলস্বরূপ যে নির্ব্বাণ-মুক্তি, তাহাই এখন তাঁহার সমীপস্থ হইয়াছিল। সন্ন্যাস-গ্রহণের ত্রয়োদশ বর্ষে বৈশাখ মাসের দশম দিবসে শুক্লপক্ষে শুভরাত্রে 'বিজয়' নামা মুহূর্ত্তে জৃম্ভিক-গ্রাম-প্রান্তে ঋজুপালিকা নদীতীরে একটী পুরাতন মন্দির-সন্নিকটে শালবৃক্ষমূলে বসিয়া মহাবীর স্বামী কেবল-জ্ঞান লাভ করেন। সে সময়ে চন্দ্রের সহিত উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রের সংক্রমণ ঘটিয়াছিল। সেই শ্রেষ্ঠ পূর্ণ অনন্ত অবাধ কেবল-জ্ঞান লাভের পূর্ব্বে আড়াই দিবস কাল, নির্জ্জল-উপবাসে পদ্মাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া, তিনি গভীর ধ্যানে নিরত ছিলেন। এইরূপে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ করিয়া, ভগবান মহাবীর যখন জিন এবং অর্হৎ পদ লাভ করিলেন—কেবলী হইলেন; তখন ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা জন্মিল। পৃথিবীর, দেবগণের, মনুষ্যগণের এবং দৈত্যগণের অগতি গতি স্থিতি সকলই তিনি দেখিতে ও বুঝিতে পারিলেন। চিন্তা, ভাব, আহার, বিহার,—কাহারও কোনও বিষয় তখন আর তাঁহার দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করিতে পারিল না। সংসারের সকল পদার্থের—সর্ব্বপ্রকার অবস্থা, সর্ব্বপ্রকার চিন্তা, সর্ব্বপ্রকার বাক্য এবং প্রতিমুহূর্ত্তের কার্য্যকলাপ—তাঁহার দিব্যদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত হইল। পূর্ণজ্ঞান লাভের পর ভগবান মহাবীর প্রথম বর্ষাকাল অস্থিক-গ্রামে * যাপন করেন। তিনটী বর্ষাকাল চম্পায় ও পৃষ্টিচম্পায় অতিবাহিত হয়। দ্বাদশ বর্ষাকাল বণিজগ্রামে, চতুর্দ্দশ বর্ষা রাজগৃহে এবং নালন্দার উপকণ্ঠে, ছয় বর্ষা মিথিলায়, দুইবর্ষা ভদ্রিকায়, এক বর্ষা আলভিকায়, এক বর্ষা পণিতভূমিতে, এক বর্ষা শ্রাবস্তীতে এবং এক বর্ষা রাজা হস্তীপালের কাছারী-বাটীতে পাপা-নগরীতে অতিবাহিত হয়। শেষোক্ত বর্ষাই তাঁহার পার্থিব জীবনের শেষ বর্ষা-কাল। কার্ত্তিক মাসের পঞ্চদশ দিবসে, কৃষ্ণপক্ষের শেষ রাত্রিতে, পাপা-নগরীতে রাজা হস্তীপালের কাছারী-বাটীতে মহাবীর স্বামীর ইহজীবন শেষ হয়। সেই দিন তিনি, জন্ম-জরা-মৃত্যুর বন্ধন ছিন্ন করিয়া, ইহজগৎ হইতে অন্তর্দ্ধান হন। সেই দিন হইতেই তাঁহার সকল দুঃখের অবসান হয়। সেই দিন তিনি সিদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হন। যে বৎসর মহাবীর স্বামী দেহত্যাগ করেন, সেই বৎসর চন্দ্রবৎসর নামে অভিহিত হয়। সে মাস প্রীতিবর্দ্ধন, সেই পক্ষ নন্দীবর্দ্ধন, সেই দিন সুব্রতাগ্নি বা উপসম নামে পরিচিত। সেই রাত্রির নাম দেবানন্দা বা নিঋতি। সেই লব 'আর্য্য', সেই প্রশ্বাস 'মুক্ত', সেই স্তোক 'সিদ্ধ', সেই করণ 'নাগ', এবং সেই

---

* এই গ্রাম পূর্ব্বে বর্দ্ধমান নামে পরিচিত ছিল। শূলপাণি নামে এক যক্ষ নরহত্যা করিয়া ঐ স্থানে তাহার অস্থিস্তূপ সঞ্চিত করিয়াছিল। সেই অস্থিস্তূপের উপর নগরবাসীরা একটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন। তদনুসারে, ঐ স্থান অস্থিগ্রাম বা অস্তিগ্রাম নামে অভিহিত হয়।

মুহূর্ত্ত 'সর্ব্বার্থসিদ্ধ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যেদিন মহাবীর স্বামী পূর্ণমুক্তি লাভ করেন, সেদিন সেই সময় চন্দ্রের সহিত স্বাতী নক্ষত্রের সংক্রমণ হইয়াছিল,—দেবগণের গতাগতি সূত্রে ব্যোমপথ আলোকিত হইয়াছিল। এইরূপে মহানির্ব্বাণ-লাভের সময় সম্পর্যাঙ্ক যোগাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় তিনি যে জ্ঞানালোক বিতরণ করিয়া যান, তাহাতে জগৎ আজিও সমুজ্জ্বল। তাৎকালিক তাঁহার উপদেশ-পরম্পরাই জৈনধর্ম্মের প্রাণভূত।

যে রাত্রিতে মহাবীর প্রভু দেহত্যাগ করেন, সে রাত্রিতে নগর আলোকমালায় সুসজ্জিত হইয়াছিল। নবমল্লকী ও নবলিচ্ছবী—সন্ধিবদ্ধ এই অষ্টাদশ সামন্তরাজসহ কাশী ও কোশলের নৃপতিবর্গ, ঐ সময় প্রভুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। ঐ দিবস সংসার-সাগর উত্তরণের তরণী-স্থানীয় 'পৌষধ' উপবাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। তথাপি, সেই মহাপুরুষের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থ নগরবাসীরা নগরী আলোক-মালায় বিভূষিত করিয়াছিল। সকলেই তখন কহিতেছিল,—"জ্ঞানের আলোক নির্ব্বাপিত হইল। এখন আমরা পার্থিব আলোকে নগর আলোকিত করিতেছি।" এ সময় মহাবীর স্বামীর অসংখ্য ও ভক্ত-অনুরক্তে তাঁহার সম্প্রদায় পরিপুষ্ট হইয়াছিল। ভগবান মহাবীর যেদিন দেহত্যাগ করেন, যেদিন প্রভুর সহিত তাঁহার প্রিয়শিষ্য গৌতম-গোত্রজ ইন্দ্রভূতির সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন হয়; সেই দিন ইন্দ্রভূতি * কেবলী-পদ লাভ করেন,—পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী হন। চতুর্দ্দশ সহস্র শ্রমণ এখন ইন্দ্রভূতিকে আচার্য্য-পদে বরণ করিয়া প্রভুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সাধ্বী চন্দনার অধিনায়কত্বে ষট্‌ত্রিংশ সহস্র সাধ্বী ভিক্ষুণী ধর্ম্ম-মাহাত্ম্য-প্রচারে ব্রতী হইলেন। এক লক্ষ উণষাট হাজার সংসারী গৃহস্থ শঙ্খশতককে আচার্য্য-পদে বরণ করিয়া ধর্ম্ম-পালনে প্রবৃত্ত হন। তিন লক্ষ আঠার হাজার সংসার-আশ্রম-বাসিনী রমণী, সুলসা ও রেবতীর কর্ত্তৃত্বাধীনে, ধর্ম্মপালন করিতেছিলেন। পূর্ব্বোক্ত চারি শ্রেণীর জৈনধর্ম্মাবলম্বিগণ যথাক্রমে সাধু, সাধ্বী, শ্রাবক, শ্রাবিকা নামে প্রসিদ্ধ। এইরূপ, আর এক শ্রেণীর তিন শত সাধু ছিলেন;—তাঁহারা জিনগণের সহিত নৈকট্য-সম্বন্ধ লাভ করিতে না পারিলেও, চতুর্দ্দশ পূর্ব্বশাস্ত্র প্রভৃতির জ্ঞানে জ্ঞানী ছিলেন এবং জিনগণের ন্যায় সত্যধর্ম্ম প্রচার করিতেন। এইরূপ, আরও তের শত সাধু ছিলেন;—তাঁহারা অবধি-জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন এবং শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন হইয়াছিলেন। সাত শত কেবলী, সাত শত বৈক্রিয়লব্ধিধারক, পাঁচ শত বিপুলমতি এবং অন্যান্য নানা শ্রেণীর জ্ঞানী এখন জৈনধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। মহাবীর প্রভু জীবনের কত কাল, কত বর্ষ, কি ভাবে যাপন করিয়াছিলেন, সূত্রে সংক্ষেপে তাহার একটী পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার জীবনের ত্রিশ বৎসর কাল গৃহস্থাশ্রমে অতিবাহিত হইয়াছিল। তারপর, বিয়াল্লিশ বৎসর সন্ন্যাসের অবস্থা। তাহার মধ্যে বার বৎসরের অধিক কাল তিনি ছদ্মস্থ (ছদ্মস্থ) অবস্থায় অতিবাহিত করেন। ঐ সময়কে দীক্ষা-গ্রহণ-কাল

দেহত্যাগ।

* মহাবীর স্বামীর দেহত্যাগের সময় ইন্দ্রভূতি জৈনধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। এই সময় তিনি কেবলী পদ লাভ করেন। ইহার পর তিনি বার বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁহার আয়ুঃকাল ৯২ বৎসর; তাহার মধ্যে সন্ন্যাস-আশ্রমে তিনি ৫০ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

বা জ্ঞানোন্মেষণ-কাল বলা হইয়া থাকে। উহার পর অনধিক ত্রিশ বৎসর কাল তিনি কেবলী-পর্য্যায়ে অবস্থিত ছিলেন। সন্ন্যাসের ৪২ বৎসর কাল তিনি দীক্ষা-প্রতিপালনে শ্রমণ-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সর্ব্বসাকুল্যে মহাবীর প্রভু বাহাত্তর বৎসর কাল মর্ত্ত্যভূমে বিচরণ করেন। উহাই তাঁহার পূর্ণ আয়ুঃকাল। ঐ আয়ুঃকাল পূর্ণ হইলেই তাঁহার কর্ম্মজীবনের অবসান হয়,—কর্ম্ম আর জ্ঞানাবরণীয় দর্শনাবরণীয় আয়ুষ্ক প্রভৃতি রূপে ফলোৎপাদনের সমর্থ হয় না। সেই অবস্থাই নির্ব্বাণ, মোক্ষ, পূর্ণ, কেবল-জ্ঞান—যখন বেদনীয় মোহনীয় আয়ুষ্ক প্রভৃতি কর্ম্মের বীজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এইরূপে, ইহজীবনের কর্ম্ম শেষ করিয়া, সকল কর্ম্মবীজ ধ্বংস করিয়া, এই বর্ত্তমান অবসর্পিণী কালে দুঃসম-সুসমা কালাংশের শেষভাগে মহাবীর প্রভু যখন ঊষার আলোকে লীন হন, তখন সেই চির-সমাধির অবস্থায় তাঁহার মুখকমলনিঃসৃত 'উত্তরাধ্যয়ন-সূত্র' প্রভৃতি রূপ উপদেশের অমৃতধারা জগৎকে নূতন জীবন দান করিবার জন্য প্রবাহিত হইয়াছিল। সে অমৃত-অভিষেক ভারতের নিস্পন্দ প্রাণে যে সঞ্জীবনী-শক্তি প্রদান করিয়া যায়, তাহাই জৈনধর্ম্ম।

জৈনধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম একই জননীর অগ্রজ-অনুজ দুইটী সন্তান-রূপে ভারতের অঙ্কে পরিপুষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং ঐ দুই ধর্ম্মের পরস্পরের মধ্যে যে বহু সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তবে, সাদৃশ্য-সত্ত্বেও একই বৃক্ষের দুইটী পত্র যেমন অভিন্ন নয়, সেইরূপ বহু-সাদৃশ্য-সত্ত্বেও জৈন ও বৌদ্ধ দুই ধর্ম্ম দুই বিভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়াছিল। কি সাদৃশ্যের বা কি পার্থক্যের ভিত্তির উপর জৈনধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, সে আভাষ আমরা প্রসঙ্গতঃ বিভিন্ন স্থানে প্রদান করিয়াছি। অপিচ, যে সকল কারণে বুদ্ধদেবকে এবং মহাবীরকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া প্রতীত হয়, আবার যে কারণে তাঁহাদের দুই জনকে দুই বিভিন্ন মহাপুরুষ বলিয়া বুঝা যায়, তৎসম্বন্ধে এ স্থলে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, মহাবীরের ও বুদ্ধদেবের নাম-বিশেষণ প্রায় একই। অপিচ, তাঁহাদিগের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নামের ও স্থান প্রভৃতির সাদৃশ্যও আশ্চর্য্যজনক। মহাবীর স্বামীর কতকগুলি আত্মীয়-অন্তরঙ্গের নাম এবং বুদ্ধদেবের কতকগুলি আত্মীয়-অন্তরঙ্গের নাম—প্রায় একই। মহাবীরের স্ত্রীর নাম—যশোদা; বুদ্ধদেবের স্ত্রীর নাম—যশোধরা। মহাবীরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম—নন্দীবর্দ্ধন, বুদ্ধদেবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা 'নন্দ' নামে পরিচিত। বুদ্ধদেব যখন যুবরাজ ছিলেন, তখন তাঁহার নাম ছিল—সিদ্ধার্থ। এদিকে আবার মহাবীরের পিতা ইতিহাসে 'সিদ্ধার্থ' নামে পরিচিত। এই যে নামের সাদৃশ্য, ভারতের ইতিহাসে,—শুধু ভারতের বা বলি কেন, পৃথিবীর অনেক স্থানেই,—অনেকের মধ্যে দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাই বলিয়া, একের সহিত অন্যের অভিন্নত্ব প্রতিপন্ন হয় না। এ দিকে, আর একটু অভিনিবেশ-সহকারে চিন্তা করিলে, মহাবীরের এবং বুদ্ধদেবের জীবনের বহু ঘটনায় বহু পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। বুদ্ধদেবের জন্মস্থানের নাম—কপিলাবস্তু; উহা হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত বলিয়া পরিচিত। মহাবীর স্বামীর জন্মস্থান—কুন্দগ্রাম বা কুন্দপুর; উহা বৈশালীর নিকটে অবস্থিত। কথিত আছে,—বুদ্ধদেবের জন্মের পরই তাঁহার জননীর দেহান্তর ঘটে। কিন্তু মহাবীরের পিতামাতা তাঁহাকে বয়স্থ সংসারী দেখিয়া ইহজীবন পরিত্যাগ করেন।

জৈন-বৌদ্ধ অগ্রজ-অনুজ।

বুদ্ধদেব, পিতার জীবিত-কালে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংসারত্যাগী হন। কিন্তু মহাবীর স্বামী আপন পিতামাতার মৃত্যুর পর, অগ্রজের এবং রাজপুরুষগণের অনুমতি লইয়া, সংসার-ত্যাগ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব ছয় বৎসর কৃচ্ছ্র কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত ছিলেন; মহাবীর স্বামী দ্বাদশ বৎসর কাল কঠোর সাধনায় ব্রতী থাকেন। কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনায় যে সময় অতীত হয়, সে সময় বৃথাই নষ্ট হইয়াছে বলিয়া বুদ্ধদেব মনে করেন। কিন্তু মহাবীর প্রাণে প্রাণে সে সাধনার আবশ্যকতা অনুভব করেন, এবং তীর্থঙ্কর পদ লাভ করিয়াও সে সাধনায় ব্রতী থাকেন। গোশাল-মঙ্খালিপুত্রের ন্যায় মহাবীরের যেরূপ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, তদ্রূপ প্রতিদ্বন্দ্বী বুদ্ধদেবের অতি অল্পই দেখিতে পাই। জামালীর ন্যায় শত্রুর উপদ্রবও বুদ্ধদেবকে সহ্য করিতে হয় নাই। জামালী জৈনধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথম বিচ্ছেদ সংঘটন করাইয়াছিলেন। আর এক বিষয়ে উভয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বুদ্ধদেবের শিষ্যগণের নামের সহিত মহাবীর স্বামীর শিষ্যগণের নামের কোনও সাদৃশ্য নাই। উপসংহারে উভয়ের মহানির্ব্বাণ-লাভের স্থান-কাল-বিষয়ে পার্থক্য পরি-লক্ষিত হয়। বুদ্ধদেবের মহানির্ব্বাণ-লাভের ক্ষেত্র—কুশীনগর। তাঁহার মহানির্ব্বাণ-লাভের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে, পাপা-নগরীতে মহাবীর স্বামী মহানির্ব্বাণ-লাভ করেন। যাহা হউক, এতাদৃশ ব্যবধান সত্ত্বেও, আজিও জৈন ও বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক-সম্বন্ধে ভ্রম-ধারণা অনেকের অন্তর হইতে অন্তর্হিত নহে। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে মতান্তরের অবধি নাই। তাঁহাদের কাহারও মতে,—'বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে জৈন-ধর্ম্মের উৎপত্তি'; কেহ আবার বলেন,—'জৈনধর্ম্মই বৌদ্ধধর্ম্মের আদিমূর্ত্তি'।* আমরা কিন্তু কে আদি বা কে প্রধান, তাহা বলিতে চাহি না। আমাদের বক্তব্য এই যে, ঐ দুই ধর্ম্মের অভ্যুদয়েই ভারতের কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল, এবং ঐ দুই ধর্ম্মই সনাতন ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম-রূপ কল্পবৃক্ষের দুইটী প্রধান কাণ্ডস্থানীয়।

মহাবীর-সম্বন্ধে অন্যান্য কথা।

মহাবীর স্বামী সম্বন্ধে আর আর বক্তব্যের মধ্যে তাঁহার জন্মস্থান ও পিতৃ-পরিচয়াদি বিষয়ে সাধারণতঃ যে সকল বাদানুবাদ উপস্থিত হয়, উপসংহারে তৎপ্রসঙ্গ একটু আলোচনা করা যাইতেছে। কি শ্বেতাম্বর, কি দিগম্বর, উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত জৈনগণ মহাবীর স্বামীকে রাজা সিদ্ধার্থের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহাদের মতে,—'সিদ্ধার্থ কুন্দনপুরের (কুন্দগ্রামের) অমিতপ্রতাপশালী নৃপতি ছিলেন। কুন্দনগ্রাম রাজধানী—সুবৃহৎ নগর-মধ্যে গণ্য ছিল।' জৈন-সাধারণের ইহাই বিশ্বাস। কিন্তু সিদ্ধার্থ ও কুন্দনগ্রাম সম্বন্ধে জৈনগণের ঐ

কুন্দগ্রাম ও সিদ্ধার্থ-বিষয়ে।

---

* ইউরোপের দুইজন অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিত এইরূপ দুই মত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রোফেসার ওয়েবারের মত এই যে,—জৈন-সম্প্রদায় হইতেই বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি; He regards "the *G*ains merely as one of the oldest sects of Buddhislm." প্রোফেসার লাসেন বলেন এই যে,—বৌদ্ধধর্ম্ম হইতেই জৈনধর্ম্মের উৎপত্তি; "The *G*ains have branched off from the Buddhas."—Compare Professor Weber, *Indische Studien*, XV*I*, 210 and Professor Lassen, *Indische Alterthumskunde*, IV, 76.

উক্তি অতিরঞ্জিত বলিয়া জ্যাকোবি প্রভৃতি অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মত এই যে, কপিলাবস্তু ও শুদ্ধোদন সম্বন্ধে বৌদ্ধগণের উক্তি যেরূপ অতিরঞ্জিত, এ উক্তিও তদ্রূপ অতিরঞ্জিত। কিবা শুদ্ধোদন, কিবা এই সিদ্ধার্থ—ইঁহারা কেহই প্রকৃতপক্ষে নৃপতি-পদবাচ্য ছিলেন না। ক্ষুদ্র জায়গীরদার বা ভূস্বামী মধ্যে তাঁহাদিগকে গণনা করা যাইতে পারে মাত্র। এ পক্ষের যুক্তি এই যে, আচারাঙ্গ-সূত্রে কুন্দন-গ্রামকে "সন্নিবেশ" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। টীকাকারগণ 'সন্নিবেশ' শব্দে 'বণিকগণের বিশ্রামস্থান' বা 'চটি' অর্থ নির্দ্দেশ করেন। অপিচ, আচারাঙ্গ-সূত্রের (দ্বিতীয় শ্রুতস্কন্ধ, পঞ্চদশ অধ্যয়ন) বর্ণনাক্রমে ঐ গ্রামকে বিদেহ-রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম্মগ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে ঐ গ্রামের বিষয়ে আরও যে উক্তি পরিদৃষ্ট হয়, তাহাতেও মহাবীরের জন্মস্থান সম্বন্ধ পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তই দৃঢ় হইয়া আসে। বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রন্থ 'মহাবগ্গে' লিখিত আছে,—বুদ্ধদেব কিছুকাল কোটি-গ্রামে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে গণিকা অম্বাপালী এবং বেশালী রাজধানীর লিচ্ছবীগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। ঐ স্থলে আরও লিখিত আছে,—সেই কোটি-গ্রাম (কটিগাম) হইতে তিনি ঞাতিকগণের (নাতিক, জ্ঞাতৃক প্রভৃতি রূপেও ঐ শব্দ লিখিত হয়) বাসস্থানে গমন করেন। সেখানে কিছু কাল ঞাতিকগণের ইষ্টক-নির্ম্মিত ভবনে বুদ্ধদেব বসতি করিয়াছিলেন বলিয়াও উল্লেখ দেখা যায়। ঞাতিকগণের সেই বাস-স্থানের অনতিদূরে গণিকা অম্বাপালীর একটী প্রমোদোদ্যান ছিল। সেই উদ্যান 'অম্বাপালী বন' নামে অভিহিত হয়। বুদ্ধদেবের এবং তাঁহার শিষ্যবর্গের উদ্দেশে অম্বাপালী ঐ উদ্যান উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সেই উদ্যান হইতে যাত্রা করিয়া বুদ্ধদেব বেশালী-নগরে গমন করেন। সেখানে লিচ্ছবীগণের সেনাপতি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ লিচ্ছবী-সেনাপতি প্রথমে নির্গ্রন্থগণের শিষ্য ছিলেন। তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রহণ উপলক্ষেই তাঁহার বিষয় মহাবগ্গে উল্লিখিত হয়। যাহা হউক, এই বর্ণনা হইতে বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত কোটিগ্রামকে জৈনশাস্ত্রোক্ত কুন্দগ্রাম (কুন্দনগ্রাম) বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে। নামের সাদৃশ্য ভিন্ন ঞাতিক-গণের উল্লেখে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত ভিত্তিহীন নহে বলিয়াই মনে হইতে পারে। মহাবীর যে সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা ঞাতিক-ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত। সুতরাং কোটিগ্রামে বুদ্ধদেবের অবস্থান-কালে ঞাতিকগণের উল্লেখে, কোটিগ্রামে ও কুন্দগ্রামে অভিন্নত্ব উপলব্ধি হয়। কুন্দগ্রাম যে বিদেহ-রাজ্যের রাজধানী বৈশালী-নগরীর উপকণ্ঠে অবস্থিত ছিল, এতদ্দারা তাহাও সপ্রমাণ হইতে পারে। সূত্রকৃতাঙ্গে (প্রথম শ্রুতস্কন্ধে, তৃতীয় অধ্যয়নে) মহাবীর স্বামীকে বেশালী বা বৈশালী বা বৈশালিক বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। "বৈশালিক" শব্দে সাধারণতঃ বৈশালীর অধিবাসী অর্থই সূচিত করে। কুন্দগ্রাম—বৈশালীর সহরতলী মধ্যে পরিগণিত ছিল; আর সেই জন্যই মহাবীর স্বামী "বৈশালিক" নামে পরিচিত হইতেন,—ইহাই অনেকের অভিমত। এইরূপে বুঝিতে পারা যায়, বৈশালীর অধিপতি প্রকৃতপক্ষে দেশের রাজা ছিলেন; কুন্দগ্রামের সিদ্ধার্থ তাঁহার একজন সর্দ্দার বা তাঁহার অধীন ভূস্বামী মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। এ সম্বন্ধে আরও একটী কারণ নির্দ্দিষ্ট হয়। সিদ্ধার্থের পত্নী ত্রিশলা কখনও রাণী বা মহারাণী বলিয়া উল্লিখিত হন

নাই। প্রধানতঃ ক্ষত্রিয়াণী নামেই তাঁহাকে পরিচিত হইতে দেখা যায়। জ্ঞাতিক ক্ষত্রিয়গণের উল্লেখে তাঁহাদিগকে কোথাও 'সিদ্ধার্থের সামন্ত' বলিয়াও অভিহিত করা হয় নাই। তাঁহারা সকলেই সিদ্ধার্থের সমপর্য্যায়ভুক্ত ছিলেন বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়। ফলতঃ, সিদ্ধার্থ রাজাও ছিলেন না, অথবা আপন সম্প্রদায়ের দলপতিও ছিলেন না ;—ইহাই সিদ্ধান্ত হয়। তবে তাঁহার অনেকটা প্রতিপত্তি ছিল নিশ্চয়ই। বিবাহ-সূত্রে তিনি রাজসংসারের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন। তাঁহার পত্নী ত্রিশলা—বৈশালীর রাজা চেটকের ভগ্নী বলিয়া অভিহিত হন। তিনি বৈদেহী বা বিদেহদত্তা নামেও পরিচিতা। বিদেহ-রাজবংশে জন্মগ্রহণ-হেতু ত্রিশলা ঐ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে কিন্তু চেটক বৈশালীর রাজা বলিয়া স্বীকৃত হন নাই। বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে,—'বৈশালীতে তৎকালে এক অভিনব শাসনতন্ত্র-প্রথা প্রচলিত ছিল। তখন একটী সদস্য-সভার মতে রাজকার্য্য পরিচালিত হইত, এবং রাজা সেই সদস্য-সভার সভাপতি মধ্যে গণ্য ছিলেন। সেই সদস্য সভার গঠন-ক্রমে রাজা, রাজপ্রতিনিধি এবং সেনাপতি প্রভৃতির মধ্যে রাজ্যশাসন-ক্ষমতা বিভক্ত ছিল। সদস্য-সভার মত লইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত।' ঐ সময়ে ভারববর্ষে যে অভিনব সাধারণতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রচলিত ছিল, পারিপার্শ্বিক লিচ্ছবীরাজ্যের বিধি-বিধান অনুসন্ধান করিলেও তাহা উপলব্ধি হইতে পারে। জৈনগণের "নিরয়াবলি সূত্রে" লিখিত আছে যে, চম্পার রাজা কুণিক (অজাতশত্রু) একসময়ে রাজা চেটকের রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য সৈন্য-সমাবেশ করেন। চেটক সেই সময়ে কাশী-কোশল প্রভৃতি সন্ধিবদ্ধ রাজগণকে এবং লিচ্ছবীগণকে ও মল্লকী-গণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। কুণিকের দাবী পূরণ করা হইবে, কি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে,—তদ্বিষয়ে মীমাংসার জন্যই সকলকে লইয়া ঐ পরামর্শ-সভা আহুত হয়। জৈন-গ্রন্থের এই বর্ণনায়, ঐ সময়ে "সামন্ত-প্রথা" প্রবর্ত্তিত ছিল বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়। তদনুসারে আরও বুঝা যায়, চেটক প্রধান নৃপতি মধ্যে গণ্য ছিলেন, এবং আমন্ত্রিতগণ সামন্তরাজ-পর্য্যায়ের অন্তর্নিবিষ্ট ছিলেন। তবে একটী বিষয়ে সে সম্বন্ধে সংশয় আনয়ন করে। মহাবীর স্বামীর নির্ব্বাণ-লাভের পর তাঁহার স্মৃতি-সম্মানের জন্য পরস্পর সন্ধিবদ্ধ অষ্টাদশ রাজ্যের অধিপতি মিলিত হইয়া যখন উৎসব-সমারোহের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ; সে ক্ষেত্রে বিশেষভাবে চেটকের কোনও উল্লেখ নাই। তিনি যদি সামন্ত-রাজগণের প্রধান-স্থানীয় হইতেন, তাহা হইলে সেস্থলে বিশিষ্ট-ভাবে তাঁহার উল্লেখ থাকিত। অতএব, সন্ধি-বদ্ধ রাজগণের মধ্যে "চেটক" একজন সাধারণ রাজা মাত্র ছিলেন মনে করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ, বৈশালী-রাজ্যে সাধারণ-তন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়ায় তাঁহার ক্ষমতা অনেকটা খর্ব্ব হইয়া আসিয়াছিল বলিয়াও মনে হয়। বৌদ্ধগ্রন্থে চেটকের বিশেষ উল্লেখ কিছুই দৃষ্ট হয় না। কিন্তু জৈনগ্রন্থে তাঁহার বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাই। বৈশালী জৈনধর্ম্মের কেন্দ্রস্থান হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধগণ ঐ স্থানকে নাস্তিক-গণের লীলাক্ষেত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ বৌদ্ধগণ তাঁহাদের বিষয় উপেক্ষা করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক, সার্ব্বভৌম সম্রাটের পুত্র না হইলেও অথবা কোনও স্বাধীন নৃপতির সন্তান বলিয়া পরিচিত না হইলেও, তাৎকালিক বিশিষ্ট রাজবংশের সহিত মহাবীর স্বামী যে সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন, তদ্বিষয়ে

কোনও সংশয় থাকিতে পারে না। অপিচ, তিনি যে ভোগ-বিলাস ও রাজ্যৈশ্বর্য্য অবহেলায় ত্যাগ করিয়া, নৈষ্কর্ম্ম্যের আদর্শ প্রদর্শন করেন, তদ্বিষয়েও কোনও মতান্তর ঘটিতে পারে না।

মহাবীর স্বামীর জীবনে ত্যাগ-স্বীকারের, নির্লিপ্ত ভাবের এবং সমদৃষ্টির যে উজ্জ্বল আদর্শ দেখিতে পাই, উপসংহারে তদ্বিষয়ে দুই একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিয়া মহাবীর স্বামী প্রায় এক বৎসর এক মাস কাল এক-বস্ত্রে দিনযাপন করিয়াছিলেন। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষার অভিঘাত তাহারই উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। এক দিন সেই বস্ত্রখানির প্রতিও এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের দৃষ্টি পড়িল। প্রভু যখন সংসার-আশ্রম পরিত্যাগ করেন, তিনি যখন দুই হস্তে অকাতরে আপনার অতুল ধন-সম্পৎ সকলই বিতরণ করিয়া ফেলেন; ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ তখন স্থানান্তরে ছিলেন; সুতরাং প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া ভিক্ষা-প্রার্থনায় তাঁহার সুযোগ ঘটে নাই। পরিশেষে, ব্রাহ্মণ যখন বিদেশ হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, মহাবীর স্বামীর অলৌকিক দান-মাহাত্ম্যের বিষয় যখন লোকমুখে চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল; তখন, ব্রাহ্মণের গৃহিণী পতিকে অনুযোগ করিয়া কহিলেন,—"তুমি হেলায় রত্ন হারাইয়াছ। যদি এখনও পার, তাঁহার অনুসরণ কর। এখনও কিছু-না-কিছু পাইলেও পাইতে পার।" পত্নীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে ব্রাহ্মণের প্রাণে উৎসাহের সঞ্চার হয়। মহাবীর স্বামী কোন্ বনে কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন, তাহার অনুসন্ধানে ব্রাহ্মণ বহির্গত হন। যেদিন মহাবীর স্বামীর সহিত ব্রাহ্মণের প্রথম সাক্ষাৎ হইল, সেদিন প্রভুর আর কোনও সম্বলই ছিল না,—পরিধানে সেই বস্ত্রখানি মাত্র ছিল। প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া, ব্রাহ্মণ কাতর-কণ্ঠে যখন ভিক্ষাপ্রার্থী হইলেন, প্রভু আপন পরিধেয় বস্ত্রের অর্দ্ধাংশ ছিন্ন করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ কিন্তু সেই বস্ত্রাংশ গ্রহণ করিয়াও পুনরপি প্রভুর পশ্চাদনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রভু এই সময় পদব্রজে একটি নদী পার হইতেছিলেন। সেই নদীগর্ভে এক-খণ্ড কাষ্ঠ ভাসমান ছিল। প্রভুর পরিহিত অর্দ্ধখণ্ড বস্ত্র সেই কাষ্ঠে সংলগ্ন হইয়া অঙ্গস্খলিত হইল। যে আপনি চলিয়া গেল, তাহার প্রতি আর কেন মায়া করি? যে আপনি নির্লিপ্ত করিল, কেন আর তাহাতে লিপ্ত হইতে চাই? প্রভু সে বস্ত্রখণ্ডের প্রতি আর ফিরিয়া চাহিলেন না। তিনি যেমন এক মনে পথ চলিতেছিলেন, তেমনই চলিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ তখন সে অর্দ্ধখণ্ড বস্ত্রও কুড়াইয়া লইলেন। অতঃপর, নগ্নদেহে মহাবীর স্বামী যখন পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার কি অলৌকিক পুণ্য-প্রভা—কেহই তাঁহাকে উলঙ্গ দেখিতে পাইল না! নিষ্কাম-নির্লিপ্ত মহাপুরুষগণের নগ্নদেহই বা কি, আর আবৃত-দেহই বা কি! তাঁহাদের তেজঃপ্রভায় উভয় অবস্থাই সমান। যাহা হউক, প্রভুর পরিত্যক্ত সেই ছিন্ন বস্ত্র দুইখণ্ড লইয়া ব্রাহ্মণ যখন প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, তখন তাঁহার আর ঐশ্বর্য্যের অবধি রহিল না। দরিদ্র ব্রাহ্মণ সেই ছিন্ন বস্ত্র দুই খণ্ডের বিনিময়ে কোনও এক ভক্ত শ্রেষ্ঠীর নিকট হইতে আড়াই লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা প্রাপ্ত হইলেন। বিষয়ী সংসারী বুঝিল—মহাবীর স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ব্রাহ্মণ বড় একটা 'দাঁও' মারিয়া বসিয়াছে; আর ভক্ত ভাবুক জন বুঝিলেন—ব্রাহ্মণ নশ্বর বিত্তের লোভে প্রভুর সংসর্গ-রূপ অবিনশ্বর রত্ন হারাইয়াছে।

মহাবীরের ত্যাগ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

জিনগণ।

[অন্যান্য জিন ও তীর্থঙ্করগণ,—পার্শ্বনাথ ;—অরিষ্টনেমী ;—ঋষভদেব ;—শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণিত ভগবান্ ঋষভদেবের সহিত আদি-তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের সাদৃশ্য-তত্ত্ব ;—জৈনশাস্ত্রের ও ভাগবতের বর্ণনা ;—মহাবীরের পরবর্ত্তী কল্পসূত্র-সঙ্কলনের সময় পর্য্যন্ত কালের স্থবিরগণের নাম-পরিচয় ;—উপসংহার।]

জৈনধর্ম্মের বিষয় আলোচনা করিতে হইলে, উহার প্রাণভূত জিনগণের প্রসঙ্গ মানসপটে স্বতঃ-প্রকটিত হয়। মনে পড়ে—পার্শ্বদেবের কথা; মনে পড়ে—অরিষ্টনেমীর ইতিহাস; মনে পড়ে—তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বিংশতি তীর্থঙ্করের বিষয়; মনে পড়ে—তাঁহাদের সকলের আদিভূত ঋষভদেবের জীবনবৃত্ত। মহাবীরের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী জিন—'অর্হৎ পার্শ্ব' বা 'পার্শ্বনাথ' নামে প্রখ্যাত।

পার্শ্বনাথ।

সকল জিনগণেরই জীবনবৃত্তান্ত সাধারণতঃ একই উপাদানে নির্ম্মিত। জন্মকাল বা জন্ম-নক্ষত্র বিভিন্ন হইলেও, জন্মগ্রহণ-প্রণালী ও কার্য্য-পরম্পরায় তাঁহাদিগকে একই ছাঁচে বিগঠিত দেখি। প্রত্যেকেরই জীবন-নাট্য কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট অঙ্কে বিভক্ত। তাহার এক এক অঙ্কে তাঁহারা এক এক অবস্থায় উন্নীত হইয়া পরিশেষে চরম মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। পার্শ্বদেবের জীবনের পাঁচটী শুভ মুহূর্ত্তে চন্দ্রের সহিত বিশাখা নক্ষত্রের সংক্রমণ ঘটিয়াছিল। তিনি দেবগণের দশম বাসস্থান প্রাণতকল্প হইতে অবতরণ করেন। জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত ভারতবর্ষ-খণ্ডে বারাণসী-ধামে তিনি অবতীর্ণ হন। তাঁহার পিতার নাম—রাজা অশ্বসেন; জননীর নাম—রাণী বামা। গ্রীষ্মকালে চৈত্র মাসে চতুর্থ দিবসে কৃষ্ণপক্ষের মধ্যরাত্রে বিশাখা-নক্ষত্রের সহিত চন্দ্রের সংক্রমণ-কালে তিনি ভ্রূণ অবস্থা প্রাপ্ত হন। তাহার নয় মাস সাড়ে সাত দিবস পরে পৌষ মাসের দশম দিবসে তাঁহার জন্ম হয়। জন্মের পর, লোকান্তিক দেবগণ আসিয়া তাঁহার স্তুতিগান করেন। মহাবীর স্বামীর জীবনবৃত্তে তাঁহার যেমন গৃহধর্ম্ম ত্যাগস্বীকার প্রভৃতির পরিচয় পাইয়াছি, পার্শ্বদেবের জীবনেও সে পরিচয় সেইরূপ ভাবেই পরিদৃশ্যমান্। পৌষ মাসের একাদশ দিবসে, 'বিশালা' নামক যানে আরোহণ করিয়া, আত্মীয়-অন্তরঙ্গ ও দেবগণে পরিবৃত হইয়া, তিনি 'আশ্রমপদ' উদ্যানে গমন করেন; এবং সেখানে শ্রেষ্ঠ অশোক-তরুমূলে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ব্রত গ্রহণ করেন। সাড়ে তিন দিবস নিরম্বু উপবাসী থাকিয়া তিনি সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিন শত সহচর তাঁহার অনুগমন করেন। ৮৩ তিরাশী দিবস কাল শীতোষ্ণাদি সহ্য করিয়া, সর্ব্ববিধ প্রাণীর অত্যাচারে অবহেলা করিয়া, তিনি জীবন-যাপন করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ৮৩ দিবস বাক্-সংযম কায়-সংযম প্রভৃতি সংযম-সাধনার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে অতিবাহিত হয়। তৎপরে চতুরধিক অশীতিতম দিবসে, চৈত্র মাসের চতুর্থ দিবসে, বিশাখা-নক্ষত্রের

সংক্রমণ-কালে তিনি কেবল-জ্ঞান প্রাপ্ত হন। অর্হৎ পার্শ্বদেবের অষ্ট গণ এবং অষ্ট গণধর ছিলেন। তাঁহাদের নাম,—শুভ, আর্য্যঘোষ, বশিষ্ঠ, ব্রহ্মচারী, সৌম্য, শ্রীধর, বীরভদ্র, যশ। পার্শ্বদেবের সময়ে জৈন-সম্প্রদায়ের যে পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে বুঝিতে পারি, তখন, আরিয়া-দিন্ন (আর্য্যদত্ত) নামক আচার্য্যের অধীনে ষোল হাজার শ্রমণ ছিলেন; পুষ্পকুলার অধিনায়িকাত্বে আটত্রিশ হাজার সাধ্বী জৈনধর্ম্ম পালন করিতেছিলেন; সুব্রতের অধীনে এক লক্ষ ষাট হাজার গৃহী এবং সুনন্দার অধীনে তিন লক্ষ সাতাশ হাজার সংসারী স্ত্রী জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এইরূপ, আরও বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন স্তরের জৈনগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; যথা,—অবধি-জ্ঞানসম্পন্ন চৌদ্দ হাজার জ্ঞানী, কেবলী-জ্ঞানসম্পন্ন এক হাজার জ্ঞানী, ইত্যাদি। পার্শ্বদেবের আয়ুঃকাল শতবর্ষ। তন্মধ্যে ত্রিশ বৎসর গৃহবাস, তিরাশী দিবস দীক্ষার অবস্থা, অনধিক সত্তর বৎসর কেবলী এবং পূর্ণ সত্তর বৎসর শ্রমণ অবস্থা। তাঁহার সকল কর্ম্ম ক্ষয় হইলে, অবসর্পিণী কালের দুঃসম-সুসমা কালাংশ অতীত হইলে, শ্রাবণ মাসের অষ্টম দিবসে, চন্দ্রের সহিত বিশাখা নক্ষত্রের সংক্রমণ সময়ে, তিনি মহানির্ব্বাণ লাভ করেন। পূর্ব্ববর্ত্তী এক মাস কাল সম্মেত-গিরিশিখরে নির্জ্জল উপবাসী অবস্থায় তিনি সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন।

পার্শ্বদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী জিন ও তীর্থঙ্কর 'অর্হৎ অরিষ্টনেমী' নামে অভিহিত হন। রাজা সমুদ্র-বিজয় এবং রাণী শিবা তাঁহার পিতামাতা বলিয়া পরিচিত। শৌরিপুত্র-নগর তাঁহার জন্মস্থান। যে যানে শোভাযাত্রা করিয়া তিনি সংসার-ত্যাগ উদ্দেশ্যে গমন করেন, তাহার নাম—উত্তরপুরা। দ্বারাবতী নগরীর রেবতীকা উদ্যানে অশোক-তরুতলে তিনি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন। গির্ণার-পর্ব্বতে বেতস্-তরু-তলে সাড়ে তিন দিবস কাল নির্জ্জল উপবাসে সাধনায় মগ্ন থাকিয়া তিনি কেবল-জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অষ্টাদশ গণ ও গণধর ছিল। অরিষ্টনেমীর অনুবর্ত্তী জৈনগণের পরিচয়ে লিখিত আছে যে,—তখন বরদত্ত নামক আচার্য্যের অধীনে আঠার হাজার শ্রমণ, আর্য্য-যক্ষিণীর অধিনায়িকাত্বে চল্লিশ হাজার সাধ্বী, নন্দের অধিনায়কত্বে এক লক্ষ উনসত্তর হাজার গৃহস্থ এবং মহাসুব্রতার অধিনায়িকাত্বে তিন লক্ষ ছত্রিশ হাজার গৃহস্থ-স্ত্রীলোক জৈনধর্ম্ম পালন করিয়া আসিতেছিলেন। তখন, পূর্ব্ব-শাস্ত্রে জ্ঞানীর সংখ্যা চারি শত, অবধি-জ্ঞানে জ্ঞানীর সংখ্যা পনের শত ইত্যাদি রূপ জৈনধর্ম্মাবলম্বিগণের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। অরিষ্টনেমীর আয়ুঃকাল সহস্র বৎসর বলিয়া কথিত হয়। তাহার মধ্যে তিনি তিন শত বৎসর যুবরাজ-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; চুয়ান্ন দিন তাঁহার দীক্ষা-অবস্থায় কাটিয়াছিল। পূর্ণ সাত শত বৎসর তিনি শ্রমণ-পদাভিষিক্ত ছিলেন; তাহার মধ্যে দীক্ষার কয়েক দিন ভিন্ন অন্য সময় তাঁহার কেবলী-অবস্থা বলিয়া কথিত হয়। অবসর্পিণী কালে দুঃসম-সুসমা কালাংশের অধিক ভাগ অতীত হইলে, আষাঢ় মাসের অষ্টম দিবসে তাঁহার পুনর্নির্ব্বাণ লাভ হয়। গির্ণার গিরিশিখরে এক মাস কাল নির্জ্জল উপবাস অবস্থায় সাধনায় যাপন করিয়া, চন্দ্রের সহিত চিত্রা নক্ষত্রের সংক্রমণকালে তিনি মহানির্ব্বাণ লাভ করেন।

অরিষ্টনেমী।

তীর্থঙ্কর মধ্যে পরিগণিত। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী একবিংশ তীর্থঙ্কর নমি বা নমিনাথ নামে অভিহিত হন। কল্পসূত্র যে সময়ে লিপিবদ্ধ * হইয়াছিল, তাহার ৫,৮৪,৯৭৯ বৎসর পূর্ব্বে অর্হৎ নমিনাথ মহানির্ব্বাণ লাভ করেন; তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বিংশতিতম তীর্থঙ্কর—মুনিসুব্রত। তাঁহার মহানির্ব্বাণ লাভ ১১, ৮৪, ৯৮০ বর্ষ পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। উনবিংশতিতম তীর্থঙ্কর—মল্লিনা, ৫৫,৮৪,৯৮০ বর্ষ পূর্ব্বে মহানির্ব্বাণ লাভ করেন। অষ্টাবিংশতি তীর্থঙ্কর অরনাথ, মল্লিনাথের কোটী বৎসর পূর্ব্বে মহানির্ব্বাণ লাভ করেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী তীর্থঙ্করগণের কাল-পরিমাণ নির্ণয় করা অধুনা অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অরনাথের পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তদশ তীর্থঙ্কর কুন্থুনাথের মহানির্ব্বাণ-লাভ সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, তিনি মল্লিনাথের পূর্ব্ববর্ত্তী চতুর্থাংশ পলিয়পমকালে মহানির্ব্বাণ লাভ করেন। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ষোড়শ তীর্থঙ্কর শান্তিনাথ পলিয়পম-কালের তিন অংশ, পঞ্চদশ তীর্থঙ্কর ধর্ম্মনাথ তিন সাগরোপম পূর্ব্বে (মল্লিনাথের), চতুর্দ্দশ তীর্থঙ্কর অনন্তনাথ সাত সাগরোপম কাল পূর্ব্বে (মল্লিনাথের), মহানির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। এই পলিয়পম ও সাগরোপম কালের পরিমাণ সম্বন্ধে নানা মতান্তর আছে। সুতরাং মল্লিনাথের পূর্ব্ববর্ত্তী তীর্থঙ্করগণের মহানির্ব্বাণের কাল-নির্ণয় গণনাঙ্কের সীমায় নির্দ্দেশ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। অতএব, আমরা (১৩) বিমলনাথ, (১২) বাসুপূজ্য, (১১) শ্রেয়াংশনাথ, (১০) শীতলনাথ, (৯) সুবিধিনাথ বা পুষ্পদন্ত, (৮) চন্দ্রপ্রভ, (৭) সুপার্শ্ব, (৬) পদ্মপ্রভ, (৫) সুমতিনাথ, (৪) অভিনন্দ, (৩) সম্ভবনাথ, (২) অজিতনাথ, (১) ঋষভদেব—ইঁহাদের কাল-নির্ণয়ে বৃথা চেষ্টায় বিরত রহিলাম।

প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেব সম্বন্ধে এবং অন্যান্য তীর্থঙ্করের বিষয়েও পূর্ব্বে আমরা সামান্যরূপ আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান অবসর্পিণী কালের তীর্থঙ্করগণের মধ্যে ঋষভদেব আদিভূত। চতুর্ব্বিংশতিতম তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর জীবন-বৃত্ত যে ভাবে এবং যেরূপ ভাগে বিভক্ত, ইঁহার জীবনবৃত্তান্তও অনেকাংশে সেইরূপ বিভাগে বিভাগীকৃত। ইঁহার জীবনের প্রথম প্রধান চারি মুহূর্ত্ত চন্দ্রের সহিত উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের এবং পঞ্চম মুহূর্ত্ত অভিজিৎ নক্ষত্রের সংক্রমণকালে উপস্থিত হইয়াছিল। সর্ব্বার্থসিদ্ধ নামক বিমানে তেত্রিশ সাগরোপম কাল অবস্থিতির পর, আষাঢ় মাসের চতুর্থ দিবসে, ভারতবর্ষের ইক্ষ্বাকু-ভূমিতে ইনি আবির্ভূত হন। কুলকর নাভির ঔরসে মরুদেবীর গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইক্ষ্বাকুভূমি কোশলরাজ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। সেইজন্য ঋষভদেব কোশালী নামেও অভিহিত হন। ঋষভদেবের এবং মহাবীরের জন্মকালের ঘটনাবলী সম্বন্ধে সামান্য কয়েকটী পার্থক্য দৃষ্ট হয়। মহাবীরের জননী প্রথম স্বপ্নে বৃষভ দর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু ঋষভদেবের জননী মরুদেবী প্রথম স্বপ্নে হস্তী দর্শন করেন। পতির নিকট ত্রিশলা স্বপ্নবৃত্তান্ত বিবৃত করিলে, দেবগণের দ্বারা তাহার ফলাফল নির্ণীত হইয়াছিল। কিন্তু মরুদেবীর স্বপ্নবৃত্তান্তের ফলাফলের বিষয় তাঁহার পতি নাভি বিবৃত করেন। ঋষভদেব কাশ্যপগোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। মহাবীরও কাশ্যপ-গোত্রজ

ঋষভদেব।

* এই খণ্ডের ৩৮ পৃষ্ঠায় সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র লিপিবদ্ধ হওয়ার কালবিষয়ক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ছিলেন বটে; কিন্তু তিনি গর্ভ হইতে গর্ভান্তরে সঞ্চালিত হওয়ায়, তাঁহার গোত্র-সম্বন্ধে কাহারও কাহারও বিভ্রম উপস্থিত হয়। ঋষভদেব পাঁচ নামে পরিচিত;—ঋষভ, প্রথম রাজা, প্রথম ভিক্ষু, প্রথম জিন, প্রথম তীর্থঙ্কর। কিন্তু মহাবীরের তিনটী প্রধান নাম। অর্হৎ ঋষভ—বুদ্ধিমান, উদ্যমশীল, অতিসুন্দর, সংযমী, অদৃষ্টবান্ ও নম্র ছিলেন। সে পক্ষে তাঁহার সহিত মহাবীরের সাদৃশ্যের অসদ্ভাব নাই। ঋষভদেব কুড়ি লক্ষ বৎসর যুবরাজ-পদে এবং তেষট্টি লক্ষ বৎসর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে জনসাধারণের সুশিক্ষা-বিধানের ও উপকার-সাধনের জন্য তিনি বিশেষরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে দ্বিসপ্ততি বিজ্ঞান স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছিল। তাহার মধ্যে গণিতবিজ্ঞান, ভবিষ্যজ্ঞান, নারীজাতির শিক্ষণীয় চতুঃষষ্টি (নৃত্যগীতাদি) বিদ্যা, শতবিধ শিল্প এবং পুরুষজাতির প্রতিপাল্য ত্রিবিধ বৃত্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফলতঃ, কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি পর্য্যায়ে তখন অশেষ প্রকার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। ঋষভদেবের শত পুত্র; তিনি সেই পুত্র-শতককে দীক্ষা-দানান্তর এক এক রাজ্য প্রদান করেন। পরিশেষে সুদর্শন নামক যানে আরোহণ-পূর্ব্বক, দেবগণে মনুষ্যগণে ও অসুরগণে পরিবৃত হইয়া, তিনি সন্ন্যাস-অবলম্বনার্থ যাত্রা করেন। বিনীতা-নগরীতে সিদ্ধার্থ-বন নামক উদ্যানে অশোক-তরুতলে চন্দ্রের সহিত আষাঢ়া নক্ষত্রের সংক্রমণ-কালে তিনি সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবিষ্ট হন। আড়াই দিবস নির্জ্জল উপবাসী থাকিয়া, চারি সহস্র উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত রাজ-বংশীয় ব্যক্তির ও ক্ষত্রিয়গণের সহিত, কেশপাশ ছিন্ন করিয়া, তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করেন। পরিশেষে, যথারীতি কেবলী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, যথাকালে তিনি মহানির্ব্বাণ লাভ করেন। তাঁহার আয়ুঃকাল চুরাশী লক্ষ বৎসর নির্দ্দিষ্ট হয়। সর্ব্বকর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, সাড়ে ছয় দিন কাল নির্জ্জল উপবাসী অবস্থায় সাধনা-মগ্ন থাকিয়া, তিনি মহানির্ব্বাণ লাভ করেন। ঋষভদেবের গণ ও গণধরগণ সংখ্যায় চুরাশী জন। তাঁহার শিষ্য-সেবক-গণের মধ্যে আচার্য্য ঋষভসেনের অধিনায়কত্বে চুরাশী হাজার শ্রমণ, সাধ্বী ব্রাহ্মীসুন্দরীর অধিনায়িকাত্বে তিন লক্ষ সাধ্বী ছিলেন। সংসারী পুরুষের মধ্যে সাড়ে তিন লক্ষ পুরুষ শ্রেয়াংশের অধীনে, এবং পঞ্চান্ন লক্ষ চারি হাজার স্ত্রীলোক সুভদ্রার অধিনায়িকাত্বে পরিচালিত হইতেন। পূর্ব্বাদি শাস্ত্রাভিজ্ঞ, অবধি-জ্ঞান-সম্পন্ন এবং কেবলী প্রভৃতির সংখ্যাও তাঁহার সম্প্রদায়ে অনেক ছিল। অষ্টপাদ পর্ব্বতশিখরে দশ সহস্র সন্ন্যাসী পরিবেষ্টিত হইয়া, 'সম্পর্য্যঙ্ক' যোগাসনে বসিয়া, ভগবান ঋষভদেব মুক্তিলাভ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান বিষ্ণুর অবতার বলিয়া যে ঋষভদেবের উল্লেখ আছে, তাঁহার সহিত জৈন-শাস্ত্রোক্ত এই ঋষভদেবের অভিন্নত্ব পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

জৈনশাস্ত্রের বর্ণনার সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনার অশেষ ঐক্য দৃষ্ট হয়। তীর্থঙ্কর ঋষভদেব যেরূপভাবে স্তরে স্তরে মুক্তির পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন; জৈন-সম্প্রদায়ের মধ্যে যেরূপ মুক্তিলাভের পথে সোপান-পরম্পরা দৃষ্ট হয়; জৈনশাস্ত্র-অনুসারে জিনপদে উন্নীত হইবার পথে যে অশেষ বাধা-বিঘ্ন-বিপত্তি অতিক্রমের ও কষ্ট-সহিষ্ণুতার আবশ্যক হয়; ঋষভদেবের ও মহাবীর প্রভৃতির জীবনবৃত্তে যেরূপ কঠোর সন্ন্যাস-গ্রহণের এবং পবিত্র পরমার্থতত্ত্ব-জ্ঞানের পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতে ঋষভদেব।

পাই ; শ্রীমদ্ভাগবতে ঋষভদেবের চরিত্রে সেই আদর্শ পরিদৃশ্যমান। পুত্রগণের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া ঋষভদেব কি কঠোর সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহার এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয় ;—"ঋষভদেব স্বয়ং উপশমশীল উপরতকর্ম্মা মহামুনিদিগের ভক্তিজ্ঞান-বৈরাগ্য-লক্ষণ পারমহংসধর্ম্ম শিক্ষা করিবার আকাঙ্ক্ষায়, আপনার শতসুতের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পরমভাগবত ভগবজ্জনপরায়ণ ভরতকে ধরণীমণ্ডল-পালনার্থ রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। পরে, শরীরমাত্র পরিগ্রহ হইয়া তিনি উন্মত্তের ন্যায় নগ্নবাসে ও বিমুক্তকেশে আবহনীয় অগ্নি আপনাতেই রক্ষা করিয়া প্রব্রজ্যাশ্রমে প্রবেশ করিবার জন্য ব্রহ্মাবর্ত্তদেশ হইতে প্রস্থান করিলেন। তৎকালে তাঁহার সহিত কেহ কথা কহিতে গেলে, তিনি তাহাদের মধ্যে জড় মুক অন্ধ বধির পিশাচ অথবা উন্মত্তের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া, কাহারও সহিত আলাপ করিতেন না ;—তিনি মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া তূষ্ণীম্ভাব ছিলেন। তিনি পুর, গ্রাম, আকর, কৃষীবল-গ্রাম, পুষ্পাদি বাটীকা, খর্ব্বট, শিবির, গোস্থান, আভির-পল্লী, যাত্রিকদিগের সম্মিলন-স্থান, পর্ব্বত, বন এবং আশ্রম প্রভৃতি যে যে স্থানে গমন করেন, সেই সেই স্থানের পথে, মক্ষিকাগণ যেমন বন্যগজকে ব্যস্ত করে, তদ্রূপ দুরাত্মা-সকলে তাঁহাকে ভয়প্রদর্শন, তাড়ন, গাত্রে প্রস্রাব ও শ্লেষ্মা পরিত্যাগ, প্রস্তর বিষ্ঠা ও ধূলি-প্রক্ষেপ, সম্মুখে অধোবায়ু ত্যাগ এবং দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ ইত্যাদি দ্বারা নানা প্রকারে ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিল। তিনি সেই সকলের প্রতি কিছুই ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। মিথ্যাভূত এই সংসার নামে মাত্র সৎ ; ইহাতে সৎ ও অসতের অনুভব-স্বরূপ স্বীয় মহিমায় অবস্থান করিয়া তাঁহার 'আমি আমার' ইত্যাকার অভিমান দূরীভূত হইয়াছিল। যখন লোকসকল তাঁহার যোগানুষ্ঠানের প্রতিপক্ষ হইয়া উঠিল, তখন তিনি উহার প্রতিকার করা নিতান্ত নিন্দনীয় বিবেচনা করিয়া আজগর ব্রত অবলম্বন করিলেন। তাহাতে একস্থানে অবস্থান করিয়া অশন, পান, চর্ব্বণ ও মলমূত্র পরিত্যাগ-ক্রিয়া হইতে লাগিল। তিনি সময়ে সময়ে বিষ্ঠার উপর বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার শরীরের স্থানে স্থানে বিষ্ঠা লিপ্ত হইল। ঐ বিষ্ঠায় দুর্গন্ধের লেশমাত্র ছিল না। যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত, খেচরত্ব, মনযবত্ব, অন্তর্দ্ধান, পরকায় প্রবেশ এবং দূরদর্শন প্রভৃতি স্বয়ং আগত যোগৈশ্বর্য্য সকলে তাঁহার কিছুমাত্র আদর ছিল না। কি প্রকারে কলেবর ত্যাগ করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দিবার জন্য তিনি আপনার কলেবর ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি আত্মাতেই সাক্ষাৎ অবস্থিত পরমাত্মাকে আপনার সহিত অভেদভাবে দেখিয়া দেহাভিমান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ভগবান ঋষভদেব নিত্য-অনুভূত নিজ-স্বরূপ-লাভেই সমস্ত তৃষ্ণা নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। দেহাদির জন্য স্বকাম কল্যাণ-বিষয়ে যাহাদের বুদ্ধি চিরসুপ্ত ছিল, তিনি তাহাদিগকে করুণা করিয়া অভয়রূপ নিজলোক উপদেশ দিয়াছিলেন।" শ্রীমদ্ভাগবতের এই বর্ণনার সহিত মহাবীর স্বামীর ও ঋষভদেবের (মহাবীর স্বামীর আর ঋষভদেবেরই বা বলি কেন—সকল তীর্থঙ্করগণেরই) জীবনের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। কল্পসূত্রে বর্ণিত ঋষভ-দেবের চরিত্রে (২১২ম সূত্রে) এবং মহাবীর-চরিত্রে (১১৭ম সূত্রে) * অপিচ, আচারাঙ্গ সূত্রে

* ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণে ভিন্ন ভিন্ন রূপ সূত্রের সংখ্যা দেখিতে পাই।

(দ্বিতীয় শ্রুতস্কন্ধে, দ্বিতীয় অধ্যয়নের পঞ্চদশ সূত্রে) অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। যথা,- ঋষভচরিত্রে ও মহাবীর-চরিত্রে, যথাক্রমে কল্পসূত্রে ও আচারাঙ্গ-সূত্রে,—

"উসভে ণং অরহা কোসলিএ এগং বাসসহস্‌স নিচ্চং বোসট্ঠকাএ চিয়ত্তদেহে জে কেই উবসগ্‌গা জাব্ং অপ্পাণং ভাবেমাণস্‌স ইক্কং বাসসহস্‌সং বিইক্কংতং, তও ণং জে সে হেমংতাণং চ উত্থে মাসে সত্তমে পক্‌খে ফগ্‌গুণবহুলে, তস্‌স ণং ফগ্‌গুণবহুলস্‌স ইকারসী-পক্‌খেণং পুব্বণ্হকালসময়ংসি পুরিমতালস্‌স নয়রস্‌স বহিআ সগড়মুহংসি উজ্জাণংসি নগ্‌গোহবরপায়বস্‌স অহে অট্ঠমেণং ভত্তেণং অপাণএণং আসাঢ়াহিং নক্‌খত্তেণং জোগ-মুবাগএণং ঝাণংতরিআএ বট্টমানস্‌স অণংতে জাব্ং জাণমাণে পাসেমাণে বিহরই॥"*

"তওণং সমণে ভগবং মহাবীরে বোসট্ঠচত্তদেহে অনুত্তরেণং আলএণং, অনুত্তরেণং বিহারেণং, এবং সংজমেণ, পগ্‌গহেণং, সংবরেণং, তবেণং, বম্ভচেরবাসেনং খংতীএ, মোত্তীএ, তুট্টিএ, সমিতীএ, গুত্তীএ, ঠাণেনং, কম্মেণং, সুচরিয়ফলণেব্বাণমুক্তিমগ্‌গেণং অপ্পাণং ভাবেমানে বিহরই। (১০২২); এবং বা বিহরমাণস্‌স জে কেই উবসগ্‌গা সমুপ্পজ্জিংসু—দিব্বা বা, মাণুসা বা, তেরিচ্ছিয়া বা, তে সব্বে উপসগ্‌গে সমুপন্নে সমাণে, অনাইলে, অব্বহিতে, অদীণমাণসে তিবিহ মণবয়ণকায়গুত্তে সম্ম সহই খমই তিতিক্‌খই অহিয়াসেই।" (১০২৩)। আচারাঙ্গ-সূত্র, চতুর্ব্বিংতিতম অধ্যয়নম্, তৃতীয়া চূলা।"

"চত্তারী সাহি এমাসে, বহবে পানজাইয়া আগম্ম;
অভিরুজ্ঝ কায়ং বিহরিংসু, আরুহিয়া ণং তত্থ হিংসিংসু।
সংবচ্ছরং সাহিয়ং মাস, জং ন রিক্কাসি পত্থগং ভগবং;
অচেলএ ততো চাঈ, তং বোসজ্জ বত্থ-মণগারে।"
(আচারাঙ্গ-সূত্র, নবম অধ্যয়ন, প্রথম উদ্দেশ, তৃতীয়—চতুর্থ সূত্র।) †

"তণফাসে সীয়ফাসে, তেউফাসে য দংসমসগেয়;
অহিয়াসএ সয়া সমিএ, ফাসাইং বিরূবরূবাইং।"
(আচারাঙ্গ-সূত্র, নবম অধ্যয়ন, তৃতীয় উদ্দেশ, প্রথম সূত্র।) ‡

---

* ঐ অংশের ইংরাজী মর্ম্মানুবাদ—"The Arhat Rishabha, the Kosalian, for one thousand years neglected his body, and abandoned the care of it; he with equanimity bore, underwent, and suffered all pleasant and unpleasant occurances arising from divine power, men or animals etc."

† আচারাঙ্গ-সূত্রে মহাবীর স্বামীর সহিষ্ণুতা বিষয়ক ঐ অংশের ইংরাজী অনুবাদ,—"More than four months many sorts of living beings gathered on his body, crawled about it and caused pain there. For a year and a month he did not leave off his robe, since that time the Venerable One, giving up his robe was a naked, world-relinquishing, houseless (sage). Without food he should lie down and bear the pains which attack him. When crawling animals or such as live on high or below, feed on his flesh and blood, he should neither kill them nor rub (the wound). Though these animals destroy the body he should not stir from his position."

‡ "Always well-guarded, he bore the pains (caused by) grass, cold, fire, flies, and gnats, manifold pains."

শ্রীমদ্ভাগবতে ঋষভদেবের পুত্রদিগের প্রতি যে উপদেশ দেখিতে পাই, সে উপদেশ জৈনশাস্ত্রের সারভূত। সংসার ত্যাগের পূর্ব্বে ভগবান ঋষভদেব পুত্রদিগকে উপদেশ দিতেছেন;—"যাহারা নরলোকে জন্ম লইয়া মানব দেহ পাইয়াছে, তাহাদের ঐ দেহে বিষ্ঠাভোজী শূকরাদির ভোগ্য দুঃখদ বিষয় ভোগ করা কর্ত্তব্য নহে। তপস্যাই সার বস্তু। এই তপস্যার দ্বারা সত্ত্ব পবিত্র হয়। তাহাতেই অনন্ত ব্রহ্মসুখ লাভ হইয়া থাকে। মহতের সেবা মুক্তির দ্বার এবং যোষিৎ সঙ্গীদিগের সঙ্গ সংসারের কারণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যাঁহারা সকলের সুহৃদ্, প্রশান্ত, অক্রোধ, সদাচারী এবং যাঁহারা সর্ব্ব প্রাণীকেই সমান দেখেন, তাঁহারাই মহৎ। আমি ঈশ্বর। যাঁহারা আমাতে সৌহৃদ্য করিয়া তাহাই পরমপুরুষার্থ জ্ঞান করেন; যাঁহারা বিষয়াসক্ত ব্যক্তি ও পুত্র-কলত্র-ধন-মিত্রাদি-বিশিষ্ট গৃহে প্রীতি-যুক্ত নহেন এবং যাঁহারা লোক-মধ্যে দেহযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী অর্থ অপেক্ষা অধিক অর্থের প্রয়াসী নহেন; তাঁহারাই মহৎ। মনুষ্য ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধনে ব্যাপৃত হইলে প্রায়ই প্রমত্ত হইয়া বিরুদ্ধ কর্ম্ম করে। একবার বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়া আত্মার এই ক্লেশকর দেহ উৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং আমি ইহা ভাল বলিতে পারি না। লোকে যে পর্য্যন্ত না আত্মতত্ত্ব জানিতে চাহে, সে পর্য্যন্ত তাহার নিকট অজ্ঞানকৃত আত্মস্বরূপের অভিভব হয়; যে পর্য্যন্ত ক্রিয়া থাকে, সে পর্য্যন্ত এই মনে কর্ম্ম স্বভাব প্রকাশ পায়;—ইহাই দেহবন্ধের কারণ। এই হেতু পূর্ব্বকৃত কর্ম্মই মনকে পুনর্ব্বার কর্ম্মকরণে প্রবৃত্তি দেয় এবং আত্মা যতকাল অবিদ্যা উপাধিযুক্ত থাকে, ততকাল মন পুরুষকে কর্ম্মবশ করিয়া রাখে। আমি বাসুদেব। লোকে যে পর্য্যন্ত আমাতে প্রীতি না করে, সে পর্য্যন্ত দেহযোগ হইতে মুক্ত হইতে পারে না। পুরুষ যতক্ষণ বিবেকী হইয়া ইন্দ্রিয়গণের চেষ্টাকে অলীক বলিয়া না দেখে, ততক্ষণ তাহার স্বরূপের স্মৃতি থাকে না; সুতরাং সেই মূঢ়, মিথুনসুখ-প্রাপক গৃহ প্রাপ্ত হইয়া ভোগ করিতে থাকে। স্ত্রী ও পুরুষ, প্রত্যেকের জন্মাবধি এক একটা হৃদয়-গ্রন্থি আছে। পুরুষ, স্ত্রীর সহিত মিলিত হইলে, তাহাদের পরস্পরের আর একটী হৃদয়গ্রন্থি হয়। এই দুর্ভেদ্য হৃদয়-গ্রন্থি হইতে পুত্র, মিত্র, ক্ষেত্র, ধন ইত্যাদি বিষয়ে মোহ উৎপন্ন হয়। এই হেতু সংসারে স্ত্রীর সহিত মিলন সুখ-কারণ নহে, বরং ইহা মহামোহ উৎপাদন করিয়া আত্যন্তিক দুঃখের কারণ হয়। তবে, কর্ম্মানুবদ্ধ মনোরূপ দৃঢ় হৃদয়-গ্রন্থি সেই মিথুনীভাব হইতে শিথিল হইলে অর্থাৎ আমার অভিমুখীন হইলে, লোক সংসারের হেতুভূত অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া মুক্তি ও পরম পদ পাইতে পারে। হংস ও গুরু স্বরূপ যে আমি—আমাতে ভক্তি সহকারে অনুবৃত্তি করা, বিতৃষ্ণা, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা, ইহ পরলোক সর্ব্বত্র সকল প্রাণীর দুঃখ-দর্শন, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা, তপস্যা, কাম্য কর্ম্ম পরিত্যাগ, আমার জন্যই কর্ম্ম করা, আমার কথা কথন, যাহারা আমাকে পরম দেব বলিয়া জানে—তাহাদের সহিত নিত্য সহবাস, আমার গুণকীর্ত্তন, নির্ব্বৈরতা, সমতা, উপশম, আত্মদেহ ও 'আমি আমার' এইরূপ বুদ্ধি পরি-ত্যাগের কামনা, অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের অভ্যাস, নির্জ্জন স্থানে বাস, প্রাণ ইন্দ্রিয় মন—এ

পুত্রগণকে উপদেশ।

আবু-পর্ব্বতস্থ দিলওয়ারা মন্দিরের অভ্যন্তর।

সকলের সম্যক্ প্রকারে জয়, সৎশ্রদ্ধা, ব্রহ্মচর্য্য, কর্ত্তব্য-কর্ম্মের অপরিত্যাগ, বাক্য-সংযম, সর্ব্বদা মদীয়-চিন্তাদিপূর্ণ—অনুভব পর্য্যন্ত জ্ঞান-সমাধি,—এই সকল দ্বারা ধৈর্য্য, যত্ন ও বিবেকবান্ হইয়া, অহঙ্কার নামক উপাধিকে নিরাকৃত করিবে।"

শ্রীমদ্ভাগবতে ঋষভদেবের যে উপদেশ দেখি, জৈনশাস্ত্রের সর্ব্বত্রই সেই উপদেশ পরিদৃষ্ট হয়। কর্ম্মফলেই যে দেহাদির উৎপত্তি, কামনা-মূলক কর্ম্ম দ্বারাই যে পুনঃপুনঃ জন্ম জরা-মৃত্যুর অধীন হইতে হয়, ঋষভদেবের এই উক্তির প্রতিধ্বনি জৈনশাস্ত্রে কোথায় নাই? জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয় প্রভৃতি কর্ম্মাষ্টকের প্রসঙ্গে এ বিষয় বোধগম্য হয়। আচারাঙ্গ-সূত্রে (ষষ্ঠ অধ্যয়নে, প্রথম উদ্দেশকে) 'ধূত' প্রসঙ্গে কর্ম্মফলে জন্ম-জন্মান্তরে জীব যে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তদ্বিষয় বিশদভাবেই বিবৃত রহিয়াছে। সেখানে বলা হইতেছে,—'অতি-লোভী কচ্ছপ যেমন জলাশয়ের শৈবাল-পত্রাদির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পরিশেষে আর উপরে উঠিতে সমর্থ হয় না; অথবা, শিকড়ের দ্বারা মৃত্তিকার রস গ্রহণ করিতে গিয়া উদ্ভিদ যেমন চলচ্ছক্তি বিহীন হইয়া পড়ে, এমন কি ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতেও তাহাকে নড়াইতে পারে না; মানুষেরও সেই দশা।' * মানুষ যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, সেই পরিবারের প্রতি মমতা তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখে; তাহার ইন্দ্রিয়-সমূহ কামনার প্রাবল্যে কাম্যবস্তুতে আসক্ত হইয়া পড়ে। ফলে, মানুষকে চিরজীবন হাহাকার করিতে হয়। তাহার কর্ম্মরূপ পাপবন্ধনে তাহাকে মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে দেয় না। মানুষ যে বিবিধ পীড়ার যন্ত্রণায় অস্থির হয়, তাহারও কারণ—সেই জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল-ভোগ। পুরুষানুগত ব্যাধি-বিপত্তি—কর্ম্ম-বন্ধনজনিত জন্মগ্রহণের ফল ভিন্ন আর কি হইতে পারে? এবম্বিধ মর্ম্ম-কথাই ঐ অধ্যয়নে 'ধূত' প্রসঙ্গে আলোচিত আছে। ফলতঃ, কর্ম্মফলে দুর্ব্বহ জীবনভার বহন—ঋষভদেবের এই উক্তি—জৈনশাস্ত্রের মেরুদণ্ড স্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তার পর, স্ত্রীলোক-সম্বন্ধে ঋষভদেব যে উপদেশ দিয়াছেন, জৈন-শাস্ত্রের সর্ব্বত্র তাহার প্রতিধ্বনি দেখি। স্ত্রীগণ সম্বন্ধে পুরুষগণকে নানা স্থানে নানা প্রকারে সাবধান করা হইয়াছে। পুরুষ যাহাতে স্ত্রীলোকের সংসর্গ পরিত্যাগ করে, তদ্বিষয়ে উপদেশের অবধি নাই। দুই-একটী দৃষ্টান্ত মাত্র নিম্নে উল্লেখ করিতেছি। সূত্রকৃতাঙ্গে (চতুর্থ অধ্যয়নে) 'স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে জ্ঞান' বিষয়ক একটী প্রসঙ্গ আছে। স্ত্রীগণ কিরূপে মোহজালে পুরুষকে আবদ্ধ করে, দৃষ্টান্তে ও উপমায়—নানারূপে তাহা বিবৃত হইয়াছে। যথা;—'যেমন এক খণ্ড মাংসের প্রলোভন দেখাইয়া দুর্দ্দান্ত নির্ভীক সিংহকে মানুষ জাল-বদ্ধ করে, যতই সতর্ক হউন না কেন, সাধুজনকে সেইরূপ রূপাদির প্রলোভন দেখাইয়া রমণীরা জালে আবদ্ধ করে। তার পর, তাহার দ্বারা সে যদৃচ্ছা কর্ম্ম সম্পন্ন করাইয়া লয়। চক্রযান-নির্ম্মাতা যেমন শনৈঃ শনৈঃ চক্র-বিঘূর্ণন করে, রমণীর দ্বারা তখন পুরুষও সেইরূপ বিঘূর্ণিত

জৈনশাস্ত্রের তুলনায়।

* সূত্রের ভাষায় উপমাটি এইরূপ দৃষ্ট হয়;—"সে বেমি—সে জহাবি কুম্মে, হরএ বিনিবিট্‌ঠচিত্তে পচ্ছন্নপলাসে উম্মগ্‌গং সে ণ লভতি।" (৩৩৬)। "ভংজগা ইব সন্নিবেসং ণো চয়ংতি। এবং এগে অণেগরূবেহিং কুলেহিং জায়া রূবেহিং সত্তা কলুণং থণংতি। নিদাণতো তে ণ লভংতি মোক্‌খং। " (৩৩৭)।"

হয়। জালবদ্ধ মৃগ যেমন বহু চেষ্টা করিয়াও মুক্তিলাভে সমর্থ হয় না, পুরুষেরও তখন সেই দশা ঘটে। বিষমিশ্রিত দুগ্ধ পান করিলে পরিশেষে যেমন অনুশোচনার অন্তর্দাহে দগ্ধীভূত হইতে হয়; রমণীগণের সংসর্গে অতিবিজ্ঞ সাধুকেও পরিশেষে সেইরূপ পরিতাপানলে দগ্ধ হইতে হয়। স্ত্রীলোকের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবে না; তাহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করিবে। কদাচ তাহাদের সহিত সখ্যতা-বন্ধনে আবদ্ধ হইবে না। স্ত্রীলোকের সংসর্গে যে সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা সকল দুঃখের হেতুভূত।' * তার পর, হিন্দুশাস্ত্রের যে সার শিক্ষা,—বেদান্তের যে চরম উপদেশ—সেই আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান, তদ্বিষয়েই বা জৈনশাস্ত্রে কি উপদেশ প্রাপ্ত হই? শ্রীমদ্ভাগবতে ঋষভদেব যাহা বলিয়াছেন, জৈনশাস্ত্রের পত্রে পত্রে তাহারই প্রতিধ্বনি নাই কি? 'আমাকে জানিলেই সকল জানা হইবে।' 'আমার উপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা।'—তীর্থঙ্করগণ সকলেই সেই চরমজ্ঞান-সম্পন্ন ছিলেন। "আত্মাই জ্ঞান।" "জ্ঞানই আত্মা।" †—এ উক্তি আচারাঙ্গ-সূত্রে (পঞ্চম অধ্যয়নে, পঞ্চম উদ্দেশকে) স্পষ্টতঃ দেখিতে পাই। 'কাষ্ঠে যেমন অগ্নি আছে, দুগ্ধে যেমন নবনী আছে, তিলে যেমন তৈল আছে; ইহসংসারে আত্মা সর্ব্বত্র সেইভাবে বিদ্যমান।' ‡ উত্তরাধ্যয়নের (চতুর্দ্দশ অধ্যয়নে) এবম্বিধ উপমাসমূহ কি শিক্ষা প্রদান করিতেছে? এ সকল বিষয় পূর্ব্বেও আলোচনা করিয়াছি। ফলতঃ, কর্ম্মের দ্বারা চিনিতে পারা যায় না; আবার কর্ম্মের দ্বারাই স্বরূপতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। বন্ধনও কর্ম্ম; মুক্তিও কর্ম্ম। কতকগুলি কর্ম্মে বন্ধন অনিবার্য্য; আর কতকগুলি কর্ম্মে মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। সৎকর্ম্মের সৎপরিণতি; অসৎকর্ম্মের অসৎপরিণতি। বিচারপূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া যাও। ফল পুরোভাগে প্রতীক্ষা করিতেছে। জৈনশাস্ত্রেরও ইহা সার উপদেশ।

---

* সূত্রকৃতাঙ্গের মূল অংশের ইংরাজী অনুবাদ; যথা,—

"As men (by baiting) with a piece of flesh a fearless single lion get him into a trap, so women may capture an ascetic though he be careful.

And then they make him do what they like, even as a wheel-wright gradually turns the felly of a wheel.

As an antilope caught in a snare, so he does not get out of it, however he struggles.

Afterwards he will feel remorse like one who has drunk milk mixed with poison ; considering the consequences, a worthy monk should have no intercourse with women."

† সূত্রের ভাষায়, যথা,—"জে আয়া সে বিন্নায়া। জে বিন্নায়া সে আয়া। জেণ বিজাণতি সে আয়া। তং পডুচ্চ পরিসংখায়এ এস আয়াবাদী সণিয়াএ পরিয়াএ বিয়াহিতে—ত্তি বেমি।"

‡ মূলাংশের ইংরাজি অনুবাদ,—

"As fire is produced in the Arani-wood, as butter in milk, and oil in sesamum seed, so, my sons, is the soul produced in the body." &c.

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

স্থবিরগণ।

[গণ ও গণধরগণ,—কুল শাখা গচ্ছ প্রভৃতি ;—চতুর্দ্দশ গণধর স্থবির,—তাঁহাদের শাখা-প্রশাখা ও শিক্ষা-পরম্পরা ;—আর্য্য সুহস্তীনের প্রভাব-প্রতিপত্তি—তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যের ও শাখা-প্রশাখার পরিচয় ;—পঞ্চদশ হইতে উনচত্বারিংশ গণধরের বিবরণ ;—শেষোক্ত কয়েক জন আচার্য্যের বন্দনা-গীতি।]

মহাবীর স্বামীর মহা-নির্ব্বাণলাভের পর, যাঁহারা জৈনসম্প্রদায়ের প্রাণভূত ছিলেন, তাঁহাদের একটা ধারাবাহিক পরিচয় কল্পসূত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভদ্রবাহু, কল্পসূত্র-সঙ্কলন-কালে, মহাবীরস্বামীর গণ ও গণধরগণের পরিচয়ের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সাধারণতঃ 'স্থবির' নামে অভিহিত হন। গণ, কুল, শাখা, গচ্ছ প্রভৃতির উৎপত্তি-তত্ত্ব তাঁহাদের পরিচয়-প্রসঙ্গে অবগত হওয়া যায়। মহাবীর স্বামীর যিনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন শিষ্য ছিলেন, তাঁহার নাম—ইন্দ্রভূতি। তিনি গৌতম-গোত্রজ। পাঁচ শত শ্রমণকে তিনি ধর্ম্ম-শিক্ষা দান করেন। মহাবীর স্বামীর দ্বিতীয় শিষ্য মধ্যবয়স্ক ছিলেন। তাঁহার নাম—অগ্নিভূতি। তিনিও গৌতম-গোত্রজ। তিনিও পাঁচ শত শ্রমণের উপদেষ্টা ছিলেন। মহাবীর স্বামীর তৃতীয় শিষ্য—গৌতম-গোত্রজ বায়ুভূতি। শিষ্যগণের মধ্যে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অল্পবয়স্ক ছিলেন। তিনিও পাঁচ শত শ্রমণের শিক্ষাগুরু বলিয়া পরিচিত। তৎপরে, ভারদ্বাজ-গোত্রজ স্থবির আর্য্যব্যক্ত, অগ্নিবেশ্যায়ন-গোত্রজ স্থবির আর্য্যসুধর্ম্মন্, বাশিষ্ঠ-গোত্রজ স্থবির মণ্ডিকপুত্র, কাশ্যপ-গোত্রজ স্থবির মৌর্য্যপুত্র, বিশেষ প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। ইঁহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত দুই জন, প্রত্যেকে পাচ শত শ্রমণের এবং শেষোক্ত দুই জন প্রত্যেকে আড়াই শত শ্রমণের শিক্ষাগুরু ছিলেন। ইঁহাদের পর গৌতম-গোত্রজ স্থবির অকম্পিত ও হারিতায়ন-গোত্রজ স্থবির অচল-ভ্রাতৃ, উভয়ে একত্রে তিন শত শ্রমণের শিক্ষক ছিলেন, এবং কৌণ্ডিণ্য-গোত্রজ মেতার্য্য ও প্রভাস নামক স্থবিরদ্বয় একত্রে তিন শত শ্রমণকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। ইন্দ্রভূতি হইতে প্রভাস পর্য্যন্ত এগার জন ধর্ম্মোপদেষ্টা মহাবীর স্বামীর একাদশ 'গণধর' নামে অভিহিত হন। আর তাঁহারা যে নয় সম্প্রদায়ের শ্রমণকে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন, সেই নয়টী শ্রমণ-সম্প্রদায় মহাবীর স্বামীর 'গণ' বলিয়া পরিচিত। অন্যান্য জিনগণের গণ ও গণধর সংখ্যা একই রূপ। কিন্তু মহাবীর স্বামীর গণসংখ্যা হইতে গণধর-সংখ্যা দুই জন অধিক। তাহার কারণ এই যে, শেষোক্ত দুই গণ দুই জন হিসাবে চারি জন গণধরের অধিনায়কত্বে পরিচালিত হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত একাদশ গণধর দ্বাদশ অঙ্গশাস্ত্রে, চতুর্দ্দশ পূর্ব্বশাস্ত্রে এবং সমগ্র সিদ্ধান্তশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। এক মাস কাল নির্জ্জল উপবাসী থাকিয়া ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তাঁহারা মহানির্ব্বাণ লাভ করেন। ইন্দ্রভূতি ও আর্য্য-সুধর্ম্মন্ স্থবিরদ্বয় মহাবীরের নির্ব্বাণের পর নির্ব্বাণ-লাভ করিয়াছিলেন। নির্গ্রন্থ শ্রমণগণ সকলেই আর্য্যসুধর্ম্মণের

গণ ও গণধরগণ।

বংশধর; অন্যান্য গণধরগণের কোনও বংশধর ছিল না। সুতরাং আর্য্যসুধর্ম্মণ হইতেই মহাবীর স্বামীর শিষ্য-প্রশিষ্য স্থবিরগণের পর্য্যায় আরম্ভ হইয়াছে; যথা,—

নাম।	গোত্র।
১। আর্য্যসুধর্ম্মন্	অগ্নিবেশ্যায়ন
২। „ জম্বুনামন্	কাশ্যপ
৩। „ প্রভাব	কাত্যায়ন
৪। „ শয্যম্ভ (মানকের পিতা)	বাৎস্য
৫। „ যশোভদ্র	তুঙ্গিকায়ন

স্থবিরগণের নাম সংগ্রহ করিয়া যখন প্রথম লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল, তখন আর্য্য-যশোভদ্রের পরবর্ত্তী নিম্নলিখিত স্থবিরগণের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়; যথা,—

নাম।	গোত্র।
৬। (ক) আর্য্য সম্ভূতবিজয়...	মাথর
(খ) „ ভদ্রবাহু	প্রাচীন
৭। „ স্থূলভদ্র	গৌতম
৮। (ক) „ মহাগিরি	ঐলাপত্য
(খ) „ সুহস্তীন্	বশিষ্ঠ
৯। (ক) „ সুস্থিত (কোতিক)	ব্যাঘ্রাপত্য
(খ) „ সুপ্রতিবুদ্ধ (কাকন্দক)... ...	ঐ
১০। „ ইন্দ্রদত্ত (ইন্দদিন্ন)	কৌশিক
১১। „ দত্ত (দিন্ন)	গৌতম
১২। „ সিংহগিরিজাতিস্মর	কৌশিক
১৩। „ বজ্র	গৌতম
১৪। „ বজ্রসেন	উৎক্রুষ্ঠ

বজ্রসেনের চারি জন শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদের নাম—আর্য্য নাগিল, আর্য্য পদমিল, আর্য্য জয়ন্ত এবং আর্য্য তাপস্। ইঁহাদের প্রত্যেকে এক একটী শাখার প্রবর্ত্তক। ইঁহাদের নাম অনুসারে সেই শাখা-চতুষ্টয়ের নামকরণ হয়। যথা,—আর্য্যনাগিলা শাখা, আর্য্যপদমিলা শাখা, আর্য্য-জয়ন্তী শাখা, আর্য্য-তাপসী শাখা।

স্থবিরগণের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয়-মূলক যে তালিকা সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহা হইতে আর্য্য যশোভদ্রের পরবর্ত্তী স্থবিরগণের শাখা-প্রশাখার ও শিষ্য-প্রশিষ্যের নিম্নলিখিতরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়;—

৬। (ক) মাথর-গোত্রজ আর্য্য সম্ভূতবিজয়ের বার জন শিষ্য ও সাত জন শিষ্যা ছিলেন। শিষ্যগণের নাম—নন্দনভদ্র, উপানন্দ, তিষ্যভদ্র, যশোভদ্র, সুমনোভদ্র, মণিভদ্র, পুণ্যভদ্র, গৌতমগোত্রজ স্থূলভদ্র, ঋজুমতি, জম্বু, দীর্ঘবাহু, পাণ্ডুভদ্র। তাঁহার সাত জন শিষ্যার নাম—যক্ষা, যক্ষদত্তা (যক্ষদিন্না), ভূতা, ভূতদত্তা, ভূতাদিন্না, সেনা (এনা), বেণা, রেণা।

৬। (খ) প্রাচীনগোত্রজ আর্য্য ভদ্রবাহুর কাশ্যপগোত্রজ চারি জন শিষ্য ছিল। তাঁহার প্রথম শিষ্যের নাম—গোদাস; তিনি গোদাস-গণের প্রবর্ত্তক। সেই গণ চারি শাখায় বিভক্ত ছিল;—(১) তাম্রলিপ্তিকা শাখা, (২) কোতিবর্ষীয়া শাখা, (৩) পুণ্ড্রবর্দ্ধনীয়া শাখা, (৪) দাসীখারবতীকা শাখা। আর্য্য ভদ্রবাহুর দ্বিতীয় শিষ্যের নাম—অগ্নিদত্ত; তৃতীয়—জনদত্ত, চতুর্থ—সোমদত্ত।

৮। (ক) ঐলাপত্য-গোত্রজ আর্য্য মহাগিরির আট জন শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদের নাম—(১) উত্তর, (২) বলিসহ; ইঁহারা দুই জনে উত্তরবলিসহ গণ প্রবর্ত্তনা করেন। চারিটি শাখায় সেই গণ বিভক্ত হয়; যথা,—কৌশাম্বিকা, সৌতপ্তিকা (সৌরিতিকা, সোইত্তিয়া), কৌতুম্বিনী (কুণ্ডধারী, কোণ্ডবাণী), চন্দনাগরী (চন্দ্রনাগরী)। (৩) মহাগিরির তৃতীয় শিষ্য—ধনার্দ্ধি (ধণাড্ঢ), (৪) চতুর্থ শিষ্য—শীরদ্ধি বা শ্রীভদ্র (বা সিরিড্ঢি), (৫) পঞ্চম শিষ্য—কোডিণ্য (কোডিন্ন), (৬) ষষ্ঠ—নাগ, (৭) সপ্তম—নাগপুত্র, (৮) অষ্টম—ছালুক রোহগুপ্ত; ইনি কৌশিক গোত্রজ এবং ত্রৈরাশিক শাখার প্রবর্ত্তক।

৮। (খ) বাশিষ্ঠ গোত্রজ আর্য্য সুহস্তীনের বার জন শিষ্য ছিল। তাঁহার প্রথম শিষ্য—আর্য্যরোহণ; তিনি কাশ্যপ-গোত্রজ। তৎকর্ত্তৃক উদ্দেহ 'গণ' প্রবর্ত্তিত হয়। সেই গণ—চারিটী শাখায় এবং ছয়টী কুলে বিভক্ত হইয়াছিল। শাখা-চতুষ্টয়ের নাম;—উদুম্বরিকা (উদুমবাড়ি-জ্জিয়া), মাসপূরিকা, মতিপত্রিকা, পূর্ণপত্রিকা (পুন্নপত্তিয়া)। ছয়টী কুলের নাম;—নাগভূত, সোমভূত, উল্লগচ্ছ (আর্দ্রকচ্ছ), হস্তিলিপ্ত (হত্তিলিজ্জ), নান্দিক (নন্দিজ্জ), পরিহাসক। আর্য্য সুহস্তীনের দ্বিতীয় শিষ্যের নাম—ভদ্রযশস্; তিনি ভারদ্বাজ-গোত্রজ। তৎকর্ত্তৃক উড়ুবাতিক 'গণ' প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই 'গণ' চারি শাখায় ও তিন কুলে বিভক্ত। শাখা চারিটীর নাম;—কম্পীয়িকা (কংপিজ্জিয়া), ভদ্রীয়িকা (ভদ্দিজ্জিয়া), কাকন্দিকা, মেখলীয়িকা (মেহলিজ্জিয়া)। কুল তিনটীর নাম—ভদ্রযক্ষ (ভদ্দজসিয়), ভদ্রগুপ্তিকা, যশোভদ্র (জসভদ্দ)। আর্য্য সুহস্তীনের তৃতীয় শিষ্যের নাম—মেঘ। তাঁহার চতুর্থ শিষ্যের নাম—কামর্দ্ধি (কামিদ্ধি); তিনি কুণ্ডল-গোত্রজ। বেশবাতিক 'গণ' তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই 'গণ' চারিটী শাখায় ও চারিটী কুলে বিভক্ত ছিল। সেই শাখার নাম—শ্রাবস্তিকা, রাজ্যপালিকা, (রাজ্জপালিয়া), অন্তরঞ্জিকা (অন্তরিজ্জিয়া), ক্ষেমলিপ্তিকা (ক্ষেমলিজ্জিয়া)। চারিটী কুল; যথা,—গণিকা, মৈঘিকা, কামরিদ্ধিকা, ইন্দ্রপূরক। সুহস্তীনের পঞ্চম শিষ্যের নাম—'শ্রীগুপ্ত'। তিনি হারিত-গোত্রজ। তৎকর্ত্তৃক চরণ 'গণ' প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই গণ চারি শাখায় ও সাত কুলে বিভক্ত। শাখা-চতুষ্টয়ের নাম—হারিতমালাকারী, সংকাশিকা, গভেধুকা, বজ্রনাগরী। সপ্তকুল; যথা,—বাৎসলীয়া (বাচ্ছলিজ্জা), প্রতিধর্ম্মিকা, হারিদ্রক (হালিজ্জ), পুষ্পমিত্রিক (পুসমিত্তিজ্জা), মাল্যক (মালিজ্জ), আর্য্যচেতক, কৃষ্ণশাখা (কনহসহ)। সুহস্তীনের ষষ্ঠ শিষ্যের নাম—ঋষিগুপ্ত কাকন্দক। তিনি বশিষ্ঠ-গোত্রজ। তৎকর্ত্তৃক 'মানবগণ' প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই 'গণ' চারি শাখায় ও তিন কুলে বিভক্ত। শাখাচতুষ্টয়; যথা,—কাশ্যপীয়া (কাসবিজ্জিয়া), গৌতমীয়া (গোয়মেজ্জিয়া), বাসিষ্টিয়া (বাসিথিয়া), সৌরাষ্ট্রীকা। কুল-ত্রিতয়; যথা,—ঋষিগুপ্তিকা, ঋষিদত্তিকা, অভিযশস্। সুহস্তীনের সপ্তম ও অষ্টম শিষ্যদ্বয়ের—

নাম—সুস্থিত ও সুপ্রতিবুদ্ধ। তাঁহারা যথাক্রমে কৌতিক এবং কাকন্দক নামে পরিচিত। উভয়েই ব্যাঘ্রাপত্য গোত্রজ। উঁহাদের কর্ত্তৃক কৌতিক 'গণ' প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই 'গণ' চারি শাখায় ও চারি কুলে বিভক্ত। শাখা-চতুষ্টয়ের নাম;—উচ্চনাগরী, বিদ্যাধরী, বজ্রী, মধ্যমিকা (মজ্ঝিমিল্লা)। কুল-চতুষ্টয়; যথা,—ব্রহ্মলিপ্তক (বংভালিজ্জ), বাৎসলীয় (বচ্ছলিজ্জ), বাণীয় (বাণিজ্জ), প্রশনবাহনক। সুস্থিত ও সুপ্রতিবদ্ধ স্থবিরদ্বয়ের পাঁচ জন শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদের নাম;—(১) আর্য্য ইন্দ্রদত্ত (ইন্দদিন্ন); ইনি কাশ্যপ গোত্রজ ছিলেন; (২) প্রিয়গন্থ; ইনি মধ্যমা-শাখা প্রবর্ত্তক; (৩) বিদ্যাধর গোপাল; ইনি কাশ্যপ-গোত্রজ এবং বিদ্যাধরী শাখার প্রবর্ত্তক; (৪) ঋষিদত্ত; (৫) অর্হৎদত্ত (অরিহাদত্ত)। সুহস্তীন্ হইতে এইরূপ বহু কুলের ও শাখার উৎপত্তি হইয়াছিল। জৈনধর্ম্মের বিস্তার-পক্ষে সুহস্তীনের প্রতিষ্ঠার অবধি নাই। রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের পৌত্র ও উত্তরাধিকারী সম্প্রাতি তাঁহারই কর্ত্তৃক জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সুহস্তীনের অভ্যুদয়কালে জৈনধর্ম্মের প্রভাব সর্ব্বতোভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

সুহস্তীনের শিষ্যশাখার পর, গৌতম-গোত্রজ আর্য্যদত্তের শিষ্যশাখার বিষয় উল্লিখিত হয়। তিনি একাদশ পর্য্যায়ে অবস্থিত। তাঁহার দুই শিষ্য ছিল। প্রথম শিষ্য—আর্য্য শান্তিসেনিক; তিনি মাথর-গোত্রজ। তৎকর্ত্তৃক 'উচ্চনাগরী' শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার চারি জন শিষ্য ছিল। সেই শিষ্য-চতুষ্টয়ের—(১) আর্য্যসেনিক হইতে আর্য্যসেনিকা শাখা, (২) আর্য্যতাপস হইতে আর্য্যতাপসী শাখা, (৩) আর্য্যকুবের হইতে আর্য্যকুবেরা শাখা এবং (৪) আর্য্যঋষিপালিত হইতে আর্য্যঋষিপালিতা শাখা প্রবর্ত্তিত হয়। আর্য্যদত্তের দ্বিতীয় শিষ্যের নাম—আর্য্যসিংহগিরি জাতিস্মর; তিনি গৌতমগোত্রজ। তাঁহারও চারিটী শিষ্য ছিল;—(১) ধনগিরি, (২) ব্রহ্মদীপিকা শাখা প্রবর্ত্তক গৌতম-গোত্রজ আর্য্যসমিত, (৩) আর্য্যবজ্র-শাখার প্রবর্ত্তক গৌতম-গোত্রজ আর্য্যবজ্র, (৪) অর্হদ্দত্ত (অরিহদিন্ন)। মহাবীর স্বামীর শিষ্য সুধর্ম্মন হইতে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের একটী পর্য্যায় নির্দ্দিষ্ট আছে। সুধর্ম্মণাচার্য্য হইতে আর্য্য বজ্রসেন পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ স্থবির সেই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।* তদনুসারে আর্য্যদত্ত আর্য্য-শান্তিসেনিক, ধনগিরি এবং আর্য্য বজ্রসেন যথাক্রমে একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ পর্য্যায়ে পরিগণিত। আর্য্য বজ্রসেন কর্ত্তৃক আর্য্যনাগিলা শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার সহযোগী আর্য্য পদ্ম কর্ত্তৃক আর্য্যপদ্মাশাখা এবং বাৎসগোত্রজ আর্য্য রথ কর্ত্তৃক আর্য্য জয়ন্তী শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।† এইরূপে সুধর্ম্মণাচার্য্য হইতে দেবর্দ্ধি পর্য্যন্ত (কল্পসূত্র লিপিবদ্ধ হওয়া পর্য্যন্ত) মোট ৩৯ জন প্রধান আচার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব্বে চতুর্দ্দশ পর্য্যায় পর্য্যন্তের নাম-পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে পঞ্চদশ পর্য্যায়

পরবর্ত্তী স্থবিরগণ।

---

* এই চতুর্দ্দশ স্থবিরের নাম ও গোত্রের বিষয় ১২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† আর্য্য পদ্ম এবং আর্য্য রথ ইঁহারা দুই জন আর্য্য বজ্রসেনের শিষ্য ছিলেন বলিয়া এবং ইঁহারা অন্য নামেও পরিচিত বলিয়া বোধ হয়। কেন-না, আর্য্যজয়ন্তী শাখার প্রবর্ত্তক আর্য্য জয়ন্ত নামও দেখিতে পাই এবং আর্য্য পদমীল কর্ত্তৃক আর্য্যপদমিলা শাখায় প্রবর্ত্তনার বিষয় অবগত হই।

(আর্য্য পুষ্যগিরি) হইতে ঊনচত্বারিংশ পর্য্যায় (ক্ষমাশ্রমণ দেবর্দ্ধি) পর্য্যন্ত যে সকল স্থবিরের নাম ও গোত্র-পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল। যথা,—

স্থবিরের নাম।				গোত্র।
১৫। আর্য্য পুষ্যগিরি	...	...	...	কৌশিক
১৬। " ফল্গুমিত্র	...	...	...	গৌতম
১৭। " ধনগিরি	...	...	...	বাশিষ্ঠ
১৮। " শিবভূতি	...	...	...	কৌৎস
১৯। " ভদ্র	...	...	...	কাশ্যপ
২০। " নক্ষত্র	...	...	...	কাশ্যপ
২১। " রক্ষ	...	...	...	কাশ্যপ
২২। " নাগ	...	...	...	গৌতম
২৩। " জেহিল	...	...	...	বাশিষ্ঠ
২৪। " বিষ্ণু	...	...	...	মাথর
২৫। " কালক	...	...	...	গৌতম
২৬। " সম্পলিত ও ভদ্র		...	...	গৌতম
২৭। " বৃদ্ধ	...	...	...	গৌতম
২৮। " সঙ্ঘপালিত	...	...	...	গৌতম
২৯। " হস্তীন্	...	...	...	কাশ্যপ
৩০। " ধর্ম্ম	...	...	...	সুব্রত
৩১। " সিংহ	...	...	...	কাশ্যপ
৩২। " ধর্ম্ম	...	...	...	কাশ্যপ
৩৩। " শাণ্ডিল্য *	...	...	...	...
৩৪। " জম্বু	...	...	...	গৌতম
৩৫। " নন্দিত	...	...	...	কাশ্যপ
৩৬। " ক্ষমাশ্রমণ দেশিগাণিন		...	...	কাশ্যপ
৩৭। " স্থিরগুপ্ত	...	...	...	বাৎস
৩৮। " ধর্ম্ম (কুমার)	...	...	...	...
৩৯। " ক্ষমাশ্রমণ দেবর্দ্ধি	...	...	...	কাশ্যপ

কল্পসূত্রে স্থবিরগণের নাম-পরিচয়ের উপসংহারে স্থবিরগণের একটী বন্দনা আছে। সেই বন্দনা গাথাকারে গ্রথিত। ষোড়শ-পর্য্যায়ভুক্ত স্থবির ফল্গুমিত্র হইতে ঊনচত্বারিংশ পর্য্যায়ভুক্ত স্থবির দেবর্দ্ধির বন্দনা সেই গাথায় গ্রথিত আছে। গাথাটি চতুর্দ্দশ শ্লোকে

* জেকবীর অনুবাদে প্রকাশ,—১৭শ হইতে ৩৩শ পর্য্যন্ত আচার্য্যদিগের নাম কোনও কোনও পুঁথিতে পাওয়া যায় নাই। তিনি আরও বলেন,—এই শাণ্ডিল্যই বল্লবীদিগের প্রতিযোগী মথুরার সঙ্ঘের প্রধান আচার্য্য 'স্কন্দিল' হওয়া সম্ভব।

নিবদ্ধ। প্রাচীন গাথায় প্রাকৃত ভাষায় কোন্ নাম কোন্ গোত্র কি ভাবে উচ্চারিত হইয়াছে, তাহার পরিচয় সেই গাথায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। গাথাটি এই; যথা,—

বংদামি ফগ্গুমিত্তং, চ গোয়মং ধণগিরিং চ বাসিট্ঠং।
কুচ্ছং সিবভূইংপিয়, কোসিয় দুজ্জংতকণ্হে অ॥ ১।
তে বংদিউণ সিরসা, ভদ্দং বংদামি কাসবসগুত্তং।
নক্খং কাসবগুত্তং, রক্খংপিয় কাসবং বংদে॥ ২।
বংদামি অজ্জনাগং, চ গোয়মং জেহিলং চ বাসিট্ঠং।
বিণ্হু মাঢরগুত্তং, কালগমবি গোয়মং বংদে॥ ৩।
গোয়মগুত্তকুমারং, সংপলিয়ং তহয় ভদ্দয়ং বংদে।
থেরং চ অজ্জবুড্ঢং, গোয়মগুত্তং নমংসামি॥ ৪।
তং বংদিউণ সিরসা, থিরসত্তচরিত্ত নাণসংপন্নং।
থেরং চ সংঘবালিয়, গোয়মগুত্তং পণিবয়ামি॥ ৫।
বংদামি অজ্জহত্থিং, চ কাসবং খংতিসাগরং ধীরং।
গিম্হাণ পঢমমাসে, কালগয়ং চেব সুদ্ধস্স॥ ৬।
বংদামি অজ্জধম্মং, চ সুব্বয়ং সীললদ্ধিসংপন্নং।
জস্স নিক্খমণে দেবী, ছত্তং বরমুত্তমং বহই॥ ৭।
হত্থিং কাসবগুত্তং, থম্মং সিবসাহগং পণিবয়ামি।
সীহং কাসবগুত্তং, ধম্মংপিয় কাসবং বংদে॥ ৮।
তং বংদিউণ সিরসা, থিরসত্তচরিত্তনাণসংপন্নং।
থেরং চ অজ্জজংবু, গোয়মগুত্তং নমংসামি॥ ৯। *
মিউমদ্দবসংপন্নং, উবউত্ত নাণদংসণচরিত্তে।
থেরং চ নংদিয়ংপিয়, কাসবগুত্তং পণিবয়ামি॥ ১০।
তত্তো য থিরচরিত্তং, উত্তমসম্মত্তসত্তসজুত্তং।
দেবড্ঢিগণিখমাসমণং, মাঢরগুত্তং নমংসামি॥ ১১।
তত্তো অণুওধরং, ধীরং মইসাগরং মহাসত্তং।
থিরগুত্তখমাসমণ, বচ্ছসগুত্তং পণিবয়ামি॥ ১২।
তত্তো য নাণদংসন—চরিত্ততবসুট্ঠিয়ং গুণমহংতং।
থেরং কুমারধম্মং বংদামি গণিং গুণোবেয়ং॥ ১৩।
সুত্ত্থরয়ণভরিএ, খমদমমদ্দবগুণেহিং সংপন্নে।
দেবিড্ঢিখমাসমণে, কাসবগুত্তে পণিবয়ামি॥ ১৪।

---

* জেকবীর গ্রন্থে নবম শ্লোক হইতে চতুর্দ্দশ শ্লোকের অনুবাদ মাত্র আছে। তিনি বলেন,—ঐ সকল গাথায় প্রধান প্রধান আচার্য্যগণের স্তব দৃষ্ট হয়; নবম শ্লোকের জম্বু দ্বিতীয় পর্য্যায়ের জম্বুনামনকেই বুঝাইতেছে। কিন্তু মূল দেখিয়া তাহা মনে হয় না। ষোড়শ আচার্য্য হইতে উনচত্বারিংশ আচার্য্যের স্তবই উহাতে প্রকটিত দেখি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিবিধ বিদ্যা।

[জৈনধর্ম্মের অভ্যুদয়ে আধ্যাত্মিক উন্নতি,—আধুনিক সভ্য-সমাজের ন্যায় তাৎকালিক সমাজের আচার-ব্যবহার প্রভৃতির নিদর্শন ;—রাজসভার বিবরণ ও রাজার দৈনন্দিন কার্য্যাবলী ;—উদ্ভিদের ও মনুষ্যের সাদৃশ্য-তত্ত্ব—জ্ঞানোন্নতির নিদর্শন ;—বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি লাভ,—দ্বিসপ্ততি বিজ্ঞান ও চতুঃষষ্টি কলা-বিদ্যার বিবরণ ;—ঋষভপুত্রগণ ;—দূর-অতীতে বঙ্গদেশের ও বাঙ্গালী জাতির প্রতিষ্ঠা-পরিচয়।]

আধ্যাত্মিক উন্নতি।

ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাসে জৈনধর্ম্ম একটী প্রসিদ্ধ পরিচ্ছেদ। কি রাজনৈতিক, কি সমাজনৈতিক, কি ধর্ম্মনৈতিক—ভারতবর্ষের সর্ব্ববিধ উন্নতির নিদর্শন জৈনধর্ম্মের অভ্যুদয়-কালে পরিলক্ষিত হয়। ত্যাগের আদর্শ মনুষ্য ভুলিতে বসিয়াছিল; কামনা-মূলক কর্ম্মকাণ্ডের শাখা-পল্লবে চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছিল; জৈনধর্ম্ম সেই কর্ম্মের মূলোচ্ছেদে প্রবৃত্ত হন। অনাসক্ত আকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্য ভাবে জৈনধর্ম্ম তখন যে কর্ম্মানুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করিতে প্রযত্নপর হইয়াছিল, তদ্দ্বারা কর্ম্ম-মূল সর্ব্বতোভাবে উৎপাটিত হইতে চলিয়াছিল। মহাবীর স্বামীর প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইয়া জৈন-যতিগণ ত্যাগ-স্বীকারের (নিষ্কাম-কর্ম্মের) যে সকল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া যান, তাহা যে মনুষ্যের ধর্ম্মোৎকর্ষ-সাধনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ—তাহাতে সংশয় নাই। সর্ব্বজীবে সমদর্শনের ভাব—জৈনধর্ম্মের যাহা সারভূত শিক্ষা, এই সময়েই স্ফূর্ত্তি-লাভ করিয়াছিল। সর্ব্বত্র জীব-দর্শন, আর জীব-হিতে জীবন-নিয়োগ,—জৈনধর্ম্মের যে প্রধান শিক্ষা, আধ্যাত্মিক উন্নতির যে চরম নিদর্শন, তাহার নিকট পৃথিবীর সকল নীতিবিদ্‌গণের মস্তক অবনত হইয়া আছে।

সভ্য-সমাজের নিদর্শন।

জৈনধর্ম্মের অভ্যুদয়ে মানুষের যেমন আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তেমনই সমাজের বহিরঙ্গের শ্রী-সম্পৎ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মহাবীর স্বামীর পিতা রাজা সিদ্ধার্থের দৈনন্দিন কর্ম্মকাহিনীর বিষয় স্মরণ করিলে, আধুনিক বিংশ শতাব্দীর সভ্য-সমুন্নত রাজপুরুষের চিত্র মানসপটে প্রতিভাত হয়। প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া তিনি যে ভাবে স্নানাহার ব্যায়ামাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন, তদ্বিবরণ পাঠ করিলে, তাহা আধুনিক নৃপতিগণের দৈনন্দিন কর্ম্মের সহিত সম্পূর্ণ সাদৃশ্য-সম্পন্ন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। অপিচ, তদ্দ্বারা তৎকালের রাজ-সভা, রাজ-অট্টালিকা এবং রাজ-পারিষদগণের বেশ একটা জীবন্ত চিত্র প্রত্যক্ষীভূত হইতে পারে। কল্পসূত্রে (৬০—৬২ সূত্রে) এতৎসংক্রান্ত যে বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তাহা এই ;—

"তএণং সিদ্ধথে খত্তিএ কল্লং পাউপ্পভায়াএ রয়ণীএ ফুল্লুপ্পলকমলকোমলুম্মীলিয়ংমি অহাপংডুরে পভাএ, রত্তাসোগপ্পগাসকিংসুঅসুঅমুহগুংজদ্ধরাগবংধুজীবগপারাবয়চলণ-নয়ণ পরহুঅসুরত্তলোঅজাসুঅণকুসুমরাসিহিংগুলণিঅরাতিরেঅরেহংত সরিসে কমলায়-রসংডবোহএ উট্ঠিঅংমি সূরে সহস্সরস্সিংমি দিণয়রে তেঅসা জলংতে, তস্স য

করপহরাপরদ্ধংমি অংধয়ারে বালায়বকুংকুমেণং খচিঅ ব্ব জীবলোএ, সয়ণিজ্জাও অব্ভুট্ঠেই ॥ ৬০ ॥ অব্ভুট্ঠিত্তা পায়পীঢাও পচ্চোরুহই পচ্চোরুহিত্তা জেণেব অট্টণসালা তেণেব উবাগচ্ছই উবাগচ্ছিত্তা অট্টণসালং অণুপবিসই, অণুপবিসিত্তা অণেগবায়ামজোগবগ্গণবামদ্দণমল্লজুদ্ধকরণেহিং সংতে পরিস্সংতে সয়পাগসহস্সপাগেহিং সুগংধবরতিল্লমাইএহিং পীণণিজ্জেহিং ময়ণিজ্জেহিং বিংহণিজ্জেহিং দপ্পণিজ্জেহিং সব্বিংদিয়গায়পল্হায়ণিজ্জেহিং অব্ভংগিএ সমাণে তিল্লচম্মংসি নিউণেহিং পডিপুণ্ণপাণিপায়সুকুমালকোমলতলেহিং পুরিসেহিং অব্ভংগণপরিমদ্দণুব্বলণকরণগুণনিম্মাএহিং ছেএহিং দক্খেহিং পট্ঠেহিং কুসলেহিং মেহাবীহিং জিঅপরিস্সমেহিং অট্ঠিসুহাএ মংসসুহাএ তয়াসুহাএ রোমসুহাএ চউব্বিহাএ সুহপরিকম্মণাএ সংবাহণাএ সংবাহিএ সমাণে অবগয়পরিস্সমে অট্টণসালাও পডিণিক্খমই ॥ ৬১ ॥ পডিনিক্খমিত্তা জেণেব মজ্জণঘরে তেণেব উবাগচ্ছই, উবাগচ্ছিত্তা মজ্জণঘরং অণুপবিসই অণুপবিসিত্তা সমুত্তজালাকুলাভিরামে বিচিত্তমণিরয়ণকুট্টিমতলে রমণিজ্জে ণ্হাণমংডবসি নাণামণিরয়ণভত্তিচিত্তংসি ণ্হাণপীঢংসি সুহনিসণ্ণে পুপ্ফোদএহি অ গংধোদএহি অ উণ্হোদএহি অ সুহোদএহি অ সুদ্ধোদএহি অ, কল্লাণকরণপবরমজ্জণবিহীএ মজ্জিএ, তত্থ কোউঅসএহিং বহুবিহেহিং কল্লাণগপরমজ্জাণাবসাণে পম্হলসুকুমালগংধকাসাইঅলূহিঅংগেঅহয়সুমহগ্ঘদূসরয়ণসুসংবুডে সরসসুরভিগোসীসচংদণাণুলিত্তগত্তে সুইমালাবণ্ণগবিলেবণে আবিদ্ধমণিসুবণ্ণে কপ্পিয়হারদ্ধহারতিসরয়পালংবপালংবমাণকডিসুত্তসুকয়সোভে পিণদ্ধগেবিজ্জে অংগুলিজ্জগললিয়কয়াভরণে বরকডগতুডিঅথংভিঅভুএ অহিঅরূবসস্সিরীএকুংডলউজ্জোইআণণে মউডদিত্তসিরএ হারোত্থয়সুকয়রইঅবচ্ছে মুদ্দিআপিংগলংগুলীএ পালংবপলংবমাণসুকয়পডউত্তরিজ্জে নাণামণিকণগরয়ণবিমলমহরিহণিউণোবচিঅমিসিমিসিংতবিরইঅসুসিলিট্ঠবিসিট্ঠলট্ঠআবিদ্ধবীরবলয়ে, কিংবহুনা? কপ্পরুক্খএ চেব অলংকিঅবিভূসিএ নরিংদে, সকোরিংটমল্লদামেণং ছত্তেণং ধরিজ্জমাণেণং সেঅবরচামরাহিং উদ্ধুব্বমানীহিং মংগলজয়সদ্দকয়ালীএ অণেগগণনাগগদংডনায়গরাঈসরতলবরমাডংবিঅকোডংবিঅমংতিমহামংতিগণগদোবারিয়অমচ্চচেডপীঢমদ্দনগরনিগমসিট্ঠিসেনাবইসত্থবাহদূঅসংধিবাল সদ্ধিং সংপরিবুডে ধবলমহামেহনিগ্গএ ইব গহগণদিপ্পংতরিক্খতারাগণাণ মজ্ঝো সসিব্ব পিঅদংসণে নরবই নরিংদে নরবসহে নরসীহে অব্ভহিঅরায়তেঅলচ্ছীএ দিপ্পমাণে মজ্জণধরাও পডিণিক্খমই। ৬২ ॥"

মর্ম্মার্থ,—'নিশাবসানে অরুণোদয়ে প্রস্ফুট কমলদল বিকাশ পাইল। দিনদেব, অশোক-পুষ্পের ন্যায়, প্রস্ফুট কিংশুকের ন্যায়, তোতাপক্ষীর চঞ্চুর ন্যায়, অথবা গুঞ্জার্দ্ধের ন্যায়, রক্তমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। ক্রমশঃ সে মূর্ত্তি বন্ধুজীব পুষ্পের ন্যায়, পারাবতের চক্ষুর ও চরণের ন্যায়, কোকিলের রক্তচক্ষুপ্রায়, গোলাপ-স্তবকের অথবা সিন্দূরের ন্যায়, প্রগাঢ় হরিদ্রাভ রক্তবর্ণ প্রাপ্ত হইল। অতঃপর, সহস্র কিরণজাল বিস্তার করিয়া উজ্জ্বলতায় দিক উদ্ভাসিত করিয়া কমল-স্তবক-সমূহকে জাগ্রৎ করিয়া সূর্য্যদেব উদিত হইলেন। দিনদেব উদিত হইয়া আপন কিরণজাল-বিস্তারে অন্ধকারকে বিদূরিত করিলে, জীব-জগৎ জাগ্রৎ হইল।

রাজা সিদ্ধার্থ শয্যা ত্যাগ করিয়া নিম্নে অবতরণ করিলেন। প্রাসাদের একাংশে ব্যায়াম-গৃহ ছিল। তিনি সেখানে গমন করিলেন। তথায় নানাপ্রকার স্বাস্থ্যপ্রদ ব্যায়ামক্রীড়ায় নিযুক্ত হইলেন। উল্লম্ফন, অঙ্গমোড়ন, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি বিবিধ ব্যায়াম-ক্রীড়া চলিতে লাগিল। ব্যায়াম-ক্রীড়ায় দেহে ক্লান্তি উপস্থিত হইলে, পরিচারকগণ গাত্র-মর্দ্দনে প্রবৃত্ত হইল। শতপাক সহস্রপাক তৈল—শত ও সহস্র বনস্পতির ও ভেষজের সংযোগে প্রস্তুত হইয়াছিল। সে তৈল পুষ্টিকর, সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক, শক্তিপ্রদ, সদ্গন্ধযুক্ত এবং ইন্দ্রিয়ের ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিপুষ্টিসাধক। তৈলসিক্ত চর্ম্মাসনে উপবেশনপূর্ব্বক এই তৈল-মর্দ্দন-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। দক্ষ ও চতুর তৈলমর্দ্দকগণ সেই তৈলমর্দ্দন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিল। যাহাতে শরীরের ক্লেশ অপগত হয়, অথচ অস্থি মাংস চর্ম্ম কেশ প্রভৃতি দৃঢ় ও সৌন্দর্য্যসম্পন্ন হয়, তৈলমর্দ্দকগণ তেমনই কৌশলক্রমে মর্দ্দন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে লাগিল। অতঃপর ব্যায়াম-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া রাজা সিদ্ধার্থ স্নানাগারে প্রবেশ করিলেন। সেই অতিমনোহর আনন্দপ্রদ স্নানাগার মুক্তাখচিত বহুবর্ণবিশিষ্ট কাচের বাতায়ন-সমূহে সুশোভিত ছিল। স্নানাগারের তলদেশ নানাবিধ মূল্যবান প্রস্তরে গ্রথিত হইয়াছিল। জহরতাদিখচিত বহুমূল্য প্রস্তরে নির্ম্মিত এক আসনে উপবেশনপূর্ব্বক সিদ্ধার্থ স্নানক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। যে জলে তাঁহাকে স্নান করান হইল, সে জল নানাবিধ পুষ্পে ও গন্ধদ্রব্যে সুগন্ধীকৃত ছিল। বিশুদ্ধ পবিত্র জল এবং উষ্ণ জল উভয়ই স্নানাগারে রক্ষিত থাকিত। যে ভাবে স্নান করিলে স্বাস্থ্য বৃদ্ধি পায়, ভৃত্যগণ তেমনই ভাবে তাঁহাকে স্নান করাইল। আনন্দের সহিত স্নানক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, সদ্গন্ধযুক্ত উত্তম বস্ত্রের দ্বারা গাত্রমোক্ষণপূর্ব্বক তিনি বস্ত্র-পরিবর্ত্তন করিলেন। বহুমূল্য নূতন বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক 'গোশীর্ষ' ও চন্দন প্রভৃতির সদ্গন্ধে এবং পুষ্পমাল্যে ভূষিত হইলেন। অতঃপর মণিমুক্তা-জহরতাদিখচিত বহুমূল্য অলঙ্কারসমূহ তাঁহার অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করিল। গলদেশে মুক্তার মালা দোদুল্যমান হইল। করে কঙ্কণ বলয় শোভা পাইল। করাঙ্গুলি অঙ্গুরীয়ক-দ্যুতিতে দ্যুতিমান হইল। এইরূপে বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হইয়া তিনি দরবার-গৃহে গমন করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তখন, জয়ধ্বনিতে দিক নিনাদিত হইল। দুই পার্শ্বে দুই জন রাজকর্ম্মচারী শ্বেত চামর লইয়া ব্যজন করিতে আরম্ভ করিল। রাজা সিদ্ধার্থকে বেষ্টন করিয়া, মন্ত্রী, মহামন্ত্রী, সেনাপতি, সিপাহী, অমাত্য, দাস, ব্যবসায়ী, সার্থবাহ, জ্যোতিষী, সন্ধিপাল (বৈদেশিক দূত) এবং বিশিষ্ট নাগরিকগণ পদমর্য্যাদা অনুসারে আপন আপন আসন গ্রহণ করিলেন। যেন নক্ষত্রবেষ্টিত চন্দ্রমার ন্যায় সেই নরসিংহ নৃপতি সিংহাসনে শোভমান রহিলেন। রাজা সিদ্ধার্থ পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট ছিলেন। দরবার-গৃহের উত্তর-পূর্ব্ব অংশে আটখানি স্বতন্ত্র আসন স্থাপিত হয়। মূল্যবান বস্ত্রাদিতে সেই আসনগুলি সুসজ্জিত ছিল। সেই আসন-গুলির অনতিদূরে অন্দরের দিকে পর্দ্দার অন্তরালে রাজ্ঞীর বসিবার আসন নির্দ্দিষ্ট থাকে। সে আসন বহুমূল্য প্রস্তরে বিনির্ম্মিত ও জহরতাদি-বিখচিত ছিল। যেখানে সে আসন প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই কক্ষটি নানা বিচিত্র চিত্র-সমন্বিত কোমল মসৃণ বস্ত্রসমূহে সুসজ্জিত হয়। সেই সকল চিত্রের মধ্যে সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, অশ্ব, সর্প, পক্ষী, মনুষ্য, মৃগ, বৃক্ষ, গুল্ম

প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি বিশেষ চিত্তাকর্ষক।" ইত্যাদি। উপরি উক্ত বর্ণনায় আমরা ব্যায়ামগৃহ, স্নানাগার, সুগন্ধি তৈল, অলঙ্কার, সিংহাসন, রাজসভা প্রভৃতির যে বিবরণ প্রাপ্ত হই, তাহা যে সভ্য-সমুন্নত সমাজের চিত্রপট, তদ্বিষয়ে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না। সিদ্ধান্তগ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছিল—কতকাল পূর্ব্বে, আর তাহাতে বর্ণিত আছে—আরও কতকাল পূর্ব্বের ঘটনা! এখন যে সকল আচার-পদ্ধতিকে আদর্শ সুসভ্য সমাজের আচার বলিয়া মনে করি, তখনও সেই সকল আচার-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল,—পূর্ব্বোক্ত বর্ণনায় তাহা বোধগম্য হয় না কি?

আরও তখন—সে দূর অতীতকালে—বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞান যে স্ফূর্ত্তি-লাভ করিয়াছিল, জৈনশাস্ত্র-সমূহে তাহারই কি অল্প নিদর্শন পাই! উদ্ভিদের জীবন ও সংজ্ঞা বিষয়ক অভিজ্ঞতা বিজ্ঞান-জগতে এখন যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। কিন্তু এই অভিজ্ঞতার প্রমাণ জৈনশাস্ত্রের পত্রে পত্রে দেদীপ্যমান। মানুষের ন্যায় উদ্ভিদের সংজ্ঞা আছে; মানুষের ন্যায় উদ্ভিদগণ জন্ম-জরা-মরণের অধীন; মানুষের ন্যায় উদ্ভিদের আহার্য্যগ্রহণ ও শ্বাস-প্রশ্বাস পরিত্যাগ প্রভৃতি জীবনী-শক্তির পরিচয়-জ্ঞাপক উক্তি—জৈনশাস্ত্রের নানা স্থানে দেখিতে পাই। একটী দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

মানুষে ও উদ্ভিদে।

"সে বেমি,—ইমংপি জাইধম্ময়ং, এয়ংপি জাইধম্ময়ং; ইমংপি বুড্‌ঢিধম্ময়ং, এয়ংপি বুড্‌ঢিধম্ময়ং; ইমংপি চিত্তমংতয়ং, এয়ংপি চিত্তমংতয়ং; ইমংপি ছিন্নং মিলাতি, এয়ংপি ছিন্নং মিলাতি; ইমংপি আহারগং, এয়ংপি আহারগং; ইমংপি অণিচ্চয়ং, এয়ংপি অণিচ্চয়ং; ইমংপি অসাসয়ং, এয়ংপি অসাসয়ং; ইমংপি চওবচইয়ং এয়ংপি চওবচইয়ং; ইমংপি বিপরিণামধম্ময়ং, এয়ংপি বিপরিণামধম্ময়ং।"

অর্থাৎ,—'মনুষ্য যেমন জন্মধর্ম্মের অধীন, বৃক্ষাদিও সেইরূপ জন্মধর্ম্মের অধীন। মনুষ্যের যেমন বুদ্ধিধর্ম্ম আছে, বৃক্ষাদিরও সেইরূপ বুদ্ধিধর্ম্ম আছে। মনুষ্য যেমন চিত্তমন্ত, বৃক্ষাদিও সেইরূপ চিত্তমন্ত। মানুষের কোনও অঙ্গ ছিন্ন করিলে সে যেমন ব্যথিত ও ম্লান হয়, বৃক্ষকে ছিন্ন করিলে সেও তদ্রূপ ম্লান হইয়া পড়ে। মনুষ্যের যেমন খাদ্যের আবশ্যক, বৃক্ষাদিরও সেইরূপ খাদ্যের আবশ্যক। মনুষ্যের দেহ যেমন অনিশ্চিত, ক্ষয়ধর্ম্মশীল; বৃক্ষাদিরও দেহ সেইরূপ অনিত্য, ক্ষয়ধর্ম্মশীল। মনুষ্য যেমন চিরস্থায়ী নয়, বৃক্ষও সেইরূপ চিরস্থায়ী নয়। মনুষ্য যেমন পরিবর্দ্ধনশীল, বৃক্ষও সেইরূপ পরিবর্দ্ধনশীল। মনুষ্য যেমন পরিণাম-ধর্ম্মশীল, বৃক্ষও তদ্রূপ পরিণাম-ধর্ম্মশীল।'

জৈনধর্ম্ম যখন প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিল, তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ পরিপুষ্টি-লাভ করিয়াছিল। জ্যোতিষ-বিজ্ঞান তখন প্রসিদ্ধিলাভ করে; গণিত-বিজ্ঞানে তখন অনেকের পারদর্শিতা পরিলক্ষিত হয়। শিল্পবিজ্ঞান তখন শত বিভাগে স্ফূর্ত্তিলাভ করে। রমণীগণ পর্য্যন্ত তখন বিবিধ বিদ্যায় যশস্বিনী হন। রমণীগণের জ্ঞানোন্নতির প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রত্যেক জিনের আবির্ভাব-কালে প্রত্যক্ষীভূত হয়। সাধ্বীগণ বহুসংখ্যক রমণীর অধিনেত্রী ছিলেন। সে নেতৃত্ব তাঁহাদের জ্ঞানোন্নতির এবং কর্ত্তৃত্ব-শক্তির প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। ঋষভদেবের জীবনবৃত্ত

জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি।

আলোচনায় দেখিয়াছি, তখন দ্বিসপ্ততি বিজ্ঞান স্ফূর্তিলাভ করিয়াছিল; আর তখন রমণীগণ চতুঃষষ্টি কলা-বিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন। সেই দ্বিসপ্ততি বিজ্ঞানই বা কি, আর সেই চতুঃষষ্টি কলা-বিদ্যাই বা কি? যদি অনুসন্ধান করিয়া দেখি, তাহা হইলে কি বুঝিতে পারি? জৈনশাস্ত্রের টীকাকারগণ সেই দ্বি-সপ্ততি বিজ্ঞান সম্বন্ধে এবং রমণীগণের অধিগত সেই চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। সেই দ্বিসপ্ততি বিজ্ঞান; যথা,—

'লেখন, গণিত, গীত, নৃত্য, বাদ্য, পঠন, শিক্ষা, জ্যোতিষ, ছন্দ, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, নিরুক্তি, কাব্য, কাত্যায়ন, নিঘণ্টু, গজারোহণ, অশ্বারোহণ, শাস্ত্রাভ্যাস, রস, মন্ত্র, যন্ত্র, বিষ, খনিকর্ম্ম, গন্ধবাদ, প্রাকৃত, সংস্কৃত, পৈশাচিক, অপভ্রংশ, স্মৃতি, পুরাণ, বিধি, সিদ্ধান্ত, তর্ক, বৈদ্যক, বেদ, আগম, সংহিতা, ইতিহাস, সামুদ্রিক বিজ্ঞান, আচার্য্য-বিদ্যা, রসায়ন, কপট বিদ্যানুবাদ, দর্শন, সংস্কার, ধূর্ত্ত, সঞ্চয়, মণিকর্ম্ম, তরু-চিকিৎসা, খেচরী কলা, অমরী কলা, ইন্দ্রজাল, পিশাচসিদ্ধি, রসবত্তা, পঙ্কক, সর্ব্ব-করণী, প্রাসাদ-লক্ষণ, পণ, চিত্রোপল, লেপ, চর্ম্মকর্ম্ম, পত্রচ্ছেদ, নখচ্ছেদ, পত্র-পরীক্ষা, বশীকরণ, কাষ্ঠঘটন, দেশভাষা, গারুড়, যোগাঙ্গ, ধাতুকর্ম্ম, কেবলবিধি, শকুন রুত।'

যদিও টীকাকারের ঐ ব্যাখ্যায় সর্ব্ববিধ বিজ্ঞানের স্বরূপ-পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তথাপি বিবিধ বিদ্যায় দেশের উন্নতির বেশ একটা আভাষ পাওয়া যায়। রমণীগণের অধিগত যে চৌষট্টি কলাবিদ্যা (টীকাকারগণের ব্যাখ্যাক্রমে) তাহারও কিঞ্চিৎ আভাষ দিতেছি। তাহাতেও বুঝা যাইবে, রমণীগণ তখন কত গুণে গুণান্বিতা ছিলেন। রমণীগণের আয়ত্তাধীন সেই চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যার পরিচয় এইরূপ পাওয়া যায়; যথা,—

'নৃত্য, ঔচিত্য, চিত্রবাদিত্র, মন্ত্র, তন্ত্র, ধনবৃষ্টি, কলাকৃষ্টি, সংস্কৃতবাণী, ক্রিয়াকল্প, জ্ঞান, বিজ্ঞান, দম্ভ, জলস্তম্ভগীত, তাল, আকৃতি-গোপন, আরাম-রোপণ, কাব্যশক্তি, বক্রোক্তি, নরলক্ষণ, গজপরীক্ষা, অশ্বপরীক্ষা, বাস্তুশুদ্ধি, লঘুবুদ্ধি, শকুনবিচার, ধর্ম্মাচার, অঞ্জনযোগ, চূর্ণযোগ, গৃহধর্ম্ম, সুপ্রসাদনকর্ম্ম, সোণাসিদ্ধি, বর্ণিকাবৃদ্ধি, বাক্‌পটুতা, করলাঘব, ললিতচরণ, তৈলসুরভিকরণ, ভৃত্যোপচার, গৃহাচার, ব্যাকরণ, পরনিরাকরণ, বীণাবাদ, বিতণ্ডাবাদ, অঙ্কস্থিতি, জনাচার, কুম্ভভ্রম, সারিশ্রম, রত্নমণিভেদ, লিপিপরিচ্ছেদ, বৈদ্যক্রিয়া, কামাবিষ্করণ, রসসঞ্চরণ, শবংধ, শালীখণ্ডম্, মুখমণ্ডন, কথা-কথন, কুসুম-গ্রন্থন, বরবেশ, সর্ব্বভাষাবোধ, বাণিজ্য, ভোজ্য, অভিধান পরিজ্ঞান, যথাস্থান ভূষণ-ধারণ, অন্ত্যাক্ষরিকা ও প্রহেলিকা।'

বলা বাহুল্য, এই চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যার অনেকগুলিই এখন প্রহেলিকাময়। এইরূপ প্রহেলিকাময়—তৎকাল-প্রচলিত অষ্টাদশ লিপির অন্তর্গত বহু লিপি। লিপি-সমূহের নাম,—

"হংস, ভূত, যক্ষ, রাক্ষস, উড্ডি, যাবনী, তুরকী, কীরী, দ্রাবিড়ী,
সৈন্ধবী, মালবী, বড়ী, নাগরী, ভাটী, পারসী, অনিমিত্তি, মূল দেবী।"

ইহার অনেক লিপির মর্ম্ম এখন অনুধাবন করাই কঠিন। ঋষভদেব এক ব্রাহ্মী কুমারীকে অষ্টাদশ লিপি এবং গণিত শিখাইয়াছিলেন। আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরতকে তিনি কাষ্ঠকর্ম্ম শিক্ষা দেন এবং বলিপুরুষলক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত করিয়াছিলেন। বিদ্যায় ও বিজ্ঞানে তখন

দেশ যেমন উন্নত ছিল, রাজৈশ্বর্য্যও তেমনই সৌভাগ্যশালী হইয়াছিল। আপন শত পুত্রকে ঋষভদেব আপন রাজ্য বিভাগ করিয়া দেন। তাহাতে কোন্ কোন্ দেশে তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত ছিল, বুঝিতে পারি। জৈনশাস্ত্রে ঋষভদেবের শতপুত্রের নাম এইরূপ দৃষ্ট হয়;—

"ভরত, বাহুবলী, শঙ্খ, বিশ্বকর্ম্মা, বিমল, সুলক্ষণ, অমল, চিত্রাঙ্গ, খ্যাতকীর্ত্তি, বরদত্ত, সাগর, যশোধর, অমর, রথবর, কামদেব, ধ্রুব, বৎসনন্দ, সুর, সুনন্দ, কুরু, অঙ্গ, বঙ্গ, কৌশল, বীর, কলিঙ্গ, মাগধ, বিদেহ, সঙ্গম, দশার্ণ, গম্ভীর, বসুবর্ম্মা, সুবর্ম্মা, রাষ্ট্র, সৌরাষ্ট্র, সুযশা, যশঃকীর্ত্তি, বুদ্ধিকর, বিবিধিকর, যশস্কর, কীর্ত্তিকর, সুরণ, ব্রহ্মসেন, বিক্রান্ত, নরোত্তম, পুরুষোত্তম, চন্দ্রসেন, মহাসেন, নভসেন, ভানু, সুকান্ত, পুষ্পযুত, শ্রীধর, দুর্দর্শ, সুসুমার, দুর্জ্জয়, অজয়মান, সুধর্ম্মা, ধর্ম্মসেন, আনন্দ, নন্দ, অপরাজিত, বিশ্বসেন, হরিষেণ, জয়, বিজয়, বিজয়ন্ত, প্রভাকর, অরিদমন, মান, মহাবাহু, দীর্ঘবাহু, মেঘ, সুঘোষ, বিশ্ব, বরাহ, সুসেন, সেনাপতি, কুঞ্জরবল, জয়দেব, নাগদত্ত, কাশ্যপ, বল, বীর, শুভমতি, সুমতি, পদ্মনাভ, সিংহ, সুজাতি, সঞ্জয়, সুনাম, মরুদেব, চিত্তহর, সরবর, দৃঢ়রথ, প্রভঞ্জন।"

বলা বাহুল্য, গণনায় এক শত নাম মিলিল না। কতকগুলি নামকে বিশেষণ বলিয়াও মনে হইল। কয়েকটী নাম সন্ধিসূত্রে অন্যের সহিত মিশিয়া থাকা অসম্ভব নহে।* যাহা হউক, এই সকল নাম হইতে এবং এতৎপ্রসঙ্গে যে যে দেশের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে দূর-দূরান্তরে রাজ্য-সীমা বিস্তারের বিষয় মনে আসিতে পারে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের তো কথাই নাই; চীন, মহাচীন এবং মধ্যএসিয়া পর্য্যন্ত যে তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল, সে বিভাগে তাহা বুঝিতে পারা যায়। বঙ্গদেশের এবং বাঙ্গালী-জাতির আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য এক শ্রেণীর পণ্ডিতের যে প্রয়াস দেখা যায়, ঋষভদেবের ইতিবৃত্ত অনুশীলন করিলে, তাঁহাদের সে প্রযত্ন ব্যর্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। তাঁহার এক পুত্রের নাম—বঙ্গ, এবং তিনি বাঙ্গালী বলিয়া পরিচিত। সে প্রাচীনকালে বঙ্গ এবং বাঙ্গালী এইরূপ উল্লেখ দৃষ্টে বঙ্গদেশের আধুনিকত্বের যুক্তি-পরম্পরা অবশ্যই উড়াইয়া দেওয়া যায়। অপিচ, বঙ্গদেশের প্রাচীন গৌরব-বিভবের স্মৃতি নয়নপথে প্রতিভাত হয়। যাহা হউক, জৈনধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের সময়, বহু দেশের বহু জাতির সহিত সম্বন্ধ-সংশ্রবের এবং বিবিধ বিদ্যায় উৎকর্ষের প্রমাণ জৈনশাস্ত্রের নানা স্থানেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই বলিয়াছি, জৈনধর্ম্ম—ভারতের উন্নতির একটী প্রধান স্তর।

---

* জ্যেষ্ঠপুত্র ভরতের নাম এবং আর দুই একটী নাম ভিন্ন অন্যান্য নামের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত ঋষভ-পুত্রগণের নামের মিল নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে ঋষভদেবের পুত্রদিগের নাম-সম্বন্ধে লিখিত আছে,—'জ্যেষ্ঠ-পুত্র ভরত। তাঁহার নাম অনুসারে ভারতবর্ষ নামের উৎপত্তি। তাঁহার অন্যান্য পুত্রের মধ্যে,—কুশাবর্ত্ত, ইলাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত, মলয়কেতু, ভদ্রসেন, ইন্দ্রস্পৃক, বিদর্ভ, কীকট—এই নয়টি প্রধান। ইঁহারা ভরতের অনুগত ছিলেন। তৎপরবর্ত্তী কবি, হরি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, অবিহোত্র, দ্রবিড়, চমস, করভাজন—ইঁহারা পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। এই সকলের কনিষ্ঠ একাশীতি পুত্রেরা পিত্রাজ্ঞা-পালক, বিনয়ান্বিত, যজ্ঞবান্ ও বিশুদ্ধ-কর্ম্মশীল ছিলেন।'—শ্রীমদ্ভাগবত, পঞ্চম স্কন্ধ, অষ্টম অধ্যায়।

নবম পরিচ্ছেদ।

জৈন-ধর্ম্মনীতি।

[জৈনশাস্ত্র সন্নীতির ভাণ্ডার,—প্রকৃত মুনি কাহাকে বলে, বন্ধনই বা কি—তাহার বিবরণ ;—প্রকৃত জ্ঞানী ও বীর,—তাঁহাদের কর্ম্মলক্ষণ ;—রমণী-সংসর্গ পরিত্যাগ-বিষয়ে জৈনশাস্ত্রের কঠোর আদেশ ;—সম্যকত্ব-লাভের উপায়-পরম্পরা ;—মোক্ষলাভ-সম্বন্ধে কঠোর বিধিবিধান ;—বিমুক্ত কোন্ জন ;—বিবিধ নীতিকথা।]

সন্নীতি-সদাচার শিক্ষাদান-সম্বন্ধে জৈনশাস্ত্রে অমূল্য উপদেশ-পরম্পরা দৃষ্ট হয়। জৈন-যতিগণের প্রতিপাল্য বিধি-বিধান যেমন কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধ্য, জৈনশাস্ত্রের নীতি-সমূহও সেইরূপ মর্ম্মভেদী শিক্ষামূলক। জৈনশাস্ত্র মানুষের প্রতি পদক্ষেপে মানুষকে পাপের পথে অগ্রসর হওয়া সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিতেছেন। কঠোর ত্যাগ-শিক্ষাই যেন জৈনধর্ম্মের মেরুদণ্ডস্থানীয়। জৈনশাস্ত্রের যে অংশই অধ্যয়ন করি না কেন, সর্ব্বত্রই বন্ধন-ছেদনের অস্ত্র প্রাপ্ত হই। কর্ম্মবন্ধনই জীবকে পুনঃপুনঃ জন্ম-জরা-মৃত্যুর অধীন করিয়া রাখিয়াছে। সে অধীনতার কবল হইতে কি প্রকারে মুক্তিলাভ সম্ভবপর? সে বন্ধন ছিন্ন করার প্রধান অস্ত্র কি আছে? তদ্বিষয়ে জৈনশাস্ত্র বড় এক সুন্দর উপদেশ দিয়াছেন ; বলিয়াছেন,—'প্রথমে আত্মপদার্থবিচার ও কর্ম্মবন্ধ-হেতু-বিচার কর ; যদি আত্মপদার্থ উপলব্ধি হয়, আর যদি কর্ম্ম-বন্ধনের কারণ-পরম্পরা অধিগত হয়, তাহা হইলে সে কারণ-মূল ছিন্ন করিবার চেষ্টা আসে। সেই চেষ্টাই অস্ত্র-স্বরূপ।' সত্যের ধারণা, আর অসত্যের পরিবর্জ্জন,—ইহাই সেই অস্ত্র। ভগবান তাই বলিয়াছেন,—'ইহজীবনে সম্মান-বৃদ্ধির জন্য, গৌরব-বৃদ্ধির জন্য অথবা জাঁকজমক দেখাইবার জন্য, যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয় ; জন্ম-হেতু, মৃত্যু-হেতু অথবা মুক্তি-হেতু আমরা যাহা কিছু আকাঙ্ক্ষা করি ; অপিচ, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক দুঃখ-দূরীকরণের জন্য যে কোনও প্রযত্ন মানুষের দেখিতে পাই ; তাহা সকলই পাপের মূলীভূত। এই বিষয় বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়া এই সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে। যিনি পাপের এবম্বিধ কারণ-পরম্পরা অনুধাবন করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং তৎসমুদায়কে দূরীভূত করিয়াছেন, অর্থাৎ অসত্যের পরিহারে যিনি সত্যের আশ্রয় লইতে পারিয়াছেন, তাঁহাকেই প্রকৃত 'মুনি' (জ্ঞানী) বলিয়া জানিবে।' এ সম্বন্ধে মহাবীর স্বামীর উপদেশ এই,—

জৈনশাস্ত্র সন্নীতির ভাণ্ডার।

"ইমস্‌সচেব জীবিয়স্‌স পরিবংদণমাণণপূয়ণাএ,
জাইমরণমোয়ণাএ, দুক্‌খ পড়িধায়হেউং। ৭।
এয়াবংতি সব্বাবংতি লোগংসি কম্মসমারংভা পরিজাণিয়ব্বা ভবংতি। ৮।
জস্‌সেতে লোগংসি কম্মসমারংভা পরিন্নায়া ভবংতি,
সে হু মুনী ত্তি বেমি। ৯।"

এই সত্যজ্ঞান সদ্‌জ্ঞান কিরূপে সঞ্জাত হয়, এক্ষণে তৎসম্বন্ধে কি উপদেশ প্রাপ্ত হই—দেখা দেখা যাউক। জৈনমতে,—সাধারণভাবে সকল পদার্থেরই প্রাণ আছে; সুতরাং কোনও পদার্থেই অস্ত্রাঘাত করা কর্ত্তব্য নহে। অন্ধজনের হস্ত পদ বা কোনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছেদন করিলে, সে তাহা দেখিতে পায় না বটে; কিন্তু অঙ্গ-ছেদনের যন্ত্রণা তাহার সম্পূর্ণ অনুভূত হয়। সেইরূপ উদ্ভিদাদির প্রতি অস্ত্রাঘাত-জনিত যন্ত্রণা মানুষের দৃষ্টিগোচর হইতে না পারে; কিন্তু যাহাদের প্রতি অস্ত্রাঘাত করা হয়, তাহারা মর্ম্মে মর্ম্মে সে যন্ত্রণা অনুভব করে। যিনি জ্ঞানী ব্যক্তি, তিনি সে যন্ত্রণার বিষয় নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেন। * যিনি গৈরিক বসন পরিধান করিয়া গৃহত্যাগী হইয়াছেন, তাঁহাকেই লোকে সাধারণতঃ সন্ন্যাসী বলিয়া সম্মান করেন; কিন্তু প্রকৃত সন্ন্যাসী কাহাকে কহে? প্রকৃত সংসার-ত্যাগীই বা কোন্ জন? জৈন-শাস্ত্র বলিতেছেন,—'সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী তাঁহাকেই বলি,—যিনি সৎকর্ম্মে মতিমান্, যিনি পবিত্র-চরিত্র, আর যিনি অকপট ও সরল।' † ফলতঃ, সংসার-ত্যাগ ত্যাগ নহে; গুণ বা বিষয়ে আসক্তি ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। বিষয়ই আবর্ত্ত; সেই আবর্ত্তে পড়িয়াই মানুষ হাবুডুবু খাইতেছে। গুণ বা বিষয়—বন্ধনের মূলস্বরূপ। গুণ বা বিষয়ের দ্বারা মানুষ আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। যিনি গুণ বা বিষয়ের বাসনায় অভিভূত, তাঁহার কষ্টের কখনও শেষ নাই। তিনি মনে করেন,—তাঁহার পিতা আছে, মাতা আছে, ভাই আছে, ভগ্নী আছে, স্ত্রী আছে, পুত্র আছে, কন্যা আছে, পুত্রবধূ আছে, বন্ধু-বান্ধব আছে, নিকট-আত্মীয় ও দূর-আত্মীয় আছে। এইরূপ, বিত্ত-সম্পত্তি-লাভের প্রতি, অসন-বসন প্রভৃতি কত বিষয়ের প্রতি—মানুষের চিত্ত দিবারাত্রি আকৃষ্ট। তৎসমুদায় রক্ষার জন্য মানুষ কত না পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে! তাহারই ফলে, মানুষকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে। জৈনশাস্ত্র তাই তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন,—'গুণ জান, গুণ ত্যাগ কর।'

সন্ন্যাসী বা মুনি কে?

"জে গুণে, সে আবট্টে। জে আবট্টে, সে গুণে।" ‡
"জে গুণে, সে মূলট্টাণে। জে মূলট্টাণে, সে গুণে।" ¶
"ইতি সে গুণট্টি মহতা পরিয়াবেণং বসে পমত্তে।" §

যেখানে বিষয় (গুণ), সেখানেই আসক্তি। বিষয়-ত্যাগ বলিতে, আসক্তি-ত্যাগই বুঝাইয়া থাকে। বাহ্যভাবে লৌকিক দৃষ্টিতে বিষয়-সঙ্গ ত্যাগ করিলে, বিষয় ত্যাগ করা হয় না। বিষয়ের প্রতি আসক্তি-ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। সেই আসক্তি-ত্যাগেরই অপর নাম—অরতি। জ্ঞানী বলি কাহাকে?—না, বিষয়ে যাঁহার অরতি জন্মিয়াছে। মুক্তি-লাভের অধিকারী হন—কোন

* আচারাঙ্গ সূত্র, প্রথম অধ্যায়ন, দ্বিতীয় উদ্দেশ, পঞ্চদশ সূত্র,—"সে বেমি—অপ্পেগে অংধ মব্‌ভে. অপ্পেগে অংধ মচ্ছে" ; ইত্যাদি।

† জৈনশাস্ত্রের উক্তি ; যথা,—"সে বেমি, সে জহাবী অণগারে উজ্জুকডে, ণিয়াগপডিবন্নে, অমায়ংকুব্বমাণে, বিয়াহিতে জাএ সদ্ধাএ ণিক্‌খংতে তমেব মণু পালিজ্জা বিজহিত্তা বিসোতিয়ং।"

‡ "Quality is the whirlpool (Avatta—Sansara), and the whirlpool is quality."

¶ "Quality is the seat of the root and the seat of the root is quality."

§ "He who longs for the qualities, is overcome by great pain and he is careless."

জন?—না, বিষয়ে যাঁহার অরতি জন্মিয়াছে, অর্থাৎ আসক্তি নাই। জৈনশাস্ত্রের নির্দ্দেশ তাই,—

"অরইং আউট্টে সে মেহাবী; খণংসি মুক্কে।"

অর্থাৎ,—'যাঁহার সংযম-শিক্ষা হইয়াছে; বিষয়ের প্রতি যাঁহার অরতি জন্মিয়াছে; তিনিই মেধাবী বুদ্ধিমান্ পুরুষ; তিনিই অল্পকাল মধ্যে মুক্তিলাভের অধিকারী হন।' অপিচ, 'অলোভের দ্বারা যিনি লোভকে পরাজয় করিয়াছেন, লব্ধমান্ সুখ-ভোগেও যাঁহার অরতি জন্মিয়াছে, লোভকে নির্ম্মূল করিয়া যিনি কর্ম্মরহিত হইতে পারিয়াছেন, সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী নিষ্কাম জনই প্রকৃত সন্ন্যাসী-পদবাচ্য; মুক্তি তাঁহারই অধিগত।' জৈনশাস্ত্র তারস্বরে কহিতেছেন;—

"বিমুত্তা হু তে জণা:, জে জণা পরিগামিণো লোভং অলোভেণ দুগংছমাণে লদ্ধে কামে নাভিগাহই, বিণাবি লোভং নিক্খম্ম এস অকম্মে জাণতি পাসতি। পডিলেহাএ ণাবকংখতি, এস অণগারেত্তি বুচ্চতি।" *

সংযমই সর্ব্বমূলাধার। যিনি সংযমী, মূলতত্ত্ব তাঁহারই অধিগত। অপিচ, যিনি মূলতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার আত্মদর্শন লাভ হইয়াছে,—তাঁহার আর কোনও নূতন শিক্ষার আবশ্যক করে না;—"উদ্দেসো পাসগস্স নত্থি।" একবার একস্থানে নহে, এ উক্তি পুনঃপুনঃ বিঘোষিত হইয়াছে। পরমার্থদর্শী মুনি যিনি, তাঁহার আর কি শিক্ষা অবশিষ্ট আছে?

প্রকৃত জ্ঞানী ও বীর।

যিনি অমুনি—অজ্ঞানী, তিনি চির-নিদ্রিত রহিয়াছেন। যিনি মুনি—জ্ঞানী, তিনি চির-জাগ্রৎ আছেন। ইহসংসারে অজ্ঞানতাই দুঃখের মূলীভূত; তদ্দ্বারাই সর্ব্ববিধ অনিষ্ট সংসাধিত হইতেছে। জ্ঞানিগণ দুঃখের মূল কারণ অবগত আছেন বলিয়াই কখনও দুষ্কর্ম্মে রত নহেন। যাহারা ভ্রান্ত, অসংযত, তাহারা দুঃখের মূলীভূত কর্ম্মের বিষয় অবগত হইয়াও, সে কর্ম্মে বিরত হইতে পারে না; সুতরাং পুনঃপুনঃ জন্ম-জরা-মরণের ক্লেশভোগে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু যিনি সুবুদ্ধি-সম্পন্ন, শব্দ বর্ণ প্রভৃতির পাশ ছিন্ন করিয়া, কামকে (মারকে) অবহেলা করিয়া, তিনি মুক্তি-পথের পথিক হন। এ বিষয়ে জৈনশাস্ত্রের এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়; যথা,—

"সুত্তা অমুনী সয়া। মুণিণো সয়া জাগরংতি।
লোয়ংসি জাণ অহিয়াঅ দুক্খং।
সময়ং লোগস্স জাণিত্তা এত্থ সত্থোবরএ।"

যে পুরুষ প্রকৃতরূপে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন; যিনি আত্মদর্শী জ্ঞানী এবং সংসার-বিষয়ে সত্যজ্ঞান-সম্পন্ন, অর্থাৎ সংসারকে যথার্থরূপে চিনিতে পারিয়াছেন; মুনি তাঁহাকেই বলে,—মুক্তি তাঁহারই অধিগত। শব্দ গন্ধ রূপ রস

---

* "Those who are freed (from attachment to the world and its pleasures), reach the opposite shore (Moksha—final liberation). Subduing desire by desirelessness, he does not enjoy pleasures that offer themselves. Desireless, giving up the world, and ceasing to act, he knows, and sees, and has no wishes because of his discernment; he is called houseless."

স্পর্শের স্বরূপ-তত্ত্ব না বুঝিয়া যাহারা কর্ম্ম করে, তাহাদের দুঃখের অবধি থাকে না। যথা,—

"আরংভজং দুক্খ মিণংতি ণচ্চা, মায়ী পমাঈ পুনরেই গব্ভং।
উবেহমাণে সদ্দরূবেসু অংজু, মারাভিসংকী মরণা পমুচ্চতি॥"

দুঃখ কি, জানিতে হইবে; দুঃখের কারণ কি, বুঝিতে হইবে। তার পর, বীরের ন্যায় দুঃখকে জয় করিতে হইবে,—দুঃখের কারণ পরিহার করিতে হইবে। বীর কাহাকে বলে? বীর তিনি—যিনি নিরানন্দ জয় করিয়া চির-আনন্দময় আছেন! বীর তিনি—যিনি কামনা জয় করিয়া নিষ্কাম হইয়াছেন! বীর তিনি—যিনি সুষুপ্তিকে জয় করিয়া চির-জাগ্রৎ রহিয়াছেন! বীর তিনি—শব্দ গন্ধ রূপ রস স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াকর্ষক কোনও পদার্থে যিনি আকৃষ্টচিত্ত নহেন। বীর তিনি—যিনি ক্রোধ ও অহঙ্কারকে জয় করিয়াছেন। বীর তিনি—যিনি লোভকে কামনাকে নিরয়-কারণ বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছেন! আর বীর তিনি—যিনি প্রাণিহত্যা-কার্য্যে বিরত থাকিয়া দুঃখকে বিনাশপূর্ব্বক নির্ব্বাণ-পথের পথিক হইয়াছেন; অর্থাৎ, প্রাণীকে বিনষ্ট না করিয়া দুঃখকে বিনষ্ট করাই বীরের লক্ষণ।

"কোহাইমাণং হণিয়ায় বীরে, লোভস্স পাসে নিরয়ং মহংতং;
তম্হায় বীরে বিরতে বহাও, ছিংদিজ্জ সোয়ং লহুভূয় গামী।
গংথং পরিন্নায় ইহজ্জ বীরে, সোয়ং পরিন্নায় চরিজ্জ দংতে;
উম্মজ্জ লদ্ধুং ইহ মাণবেহিং, ণো পাণিণো পাণ সমারভেজ্জসি।" *

বীর যিনি, তিনি বন্ধন কি, তাহা জানেন; দুঃখ কি, তাহাও অবগত আছেন। দুঃখ ও দুঃখের কারণ, বন্ধন ও বন্ধনের হেতু, অবগত থাকিয়া, বীর যিনি, তিনি সংযম-সাধনার প্রভাবে উচ্চগতি প্রাপ্ত হন। যিনি মনুষ্য-জয়ী, তিনি বীর নহেন; যিনি রাষ্ট্র-বিজয়ী, তিনিও বীর নহেন; যিনি ক্রোধজয়ী, যিনি মান-জয়ী, যিনি লোভ-জয়ী, যিনি মোহ-জয়ী—তিনিই প্রকৃত বীর। ক্রোধ হইতে মান, মান হইতে মায়া; মায়া হইতে লোভ, লোভ হইতে অনুরাগ; অনুরাগ হইতে দ্বেষ, দ্বেষ হইতেই মোহ জন্মে। মোহ হইতেই অনুভূতি (গর্ভ-সঞ্চার); তাহা হইতেই জন্ম, জন্ম হইতেই মৃত্যু; মৃত্যু হইতেই নরক। নরকের ফল জীবদেহ; জীবদেহই দুঃখের নিলয়। যিনি একের অনুবর্ত্তন করেন, তাঁহাকে ক্রমে ক্রমে সকলগুলিরই অনুবর্ত্তী হইতে হয়। জ্ঞানিজন এইজন্য ক্রোধ মান মায়া লোভ রাগ দ্বেষ মোহ দূর করিয়া গর্ভ জন্ম মরণ নরকগতি জীবজন্ম ও দুঃখের কবল

---

* "And the hero should conquer wrath and pride,
Look at the great hell (as the place) for greed.
Therefore the hero abstaining from killing,
Should destroy sorrow, going the road of easiness.
Here now the hero, knowing the bondage,
Knowing sorrow, should restrain himself.
Having risen to birth among men,
He should not take the life of living beings.

হইতে নিষ্কৃতিলাভ করেন। এ বিষয়ে জৈন-শাস্ত্রে এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়; যথা,—

"জে এগং ণামে সে বহু ণামে, জে বহু ণামে সে এগং নামে।...সে মেহাবী অভিণি-বট্টেজ্জা কোহংচ মাণংচ মায়ংচ লোহংচ পেজ্জংচ দোসং চ মোহং চ গব্ভং চ মরণং চ পরগং চ তিরিয়ং চ দুক্‌খং চ এয়ং পাসগস্‌স দংসণং উবরয়সত্থস্‌ পলিয়ংতকরস্‌স।"

যাঁহারা সংসারের মোহে আকৃষ্ট, তাঁহারা পুনঃপুনঃ সংসারেই প্রবিষ্ট হন; জন্ম-জরা-মৃত্যুর ক্লেশভোগ করেন;—"সমেমাণা পলেণাণা পুণো পুণো জাতিং পকপ্পংতি।" যাঁহারা সংসারকে চিনিতে পারিয়াছেন, কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন; তাঁহারাই—"কুম্মুণো সফলত দট্টুং তও ণিজ্জতি বেয়ংবি"—কর্ম্মমাত্রকে ফলপ্রসূ বুঝিয়া শাস্ত্রজ্ঞান অনুসারে কর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন।

সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা মোহনীয় সামগ্রী—রমণী। রমণীই সংসার-বন্ধনের প্রধান কারণ। জৈনশাস্ত্র তাই পুনঃপুনঃ রমণী-সংসর্গ-রূপ প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। জৈনধর্ম্মশাস্ত্রের যে অংশই অনুশীলন করি না কেন, সেখানেই রমণী-সংসর্গ সম্বন্ধে কঠোর বিধি-বিধান দেখিতে পাই। এ বিষয় পূর্ব্বেও কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে নীতিপ্রসঙ্গেও অল্প-বিস্তর আলোচনা করিতেছি। আচারাঙ্গসূত্রে স্পষ্টতঃ উপদেশ আছে,—মুক্তি-অভিলাষী পুরুষ কখনও রমণীর সহিত বাক্যালাপ করিবেন না, কখনও রমণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন না, কখনও কোনও রমণীকে আপনার আত্মীয় জ্ঞান করিবেন না, কখনও তাহাদের কোনও কার্য্য মাত্র সম্পন্ন করিবেন না। এইরূপে বাক্যে ও মনে সংযত হইতে পারিলে, পাপ পরিত্যক্ত হইবে; আর তদ্দারা জ্ঞানি-পর্য্যায়ভুক্ত হওয়া যাইবে। রমণী হইতে চিত্ত সর্ব্বতোভাবে অপসৃত করা প্রয়োজন। রমণী-সংসর্গে যে সুখ, সে সুখ প্রাপ্তির পক্ষে দুঃখ আছে; আবার সে সুখ প্রাপ্ত হওয়ার পরও বিপত্তি আছে। নরকাদি যন্ত্রণাভোগ—সে সুখেরই পরিণতি। সাধুগণ তাই বলিয়াছেন,—"এস সে পরমারামে জাও লোগং-সিইখিও।" রমণী-সংসর্গ-সুখের অগ্র-পশ্চাৎ যে দুঃখময়, জৈনশাস্ত্র একটী উপমায় এইরূপে তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন;—"পুব্বং দংডা পচ্ছা ফাসা, পুব্বং ফাসা পচ্ছা দংডা।" রমণী প্রতি চিত্ত যেন কদাচ আসক্ত না হয়। রমণী-সংসর্গে সুখ-দুঃখ অগ্রপশ্চাৎ ওতঃপ্রোত-ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। অগ্রে দুঃখ পরে সুখ, অগ্রে সুখ পরে দুঃখ,—এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছে। নির্ম্মল সুখ সে সংসর্গে কদাচ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সে সংসর্গে দুঃখ থাকিবেই থাকিবে;—সে দুঃখ কখনও পরিহার করিতে পারিবে না। এ বিষয়ে আরও বলা হইয়াছে;—

রমণী-সংসর্গ পরিত্যাজ্য।

"আসং চ ছংদং চ বিগিং চ ধীরে। ১।
তুমং চেব তং শল্লমাইট্টু। ২।
জে সিয়া, তেণ ণো সিয়া। ৩।
ইণমেব ণাববুজ্ঝংতি, জে জণা মোহপাউডা। ৪।
থীলোভপব্বহিএ তে ভো বয়ংতি—'এয়াইং আয়তণাইং।' ৫।
সে দুক্‌খাএ, মোহাএ, মারাএ, ণরগাএ, ণরগতিরিক্‌খাএ। ৬।

সন্ততং মূঢে ধম্মং নাভিজানতি।
উদাহু বীরে,—'অপ্পমাদো মহমোহে।' ৮।

অর্থাৎ—'হে ধীর পুরুষ! বিষয়ের প্রতি আশা ও লালসা পরিহার কর। ১। যে আশা-রূপ শল্য হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া আছে; তাহাকে উৎখাত কর। ২। ভোগাভোগের মোহে যে আবদ্ধ, সে কখনও প্রকৃত সুখের অধিকারী হয় না। ৩। যে প্রাণী মোহঘোরে অন্ধ, সে কদাচ এ তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ নহে। ৪। যাহারা রমণীর মোহে আসক্ত, তাহারাই বলিয়া থাকে,—'স্ত্রীগণ সুখের তরনীস্বরূপ।' ৫। কিন্তু রমণীই দুঃখের মোহের মরণের নরকের এবং তির্য্যগাদি গতির হেতুভূত। ৬। মূঢ়জন এ ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত নহে। ৭। মহাবীর প্রভু তাই বলিয়াছেন—'সে মহামোহে কদাচ মগ্ন হইও না। ৮।' সূত্রকৃতাঙ্গের চতুর্থ অধ্যয়নে রমণী-সংসর্গ-বিষয়ে আরও কঠোর উপদেশ আছে। যাঁহারা ধর্ম্মব্রত গ্রহণ করিবেন; তাঁহারা পিতামাতাকে পরিত্যাগ করিবেন; স্ত্রীর সহিত সম্বন্ধ-রক্ষা তো দূরের কথা, কন্যার বা পুত্রবধূর পর্য্যন্তের সহিত সাক্ষাৎ আলাপ তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। যাঁহারা শ্রমণ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও স্ত্রী-সংসর্গ করেন, তাঁহারা বলাৎকারের অপরাধী বলিয়া গণ্য হন। তাঁহাদের হস্ত-পদ কাটিয়া ফেলিবার এবং গাত্রের মাংস-চর্ম্ম ছিন্ন করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবার বিধি পর্য্যন্ত বিহিত আছে। নাসিকা, কর্ণ ও জিহ্বা ছেদন করিয়া সেই সকল নরপিশাচগণের ক্ষতস্থানে জ্বলন্ত দ্রাবক প্রদান করার বিধি পর্য্যন্ত সূত্রকৃতাঙ্গ দৃষ্ট হয়। মন্বাদি সংহিতা-শাস্ত্রেও পরদার-গ্রহণ প্রভৃতি পাপ সম্বন্ধে এবম্বিধ কঠোর অনুশাসন বিহিত আছে। ভর্ত্তৃহরির 'বৈরাগ্যশতক' প্রভৃতিতে রমণী-জাতির প্রতি যে বিদ্বেষভাব পরিদৃষ্ট হয়, জৈনশাস্ত্রের অনেক স্থানেই সেই ভাব প্রকট দেখি। নীতি-শিক্ষার পক্ষে, নৈতিক চরিত্রোন্নতি-সাধন বিষয়ে, এবম্বিধ শিক্ষার যে মূল্য আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। তবে, পুরুষ যে সমাজ-শরীরের অঙ্গস্বরূপ, রমণীও যে সেই সমাজ-শরীরের অঙ্গস্বরূপিণী, কোনও শাস্ত্রই তাহা অস্বীকার করেন নাই। যত কিছু কঠিন-কঠোর বিধি-বিধান, সে কেবল ব্যভিচার-দমনের উদ্দেশ্যে—নৈতিক চরিত্র সংরক্ষণের শুভসঙ্কল্প মাত্র। সদাচার, সচ্চারিত্র্য প্রভৃতি সৎগুণাবলিসম্পন্ন না হইলে, সৎপদ লাভ হইবে কি প্রকারে? সত্ত্বগুণের অধিকারী না হইলে, সৎ-অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পঞ্চভূতাত্মক দেহ, জল বায়ু মৃত্তিকা প্রভৃতিতে পরিণত হইতে না পারিলে, ভূতসমূহের সহিত মিশিয়া অভিন্নত্ব লাভ করিতে পারে না। এক্ষেত্রেও তাহাই বুঝিতে হইবে। সত্ত্বভাবময় না হইলে, মানুষ সৎস্বরূপে বিলীন হইবে কি প্রকারে?

চিত্তস্থৈর্য্য।

সকল শাস্ত্রই তারস্বরে বলিতেছেন,—চিত্ত-স্থৈর্য্য ভিন্ন গত্যন্তর নাই। যাহার চিত্ত স্থির নহে, সে কখনও সমাধির অধিকারী হয় না। আমাদের শাস্ত্র-গ্রন্থ কি ভাবে কত প্রকারে এ কথা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, চিত্তস্থৈর্য্যবিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন, প্রসঙ্গতঃ নানা স্থলেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। যোগ আর কি?—'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।' চিত্তবৃত্তিনিরোধ—চিত্তস্থৈর্য্য, মুক্তি-লাভ-পক্ষে প্রথম ও প্রধান আবশ্যক। যাহা হউক, জৈনশাস্ত্রেই বা এসম্বন্ধে কি উক্তি দেখিতে

পাই, অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক। আচারাঙ্গসূত্র তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন,—

"কিতিগিংচ্ছ সমাবন্নেণং অপ্পাণেণং ণো লভতি সমাধিং।" *

অর্থাৎ,—'যাহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া ফিরিতেছে, সে কখনও সমাধিলাভে সমর্থ হয় না।' আবার, সমাধিলাভ ভিন্ন আত্মদর্শন সম্ভবপর নহে। সুতরাং, মোহের বস্তু রমণী-সঙ্গ প্রভৃতি হইতে চিত্তকে অন্তরিত করিয়া, আত্মবস্তুতে মন লীন করিতে হইবে। আত্ম-পদার্থে চিত্ত লীন করারই নামান্তর—'সমাধি।' সমাধিই সমদর্শন। সমদর্শনই সমাধির মূল। তাই শাস্ত্রের উপদেশ,—সর্ব্বজীবে সমদর্শী হও। সকলকে আপনার বলিয়া জ্ঞান কর। কায়ে মনে বা বাক্যে কোনও জীবকে কখনও কষ্ট দিবে না, বা কষ্ট দিবার কল্পনা মাত্রও করিবে না। তাহাতে পরিশেষে আপনাকেই কষ্ট পাইতে হইবে। অপরকে যন্ত্রণা দিয়া যাহার আনন্দ হয়, তাহার জন্য তাতোধিক যন্ত্রণাভোগ পুরোভাগে অবস্থিতি করে। এ বিষয়ে জৈনশাস্ত্র অশেষ উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, জৈনধর্ম্মের মেরুদণ্ডই সর্ব্বজীবে সমদর্শন। এ সম্বন্ধে জৈনশাস্ত্রের একটী প্রধান ও পরম উপদেশ,—

মননে বা কর্ম্মে অনিষ্ট-কল্পনা।

"তুমংসি ণাম তং চেব, জং হংতব্বং তি মন্নসি। তুমংসি ণাম তং চেব, জং অজ্জাবেয়ব্বতি মন্নসি। তুমংসি ণাম তং চেব, জং পরিতাবেয়ব্বংতি মন্নসি। তুমংসি ণাম তং চেব, জং পরিঘেতব্বংতি মন্নসি। এবং তুমংসি ণাম তংচেব, জং উদ্দবেয়ব্বংতি মন্নসি। অংজু চেয়পডিবুদ্ধজ্জীবী তম্হা। ণ হংতা, ণ বিঘায়এ; অণুসংবেয়ণ—মপ্পাণেণং, জং হংতব্বং পাভিপত্থএ।" †

কাহাকেও হত্যা করিতে ইচ্ছা করিলে, অথবা কাহারও প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, অথবা কাহাকেও যন্ত্রণা দিতে চেষ্টা পাইলে, অথবা কাহাকেও শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর হইলে, অর্থাৎ মননে বা কর্ম্মে যাহা কিছু পাপ করিবে, সে সকলই নিজের জন্য সঞ্চিত থাকিবে। জ্ঞানী ব্যক্তি এই সকল বিষয় অবগত আছেন বলিয়া, কদাচ কোনও প্রাণীর অনিষ্ট-সাধনে প্রবৃত্ত বা কোনও প্রাণীর বিনাশের কারণ হন না। জানিয়া শুনিয়া কোনও মানুষই আপনার শাস্তি আপনি আহ্বান করিয়া আনেন না। যাঁহারা বাক্য মন বা কর্ম্মের দ্বারা কাহারও কোনরূপ অনিষ্ট না করেন, তাঁহারা পাপের অতীত অবস্থা প্রাপ্ত হন।

---

* "He whose mind is always wavering, does not reach abstract contemplation (সমাধি)।"

† জৈনশাস্ত্রে ইহা একটী প্রধান উপদেশ। এই অংশের ইংরাজী অনুবাদ এইরূপ দৃষ্ট হয়;—"As it would be unto thee, so it is with him whom thou intendest to kill. As it would be unto thee, so it is with him whom thou intendest to tyrannise over. As it would be unto thee, so it is with him whom thou intendest to torment. In the same way (it is with him) whom thou intendest to punish, and to drive away. The righteous man who lives up to these sentiments, does therefore neither kill nor cause others to kill (living beings). He should not intentionally cause the same punishment for himself."

জ্ঞানী যিনি, বিমুক্ত যিনি, তিনি সংসারের সকল সম্বন্ধ-সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছেন। জ্ঞানী জানেন, বিমুক্ত যিনি তিনি জানেন,—সকলই অনিত্য, সংসারে আগমন মাত্র কয়েক দিনের জন্য।'

বিমুক্ত—জ্ঞানী।

সুতরাং জ্ঞানী যিনি, বিমুক্ত যিনি, প্রথমেই তিনি পরিজনবর্গের সম্বন্ধ-বন্ধন স্বতঃপরতঃ ছিন্ন করিবেন,—কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক, আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, নির্লিপ্তভাবে বিচরণ করিবেন। বিমুক্ত তিনিই—যিনি অনিত্যত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন! বিমুক্ত তিনি—যাঁহার চিত্ত পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ় আছে;—যিনি রণজয়ী মত্ত-হস্তীর ন্যায় রিপুজয়ী! বিমুক্ত তিনি—যিনি বিষয়-হেতুভূত সকল কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন,—যিনি স্থান কাল প্রভৃতির সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া উজ্জ্বল জ্ঞানালোকের অনুবর্ত্তী হইতে পারিয়াছেন! বিমুক্ত তিনিই—যিনি রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ প্রভৃতি কোন পদার্থে আকৃষ্ট নহেন। আচারাঙ্গ-সূত্রের উপসংহারে বিমুক্তজনের স্বরূপ-তত্ত্ব এইরূপ বিবৃত আছে;—

"অণিচ্চ মাবাস মুবেংতি জংতুণো, পলোয়এ সুচ্চ মিদং অণুত্তরং;
বিউসিরে বিন্নু অগার বংধণং, অভীরু আরংভপরিগ্গহং চএ। ১।
তহাগহং ভিক্‌খু মণংত সংজয়ং, অণেলিসং বিন্নু চরংত ভেসণং;
তুদংতি বায়াহিং অভিদ্দবং ণরা, সয়েহি সংগামগয়ং ব কুংজরং। ২।
তহপ্পগারেহিং জণেহিং হীলিএ, ससদ্দফাসা ফরুসা উদীরিয়া;
তিতিক্‌খএ ণাণি অদুট্ঠচেতসা, গিরিব্ব বাতেণ ণ সংপবেবএ। ৩।
উবেহমাণে কুশলেহি সংবসে, অকংত দুক্‌খা তস থাবরা দুহী;
অলূসএ সব্বসহে মহামুণী, তথাহি সে সুস্সমণে সমাহিএ। ৪।
বিদূ ণতে ধম্মপয়ং অণুত্তরং, বিণীয়তহণ্হস্স মুণিস্স ঝায়ও;
সমাহিয়স্সগ্গিসিহা ব তেয়সা, তবো য পন্না য জসো য বড্ঢতি। ৫
দিসোদিসি ণংতজিণে ণ তাইণা, মহব্বয়া খেমপদা পবেদিতা;
মহাগুরু ণিস্সয়রা উদীরিতা, তমং ব তেউ তিদিসং পগাসয়া। ৬।
সিতেহিং ভিক্‌খু অসিতো পরিব্বএ, অসজ্জ মিত্থীসু চএজ্জ পূঅণং;
অণিস্সিও লোগং মিণং তহা পরং, ণ মজ্জতী কামগুণেহিং পংডিএ। ৭।
তিহা বিমুক্কস্স পরিন্নচারিণো, ধিতীমতো দুক্‌খখমস্স ভিক্‌খুণো;
বিসুজ্ঝএ জং সি মলং পুরেকডং, সমীরিয়ং রূপ্পমলং ব জোইণা। ৮।
সে হু পরিন্নাসময়ংসি বট্টই, ণিরাসসে উবরয়মেহুণে চরে;
ভুজংগমে জুন্নতয়ং জহা জহে, বিমুচ্চতী সে দুহসেজ্জ মাহণে। ৯।
জ মাহু ওহং সলিলং অপারগং, মহসমুদ্দং বং ভুয়াহিং দুত্তরং;
অহেবণং পরিজাণাহি পংডিএ, সেণহু মুণী অংতকডে ত্তিবুচ্চই। ১০।
জহাহি বদ্ধং ইহ মাণবেহিং, জহায় তেসিং তু বিমোক্‌খ আহিও;
অহাতহাবংধবিমোক্‌খ জে বিউ, সে হু মুণী অংতকডে ত্তি বুচ্চই। ১১
ইমংমি লোএ পরতে জ দোসুবি, ণ বিজ্জই বংধণং জস্স কিংচিবি;
সে হু নিরালংবণে অপ্পতিট্টে, কলংকলী ভাবমহং বিমুচ্চই। ১২।"

মর্ম্মার্থ,—'জীবের এই আবাস অনিত্য। এই সত্য অবগত হইয়া, অন্তরে অন্তরে বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। সেই বিচারের ফলেই, জ্ঞানিগণ ইহসংসারের পারিবারিক সকল প্রকার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবেন,—নির্ভয়ে কর্ম্ম এবং আসক্তি পরিত্যাগ করিবেন। ১। পার্থিব পদার্থের সহিত সম্বন্ধবিহীন হইয়া বিজ্ঞ ভিক্ষু যখন ভিক্ষা যাচ্ঞা করেন, বাক্যে ও কার্য্যে জনসাধারণ তাঁহার প্রতি কতই দুর্ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে মত্তহস্তী যেমন তীরবৃষ্টিকে অবহেলায় উপেক্ষা করে, নিস্পৃহ সন্ন্যাসী লোকের অত্যাচারও সেইরূপ অবাধে সহ্য করেন। ২। ঝঞ্চাবাতে যেমন পর্ব্বত বিচঞ্চল হয় না, মানুষের বাক্যে বা উপদ্রবে বিজ্ঞ ভিক্ষুগণও সেইরূপ অবিচলিত-চিত্ত থাকেন। ৩। সর্ব্বপ্রকার দুঃখ-দুর্ব্বিপদে উপেক্ষা করিয়া, সুখ-দুঃখে সমজ্ঞানী হইয়া, সাধুসঙ্গে যিনি বাস করেন; গতিশীল বা গতিহীন কোনও জীবের কোনরূপ অনিষ্ট-সাধনে যিনি পরাঙ্মুখ; তিনিই প্রকৃত শ্রমণ-পদবাচ্য। ৪। প্রজ্বলিত অগ্নির শিখা যেমন প্রভা বিস্তার করে; যে মুনি সাংসারিক অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া তৃষ্ণাত্যাগী ধ্যানপরায়ণ ও ধর্ম্মপদানুচারী হইয়াছেন, তাঁহার জ্ঞান ও গৌরব সেইরূপ স্বতঃবিকাশপ্রাপ্ত হয়। ৫। আলোক যেমন ত্রিলোকের অন্ধকার নাশ করে, জিনদেবের আদেশানুবর্ত্তী মহাব্রত নিষ্কাম সাধুগণ সেইরূপ সংসারকে জ্ঞানালোকে আলোকিত করেন। ৬। তিনিই বিমুক্ত,—যিনি এই বন্ধনমূল সংসারের মধ্যে নিস্পৃহ ভিক্ষুর জীবন যাপন করেন,—ইহলোকে বা পরলোকে যাঁহার কোনও আকাঙ্ক্ষা নাই, এবং কামগুণের দ্বারা কদাচ যাঁহার জ্ঞানের পরিমাপ হয় না। ৭। অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়াও যিনি জ্ঞানমার্গে বিচরণ করেন, অগ্নি দ্বারা সংস্কৃত রৌপ্যের ন্যায় তাঁহার পূর্ব্বকৃত পাপ-কলুষ দূরীভূত হয়। ৮। কামনার কবল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, কামকে জয় করিয়া, সংযম-সাধনার ফলে যিনি জ্ঞানমার্গে প্রবেশ করিয়াছেন; তিনিই পরম সুখী। সর্প যেমন জীর্ণ-চর্ম্ম পরিত্যাগ করে, ব্রাহ্মণ সেইরূপ দুঃখ-শয্যা পরিত্যাগ করেন। ৯। মানুষ মহাসমুদ্রকে যেমন অনন্ত-অসীম জলরাশি বলিয়া জানে, সন্তরণে যেমন মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব; বিজ্ঞজন সংসারকেও সেইরূপ দুষ্পার অনন্ত পাপের নিলয় বলিয়া অবগত আছেন। সেই কারণেই, যিনি জ্ঞানী—মুনি, ইহসংসারে তিনি দুঃখের অন্তকারী বলিয়া অভিহিত হন। ১০। বন্ধনই বা কি, আর মুক্তিই বা কি, তাহা (জৈনধর্ম্মে) বিঘোষিত হইয়াছে। ধর্ম্মের শিক্ষা অনুসারে যিনি বন্ধন ও মুক্তির বিষয় সর্ব্বতোভাবে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, সেই জ্ঞানী জনই ইহসংসারের সকল দুঃখের অন্তকারী বলিয়া অভিহিত হন। ১১। ইহসংসারে যাঁহার কোনও বন্ধন নাই; স্বর্গে ও নরকে অথবা অন্য কোনও মহাদেশে যিনি কোনও সম্বন্ধই রাখেন নাই; প্রকৃতপক্ষে তাঁহার কোনও আধারের বা আশ্রয়ের আবশ্যক করে না। তিনিই সর্ব্বতোভাবে জন্মের পথ রোধ করিয়াছেন। বিমুক্ত তাঁহাকেই বলে। ১২।' ফলতঃ, মান, মায়া, ক্রোধ, লোভ, ভয়-বিভীষিকা প্রভৃতির কোনও আকর্ষণে যিনি আকৃষ্ট নহেন; পরন্তু, সকল বিভীষিকার অতীত, যিনি সকল প্রকার সাংসারিক সম্বন্ধ-বন্ধন ছেদন করিতে পারিয়াছেন; একমাত্র তিনিই বিমুক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

কি কঠোর সংযম-সাধনার ফলে, সেই বিমুক্ত অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়, জৈনশাস্ত্র ভিক্ষুর প্রতিপাল্য বিধি-বিধানে তাহা পুনঃপুনঃ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ভিক্ষুধর্ম্ম পরিগ্রহণ-কালে যে প্রতিজ্ঞা-পঞ্চকে আবদ্ধ হইতে হয়, তদ্বিষয় অনুধাবন করিলে, বিষয়টী বুঝিতে পারা যায়; আর তদ্দারাই মুক্তির পথ পুরোভাগে পরিদৃশ্যমান্ হয়। সেই পঞ্চপ্রতিজ্ঞা জৈনশাস্ত্রে 'পঞ্চ-মহাব্রত' নামে অভিহিত। মহাবীর প্রভু, মহানির্ব্বাণ-লাভের সময়, পূর্ণ-জ্ঞান-সম্পন্ন অবস্থায়, সেই 'পঞ্চ-মহাব্রত' গ্রহণের বিষয় উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। নিগ্রর্ন্থগণ এবং শ্রমণগণ সেই পঞ্চ-মহাব্রত পালন করিবেন। ভিক্ষু-ধর্ম্ম গ্রহণকালে প্রত্যেককে সেই মহাব্রত পালন জন্য প্রতিজ্ঞা করিতে হয়। পঞ্চ-মহাব্রতের প্রত্যেক মহাব্রতের মধ্যে পাঁচটী করিয়া ভাবনা বা বিভাগ আছে। সেই মহাব্রত-পঞ্চক ও তদন্তর্গত ভাবনা-সমূহ বোধগম্য হইলে, জৈন-ধর্ম্মনীতির মূল তথ্য উপলব্ধি হইবে। মহাবীর প্রভুর উপদিষ্ট সেই পঞ্চ-মহাব্রতের অন্তর্গত প্রথম মহাব্রত; যথা,—

পঞ্চমহাব্রত।

"পঢমং ভংতে মহব্বয়ং,—'পচ্চক্খামি সব্বং পাণাইবায়ং;
সে সুহুমং বা, বায়রং বা, তসং বা, থাবরং বা, ণেব সয়ং পাণাইবায়ং করেজ্জা;
জাবজ্জীবাএ তিবিহংতিবিহেণং মণসা বয়সা কায়সা।
তস্স ভংতে পডিক্কমামি, নিংদামি, গরিহামি, অপ্পাণং বোসিরামি'।"

অর্থাৎ,—আমি এই প্রথম মহাব্রত গ্রহণ করিতেছি;—'আমি সর্ব্ব প্রাণাতিপাত ত্যাগ করিলাম; সূক্ষ্ম কিংবা স্থূল, গতিশীল কিংবা গতিহীন (স্থাবর ও অস্থাবর), কোনও প্রাণীকেই আমি নিহত করিব না। স্বয়ং প্রাণীহত্যায় বিরত থাকিব। অপরের কৃত হত্যাকার্য্যের সহায় হইব না, এবং কোনরূপ প্রাণীহত্যা-কর্ম্মে কখনও অনুমোদন করিব না। যতদিন জীবিত থাকিব, মন বাক্য কায় ত্রিবিধ উপায়ে প্রাণীহত্যা-রূপ পাপকার্য্যে বিরত থাকিব, ঐরূপ পাপ কার্য্যের জন্য অনুশোচনা করিব, ঐরূপ পাপকার্য্যকে সর্ব্বথা দূষণীয় বলিয়া ঘোষণা করিব।'

এই প্রথম মহাব্রতের অন্তর্গত ভাবনা-পঞ্চক; যথা,—প্রথম ভাবনা;—অতি সাবধানতার সহিত, একটুও অসাবধান না হইয়া, নিগ্রর্ন্থ পাদচারণা করিবেন। কেবলী ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে,—'যদি কোনও নিগ্রর্ন্থ অসাবধানভাবে বিচরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার পদতলে পড়িয়া কত জীবিত প্রাণী আহত নিহত স্থানভ্রষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। এই কারণ নিগ্রর্ন্থগণ পদচালনে সতত সাবধান থাকিবেন। কখনও অসাবধান হইয়া তাঁহারা পরিভ্রমণ করিবেন না।'

দ্বিতীয় ভাবনা এইরূপ;—নিগ্রর্ন্থ নিয়ত আপন চিত্ত অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন। চিত্ত যদি পাপপূর্ণ হয়, অভিপ্রায় যদি দূষণীয় থাকে, আর তদ্দরুণ যদি কোনও প্রাণীর কোনরূপ যন্ত্রণার আশঙ্কা থাকে, নিগ্রর্ন্থ কখনও চিত্তকে সে পথে পরিচালিত করিবেন না। পরন্তু, যে কার্য্যে কোনও পাপের সম্ভাবনা নাই, চিত্তকে সেইদিকে নিবিষ্ট রাখিতে হইবে।

তৃতীয় ভাবনা এইরূপ; যথা,—নিগ্রর্ন্থকে সতত আপনার বাক্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বাক্য যদি পাপপূর্ণ দোষাবহ বা কোনও প্রাণীর কোনরূপ অনিষ্টকর হয়, সে

বাক্য কখনও তিনি উচ্চারণ করিবেন না। পরন্তু, যে বাক্য পাপশূন্য, যে বাক্য কোনও প্রাণীর অনিষ্টসাধক নহে, সেই বাক্য মাত্র তিনি উচ্চারণ করিতে পারিবেন।

চতুর্থ ভাবনা এইরূপ ;—নিগ্রন্থ আপন ভিক্ষাপাত্র-রক্ষণে সদা সাবধান থাকিবেন, কদাচ অসাবধান হইবেন না। কেবলী বলিয়াছেন,—'যে নিগ্রন্থ আপন ভিক্ষাপাত্র রক্ষায় অসাবধান, তাঁহার দ্বারা সর্ব্বপ্রকার জীবের সংহার-সাধন বা কোন-না-কোনরূপ অনিষ্ট হইতে পারে। এই কারণ নিগ্রন্থকে ভিক্ষাপাত্র রক্ষার কার্য্যে পর্য্যন্ত সাবধান থাকিতে হইবে, কদাচ অসাবধান হইলে চলিবে না।'

পঞ্চম ভাবনা এইরূপ ;—নিগ্রন্থ আপন খাদ্য ও পানীয় বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া পরিশেষে তাহা গ্রহণ করিবেন। ভালরূপ না দেখিয়া কোনও দ্রব্য আহার করা বা পান করা, তাঁহার কথনও কর্ত্তব্য নহে। কেবলী বলিয়াছেন,—'যে নিগ্রন্থ ভালরূপ না দেখিয়া শুনিয়া পানাহার গ্রহণ করেন, তাঁহার দ্বারা প্রাণীর প্রাণনাশ প্রভৃতি অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে। অতএব, খাদ্য ও পানীয় বিশেষরূপ পরীক্ষা ভিন্ন কোনও নিগ্রন্থ কথনও গ্রহণ করিবেন না।'

উল্লিখিত প্রথম মহাব্রত এবং তদন্তর্গত ভাবনা-পঞ্চক কায় মন ও বাক্য দ্বারা পালন করিতে হইবে। আপনার কার্য্যে উহার সার্থকতা দেখাইতে হইবে। অপরকে উহার সার্থকতা বুঝাইয়া দিতে হইবে। উহার সার্থকতা-পক্ষে সর্ব্বথা প্রযত্নপর থাকিতে হইবে, এবং আজ্ঞা-প্রমাণে উহার সাধনা করিতে হইবে। প্রাণীহত্যা হইতে বিরতি-বিধায়ক—ইহাই প্রথম মহাব্রত। অতঃপর মহাবীর স্বামীর উপদিষ্ট দ্বিতীয় মহাব্রত,—

"অহাবরং দোচ্চং মহাব্বয়ং,—'পচ্চক্খামি সব্বং মুসাবায়ং বতিদোসং সে কোহাবা, লোহাবা, ভয়াবা, হাসাবা, ণেব সয়ং মুসং ভাসেজ্জা, ণেবন্নেণং মুসং ভাসাবেজ্জা, অন্নং পি মুসং ভাসতং ণ সমণুজাণেজ্জা, ত্রিবিহং তিবি হেণং, মণসা বয়সা কায়সা, তস্স ভংতে পডিক্কমামি জাব বোসিরামি।"

অর্থাৎ,—'ক্রোধ, লোভ, ভয় বা হাস্যের জন্য মিথ্যা-বাক্য-রূপ বচন-দোষ পরিত্যাগ করিতেছি। আমি কদাচ মিথ্যা বলিব না, কাহারও মিথ্যা বাক্যের হেতু হইব না, অথবা কাহারও মিথ্যা-কথনে কদাচ অনুমোদন করিব না। কায়মনোবাক্য ত্রিবিধ উপায়ে যাবজ্জীবন মিথ্যা পরিহার করিব ; মিথ্যার জন্য অনুশোচনা করিব, এবং মিথ্যা ভাষণে অন্যকে প্রতিনিবৃত্ত করিব,—মিথ্যার দোষ দেখাইব।'

এই দ্বিতীয় মহাব্রত পঞ্চ-ভাবনায় বিভক্ত। সেই ভাবনা-পঞ্চকে উপদেশ আছে ; (১) নিগ্রন্থ বিচার-পূর্ব্বক বাক্য প্রয়োগ করিবেন। বিচার না করিয়া কদাচ কথা কহিবেন না। কেবলী বলিয়াছেন,—'বিচার-পূর্ব্বক বাক্য-প্রয়োগ না করিলে মিথ্যা বাক্য উচ্চারিত হইতে পারে।' (২) নিগ্রন্থ ক্রোধের স্বরূপ অবগত হইয়া ক্রোধ পরিত্যাগ করিবেন। কেবলী বলিয়াছেন,—'যে নিগ্রন্থ ক্রোধের দ্বারা অভিভূত হন, তিনি ক্রোধবশে মিথ্যাবাক্য উচ্চারণ করিতে পারেন।' (৩) নিগ্রন্থ লোভের স্বরূপ অবগত হইয়া লোভ পরিত্যাগ করিবেন। কেবলী বলিয়াছেন,—'যে নিগ্রন্থ লোভের দ্বারা অভিভূত হন, তিনি লোভ-বশতঃ মিথ্যা বাক্য বলিতে পারেন।' (৪) নিগ্রন্থ ভয়ের স্বরূপ অবগত হইয়া ভয় পরিহার

করিবেন। কেবলী বলিয়াছেন,—'যে নিগ্রন্থ ভয়ের দ্বারা অভিভূত হন, ভীত হইয়া তিনি মিথ্যা কথা বলিতে পারেন।' (৫) নিগ্রন্থ হাস্যের স্বরূপ অবগত হইয়া হাস্য পরিহার করিবেন। কেবলী বলিয়াছেন,—'হাস্য পরিহাসে অভিভূত হইয়া নিগ্রন্থ মিথ্যা বাক্য উচ্চারণ করিতে পারেন।' প্রথম মহাব্রতের ন্যায় এই দ্বিতীয় মহাব্রত কায়মনোবাক্যে পালন করিতে হইবে।

মহাবীর প্রভুর উপদিষ্ট পঞ্চ-মহাব্রতের অন্তর্গত তৃতীয় মহাব্রত; যথা,—

"অহাবরং তচ্চ মহব্বয়ং,—'পচ্চকৃখতি সব্বং অদিন্না দাণং;
সে গামে বা ণগরে বা অরণ্যে বা অপ্পং বা বহুং বা অণুং বা
থুলং বা চিত্তমংতং বা অচিত্তমংতং বা ণেব সয়ং অদিন্নং গিণ্হেজ্জা,
ণেবন্নেহিং অদিন্নং গেণ্হাবেজ্জা, অন্নংপি অদিন্নং গিণ্হংতং ণ
সমণুজ্জাণেজ্জা; জাবজ্জীবায়ে, জাব বোসিরামি।"

অর্থাৎ,—'প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অদত্ত দ্রব্য কদাচ গ্রহণ করিব না। গ্রামে বা নগরে বা অরণ্যে, ক্ষুদ্র হউক বা বৃহৎ হউক, অল্প হউক বা অধিক হউক, জীবিত হউক বা মৃত হউক, অদত্ত কোন বস্তুই আমি গ্রহণ করিব না। আপনি লইব না; অপরে লওয়ার কারণ হইব না; অথবা অপরের লওয়ায় অনুমোদন করিব না।'

এই তৃতীয় মহাব্রতের অন্তর্গত ভাবনা-পঞ্চক; যথা,—(১) নিগ্রন্থ বিচার-পূর্ব্বক, বিশিষ্ট কারণ বিদ্যমানে, ভিক্ষার্থী হইতে পারেন। অবিচারে কখনও তিনি ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন না। কেবলী বলিয়াছেন,—'যদি কোনও নিগ্রন্থ বিশিষ্ট কারণ ভিন্ন নির্ব্বিচারে ভিক্ষা গ্রহণ করেন, তাহাতে তিনি অদত্তগ্রহণকারী হইতে পারেন।' (২) নিগ্রন্থ গুরুর অনুজ্ঞাক্রমে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করিবেন। বিনানুমতিতে তাঁহার পানাহার অবিধি। কেবলী বলিয়াছেন,—'যদি কোন নিগ্রন্থ আচার্য্যের অনুমতি ব্যতীত পানাহার গ্রহণ করেন, তাহাতে তাহার পক্ষে অদত্তাহার অসম্ভব নহে।' (৩) নিগ্রন্থ সীমাবদ্ধ স্থানে নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য অবস্থান করিবেন। কেবলী বলেন,—'যদি কোন নিগ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য সীমাবদ্ধ স্থানের মধ্যে অবস্থিতি না করেন, তাহা হইলে অদত্ত-গ্রহণ-পাপে লিপ্ত হইতে পারেন।' (৪) নিগ্রন্থ যেখানেই বাস করুন, সর্ব্বদা তদ্বিষয়ে ভূস্বামীর সম্মতি গ্রহণ করিবেন। কেবলী বলিয়াছেন,—'যদি কোন নিগ্রন্থ আপন বাসস্থান-বিষয়ে ভূস্বামীর অনুমতি গ্রহণ না করেন, তাহাতে অদত্ত-গ্রহণ-জনিত পাপ স্পর্শিতে পারে।' (৫) নিগ্রন্থ আপন সহধর্ম্মীর বাসের জন্য বিচার-পূর্ব্বক সীমাবদ্ধ স্থান ভিক্ষা করিতে পারেন; কিন্তু অবিচারে কখনও নহে। কেবলী বলিয়াছেন,—'বিচার না করিয়া যদি কোনও নিগ্রন্থ স্থান-ভিক্ষা করেন, তাহাতে অদত্ত-গ্রহণ-জনিত পাপ বর্ত্তিতে পারে।' এই তৃতীয় মহাব্রত, পঞ্চভাবনা-সহ, কায়মনোবাক্যে প্রতিপালন করিতে হইবে।

মহাবীর স্বামীর উপদিষ্ট পঞ্চ-মহাব্রতের অন্তর্গত চতুর্থ মহাব্রত; যথা,—

অহাবরং চউত্থং মহব্বয়ং,—'পচ্চকৃখামি সব্বং মেহুণং;
সে দিব্বং বা মাণুসং বা, তিরিকৃখজোণিয়ং বা,

ণেব সয়ং মেহুণে গচ্ছে, তং চেব
অদিন্নাদানবত্তব্বয়া ভাণিয়ব্বা জাববোসিরামি।"

অর্থাৎ,—'আমি সর্ব্বপ্রকার মৈথুনসুখ পরিহার করিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছি। দেব মনুষ্য বা তির্য্যক্—কিছুতেই আসক্ত হইব না। আমি সর্ব্ববিধ ইন্দ্রিয়-সেবায় বিরত থাকিব।'

এই চতুর্থ মহাব্রতের ভাবনা-পঞ্চক; যথা,—(১) নির্গ্রন্থ বারম্বার স্ত্রীলোকের কথা আলোচনা করিবেন না। কেবলী বলিয়াছেন,—'পুনঃপুনঃ রমণীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে অধঃপতন ঘটিতে পারে, অশান্তি আসিতে পারে।' (২) রমণীর মনোহারিণী মূর্ত্তির বিষয়ে নির্গ্রন্থ কখনও চিন্তা করিবেন না। কেবলী বলিয়াছেন,—'তদ্রূপ চিন্তায় অধঃপতন ঘটে,—শান্তি ভঙ্গ হয়।' (৩) পূর্ব্বে স্ত্রীসংসর্গে যে সুখ বা যে আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, নির্গ্রন্থ ভ্রমেও কখনও সে স্মৃতি মনে আনিবেন না। কেবলী বলিয়াছেন,—'সে আনন্দের বা সে সুখের স্মৃতি দারুণ অশান্তির ও অধঃপতন হেতুভূত।' (৩) নির্গ্রন্থ কদাচ অধিক খাদ্য বা অধিক পানীয় গ্রহণ করিবেন না। তাঁহার পক্ষে, মদ্যপান বা অতিরিক্ত রসবান্ খাদ্য গ্রহণ নিষেধ। কেবলী বলিয়াছেন,—'অতিরিক্ত পান-ভোজন-হেতু, অথবা মদ্যপানে এবং অতিরিক্ত রসবান্ খাদ্য-গ্রহণে অশান্তি ও অপবিত্রতা আসে।' (৫) নির্গ্রন্থ কদাচ স্ত্রী পশু অথবা নপুংসক পরিবৃত হইয়া কোনও শয্যায় শয়ন বা উপবেশন করিবেন না। কেবলী বলিয়াছেন,—'যে শয্যা-সান্নিধ্যে স্ত্রীগণ পশ্বাদি অথবা নপুংসক অবস্থিতি করে, সে শয্যায় উপবেশন বা শয়ন করিলে নির্গ্রন্থের অশান্তি ও অধঃপতন ঘটে।' এই চতুর্থ মহাব্রত, ভাবনা-পঞ্চক-সহ, কায়মনোবাক্যে প্রতিপালন করা আবশ্যক।

মহাবীর স্বামীর উপদিষ্ট পঞ্চম মহাব্রত; যথা,—

অহাবরং পংচমং মংতে মহব্বয়ং,—'সব্বং পরিগ্‌গহং পচ্চক্‌খামি;
সে অপ্পং বা বহুং বা অণুং বা থূলং বা চিত্তমংতং বা অচিত্ত-
মংতং বা ণেব সয়ং পরিগ্‌গহং গিণ্‌হজ্জা, ণবন্নেণ পরিগ্‌গহং গিণ্‌হবিজ্জা,
অন্নং পি পরিগ্‌গহং গিণ্‌হংতং ণ সমণু জাণেজ্জা জাব বোসিরামি।'

অর্থাৎ,—আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি সর্ব্বপরিগ্রহ (অর্থাৎ সংসার-সুখের সকল প্রকার আসক্তি) পরিত্যাগ করিলাম। অল্প বা অধিক, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ, জীবিত বা মৃত, কোনও পদার্থের প্রতি আর আমার আসক্তি থাকিবে না। আমি নিজে কাহারও প্রতি অনুরক্ত হইব না, কাহারও অনুরাগের কারণ হইব না, অথবা কাহারও অনুরাগ অনুমোদন করিব না। অপিচ, কায়মনোবাক্য—ত্রিবিধ উপায়ে আপনাকে আসক্তির বিষয় হইতে অন্তরিত করিব।

পঞ্চম মহাব্রতের ভাবনা-পঞ্চক; যথা,—(১) কর্ণে তৃপ্তিকর ও অতৃপ্তিকর শব্দ ধ্বনিত হয়। কিন্তু, তৃপ্তিকরই হউক আর বিরক্তিকরই হউক, কোনও শব্দেই আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়; অথবা কোনও শব্দই আনন্দপ্রদ, অভিলষিত, মোহদ, বিবেক-ভ্রষ্ট বা বিরক্তিকর হওয়া কর্ত্তব্য নহে। কেবলী বলিয়াছেন,—'যদি কোন নির্গ্রন্থ আনন্দকর অথবা নিরানন্দকর শব্দ শ্রবণে অভিভূত হন, তাহা হইলে তাঁহার পতন ও অশান্তি

অনিবার্য্য।' (২) দর্শন ইন্দ্রিয়ে তৃপ্তিপ্রদ ও অতৃপ্তিকর দৃশ্য (বর্ণ প্রভৃতি) প্রতিভাত হয়। কিন্তু তাহার প্রতি কদাচ আসক্ত হওয়া উচিত নয়। দৃশ্য-পদার্থে আনন্দ, নিরানন্দ, অনুরাগ, বিরাগ প্রভৃতি পরিহর্ত্তব্য। কেবলী বলিয়াছেন,—'যদি কোনও নির্গ্রন্থ তৃপ্তিকর বা অতৃপ্তিকর দৃশ্য-পদার্থে অভিভূত হন, তাঁহার অধঃপতন অনিবার্য্য।' (৩) ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে তৃপ্তিকর এবং অতৃপ্তিকর গন্ধ উপস্থিত হয়। কিন্তু, তাহাতে কদাচ আসক্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। 'যিনি ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের কার্য্যে অভিভূত হন', কেবলী বলিয়াছেন, 'তাঁহার অধঃপতন ও অশান্তি অনিবার্য্য।' (৪) রসনেন্দ্রিয়ে তৃপ্তিকর বা অতৃপ্তিকর আস্বাদ পরি-পরিগৃহীত হয়। কিন্তু তৎপ্রতি আসক্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। কেবলী বলিয়াছেন,—'যে নির্গ্রন্থের রসনেন্দ্রিয় তৃপ্তিকর বা অতৃপ্তিকর আস্বাদে অভিভূত হয়, তাহার অধঃপতন ও অশান্তি অবশ্যম্ভাবী।' (৫) ত্বগেন্দ্রিয় তৃপ্তিকর বা অতৃপ্তিকর স্পর্শ অনুভব করে। সে অনুভব পরিত্যাজ্য। কেবলী বলিয়াছেন,—'যে নির্গ্রন্থ স্পর্শেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর বা অতৃপ্তি-কর স্পর্শে অভিভূত হন, তাঁহার অধঃপতন ও অশান্তি অপরিহার্য্য।'

সার উপদেশ।

সর্ব্বশাস্ত্রেরই সার উপদেশ,—'জ্ঞানী হও, জ্ঞানলাভ কর; কেন না, জ্ঞানই মুক্তি—জ্ঞানান্মুক্তিঃ।' কিন্তু জ্ঞান কি, আর কিরূপেই বা তাহা অধিগত হয়? উপরি উক্ত পঞ্চ-মহাব্রতের অনুশীলন উপলক্ষে জৈন-শাস্ত্র তাহারই উপদেশ দিতেছেন; বলিতেছেন—'তোমার সকল অনর্থের সকল মোহের মূল—তোমার ইন্দ্রিয়গ্রাম; যদি জ্ঞানলাভ করিতে চাও, যদি মুক্তির প্রয়াসী হও, তবে তোমার ইন্দ্রিয়গ্রামকে আগে বশীভূত কর। ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে না পারিলে, তোমার সকল প্রযত্নই ব্যর্থ হইবে।' সার শিক্ষা—ইন্দ্রিয়-সংযম। সে সংযম কেমনভাবে আয়ত্ত করিতে হইবে, অতঃপর তাহারই উপদেশ প্রদান করা হইতেছে। প্রথম—শ্রবণেন্দ্রিয়। উহার সংযম কি প্রকারে সাধিত হইতে পারে? শ্রবণেন্দ্রিয়ে শব্দ প্রতিধ্বনিত হইবে; সে ধ্বনি রোধ করিতে পারিবে না, সত্য; কিন্তু, তৃপ্তিকর হউক বা অতৃপ্তিকর হউক, অনুরাগ বা বিরাগ তাহাতে যেন সঞ্চিত না হয়, ইহাই সার উপদেশ।

জ্ঞানলাভে প্রধান আবশ্যক।

ণো সক্কা ণ সোউং সদা, সোয়বিসয় মাগতা;
রাগদোসাউ জে তত্থ, তং ভিক্‌খু পরিবজ্জএ। ১।

ভিক্ষু সন্ন্যাসী বা মুনি তাঁহাকেই বলি, বিমুক্তি তাঁহারই অধিগত হয়,—কর্ণে প্রতি-ধ্বনিত হইলেও কোনরূপ শব্দে কদাচ যাঁহার অনুরাগ বা বিরাগ উপস্থিত হয় না; শ্রবণেন্দ্রিয়ের সংযম তাঁহারই হইয়াছে; শ্রোত্র তাঁহারই সার্থক।

এইরূপ, নেত্র—তাঁহারই সার্থক,—কোনরূপ দৃশ্য-পদার্থে যিনি আসক্ত বা বিরক্ত নহেন।

ণো সক্কা রূব মদট্ঠুং, চক্‌খুবিসয় মাগয়ং;
রাগদোসাউ জে তত্থ, তং ভিক্‌খু পরিবজ্জএ।

নেত্রপথে তৃপ্তিকর বা অতৃপ্তিকর দৃশ্যপট নিপতিত হইবেই হইবে; কেহ তাহা রোধ

করিতে পারিবে না। কিন্তু, প্রকৃত ভিক্ষু যিনি, জ্ঞানী যিনি,—দৃষ্ট-পদার্থের প্রতি অনুরাগ বা বিরাগ তিনি যুগপৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

এইরূপ ঘ্রাণেন্দ্রিয় তাঁহারই সার্থক,—যিনি কোনরূপ আঘ্রাণে আকৃষ্ট নহেন।

ণো সক্কা গংধ মগ্ঘাউ, ণাসাবিসয় মাগয়ং ;
রাগদোসাউ জে তত্থ, তং ভিক্খু পরিবজ্জএ।

নাসারন্ধ্রে, গন্ধ প্রবেশ করিতেছে ; সে গতি কে রোধ করিবে? কিন্তু প্রকৃত ভিক্ষু যিনি, যতি যিনি,—তৃপ্তিকরই হউক বা অতৃপ্তিকরই হউক, কোনরূপ গন্ধের প্রতি তাঁহার অনুরাগ বা বিরাগ নাই। সর্ব্বপ্রকার আঘ্রাণেই তাঁর নির্লিপ্ত ভাব।

এইরূপ, তাঁহারই রসনেন্দ্রিয় সার্থক,—যিনি কোনরূপ আস্বাদে আকৃষ্ট নহেন।

ণো সক্কং রস মণাসাতুং, জীহাবিসয় মাগয়ং ;
রাগদোসাউ জে তত্থ, তে ভিক্খু পরিবজ্জএ।

রসনায় তৃপ্তিকর বা অতৃপ্তিকর আস্বাদ উপস্থিত হইবেই হইবে ; কিন্তু ভিক্ষু যিনি, যতি যিনি,—কোনরূপ আস্বাদেই তাঁহার প্রাণে অনুরাগ বা বিরাগ সঞ্চারিত হইবে না।

তার পর, স্পর্শেন্দ্রিয়ের কথা। তাঁহারই স্পর্শেন্দ্রিয় সার্থক,—যিনি আদৌ স্পর্শানুভবে আসক্ত নহেন। সর্ব্ববিধ স্পর্শেই তাঁহার অনাসক্ত ভাব।

ণো সক্কং ফাসং ণ বেদেতুং, ফাসং বিসয়মাগয়ং ;
রাগদোসাউ জে তত্থ, তে ভিক্খু পরিবজ্জএ।

স্পর্শেন্দ্রিয়ের স্পর্শ অনিবার্য্য ; কিন্তু, সুখকরই হইক, বা দুঃখকরই হউক, তৃপ্তিপ্রদই হউক, আর অতৃপ্তিপ্রদই হউক, স্পর্শেন্দ্রিয়ের কোন কার্য্যে যাঁহার অনুরাগ বা বিরাগ নাই, অর্থাৎ যিনি সকল ইন্দ্রিয়ের সকল অনুরাগ-বিরাগ পরিহার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই প্রকৃত ভিক্ষু। বিমুক্তি তাঁহারই অধিগত।

বিবিধ নীতি-কথা।

জৈন-ধর্ম্মগ্রন্থ-সমূহ—যেমন প্রাকৃত ভাষায়, তেমনই সংস্কৃত-ভাষায় বিরচিত। সুতরাং জৈন-ধর্ম্মের প্রাচীন নীতি-সমূহ যেমন প্রাকৃত ভাষায় প্রচারিত ; তেমনই সংস্কৃত-ভাষায়ও বহু জৈন-নীতি প্রচারিত আছে—দেখিতে পাই। * জৈন-শাস্ত্রে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বত্র বিঘোষিত। ভাবহীন ক্রিয়ার সহিত যোগসিদ্ধ জ্ঞানের তুলনা করা হইয়াছে। সে তুলনায় পরস্পরের কি পার্থক্য, তাহা 'যোগদৃষ্টিসমুচ্চয়' নামক গ্রন্থে একটী উপমায় এইরূপ ভাবে বিবৃত আছে ; যথা,—

বিবিধ নীতিকথা।

"তাৎকালিকপক্ষপাতভাবশূন্যা চ যা ক্রিয়া। অনয়োরন্তরং জ্ঞেয়ং ভানুখদ্যোতয়োরিব ॥"

অর্থাৎ,—'যোগলব্ধ জ্ঞানের সহিত ভাবশূন্য ক্রিয়ার প্রভেদ, সূর্য্যের ও খদ্যোতের প্রভেদের

* এ বিষয়ে স্বর্গীয় রামদাস সেন মহাশয় "জৈনমত সমালোচন" প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, সেই সংক্ষিপ্ত জ্ঞাতব্যতত্ত্বপূর্ণ নীতিকথার কয়েকটী মাত্র আমরা এইস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। বঙ্গ-ভাষায় জৈন-মত আলোচনা বিষয়ে, বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই পথপ্রদর্শক বলিয়া মনে করিতে পারি।

স্থায়।' এই জ্ঞান সম্বন্ধে ('দ্রব্যানুযোগ টীকাকারের' ব্যাখ্যায়) আরও লিখিত আছে,—

"জ্ঞানং হি জীবস্য গুণো বিশেষো জ্ঞানং ভবাব্ধেস্তরণেষু পোতঃ।
জ্ঞানং হি মিথ্যাত্বতমোবিনাশে ভানুঃ কৃশানুঃ পৃথুকর্মকক্ষে॥
জ্ঞানং নিধানং পরমং প্রধানং জ্ঞানং সমানং ন বহুক্রিয়াভিঃ।
জ্ঞানং মহানন্দরসং রহস্যং জ্ঞানং পরং ব্রহ্ম জয়ত্যনন্তম্॥
বাহ্যাচারপরাশ্চ বোধরহিতা ইজ্যাখ্যযোগোদ্ধতাঃ।
যে কেঽপি প্রতিসেবনাবিধুরিতাস্তে নিন্দিতাঃ শাসনে॥"

অর্থাৎ,—"জ্ঞান জীবের একটী বিশেষ গুণ, জ্ঞানই ভব-সমুদ্র তরণের নৌকা, জ্ঞানই মিথ্যাভূত অজ্ঞানের বিনাশক। জ্ঞানই কর্ম্মরূপ তৃণের অগ্নি। জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ ও প্রধান, জ্ঞান কোন প্রকার ক্রিয়ার তুল্য হয় না। জ্ঞানই আনন্দ, জ্ঞানই রহস্য, জ্ঞানই পরম ব্রহ্ম। যাহারা রহস্য আচারে রত, যাগ-যজ্ঞযোগে উদ্ধত, প্রতিসেবন অর্থাৎ জ্ঞানবিরহিত, তাহারা জৈনশাস্ত্রসম্মত নিন্দ্য ব্যক্তি।" জিনদত্ত সূরি কৃত 'বিবেক-বিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে যে সকল জৈন-নীতি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার কয়েকটী নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা;—

"গুণিনঃ সূনৃতং শৌচং প্রতিষ্ঠা গুণগৌরবম্। অপূর্ব্বজ্ঞানলাভশ্চ যত্র তত্র বসেৎ সুধীঃ॥ ১।
বালরাজ্যং ভবেদ্যত্র দ্বৈরাজ্যং যত্র বা ভবেৎ। স্ত্রীরাজ্যং মূর্খরাজ্যং বা যত্র স্যাত্তত্র নো বসেৎ॥ ২।
একাকিনা ন গন্তব্যং স্বপেন্নৈকাকিনো গৃহে। নৈবোপরি নাপি পথি বিশেৎ কস্যাপি বেশ্মনি॥ ৩।
দেবা বৃদ্ধাশ্চ ন প্রাজ্ঞৈর্বঞ্চনীয়াঃ কদাচন। ভাব্যং প্রতিভুবা নৈব দক্ষিণেন চ সাক্ষিণা॥ ৪।
বহিস্তোঽভ্যাগতো গেহমুপবিশ্য ক্ষণং সুধীঃ। কুর্য্যাদ্বস্ত্রপরাবর্ত্তং দেহশৌচাদি কর্ম্ম চ॥ ৫।
পেষণী খণ্ডনী চুল্লী গর্গরী বর্দ্ধনী তথা। অমী পাপকরাঃ পঞ্চ গৃহিণো ধর্ম্মবাধকাঃ॥ ৬।
দয়া দানং দমো দেবপূজা ভক্তির্গুরৌ ক্ষমা। সত্যং শৌচং তপোঽস্তেয়ং ধর্ম্মোঽয়ং গৃহমেধিনাম্॥ ৭
হীনোদ্ধরণমদ্রোহো বিনয়েন্দ্রিয়সংযমে। ন্যায়বৃত্তির্মৃদুত্বঞ্চ ধর্ম্মোঽয়ং পাপসংচ্ছিদে॥ ৮।
অতিথীনর্থিনো দুঃস্থান্ ভক্তি শক্ত্যনুকম্পনৈঃ। আগতঃ সোঽতিথিঃ পূজ্যো বিশেষেণ মনীষিণা॥ ৯।
আর্ত্তস্তৃষ্ণাক্ষুধাভ্যাং যো বিত্রস্তো বা স্বমন্দিরং। আগতঃ সোঽতিথিঃ পূজ্যো বিশেষেণ মনীষিণা॥ ১০।
দুষ্প্রাপ্যং প্রাপ্য মানুষ্যং কার্য্যং তৎ কিঞ্চিদুত্তমৈঃ। মুহূর্ত্তমেমপ্যস্য নৈব যাতি যথা বৃথা॥ ১১।

অর্থাৎ—'সুধিগণ সেই স্থানে বসতি করিবেন—যেখানে গুণিজন সত্য শৌচ প্রতিষ্ঠা ও গুণ-গৌরব আছে, এবং যেখানে অপূর্ব্ব জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা আছে। ১। সে রাজ্যে কখনও বাস করিবে না,—যেখানে বালক স্ত্রী বা মূর্খ রাজা বা দুই জন রাজা রাজত্ব করেন। ২। একাকী গমন বা একাকী শয়ন বা উচ্চস্থানে শয়ন বা একাকী কাহারও ঘরে প্রবেশ করিবে না। ৩। প্রাজ্ঞগণ কদাচ দেবতাদিগকে ও বৃদ্ধদিগকে বঞ্চনা করিবেন না; কদাচ কাহারও প্রতিভূ হইবেন না বা সাক্ষ্যদান করিবেন না। ৪। পরিভ্রমণান্তর গৃহে আসিয়া প্রথমে বিশ্রাম করিবে; পরে বস্ত্র পরিত্যাগ করিবে; অবশেষে দেহ-শৌচাদি অর্থাৎ হস্ত-পদাদি প্রক্ষালন করিবে। ৫। পেষণী (জাঁতা), খণ্ডনী (অস্ত্র), চুল্লী (পাকস্থান), গর্গরী (কুম্ভ), বর্দ্ধনী (তৈজস) —গৃহস্থের ব্যবহার্য্য এই পঞ্চবিধ দ্রব্য—ধর্ম্মবাধাপ্রদ ও পাপজনক। ৬। দয়া, দান, দম (ইন্দ্রিয়সংযম) দেবপূজা, গুরুভক্তি, ক্ষমা, সত্য, শৌচ তপস্যা, অস্তেয়—এই গুলিই গৃহস্থ-

দিগের ধর্ম্ম। ৭। হীনজনের উদ্ধার, অদ্রোহ (নির্ব্বিবাদ), বিনয়, ইন্দ্রিয়-সংযম, ন্যায়বৃত্তি, মৃদুত্ব—এই সকল ধর্ম্ম দ্বারা পাপ বিনষ্ট হয়। ৮। অতিথি ভিক্ষার্থী বা দুঃস্থ জন গৃহে উপস্থিত হইলে, ভক্তিসহকারে যথাশক্তি অভ্যর্থনা-পূর্ব্বক আহার্য্য প্রদান করিবে। ৯। আর্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, ক্ষুধার্ত্ত বা সন্ত্রস্ত জন গৃহে উপস্থিত হইলে, যথারীতি তাহার সৎকার করিবে। ১০। মনুষ্য-জন্ম দুর্লভ; সে জন্ম লাভ করিয়া কিঞ্চিৎ সৎকর্ম্ম করিবার জন্যই সর্ব্বদা যচেষ্ট থাকিবে; দেখিও, যেন মুহূর্ত্ত সময়ও বৃথা নষ্ট না হয়। ১১।' সদ্‌গুরু বা অসদ্‌গুরু কাহাকে বলে? পঞ্চ-মহাব্রত, অহিংসা ও সত্য প্রভৃতিরই বা মূল লক্ষ্য কি? আত্মার ও ধর্ম্মের স্বরূপ তত্ত্ব এবং পুণ্য লক্ষনই বা কিরূপ? এ সকল বিষয়েও জৈনশাস্ত্রে যে সকল উক্তি দৃষ্ট হয়, তৎসমুদায়ও অমূল্য নীতিকথার অন্তর্ভুক্ত। সদ্‌গুরু বা অসদ্‌গুরু; যথা—

"মহাব্রতধরা ধীরা ভৈক্ষমাত্রোপজীবিনঃ। সামায়িকস্থা ধর্ম্মোপকদেশকা গুরবো মতাঃ। ১।
সর্ব্বাভিলাষিণঃ সর্ব্বভোজিনঃ সপরিগ্রহাঃ। অব্রহ্মচারিণো মিথ্যোপদেশা গুরবো মতাঃ। ২।

অর্থাৎ—'যিনি পঞ্চ-মহাব্রত পালনশীল, ভিক্ষামাত্রজীবী ধীর, এবং যিনি ধর্ম্ম-সাধনের উপকরণ ভিন্ন অন্য কিছুই সংগ্রহ করেন না; তদ্রূপ ধর্ম্মোপদেষ্টাকেই সদ্‌গুরু বলিয়া জানিবে। আর, যে গুরুর সর্ব্বদ্রব্যে সর্ব্ববিষয়ে অভিলাষ, সর্ব্বদ্রব্য ভোজনে স্পৃহা; যে গুরু গৃহবাসী—ব্রহ্মচারী নহে এবং যে গুরু মিথ্যা উপদেশ দেয়, তাহাকে অসদ্‌গুরু বলিয়া জানিবে।' এইরূপ,—

"অহিংসা সূনৃতাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ। পঞ্চভিঃ পঞ্চভির্যুক্তা ভাবনাভির্বিমুক্তয়ে॥
ন যৎ প্রমাদযোগেন জীবিতব্যপরোপণম। ত্রসানাং স্থাবরাণাঞ্চ তদহিংসাব্রতম্ মতং॥
প্রিয়ং পথ্যং বচস্তথ্যং সূনৃতব্রতমুচ্যতে।"

অর্থাৎ,—'অহিংসা সূনৃত অস্তেয় ব্রহ্মচর্য্য অপরিগ্রহ—এই পঞ্চ কার্য্য মহাব্রত নামে অভিহিত। ১। ইহার মধ্যে অহিংসা বলিতে ত্রসজীব এবং স্থাবরজীব অর্থাৎ একেন্দ্রিয় দ্বীন্দ্রিয় প্রভৃতি হইতে পৃথিবীজীব বায়ুজীব প্রভৃতি কোন জীবের ভ্রমক্রমেও কদাচ অনিষ্ট না করা। ২। সূনৃত বলিতে সেই বাক্যকে বুঝায়, যে বাক্যে জীবের মঙ্গল, হর্ষ ও পরিণাম সুখকর হয়।' ধর্ম্মই বা কি, আর আত্মাই বা কি, তৎসম্বন্ধে এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়;—

"যথাবস্থিততত্ত্বানাং সংক্ষেপাদ্বিস্তরেণ বা। যোহববোধস্তমত্রাহুঃ সম্যক্‌জ্ঞানং মনীষিণঃ॥
যঃ কর্ত্তা কর্ম্মভেদানাং ভোক্তা কর্ম্মফলস্তচ। সংসর্ত্তা পরিনির্বাতা সহ্যাত্মা নান্যলক্ষণঃ॥

অর্থাৎ—'যথাবস্থিত তত্ত্ব (শাস্ত্রোক্ত উপদেশ) সংক্ষেপে বা বিশদ ভাবে অবগত হইয়া যে জন তাহার সম্যক্ জ্ঞানের অধিকারী হন, সেই মনীষি ব্যক্তিই প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ—সম্যক্-জ্ঞানসম্পন্ন। যে কর্ম্মকর্ত্তা, কর্ম্মফলভোক্তা, সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা কর্ম্মফল ধ্বংস করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই প্রকৃত আত্মা; আত্মার অন্য লক্ষণ নাই।' বলা বাহুল্য, এ সকল নীতি-কথা সকল কালে সকল শাস্ত্রেই বিঘোষিত হইয়া আসিয়াছে। পেষণী প্রভৃতি পঞ্চব্যবহার্য্য দ্রব্যে ধর্ম্মবাধক পাপ জন্মে,—এ উক্তি, মন্বাদি শাস্ত্রে উপদিষ্ট পঞ্চসূনা পাপের লক্ষণাদির প্রতিধ্বনি নহে কি? এইরূপ, আত্মজ্ঞান আত্মদর্শন প্রভৃতি বিষয়ক উপদেশও সনাতন ধর্ম্মের সনাতন বাক্য ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

—— * ——

দশম পরিচ্ছেদ।

জৈনশাস্ত্রের শিক্ষা।

[শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের—গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ,—সংযমে সে সম্বন্ধের দৃঢ়তা ;—পরীষহ, অপবিত্রতা, ইচ্ছামৃত্যুর প্রসঙ্গ ;—ভণ্ডতপস্বীর ও তৃষ্ণাত্যাগীর দৃষ্টান্ত ;—জীবনের ক্ষণভঙ্গুরত্ব ;—প্রকৃত জ্ঞানীর লক্ষণ ;—ভিন্ন ভিন্ন ভিক্ষুর জীবনের দৃষ্টান্ত; নির্গ্রন্থের আচার-লক্ষণ ;—বিবিধ দৃষ্টান্ত ;—নির্গ্রন্থের কর্ত্তব্য-বিষয়ক দৃষ্টান্ত ;—ত্যাগী ও শমাচারী,—তদ্বিষয়ক দৃষ্টান্ত ;—বিবিধ বক্তব্য।]

জ্ঞানের মূল—শিক্ষা। শিক্ষার উদ্দেশ্যেই শিক্ষকের সহিত শিক্ষার্থীর সম্বন্ধ। গুরু জ্ঞান-রত্ন বিতরণ করেন; শিষ্য যত্ন-সহকারে সে রত্ন সংগ্রহ করিয়া লয়। শিক্ষক ভিন্ন শিক্ষালাভ হয় না; দাতা ভিন্ন দান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আবার শিক্ষার্থী ভিন্ন শিক্ষালাভে কেহ কখনও সমর্থ হয় না; দানপ্রার্থী না হইলে দাতার দান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অপিচ, যেরূপ দাতার নিকট যে প্রকার দানের প্রার্থী হইবে, যোগ্যতাও তদনুরূপ হওয়া আবশ্যক। যে মুষ্টিভিক্ষুক, সে কি কখনও রাজ-পদের প্রার্থী হইতে পারে? বর্ণমালা যাহার অধিগত হয় নাই, সে কি কখনও কাব্য-মহাকাব্যের রসাস্বাদে সমর্থ হয়? সুতরাং, যে সামগ্রী লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা করিবে, উপযুক্ততা তদনুরূপ হওয়া আবশ্যক। এই কারণেই শাস্ত্রে গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ-বিচার অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়। গুরুই বা কিরূপ গুণ-সম্পন্ন হইবেন, আর শিষ্যই বা কিরূপ গুণে গুণান্বিত হইবেন,—এ প্রসঙ্গ প্রায়শঃ উত্থাপিত হইয়া থাকে। কোনও শাস্ত্র অধ্যয়নের পূর্ব্বে, অথবা জ্ঞানমার্গের কোনও স্তরে প্রবেশ করিবার অগ্রে, আপনার ক্ষমতা-অক্ষমতার বিষয় বিশেষভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। যেমন ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মগ্রন্থে, তেমনই জৈনশাস্ত্রে, এ সম্বন্ধে বিশেষ বিধি দৃষ্ট হয়। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, যিনি ধর্ম্মপথের পথিক হইতে চাহেন, প্রথমে তাঁহাকে 'বিনয়' শিক্ষা করিতে হইবে। জৈনশাস্ত্রানুমত 'বিনয়' যে কি কঠোর সংযম-সাধনা-সাপেক্ষ, সে আভাষও পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। * শিক্ষার উহাই প্রথম সোপান। জৈনধর্ম্ম-মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে, সেই সোপানের প্রতি প্রথম লক্ষ্য করিতে হয়। শিক্ষার্থীর পক্ষে বিনয় প্রথম শিক্ষণীয়। সত্যবাদী, মিতভাষী, আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া গুরুর নিকট ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে; গুরুর ভৎসনায় ক্রোধ-সঞ্চার হইলে চলিবে না, সর্ব্বথা সহিষ্ণুতার আদর্শ দেখাইতে হইবে। শিক্ষার্থী তবে শিক্ষার অধিকারী হইবে। শিক্ষার্থী কেমন হইবেন, তাহার লক্ষণ,—

শিক্ষার মূল—সংযম-সাধনা।

"নাপুট্ঠো বাগরে কিংচি পুট্ঠোবা নালিয়ং বএ। কোহং অসচ্চং কুব্বেজ্জা ধারেজ্জা পিয়মপ্পিয়ং। ১।
অপ্পাচেব দমেয়ব্বো। অপ্পাহু খলু দুদ্দমো। অপ্পাদংতো সুহী হোই অস্সিংলোএ পরত্থয়। ২।

---

* এই খণ্ডের ৮০ পৃষ্ঠায় 'বিনয়' সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য-তত্ত্ব লিখিত হইয়াছে।

অপ্পং মে অপ্পাদংতো সংযমেণ তবেণয়। মাহং পরেহিং দম্মংতো বংধণেহিং বহেহিয়। ৩।
পডিণীয়ংচ বুদ্ধাণং বায়া অদুব কম্মুণা। আবীবা জইবা রহস্সে নেবকুজ্জা কয়াইবি। ৪।"

মর্ম্মার্থ,—'যিনি শিক্ষার্থী, তিনি কখনও অজিজ্ঞাসিত অবস্থায় বাক্যোচ্চারণ করিবেন না; জিজ্ঞাসিত হইলেও কোনও প্রশ্নের উত্তরে কদাচ মিথ্যা বাক্য কহিবেন না। তিনি কখনও রাগের বশীভূত হইবেন না; সুখজনক অথবা দুঃখজনক—সকল অবস্থাতেই তিনি নিস্পৃহ থাকিবেন। ১। আত্মসংযম কর; আত্মসংযম বড় কঠিন। যদি আত্মসংযমে সমর্থ হও, ইহলোকে ও পরলোকে, সর্ব্বত্র সুখী হইতে পারিবে। ২। বন্ধনে বা দৈহিক ক্লেশ-সহনে আত্মজয়ী হওয়া যায় না; সংযম-সাধনাই আত্মজয়ের প্রধান অস্ত্র। ৩। জ্ঞানান্বেষী জন কদাচ গুরুজনের অপ্রীতিকর কোনরূপ কার্য্য করিবেন না। তাঁহার বাক্যে বা কার্য্যে, গোপনে বা প্রকাশ্যে, কদাচ গুরুজনের প্রতি অসম্মানের ভাব আসিবে না। ৪।'

'বিনয়' সংযম-সাধনা-সাপেক্ষ। 'পরীসহ' তদন্তরায়ভূত। দ্বাবিংশ পরীসহ-প্রসঙ্গে সে আভাষ প্রদত্ত হইয়াছে। ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিবার পথে প্রথমেই ক্ষুধা-তৃষ্ণা-রোগ-শোক প্রভৃতি অন্তরায় আসিয়া উপস্থিত হয়। মহাবীর স্বামী তাই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন,—'সাবধান! যেন পরীসহ আসিয়া তোমায় অভিভূত না করে। সন্ন্যাস-আশ্রমে প্রবেশ করিবার সময় প্রথমেই দ্বাবিংশ পরীসহের স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি করিবে; তার পর তাহাদিগকে দৃঢ়তার সহিত জয় করিবে। দেখিও, যেন ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, লোভ, মোহ প্রভৃতি পরীসহ আসিয়া কখনও তোমায় আক্রমণ করিতে না পারে।' পরীসহ-বিজয় বিষয়ে জৈনশাস্ত্রে এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়; যথা,—

পরীসহ।

"ইমে খলু তে বাবীসং পরীসহা সমণেণং ভগবয়া মহাবীরেণং কাসবেণং পবেইয়া। জে. ভিক্খু সোচ্চানচ্চাজিচ্চা অভিভূয়ভিক্খায়রিয়াএ পরিব্বয়ংতো পুট্ঠো নো বিহংনিজ্জা। দিগিংচ্ছা পরীসহে (১) পিবাসা পরীসহে (২) সীয় পরীসহে (৩) উসিণ পরীসহে (৪) দংস মসগ পরীসহে (৫) অচেল পরীসহে (৬) অরই পরীসহে (৭) ইত্থী পরীসহে (৮) চরিয়া পরীসহে (৯) নিসীহিয়া পরীসহে (১০) সিজ্জা পরীসহে (১১) অক্কোস পরীসহে (১২) বহ পরীসহে (১৩) জায়ণা পরীসহে (১৪) অলাভ পরীসহে (১৫) রোগ পরীসহে (১৬) তণফাস পরীসহে (১৭) জল্ল পরীসহে (১৮) সক্কার পুরক্কার পরীসহে (১৯) পন্না পরীসহে (২০) অন্নাণ পরীসহে (২১) দংসণ পরীসহে (২২) পরীসহাণং পবিভত্তী কাসবেণং পবেইয়া তংভে উদাহরিস্সামি আণুপুর্ব্বিং সুণেহমে।" *

ইহার পর একে একে প্রত্যেক পরীসহের বিশেষভাবে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। আর, সঙ্গে সঙ্গে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে, কি বাহ্য কি মানস—সকল উপদ্রবেই চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। রৌদ্র বৃষ্টি ঝঞ্ঝাবাত, ক্ষুধা তৃষ্ণা রোগ শোক, লজ্জা ভয় অপমান, সুখ সন্তাপ মোহ—কিছুরই প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিলে চলিবে না। যুদ্ধক্ষেত্রে মত্ত-

* এই দ্বাবিংশ পরীসহের সংজ্ঞা, উচ্চারণ ও বর্ণবিন্যাস প্রভৃতি সম্বন্ধে বিবিধ গ্রন্থে পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। এই খণ্ডের ৭০ পৃষ্ঠায় পরীসহ (পরিসহ, পরীবহ) বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে বিষয়টী বোধগম্য হইবে।

হস্তী যেমন আততায়ীকে বিনাশ করে, সেই ভাবে বহিরভ্যন্তরের সমস্ত শত্রুকে পরাজয় করিতে হইবে;—"নাগো সংগাম সীসেবা স্থরো অভিহণে পরং।" সর্ব্ব বিষয়ে সম্পূর্ণরূপ অরতি হওয়া চাই। রতির—আসক্তির এক প্রধান আশ্রয়-স্থান—রমণী। অন্যান্য প্রসঙ্গেও রমণীর সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত, পরীসহ-প্রসঙ্গেও জৈনশাস্ত্র সেই উপদেশ দিতেছেন; যথা,—

"সংগো এস মণুস্সাণং জাও লোগংসি ইত্থিও। জস্স এয়া
পরিন্নায়া সুকউং তস্স সামণং॥ এব মাদায় মেহাবী
পংকভূয়াও ইত্থিও। নো তাহিং বিহন্নেজ্জা চরেজ্জও গবেসএ॥"

অর্থাৎ,—'ইহসংসারে রমণীর প্রতি মানুষের আসক্তি স্বাভাবিক। যিনি তাহা উপলব্ধি করিয়া সে আসক্তি পরিহার করিতে পারেন, তিনিই শ্রমণ-ধর্ম্ম পালন করিতে সমর্থ হন। যে মেধাবী পুরুষ রমণীকে পঙ্কস্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাহাতে লিপ্ত না হন, পরন্তু আত্মচিন্তায় অভিনিবিষ্ট থাকেন, রমণী হইতে তাঁহার কোনই অনিষ্ট সাধিত হয় না।' মুক্তিকামী সন্ন্যাসীর সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—ইহজীবনই কর্ম্মের শেষ নহে। সংযম-সাধনার দ্বারা উন্নত অবস্থা লাভ হইতে পারে। এই বুদ্ধি লইয়া যাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হন, তাঁহারাই পরীসহ-বিজয়ে সমর্থ হইতে পারেন। সৎকর্ম্মের ফল—এ জীবনে না হয়, পরজন্মে প্রাপ্ত হইব,—এই সত্যতত্ত্ব প্রাণে প্রাণে ধারণা করিয়া মানুষ সৎকর্ম্ম-শীল হও; তোমার মুক্তির পথ কেহই রোধ করিতে সমর্থ হইবে না।

পরম তত্ত্ব-চতুষ্টয়।

ইহসংসারে মোক্ষসাধনের উপায়স্বরূপ চারিটী পরম তত্ত্ব আছে। বহুজন্মের পুণ্যপুঞ্জ-ফলে সে তত্ত্ব অধিগত হয়। সেই পরম তত্ত্ব-চতুষ্টয়ের আদিভূত—মনুষ্যজন্ম। বিশ্বসংসারে অনন্ত প্রাণিপর্য্যায় বিচরণ করিতেছে। কিন্তু দুর্লভ—এই মনুষ্যজন্ম। সৃষ্টির এই শ্রেষ্ঠ-সুন্দর মনুষ্য-জন্ম, কত সাধনার ফলে যে লাভ করা যায়, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? কত কোটী কোটী জন্মের অভ্যন্তরে বিচরণ করিয়া পরিশেষে মনুষ্য-জন্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়! পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ—তাহাদের জীবন—আহার বিহার শয়ন স্বপন প্রভৃতিতে অতিবাহিত হয়। সে সকল জন্মে এমন কর্ম্ম সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না,—যদ্দ্বারা উচ্চগতি লাভ করিতে পারা যায়। কিন্তু মনুষ্যজন্মের কর্ম্মফলে উচ্চ ও নীচ উভয় গতিই মনুষ্যের আয়ত্তাধীন। সেই জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—মনুষ্যজন্ম লাভ এক পরম-তত্ত্ব লাভ। দ্বিতীয় পরম তত্ত্ব—ধর্ম্মলাভ। শ্রুতিধর্ম্ম শ্রবণ, শ্রুতিধর্ম্মে শ্রদ্ধা, শ্রুতিধর্ম্মে রুচি অর্থাৎ ধর্ম্মবিশ্বাস—ইহাই হইল তৃতীয় তত্ত্ব। মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া যিনি 'ধর্ম্ম কি'—তাহা জানিতে পারিয়াছেন, আর 'ধর্ম্ম কি'—তাহা জানিয়া তৎসম্বন্ধে শ্রদ্ধাবান হইতে পারিয়াছেন;—ত্রিবিধ তত্ত্ব তাঁহারই অধিগত হইয়াছে। চতুর্থ তত্ত্ব—সংযম-সাধনা। সংযমে সাধ্বাচার-পালনে যাঁহার বীর্য্য-সামর্থ্য-শক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে, চতুর্থ তত্ত্ব তাঁহারই অধিগত। এ বিষয়ে জৈনশাস্ত্রের উক্তি,—

"চত্তারি পরমংগাণি দুল্লহাণী হজংতুণো। মাণুসত্তং সুইসদ্ধা সংজমংমিয়বীরিয়ং॥
চউরংগং দুল্লহং নচ্চা সংজমং পড়িবজ্জিয়া। তবসা ধুয় কম্মং সেসিদ্ধে হবই সাসএত্তিবেমি॥"

অর্থাৎ,—'চতুর্ব্বিধ পরম তত্ত্ব অবগত হইয়া যিনি আত্মসংযমশীল স্বধর্ম্মপরায়ণ, তাঁহার

কর্ম্মাবশেষ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, এবং তিনি সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হন।' বিনয়ে যাহার সূচনা, পরীসহে যাহার পরীক্ষা, পরমতত্ত্ব অধিগত হওয়ায় তাহার চরমোৎকর্ষ—সিদ্ধিলাভ।

জন্ম-জন্মান্তরের বহু পুণ্যফলে মনুষ্য-জীবন লাভ করিয়াছ। মানুষ! মনে রেখ—এ জীবন চিরস্থায়ী নয়; মনে রেখ—তোমার ইচ্ছায় এ জীবন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না; মনে রেখ—আয়ুঃকাল দিন দিন ক্ষয় পাইয়া আসিতেছে; মনে রেখ—সময় অতীত হইলে, বার্দ্ধক্য আসিয়া আক্রমণ করিলে, আর অবসর পাইবে না। সুতরাং সতর্ক হও। পাপকর্ম্মে কখনও সুখ নাই। কুকর্ম্মের দ্বারা ধনসঞ্চয় করিয়া যে জন সুখী হইবার আকাঙ্ক্ষা করে, কামনার পাশে আবদ্ধ হইয়া সে জন দুঃসহ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। এ বিষয়ে জৈনশাস্ত্রের উক্তি; যথা,—

পবিত্রতা ও অপবিত্রতা।

"জে পাব কর্ম্মে হিংধণং মণূসা সমায়য়ংতী অময়ং গহায়
পহায়তে পাস পয়ট্টিএ নরে বেরাণুবদ্ধা নরয়ং উবেংতি।"

অসৎ কর্ম্মের দ্বারা, অপকর্ম্মের দ্বারা মানুষ যে নরকে পাশবদ্ধ হয়, সে কেমন? না—'চোর যেমন সিঁধের মধ্যে প্রবেশ করিতে গিয়া ধৃত হয় ও গুরু দণ্ড প্রাপ্ত হয়; এ জীবনে ও পরজীবনে দুষ্কর্ম্মকারীর অবস্থাও তদ্রূপ।' অপরের জন্যই অনুষ্ঠিত হউক বা আত্মসুখের অভিলাষেই অনুষ্ঠিত হউক, পাপকর্ম্মের ফলভোগ তোমার নিজেকেই করিতে হইবে। আত্মীয়-স্বজন কেহই তোমার সে পাপ-কর্ম্মের ফলভাগী হইবে না। অসতর্ক জনকে ইহলোকে বা পরলোকে রক্ষা করিবার কেহই নাই। অর্থ-সম্পৎ কখনও কাহাকেও পাপকর্ম্মের ফলভোগ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। যে জন পাপাচারী, সে জন ধর্ম্মপথ দেখিয়াও দেখিতে পায় না। আলোক নির্ব্বাপিত হইলে, অন্ধকারে যেমন কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, জ্ঞানের অভাবে মানুষও সেইরূপ সকলই অন্ধকারময় দেখে।

"তেণে জহা সংধি মূহে গহীএ স কম্মুণা কিচ্চই পাবকারী। এবং
পয়া পেচ্চ ইহংচ লোএ কডাণ কম্মাণ ন মোক্‌খ অত্থি॥ সংসার মাবণ্ণ
পরস্‌স অট্টা সাহারণং জংচ করেই কম্ম কম্মস্‌স তে তস্‌স উবেই কালে
ন বংধ বাবংধবয়ং উবেংতি॥ বিত্তেণতাণং ন লভে পমত্তে ইমস্‌সিলীএ
অদুবাপরত্থা। দীবপ্পণট্ঠেব অণংতমোহেনেয়াউয়ং দট্ঠুম দট্ঠুমেব॥"

অজ্ঞানী নিদ্রিত থাকেন; জ্ঞানিজন সদা সতর্ক ও সদা জাগরূক আছেন। পাপ নিয়ত প্রলোভন-জাল বিস্তার করিয়া মানুষকে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছি। সুতরাং প্রতিপদবিক্ষেপে সতর্কতা প্রয়োজন। পাপের প্রলোভনে বশীভূত না হইয়া, কামনাকে দমন করিয়া, শিক্ষিত অশ্বের যুদ্ধক্ষেত্রে গমনের ন্যায়, যিনি সংসারে বিচরণ করিতে পারেন, মোক্ষ তাঁহারই অধিগত হয়। পাপজনিত অপবিত্রতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। বাহ্যবস্তু সর্ব্বদা চিত্তকে চঞ্চল করিবার জন্য চেষ্টা পাইতেছে; সুতরাং চিত্তকে সর্ব্বদা বাহ্যবস্তু হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা কর। ভ্রান্তি দূর কর। অহঙ্কারে জলাঞ্জলি দাও। প্রবঞ্চনা পরিহার কর। কামনা বিসর্জ্জিত হউক। উহাই পবিত্রতা। যাহারা অপবিত্র, পাপী ও মিথ্যার বশীভূত, তাহারাই কেবল অনুরাগের ও বিরাগের অধীন,—তাহারাই কেবল কামনার দুঃস

হইয়া আছে। সেরূপ মানুষকে অপবিত্র বলিয়া জানিবে; আর জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ধর্ম্মানুরাগী থাকিবে। যাহারা পাপী, তাহারা কামনার দাস; যাঁহারা নিষ্পাপ, তাঁহারাই নিষ্কাম।

"মংদায় কাসা বহুণী হপিজ্জা তহপ্পগারেসু মণং ন কুজ্জা। রকৃখেজ্জ কোহং বিণএজ্জ-মাণং মায়ং ণসেবেজ্জপহেজ্জলোহং॥ জে সংখয়া তুচ্ছ পরপ্পবাইতেপেজ্জ দোসাণু-গয়া পরোজ্ঝা এএ অহ স্মোত্তি দুগংছমাণোকংখেগুণে জাব সরীরভে উত্তিবেমি।"

সত্য বটে, ইহসংসারে পাপীর লক্ষণ—সকাম; আর নিষ্পাপ যিনি, তিনি নিষ্কাম (অকাম)। কিন্তু একটী বিষয়ে এ ভাবের ব্যত্যয় দেখি! সেখানে উভয়ে পরস্পর আর এক বিপরীত-ভাবাপন্ন। সেখানে—নিষ্পাপ যিনি, তিনি সকাম; আর পাপী যিনি, তিনি অকাম। সে কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ বিষয় সম্বন্ধে? শাস্ত্র বলিতেছেন—মরণ-সম্বন্ধে। সকল বিষয়েই মানুষের কামনা দেখি; কিন্তু মরণ-সম্বন্ধে মানুষ সম্পূর্ণরূপ কামনা-রহিত। মৃত্যুর জন্য মানুষ কখনও কামনা করে না; তাই মৃত্যু দুই প্রকার; ইচ্ছা-মৃত্যু ও অনিচ্ছা-মৃত্যু; সকাম মরণ ও অকাম মরণ। যথা;—

সকাম ও অকাম মরণ।

"সংতিমেয় দুবেটাণা অকৃখায়া মরণং তিয়া।
অকাম মরণংচেব সকাম মরণং তহা॥
বালাণং অকামংতু মরণং অসইং ভবে।
পংডিয়াণং সকামংতু উক্কোসেণং সইং ভবে।"

অজ্ঞানী মূঢ় জনের মৃত্যু—অকাম মরণ নামে অভিহিত হয়। তাহারা মৃত্যু চাহে না বলিয়াই পুনঃপুনঃ জন্মের অধীন হয়। পাপরূপ কর্ম্ম-বন্ধন মরণের পরেও তাহাদিগকে সংসারে টানিয়া আনে। কিন্তু যাঁহাদের মৃত্যু সকাম, অর্থাৎ সংসারের কোনও মায়া-মমতা যাঁহাদিগকে আবদ্ধ করিতে পারে নাই, পরন্তু মৃত্যুই যাঁহাদের একমাত্র কামনার বিষয় হইয়াছে, তাঁহাদিগকে আর কখনও জন্ম জরা-মরণের আবর্ত্তে কষ্ট পাইতে হয় না; কামনানুরূপ মৃত্যু—মহানির্ব্বাণ—তাঁহাদেরই অধিগত হয়। মহাবীর স্বামী বলিয়া গিয়াছেন,—"মূঢ়জন ইহলৌকিক সুখের জন্য কত জীবের প্রতি কত নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়া থাকে। যাহারা ঐহিক সুখে ও আমোদে আসক্ত, তাহারা কি বিষম ভ্রান্তিজালে আবদ্ধ আছে! তাহারা মনে করে—'পরলোক কখনও দেখি নাই, কিন্তু ইহলোকের সুখ প্রত্যক্ষীভূত।' তাহারা আরও বলে—'তোমার ইহজীবনের সুখ তোমার আয়ত্তাধীন। কিন্তু পরজীবন অনিশ্চিত। পরলোক আছে কি না, কে বলিতে পারে?' এবম্বিধ চিন্তার ফলে, লোকান্তরে অবিশ্বাসবান হইয়া অজ্ঞানী জন যত-কিছু পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। সেই অবিশ্বাসের ফলেই প্রাণিহত্যা মিথ্যা প্রবঞ্চনা কপটতা মদ্যপান মাংসাহার প্রভৃতি অপকর্ম্ম করিয়াও সৎকার্য্য করিতেছি বলিয়া মানুষ মনে করে। আর তাহারই ফলে তাহাদিগকে পুনঃপুনঃ জন্ম-জরা-মরণের যন্ত্রণা ভুগিতে হয়।" এ যে নির্ব্বুদ্ধিতার ফল, এ যে অজ্ঞানতার পরিণাম, জৈনশাস্ত্র একটী সুন্দর উপমায় এইরূপে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন; যথা,—

"জহাসাগডিউজ্জাণং সমং হিচ্চা মহাপহং বিসমং মগ্‌গ মোইণো অকৃখে ভগ্‌গংমি সোয়ঈ।
এবং ধম্মং বিউকম্ম অহম্মং পড়িবজ্জিয়া বালে মচ্চু মুহং পত্তে অকৃখে ভগ্‌গেব সোয়ঈ॥"

অর্থাৎ,—'যেমন কোনও শকটবান, অজ্ঞানতা নিবন্ধন, সমতল পথ পরিত্যাগ করিয়া বন্ধুর পথে শকট পরিচালনা করিতে গিয়া শকটের অক্ষভঙ্গে অনুশোচনার অন্তর্দাহে দগ্ধীভূত হয়; সেইরূপ অজ্ঞজন, ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া অধর্ম্ম-পথ গ্রহণ পূর্ব্বক, অনুতাপের দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করে।' মৃত্যু সম্মুখীন বুঝিয়া অজ্ঞজন আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠে। তখন, মৃত্যু আসিয়া কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে লইয়া চলিয়া যায়। তাহার সেই মৃত্যুই অকাম-মৃত্যু—অনিচ্ছা-মৃত্যু। আর, যাঁহারা মৃত্যু নিকট দেখিয়া আনন্দিত হন, আনন্দে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারেন, তাঁহাদেরই মৃত্যু—সকাম মৃত্যু—ইচ্ছা-মৃত্যু। জ্ঞানিজন দুই প্রকার মৃত্যুরই স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত আছেন, দুই প্রকার মৃত্যুরই সাফল্য-অসাফল্য তুলাদণ্ডে পরিমাপ করিয়া দেখিয়াছেন; দেখিয়া, তাঁহারা পরিশেষে সকাম-মৃত্যুরই—ইচ্ছা-মৃত্যুরই অনুসরণ করিয়াছেন।

যাহারা সত্য তত্ত্ব অবগত নহে, তাহারাই দুঃখ-কবলিত; তাহারাই অনন্ত সংসারে অনন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। চটুল ও চতুর বাক্যে মুক্তি অধিগত হয় না। দার্শনিক বিতর্কেও মোক্ষ-লাভ সম্ভবপর নহে। ভণ্ডজন শুধুই বিতর্কের ছটায় মনুষ্যকে ভুলাইতে চায়। মূঢ়জন পাপ-কর্ম্মের ফলে কেবলই অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে; অথচ, তাহারা আপনাদিগকে বিজ্ঞ বলিয়া বড়াই করিয়া আসিতেছে। ফলতঃ, পার্থিব পদার্থে অনুরক্ত আত্মতত্ত্ব অনভিজ্ঞ ভণ্ডজনের মুক্তি কখনই নাই। অপিচ,—

ভণ্ডের মুক্তি নাই।

"জে কেই সরীরে সত্তা বণ্ণে রূবেয় সব্বসো।
মণসা কায় বক্কেণং সব্বেতে দুক্খ সংভবা॥"

যে জ্ঞানবাদী, শারীরিক সুখান্বেষী হইয়া, গৌর আদি বর্ণের, সুন্দর-নয়ন-নাসাদি অবয়বের ও শব্দ-রস-গন্ধ-স্পর্শাদি গুণের অনুরাগী হয়, এবং কায়মনোবাক্যে তৎসমুদায়ে সংলিপ্ত থাকে; তাহাকে নিশ্চয়ই দুঃখভাগী হইতে হয়। সে জন মৃগপতঙ্গমীনমধুপমাতঙ্গবৎ ইহলোকে যথামরণ দুঃখভাগী এবং পরলোকে আত্মধ্যানে মৃত্যু-হেতু অশেষ দুঃখের অধিকারী হয়।

মানুষ জন্মজন্মান্তরে ঐহিক সুখের দাস হইয়া রহিয়াছে। ঐহিক সুখে যাহারা আপনাদিগকে সুখী বলিয়া মনে করে, তাহাদের অবস্থার সহিত একটী গৃহপালিত মেষের তুলনা হইয়া থাকে। গৃহস্থ যেমন মেষ-শাবককে দৈনন্দিন খাদ্যদানে পরিপুষ্ট করে, এবং শেষে একদিন তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া অতিথি-অভ্যাগতের বা আত্মীয়-অন্তরঙ্গের উদরপূর্ত্তির সহায়তা করে; মানুষের সাংসারিক সুখভোগও সেই প্রকার। ইন্দ্রিয়সমূহ নিত্য-নূতন উপভোগ্য দ্রব্যে যখন আকৃষ্ট অভিভূত হইয়া পড়ে, কালের করাল হস্ত আসিয়া তখনই তাহার মুণ্ডচ্ছেদে প্রবৃত্ত হয়;—নিত্য-নূতন তৃণাদি ভক্ষণজনিত সুখে আত্মহারা মেষশাবকের পরিণতির ন্যায় ইন্দ্রিয়সুখ-প্রমত্ত মানুষের পরিণাম দুঃখকর হইয়া আসে। এইরূপ আর একটী দৃষ্টান্ত আছে। তিন জন বণিক বিদেশে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন। একজন যথেষ্ট লাভবান হন। দ্বিতীয় ব্যক্তি মূলধন মাত্র লইয়া দেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। তৃতীয় ব্যক্তি যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া আসেন। মানুষের জীবন-নাট্য এইরূপ প্রহেলিকাময়। মর্ম্মার্থ অনুধাবন করিয়া, মানুষ,

ঐহিক ও অনন্ত সুখ।

ধর্ম্ম-পথের পথিক হও। তোমার মূলধন—মনুষ্যজন্ম। যদি লাভবান হও—সে স্বর্গ। মূলধনের বিনাশ অর্থ—দুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্ম ভ্রষ্ট হইয়া নরকের কীটমধ্যে বা নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ। সকল পথই তোমার জন্য মুক্ত রহিয়াছে; লাভালাভ তোমার কর্ম্ম-সাপেক্ষ। যদি লাভবান হইতে চাও, কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন কর; যদি ডুবিয়া মরিবার অভিলাষ থাকে, তবে স্রোতে যেমন গা ভাসাইয়া দিয়াছ, তাহাতেই শেষ হইবে। যে জন কামের ক্রীতদাস হইয়া আছে, তাহারই মূলধন পর্য্যন্ত নষ্ট হইতে বসিয়াছে;—মনুষ্য-জন্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া তাহাকে নীচ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। মনুষ্যত্ব-রূপ তাহার যে মূলধন ছিল, কামনার বশীভূত হইয়া অপব্যয়ে সে ধন সে যে উড়াইয়া দিল! এইরূপ, যে জন কেবলমাত্র মূলধন লইয়া ফিরিয়া আসিল, সে কেবল আপনার মনুষ্যত্বটুকু বজায় রাখিয়াছিল মাত্র; অর্থাৎ, সংসারে থাকিয়া গৃহীর যেটুকু কর্ত্তব্য, সেইটুকু মাত্র পালন করিতে সমর্থ হইয়াছিল; অধিক আর কিছু করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু যিনি, মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া মনুষ্যের অধিক কর্ত্তব্য পালন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; অমানুষিক গুণ-গরিমার পরিচয় দিতে পারিয়াছিলেন; তিনিই লাভবান হইয়াছেন,—অনন্ত সুখের অধিকারী হইতে পারিয়াছেন। পার্থিব সুখ আর কতটুকু সুখ? কুশাগ্রে নিপতিত জলবিন্দু যেমন মহাসমুদ্রের অনন্ত জলরাশির সহিত তুলিত হইতে পারে না, স্বর্গীয় সুখের তুলনায় ইহজগতে মনুষ্যের সুখ ততটুকু মাত্র। কুশাগ্রে পতিত একবিন্দু জলবৎ ঐহিক সুখের কামনায়, কেন মানুষ অনন্ত অসীম সুখ-সমুদ্রকে উপেক্ষা করিতেছে? এ সকল বিষয়ে জৈনশাস্ত্রে বড় সুন্দর উক্তি দৃষ্ট হয়।

তদুক্ত তিন জন বণিকের লাভালাভ প্রসঙ্গ; যথা,—

"জহায়তিন্নিবণিয়ামূলংঘিত্তুণনিগ্গয়া। এগোতথলহএ লাভং এগোমূলেণ আগও॥
এগো মূলংপি হারিত্তা আগও তথ বাণিও ববহারে উবমাএসা এবং ধম্মে বিয়াণহ॥
মাণুসত্তং ভবেমূলং লাভো দেব গঈভবে। মূল ছেএণ জীবাণং নরগং তিরক্খত্তণং ধুবং॥" *

কুশাগ্রে জলবিন্দু ও মহাসমুদ্রে জল-রাশির সহিত ঐহিক সুখের ও অনন্ত সুখের তুলনা;—

"দারং জহাকুসগ্গে উদযং সমুদ্দেণ সমংমিণে।
এবং মণুস্সয়াকামাদেবাদেবকামাণ অংতিএ॥
কুসগ্গমিত্তা ইমেকামা সন্নিরুদ্ধংমি আউএ।
কস্স হেউং পুরাকাউং জোগক্খেমং নসংবিদে॥"

---

* বাইবেলের অন্তর্গত ম্যাথু (Mathew, XXV, 14) এবং লুক (Luke, XIX, 11) গ্রন্থে তিন জন বণিকের একটী প্রসঙ্গ আছে। তাহা উত্তরাধ্যয়নের উল্লিখিত আখ্যায়িকার সহিত সাদৃশ্যসম্পন্ন। কেহ কেহ এই জন্য অনুমান করেন যে, বাইবেল হইতে ঐ উপমা পরিগৃহীত হইয়া থাকিবে। কিন্তু হারমান জ্যাকোবি এ বিষয়ে বিশেষরূপ আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—"Taking into consideration (1) that the Gaina version contains only the essential elements of the parable, which in the Gospels are developed into a full story; and (2) that it is expressly stated in the Uttaradhyayana, VII, 15, that 'this parable is taken from common life', I think it probable that the Parable of the Three Merchants was invented in India, and not in Palestine."

যিনি জ্ঞানী জন, তিনি পাপীর ও পুণ্যবানের অবস্থা তুলনা করিয়া, পাপীর অবস্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুণ্যবানের অবস্থা গ্রহণ করিবেন। সেই ব্যক্তিই প্রকৃত মুনিপদবাচ্য।

"তুলিয়াণ বালভাবং অবালং চেব পংডিএ।
চইউণ বালভাবং অবালং সেবই মুণিত্তিবেমি॥"

এই অনন্ত দুঃখপূর্ণ সংসারের দুঃখবন্ধন হইতে কি প্রকারে পরিত্রাণ লাভ হইবে? সাধকের চিত্তে যখনই এই চিন্তার উদয় হয়, যখনই তিনি সংসারের অনন্ত দুঃখের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখনই তাঁহার মনে সত্যের আলোক উদ্ভাসিত হয়। ঐহিক সুখের লালসা পরিত্যাগ করা বড়ই কঠিন। একদিকে আত্মীয়জনের স্নেহানুরাগের বন্ধন, অন্যদিকে নিত্য-নূতন সুখের লালসা। যে মনুষ্যকে চারিদিকে এবম্বিধ বৃতির দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে, সে কেমন করিয়া মুক্তিলাভ করিবে? যাঁহার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, তিনি দেখিতেছেন, সে মুক্তির এক উপায়—তৃষ্ণা-ত্যাগ। যিনি প্রকৃত সাধক, যিনি প্রকৃত ভিক্ষুধর্ম্মাবলম্বী, তিনি কখনই তৃষ্ণার বশীভূত নহেন। তাঁহার অনুরাগেরও কেহ নাই, বিরাগেরও কেহ নাই। ভাল বাসিলেও তিনি কাহাকেও ভালবাসেন না; আবার, ভাল না বাসিলেও তিনি সকলকেই ভালবাসেন। সর্ব্বত্র সমদর্শনই তাঁহার তৃষ্ণাত্যাগের মূল। তিনি বুঝিয়াছেন,—তৃষ্ণার নিবৃত্তি কিছুতেই নাই, কামনার পূরণ কখনও সম্ভবপর নহে, সমগ্র পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলেও মানুষের আকাঙ্ক্ষার পূরণ হয় না। তিনি বুঝিয়াছেন—কামনা-ত্যাগেই পরিত্রাণ।

পরিত্রাণের উপায়।

"কসিণংপি জো ইমং লোয়ং পডিপুন্নং দলেজ্জ একস্স তেণাবিসেন
তুসেজ্জ ইই দুপ্পূরএ ইমেআয়া॥ জহা লাভোতহা লোভোলাভা-
লোভো পবড্ঢই। দোমাসকয়ং কজ্জং কোডীএবি ননিট্ঠিয়ং॥"

মানুষ যতই বিত্তৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়, ততই তাহার অভাব বাড়িয়া যায়। তুমি যতই পাইবে, ততই তোমার অভাব বাড়িবে। আয়ের সঙ্গে সঙ্গে নূতন অভাবের সৃষ্টি হয়। দুই 'মাসা' মাত্র অর্থ প্রাপ্ত হইলে যাহার অভাব মিটিত, কোটী মুদ্রা পাইয়াও সে এখন সন্তুষ্ট নহে। এ সংসারের রীতিই এই! জৈনশাস্ত্রের এই উক্তি হিন্দুশাস্ত্রের একটী শ্রেষ্ঠ উপদেশের সহিত সাদৃশ্য-সম্পন্ন। সে উপদেশ—'তৃষ্ণাবধিং কো গতঃ।' যথা—

"নিঃস্বো ব্যষ্টিশতং সতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপো,
লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশ্বরত্বং পুনঃ।
চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং সুরপতি ব্রহ্মাপদং বাঞ্ছতি।
ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং হরির্হরপদং তৃষ্ণাবধিং কো গতঃ॥"

অর্থাৎ,—'নিঃস্ব দরিদ্র জন শত মুদ্রালাভের আকাঙ্ক্ষা করে; কিন্তু শতমুদ্রা প্রাপ্ত হইলেই সে আবার সহস্র মুদ্রার আকাঙ্ক্ষা করে। সহস্রাধিপ লক্ষপতি হইতে চায়; লক্ষপতি ক্ষিতিপালক হইতে আকাঙ্ক্ষা করে। ক্ষিতিপতির আকাঙ্ক্ষা—চক্রেশ্বরত্ব-লাভ; চক্রেশ্বর ইন্দ্রত্বের অভিলাষী। সুরপতি ব্রহ্মাপদ আকাঙ্ক্ষা করেন। ব্রহ্মার বিষ্ণুপদ-প্রাপ্তির, আর শ্রীহরির হর-পদ লাভের আকাঙ্ক্ষা। তৃষ্ণার সীমা কে নির্ণয় করিতে পারে?' এই

শ্লোক কোনও শৈবের রচনা বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু, তাহা হইলেও, ইহা যে সনাতন শাস্ত্রোক্তির প্রতিধ্বনি, তাহাতে সংশয় নাই।

তৃষ্ণাত্যাগের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ জৈনশাস্ত্রে সুন্দর একটী উপাখ্যান আছে। নমী নামে মিথিলায় এক রাজা ছিলেন। কোনও এক ভ্রান্তিবশে স্বর্গচ্যুত হইয়া তিনি মিথিলার রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। মর্ত্ত্যে মনুষ্যজন্ম পরিগ্রহ করিলে, পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মফলে, তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠে। তখন তিনি রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। সুখের রাজধানী মিথিলা, প্রাণপ্রিয়া সহধর্ম্মিণী, স্নেহাধিক কুমার, সৈন্য-সামন্ত, দাসদাসী, পরিজনবর্গ—কোনও আকর্ষণই তখন আর তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে না। পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া, তিনি যেদিন প্রব্রজ্যায় গমন করেন; ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া, শক্রদেব তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পান।

তৃষ্ণা-ত্যাগের আদর্শ।

রাজা নমীর নিকট উপস্থিত হইয়া শক্রদেব প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন,—"রাজন্! মিথিলা আজ কেন আর্ত্তনাদে পরিপূর্ণ! প্রাসাদ-মধ্যে এবং প্রতি গৃহে কিসের ক্রন্দন-কোলাহল শ্রুত হইতেছে?"

প্রশ্নের মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করিয়া, রাজা উত্তর দিলেন,—"মিথিলায় মনোরমা নামে এক পুণ্য-তরু আছে। পত্র-পুষ্প-ফল-সমন্বিত সেই তরু স্নিগ্ধছায়া দান করিত। সে তরু বহু পক্ষীর প্রিয়-নিকেতন ছিল। সহসা বিষম ঝঞ্ঝাবাতে আজ সে তরু প্রকম্পিত। পক্ষিগণ কুলায়-ভ্রষ্ট নির্য্যাতনগ্রস্ত দুর্দ্দশাক্লিষ্ট; তাই তাহারা উচ্চ চীৎকারে দিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে।"

উত্তর শুনিয়া, দেবরাজ কহিলেন,—"আপনার প্রাসাদ অগ্নিসংযুক্ত। অগ্নি ও ঝঞ্ঝা যুগপৎ আপনার প্রাসাদ আক্রমণ করিয়াছে। রাজন্! আপনার অন্তঃপুর রক্ষার প্রতি এখনও কেন আপনি উদাসীন রহিয়াছেন?"

রাজা উত্তর দিলেন,—"আমি বড় সুখী; কেন-না, আমার আর আপনার বলিবার কিছুই নাই। মিথিলায় আগুন লাগিয়াছে; তাহাতে আমার তো কিছু পুড়িবে না! যে ভিক্ষু পুত্র-পরিজন পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছে, যাহার কর্ম্মস্রোত অবরুদ্ধ হইয়াছে, তাহার পক্ষে সুখকর অথবা দুঃখকর কিছুই তো থাকিতে পারে না! যিনি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, যিনি সকল বন্ধন হইতে বিমুক্ত, যিনি কাহারও সহিত কোনও বিষয়ে সম্বন্ধযুক্ত নহেন বলিয়া আপনাকে বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহার আবার অশান্তির কারণ কি আছে?"

ইন্দ্র কহিলেন,—"আপনি ক্ষত্রিয়; প্রাচীর, তোরণ ও দুর্গসমূহ প্রস্তুত করুন, পরিখা খনন করুন; শতঘ্নী প্রস্তুতে প্রবৃত্ত হউন! তবে তো আপনি ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইবেন।"

রাজা উত্তর দিলেন,—"হাঁ! ক্ষত্রিয় তিনিই বটেন;—যিনি ধর্ম্মবিশ্বাসকে দুর্গরূপে পরিণত করিয়াছেন,—যাঁহার তপঃসংযম সে দুর্গ-তোরণের অর্গলরূপে পরিণত হইয়াছে,—যাঁহার ক্ষান্তিরূপ সুদৃঢ় প্রাকার নগরকে বেষ্টন করিয়া আছে,—আর ত্রিগুপ্তির (মনোগুপ্তি, বাগ্‌গুপ্তি, কায়গুপ্তি) ত্রিবিধ উপায়ে যিনি সে নগর অজেয় করিয়া রাখিয়াছেন। পরাক্রম-রূপ ধনু, ঈর্য্যারূপ (পদচারণ প্রভৃতিতে সতর্কতা) জ্যা, ধৃতি বা সন্তোষ-রূপ প্রত্যঞ্চ (ধনুঃ-প্রান্তভাগ), সত্যরূপ পরিমন্থন—এতদ্দ্বারা যিনি কর্ম্মরূপ শত্রুর হৃদয়ে সংযম-রূপ লৌহ-তীর

বিদ্ধ করিয়া জয়লাভে সমর্থ হন, তাঁহার আর ভাবনা কিসের? তিনিই তো অনায়াসে সংসার হইতে বিমুক্ত হন!" তিনিই তো প্রকৃত ক্ষত্রিয়! এ বিষয়ে রাজা নমীর উক্তি; যথা,—

"সদ্ধংচ ণগরং কিচ্চা তবসংবর মগ্গলং। খংতীনিউণপাগারং তিগুত্তং দুপ্পধংসগং॥
ধণুপরক্কমং কিচ্চা জীবংচ ইরিয়ং সয়া। ধিইংচকেয়ণং কিচ্চা সচ্চেণং পলিমংথএ॥
তবণারায় জুত্তেণং ভিত্তূণংকম্ম কংচুয়ং। মুণীবি গয় সংগামো ভবাও পরিমুচ্চঈ॥"

ইন্দ্র কহিলেন,—"প্রাসাদসমূহ নির্ম্মাণ করুন। সুদৃশ্য অট্টালিকাসমূহ নির্ম্মিত হউক। তাহার চূড়াসমূহ গগন স্পর্শ করুক। তবে তো আপনি ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইবেন!"

নমী উত্তর দিলেন,—"ইহসংসার পথ-স্বরূপ। পথিমধ্যে যিনি গৃহ নির্ম্মাণ করেন, তাঁহাকে নিশ্চয়ই বিপদে পড়িতে হয়। কিন্তু সন্ন্যাসী যিনি,—যেথানে ইচ্ছা, সেথানেই তিনি তাঁহার বাসস্থান লইতে পারেন।"

ইন্দ্র উত্তর দিলেন,—"দস্যু-তস্করের দণ্ড-বিধান করিয়া জনসাধারণকে রক্ষা করুন; দেশমধ্যে শান্তি স্থাপিত হউক। তবেই তো আপনি ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইবেন!"

নমী উত্তর দিলেন,—"মানুষ সর্ব্বদাই অন্যায়রূপে দণ্ড-বিধান করে। নিরীহ জন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়; অপরাধী মুক্তি পাইয়া যায়।"

ইন্দ্র কহিলেন,—"হে রাজন্! যে সকল রাজা আজিও আপনার প্রাধান্য স্বীকার করে নাই, তাহাদিগকে বশে আনয়ন করুন। তবে তো আপনি ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইবেন!

নমী উত্তর দিলেন,—

"জো সহস্সং সহস্সাণং সংগামেদুজ্জএজিণে। এগংজিণেজ্জঅপ্পাণং
এসসেপরমোজও॥ অপ্পাণমেবজুজ্ঝাহিং কিং তে জুজ্ঝো ণবজ্ঝাও।
অপ্পাণমেব অপ্পাণং জুইত্তা সুহমেএ॥ পংচিদিয়াণ কোহংমাণং
মায়ংতহেবলোহংচ। দুজ্জয়ংচেব অপ্পাণং সব্বমপ্পে জিএজিয়ং॥"

'মনুষ্য সহস্র সহস্র দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকে যদিও পরাজয় করিতে পারে, কিন্তু সে শত্রুকে জয় করা অপেক্ষা আত্ম-জয়ই প্রধান জয়। মানুষ কেন বহিঃশত্রু-জয়ে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়? আত্মজয়ের জন্য সংগ্রাম কর। যিনি আপনার দ্বারা আপনাকে জয় করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত সুখী হন। এই পঞ্চেন্দ্রিয়, ক্রোধ, অহঙ্কার, মোহ, কামনা—এই সকল আত্ম-শত্রুকে জয় করা বড়ই কঠিন। উহাদিগকে যথন জয় করিতে পারিবে, মানুষ তথনই সর্ব্বজয়ী হইবে।'

ইন্দ্র কহিলেন,—"তোমার স্বর্ণ-রৌপ্যের ভাণ্ডার, তোমার জহরৎ-মণি-মাণিক্যের ভাণ্ডার, তোমার পোষাক-পরিচ্ছদ, তোমার ঘর-বাড়ী-গাড়ী-সম্পত্তি যাহাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা পাও। তবেই তো তুমি ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইবে!"

নমী উত্তর দিলেন,—

"সুবণ্ণ রূপ্পস্সয় পব্বয়াভবে সিয়াহু কেলাস সমাঅসংখয়া। নরস্স লুদ্ধস্স
ন তেহিং কিংচি ইচ্ছাহু আগাসসমা অণংতিয়া॥ পুঢ়বী সালী জবা চেব
হিরণ্ণং পসুভিস্সহ। পড়িপুন্নংনা লমেগস্স ইই বিজ্জা তবংচরে॥"

'মানুষের এতই লোভ যে, কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় অত্যুচ্চ সুবর্ণের ও রৌপ্যের পর্ব্বত সকল

প্রাপ্ত হইলেও তাহার লোভের শান্তি হয় না। আকাশ যেমন অসীম অনন্ত, মানুষের আকাঙ্ক্ষাও সেইরূপ অসীম অনন্ত। এই ধনধান্যপূর্ণ বসুন্ধরা অর্পণ করিলেও, মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না। সংযম-সাধনা ভিন্ন সে কামনা-নিবৃত্তির উপায় নাই।'

ইন্দ্র কহিলেন,—"আশ্চর্য্য! রাজন! আপনি কল্পিত সুখের অনুসন্ধানে কেন প্রত্যক্ষ-সুখ পরিহার করিতেছেন? উহাই আপনার ধ্বংসের কারণ হইবে।"

নমী উত্তর দিলেন,—

"সল্লং কামা বিসংকামা কামাআসী বিসোপমা।
কামেপত্থে মাণা অকামা জংতি দুগ্‌গইং॥
অহোবয়ই কোহেণং মাণেণংঅহ মাগঈ।
মায়া গঈ পড়িগ্‌ঘাও লোহাও দুহও ভয়ং॥"

'ইহসংসারের সুখ—কাম—শল্য-স্বরূপ; কাম—বিষ-স্বরূপ। কাম আশীবিষবৎ। যে জন কামনার অনুসরণ করে, সে কখনও সুখী হইতে পারে না! তাহার শেষ পরিণাম অতুই দুঃখপ্রদ। কাম হইতে মানুষ ক্রোধে অভিভূত হয়; রাগ হইতে অহঙ্কার আসে; তৎপরে মোহ আসিয়া মুক্তির পথ অবরোধ করে। কামনার বশবর্ত্তী মানুষ ইহলোকে ও পরলোকে সর্ব্বত্র অশেষ কষ্ট প্রাপ্ত হয়।

রাজার উত্তরে ইন্দ্রের ভ্রম-ধারণা অপসৃত হইল। তখন তিনি ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া, আত্ম পরিচয় প্রকাশ করিলেন; এবং যথাযোগ্য অভিবাদন-পূর্ব্বক রাজা নমীকে কহিলেন,—

"অহো তেনিজ্জিও কোহো অহো তে মাণো পরাজিও। অহো তে নিরক্কিয়া মায়া অহোতে লোভোবসীকও॥ অহো তে অজ্জবং সাহু অহোতে সাহু মদ্দবং। অহো তে উত্তমাখংতী অহো তে মুত্তি উত্তমা॥"

'ধন্য রাজন্!—আপনি ক্রোধ-জয়ী হইয়াছেন! ধন্য রাজন্!—আপনার অহঙ্কার দূরীভূত হইয়াছে! ধন্য রাজন্!—আপনার মোহ অপসৃত! ধন্য রাজন্!—আপনার কামনা পরাভূত। ধন্য আপনার সরলতা! ধন্য আপনার নম্রতা! ধন্য আপনার সহিষ্ণুতা! ধন্য আপনার উত্তমা মুক্তি!'

এ জীবন কয়-দিনের জন্য? অনন্ত কালসাগরের বুদ্বুদবৎ এ জীবন লইয়া, মানুষ কিসের বড়াই করিতেছ? একে এই সীমাবদ্ধ অল্প সময়; সে সময়টুকুও যদি তুমি অবহেলায় হারাইয়া ফেল, উপায় কি হইবে? পত্র পরিশুষ্ক হইলেই বৃক্ষ হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে; দিবা অতীত হইলে, রাত্রি আসিলে, মানুষেরও সেইরূপ আয়ুঃ শেষ হইয়া আসে। কুশ-তৃণে শিশির-বিন্দু কতক্ষণ চাক্‌চিক্যময় থাকে? মানুষেরও জীবন কুশতৃণস্থিত শিশিরবিন্দুবৎ। মহাবীর স্বামী আপন প্রিয় শিষ্য গৌতমকে সম্বোধন করিয়া তাই বলিতেছেন,—"গৌতম! সাবধান হও; জীবন-তরী আবর্ত্তে নিপতিত, সদা-সঙ্কটাপন্ন। সত্বর উহার পাপভার লাঘব কর। ভাগ্য-ক্রমে বহু জন্ম পরে দুর্ল্লভ মনুষ্য-জীবন লাভ করিয়াছ; কর্ম্মফলে যেন আর অধঃপতিত হইও না। কর্ম্মফলে যদি পৃথিবী দেহে পরিণত হও, অসংখ্যকাল সেই অবস্থায় কাটিয়া যাইবে। কর্ম্মফলে যদি জলদেহ প্রাপ্ত হও, আত্মাকে সেই অবস্থাতেই বহুকাল যাপন

জীবন ক্ষণবিধ্বংসী।

করিতে হইবে। কর্ম্মফলে অগ্নিদেহে বা বায়ুদেহে প্রবিষ্ট হইলে, সেই ভাবেই অসংখ্য-কাল কাটিয়া যাইবে। কর্ম্মফলে আরও কত কত দেহে পরিণত হইবার আশঙ্কা আছে। একবার অধঃপতন ঘটিলে পুনরুত্থানের আশা বড়ই অল্প। বড় দুর্ল্লভ—মনুষ্য-জন্ম-লাভ! মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও আর্য্যজন্ম-লাভ আবার বহু সাধনা-সাপেক্ষ। আবার আর্য্যজন্ম প্রাপ্ত হইলেও পঞ্চেন্দ্রিয়ের অধিকারী হওয়া আরও কঠিন। পঞ্চেন্দ্রিয়ের অধিকারী হইলেও আবার ধর্ম্মলাভ সম্ভবপর নহে। আবার সত্যধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেও তাহাতে শ্রদ্ধা-অনুরাগ সঞ্চার হওয়া বড় কঠিন। শ্রদ্ধা-অনুরাগ সঞ্চিত হইলেও ধর্ম্ম-প্রতিপালনে কচিৎ স্পৃহা জন্মে; কেন না, মানুষ সদাই কামনার দাস,—মানুষ সদাই ঐহিক সুখের অনুধ্যানে রত রহিয়াছে। দিন দিন দেহে বার্দ্ধক্যের সঞ্চার হইতেছে; মস্তকের কেশরাশি শুভ্র হইয়া আসিতেছে, কর্ণের শ্রবণশক্তি কমিয়া যাইতেছে, চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পাইতেছে, ঘ্রাণ-শক্তি ও স্পর্শানুভব শক্তি লোপ পাইতেছে; একে একে সব যাইতে বসিয়াছে। এ সকল দেখিয়া, গৌতম! তুমি সর্ব্বদা সাবধান হও। আসক্তির সামগ্রী, সমস্ত দূরে নিক্ষেপ কর। পদ্মপত্রে যেমন শরতের বারি বর্ষিত হইলে, পদ্মপত্র তাহাতে আসক্ত নহে; হে গৌতম! তুমি সেইরূপ অনাসক্ত-ভাবে সংসারে বিচরণ কর। দিন ফুরাইয়া আসিল।' গৌতমকে সম্বোধন করিয়া মহাবীর স্বামীর যে উক্তি, তাহার কিয়দংশ;—

"দুমপত্তএ পংডুঅএ জহানিবউই রাই গণাণ অব্বএ।
এবং মণুয়াণ জীবিয়ং সময়ংগোয়মমাপমায়এ ॥ ১।
কুসগ্গে জহ ওসবিংদুএ থোবং চিট্টই লংবমাণএ।
এবং মণুয়াণ জীবিয়ং সময়ংগোয়মমাপমায়এ ॥ ২।
ইই ইত্তরিয়ংমি আউএ জীবিএ বহু পচ্চবায়এ।
বিহুণাহি রয়ং পুরে কডং সময়ংগোয়মমাপমায়এ ॥ ৩।
দুল্লহে খলু মাণুসে ভবে চিরকালেণ বিসব্বপাণিণং।
গাঢায় বিবাগ কম্মণো সময়ংগোয়মমাপমায়এ ॥ ৪।
লদ্ধূণবি মাণুসত্তণং আয়রিয়ত্তং পুণরাবিদুল্লহং।
বহবে দস্সুয়ামিলক্খুয়া সময়ংগোয়মমাপমায়এ ॥ ১৬।
লদ্ধূণবি আয়রিয়ত্তণং অহীণ পংচিদিয়াহু দুল্লহা।
বিগলিংদিয় যাহুদীসঈ সময়ংগোয়মমাপমায়এ ॥ ১৭।
অহীণপংচিংদিয়ত্তংপিসেলহে উত্তমধম্মসুইহু দুল্লহা।
কুতিত্থি নিসেবএ জণে সময়ংগোয়মমাপমায়এ ॥ ১৮।
লদ্ধূণবি উত্তমংসুয়ং সদ্দহণা পুণরবি দুল্লহা।
মিছত্তণিসেবএজণে সময়ংগোয়মমাপমায়এ ॥ ১৯।
ধম্মং পিহু সদ্দহংতয়া দুল্লহয়াকাএণফাসয়া।
ইহকামগুণেহিং মুচ্ছিয়া সময়ংগোয়মমাপমায়এ ॥ ২০।

দুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্ম, ততোধিক দুর্ল্লভ আর্য্যজন্ম, ততোধিক দুর্ল্লভ পঞ্চেন্দ্রিয়-লাভ, ততোধিক

দুর্লভ ধর্ম্ম শিক্ষার অবসর, ততোধিক দুর্লভ ধর্ম্মবিশ্বাসে বিশ্বাসবান হওয়া, ততোধিক দুর্লভ সে বিশ্বাস কার্য্যে পরিণত করা।' এই বলিয়া, মহাবীর স্বামী গৌতমকে উপদেশ দিতেছেন,—

"পরিজূরইতে সরীরয়ং কেসাপংডুরয়া হবংতি তে।
সেসোয়বলেয়হায়ঈ সময়ংগোয়মমাপমায়এ॥ ২১।
পরিজূরইতে সরীরয়ং কেসায়ং পংডুরয়া হবংতি তে।
সেচক্খুবলেয় হায়ঈ সময়ংগোয়মমাপমায়এ॥ ২২।
পরিজূরইতে সরীরয়ং কেসায়ংপংডুরয়া হবংতি তে।
সেঘাণবলেয় হায়ঈ সময়ংগোয়মমাপমায়এ। ২৩॥
পরিজূরইতে সরীরয়ং কেসাপংডুরয়া হবংতি তে।
সেজিভ্ভবলেয় হায়ঈ সময়ংগোয়মমাপমায়এ॥ ২৪।
পরিজূরইতে সরীরয়ং কেসপংডুরয়া হবংতি তে।
সেফাসবলেয় হায়ঈ সময়ংগোয়মমাপমায়এ॥ ২৫।
পরিজূরইতে সরীরয়ং কেসাপংডুরয়া হবংতি তে।
সেসব্ববলেয় হায়ঈ সময়ংগোয়মমাপমায়এ॥ ২৬।

'তোমার শ্রবণেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয়, ত্বগেন্দ্রিয়—এমনি কি, তোমার দেহের সকল বল—দিন দিন ক্ষীণ হইয়া আসিল। গৌতম, এখনও সাবধান হও।' এই বলিয়া মহাবীর প্রভু গৌতমকে সংসারের সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন,—

বোচ্ছিংদসিণেহ মপ্পণো কুমুয়ং সারইয়ংবপাণিয়ং।
সেসব্বসিণেহবজ্জিএ সময়ংগোয়মমাপমায়এ॥ ২৮।

শরতের বারিতে অনাসক্ত পদ্মপত্রের ন্যায় সংসারে অনাসক্ত হইতে উপদেশ দিয়া, সর্ব্বপ্রকার আসক্তি পরিত্যাগ করিবার জন্য উদ্‌বুদ্ধ করিয়া, মহাবীর প্রভু শেষ কহিতেছেন,—

"অবলে জহ ভারবাহএ মামগ্‌গে বিসমেব গাহিয়া। পচ্ছাপচ্ছাণু তাবএ
সময়ংগোয়মমাপমায়এ॥ ৩৩। তিন্নোহিসি অন্নবংমহংকিংপুণ চিট্ঠসি-
তিরাভাও। অভিতুরপায়ংগমিত্তয়ে সময়ংগোয়মমাপমায়এ॥ ৩৪।"

'মস্তকে গুরুভার, অথচ তুমি দুর্ব্বল। উচ্চ-নীচ বন্ধুর পথে অগ্রসর হইও না। তাহাতে পরিশেষে তোমাকে অনুতাপ করিতে হইবে। গৌতম! তুমি সাবধান হও। মহাসমুদ্র প্রায় উত্তীর্ণ হইয়াছ। তীর-সন্নিধানে উপনীত হইয়া কেন নিশ্চেষ্ট রহিয়াছ? পরপারে পৌঁছিবার পক্ষে ত্বরান্বিত হও। গৌতম! তুমি এখনও সাবধান হও।

জ্ঞানী ও অজ্ঞানী।

অজ্ঞানীই বা কেমন, আর জ্ঞানীই বা কেমন;—তাহার লক্ষণ বলা হইয়াছে। যে জন বিদ্যাহীন অর্থাৎ সত্য-তত্ত্ব অবগত নহে, যে জন স্তব্ধ অর্থাৎ অহঙ্কারী, লুব্ধ অর্থাৎ লোভপরতন্ত্র, অবিনীত এবং যথেচ্ছবাক্, তাহাকেই অজ্ঞানী বলা যায়। পঞ্চবিধ কারণে সে অজ্ঞানতা সঞ্জাত হয়। সেই কারণ-পঞ্চক;—রাগ, প্রমাদ, স্তম্ভ, রোগ, আলস্য। উল্লিখিত পাঁচ কারণে যেমন বিনয়-প্রতিপালন ধর্ম্মানুশীলন অসম্ভব, তেমনই নিম্নলিখিত অষ্টবিধ কারণে ধর্ম্মশিক্ষা সুসাধ্য। (১) হাস্য-

বর্জ্জন, (২) দানতত্ত্ব অর্থাৎ সংযমশীলতা, (৩) পরমর্ম্মানুদ্ঘাটন-বিরতি অর্থাৎ পরনিন্দা-পরিবর্জ্জন, (৪) শীলসম্পন্নতা, (৫) বিশীলবর্জ্জন, (৬) অতি-লোলুপত্ব-নিষেধ অর্থাৎ অতিলোভ-পরিহার, (৭) ক্রোধ পরিত্যাগ, (৮) সত্য কথন। এই আটটী বিষয় যাঁহার অধিগত হইয়াছে, তিনিই শীলসম্পন্ন অর্থাৎ জ্ঞানী বলিয়া পরিগণিত। যে ভিক্ষুর পক্ষে নির্ব্বাণ-পথ অবরুদ্ধ, সে ভিক্ষু চতুর্দ্দশ-দোষদুষ্ট। আর যে ভিক্ষু নির্ব্বাণ-পথের পথিক, তিনি পঞ্চদশ-গুণসমন্বিত। চতুর্দ্দশ দোষ; যথা,—পুনঃপুনঃ ক্রোধ, দীর্ঘস্থায়ী ক্রোধ, মিত্রের উপদেশে অবজ্ঞা, শাস্ত্রজ্ঞানের অহঙ্কার, অপরের দোষানুসন্ধান, মিত্রের প্রতি রোষ, মিত্রের অসাক্ষাতে মিত্রের নিন্দাবাদ, প্রতিজ্ঞাবাদী, হিংস্র, স্তব্ধ, লুব্ধ, রসগৃধ্র, সম্বিভাগ-রহিত, অপ্রীতিকর। ভিক্ষুর পঞ্চদশ গুণ; যথা,—তিনি বিনীত, অচপল, মায়ারহিত ও অকুতূহল; তিনি কাহাকেও কটুবাক্য বলেন না; ক্ষুব্ধ হইলেও তিনি কদাচ রাগের বশীভূত নহেন; মিত্রের সুপরামর্শে তিনি সর্ব্বদা কর্ণপাত করেন; বিদ্যামদ তাঁহার আদৌ নাই; অন্যের দোষানুসন্ধানে তিনি নিয়ত পরাঙ্মুখ; মিত্রের প্রতি কখনও তাঁহার রাগ নাই; অসাক্ষাতেও তিনি কুমিত্রের অমঙ্গল কামনা করেন না; বিবাদে ও কোলাহলে তিনি সর্ব্বদা বিরত থাকেন; তিনি বুদ্ধিমান, কুলীন, শান্ত ও সচ্চরিত্র। এবম্প্রকার গুণসম্পন্ন ব্যক্তি ধর্ম্ম-শিক্ষালাভের উপযোগী পাত্র বলিয়া গণ্য হন। স্বচ্ছ পাত্রে জল রাখিলে সে জল যেমন উজ্জ্বল দেখায়, পূর্ব্বোক্ত সদ্গুণসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট বিদ্যাও সেইরূপ জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানী ভিক্ষুর স্বরূপ-বিষয়ে জৈনশাস্ত্রে এইরূপ উপমা-সমূহ দৃষ্ট হয়; যথা,—

"জহাসংখংমিপয়ং পিহিতং দুহও বিবিরায়ঈ এবং বহুস্সুএ ভিক্‌খুধম্মো কিত্তীতহা সুয়ং।
জহাসে কংবোয়াণং আইন্নে কংথএসিয়া আসেজবেণপবরে এবং হবই বহুস্সুএ॥
জহাইণ সমারূঢ়ে সূরেদঢপরকমে উভও নংদিঘোসেণং এবংহবই বহুস্সুএ।
জহাসে তিমিরবিদ্ধংসে উত্তিট্ঠংতে দিবাঅরে। জলংতে ইব তেএণং এবং হবই বহুস্সুএ॥
জহাসে উডুবঈ চংদে নক্‌খত্তে পরিবারিএ। পডিপুন্নে পুন্নমাসীএ এবং হবই বহুস্সুএ॥
জহাসে সয়ংভু রমণে উদহী অক্‌খওদএ নাণা রয়ণ পডিপুন্নে এবং হবই বহুস্সুএ।"

সমুদ্দ গংভীরসমা দুরাসয়া অচক্কিয়া কেণই দুপ্পহংসয়া
সুয়স্‌স পুন্না বিউলস্‌স তাইণো খবিত্তু কম্মং গইমুত্তমংগয়া।"

অর্থাৎ,—'শঙ্খে নিপতিত বারি যেমন দ্বিগুণ ঔজ্জ্বল্য-সম্পন্ন মনে হয়; জ্ঞানী ভিক্ষুর জ্ঞান-যশ-কীর্ত্তিও সেইরূপ ঔজ্জ্বল্য-সম্পন্ন হয়। কাম্বোজ-দেশীয় সুশিক্ষিত অশ্ব যেমন রণকোলাহলে ভীত না হইয়া দ্রুতগতিতে অন্যান্য অশ্বকে অতিক্রম করে, জ্ঞানী ভিক্ষুও সেইরূপ সকলকে অতিক্রম করেন। সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার বিদূরিত হয়, আর সকল আলোক যেমন তাহার নিকট নিষ্প্রভ হয়; জ্ঞানী ভিক্ষুর নিকটও অন্য সকলে সেইরূপ নিষ্প্রভ। সূর্য্যের যেমন তুলনা নাই; তাঁহারও সেইরূপ তুলনা নাই। নিশামণি পূর্ণচন্দ্র যেমন তারাদল পরিবেষ্টিত হইয়া আকাশে বিরাজ করেন; আর, তাঁহার যেমন তুলনা নাই; বিজ্ঞ ভিক্ষুরও সেইরূপ তুলনা নাই। অনন্ত জলাধার মহাসমুদ্র যেমন স্বয়ম্ভুর আনন্দ-নিকেতন-রূপে অসংখ্য অমূল্য রত্নরাজি বক্ষে ধারণ করিয়া অতুলনীয় হইয়া আছেন; জ্ঞানী ভিক্ষুও

সেইরূপ অতুলনীয় জ্ঞান-সম্পদের অধিকারী হইয়া রহিয়াছেন।' যে ভিক্ষুতে মহাসমুদ্রের ন্যায় গাম্ভীর্য্য আছে, যাঁহার জ্ঞান-বারিধি পরিমাপ করা অসম্ভব, যিনি কোনও বস্তুর বা কোনও ব্যক্তির দ্বারা কথনও সন্তুষ্ট নহেন, যাঁহাকে কদাচ অভিভূত করা যায় না, যাঁহার অগাধ জ্ঞান এবং যিনি আত্মসংযমশীল, তাঁহার কর্ম্ম ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি নিঃসন্দেহে সেই অত্যুচ্চ মহান্ মুক্তিপদ লাভ করিবেন।'

ভিন্ন ভিন্ন ভিক্ষুর জীবনে জ্ঞানের জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত দেখি। হরিকেশ বল, শ্বপচকুলে জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু কর্ম্মপ্রভাবে তিনি মুক্ত-পুরুষমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। তিনি যখন সর্ব্বকর্ম্ম-পরিত্যাগী সন্ন্যাসী, তাঁহাকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। প্রতিপক্ষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন,—"আপনি যে যতি, আপনি যে যোগী, কৈ আপনার যজ্ঞবেদী কৈ? কোথায় আপনার অগ্নি, কোথায় আপনার বলিদ্রব্য? কোথায় আপনার যজ্ঞস্থালী? কোথায় আপনার গোময়? অগ্নি-মুখে আপনি কি আহুতি অর্পণ করিবেন?" হরিকেশ তাহাতে উত্তর দেন,—

হরিকেশ-প্রসঙ্গ।

"তবো জোঈ জীবো জই ঠাণং জোগোস্থ্যা সরীরং কারিসংগং।
কম্মংপহাসংজমজোগ সংতীহোমং হুণামীইসিণং পসত্থং॥"

অর্থাৎ,—'সংযম আমার হোমাগ্নি। জীবন আমার যজ্ঞবেদী; সদুত্তম আমার যজ্ঞস্থালী; দেহ আমার শুষ্ক গোময়; কর্ম্ম আমার ইন্ধন-স্বরূপ; আত্মসংযম, সদুত্তম, শান্তি—আমার নৈবেদ্য; জ্ঞানী জনের প্রশংসিত এবম্বিধ যজ্ঞ লইয়াই আমি যোগরত আছি।'

তার পর আবার প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইল,—'হে মুনি! তবে তোমার স্নানকরণযোগ্য জলাধার হ্রদ কৈ? তোমার পাপনাশক তীর্থ কোথায়? কোথায় অবগাহন করিয়া তুমি বিশুদ্ধ হইবে?"

মুনি উত্তর দিলেন,—"আমার ধর্ম্মরূপ বিনয়মূল স্নানকরণোপযোগী হ্রদ আছে। কর্ম্ম-মলাপহারক ব্রহ্মচর্য্যরূপ আমার তীর্থস্থান রহিয়াছে। সেই ব্রহ্মচর্য্য-তীর্থে রাগদ্বেষাদি মল বিধৌত করিয়া আমি আত্ম-প্রসঙ্গরূপ নির্ম্মলত্ব প্রাপ্ত হই। বিজ্ঞজন স্নানোপযোগী এবম্বিধ হ্রদই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই ব্রহ্মচর্য্যরূপ হ্রদে অবগাহন করিয়া কাম-ক্রোধাদি মল অপসারণ করিতে পারিলেই উচ্চগতি প্রাপ্ত হওয়া যায়।" যথা,—

ধম্মে হরয়ে বংভে সংতি তিথে অণাবিলে অত্তপসন্নলেসে।
জহিং পিণ্হাও বিমলো বিসুদ্ধো সুসীই ভূয়োপজহানিদোসং॥
এয়ং সিণাণং কুশলেহিং দিট্ঠং মহাসিণাণং ইসিণং পসত্থং।
জহিং সিণ্হায়া বিমলা বিসুদ্ধয়া মহারিসী উত্তমঠাণং পতেত্তিবেমি।"

অপর এক আখ্যায়িকায়, চিত্র ও সম্ভূত দুই বন্ধুর চরিত্র-কথায়, আসক্তি-ত্যাগীর ও আসক্ত জীবের অবস্থার বিষয় পরিবর্ণিত আছে। চিত্র ও সম্ভূত দুই জনে বহুজন্মের পর মনুষ্য-জন্ম প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মনুষ্য-জন্মে দুই জনেই চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। চণ্ডাল-জন্মে দুই জন দুই পথের পথিক হইবার আকাঙ্ক্ষা করে। ইহসংসারে রাজচক্রবর্ত্তীর পদ শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্ভূতের মনে হয়। আর, যতি সন্ন্যাসীর পদকেই চিত্র শ্রেয়ঃসাধক বলিয়া মনে করে। সুতরাং দুই ভাবে দুই জনের

অনাসক্ত ও আসক্ত।

জীবন-গতি পরিবর্ত্তিত হয়। সম্ভূত পরজন্মে যখন ব্রহ্মদত্ত-নামা রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া পরিগণিত হন, চিত্র তখন এক প্রসিদ্ধ বণিক-গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করেন। সেই সময়ে দুই বন্ধুর পরস্পর মিলন হয়; আর সে মিলনে পরস্পরের পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগিয়া উঠে। তখন, দুই বন্ধুতে আপনাদের অবস্থার বিষয় আলোচনা করেন। অনেক কথাবার্ত্তা হয়। বুঝিতে পারেন,—তাঁহারা উভয়ে আপনা-আপন কর্ম্মের ফলস্বরূপ, আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ, পদসম্পৎ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একজন সন্ন্যাসী; অপর জন দেশপতি রাজচক্রবর্ত্তী। অবস্থার এই তারতম্য উপলব্ধি করিয়া, রাজা ব্রহ্মদত্ত (সম্ভূত) আপন বন্ধু চিত্রকে কহিলেন,—"দেখ বন্ধু! আমার কত সুখৈশ্বর্য্য! আমার উচ্চ মনোহর প্রাসাদ, অসংখ্য দাস-দাসী, শ্রেষ্ঠ ধন-সম্পৎ। বন্ধু! কেন তুমি, এই দারুণ ক্লেশ সহ্য করিতেছ? এস, আমার এই অতুল ধনৈশ্বর্য্যের অংশভাগী হও। সুন্দরীগণ মনোহর নৃত্য-গীতে তোমায় সর্ব্বদা মুগ্ধ রাখিবে। এস, সুখ ভোগ কর। কেন বৃথা ব্রহ্মচর্য্যের ক্লেশ সহ্য করিতেছ? বন্ধুকে ইন্দ্রিয়-সুখে একান্ত আসক্ত দেখিয়া, অন্তরে অন্তরে তাঁহার মঙ্গল কামনা করিয়া, বন্ধুর জীবনগতি পরিবর্ত্তিত করিবার উদ্দেশ্যে, চিত্র উত্তর দিলেন,—

"সব্বং বিলংবিয়ংগীয়ং সব্বং নট্টং বিড়ংবিয়ং। সব্বে আভরণাভারা সব্বেকামা দুহাবহা॥ ১৬। বালাভিরামেসু দুহাবহেসু ণতংসুহংকামগুণেসু রায়ং বিরত্তকামাণ তবোহণাণং। জংভিক্খুণং সীলগুণে রয়াণং॥ ১৭। ইহজীবিএ রায় অসাসযংমি। ধণিয়ংতু পুন্নাইং অকুব্বমাণো। সে সোয়ঈ মচ্চু মুহো বণীএ। ধম্মং অকাউণ পরম্মিলোএ॥ ২১। জহেহ সীহোবমিয়ং গহায়। মচ্চু নরংণেইহু অংতকালে। ণতস্সমায়াবপি যাবভায়া। কালংমি তম্মং স হরা ভবংতি॥ ২২। ণতস্সদুক্খং বিভয়ং তিণাইও। ণমিত্তবগ্গাণ সুয়াণ বংধবা। এক্কোসয়ং পচ্চণুহই দুক্খংকত্তা রমেবং অণুজা ইকম্মং॥ ২৩। ণাগোজহাপংকজলাবসন্নো দট্ঠুংথলংণাভিসমেতি তীরং। এবং বয়ং কামগুণেসুগিদ্ধাণ ভিক্খুণোমগ্গমণুবয়ামো॥ ৩০। অব্বেই-কালোত্তরংতি রাইওণয়াবি ভোগা পুরিসাণ নিচ্চা। উবিচ্চভোগা পুরিসং বয়ংতি। দুমং জহাখীণফলং বপক্খী॥ ৩১। জইতংসিভোগে চইউ অসত্তো অজ্জাইং কম্মাইং করেহিরায়ং। ধম্মে টিও সব্বপয়াণু কংপী। তোহোহিসি দেবোইউ বিউব্বী॥" ৩২।

অর্থাৎ,—'হে রাজন্! সে তো সঙ্গীত নয়; সে যে বিলাপ-ধ্বনি! সে তো নৃত্য নয়; সে যে বিড়ম্বনা—ভূতাবিষ্টের বিক্ষেপ মাত্র! সে তো আভরণ নয়; সে যে ভার-বিশেষ! সংসারের সুখমাত্র—সর্ব্বপ্রকার কামই—দুঃখদায়ক। ১৬। অজ্ঞান জনই কামনার দাস। তাহারা জানে না যে, কামনাই সকল দুঃখের হেতুভূত। ধার্ম্মিক ভিক্ষু কখনও সুখের আকাঙ্ক্ষা করেন না। তাঁহারা ধর্ম্মানুগত হইয়াই আনন্দ উপভোগ করেন। মূঢ় জনেরা আশু হর্ষোৎপাদক পরিণাম-দুঃখকারণ কামকে অবলম্বন করে। সাধুজন কদাচ তাহার অনুরক্ত নহেন। ১৭। ইহজীবনে যিনি কোনও সৎকর্ম্ম না করিলেন, ইহজীবনে যিনি ধর্ম্মানুগত না রহিলেন, মৃত্যুর কবলগত হইয়া পরজীবনে তাঁহাকে অশেষ পরিতাপ করিতে হয়। ২১। সিংহ যেমন মৃগকে আক্রমণ করে, মৃত্যু আসিয়া মানুষকে সেইরূপ আক্রমণ

করে। মাতা বল, পিতা বল, ভাই বল, বন্ধু বল, সে সময়ে কেহই (জীবনের) কণামাত্র রক্ষা করিতে পারে না। ২২। কিবা আত্মীয়-স্বজন, কিবা বন্ধু-বান্ধব, কিবা পুত্র-কন্যা—কেহই সে যন্ত্রণার অংশভাগী হয় না। কর্ম্মকর্ত্তাকেই কর্ম্মের ফলভাগী হইতে হয়; একাই যন্ত্রণাভাগী হয়। ২৩। হস্তী যেমন পঙ্ক-মধ্যে নিপতিত হইয়া সম্মুখস্থ উচ্চ ভূ-খণ্ড দেখিয়াও তাহাতে উঠিতে সমর্থ হয় না; যাহারা কামাসক্ত, ইন্দ্রিয়-সুখ-মগ্ন, ধর্ম্মপথের পথিক নহে, তাহাদেরও সেই দুর্দ্দশা। ৩০। কাল অতীত হইতেছে; দিন দ্রুতগতি চলিয়া যাইতেছে; মনুষ্যের সুখ চিরস্থায়ী নয়। বৃক্ষ ফলশূন্য হইলে পক্ষী যেমন বৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, আয়ুঃ-কাল-ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভোগসুখ সেইরূপ শেষ হইয়া আসে। ৩১। ভোগসুখ পরিহার করিতে যদি একান্ত অপারক হইয়া থাকেন, হে রাজন্! তাহার সঙ্গে সঙ্গেই সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন; ধর্ম্মের অনুসরণ করুন, জীবে দয়ার্দ্র-চিত্ত হউন; তাহার ফলে, পরজন্মে উচ্চ দেব-গতি লাভ হইতে পারে। ৩২।” এই বলিয়া চিত্র বিদায় লইলেন; উপসংহারে কহিলেন,—‘যদি মোহ পরিহার করিতে না পারেন, যদি ধনৈশ্বর্য্যেই আসক্ত থাকেন, নিরুপায় জানিবেন।’

স্বর্গভ্রষ্ট দেব-ষটকের নরলোকে বিচরণ উপলক্ষে জৈনশাস্ত্রে তৃষ্ণা-ত্যাগের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখিতে পাই। পুরাকালে উসুয়ার (ইশুকার—কুরুদেশ) নামে সুরলোকের ন্যায় এক রম্য নগর ছিল। সেই নগরে সেই দেবগণ মনুষ্য-জন্ম প্রাপ্ত হন। দুই জন চিরকুমার ছিলেন; তৃতীয় জন ভৃগু নামে পরিচিত হইয়া পৌরোহিত্য-কার্য্যে ব্রতী হন; চতুর্থ—তাঁহার পত্নীরূপে যশা নামে পরিচিতা ছিলেন; পঞ্চম—ইশুকারের প্রখ্যাতনামা অধিপতি ‘রাজা ইশুকার’; ষষ্ঠ—তাঁহার পত্নী ‘রাজ্ঞী কমলাবতী’। ইঁহারা কি প্রকারে সংসার-বন্ধন ছিন্ন করেন, ধর্ম্মপথের পথিক হন, উপাখ্যানে তাহাই বিবৃত আছে। চিরকুমার দুইজন পুরোহিতের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বস্মৃতি জাগরূক হওয়ায় প্রথমেই তাঁহাদিগের চিত্তে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছিল। মুক্তিকামী হইয়া প্রথমেই তাঁহারা পিতৃসমীপে বিদায়-প্রার্থনা করেন। পিতা অনেকরূপ বুঝাইয়া তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা পান। কিন্তু পিতার সকল যুক্তি পুত্রদ্বয় তর্কদ্বারা ছিন্ন করিয়া ফেলেন। পিতা প্রথমে সাংসারিক সুখের বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা পান, পুত্রেরা সে কথায় কর্ণপাত করেন না।

তৃষ্ণাত্যাগ-দৃষ্টান্ত।

পিতা তখন বুঝাইবার প্রয়াস পান—“ইহসংসারের সুখই সুখ; পরলোকের কল্পনা বৃথা মাত্র’। তিনি বলেন,—“অরণি-কাষ্ঠ হইতে যেমন অগ্নি উৎপন্ন হয়, দুগ্ধ হইতে যেমন নবনী উৎপন্ন হয়, তিল হইতে যেমন তৈলের উৎপত্তি; হে পুত্র, এই দেহ হইতেই সেইরূপ আত্মার উৎপত্তি। উহারা কেহই পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল না। এখন উহাদের বিদ্যমানতা দেখি। পরে উহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। কি আত্মা, কি দেহ,—কেহই চিরস্থায়ী নয়।”

কুমারেরা কহিলেন,—“পিতঃ! ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অমূর্ত্ত আত্মার ধারণা সম্ভবপর নহে। আত্মা যখন অরূপ অমূর্ত্ত, তখন উহা অনন্ত। মিথ্যাত্বাদি গুণের দ্বারা আত্মা আবদ্ধ হয়; সেই বন্ধনই আত্মার সংসার-হেতু; অর্থাৎ, কর্ম্ম দ্বারাই আত্মা আবদ্ধ হইয়া সংসারচক্রে বিঘূর্ণীত হয়। ধর্ম্মতত্ত্ব অপরিজ্ঞাত থাকিয়া পাপকর্ম্ম করিয়া আসিয়াছি। তাহারই ফলে

এই অধঃপতন ঘটিয়াছে। মনুষ্যজীবন সর্ব্বদা প্রপীড়িত, সর্ব্বদা আক্রান্ত, সর্ব্বদা পরিভ্রষ্ট। এ জীবনে গৃহবাসে কোনও শান্তি নাই।"

পিতা কহিলেন,—"কে প্রপীড়িত করিবে? কে আক্রমণ করিবে?"

কুমারেরা কহিলেন,—"মৃত্যু আসিয়া মনুষ্যকে প্রপীড়িত করিতেছে; বার্দ্ধক্য আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়া বসিয়াছে। দিন অতীত হইতে চলিল। যে দিন একবার চলিয়া যায়, সে আর ফিরিয়া আসে না। যে জন ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম করে, তাহার দিন বিনালাভে অতিবাহিত হয়। আর যে জন ধর্ম্মানুসারী হন, তিনিই দিন দিন লাভবান হন। যিনি মৃত্যুকে আপনার মিত্র বলিয়া আবাহন করিতে পারেন, কিম্বা যিনি তাহার সংসর্গ পরিহার করিতে সমর্থ হন, অথবা যিনি জানেন যে, তাঁহার মৃত্যু নাই, তিনিই কর্ত্তব্য অবধারণে সমর্থ হইয়াছেন।"

ইহার পরই কুমারদ্বয় গৃহত্যাগী হন। তখন, ভৃগু আসিয়া পত্নী বাশিষ্ঠীকে কহেন,— "প্রিয়ে! গার্হস্থ্য জীবনে আর কোনও আকর্ষণ নাই। যতদিন শাখা-প্রশাখা থাকে, বৃক্ষ ততদিনই প্রকৃত বৃক্ষ নামের বাচ্য। সে যখন শাখা-প্রশাখা ভ্রষ্ট হয়, তখন কাণ্ডমধ্যে পরিগণিত হয়। পক্ষভ্রষ্ট পক্ষী যেমন, রণস্থলে অনুচরবিহীন নৃপতি যেমন, বাণিজ্য-দ্রব্যশূন্য বাণিজ্য-পোতে বণিক যেমন, পুত্রাদি বিহনে আমারও এখন সেই অবস্থা।"

বাশিষ্ঠী বহুপ্রকারে পতিকে সন্ন্যাসে বিরত করিবার প্রয়াস পাইলেন। বুঝাইলেন— সাংসারিক সুখের বিষয়। বুঝাইলেন—সন্ন্যাস-জীবন দুঃখপূর্ণ। কিন্তু ভৃগু কোনও কথায় প্রলুব্ধ হইলেন না। ভৃগু কহিলেন,—"প্রিয়ে! সর্প যেমন কঞ্চুক (খোলস) পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ লাভ করে, তার পর যথেচ্ছ-গমনে সমর্থ হয়, আমার পুত্রেরা সেইরূপ সাংসারিক সুখভোগ বিসর্জ্জন দিয়া সত্যপথে অগ্রসর হইয়াছে। আমিই বা কেন তাহাদের অনুসরণ না করিব? রোহিত মৎস্য যেমন জীর্ণ জাল ছিন্ন করিয়া প্রধাবিত হয়, আদর্শচরিত্র জ্ঞানিজনও সংযম-সাধনার প্রভাবে সেইরূপ ইহলৌকিক সুখকে ছিন্ন করিয়া সন্ন্যাস-আশ্রমে প্রবেশ করেন। ৩৫ ॥"

পতিকে সংসারের প্রতি এবম্বিধ বীতরাগ দেখিয়া বাশিষ্ঠী কহিলেন,—"ক্রৌঞ্চ ও হংস যেমন জলে ছিন্ন করিয়া আকাশে উড্ডীন হয়; আমার পতি ও পুত্র সেইরূপ সংসার-জাল ছিন্ন করিয়াছেন। আমিই বা কেন, তাঁহাদের অনুসরণ না করিব? ৩৬ ॥"

এইরূপে পুরোহিত, পুরোহিত-পত্নী ও তাঁহাদের পুত্রদ্বয় যখন সংসার-আশ্রম পরিত্যাগ করিলেন; রাজ্ঞীর মনেও তখন নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। নৃপতিকে সম্বোধন করিয়া রাজ্ঞী কহিলেন,—"বমনোদ্গত আহার্য্য পুনর্গ্রহণ কদাচ শ্লাঘনীয় নহে। ব্রাহ্মণের পরিত্যক্ত সম্পত্তি আপনি কেন রাজকোষের অন্তর্ভুক্ত করেন? সমগ্র পৃথিবী এবং পৃথিবীর সমস্ত ধন-সম্পত্তি যদি আপনার হয়, তাহা হইলেও আপনার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইবে না। আর সেই সমগ্র ধন-সম্পত্তিও আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। হে রাজন্! মৃত্যু-কালে মনোমদ ঐশ্বর্য্য-সম্পৎ, সকলই পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে। কোনও পার্থিব পদার্থই সেদিন আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবে না! বিহঙ্গ যেমন পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিতে ইচ্ছা করে

না, আমারও সেইরূপ এ সংসারে আর আবদ্ধ থাকিতে ইচ্ছা নাই। ৪১॥ দাবানলে আরণ্য পশু দগ্ধীভূত হইলে রাগ-দ্বেষাভিভূত অন্য কতকগুলি প্রাণী যেমন প্রমোদ-প্রফুল্ল হয়, অজ্ঞানী আমরাও সেইরূপ রাগ-দ্বেষের অনলে পৃথিবীকে দগ্ধীভূত হইতে দেখিয়া প্রমোদে আসক্ত রহিয়াছি। ৪২—৪৩॥ ভোগ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া যাঁহারা বায়ুর ন্যায় স্বেচ্ছা-গতি লাভ করিতে পারিয়াছেন, আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষীর ন্যায় যাঁহারা অবাধগতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই জীবন সার্থক। ৪৪॥ পক্ষীকে যখন ধৃত করিয়া হস্তমধ্যে রক্ষা করি, সে পলায়নের জন্য কত যত্নবান হয়। আমাদেরও সেইরূপ কামনার বন্ধন হইতে নির্ম্মুক্ত হইবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করা আবশ্যক। ৪৫॥ আমিষ-লোভী গৃধ্র জালবদ্ধ হইলে অন্য পক্ষী যেমন তৎপ্রতি দৃষ্টি করিয়া সতর্ক হয়, কামলুব্ধ জীবের দুর্দ্দশা দেখিয়া আমাদেরও সেইরূপ সতর্ক হওয়া আবশ্যক; বিষয়াদির প্রলোভন পরিহর্ত্তব্য। ৪৬॥ সর্প যেমন গরুড়-ভয়ে ভীত হইয়া শঙ্কিত-ভাবে বিচরণ করে, সংসার-বন্ধ-হেতুভূত বিষয়-বাসনাকেও সেইরূপ শঙ্কার সহিত বর্জ্জন করা আবশ্যক। ৪৭॥ শৃঙ্খল ভগ্ন করিতে পারিলে হস্তী যেমন যথেচ্ছ-স্থানে পলায়ন করে, মানুষও সেইরূপ কামনার শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া মুক্তির পথে অগ্রসর হয়। ৪৮॥ হে রাজন্! এই যে রাজ্য, এই যে সুখ-সম্পৎ, এই যে কামনার বিষয়, তাহা পরিত্যাগ করুন। ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধনে প্রয়াস পরিহার করুন। ধন-সম্পদে আসক্তি ছিন্ন হউক। সংসারের সুখ বিসর্জ্জন দিয়া ধর্ম্মের সাধনায় প্রবৃত্ত হউন। দৃঢ় চেষ্টার ফলে সংযম অধিগত হয়। ৪৯—৫০॥

জহায়ভোঈ তণুয়ং ভুয়ংগো নিম্মোয়ণিং হিচ্চপলেই মুত্তে। এমেব জায়া পয়হংতি-ভোএনোহং কহং নাণু গভিস্‌সমেক্কো॥ ৩৪॥ ছংদিত্তু জালং অবলং বরোহিয়া মচ্ছাজহা কামগুণেপহায় ধোরেয় সীলাতবসা উদারা ধীরাহুভিক্‌খায়রিঅং চরংতি॥ ৩৫॥ নহেব কুংচা সমইক্কমংতা তয়াণি জালাণি দলিত্তু হংসা। পলেংতি পুত্তায় পঈয়মজ্‌ঝংতেহং কহংনাণুগমিস্‌সমেক্কো॥ ৩৬॥ নাহং রমেপংকৃখিণি পংজরেবা সংতাণছিন্না চরিস্‌সামি-মোণং। অকিংচনাউজ্জু কডা নিরামিসাপরিগ্‌গহারংভ নিয়ত্তদোসা॥ ৪১॥ দবগ্‌গিণা জহারম্নেউজ্ঝমাণেসু জংতুসু। অন্নেসত্তাপ মোয়ংতি রাগদোস বসংগয়া॥ ৪২॥ এবমেব বয়ং মূঢ়া কামভোগেসু মুচ্ছিয়া উজ্‌ঝমাণং নবুজ্ঝামো। রাগদোষগ্‌গিণা জগং॥ ৪৩॥ ভোগেভোচ্চাবমিত্তায় লহুভূয় বিহারিণো। অমোয়মাণা গচ্ছংতি দিয়াকম কমাইব॥৪৪॥ ইমেয় বদ্ধা ফংদংতি মমহত্থজ্জমাগয়া বয়ংচ সত্তাকামেসু ভবিস্‌সামো জহাইমে॥ ৪৫॥ সামিসং কুললংদিস্‌স বজ্ঝমাণং নিরামিসং আমিসং সব্বমুজ্‌ঝিত্তা বিহরিস্‌সামো নিরামিসা॥ ৪৬॥ গিদ্ধো বমেউ গচ্ছাণং কামে সংসারবড্‌ঢণে। উরগো সুবন্ন পাসেব্ব সংকামণো তণুংচরে॥ ৪৭॥ নাগোব্ব বংধণং ছিত্তা অপ্পণো বসহিংবএ। এয়ং পথ্থং মহারায়ং উসুয়ারেত্তিমেবুয়ং॥ ৪৮॥ চঈত্তা বিউলং রজ্জং কামভোগেয় দুচ্চএ। নিব্বিসয়া নিরামিস্‌সা নিন্নেহানিপরিগ্‌গহা॥ ৪৯॥ সম্মং ধম্মং বিয়া ণিত্তা চিচ্চাকাম-গুণে বরে। তবংপগিজ্ঝ হক্‌খায়ং ঘোরং ঘোর পরক্কমা॥ ৫০॥

রাজ্ঞীর এবম্বিধ উৎসাহপূর্ণ বাক্যে রাজার চৈতন্য উদয় হয়; রাজ্ঞীর বাক্যে জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইলে রাজাও সংসার-আশ্রম পরিত্যাগ করেন।

সংসার-ত্যাগে ভিক্ষুধর্ম্ম-গ্রহণে ভিক্ষু-জীবন কিরূপে যাপন করিতে হইবে, অতঃপর তৎসম্বন্ধে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। উত্তরাধ্যয়নের পঞ্চদশ অধ্যয়নের বর্ণিতব্য বিষয়—"স ভিক্ষু"। ঐ অধ্যয়নের প্রতি শ্লোকেরই শেষ বাক্য—"স ভিক্ষু।"

প্রকৃত ভিক্ষু কে? কি গুণ-ধর্ম্মের অধিকারী হইলে প্রকৃত ভিক্ষু পদ লাভ করা যায়, কি কঠোর সংযম-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে প্রকৃত ভিক্ষু হইতে পারা যায়, এই অধ্যয়নের শ্লোক-ষোড়শে তাহাই বিবৃত আছে। যদি কাহারও মনে প্রশ্ন উঠে, যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন—ভিক্ষু কে? (কঃ ভিক্ষু) তাহার উত্তর,—

"মোণং চরিস্সামি সমেচ্চধম্মং সহিএউজ্জু কডেনিয়াণ ছিন্নে। সংথবং জহেজ্জ অকামকামে অন্নায়এসী পরিব্বএ স ভিক্খু॥ ১॥ রাগোবরয়ংচরেজ্জলাঢে বিরএ বেয় বিয়ায় রক্‌খিএ। পন্নে অভিভূয় সব্বদংসী জে কম্হি বিনমুচ্ছিএ স ভিক্খু॥ ২॥ অক্কোসবহংবিদিত্তুধীরে মুনীচরে লাঢে মিচ্চমায় গুত্তে। অবগ্‌গমণে অসংপহিট্ঠে জে কসিণং অহিয়াসএ স ভিক্খু॥ ৩॥ পংতং সয়ণাসণং ভইত্তাসি উন্হং বিবিহংচ দংসমসগং অবগ্‌গং অবগ্‌গমনে অসংপহিট্ঠে জেকসিণং অহিয়ায়সএ স ভিক্খু॥ ৪॥ নোসক্কিয় মিচ্ছঈণ পুয়ং নোবিয় বংদণগংকওপসংসং। সসংজএ সুব্বএ তবস্সী সহিএ আয় গবেসএ স ভিক্খু॥ ৫॥ যেন পুণো জহাই জীবিয়ং মোহং বাকসিণং নিয়চ্ছঈ। নরনারিংপজহে সয়া তবস্সীনয় কোউহলং উবেঈ স ভিক্খু॥ ৬॥ ছিন্নং সরংভোম মংতলিক্‌থং সুবিণ লক্‌খণ দংডবথু বিজ্জং। অংগবিয়ারং সরস্স বিজয়ংজো বিজ্জাহিং ন জীবঈ স ভিক্খু॥ ৭॥ মুংতং মূলং বিবিহং বিজ্জচিংতং বমণ বিরেয়ণ ধূভনেত্ত সিণাণং আউরে সরণংতিগিচ্ছিয়ংচ। তং পরিন্নায় পরিব্বএ স ভিক্খু॥ ৮॥ খত্তিয়গণউগ্‌গরায়পুত্তমাহণ ভোইয় বিবিহায় সিপ্পিণো ণোতেসিং বয়ই সিলোগ পুয়ং তং পরিন্নায় পরিব্বএ স ভিক্খু॥ ৯॥ গিহিণোজে পব্বইএণ দিট্টা অপব্বই এণবসংথুয়া হবেজ্জা তেসিংইহলোইয় ফলট্টা জো সংথবং ন করেই স ভিক্খু॥ ১০॥ সয়ণাসণপাণ ভোয়ণং বিবিহং খাঈমসাইমং পরেসিং অদএ পডিসেহিএ নিয়ংটে জেতথনপও সঈ স ভিক্খু॥ ১১॥ জং কিংচি আহারপাণং বিবিহংখাই সমাইমং পরেং সিং লদ্ধুং জোতংতিবিহেণনাণুকংপেমণ বয়কায় সুসংবডে স ভিক্খু॥ ১২॥ আয়ামগংচেব জবোদগংচ সীয়ংসো বীরংচ জবোদগংচ নোহীলএ পিডং নীরসংতু পংতং কুলাইং পরিব্বএ স ভিক্খু॥ ১৩॥ সদ্দা বিবিহাভবংতিলোএ দিব্বামাণুস্সায় তহাতিরিচ্ছা। ভীমাভয়ভেরবা উরালাজে সোচ্চা ন বিহিজ্জই স ভিক্খু॥ ১৪॥ বায়ং বিবিহং সমেচ্চলোএসহিয়েখেয়াণু গএ কোবিয়প্পা। পন্নেঅভিভূয় সব্বদংসী উবসংতেঅ বিহেউএ স ভিক্খু॥ ১৫॥ অসিপ্পজীবীঅ গিহেঅমিত্তেজি ইংদিএ সব্বওবিপ্পমুক্কে অণুক্কসাঈলহু অপ্পভক্‌খী। চিচ্চাগিহং এগচরে স ভিক্খুত্তিবেমি॥ ১৬॥"

অর্থাৎ,—'ভিক্ষু-ধর্ম্ম-গ্রহণে অঙ্গীকার পূর্ব্বক যিনি সাধুসঙ্গে সরল অন্তঃকরণে কামনা-বর্জ্জিত হইয়া বাস করেন; এবং পূর্ব্ব-সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া সুখাশা-পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক অজ্ঞাত

অপরিচিত ভিক্ষুকের ন্যায় পরিভ্রমণ করেন; তিনিই প্রকৃত ভিক্ষু-পদবাচ্য। ১॥ অনুরাগ-বিবর্জ্জিত হইয়া সততার আদর্শ রূপে পাপকার্য্য পরিহার পূর্ব্বক যিনি ধর্ম্ম-তত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ করেন; এবং আত্মাকে সর্ব্ববিধ অপবিত্র সংসর্গ হইতে মুক্ত করিয়া জ্ঞানী দৃঢ়চিত্ত ও সর্ব্বদর্শী হইতে পারেন; অপিচ, সর্ব্ববিষয়েই যিনি আসক্তি-পরিশূন্য হন;—তিনিই প্রকৃত ভিক্ষুপদবাচ্য। ২॥ কোনরূপ নিন্দায় বা ক্ষতিকর কার্য্যে যিনি অবিচলিত-চিত্ত, সততার আদর্শ-স্বরূপ যে দৃঢ়চিত্ত ভিক্ষু আপন আত্মাকে সর্ব্বদা পাপ-সংসর্গ হইতে নির্লিপ্ত রাখিতে পারিয়াছেন; কোনও বিষয়ের প্রতিই যাঁহার রতি বা আকাঙ্ক্ষা নাই; যিনি সকল বিষয়ই সর্ব্বথা সহ্য করিতে সমর্থ;—তিনিই প্রকৃত ভিক্ষু-পদবাচ্য। ৩॥ নিকৃষ্ট শয্যায় বা বাসস্থানে যাঁহার পরিতুষ্টি; শৈত্যে বা উত্তাপে, মক্ষিকার বা মশকের উপদ্রবে যিনি কদাচ বিচলিত নহেন; সকলই যিনি সহ্য করিতে পারিয়াছেন;—তিনিই প্রকৃত ভিক্ষু-পদবাচ্য। ৪॥ যিনি সম্মানজনক ব্যবহারের, অথবা আতিথ্য-সৎকার লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন না; যিনি প্রশংসার অথবা শ্রদ্ধা-ভক্তির আশায় আশান্বিত নহেন; যিনি আত্ম-সংযমশীল প্রতিজ্ঞাপালন-তৎপর, কঠোর নিয়ম-পালনে সদা-অভ্যস্ত; সাধু সঙ্গে বাসে সতত সচ্চিন্তায় যাঁহার আত্মা নিবিষ্ট;—তিনিই প্রকৃত ভিক্ষু-পদবাচ্য। ৫॥ যিনি আপনার জীবনকে তুচ্ছ বলিয়া মনে করেন; মোহকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন; স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই সঙ্গলাভে যিনি উদাসীন; যিনি সর্ব্বদা কঠোর সংযম-সাধনা-পরায়ণ; কোনও বিষয়েই যাঁহার কৌতূহল নাই;—তিনিই প্রকৃত ভিক্ষু-পদবাচ্য। ৬॥······পার্থিব সুখ-সম্পৎ-লাভের জন্য যিনি কখনও কোনও গৃহীর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করেন নাই, কিংবা কাহারও সহিত বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ নহেন;—তিনিই প্রকৃত ভিক্ষু-পদবাচ্য। ১০॥ কোনও গৃহী যদি স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া শয্যা, বাসস্থান, পানাহার কিংবা কোনও সুখাদ্য প্রদান না করে, নিগ্রন্থ কদাচ তাহা গ্রহণ করিবেন না। গৃহীর নিকট প্রত্যাখ্যাত হইলেও যে নিগ্রন্থ কখনও ক্রোধের বশীভূত হন না; তিনিই প্রকৃত ভিক্ষু-পদবাচ্য। ১১॥ যদি কোনও নিগ্রন্থ খাদ্য পানীয় প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া বাক্যে চিন্তায় বা কার্য্যে আপনার সমধর্ম্মী ভিক্ষুগণের প্রতি সহানুভূতি-পরায়ণ না হন; তাহা হইলে তাঁহাকে প্রকৃত ভিক্ষু বলা যায় না; অপিচ, যিনি চিন্তায় বাক্যে বা কার্য্যে সম্পূর্ণ বিনয়-সম্পন্ন;—তিনিই প্রকৃত ভিক্ষু-পদবাচ্য। ১২॥······যাঁহার গৃহ নাই, যাঁহার বন্ধু নাই; যিনি ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিতে পারিয়াছেন; যিনি সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন; যিনি নিষ্পাপ এবং স্বল্পাহারী গৃহত্যাগী ও সঙ্গ রহিত;—তিনিই প্রকৃত ভিক্ষু-পদবাচ্য। ১৬॥'

নিগ্রন্থ বা ভিক্ষু হইতে হইলে বড় কঠোর সংযম-সাধনা আবশ্যক। জৈন-শাস্ত্রে সাধারণ-ভাবে নিগ্রন্থের প্রতিপাল্য দশটী বিধি আছে। জৈন-ধর্ম্ম-গ্রহণ কালে যে পঞ্চ মহাব্রত গ্রহণ করিতে হয়, দশবিধ বিধি বা অনুশাসন তাহারই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতিতে আকৃষ্ট না হইয়া কঠোর সংযম-সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারিলে নিগ্রন্থ বা ভিক্ষু হইতে পারা যায়। নিগ্রন্থের প্রতিপাল্য যে দশবিধ নিদেশ আছে, তৎসমুদায়ের

নিগ্রন্থের আচার-লক্ষণ।

মর্ম্ম এই যে, নির্গ্রন্থ কখনও এক স্থানে অবস্থিতি করিবেন না, কদাচ স্ত্রীলোকের সংসর্গে আসিবেন না, কদাচ নৃত্য-গীত-বাদ্যে আসক্ত হইবেন না, কদাচ সুখাদ্যের বা সুবেশের অনুরাগী হইবেন না। বাক্যে, কার্য্যে বা চিন্তায় কোনও বিষয়ে তাঁহার আসক্তি না জন্মে,—ইহাই এ সম্বন্ধে স্থূল উপদেশ। নির্গ্রন্থ নামের সার্থকতা এবং নির্গ্রন্থের পদস্খলন প্রভৃতি বিষয়ে শাস্ত্রে অশেষ দৃষ্টান্ত আছে। আবার সংসার-কীট মানুষ, রাজ্যৈশ্বর্য্যে আকৃষ্ট নরপতি, কিরূপে ভিক্ষু-জীবন গ্রহণ করিয়া চিরশান্তির ক্রোড়ে আশ্রয় প্রাপ্ত হন, তাহার ভূয়সী দৃষ্টান্ত জৈন-শাস্ত্রে দেখিতে পাই। রাজা সঞ্জয় প্রভৃতির প্রসঙ্গে, তাঁহাদের সংসার-ত্যাগের দৃশ্য উজ্জ্বল হইয়া আছে। জৈন-শাস্ত্রে দেখিতে পাই,—কাম্পিল্য নগরে সঞ্জয় নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার বহু সৈন্য-সামন্ত, বহু গজাশ্ব-রথ ছিল। রাজা সঞ্জয় একদা মৃগয়ায় বহির্গত হন। সঙ্গে অসংখ্য ঘোটক, অসংখ্য গজ, অসংখ্য রথ এবং অসংখ্য পদাতিক সৈন্য সুসজ্জিত ছিল। মৃগয়ায় গমন করিয়া অশ্বারোহণ পূর্ব্বক সঞ্জয় এক মৃগের অনুসরণে ধাবমান হন। কাম্পিল্য নগর সান্নিধ্যে 'কেশর' উদ্যান মধ্যে সেই মৃগ পলায়ন করে। রাজা সঞ্জয় ক্রীড়াচ্ছলে সেই ভীত ত্রস্ত মৃগের সংহার-সাধন করেন। তখন কেশর উদ্যানে এক সন্ন্যাসী যোগ-মগ্ন ছিলেন। সংসারের সর্ব্বপ্রকার পাপ-জনক প্রবৃত্তি ধ্বংস করিয়া বৃক্ষমূলে আশ্রয়-গ্রহণ পূর্ব্বক তিনি তপস্যা করিতেছিলেন। মৃগ যখন প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া সেই সাধু-সন্নিধানে উপস্থিত হয়, রাজা সঞ্জয় তখনই তাহাকে নিহত করেন। মৃগ নিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজার দৃষ্টি সন্ন্যাসীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সাধুর নিকটে গমন করেন। অনুশোচনার তীব্র তাপে নৃপতির হৃদয় বিদগ্ধ হইতে থাকে। তিনি মনে মনে বলেন,—'হায়, আমি কি সর্ব্বনাশই করিয়া-ছিলাম! ক্রীড়ামদে উন্মত্ত হইয়া এখনই সাধুর সংহার-সাধন করিতে বসিয়াছিলাম! আমি কি নির্দ্দয়!—আমি কি হতভাগ্য!' মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া, অশ্বকে বিদায় দিয়া, নৃপতি সেই ভিক্ষুর পদপ্রান্তে নিপতিত হইয়া আর্ত্তস্বরে কহিলেন,—'মহাত্মন্! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।' সাধু ভগবচ্চিন্তায় নিবিষ্ট-চিত্ত ছিলেন। নৃপতির প্রার্থনায় কোনও উত্তর প্রদান করিলেন না। রাজার মনে তাহাতে অধিকতর ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি আর্ত্তস্বরে কহিলেন,—'আমি রাজা সঞ্জয়। হে মহাত্মন্! আপনি আমায় ক্ষমা করুন! আপনার ক্রোধানলে যেন আমার এ লক্ষ লক্ষ সহচর ভস্মসাৎ না হয়।' ভিক্ষুর ধ্যান-ভঙ্গ হইল। নৃপতিকে আশ্বস্ত করিয়া তিনি উত্তর দিলেন,—'হে রাজন্! কোনও শঙ্কা নাই! আপনার সহচরগণকেও অভয় প্রদান করুন। পৃথিবীর এই ক্ষণস্থায়ী জীব-জীবনে কেন আপনারা নিষ্ঠুরাচারে আসক্ত হইয়াছেন? নিশ্চয়ই এক-দিন এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের অবসান হইবে। সংসারের সকল বস্তুর সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যাইবে। এ অবস্থার বিষয় অবগত থাকিয়াও কেন আপনার রাজ-শক্তিতে আসক্তি দেখি! জীবন এবং সৌন্দর্য্য বিদ্যুৎ-প্রবাহের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী! তাহাতেই আপনার এত আসক্তি! মনে ভাবিয়া দেখুন—পরজীবনে উহাদের দ্বারা কি উপকার সাধিত

সঞ্জয়ের উপাখ্যান।

হইবে। স্ত্রী বলুন, পুত্র-কন্যা বলুন, বন্ধু-বান্ধব বলুন, আত্মীয়-স্বজন বলুন, মনুষ্যের জীবন-কালে যাহারা পোষ্য ছিল, মৃত্যুর সময় তাহারা কেহই অনুসরণ করে না! পুত্রগণ দুঃখ প্রকাশ করিয়া পিতার মৃতদেহ অপসৃত করে। পুত্রগণের এবং আত্মীয়গণের সম্বন্ধে পিতামাতারও সেই ব্যবহার। এ সকল দেখিয়া, হে রাজন্, সংযম-সাধনা শিক্ষা করুন। মৃত ব্যক্তি যে ধনরাশি সঞ্চয় করিয়া যায়, তাহার আত্মীয়-স্বজন আনন্দে সে ধন-সম্পত্তি উপভোগ করে। এমন কি, মৃত ব্যক্তির সুরক্ষিত সহধর্ম্মিণীকে পর্য্যন্ত পরিশেষে অপরের অঙ্কশায়িনী হইতে দেখা যায়। ইহা দেখিয়াও কি মানুষের জ্ঞান-চৈতন্য হয় না! ইহ-সংসারে মানুষ ইহ-জীবনে সদসৎ যে কোনও কার্য্য করে, পরজীবনে তাহাকে তাহার ফল-ভাগী হইতে হয়।' * ভিক্ষুর এবম্বিধ উপদেশ-বাক্যে নৃপতির জ্ঞান-সঞ্চার হইল। তিনি সেই ভিক্ষুর নিকট সদ্ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তদবধি আত্মার পবিত্রতা সাধনে তাঁহার প্রবৃত্তি আসিল। পার্থিব সর্ব্ববিধ পদার্থে তাঁহার অরতি জন্মিল। তিনি বুঝিলেন,—যিনি সকল বন্ধন, সকল পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছেন, তিনিই মুক্ত-পুরুষ। †

নৃপতি সঞ্জয় সাধু-বাক্যে জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় আরও বহু নৃপতি জ্ঞানালোক লাভ করিতে সমর্থ হন। রাজা ভরত, যাঁহার নাম অনুসারে ভারতবর্ষ নামের উৎপত্তি, জৈনশাস্ত্রানুসারে তিনিও এই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

বলশ্রীর উপাখ্যান।

রাজা সগর, এই সদ্জ্ঞান লাভ করিয়া সসাগরা ধরিত্রীর আধিপত্য অবহেলায় পরিত্যাগ করিয়া যান। বিশ্বব্যাপী রাজ-শক্তি পরিত্যাগ করিয়া রাজা মঘবন্, রাজা সনৎকুমার, শান্তি, কুন্থু, অর, মহাপদ্ম, হরিসেন, জয়, দশার্ণভদ্র, করকণ্ডু, দ্বিমুখ, নমী, নগ্নজিৎ, উদয়ন্, বিজয়, মহাবল এবং কাশীরাজ প্রভৃতি নৃপতিগণ সেই জ্ঞান লাভ করিয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন। ‡ পূর্ব্ববয়স্ক রাজগণ যে জ্ঞান লাভ করিয়া যে ত্যাগের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া যান, অস্ফুট-কোরক-সদৃশ কত কত রাজকুমারের জীবন-

---

রাজা সঞ্জয়কে ভিক্ষু যে উত্তর দিয়াছিলেন, উত্তরাধ্যয়ন সূত্রের ভাষায় তাহা এইরূপ বিবৃত হইয়াছে; যথা,—

"অভয়ং পত্থিবাতুজ্ঝং অভয়দায়া ভবাহিয়। অণিচ্চে জীবলোগংমি কিংহিংসাএ পসজ্জসী॥ ১১॥
জয়াসব্বং পরিচ্চজ্জ গংতব্ব মবসস্সতে। অণিচ্চে জীবলোগংমি কিংরজ্জংমি পসজ্জসী॥ ১২॥
জীবিয়ং চেবরূবংচ বিজ্জুসংপায় চংবলং। জত্থতং মুজ্ঝসীরায়ং পেচ্চত্থং নাববুজ্ঝসে॥ ১৩॥
দারাণিয় সুয়াচেব মিত্তায় তহ বংধবা। জীবংত মনুজীবংতি ময়ংনাণুব্বয়ংতিয়॥ ১৪॥
নীহরংতি ময়ংপুত্তা পিয়রং পরমদুক্খিয়া। পিয়রোবি তহা পুত্তে বংধুরায়ং তবংচরে॥ ১৫॥
তওতেণজ্জিএ দব্বেদারেয় পরিরক্খিয়ে। কীলংতন্নে নরারায়ং হট্ঠতুট্ঠ মলংকিআ॥ ১৬॥
তেণা বিজং কয়ং কম্মং সুহংবাজইবাদুহং। কম্মুণাতেণ সংজুত্তো গচ্ছঈও পরংভবং॥" ১৭॥

কহংধীরে অহে উহিং অত্তাণং পরিযাবসে। সব্বসংগ বিণিমুক্কে সিদ্ধে হবই নীরএত্তিবেমি॥ ৫৪॥

জৈনধর্ম্ম গ্রহণ উপলক্ষে পূর্ব্বোক্ত যে সকল রাজার ত্যাগ-স্বীকারের দৃষ্টান্ত জৈনশাস্ত্রে উক্ত দেখি, তাঁহারা প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পৃষ্ঠ-পোষক ও আদর্শ-অনুসরণকারী ছিলেন বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রে পরিচিত আছেন। এই বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে জৈনধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্ম যে অভিন্ন, এবং একেরই দুই প্রতিরূপ, তাহা স্বতঃই মনে আসে। যে ভরতের নাম অনুসারে ভারতবর্ষ নামের উৎপত্তি, তাঁহার সম্বন্ধে নানা মতান্তর আছে। জৈন-শাস্ত্রের মত এই যে, প্রথম জৈন-তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র সেই ভরত। তিনি প্রথম রাজচক্রবর্ত্তী

বৃত্তেও সেই দৃষ্টান্ত প্রস্ফুট দেখিতে পাই। কুমার বলশ্রী তাঁহাদের অন্যতম। মনোহর উদ্যানাদি শোভিত সুগ্রীব নগরে রাজা বলভদ্র ও রাণী মৃগা প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন। বলশ্রী তাঁহাদের একমাত্র প্রিয়পুত্র, ভাবী রাজ্যেশ্বর যুবরাজ। মৃগার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া কুমার বলশ্রী মৃগাপুত্র নামেও পরিচিত ছিলেন। আনন্দের সংসারে একমাত্র স্নেহের নন্দন—যখন সুখৈশ্বর্য্যের মধ্যে লালিত পালিত বর্দ্ধিত হইতেছিলেন, সেই সময় সহসা এক শ্রমণের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তাঁহাকে দেখিয়া কুমারের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—তিনি যেন সে মূর্ত্তি কোথাও দেখিয়াছেন। একদৃষ্টে সেই শ্রমণের প্রতি চাহিতে চাহিতে কুমারের মনে পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তাঁহার মনে পড়িল,—কি সূত্রে কি আকাঙ্ক্ষার ফলে তিনি রাজ-

---

হইয়াছিলেন এবং অযোধ্যায় তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি যখন জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তখন ইন্দ্রদেবের আদেশ অনুসারে তিনি আপনার মস্তক হইতে পঞ্চমুষ্টি পরিমিত কেশ উৎপাটন করিয়াছিলেন। জৈনধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে প্রবেশ-কালে জৈন যতিগণের সম্বন্ধে ঐ নিয়ম আজিও প্রচলিত আছে। সসাগরা ধরিত্রীর অধিপতি সগর নৃপতি সম্বন্ধে পৌরাণিক বিবরণ পুরাণজ্ঞ হিন্দুর অবিদিত নাই। জৈনশাস্ত্রের মত এই যে, অজিৎ—দ্বিতীয় জৈন-তীর্থঙ্কর ছিলেন। তাঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঐ সগর অযোধ্যার অধিপতি হইয়াছিলেন। তিনি পৃথিবীতে দ্বিতীয় রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া অভিহিত হন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অজিৎ কর্তৃক তিনি ধর্ম্মদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামায়ণে সগর রাজার যে বিবরণ আছে, জৈন-শাস্ত্রোক্ত সগর রাজার উপাখ্যান তাহারই অনুসরণ ভিন্ন অন্য কিছুই মনে হয় না। মঘবন্—শ্রাবস্তীর রাজা সমুদ্রবিজয়ের পুত্র বলিয়া পরিচিত। তাঁহার মাতার নাম—ভদ্রা। জৈনশাস্ত্র মতে তিনি তৃতীয় রাজচক্রবর্ত্তী। সনৎকুমার—হস্তিনাপুরের অধিপতি রাজা অশ্বসেনের পুত্র। রাজ্ঞী সহদেবীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি চতুর্থ রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া পরিচিত। শান্তি—ষোড়শ তীর্থঙ্কর। কুন্থু—সপ্তদশ তীর্থঙ্কর; এবং অর—অষ্টাদশ তীর্থঙ্কর। জ্যাকোবি বলেন,—কুন্থু নামটী কুকুৎস্থ নামের অপভ্রংশ। তিনি ইক্ষ্বাকুকুলে জন্মগ্রহণ করেন। রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র কুকুৎস্থ নামে পরিচিত। তিনিই প্রাকৃত ভাষায় কুন্থু নামে অভিহিত হইয়াছেন। মহাপদ্ম—নবম রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া পরিচিত। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ণুকুমার, সুব্রত কর্তৃক জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সেই সুব্রত বিংশতিতম জৈন তীর্থঙ্কর মুনি-সুব্রতের শিষ্য ছিলেন। পিতা পদ্মোত্তরের মন্ত্রীর (নমুচির) নিকট হইতে মহাপদ্ম পৃথিবীর আধিপত্য কাড়িয়া লন। পদ্মোত্তর যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তিনি নমুচির নিকট একটী প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছিলেন। নমুচিকে তিনি ত্রিপাদ ভূমি দান করিবেন,—ইহাই তাঁহার সর্ত্ত ছিল। এই সূত্রে পদ্মোত্তরের সাম্রাজ্য নমুচি অধিকার করিয়া বসেন। মহাপদ্ম কর্তৃক তাহার উদ্ধার-সাধন হয়। হস্তিনাপুরে মহাপদ্মের রাজধানী ছিল. জ্যাকবি বলেন,—এই উপাখ্যানটী ব্রাহ্মণ্য-শাস্ত্রের বর্ণিত বিষ্ণুর ও বলির উপাখ্যান হইতে গৃহীত হইয়াছে। জৈনশাস্ত্রের মত এই যে, মন্ত্রী নমুচি বিবাদের ফলে রাজ্য অধিকার করিয়া জৈন ভিক্ষুদিগকে পরাভূত করেন। অপিচ প্রতিশোধ-গ্রহণের উদ্দেশ্যেই জৈনগণকে রাজ্য পরিত্যাগ করিতে আদেশ দেন। হরিসেন—কাম্পিল্যের রাজা মহাহরির পুত্র। তিনি দশম রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া পরিচিত। জয়—রাজগৃহের অধিপতি রাজা সমুদ্র-বিজয়ের পুত্র ছিলেন। তিনি একাদশ রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া পরিচিত। দশার্ণভদ্র—চতুর্ব্বিংশ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর সমসাময়িক। রাজা উদয়নও মহাবীর স্বামীর সমসাময়িক বলিয়া অভিহিত হন। কাশীরাজ বলিয়া যাঁহার উল্লেখ আছে, তাঁহার নাম—নন্দন। তিনি অগ্নিশিখ রাজার পুত্র এবং সপ্তম বলদেব নামে পরিচিত। বিজয়—দ্বারকাবতীর রাজা ব্রহ্মরাজের পুত্র এবং বাসুদেব দ্বিপৃষ্টির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া পরিচিত। মহাবল—হস্তিনাপুরের রাজা বলের পুত্র। ত্রয়োদশ তীর্থঙ্কর বিমলের সময়ে তিনি প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন।

সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজ্যৈশ্বর্য্যের আনন্দ তখন কুমারের নিকট তুচ্ছ বলিয়া প্রতীত হইল, সংযম-সাধনার প্রবৃত্তি আসিল।

কুমার তখন পিতা-মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—"আমি পঞ্চ মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছি। আমি জানিতেছি, পাপীর জন্য নরকে বা ইহসংসারে পশুজন্মে কি কষ্ট—কি যন্ত্রণা! এই সংসার মহা-সমুদ্রে আর আমার আনন্দ বোধ হইতেছে না। মা, আমায় সন্ন্যাস গ্রহণে অনুমতি দেও। হে পিতঃ! হে মাতঃ! আমি বহু সুখ ভোগ করিয়াছি। কিন্তু এখন বুঝিতেছি,—সে সুখ বিষফলবৎ। সে সুখের পরিণাম বড় যন্ত্রণাপ্রদ। সে যন্ত্রণা অবিচ্ছিন্ন অনন্তস্থায়ী। দেহ চিরস্থায়ী নয়। ইহা অপবিত্র ও অপবিত্রতা হইতে উৎপন্ন। আত্মার ক্ষণবিধ্বংসী এই বাসস্থান যন্ত্রণার আকর-স্বরূপ। এই ক্ষণস্থায়ী দেহ, যাহা অচিরে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে আমার কোনও আনন্দ নাই। ইহা ফেণপুঞ্জ-বৎ বা জলবুদ্‌বুদ সদৃশ। বৃথা মনুষ্য জীবন—অশান্তির ও পীড়ার আশ্রয়স্থল। বার্দ্ধক্য এবং মৃত্যু এ জীবন গ্রাস করিয়া ফেলে। এ জীবনে আমার মুহূর্ত্তের জন্যও আনন্দ নাই। জন্ম—দুঃখদায়ক, বার্দ্ধক্য—দুঃখদায়ক, জরা-মৃত্যুও—দুঃখদায়ক! হায়! আর কিছুই নয়, কেবল দুঃখ লইয়াই সংসার। এ সংসারে মানুষ কেবল দুঃখই ভোগ করে। এই ভূ-সম্পত্তি, এই অট্টালিকা, এই স্বর্ণ-রৌপ্য, এই স্ত্রী-পুত্র, এই আত্মীয়-স্বজন, এমন কি এই দেহ পর্য্যন্ত একদিন আমাকে নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিম্পাক ফল ভক্ষণের পরিণাম যেমন শোচনীয়, ইহসংসারে সুখভোগের পরিণামও সেইরূপ দুঃখপ্রদ। দূরদেশে যাত্রাকালে যদি কেহ আহার্য্যাদির ব্যবস্থা না করিয়া গমন করে, পথে যেমন তাহার কষ্টের অবধি থাকে না, সে যেমন ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে; সেইরূপ, যে জন সদ্ধর্ম্মের সম্বল না লইয়া পরজীবনের পথে যাত্রা করে, তাহাকেও পথে সেইরূপ অশান্তির ও পীড়ার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। আর যে জন দূরদেশে যাত্রাকালে পূর্ব্ব হইতেই আহার্য্যাদির ব্যবস্থা করিয়া লয়। ক্ষুধা-তৃষ্ণা-জনিত কোনও কষ্টই পরজীবনে তাহাকে অভিভূত করিতে পারে না। ধর্ম্ম-সম্বলে বলীয়ান হইয়া পরজীবনের জন্য যাত্রা করিলে মানুষ কর্ম্মবন্ধন ও যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ লাভ করে। গৃহ অগ্নি-সংযুক্ত হইলে গৃহস্বামী যেমন মূল্যবান সামগ্রী-সমূহ সর্ব্বাগ্রে বহন করিয়া লইয়া যায় এবং অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য-সমূহ গৃহ-মধ্যে পড়িয়া থাকে; সেইরূপ, যখন দেখিতেছি—সমগ্র পৃথিবী অগ্নিসংযুক্ত হইয়াছে, বার্দ্ধক্য এবং মৃত্যু আসিয়া জীবনকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন আত্মাকে রক্ষা করিবার উপায় কি? * হে জনক-জননী! অনুমতি করুন, আমি আত্ম-রক্ষার চেষ্টা করি।"

* সুয়ানিমেপংচ মহব্বয়াণি নর এসুদুকুখং চ তিরিকখজেণনিসু নিবিন্ন কামোমি।
মহন্নবাও অণ্‌জাণহপব্বইস্‌সামি অম্মো॥ ১১॥
অম্মতায়মএভোগা ভুত্তা বিসফলোবমা। পচ্ছা কডুয় বিবাগা অণ্‌বংধ দুহাবহা॥ ১২॥
ইমং সরীরং অণিচ্চং অসুঈ অসুইসংভবং। অসাসয়া বাসমিণং দুকখকেসাণ ভায়ণং॥ ১৩॥
অসাসএ সরীরং মিরঈং নোবলভামিহং। পচ্ছাপুরাচ্চঈযব্বো ফেণবুব্বুয় সংণিভে॥ ১৪॥

জনক-জননী উত্তর দিলেন,—"বৎস! বড় কঠোর—শ্রমণ-ধর্ম্ম প্রতিপালন। ভিক্ষুর সহস্র গুণ-ধর্ম্ম আবশ্যক। শত্রু মিত্র পৃথিবীর সর্ব্ব জীবের প্রতি সমদর্শিতা চাই; সারা-জীবনে সর্ব্ববিধ প্রাণীর প্রতি অহিংসায় নিরত থাকা আবশ্যক;—এ বড় কঠোর কর্ত্তব্য। মিথ্যা-বাক্যে বিরতি-বিষয়ে কদাচ অসতর্ক হইবে না; মনোহারী অথচ সত্য বাক্য প্রয়োগে সর্ব্বদা প্রযত্নপর থাকিতে হইবে;—এ বড় কঠোর কর্ত্তব্য। অদত্ত দ্রব্য (এমন কি খড়িকাটী পর্য্যন্ত) গ্রহণে বিরত থাকিতে হইবে এবং কেবলমাত্র নির্দ্দোষ ভিক্ষা-গ্রহণে অধিকার থাকিবে;—এ বড় কঠোর কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয়-সুখের আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়াও সে সুখ-সম্ভোগে বিরতি এবং সংযম-সাধনার জন্য দৃঢ়ব্রত;—এ বড় কঠোর কর্ত্তব্য। ধন-ধান্যের ও ভৃত্যবর্গের উপর আধিপত্যত্যাগ, সর্ব্বকার্য্যে বিরতি এবং কোনও বস্তু গ্রহণ না করা;—এ বড় কঠোর কর্ত্তব্য। খাদ্য পানীয় প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ সামগ্রী রাত্রিতে গ্রহণ না করা অথবা পরদিনের বা অভাবপূরণের জন্য সঞ্চয় না রাখা,—এ বড় বিষম কর্ত্তব্য! ক্ষুধা তৃষ্ণা, শীত গ্রীষ্ম, মশক-মক্ষিকার উপদ্রব, অপমান, বাসের কষ্ট, তৃণশয্যা, অপরিচ্ছন্নতা প্রহার ও ভয়-প্রাপ্তি, দৈহিক কষ্ট ও কারাক্লেশ, ভিক্ষুর জীবন, নিষ্ফল ভিক্ষা,—এ সকল বড় কষ্টপ্রদ। পিঞ্জরাবদ্ধ পারাবতের ন্যায় এ জীবন নিয়ত শঙ্কাকুল। মস্তকের কেশ উৎপাটন দারুণ যন্ত্রণাদায়ক। মহাব্রত-গ্রহণ এবং তাহা প্রতিপালন—উচ্চবংশীয় জনের অসাধ্য। বৎস! তুমি সুখের ক্রোড়ে লালিত; তোমার নির্ম্মল ও কোমল স্বভাব; তুমি কখনই শ্রমণের ধর্ম্ম পালন করিতে সমর্থ হইবে না। যতদিন জীবন, ততদিন শান্তি নাই—বিশ্রাম নাই। কর্ত্তব্যের ভার—গুরুভার লৌহভার অপেক্ষা দুর্ব্বহ। মন্দাকিনী অতি-ক্রম করা যেমন অসাধ্য, স্রোতের বিরুদ্ধে সন্তরণ করা যেমন দুঃসাধ্য, বাহুবলে সাগর-সন্তরণ যেমন অসম্ভব; কর্ত্তব্যের মহাসাগর উত্তীর্ণ হওয়াও সেইরূপ অসাধ্য। আত্মসংযম—মুখবিবরপূর্ণ বালুকা-রাশির ন্যায় স্বাদহীন। কঠোর সংযম-সাধনা—শাণিত তরবারিমুখে বিচরণের ন্যায় দুঃসাধ্য। সচ্চরিত্র বিনয়সম্পন্ন হওয়া বড় কঠিন। সর্প যেমন সর্ব্বদা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সদা-সতর্ক থাকে; বিনয়-সম্পন্ন সচ্চরিত্র জনের পক্ষেও সেইরূপ সতর্কতা আবশ্যক। কিন্তু সে কি কঠিন সমস্যা! লৌহনির্ম্মিত শস্য চর্ব্বণ যেরূপ অসম্ভব, মানুষের পক্ষে বিনয়-সম্পন্ন সচ্চরিত্র হওয়াও সেইরূপ কঠিন। প্রজ্বলিত অগ্নি গলাধঃকরণ করা যেমন অসাধ্য, যুবাপুরুষের পক্ষে শ্রমণ-ধর্ম্ম পালন করাও সেইরূপ

মাণুসত্তে অসারম্মিবাহী রোগাণ আলএ। জরামরণঘত্থংমি খণংপি নরমামিহং॥ ১৫॥
জম্মদুক্খজরাদুক্খং রোগায় মরণাণিয়। অহো দুক্খেহ সংসারো জত্থকীসংতি জংতুণো॥ ১৬॥
খিত্তং বত্থুং হিরন্নং চ পুত্তদারং চ বংধবা। চইত্তাণং ইমং দেহং গংতব্ব মবসস্সমে॥ ১৭॥
জহা কিংপাগফলাণং পরিণামো ন সুংদরো। এবংভুত্তাণ ভোগাণং পরিণামো ন সুংদরো॥ ১৮॥
অদ্ধাণংজো মহংতংতু অপাহিজ্জো পবজ্জই। গচ্ছংতোসেদুহীহোইচ্ছুহাতন্হাহি পীড়িও॥ ১৯॥
এবং ধম্মং অকাউণং জো গচ্ছই পরংভবং। গচ্ছংতোসে দুহীহোই বাহীরোগেহিং পীড়িও॥ ২০॥
অদ্ধাণংজো মহংতংতু সপাহিজ্জো পবজ্জই। গচ্ছংতোসেসুহী হোই ছুহাতণ্হাএ বজ্জিও॥ ২১॥
এবং ধম্মংপিকাউণং জোগচ্ছই পরংভবং। গচ্ছংতোসে সুহীহোই অপ্পকম্মে অবেয়ণা॥ ২২॥
জহাগেহে পলিত্তংমি তস্সগেহস্স জোপহূসারভংডাইং নীণেই। অসারং অবউজ্ঝই॥ ২৩॥"

অসাধ্য। সছিদ্র বস্ত্রে যেমন বায়ু পূর্ণ করা অসম্ভব; দুর্ব্বল মানুষের পক্ষে সেইরূপ শ্রমণ-ধর্ম্ম গ্রহণ করা অসম্ভব। তুলাদণ্ডে মন্দার-পর্ব্বত পরিমাপ করা যেমন অসম্ভব; শ্রমণধর্ম্ম-গ্রহণ পূর্ব্বক নির্ভয়ে ও দৃঢ়চিত্তে বিচরণও সেইরূপ অসম্ভব। যাহার চিত্ত প্রশান্ত নহে, বাহু দ্বারা সমুদ্র-সন্তরণের চেষ্টার ন্যায় তাহার আত্ম-সংযম-চেষ্টা বৃথাই হয়। পঞ্চবিধ মানুষিক সুখ-সম্ভোগে প্রবৃত্ত হও। সুখ-সম্ভোগ শেষ হইলে, বৎস, তুমি ধর্ম্ম-পথ অবলম্বন করিও।'

কুমার বলশ্রী কহিলেন,—'পূজ্য জনকজননী! আপনারা যেমন সরলভাবে আপনাদের বক্তব্য বিবৃত করিলেন, ধর্ম্মের পথও সেইরূপ সরল। যে জন সর্ব্বকামনা পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছে, তাহার পক্ষে এ পৃথিবীতে কিছুই কঠিন নহে। অনন্তকাল হইতে আমি দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করিয়া আসিতেছি, পুনঃপুনঃ দুঃখ ও দুর্ব্বিপদ আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিতেছে। এ সংসার দুঃখের আকর; আমি এই ভয়াবহ সংসারে পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যু-জরা-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া চলিয়াছি। এখানে যে অনলে যে উত্তাপ, নরকের সে অনলে সে উত্তাপের অতি আধিক্য! সেই নরকের সেই জ্বালা আমি কত জন্ম ভোগ করিয়াছি! এখানে যে শৈত্য দেখি, সেখানকার শৈত্য এ শৈত্য অপেক্ষাও তীক্ষ্ণ ও অসহনীয়। নরকে আমায় সে শৈত্য ভোগ করিতে হইয়াছে। ঊর্দ্ধপদে নিম্নমুখে অবস্থিত থাকিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আমি কত বার দগ্ধ হইয়াছি ও চীৎকার করিয়া কাঁদিয়াছি।...এইরূপ যন্ত্রণার পর অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি। এখন কিসে সে যন্ত্রণার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিব, তাহারই উপায় অন্বেষণ করিতেছি। প্রতি জন্মে আমি যন্ত্রণাই ভোগ করিয়া আসিতেছি, কখনও মুহূর্ত্ত মাত্র তাহার উপশম পাই নাই।'

জনকজননী উত্তর দিলেন,—'বৎস, শ্রমণ-ধর্ম্ম গ্রহণে সকলেরই স্বাধীনতা আছে সত্য; কিন্তু শ্রমণ-ধর্ম্ম-গ্রহণেও যে কষ্ট নাই, তাহাই বা কিরূপে বলিব? পীড়া প্রভৃতির যন্ত্রণা উপশম করিতে না পারিলে শ্রমণগণের দুঃখ শেষ হয় কি?'

কুমার উত্তর দিলেন,—'আপনারা যেরূপ সরলভাবে এই উপদেশ প্রদান করিলেন, দুঃখকষ্ট-নিবারণের পথও সেইরূপ সরল। এই যে অসংখ্য পশুপক্ষী অরণ্যে বিচরণ করিতেছে, কে তাহাদের কষ্ট-নিবারণে যত্ন লইতেছে! বন্যজন্তু যেমন নির্ভয়ে বনমধ্যে বিচরণ করে, আমি সেইরূপ আত্মসংযম ও কঠোর সাধনার সাহায্যে ধর্ম্মপালন করিব। বিস্তৃত অরণ্যমধ্যে বন্যপশু যখন পীড়িত হইয়া বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন কে তাহার শুশ্রূষা করিতে যায়! কে তাহাকে ঔষধ প্রদান করে! কে তাহার স্বাস্থ্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করে! কে তাহার খাদ্য পানীয় সংগ্রহ করিয়া দেয়? সে যখন সম্পূর্ণরূপ সুস্থ অবস্থায় থাকে, তখন অরণ্যমধ্যে বা হ্রদের তীরে খাদ্য-পানীয় সন্ধান করিয়া লয়। পবিত্রচেতা ভিক্ষুও সেইরূপ বন্যপশুর ন্যায় বিচরণ করিবে, কাহারও অপেক্ষা রাখিবে না। ফলে আপনিই উচ্চগতি লাভ করিবে। আমি সেই পশুদের জীবন অণুকরণ করা বরং শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করি। তাহাতেই আমার দুঃখের অবসান হইবে।'

এই বলিয়া, পিতামাতার অনুমতি লইয়া, কুমার বলশ্রী সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলেন। সর্প যেমন কঞ্চুক পরিত্যাগ করে, মানুষ যেমন পায়ের ধুলা ঝাড়িয়া ফেলে, সেইরূপ আত্মীয়-

স্বজন বিষয়-বৈভব পরিত্যাগ করিয়া কুমার শ্রমণ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। ইহলোকে বা পরলোকে কোনও লোকেই তাঁহার আর আকাঙ্ক্ষা রহিল না। সুখকর বা অসুখকর সকল বিষয়েই তিনি উদাসীন হইলেন। অশনে বা অনশনে কিছুতেই তাঁহার স্পৃহা রহিল না। এইরূপে কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া মৃগাপুত্র নির্ব্বাণ-পথের পথিক হইলেন।'

এ সংসারে কে কাহার রক্ষাকর্ত্তা? এ সংসারে কে কাহার যন্ত্রণা দূর করিতে পারে? এ সংসারে কে কাহার দুঃখ দূর করিতে সমর্থ? মানুষ মনে করে, আমি পিতা, আমি মাতা, আমি ভ্রাতা, আমি বনিতা, আমি রাজা, আমি রক্ষাকর্ত্তা। কিন্তু সে তাহাদের ভ্রম মাত্র। পুত্রের দুঃখ-দূরীকরণে যন্ত্রণা-নিবারণে পিতামাতা যত্ন করেন; প্রজার কষ্ট-নিবারণে রাজা যথোচিত চেষ্টা করেন; কিন্তু কাহার কষ্ট কে দূর করিতে পারে? অরক্ষিত জনকে কে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়! ইহসংসারে রক্ষাকর্ত্তা বা দুঃখদূরকর্ত্তা কেহই নাই। মগধাধিপতি রাজা শ্রেণীক এক সময়ে মোহমদে মনে করিয়াছিলেন,—'আমিই রাজা, আমিই প্রজার রক্ষাকর্ত্তা।' তাঁহার সেই মোহ কিরূপে ভঙ্গ হয়, জৈনশাস্ত্রে তদ্বিষয়ক একটী উপাখ্যান আছে। ইন্দ্রের নন্দন-কাননের ন্যায় রাজা শ্রেণীকের এক পরম রমণীয় উদ্যান ছিল। 'মন্দিকুক্ষি' চৈত্য নামে সে উদ্যান অভিহিত হইত। বিবিধ সুদৃশ্য বৃক্ষলতায় সে চৈত্য শোভমান ছিল। নানা-জাতীয় বিহঙ্গমকুলের কলকাকলী তানে সে উদ্যান সদা মুখরিত থাকিত। আর নানা-জাতীয় পুষ্প-স্তবকে সে উদ্যান সুশোভিত হইয়া ছিল। একদিন সেই উদ্যানে পরিভ্রমণ করিতে করিতে এক সৌম্য-মূর্ত্তি সাধুর প্রতি রাজা শ্রেণীকের দৃষ্টি নিপতিত হয়। সাধুর তরুণ বয়স, কোমল দেহ, সুন্দর আকৃতি। সাধু-সন্দর্শনে রাজা বিমুগ্ধ হইলেন। তাঁহার মনে হইল, সে সাধু যেন রূপের সার, যেন বর্ণের শ্রেষ্ঠ, যেন মাধুর্য্যের আকর, যেন শান্তির নিলয়, যেন পূর্ণতার আশ্রয়, যেন কামনার অতীত। নৃপতি তদ্গতচিত্তে সাধুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"অহোবন্নো অহোরূবং অহোঅজ্জোস্‌সসোময়া। অহোখংতী অহোমুত্তী অহোভোগে অসংগয়া॥" 'হে আশ্চর্য্য বর্ণ! হে আশ্চর্য্য মূর্ত্তি! হে আশ্চর্য্য কমনীয়তা! হে আশ্চর্য্য শান্তি! হে আশ্চর্য্য সম্পূর্ণতা! হে আশ্চর্য্য নিষ্কাম!'—এই বলিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া যুক্তকরে নৃপতি কহিলেন,—'হে তরুণবয়স্ক উচ্চবংশ-সম্ভূত যুবক! আপনি কেন শ্রমণ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন? যে বয়স আমোদ-প্রমোদে অতিবাহিত হয়, সেই বয়সে আপনি শ্রমণধর্ম্ম-পালন জন্য কেন উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছেন? কেন আপনার এরূপ মতি হইল,—আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।'

শ্রেণীকের উপাখ্যান।

সাধু-পুরুষ উত্তর দিলেন,—'হে মহারাজ! আমার কেহ রক্ষাকর্ত্তা নাই। আমাকে রক্ষা করে, কিংবা আমার প্রতি প্রকৃত সমবেদনা প্রকাশ করে, আমার এমন আত্মীয়-বন্ধু কেহ নাই।'

রাজা শ্রেণীক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—'আপনার ন্যায় এরূপ গুণবান রূপবান ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন বা রক্ষাকর্ত্তা কেহ নাই,—এ কি কথা কহিতেছেন! আমি নৃপতি; আমি ধার্ম্মিকগণের রক্ষাকর্ত্তা। আপনার আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব সহ আমার নিকট

আসিয়া আনন্দ উপভোগ করুন। দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া কেন আপনি সুখ-সম্ভোগে বিরত হইতেছেন? আমিই আপনার রক্ষাকর্ত্তা হইলাম।'

সাধু-পুরুষ উত্তর দিলেন,—'হে মগধাধিপতি মহারাজ শ্রেণীক! আপনি নিজেই যে অনাথ! আপনারই যে রক্ষাকর্ত্তা কেহ নাই। আপনি কি করিয়া অপরকে রক্ষা করিবেন!'

রাজা বিশেষ একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন,—'এ আপনি কি বলিতেছেন! আমার অশ্ব, গজ, প্রজা, নগর, প্রাসাদ, প্রভুত্ব-ক্ষমতা রহিয়াছে। আমার আবার কিসের অভাব! আসুন, মানুষোচিত আনন্দ উপভোগ করুন। যাহার অধিকারে সুখ-ভোগের এত সামগ্রী বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার আবার রক্ষাকর্ত্তা নাই, কি প্রকার? মহাশয়, আপনি অসত্য বলিয়াছেন!"

সাধু-পুরুষ কহিলেন,—'হে রাজন্! আমি যাহা বলিয়াছি, আপনি তাহার অর্থ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই! আমি বলিয়াছি—আপনি অনাথ! কিসে আপনি অনাথ—রক্ষক-শূন্য, একটু অনুধাবন করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।'

এই বলিয়া সাধু-পুরুষ রাজার নিকট আত্মকাহিনী বিবৃত করিলেন। কহিলেন,—ইন্দ্রপুরীতুল্য কৌশাম্বী নগরে অমিতবিত্তশালী পিতার পুত্ররূপে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর কহিলেন,—'অতি শৈশবে আমি চক্ষের পীড়ায় কাতর হই। সঙ্গে সঙ্গে অতি যন্ত্রণাপ্রদ পীড়ায় আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দগ্ধীভূত হইতে থাকে। আমার চক্ষের যন্ত্রণা এতই অসহ্য হইয়াছিল যে, আমার মনে হইতেছিল—যেন কোনও নিষ্ঠুর শত্রু তীক্ষ্ণধার অস্ত্র লইয়া আমায় বিদ্ধ করিতেছে। আমার পৃষ্ঠদেশে হৃদপিণ্ডে মস্তকে তখন আমি বড়ই অসহনীয় যন্ত্রণা অনুভব করিতেছিলাম; যেন বিদ্যুৎ-প্রবাহ আসিয়া আমার দেহে বজ্রসূচী বিদ্ধ করিতেছিল। দেশের প্রধান প্রধান ভীষক্‌গণ আমার চিকিৎসা করিলেন; কিন্তু যন্ত্রণার অবসান হইল না! পিতা আমার জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করিলেন; আমি শান্তি লাভ করিলাম না। আমার জননী আমার জন্য দারুণ বেদনা অনুভব করিলেন! আমার সহধর্ম্মিণী আমার যন্ত্রণায় মরমে মরিয়া রহিলেন। কিন্তু কিছুতেই আমার যন্ত্রণার শান্তি হইল না। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম,—সত্যই আমি অনাথ; ইহসংসারে সত্যই আমার রক্ষাকর্ত্তা অন্য কেহই নাই! তখন আমার মনে হইল,—জন্মচক্রে পরিভ্রমণের এ যন্ত্রণার আর তুলনা নাই! তখন আমি সন্ধান করিতে লাগিলাম—কিসে কেমন করিয়া এ যন্ত্রণার অবসান হয়! বুঝিলাম—জন্মজরা-মরণের পথ রোধ করিতে না পারিলে শান্তি আর কোথাও নাই। বুঝিলাম,—আমি নিজেই আমার সুখ-দুঃখের কর্ত্তা ও অকর্ত্তা। বুঝিলাম—আমি নিজেই আমার সুহৃৎ ও শত্রু। বুঝিলাম—আমি সৎ বা অসৎ যেরূপ কার্য্য করিব, ফলভাগী আমাকে তদ্রূপই হইতে হইবে।'

"অপ্পাকত্তা বিকত্তার দুহাণয় সুহাণয়। অপ্পামিত্ত মমিত্তং চ দুপট্টির সুপট্টিও॥"

'মানুষ আপনার দুষ্কৃতির দ্বারা আপনার প্রতি যেরূপ শত্রুতাচরণ করিয়া থাকে, কণ্ঠচ্ছেদকারী শত্রুও সেরূপ অনিষ্টকারী নহে। যাহার অন্তরে দয়ার স্থান নাই, মৃত্যুকালে নিশ্চয়ই তাহাকে অনুতাপ করিতে হয়। যিনি সচ্চরিত্রসম্পন্ন, যাহার জীবন পরম আত্ম-সংযম-

পরায়ণ, যিনি পাপকার্য্য হইতে আপনাকে দূরে রাখিতে পারিয়াছেন এবং যিনি আপনার কর্ম্মকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই সেই অত্যুত্তম চিরস্থায়ী সম্পৎ মুক্তির অধিকারী হইয়াছেন! তাঁহাকেই সনাথ বলিতে পারা যায়।

"নতং অরীকংঠছেত্তা করেই জংসেকরে অপ্পণিয়া দুরপ্পয়া
সেনাহঙ্গী মচ্চুমুহংতু পত্তে পচ্ছাণুতাবেণ দয়াবিহুণো॥
নিরট্টিয়া নিগ্গরুঈউ তস্সজেউত্তমট্টে বিবজ্জাসমেই
ইমে বিসেনত্থি পরেবিলোএ দুহও বিসেজ্ঝিজ্ঝাইতত্থ লোগে॥
চরিত্তমায়ার গুণন্নিএতও অণুত্তরং সংজমপালিয়াণং।
নিরাসবেসংকৃথবিয়াণকম্মং উবেইটাণং বিউলুত্তমং ধ্রুবং॥"

নির্গ্রন্থের উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারাজ শ্রেণীক তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অহঙ্কার দূর হইল।

একই ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন প্রক্রিয়া-পদ্ধতি পরিদৃষ্ট হয়! যে কারণে যে সময়ে সে বিভিন্নতা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার মূল-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে না পারায় অনেক স্থলে বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়া থাকে। হিন্দু-শাস্ত্রে তাই একটী প্রবাদ আছে,—"বেদা বিভিন্না স্মৃতয়ো বিভিন্না নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥"

কেশী-গৌতম প্রসঙ্গ।

দেশ-কাল-পাত্রই যে মত-বিভিন্নতার ও কর্ম্মপদ্ধতি-পরিবর্ত্তনের হেতুভূত, তাহা বলাই বাহুল্য। জৈন-শাস্ত্রে কেশী গৌতম প্রসঙ্গে সেই বিষয়টী বিশদভাবে বুঝান হইয়াছে। তীর্থঙ্কর পার্শ্বদেব মহাব্রত গ্রহণ সম্বন্ধে যে মত প্রচার করিয়া যান, মহাবীর স্বামীর মত তাহা হইতে একটু স্বতন্ত্র। পার্শ্বদেব চতুর্ব্বিধ মহাব্রত গ্রহণের উপদেশ দিয়াছিলেন; মহাবীর স্বামী পঞ্চ-মহাব্রত পালন করিতে উপদেশ দিয়া যান। এই উপলক্ষে জৈন সম্প্রদায় প্রথমে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। এক পক্ষ পার্শ্বদেবের মতানুবর্ত্তী ছিলেন। অপর পক্ষ মহাবীর স্বামীর নিদেশ মান্য করিয়া চলিতেন। কেশী ও গৌতমের বিচার-ব্যপদেশে সেই দুই বিরুদ্ধ মতের সামঞ্জস্য সাধিত হয়। *

সসম্মানে গৌতমকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া কেশী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'পার্শ্বদেব চারি মহাব্রত গ্রহণের উপদেশ দিয়াছেন; কিন্তু বর্দ্ধমান (মহাবীর স্বামী) পঞ্চমহাব্রত-গ্রহণের উপদেশ

---

* মহাবীর স্বামীর অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী তীর্থঙ্কর—পার্শ্বদেব। মহাবীর স্বামীর আবির্ভাবের ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার নির্ব্বাণ-লাভ হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কেশী—পার্শ্বদেবের মতাবলম্বী ছিলেন। গৌতম (সুধর্ম্মণ্)—মহাবীর স্বামীর শিষ্য মধ্যে পরিগণিত। উভয়-সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ একত্র সমবেত হইলে পার্শ্বদেবের মতানুবর্ত্তী সম্প্রদায়ের অধিনায়ক-রূপে কেশী কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। গৌতম সে সকল প্রশ্নের যে সদুত্তর প্রদান করেন, তাহাতে বিবাদ মিটিয়া যায়। উভয়-সম্প্রদায় একসূত্রে আবদ্ধ হয়। কিছু কাল পরে যুক্ত-সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা কারণে পুনরায় মতানৈক্য ঘটিয়াছিল। আর তাহারই ফলে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর জৈন-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছিল। যাহা হউক, পার্শ্বদেব-প্রবর্ত্তিত ও মহাবীর স্বামীর প্রচারিত ব্রতের সামঞ্জস্য-সাধন কিরূপে ঘটিয়াছিল, কেশী-গৌতম-প্রশ্নোত্তর-প্রসঙ্গে তাহার আভাষ পাওয়া যায়।

দিয়া গিয়াছেন। উভয় ধর্ম্মমতই যখন একই উদ্দেশ্যে বিহিত, তখন এরূপ পার্থক্য কেন হইল? হে বিজ্ঞ! এ বিষয়ে আপনার কি কোনও সংশয় উপস্থিত হয় না?'

কেশীর এই প্রশ্নে গৌতম উত্তর দিলেন,—

"পন্নাসমিক্‌খএ ধম্মং তত্তংতত্ত বিণিচ্ছয়ং। ২৫
পুরিমা উজ্জু জড্ডাও বঙ্কজড্ডায় পচ্ছিমা।
মজ্ঝিমা উজ্জু পন্নাও তেণ ধম্মে দুহা কএ॥ ২৬॥
পুরিমাণং দুব্বিসুজ্ঝোউ চরিমাণং দুরণুপালও।
কপ্পো মজ্ঝিমগাণং তু সুবিসুজ্ঝো সুপালও॥" ২৭॥

ধর্ম্মের সত্য-তত্ত্ব, সদসত্ত্বর সন্ধান—জ্ঞানের দ্বারা অধিগত হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী তীর্থঙ্করগণ তাৎকালিক ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত জনগণের উপযোগী করিয়া যে ধর্ম্মবিধান বিহিত করিয়াছিলেন; কালের গতি অনুসারে শেষোক্ত তীর্থঙ্কর তাহার কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক বোধ করেন। তদনুসারে দুই মত প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া সাধারণে অনুভব করে। প্রথমে চারিটী মহাব্রতে যে কার্য্য সিদ্ধ হইত, শেষে সেই কার্য্যসিদ্ধির জন্যই পঞ্চ-মহাব্রত গ্রহণের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। মানুষ যখন সরল-স্বভাব ছিল, একটী প্রতিজ্ঞার মধ্যেই অন্য প্রতিজ্ঞার বাধ্য-বাধকতা তাহারা উপলব্ধি করিত। কিন্তু তাহারা যতই কুটিল-স্বভাব-সম্পন্ন হইতে লাগিল, ততই তাহাদিগকে বিশেষ বিশেষ নিয়মে বাধ্য করা আবশ্যক বোধ হইল। 'সৎ হও'—এই বলিলেই পূর্ব্বে যে মানুষ বাক্যে কার্য্যে মনে সর্ব্বথা সৎকার্য্যে সচ্চিন্তায় নিবিষ্ট হইত; কালক্রমে তাহারই পরিবর্ত্তে বলার আবশ্যক হইল—'তুমি সচ্চরিত্র হয়, তুমি সৎকার্য্য কর, তুমি সচ্চিন্তায় রত থাক।' ফলতঃ, মহাব্রত-চতুষ্টয় ও পঞ্চ-মহাব্রত মূলে উভয়ই এক। লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যগত পার্থক্য উভয়ের মধ্যে আদৌ নাই।

কেশী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ভাল, আরও একটী বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি। বর্দ্ধমান (মহাবীর স্বামী) বস্ত্র পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু পার্শ্বদেবের মতে বহির্ব্বাস ও অন্তর্ব্বাস বিহিত আছে। উভয়ের ধর্ম্মমতই যখন একই উদ্দেশ্যে বিহিত, তখন এ পার্থক্য কেন? ধর্ম্মের এই দ্বিভাব বিষয়ে আপনার মনে কখনও কোনও সংশয় আসে না?'

গৌতম উত্তর দিলেন,—'প্রজ্ঞা দ্বারা তাঁহারা যাহা আবশ্যক অনুভব করিয়াছিলেন, ধর্ম্মপালন পক্ষে তাহাই বিহিত করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মাবলম্বীদিগের যে বিভিন্ন বাহ্যচিহ্ন প্রবর্ত্তিত হয়, তদ্দ্বারা জন-সাধারণ তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিবেন,—এই উদ্দেশ্য ছিল। সেই সকল বাহ্য-চিহ্ন দ্বারা ধর্ম্ম-জীবনের আবশ্যকতার বিষয় মানুষের মনে প্রতিভাত হইবে, ইহাই লক্ষ্য ছিল। জনসাধারণকে ধর্ম্মে অনুরক্ত করিবার জন্য এবং সাধুবেশের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে সাধুভাবের বিকাশ-করণোদ্দেশ্যে তীর্থঙ্করগণ বেশভূষার বা সন্ন্যাসোচিত চিহ্নাদি ধারণের আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছিলেন। যাঁহারা বেশভূষার বা চিহ্নাদি ধারণের পক্ষপাতী নহেন, তাঁহারা জ্ঞান ধর্ম্মবিশ্বাস এবং সচ্চরিত্রতা প্রভৃতিকেই মুক্তি-পথের সার-সম্পৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। মূল লক্ষ্য বিষয়ে কোনই পার্থক্য নাই। বিবিধ ব্যবহারে বিবিধ লক্ষণ মাত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।'

অতঃপর কেশী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আপনার চতুর্দ্দিকে সহস্র শত্রু আপনাকে আক্রমণ জন্য উদ্যত রহিয়াছে। আপনি কেমন করিয়া তাহাদিগকে পরাভূত করিবেন?'

গৌতম উত্তর দিলেন,—

"এগে জিএ জিয়া পংচ পংচে জিএ জিয়া দস।
দসহাও জিণিত্তাণং সব্ব সত্তু জিণামিহং ॥ ৩৬ ॥"

'একটীকে জয় করিতে পারিলেই পাঁচটীকে জয় করা হইবে। পঞ্চজয়ী হইতে পারিলেই দশজয়ী হইতে পারিবে। দশজয়ী হইয়া আমি সকল শত্রু বিমর্দ্দিত করিয়াছি।'

কেশী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আপনি শত্রু বলিতেছেন—কাহাদিগকে?'

গৌতম উত্তর দিলেন,—

"এগপ্পা অজিএ সত্তু কসায়া ইংদিয়াণিয়।
তেজিণিত্তু জহানায়ং বিহরামি অহংমুণী ॥" ৩৮ ॥

'মহৎ আত্মাই একমাত্র অজেয় শত্রু। ক্রোধাদি চতুর্ব্বিধ কশায় (অর্থাৎ—রাগ, ক্রোধ, অহঙ্কার, লোভ) এবং পঞ্চেন্দ্রিয়;—এই দশ শত্রুই প্রধান। আমি ইহাদিগকে জয় করিয়াছি।'

কেশী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ইহসংসারে দেখিতে পাই, সকল প্রাণীই শৃঙ্খলে আবদ্ধ। আপনি কেমন করিয়া সে শৃঙ্খল-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন?'

গৌতম উত্তর দিলেন,—

"তেপাসে সব্বসো ছিত্তা নিহংতূণ উবায়ও।
মুক্কপাসো লহুব্ভূও বিহরামি অহংমুণী ॥ ৪১ ॥"

'সকল শৃঙ্খল, সকল বন্ধন আমি সদুপায় দ্বারা ছিন্ন করিয়াছি। তাই আমি বন্ধন-মুক্ত।'

কেশী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আপনি বন্ধন বা শৃঙ্খল কাহাকে বলেন?'

গৌতম উত্তর দিলেন,—

"রাগদ্দোসাদও তিব্বানেহপাসা ভয়ংকরা।
তেছিংদিত্তু জহানায়ং বিহরামি জহক্কমং ॥" ৪৩ ॥

'অনুরাগ ও হিংসাদ্বেষ প্রভৃতি বিষম বন্ধন। আসক্তি অতি বিপজ্জনক। আমি যথারীতি তাহাদিগের ধ্বংস-সাধন করিয়া বিনয়-সম্পন্ন হইয়াছি।'

কেশী কহিলেন,—'অন্তরের অভ্যন্তরে বিষ-ফল-উৎপাদনকারী বিষবৃক্ষ বৃদ্ধি পাইতেছে। আপনি তাহাকে কি ছিন্ন করিতে পারিয়াছেন?'

গৌতম উত্তর করিলেন,—'হাঁ, আমি সে তরুকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়াছি; তাহার মূল-উৎপাটনে পর্য্যন্ত সমর্থ হইয়াছি। আর সেই জন্যই সে বিষবৃক্ষের বিষফলের আশঙ্কা আর আমার নাই।'

কেশী জিজ্ঞাসিলেন,—'বিষবৃক্ষ বলিতে আপনি কি বুঝিয়াছেন?'

গৌতম উত্তর কহিলেন,—

"ভবতণ্হালয়া বুত্তা ভীমাভীম ফলোদয়া।
তমুচ্ছিত্তু জহানায়ং বিহরামি মহামুণী ॥" ৪৮ ॥

'ভবতৃষ্ণা অর্থাৎ সংসারের প্রতি আসক্তি সেই ভয়াবহ বিষ-ফলোৎপাদনকারী ভীষণ বিষবৃক্ষ। সে বৃক্ষকে যথারীতি ছিন্ন করিতে পারিয়াছি বলিয়াই আমি এখন সুখে বিচরণ করিতেছি।'

কেশী কহিলেন,—'ভয়াবহ অনন্ত অনলে মানুষকে অহর্নিশ ঘেরিয়া রহিয়াছে। কি প্রকারে আপনি সে অনল নির্ব্বাণ করিলেন?'

গৌতম উত্তর দিলেন,—'বিশাল মেঘ হইতে উৎপন্ন পবিত্র নদীর জলে আমি আমার শরীর সিক্ত করিয়াছি। তাহাতে অনল নির্ব্বাপিত হইয়াছে। তাই সে অনল আমার দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় নাই।'

কেশী জিজ্ঞাসিলেন,—'আপনি কাহাকে অনল বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন?'

গৌতম কহিলেন,—

"কসায়া অগ্গিণোবুত্তাসুয়সীল তবোজলং।
সুয়ধারাভিহয়া সংতাভিন্নাহু নডহংতিমে॥" ৫৩॥

'রিপু অগ্নি-স্বরূপ। জ্ঞান, পবিত্র চরিত্র এবং সংযম জল স্বরূপ। জ্ঞানরূপ বারিবিন্দুর নিষেকে রিপুরূপ-অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে। সুতরাং সে অগ্নি এখন আর আমাকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হইতেছে না।'

কেশী কহিলেন,—'যে অশান্ত দুর্দ্দান্ত অশ্বের উপর আপনি আরোহণ করিয়া আছেন; সে যে নিয়ত উন্মার্গগামী। আপনি কি প্রকারে তাহাকে সংযত রাখিতে সমর্থ হইলেন?'

গৌতম উত্তর দিলেন,—'জ্ঞানরূপ রশ্মি দ্বারা আমি তাহার গতি সংযত করিতে সমর্থ। সেই কারণ অশ্ব আমার বিপথে লইতে পারে না; যথা-পথেই প্রধাবিত হয়।'

কেশী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আপনি কাহাকে সেই অশ্ব বলিয়া অভিহিত করেন?'

গৌতম কহিলেন,—

"মন্নোসাহসিও ভীমো দুট্ঠসসো পরিধাবঈ।
তং সম্মং নিগিণ্হামি ধম্মসিক্খাএ কংথগং॥" ৫৮॥

'মন অশান্ত দুর্দ্দান্ত অশ্ব-স্বরূপ। আমি বিনয়-সাহায্যে তাহাকে দমন করিয়াছি। সে এখন কাম্বোজ দেশীয় সুশিক্ষিত ঘোটকের ন্যায় আমার আজ্ঞাবাহী।'

কেশী কহিলেন,—'ইহ-সংসারে বহু কুপথ আছে। মনুষ্যকে তাহা পথভ্রষ্ট করে। হে গৌতম! আপনি কি প্রকারে সে পথ পরিহার পূর্ব্বক সৎপথের অনুসরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন?'

গৌতম উত্তর দিলেন,—'কোন্ পথ সৎ ও কোন্ পথ অসৎ, আমি তাহা বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়াছি। আর তজ্জন্যই আমি আর বিপথগামী নই।'

কেশী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ঐ যে ভীষণ জলপ্লাবনে সকলকে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে; তাহাদের আশ্রয় বা আশ্রয়োপযোগী দৃঢ় ভূমি কোথায়? কোথায় সে দ্বীপ, হে গৌতম, আপনি কি তাহা অবগত আছেন?'

গৌতম উত্তর করিলেন,—'আছে বৈ কি! বিশাল বিস্তৃত ঐ দ্বীপ জলের মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে। বন্যার জলে সে দ্বীপ কদাচ ভাসমান হয় না।'

কেশী কহিলেন,—'কাহাকে আপনি সেই দ্বীপ বলিয়া অভিহিত করেন? বল্তাই বা কি প্রকার?'

গৌতম উত্তর দিলেন,—

"জরামরণ বেগেণং বুড্‌ডমাণাণ পাণিণং।
ধম্মোদীবো পইট্টায় গঈসরণমুত্তমং॥ ৬৮॥"

'জরামরণের প্রবল পীড়নে প্রাণিপুঞ্জ ভাসিয়া চলিয়াছে। একমাত্র ধর্ম্ম দ্বীপ-স্বরূপ অবস্থিত আছে। সেই দ্বীপ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত অতি উত্তম আশ্রয়-স্থান।'

কেশী কহিলেন,—'মহা-সমুদ্রে তরঙ্গ-প্রবাহে তরণী বিচলিতপ্রায়। সেই তরণীতে আরোহণ করিয়া কি প্রকারে আপনি পরপারে উত্তীর্ণ হইবেন?'

গৌতম কহিলেন,—

"জাও অস্‌সাবিণীনাবা নসা পারস্‌সগামিণী।
জানিস্‌সা বিণীনাবা সাউপারস্‌সগামিণী॥ ৭১॥"

'সছিদ্র তরণী কথনও পরপারে পৌছিতে পারে না। কিন্তু ছিদ্রহীন তরণীর সাহায্যে পরপারে উত্তীর্ণ হওয়া যায়।'

কেশী জিজ্ঞাসিলেন,—'আপনি কাহাকে তরণী বলিয়া অভিহিত করিতেছেন?'

গৌতম কহিলেন,—

"সরীরমাহুনাবিত্তি জীবো বুচ্চই নাবিও।
সংসারো অন্নবোবুত্তো জংতরংতি মহেসিণো॥" ৭৩॥

'এই দেহ তরণী-স্বরূপ। জীবন নাবিক। জন্মচক্ররূপ সমুদ্র। সংসারে অনাসক্ত জ্ঞানিগণ প্রজ্ঞা দ্বারা সে সমুদ্র উত্তীর্ণ হন।'

কেশী কহিলেন,—'এই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে যে অসংখ্য প্রাণী অবস্থিত রহিয়াছে, কে তাহাদের জন্য আলোক-রশ্মি বিকীরণ করিবে?'

গৌতম কহিলেন,—'সেই নিষ্কলঙ্ক সূর্য্য উদিত হইয়া সমগ্র পৃথিবী আলোকিত করিবেন। তিনিই সংসারের প্রাণি-সমূহের মধ্যে আলোক বিতরণ করেন।'

কেশী কহিলেন,—'কাহাকে আপনি সূর্য্য বলিয়া অভিহিত করিতেছেন?'

গৌতম উত্তর করিলেন,—'যাঁহারা জন্মগতি রোধ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই সূর্য্যরূপে উদিত হইয়া জগতের জীবকে আলোক-রশ্মি বিতরণ করিতেছেন।'

কেশী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এই যে জীবসঙ্ঘ কায়িক ও মানসিক অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, ইহাদিগের উপযোগী নিরাপদ শান্তিপ্রদ স্থান কোথায় আছে, আপনি কি তাহা বলিতে পারেন।'

গৌতম উত্তর দিলেন,—'সকলেরই পরিদৃশ্যমান এক নিরাপদ স্থান আছে। সেখানে জরা নাই, মৃত্যু নাই, যন্ত্রণা নাই, পীড়া নাই। তবে সে স্থানে উপনীত হওয়া বড়ই কঠিন।'

কেশী জিজ্ঞাসিলেন,—'সে স্থান কি নামে অভিহিত হয়?'

গৌতম উত্তর দিলেন,—'তাহারই নাম নির্ব্বাণ, যাহাতে সকল যন্ত্রণার অবসান হয়,

যাহাতে সম্যকত্ব প্রাপ্তি ঘটে। সেই স্থানই সকলের লক্ষ্যস্থানীয়। সেই নিরাপদ সুখময় শান্তিপ্রদ স্থানে জ্ঞানী মহাত্মগণই পৌঁছিতে পারেন। সেই চিরশান্তিময় নিকেতনে তাঁহারাই পৌঁছিতে পারেন, যাঁহারা জীবনগতি রোধ করিতে পারিয়াছেন। তাঁহারাই সর্ব্ব দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন।'

কেশী গৌতমের এই প্রশ্নোত্তরে সকলেরই সর্ব্ব প্রকার সংশয় দূরীভূত হইল। সকল সম্প্রদায় একপ্রাণ একমন হইলেন।

ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে? কি শ্রেষ্ঠ গুণ-ভূষণে ভূষিত হইলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায়? যেমন হিন্দু-শাস্ত্রে, তেমনই বৌদ্ধ-শাস্ত্রে, আবার তেমনই জৈন-শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের সে মাহাত্ম্য-তত্ত্ব প্রকটিত দেখিতে পাই। পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্যের এবং গুণ-গৌরবের অশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হই। স্বয়ং নারায়ণ ব্রাহ্মণের শ্রীচরণ বক্ষে ধারণ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন, ইহার অধিক ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য আর কি হইতে পারে? কিরূপ গুণসম্পন্ন জন ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য হন—বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-শাস্ত্রে তাহার যে উল্লেখ দেখি; তাহাতেও বুঝা যায়, ব্রাহ্মণের স্থান কত উচ্চে! স্বয়ং বুদ্ধদেব নিজ মুখেই ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।* জৈনশাস্ত্রেও বিভিন্ন স্থানে ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত দেখি। উত্তরাধ্যয়নের পঞ্চত্রিংশ অধ্যয়নে; যথা,—

ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে?

"জোলোএ বংভণো বুত্তো অগ্‌গীবা মহিও জহা।
সয়াকুসল সংদিট্টং তংবয়ং বুমমাহণং॥ ১৯॥
জোন সজ্জই আগং তু পব্বয়ংতো ন সোয়ঈ।
রময়ঈ অজ্জবয়ণংমিতংবয়ং বুমমাহণং॥ ২০॥
জায় রূবং জহামট্টং নিদ্ধংত মলপাবগং।
রাগদোস ভয়াঈয়ং তবয়ং বুমমাহণং॥ ২১॥
তবস্‌সিয়ং কিসংদংতং অবচিয় মংসসোণিয়ং।
সুব্বয়ং পত্তনিব্বাণং তংবয়ং বুমমাহণং॥ ২২॥
তসেপাণে বিয়াণিত্তা সংগহেণয়থাবরে।
জোন হিংসইতি বিহেণং তংবয়ং বুমমাহণং॥ ২৩॥
কোহাবা জইবাহাসা লোভাবা জইবা ভয়া।
মুসং নবথঈজোউ তংবয়ং বুমমাহণং॥ ২৪॥
চিত্তমংত মচিত্তংবা অপ্পংবা জইবা বহুং।
ন গিণ্‌হই অদত্তংজে তংবয়ং বুমমাহণং॥ ২৫॥
দিব্বমাণুস্‌সতেরিচ্ছং জোনসেবই মেহুণং।
মণসা কায়বক্কেণং তংবয়ং বুমমাহণং॥ ২৬॥
জহাপোমং জলেজায়ং নোবলিপ্পই বারিণা।
এবং অলিত্তং কামেহিং তংবয়ং বুমমাহণং॥ ২৭॥

* পৃথিবীর ইতিহাস, পঞ্চম খণ্ডে, ৩৮১ পৃষ্ঠায় বুদ্ধদেবের উক্তি দ্রষ্টব্য।

অলোলুয়ং মুহাজীবী অণগারং অকিংচণং।
অসংসত্তং গিহথেমু তংবয়ং বুমমাহণং॥ ২৮॥
জহিত্তা পুব্বসংজোগং নাতি সংগেয় বংধবে।
জোনসজ্জই এএস্কু তংবয়ং বুমমাহণং॥ ২৯॥"

অর্থাৎ,—'যিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হন, তিনি অগ্নির ন্যায় মহিমান্বিত। জ্ঞানিগণ তদ্রূপ প্রকৃত তেজসম্পন্ন ব্যক্তিকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করেন। ১৯॥ যিনি কোনও পার্থিব আকর্ষণে আবদ্ধ নহেন; সন্ন্যাস গ্রহণে কদাচ যাঁহার মনে অনুশোচনা আসে না; সৎকথায়ই যাঁহার আনন্দ;—তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলে। ২০॥ যিনি রাগ-দ্বেষ-আশঙ্কা প্রভৃতির অতীত, যিনি অগ্নিদগ্ধ সুবর্ণের ন্যায় জ্যোতিঃ-সম্পন্ন;—তাঁহাকেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলা যায়। ২১॥ যে আত্মসংযমশীল সাধু অস্থি-কঙ্কালসার হইয়াও পবিত্রতা-সম্পন্ন নির্ব্বাণ-পথের পথিক,—তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়। ২২॥ যিনি সর্ব্বতোভাবে প্রাণি-পর্য্যায়-তত্ত্বে অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন, গতিশীল বা গতিহীন কোনও জীবের প্রতিই যিনি কোনও প্রকার অনিষ্টকারী নহেন,—তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়। ২২॥ যিনি ক্রোধে বা পরিহাসছলে অথবা লোভপরবশ হইয়া বা ভীতি প্রাপ্ত হইয়া কদাচ মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করেন না,—তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়। ২৪॥ অল্প হউক, অধিক হউক, প্রয়োজনীয় হউক বা অপ্রয়োজনীয় হউক, যিনি অদত্ত বস্তু কদাচ গ্রহণ করেন না;—তাঁহাকেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলা যায়। ২৫॥ চিন্তায়, বাক্যে বা কার্য্যে কোনও মনুষ্যের বা কোনও প্রাণীর প্রতি যাঁহার ইন্দ্রিয় আসক্ত নয়,—তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য। ২৬॥ পদ্ম যেমন জলমধ্যে অবস্থিত থাকিয়াও জলে আসক্ত আর্দ্র নয়, সেইরূপ সংসারে সুখের মধ্যে থাকিয়াও যাঁহার চিত্ত সে সুখে কলুষিত নহে,—তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়। ২৭॥ যাঁহার লোভ নাই, যিনি অজ্ঞাতবাসে জীবন যাপন করেন, যাঁহার গৃহ নাই বা যিনি কোনও সম্পত্তির অধিকারী নহেন এবং সাংসারিক কোনও ব্যক্তির সহিত যিনি বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ নহেন;—তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়। ২৮॥ আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতির সহিত যাঁহার সর্ব্বরূপ সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়াছে এবং যিনি কোনরূপ সুখের জন্য আদৌ আকাঙ্ক্ষা যুক্ত নহেন,—তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়। ২৯॥'

অন্যত্র আবার দেখিতে পাই,—

"নবি মুংডিএণ সমণো নওংকারেণ বংভণো।
ন মুণীরন্নবাসেণং কুসচীরেণ ন তাবসো॥ ৩১॥
সময়াএ সমনো হোই বংভচেরেণ বংভণো।
নাণেণয় মুণী হোই তবেণং হোই তাবসো॥ ৩২॥
কম্মুণা বংভণো হোই কম্মুণা হোই খত্তিও।
বইসো কম্মুণা হোই সুদ্দো হবই কম্মুণা॥ ৩৩॥"

'কেবল মস্তক মুণ্ডন করিলেই শ্রমণ হওয়া যায় না; কেবল ওঁকার শব্দ উচ্চারণ করিলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না; কেবল অরণ্যে বাস করিলেই তাপস হওয়া যায় না। রাগদ্বেষ প্রভৃতির প্রতি সাম্যভাব উপস্থিত হইলেই শ্রমণ হওয়া যায়; ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই

ব্রাহ্মণ হওয়া যায়; জ্ঞানের দ্বারাই মুনি হওয়া যায়; সংযমের দ্বারাই তাপস হওয়া যায়। কর্ম্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণ, কর্ম্মের দ্বারাই ক্ষত্রিয়, কর্ম্মের দ্বারাই বৈশ্য, কর্ম্মের দ্বারাই মানুষ শূদ্র হয়।' যিনি সর্ব্ব-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই 'প্রকৃত ব্রাহ্মণ;—

"সব্ব কম্ম বিনিম্মুকং তং বয়ং বুমমাহণং ॥ ৩৪ ॥"

অনন্ত—কাল, অনন্ত—দুঃখ-সমুদ্র, অনন্ত—দুঃখ-হেতু। কেমন করিয়া মানুষ সে দুঃখ-পারাবার উত্তীর্ণ হইবে; কেমন করিয়া মানুষ সে অনন্ত আকর্ষণ ছিন্ন করিবে; কেমন করিয়া মানুষ মুক্ত হইতে পারিবে;—মহাবীর স্বামী তৎসম্বন্ধে সুধর্ম্মণাচার্য্যকে একটী সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করেন। তাঁহার সেই উপদেশের সার-মর্ম্ম—সদ্‌জ্ঞান লাভ করিতে হইবে; অজ্ঞানান্ধকার দূর করিতে হইবে; অনুরাগ ও দ্বেষ ধ্বংস করিতে হইবে। যে জন তাহাতে সমর্থ হন, তিনিই পরম মুক্তির—চির-আনন্দের অধিকারী হন। উত্তরাধ্যয়ন-সূত্রের দ্বাত্রিংশ অধ্যয়নে মহাবীর স্বামীর উক্তি; যথা,—

অনন্ত দুঃখনাশ।

"নাণস্‌স সব্বস্‌স পগাসনাএ অন্নাণ মোহস্‌স বিবজ্জণাএ রাগস্‌স
দোসস্‌সয় সংখএণং এগংত সোকৃথং সমুবেইমোকৃথং ॥"

কিন্তু সে জ্ঞান কিরূপে অধিগত হইতে পারে? সে অজ্ঞানান্ধকার কিরূপে দূরীভূত হয়? সে অনুরাগ বা দ্বেষ কিরূপে ধ্বংস করা যায়? তৎসম্বন্ধে মহাবীর স্বামী বলিতেছেন,—'প্রথমে গুরুজনের ও জ্ঞানবৃদ্ধ জনের সেবা-পরায়ণ হওয়া আবশ্যক। আশৈশব দুর্জ্জন লোকের সংসর্গ পরিহার করা প্রয়োজন। একান্ত-চিত্তে ধর্ম্মগ্রন্থ-পাঠে আত্মনিয়োগ করা বিধেয়। সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রের অর্থ অভিনিবেশ সহকারে উপলব্ধি করা আবশ্যক।' সমাধি-লাভের জন্য সংযম-সাধনার আবশ্যক। সে সাধনায় আহারে, সঙ্গি-নির্ব্বাচনে ও স্থান-নির্দ্ধারণে একান্ত সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। যদি সৎসঙ্গ না মিলে, নির্জ্জন-বাস বরং শ্রেয়ঃ। সর্ব্ববিধ সুখস্পৃহা ও সর্ব্বপ্রকার পাপকর্ম্মে বিরতি সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক।

"জহায় অংউপ্পভবা বলাগা অংডং বলাগপ্পভবং জহায় এমেব।
মোহায় যণংখুতন্‌হা মোহংচ তন্‌হায়য়ণং বয়ংতি ॥ ৬ ॥
রাগোয় দোসোবিয় কম্মবীয়ং কম্মংচ মোহপ্পভবং বয়ংতি।
কম্মংচ জাঈ মরণস্‌স মূলং দুকৃথং চ জাঈ মরণং বয়ংতি ॥ ৭ ॥
দুকৃথং হয়ং জস্‌স ন হোই মোহো মোহো হও জস্‌স ন হোই তন্‌হা।
তন্‌হা হয়া জস্‌স ন হোই লোহো লোহোহও জস্‌স নকিংচণাইং ॥ ৮ ॥"

'বলাক পক্ষী হইতে যেমন অণ্ডের উৎপত্তি, আবার অণ্ড হইতে যেমন বলাক পক্ষীর উৎপত্তি; সেইরূপ মোহ হইতেই তৃষ্ণার উদ্ভব, আবার তৃষ্ণা হইতেই মোহের উৎপত্তি। ৬ ॥ কর্ম্ম হইতেই যেমন অনুরাগ ও দ্বেষের উৎপত্তি; সেইরূপ মোহ বা রাগ দ্বেষ হইতেই অনুরাগের উৎপত্তি। কর্ম্মই জন্ম-মৃত্যুর মূল, আবার জন্মমৃত্যুই দুঃখ। ৭ ॥ মোহ দূর হইলেই দুঃখ দূর হয়; আবার তৃষ্ণা দূর হইলেই মোহ দূর হইয়া থাকে। লোভ দূর হইলেই তৃষ্ণার বিরতি; আবার বিষয় না থাকিলেই লোভের শান্তি। ৮ ॥' ফলতঃ ভব-তৃষ্ণাই জন্ম, আবার জন্মই ভব-তৃষ্ণার হেতুভূত।

যিনি সম্পূর্ণরূপে অনুরাগ দ্বেষ মোহ প্রভৃতি অন্তর হইতে নির্ম্মূল করিতে চাহেন, কয়েকটী বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। সরস সুস্বাদু আহার্য্য রসনার তৃপ্তিকর হইলেও তাহা পরিহর্ত্তব্য। কেন-না, তদ্দ্বারা দেহে অত্যধিক শক্তি সঞ্চার হয়। আর সেই শক্তি-সঞ্চারের ফলে তৃষ্ণা আসিয়া অভিভূত করে। সুস্বাদু ফলভারাবনত বৃক্ষের প্রতি পক্ষীর যেমন আসক্তি, সরস সবল মনুষ্যের প্রতিও তৃষ্ণার সেইরূপ আধিপত্য। শুষ্ক কাষ্ঠপূর্ণ অরণ্য অগ্নি-সংযুক্ত হইলে বায়ুপ্রবাহ যেমন সে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইতে দেয় না; সেইরূপ যে ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ সরস খাদ্য আহার করে, তাহার পঞ্চেন্দ্রিয়ের আকাঙ্ক্ষা-অনল সদা প্রজ্বলিত থাকে। কোনও সাধু-সচ্চরিত্র মনুষ্যের তাহা উপকারে আসে না। যাঁহারা নিভৃতবাসী, অল্পাহারী, ইন্দ্রিয়জয়ী, তৃষ্ণা আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। তাঁহাদের অনুরাগ ঔষধ-সেবনে পীড়া-নিবৃত্তির ন্যায় নিবৃত্তি-প্রাপ্ত হয়। যেথানে মার্জ্জার বাস করে, মুষিকের বাস যেমন তথায় নিরাপদ নহে; সচ্চরিত্র সাধুর পক্ষে সেইরূপ রমণী-পরিবৃত গৃহে বাস করা নিরাপদ নহে। যে সাধু ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছেন, তিনি কদাচ রমণীর রূপ, লাবণ্য, মৃদুহাস্য, অঙ্গ-ভঙ্গী, বক্রদৃষ্টি প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন না; অথবা অন্তরে কথনও ভ্রমেও সে ভাব স্থান দিবেন না।' উত্তরাধ্যয়নে, যথা,—

রসে বীতস্পৃহা।

"রসাপগামং ন নিসেবিয়ব্বা পায়ং রসা দিত্তিকরা নরাণং।
দিত্তং চ কামা সমভিদ্দবংতি দুমং জহা সাদু ফলংব পক্খী ১০।
জহা দবগ্গী পউরিংধণে বনে সমারুও নোবসমং উবেই।
এবিংদিয়গ্গীব্বি পগাম ভোইণো ন বংভয়ারিস্সহিয়ায় কস্সই ॥ ১১ ॥
বিবিত্ত সেজ্জাসণ জংতিয়াণং ওমাসণাণং দমিইংদিয়াণং।
ন রাগ সত্তু ধরিসেই চিত্তং পরাইও বাহিরিবো সহেহিং॥ ১২ ॥
জহা বিরালা বসহস্স মূলে ন মূসগাণং বসহী পসথা।
এমেব ইথী নিলয়স্স মজ্ঝে ন বংভয়ারিস্স খমো নিবাসো ॥ ১৩॥
ন রূবলাবন্ন বিলাস হাসং ন জংপিয়ং ইংগিয়পেহিয়ংবা।
ইথীণ চিত্তংসি নিবেসইত্তা দট্ঠুববস্সে সমণে তবস্সী॥ ১৪॥'

'রমণীর প্রতি আসক্তি যাঁহারা পরিহার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের গন্তব্য পথে আর কোনও বাধাই কার্য্যকরী হয় না। যিনি মহা-সমুদ্র অতিক্রমে সমর্থ, গঙ্গার ন্যায় বৃহৎ নদী অতিক্রমও তাঁহার পক্ষে অকিঞ্চিৎকর। সুখ-তৃষ্ণা হইতেই নরলোকে দুঃখের উৎপত্তি। যিনি তৃষ্ণা-ত্যাগে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি কায়িক ও মানসিক সর্ব্ববিধ দুঃখকে দূর করিয়াছেন। যিনি সাধনার পথে অগ্রসর, যিনি সম্যকত্ব সমাধি-লাভের অভিলাষী, ইন্দ্রিয়-সুখকর পদার্থের প্রতি তাঁহার চিত্ত কথনও আকৃষ্ট নয়; অপিচ, অপ্রিয় অতৃপ্তিকর পদার্থের প্রতিও তাঁহার চিত্ত বিদ্বেষ-পরায়ণ নহে। ফলতঃ, কি প্রিয়, কি অপ্রিয় সর্ব্ব-বিষয়ে যিনি বীতরাগ নিস্পৃহ হইতে পারিয়াছেন; কোনও বিষয়েই যাঁহার আসক্তি বা অনাসক্তি নাই;—দুস্তর দুঃখ-সাগর উত্তীর্ণ হইতে অনায়াসে তিনি সমর্থ হন।' যথা,—

"এএয় সংগে সমইক্কমিত্তা সুহুত্তরাচেব ভবংতি সেসা।
জহা মহাসাগর মুত্তরিত্তা নঈভবে অবি গংগা সমাণা ॥ ১৮॥
কামাণুগিদ্ধিপ্পভবং খু দুক্‌খং সব্বস্‌স লোগস্‌সসদেবগস্‌স।
জং কাইয়ং মানসিয়ংচ কিংচি তস্‌সং তগং গচ্ছই বীয়রাগো ॥ ১৯ ॥
জে ইংদিয়াণং বিসয়া মণুন্না ণতেস্থ ভাবং নিসিরে কয়াইঞ্জ।
নয়া মণুন্নেস্থ মণংপি কুজ্জা সমাহি কামে সমণে তবস্‌সী ॥ ২১ ॥"

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক—এই পঞ্চেন্দ্রিয় মানুষের মোক্ষের পথে বিষম অন্তরায়। পঞ্চেন্দ্রিয়ের সদ্ব্যবহার অপব্যবহার অনুসারেই শান্তি ও অশান্তি নির্ভর করে। রূপে চক্ষু আকৃষ্ট হয়। রূপ-দর্শনেই অনুরাগ আসে, আবার রূপদর্শনেই বিরাগ উৎপন্ন হয়। কিন্তু রূপ-দর্শনে যাঁহার অনুরাগ বা বিরাগ কিছুই উৎপন্ন হয় না, সর্ব্ব-বিষয়েই যিনি বীতরাগ অনাকৃষ্ট; তিনিই মোক্ষ-লাভের অধিকারী হন। চক্ষু—অনুভব করে; রূপে চক্ষু আকৃষ্ট হয়। সেই আকর্ষণ বা অনুরাগ আনন্দপ্রদ; আর তৎপ্রতি যে বিরাগ, তাহাই নিরানন্দকর। যিনি রূপ-দর্শনে রতিযুক্ত হন, তাঁহাকেই অকালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে হয়। রূপমুগ্ধ পতঙ্গ যেমন আলোক-রশ্মিতে আকৃষ্ট হইয়া অনলে প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়; রূপমুগ্ধ মানুষেরও সেই অবস্থা। এইরূপ মানুষ যখনই রূপ-দর্শনে দ্বেষযুক্ত হয়, তদ্দণ্ডেই তাহার কষ্ট অনুভূত হয়। অবিনীত জন রূপের দ্বারা উত্যক্ত হয়।......যিনি রূপে অনাসক্ত নির্লিপ্ত, তিনিই সর্ব্ব দুঃখ হইতে মুক্ত। যদিও তিনি সংসারে বাস করেন; কিন্তু অবিচ্ছিন্ন দুঃখে তাঁহাকে কখনও অভিভূত হইতে হয় না। পদ্মপত্র জলের দ্বারা যেমন আর্দ্র হয় না; রূপের প্রতি নির্লিপ্ত জনও সংসারে থাকিয়াও সেইরূপ কদাচ কলুষগ্রস্ত নহেন। উত্তরাধ্যয়ন সূত্রে, যথা,—

রূপে বীতস্পৃহা।

"চক্ষুস্‌স রূবং গহণংবয়ংতি তংরাগ হেউংতু মণুন্ন মাহু।
তং দোস হেউং অমণুন্নমাহু সমোয় জো তেস্থ স বীয়রাগো ॥ ২২ ॥
রূবস্ত চক্‌খুং গহণং বয়ংতি চক্‌খুস্‌স রূবং গহণং বয়ংতি।
রাগস্‌স হেউং সমণুন্ন মাহু দোসস্‌স হেউং অমণুন্ন মাহু ॥ ২৩ ॥
রূবেস্থ জোগিদ্ধি মুবেই তিব্বং অকালিয়ং পাবই সে বিণাসং।
রাগাউরে সে জহ বাপয়ংগে অলোয় লোলে সমুবেই মচ্চুং ॥ ২৪ ॥
রূবে বিরত্তো মণুও বিসোগো এএণ দুক্‌খোহ পরংপরেণ।
ন লিপ্পএ ভবমজ্ঝেব সংতো জলেণবা পুক্‌খরিণী পলাসং ॥ ৩৪ ॥"

রূপ বা বর্ণ বিষয়ে যেমন চক্ষুকে নির্লিপ্ত রাখিতে হইবে, শব্দ-বিষয়ে সেইরূপ কর্ণকে নির্লিপ্ত রাখিতে হইবে। যে কর্ণ শব্দে অনুরক্ত হয়, অথবা যে কর্ণ শব্দে বিরক্তি প্রকাশ করে,—উভয় অবস্থাতেই সে অশান্তি ভোগ করে। যে জন শব্দে আকৃষ্ট হয়, তাহার অবস্থা ব্যাধের বংশী-ধ্বনিতে আকৃষ্ট কুরঙ্গের অবস্থার ন্যায় বুঝিতে হইবে। যথা,—"সদ্দেস্থ জো গিদ্ধি মুবেই তিব্বং অকালিয়ং পাবই সে বিণাস। রাগাউরে হরিণমিএব্ব মুদ্ধে সদ্দে অতিত্তে সমুবেই

শব্দে বীতস্পৃহা।

মচ্চুং ॥ ৩৭ ॥" এইরূপ, আঘ্রাণ গ্রহণে অনুরাগ ও বিরাগ যেন না জন্মে। ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে যিনি সর্ব্ববিধ আঘ্রাণ বিষয়ে নির্লিপ্ত রাখিতে পারিয়াছেন, তিনিই দুঃখের কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন। নচেৎ ঘ্রাণে যাঁহার অনুরাগ, তাঁহার অবস্থা কি শোচনীয়!

গন্ধে বীতস্পৃহা।

ভেষজ-বিশেষের গন্ধে উন্মত্ত সর্প যেমন তাহার বিবর হইতে বহির্গত হইয়া প্রাণদানে বাধ্য হয়; ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-সাধন জন্য মানুষেরও সেইরূপ দুঃখের অবধি থাকে না। যিনি মুক্তির অভিলাষী, তাঁহাকে তাই সর্ব্ববিধ আঘ্রাণের প্রতি বীতস্পৃহ থাকিতে হইবে। ঘ্রাণমুগ্ধ জনের অবস্থা; যথা,—

"গংধেসু জো গিদ্ধি মুবেই তিব্বং অকালিয়ং পাবই সে বিণাসং।
রাগাউরে ওসহি গংধগিদ্ধে সপ্পে বিলাওবিব নিক্খমংতো ॥ ৫০ ॥"

হায় রসনা! রসনার তৃপ্তি-সাধনের জন্য জীব যে কত প্রকারে বিপন্ন হইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করে? মৎস্য যেমন আমিষ-লোভে অগ্রসর হইয়া বড়শী গলাধঃকরণ-পূর্ব্বক প্রাণদানে বাধ্য হয়, মানুষও সেইরূপ রসনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য কত প্রকার

রসে বীতস্পৃহা।

বড়শীতে দিন দিন আবদ্ধ হইতেছে! সে অবস্থা,—"রসেসু জো গিদ্ধি মুবেই তিব্বং অকালিয়ং পাবই সে বিণাসং। রাগাউরে বডিস বিভিন্ন কাএ মচ্ছে জহা আমিস লোভ গিদ্ধে ॥ ৬৩ ॥" যে জন এ তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ, যে জন রসনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-সাধক পদার্থের প্রতি বীতরাগ; দুঃখের কবল হইতে সে জন নির্ম্মুক্ত। এইরূপ ত্বগিন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-সাধন জন্য বিষয়-বিশেষে রতি ও অরতি নিবন্ধন জীব যে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহার তুলনা হয় না!

স্পর্শে বীতস্পৃহা।

প্রবল-পরাক্রান্ত মত্তহস্তী ত্বগিন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-সাধন-কামনায় উন্মত্ত অন্ধ হইয়া হস্তিনীর পশ্চাদনুসরণ পূর্ব্বক ব্যাধের বন্ধনে আবদ্ধ ও পরিশেষে নিহত হয়। ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-সাধন-তৎপর কামানুগত মনুষ্যের এই শোচনীয় পরিণাম সংসার নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছে! জৈন-শাস্ত্র তাই পুনঃপুনঃ উপদেশ দিয়াছেন,—'ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত পদার্থে যেন অনুরাগ বা বিরাগ কদাচ উপস্থিত না হয়; ত্বগিন্দ্রিয়ের ভোগাভিলাষের প্রতি সদা অনাসক্ত থাকিবে। তাহা না হইলে,—

"ভাবেসু জো গিদ্ধি মুবেই তিব্বং অকালিয়ং পাবই সে বিণাসং।
রাগাউরে কামগুণেসু গিদ্ধে করেণু মগ্‌গা বহিএব নাগে ॥ ৮৯ ॥"

অতএব বুঝিতে হইবে, ইন্দ্রিয়ের ও মনের বিষয়ীভূত পদার্থ কামী জনেরই কষ্টের কারণ; নিষ্কাম ব্যক্তি তদ্দ্বারা কদাচ অভিভূত হন না। পদার্থ—পদার্থেই আছে। সুখকর হউক বা দুঃখকর হউক, তাহা কদাচ অনুরাগ বা বিরাগ উৎপন্ন করে না। মানুষ কেবল তাহাদের প্রতি অনুরক্ত বা বিদ্বেষ-বিশিষ্ট হইয়াই মোহবশে কষ্ট পাইয়া থাকে। যথা,—

"কোহংচ মাণংচ তহেব মায়ং লোভং দুগংছং অরইং রইংচ।
হাসং ভয়ং সোগ পুমিত্থিবেয়ং নপুংস বেয়ং বিবিহেয় ভাবে ॥ ১০২ ॥
আবজ্জঈ এব মণে গরুবে এবং বিহে কামগুণেসু সত্তো।
অন্নেয় এযপ্পভবে বিসেসে কারুণ্ন দীণে হরিমে বইস্সে ॥ ১০৩ ॥"

মূল-তত্ত্ব—কামনার নাশ; মূল-তত্ত্ব—অহিংসার বিরতি; মূল-তত্ত্ব—সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের দমন। সহস্র সহস্র দৃষ্টান্তের অবতারণায়, শত শত আদর্শের প্রদর্শনে, জৈন-শাস্ত্র ঐ তত্ত্বই বিশদ করিয়া গিয়াছেন। আর একটী মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া, আর একটী মাত্র আদর্শের আবরণ উন্মোচন করিয়া, এ প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি। সৌরপুর নগরে এক অমিতপ্রতাপশালী রাজা ছিলেন।

মূল-তত্ত্ব।

তাঁহার নাম—বাসুদেব। তাঁহার এক পুত্রের নাম—কেশব। কুমার কেশবের সহিত সৌদামিনীর ন্যায় রূপ-সম্পন্না রাজীমতী নাম্নী এক রাজকন্যার বিবাহ-প্রসঙ্গ স্থির হয়। যে দিন শোভা-যাত্রা করিয়া বররূপে কুমার কেশব বিবাহ-বাটীতে যাত্রা করেন, পথিমধ্যে কতকগুলি নিরীহ পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। নিরীহ পশুগুলি তাঁহার দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া যেন আর্ত্তস্বরে কাঁদিতেছিল। যেমনই সেই ভাব তাঁহার মনে উদয় হইল, অমনি তিনি সেই নিরীহ পশুগুলির পরিচালককে নিকটে আহ্বান করিলেন। পশুগুলিকে সেরূপভাবে পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া তাহারা কোথায় লইয়া যাইতেছে? কুমার জিজ্ঞাসা করায়, তাহাদের অধিকারী উত্তর দিল,—'এ পশুগুলি বড় ভাগ্যবান! আপনার বিবাহে ইহারা খাদ্য-রূপে পরিণত হইয়া বহু জনের তৃপ্তি-সাধন করিবে!' পশুচালকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কুমার চমকিয়া উঠিলেন। তিনি মনে মনে কহিলেন,—"আমার বিবাহে অভ্যাগত জনের আনন্দ-বর্দ্ধন জন্য এই সকল জীব নিহত হইবে! আমিই তবে ইহাদের হত্যার নিমিত্ত-স্থানীয়! পরজন্মে আমার তবে কি গতি হইবে?" কুমার আপনার কর্ণাভরণ উন্মোচন করিলেন; কণ্ঠহার ও সর্ব্বাঙ্গের আভরণ-সমূহ খুলিয়া ফেলিলেন; পরিশেষে পশুপালককে কহিলেন,—"এই তুমি পুরস্কার গ্রহণ কর। এই নিরীহ পশুগুলিকে ছাড়িয়া দাও।' এই বলিয়া, পশুপালককে বিদায় দিয়া, কুমার একে একে আপনার সাঙ্গোপাঙ্গগণকে বিদায় দিলেন। পরিশেষে শিবিকা হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক মস্তকের কেশ উৎপাটন করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন। রাজকন্যা রাজীমতী যখন শুনিলেন, তাঁহার পাণিপ্রার্থী যুবক সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিও তখন সংসার-ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনী সাজিলেন। রাজপুত্রের এবং রাজ-কুমারীর এইরূপে সংসার-ত্যাগ উপলক্ষে বাসুদেব তাঁহাদের দুই জনকে দুইটী উপদেশ প্রদান করিলেন। তিনি প্রথমে কুমারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—

"নাণেণং দংসণেণংচ চরিত্তেণং তহেবয়।
খংতীএ মুত্তীএ বট্টমাণো ভবাহিয় ॥ ২৬ ॥"

'অর্থাৎ,—জ্ঞান, বিশ্বাস, ভক্তি চরিত্র, সংযম প্রভৃতি সাহায্যে চরিত্রের উৎকর্ষ-সাধন করিয়া মুক্তির পথে অগ্রসর হও।' পরিশেষে সেই রাজ-কুমারীকে সম্বোধন করিয়া বাসুদেব কহিলেন,—"আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি,

"সংসারং সাগরং ঘোরং তরকন্নে লহুং লহুং ॥"

'অনায়াসে তুমি ভীষণ সংসার-সাগর হইতে পরিত্রাণ লাভ কর।' অহিংসা-ধর্ম্ম-পালনে ধার্ম্মিকের চিত্ত কিরূপ উদ্বেলিত হয়; আর তাহার ফলে সংসার কেমন ত্যাগ-স্বীকারের আদর্শ দর্শন করে, প্রোক্ত দৃষ্টান্তে তাহাই প্রত্যক্ষীভূত হয়।

কামকে (কামনাকে) কিরূপে বশীভূত করিতে হয়, কুমারী রাজীমতীর এবং রাজকুমার রথনেমির দৃষ্টান্তে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। রথনেমি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজীমতী সন্ন্যাসিনী হন। একদিন সহসা রাজীমতীর প্রতি রথনেমির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সেই রূপ, সেই যৌবন, সেই সৌন্দর্য্য দেখিয়া রথনেমি বিচলিত হইয়া পড়েন। রথনেমি, কুমারীকে ঐহিক সুখের প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিবার প্রয়াস পান। কুমারী তাহাতে যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা এই,—

কাম-জয়ে মুক্তি।

"জইসিরূবেণ বেসমণো ললিএণ নলকুবরো।
তহাবি তেন ইচ্ছামি জইসিসক্খং পুরংদরো ॥ ৪১ ॥
পংখংদে জলিয়ং জোইং ধূমকেউং দুরাসয়ং।
নেচ্ছংতি বংতয়ং ভুত্তুং কুলেজায়া অগংধণে ॥ ৪২ ॥
ধিরত্থুতে জসোকামীজোতং জীবিয় কারণা।
বংতং ইচ্ছসি আবেউং সেয়ংতে মরণং ভবে ॥ ৪৩ ॥
অহংচ ভোগরায়স্স তংচসি অংধগবন্‌হিনী।
মাকুলেগংধণাহোমো সংজমং নিহুউচর ॥ ৪৪ ॥
জইতং কাহিসিভাবং জাজাদিচ্ছসি নারীও।
বায়াবিদ্ধোব্বহডো অট্টিঅপ্পা ভবিস্‌সসি ॥ ৪৫ ॥
গোবালো ভংডবালোবা জহা তদ্দব্বনিস্‌সরো।
এবং অনিস্‌সরোতংপি সামন্নস্‌স ভবিস্‌সসি ॥ ৪৬ ॥"

অর্থাৎ,—"যদি আপনি বৈশ্রবণের (কুবেরের) ন্যায় রূপসম্পন্ন এবং নলকুবেরের (কুবের-পুত্রের) ন্যায় শীলতা-সম্পন্ন হইতেন, অধিক কি, যদি আপনি পুরন্দর ইন্দ্রও হইতেন; তথাপি আপনার প্রতি আমি কখনও আসক্ত হইতাম না। হে ধীমান্! ধিক আপনাকে! আপনি ইহজীবনের সুখের আশায় বমনোদগত দ্রব্য ভক্ষণ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। ইহা অপেক্ষা আপনার পক্ষে মরণই শ্রেয়ঃ। আমি ভোজরাজ-পুত্রী, আপনি অন্ধক-বৃষ্ণি বংশীয়। এমন উচ্চ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া গন্ধন সর্পের * ন্যায় আমাদের ব্যবহার হওয়া কদাচ উচিত নহে। আত্মসংযম অভ্যাস করুন। যে কোনও রমণীকে দেখিয়াই যদি আপনি তাহার প্রেমে পতিত হন; হঠবৎ (শৈবাল—পানার ন্যায়) আপনি মূলশূন্য হইবেন; বাত্যাপ্রবাহে আপনাকে কেবল ইতস্ততঃ বিচালিত হইয়াই ঘুরিতে হইবে। অপিচ, আপনি বুঝিয়া দেখিবেন, গোপালক রাখাল, অথবা পরধনরক্ষাকারী ব্যক্তি যেমন গোধনের বা গচ্ছিত ধনের অধিকারী হইতে পারে না; আপনিও সেইরূপ শ্রমণ-ধর্ম্মের অধিকারী নহেন। অর্থাৎ,—আমি ভিক্ষুর আশ্রমে আশ্রয় লইয়াছি। আপনি রক্ষক হইয়া ভক্ষক হইলে আপনার সে আশ্রম-ধর্ম্ম কখনও প্রতিপালিত হইতে পারে না।" রাজনন্দিনীর এবম্বিধ ভর্ৎসনা-বাক্যে রথনেমির জ্ঞানসঞ্চার হইল। অঙ্কুশাঘাতে হস্তী যেমন

* কথিত হয়, গন্ধন এবং অগন্ধন দুই জাতীয় সর্প আছে। গন্ধন-জাতীয় সর্প দ্বারা উদগীরিত বিষ শোষণ করান যাইতে পারে। অগন্ধন-জাতীয় সর্প উদগীরিত বিষ কদাচ পুনর্গ্রহণ করে না।

বিচালিত হয়, অতঃপর রথনেমিও সেইরূপ বিচালিত হইলেন; চিন্তা, বাক্য ও কার্য্য দ্বারা ইন্দ্রিয় দমন করিয়া তিনি মহাব্রত-প্রতিপালনে প্রযত্নপর রহিলেন। প্রলোভনের সামগ্রীতে অনাসক্ত হইতে পারিলে, ইন্দ্রিয়গণকে শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ-রূপ-রস প্রভৃতি বিষয়ে বিরত করিতে পারিলে, তবেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়। জৈনধর্ম্মের এই সার উপদেশ—শব্দ-গন্ধ-রূপ-রস-স্পর্শ বিষয়ে তোমার চিত্ত যেন অনাকৃষ্ট থাকে; অনুরাগ বা দ্বেষ যেন কোনও বিষয়েই উৎপন্ন না হয়।

সর্ব্বত্র ত্যাগ-শিক্ষা।

জৈনশাস্ত্র সর্ব্বত্র তারস্বরে প্রায় একই বাক্য—একই উপদেশ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। যেমন আচারাঙ্গ-সূত্রে, তেমনই উত্তরাধ্যয়ন-সূত্রে, তেমনই সূত্রকৃতাঙ্গে এবং তেমনই অন্যান্য জৈন ধর্ম্মশাস্ত্রে সেই বন্ধনের বিষয় আর সেই বন্ধন-ছেদের বিষয়ই বিবৃত রহিয়াছে। সূত্রকৃতাঙ্গের আরম্ভেই প্রশ্ন উঠিয়াছে,—'কেমন করিয়া জানিব, আত্মার বন্ধনের কারণ কি; আর সে বন্ধন ছিন্ন করিবার উপায়ই বা কি আছে?' জম্বুস্বামী এই প্রশ্ন সুধর্ম্মণাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—'বলুন দেব! বন্ধনের কারণ কি? তৎসম্বন্ধে মহাবীর স্বামী কি বলিয়া গিয়াছেন? আর সে বন্ধন-মুক্তির উপায়ই বা কি করিয়া জানিব?' সুধর্ম্মণ উত্তর দিলেন,—'জড় বা চেতন অতি সামান্য সম্পদেরও যিনি অধিকারী, অথবা অন্যের তদ্রূপ অধিকারে যিনি সম্মতি প্রদান করেন; তিনি কখনও দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন না।' সেই একই কথা—কোনও বিষয়ে আসক্তি থাকিলে চলিবে না। যাহারা ভ্রমবশে বিষয়াসক্ত হয়, তাহাদের অবস্থা সছিদ্র তরণীর সাহায্যে জন্মান্ধ-জনের সাগর-উত্তরণের প্রয়াস মাত্র। চিন্তায়, বাক্যে, কায্যে—সর্ব্বপ্রকারে আসক্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে, আর সেই আসক্তির মূল মান ক্রোধ মায়া ও লোভ বিসর্জ্জন দিতে হইবে। এই দেহ-ধারণ ও জন্ম-জরা-মৃত্যু সকলই কর্ম্মের ফল। সুতরাং কর্ম্মত্যাগ ভিন্ন মোক্ষলাভ পক্ষে আর উপায়ান্তর নাই। এক স্থলে নয়, এক বার নয়, এক উপদেশে নয়, পুনঃপুনঃ জৈনশাস্ত্র এই কথাই ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। মান, ক্রোধ, মায়া, লোভ পরিহার কর। পুত্র-কলত্র ধন-সম্পৎ বিষয়-বিভব পরিহার কর। কোনও বিষয়েই তোমার রতি বা অরতি উপস্থিত না হয়। এই উপদেশই জৈন-শাস্ত্রের সার উপদেশ। এই উপদেশ হৃদয়ে হৃদয়ে বদ্ধমূল করিবার উদ্দেশ্যে একই গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে একই ভাষায় একই বাণী বিঘোষিত হইয়াছে। অহিংসা পরিহার কর (অহিংসা সময়ং); তোমায় কেহ নিহত করুক,—তোমার যেমন ইচ্ছা নয়; অপরেরও সেইরূপ ইচ্ছা করে না যে, কেহ তাহাকে হত্যা করুক। * এই উক্তি এক সূত্রকৃতাঙ্গেই একাধিক বার দৃষ্ট হয়। এইরূপ মান (উক্কস), ক্রোধ (জলণ), মায়া (নূমা), লোভ (মজ্ঝাথ) পরিহার কর,—এই উপদেশও নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

---

* সূত্রকৃতাঙ্গ, প্রথম শ্রুতস্কন্ধ, প্রথম অধ্যায়নে দশম সূত্রে ও একাদশ অধ্যায়নে দশম সূত্রে অহিংসা-বিষয়ে এবং মানাদি পরিহার-সম্বন্ধে প্রথম শ্রুতস্কন্ধে প্রথম অধ্যায়নে ও দ্বিতীয় অধ্যয়নে ও অন্যান্য স্থানে দ্রষ্টব্য।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বিভিন্ন দার্শনিক-সম্প্রদায়ের বাদ-বিতণ্ডা।

[লক্ষ্য ও পথ,—বিভিন্ন দার্শনিক-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ;—সাম্প্রদায়িক বাদ-বিতণ্ডা,—বেদান্ত-দর্শনের ভাষ্যে সকল মতের আলোচনা ও নিরাস-প্রসঙ্গ ;—সাংখ্য-মতের নিরাস,—তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় ও তাহাতে অসামঞ্জস্য প্রদর্শন ;—বৈশেষিক মতের (পরমাণুবাদের বা আরম্ভবাদের) মূল তত্ত্ব ও তাহাতে অসামঞ্জস্য প্রদর্শন ;—ক্ষণিক বাদ, বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, মাধ্যমিক প্রভৃতির বিচারে অসামঞ্জস্য প্রদর্শন ;—জৈন-ধর্ম্মের মূলতত্ত্ববিচার ও তাহাতে দোষ-প্রদর্শন ;—শাক্তবাদাদির আলোচনায় অসামঞ্জস্য প্রদর্শন ;—উপসংহারে সর্ব্বদর্শন-সার-প্রসঙ্গ।]

লক্ষ্য অভিন্ন।

লক্ষ্য অভিন্ন ; কিন্তু পথ বিভিন্ন। অনুসন্ধের সামগ্রী এক ; কিন্তু অনুসন্ধানের পদ্ধতি অভিন্ন নহে। অপিচ, সেই পথ ও পদ্ধতি লইয়াই যত-কিছু গণ্ডগোল! বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় সেই হেতু ; বিভিন্ন দার্শনিক-সম্প্রদায়ের বিচার-বিতণ্ডাও সেই কারণে। যে মনীষি মহাপুরুষ যখন যে পথ পরিষ্কার করিয়া দেখাইতে পারিয়াছেন ; তাঁহার অনুবর্ত্তী দলের সংখ্যা তখনই বৃদ্ধি পাইয়াছে। তীক্ষ্ণ ধীশক্তি প্রভাবে যিনি যখন বিচার-বিতণ্ডায় অপরকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই তখন যশের জয়মাল্য লাভ করিয়াছেন। ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণের অথবা দার্শনিক-সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের প্রাধান্য তদনুসারেই প্রকাশ পাইয়াছে। যিনি যখন যে ভাবে যুক্তির উপর আপন মত প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছেন ; তাঁহার প্রাধান্য ও মাহাত্ম্য তখন সেই ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে প্রতিভা-প্রভাবে যে মহাপুরুষ আপনার মত প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন, তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের মধ্যে সে প্রতিভা তাদৃশ পরিস্ফুট না হইলে, সে মত রূপান্তরিত পরিবর্ত্তিত বা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে, আর তাহার স্থলে নূতন এক মত প্রতিষ্ঠিত এবং নূতন এক পথ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে—কেবল ভারতবর্ষেই বা বলি কেন—পৃথিবীতে যত ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সকলেরই মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে, ঐ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

সাম্প্রদায়িক বাদ-বিতণ্ডা।

এই ভারতবর্ষে হিন্দুর মধ্যেই কত শাখা-সম্প্রদায় দেখিতে পাই। কত সম্প্রদায় কত দার্শনিক মতেরই অনুবর্ত্তন করিয়া চলিয়াছেন। কেহ সাংখ্য-মতাবলম্বী, কেহ বৈদান্তিক, কেহ যোগমার্গাবলম্বী,—একই হিন্দুর মধ্যে কত মত-পার্থক্য! সকলেরই লক্ষ্য—সেই পরমতত্ত্ব মোক্ষ। অথচ, পথ-প্রক্রিয়া সকলেরই বিভিন্ন। জ্যোতিষ্ক—সাধারণ দৃষ্টির অন্তরালে রহিয়াছেন। বিভিন্ন জনে বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে তাঁহার স্বরূপ তত্ত্ব অবগত হইবার প্রয়াস পাইতেছেন। যিনি যখন যে যন্ত্রের উৎকর্ষ সাধনে সমর্থ হইতেছেন, তাঁহারই প্রতিষ্ঠা তখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। জ্যোতিষ্ক-দর্শনে দৃষ্টি-শক্তির সাফল্য প্রদর্শন করিতে গিয়াই এত বিভিন্ন ধর্ম্মমতের এবং

এত বিভিন্ন দর্শনের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। একের অপ্রতিষ্ঠা খ্যাপন করিতে না পারিলে, অপরের সুপ্রতিষ্ঠা সাধন হয় না,—প্রধানতঃ সেই জন্যই দর্শন-শাস্ত্রের বিচার-বিতণ্ডা। সাংখ্য দর্শনকে পণ্ডিতগণ আদি-দর্শন বলিয়া মান্য করেন। অথচ, বেদান্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় সেই সাংখ্য-মতের প্রতিবাদ দেখিতে পাই। এইরূপ, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য বিভিন্ন শাখা-সম্প্রদায়ের দর্শন-শাস্ত্র-সমূহ পরস্পর দ্বন্দ্ব-বিতণ্ডায় প্রতিষ্ঠাপন্ন। যখন বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয় ঘটে; তখন তৎকাল-প্রচলিত দার্শনিক মত-সমূহকে বৌদ্ধ-দার্শনিকগণ যুক্তি-কুঠারে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রতীত হয়। আবার জৈনধর্ম্মের যখন অভ্যুদয় ঘটে, তখন জৈনগণ কর্তৃক তৎকাল-প্রচারিত দার্শনিক মত-সমূহ খণ্ড বিখণ্ড হইয়াছিল বলিয়া জৈনশাস্ত্রে উল্লেখ দেখিতে পাই। এইরূপ, বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিজয়-পতাকা যখন উড্ডীন হয়, তাঁহারা তখন তৎপূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিক মতসমূহকে ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছিলেন। ফলতঃ, এ সকল আর কিছুই নয়—পাণ্ডিত্যের গবেষণার বা বিচার-শক্তির প্রভাবে এক পথ কণ্টকসমাকুল বলিয়া প্রতিপন্ন করা হয়, আর অন্য পথ সুগম বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়া যায়। এই হইল—বিভিন্ন দার্শনিক-সম্প্রদায়ের ও ধর্ম্মমতের উৎপত্তি-মূল। আমরা যদিচ ধর্ম্মের কোনও পথকেই কুপথ বলিয়া মনে করি না; পরন্তু যদিও অধিকারী-অনুসারে প্রত্যেক পথেরই উপযোগিতা স্বীকার করি; তথাপি, ভারতীয় বিভিন্ন দার্শনিক মতের বাদ-বিতণ্ডার বিষয় আলোচনা করিয়া, তত্তৎমতের মূলতত্ত্ব প্রদর্শনের আবশ্যক বোধ করি। বেদান্ত-দর্শনে শ্রীমৎ বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত 'গোবিন্দ-ভাষ্যে' সাংখ্য-মত, বৈশেষিক-মত (পরমাণুবাদ), বৌদ্ধ-মত এবং জৈন-মত প্রভৃতি কিরূপে খণ্ডিত হইয়াছে, তদ্বিষয় প্রণিধান করিলে, ভারতবর্ষীয় ঐ সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মূল তথ্য অনেকাংশে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। ভারতবর্ষে প্রচারিত সকল দার্শনিক মতের সংক্ষেপে আলোচনা করার পর, উপসংহারে এক্ষণে আমরা সেই গোবিন্দ-ভাষ্য-বিবৃতি উপলক্ষে সকল মতের সার নিষ্কাষণ করিতেছি।

বেদান্ত-দর্শন (দ্বিতীয় অধ্যায়, প্রথম পাদে) প্রথমে নিজ-পক্ষে পর-কর্তৃক উদ্ভাবিত দোষ-সকল নিরাস করিয়াছেন। বিরুদ্ধ-সম্প্রদায় কর্তৃক বেদান্ত-মতের যে দোষ-খ্যাপন হইয়াছে, প্রথম পাদে তাহার খণ্ডন করিয়া, দ্বিতীয় পাদে বিরুদ্ধ-পক্ষের দোষ খ্যাপন করা হইয়াছে। সেই দ্বিতীয় পাদ আনুপূর্ব্বিক অনুশীলন করিলে আর তৎপক্ষে 'গোবিন্দ-ভাষ্য' অনুসৃত হইলে, বিষয়টী সম্যক বোধগম্য হইবে। ভাষ্যকার বলিতেছেন,—'যদি অন্য পক্ষের দোষ প্রদর্শন করা না হয়, তাহা হইলে অজ্ঞজন বৈদিক পথ পরিত্যাগ করিবে। তাহাতে, অসৎপক্ষের অনুসরণে তাহাদের অনর্থ ঘটিবে।' তাই তিনি প্রথমেই সাঙ্খ্য-মতের নিরাস-কল্পে কহিতেছেন,—

সাঙ্খ্য-মতের নিরাস।

"স্বপক্ষে পরৈরুদ্ভাবিতা দোষা নিরস্তাঃ প্রথমে পাদে। দ্বিতীয়ে তু পরপক্ষা দূষ্যন্তে। ইতরথা বৈদিকং বর্ত্ম বিহায় তেষু জনানাং প্রবৃত্তিঃ স্যাদনর্থং চ তে সমীয়ুঃ। তত্র তাবৎ সাংখ্যানাং মতং নিরস্যতে। সাংখ্যাচার্য্যাঃ কপিলতন্ত্রাণি সংজগ্রাহ। সত্ত্বরজ-স্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্মহান্ মহতোঽহঙ্কারঃ অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি

উভয়মিন্দ্রিয়ং স্থূলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণ ইতি। সাম্যেনাবস্থিতানি সত্ত্বাদীনি প্রকৃতিঃ। তানি চ সুখদুঃখমোহাত্মকানি ক্রমাদ্বোধ্যানি। তৎকার্য্যে জগতি সুখাদি-রূপত্বদর্শনাৎ। তথাহি তরুণী রত্যা পত্যুঃ সুখদেতি সাত্ত্বিকী ভবতি মানেন দুঃখদেতি রাজসী বিরহেণ মোহদেতি তামসী চেত্যেবং সর্ব্বে ভাবা দ্রষ্টব্যাঃ। উভয়মিন্দ্রিয়মিতি। দশবাহ্যেন্দ্রিয়াণ্যেকমন্তরিন্দ্রিয়ং মন ইত্যেকাদশেত্যর্থঃ। নিত্যা বিভ্বী চ প্রকৃতিঃ। মূলে মূলাভাবাদমূলং মূলম্। ন পরিচ্ছিন্নং সর্ব্বোপাদানম্। সর্ব্বত্র কার্য্যদর্শনাৎ বিভুত্বমিতি সূত্রেভ্যঃ। মহদহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রাণি সপ্ত প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ. অহঙ্কাদেঃ প্রকৃতয়ঃ প্রধানাদেস্তু বিকৃতয় ইতি। একাদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চভূতানি চেতি ষোড়শ বিকৃতয় এব। পুরুষস্তু নিষ্পরিণামত্বান্ন কস্যাপি প্রকৃতির্ন চ বিকৃতিরিতি। এবমেবেশ্বর-কৃষ্ণশ্চাহ। মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকশ্চ বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষ ইতি। সা খলু প্রকৃতির্নিত্যবিকারা স্বয়মচেত-নাপ্যনেকচেতনভোগাপবর্গহেতুরত্যন্তাতীন্দ্রিয়াপি তৎকার্য্যেণানুমীয়তে। এবৈকৈব বিষম-গুণা সতী পরিণামশক্ত্যা মহদাদিবিচিত্ররচনং জগৎ প্রসূতে ইতি জগন্নিমিত্তোপাদনভূতা সেতি। পুরুষস্তু নিষ্ক্রিয়ো নির্গুণো বিভুচিৎ প্রতিকায়ং ভিন্নঃ সঙ্ঘাতপরার্থাদনুমেয়শ্চ সঃ। বিকারক্রিয়য়োর্বিরহাৎ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বয়োর্বিরহঃ। এবং স্থিতে প্রকৃতি-পুরুষয়োস্তত্ত্বে সন্নিধিমাত্রাৎ তয়োর্মিথো ধর্ম্মবিনিময়ঃ প্রকৃতৌ চৈতন্যং পুরুষে তু কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বয়োরধ্যাসো ভবতি। ইত্থমবিবেকাৎ ভোগো বিবেকাৎ তু অপবর্গঃ। প্রকৃত্যৌদাসীন্যবপুরিত্যেবমাদীনর্থান্ সোপপত্তিকৈঃ সূত্রৈর্নিববন্ধ। অস্যাং প্রক্রিয়ায়াং প্রত্যক্ষানুমানাগমান্ প্রমাণানি মেনে। ত্রিবিধং প্রমাণং তৎসিদ্ধৌ সর্ব্ব-সিদ্ধের্নাধিক্যসিদ্ধিরিতি। তত্র প্রত্যক্ষাগমসিদ্ধেষ্বর্থেষু নাতীব বিসংবাদঃ। যত্তু পরিমাণাৎ সমন্বয়াৎ শক্তিতশ্চেত্যাদিসূত্রৈঃ প্রধানং জগৎকারণমনুমিতং তন্নিরস্যং ভবতি তেনৈব সর্ব্বতন্মতনিরাসাৎ। তত্র প্রধানং জগন্নিমিত্তোপাদানং ভবেৎ ন বেতি সংশয়ে প্রধানমেব তথা জগতঃ সাত্ত্বিকাদিরূপত্বাৎ প্রধানস্যৈব সত্ত্বাদিরূপস্য তদুপাদান-ত্বেনানুমানাৎ। ঘটাদিকার্য্যস্যোপাদানং খলু তৎসজাতীয়ং মৃদাদ্যেব দৃষ্টম্। ফলন্তি বৃক্ষশ্চলতি জলমিতিবৎ জড়স্যাপি তস্য কর্ত্তৃত্বঞ্চ। তস্মাৎ প্রধানমেব জগদুপাদানাং জগৎকর্ত্তৃ চেত্যেবং প্রাপ্তে—"রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্ ॥" ১ ॥"

সাংখ্যাচার্য্য মহর্ষি কপিল তত্ত্ব (পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব) ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তদনু-সারে সত্ত্ব রজঃ তমঃ—এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি। প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চতন্মাত্র হইতে উভয়েন্দ্রিয় (জ্ঞানে-ন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়) এবং স্থূলভূতসকল উৎপন্ন। ঐ সকল আর পুরুষ—এই লইয়া পঞ্চবিংশতি গণ বা তত্ত্ব। সাম্যে অবস্থিত সত্ত্বাদি ত্রিগুণ—প্রকৃতি। ঐ তিনটি গুণ যথাক্রমে সুখদুঃখ ও মোহাত্মক। প্রকৃতিকার্য্যভূত জগৎ—সুখাদি-রূপত্ব দর্শন-হেতু। যেমন তরুণী, রতির দ্বারা পতির সুখদান করেন; আর তাহাতে সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ পায়; তেমনই তিনি আবার মানিনী হইয়া দুঃখদান হেতু রাজসিক ভাবের, এবং বিরহ-

জনিত মোহ উৎপাদন জন্য তামসিক ভাবের প্রকাশিকা হন। প্রকৃতিতে সেইরূপ সর্ব্ব-ভাব প্রকাশ পায়। ইন্দ্রিয় দ্বিবিধ; দশ বাহেন্দ্রিয় এবং একটী অন্তরেন্দ্রিয় মন—সর্ব্ব-সমেত ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা একাদশ। প্রকৃতি নিত্যা ও বিভুত্ব-সম্পন্না। মূলে মূলাভাব জন্য মূলই প্রধান অর্থাৎ কারণান্তররহিত আদি। সেই মূল অপরিচ্ছিন্ন ও সর্ব্বোপাদান। 'সর্ব্বত্র কার্য্যদর্শনাৎ বিভুত্ব'—এই সূত্র হইতে উহার স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহত্তত্ব, অহঙ্কার-তত্ব, পঞ্চতন্মাত্র—এই সাতটি প্রকৃতির বিকৃতি। অহংতত্বাদি প্রকৃতি-বিকৃতি। একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত—প্রকৃতির এই ষোড়শ বিকার। পুরুষ পরিণাম-শূন্যতা-হেতু কাহারও প্রকৃতি বা বিকৃতি নহেন। ঈশ্বরকৃষ্ণ এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন—'মূল প্রকৃতি অবিকৃত; মহত্তত্বাদি প্রকৃতির সাতটী বিকৃতি। বিকার—ষোড়শ প্রকার। যিনি পুরুষ, তিনি প্রকৃতি বা বিকৃতি নহেন।' সেই প্রকৃতি নিত্যবিকারশালিনী। তিনি স্বয়ং অচেতন হইয়াও অনেক চেতন জীবের ভোগাপবর্গের হেতুস্বরূপা; তিনি অতীন্দ্রিয় হইয়াও তৎকার্য্য দ্বারা অনুমিত হন। এক হইয়াও বিষমগুণা বলিয়া পরিণাম-শক্তির দ্বারা প্রকৃতি মহদাদি বিচিত্র রচনাময় জগৎ সৃষ্টি করেন। এই জন্যই তাঁহাকে জগন্নিমিত্তোপাদানভূতা বলা হয়। নিষ্ক্রিয় নির্গুণ পুরুষ—বিভু চিৎস্বরূপ; তিনি প্রতি দেহে ভিন্ন; সংঘাত-পরার্থ প্রভৃতি হেতু তিনি অনুমেয়। বিকার ও ক্রিয়ার বিরহ-হেতু তাঁহার কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব নাই। প্রকৃতি পুরুষের তত্ব এই ভাবে অবস্থিত। উভয়ের সান্নিধ্য মাত্র পরস্পরের ধর্ম্ম-বিনিময় ঘটে; তাহাতে প্রকৃতিতে চৈতন্যের এবং পুরুষে কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বের অধ্যাস হয়। এই অবিবেক-হেতু ভোগ এবং বিবেক-হেতু অপবর্গ বা মোক্ষ। ঔপপত্তিক সূত্র দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে, প্রকৃতির প্রতি ঔদাসীন্যই পুরুষের ধর্ম্ম। এই প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ অনুমান ও আগম প্রমাণ দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। উক্ত ত্রিবিধ প্রমাণেই উহা সিদ্ধ হয়। উহাতেই সর্ব্বসিদ্ধি; তৎসিদ্ধি পক্ষে অধিক আয়াস অনাবশ্যক। প্রত্যক্ষ আগম দ্বারা সিদ্ধ অর্থে বিসম্বাদ নাই। পরিমাণ হইতে, সমন্বয় হইতে, আর শক্তি হইতে (পরিমাণাৎ সমন্বয়াৎ শক্তিতঃ)—ইত্যাদি সূত্রে প্রধানের জগৎকারণত্ব অনুমতি হইয়াছে। তাহা নিরাসের উপরই সকল মতের নিরাস নির্ভর করে। যিনি প্রধান অর্থাৎ পুরুষ, তিনি জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান—এ বিষয়ে সংশয়-নিরাসের জন্য তাঁহার নিমিত্তত্ব উপাদানত্ব উভয়ই অঙ্গীকৃত হইয়াছে। সাত্বিকাদি রূপ-হেতু সত্বাদিরূপ প্রধানকে জগতের উপাদান-কারণ রূপে অনুমান করা যায়। ঘটাদি কার্য্যের উপাদান তৎস্বজাতীয় মৃত্তিকাদি দৃষ্টে এই অনুমান নিশ্চয় হয়। বৃক্ষের ফলোৎপত্তি, জলের গতি প্রভৃতি দৃষ্টে জড় প্রধানের কর্ত্তৃত্ব সূচিত হইয়া থাকে।

সেই যে সাংখ্য মত, সেই যে প্রধানের জগৎ-কর্ত্তৃত্ব, সেই যে প্রধানের জগদুপাদানত্ব ও নিমিত্ত-কারণত্ব, বেদান্ত-দর্শনের কয়েকটী সূত্রের ব্যাখ্যায়, ভাষ্যকার একে একে তাহার খণ্ডন করিতেছেন। বেদান্ত-দর্শনের সূত্র (দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বিতীয় পাদ, প্রথম সূত্র)—"রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্। ১।" অর্থাৎ,—'জগদ্রচনাদৃষ্টে অনুপপত্তি হয়। সুতরাং অনুমান সিদ্ধ নহে।' এ সম্বন্ধে প্রথমে ভাষ্যের ভাষা উদ্ধৃত করিয়া পরে তাহার মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিতেছি। ভাষ্য, যথা,—

সাংখ্য-মতে দোষ-প্রদর্শন।

"অনুমীয়তে জগদ্ধেতুতয়েত্যনুমানং জড়ং প্রধানম্। তন্ন জগদুপাদানং ন চ তন্নিমিত্তম্। কুতঃ রচনেতি। বিচিত্রজগদ্রচনায়াশ্চেতনানধিষ্ঠিতেন জড়েন তেনাসিদ্ধেরিত্যর্থঃ। ন খলু চেতনানধিষ্ঠিতৈরিষ্টকাদিভিঃ প্রাসাদাদিরচনা সিদ্ধা লোকে। চ শব্দেনান্বয়ানুপপত্তিঃ সমুচ্চিতা। ন হি বাহ্যা ঘটাদয়ঃ সুখাদিরূপতয়ান্বিতাঃ। সুখাদীনামান্তরত্বাৎ ঘটাদীনাং সুখাদিহেতুত্বাৎ তদ্রূপত্বাপ্রতীতেশ্চ।" উহার ভাবার্থ,— যদি অনুমান করিয়া লওয়া হয়, জড় প্রধানই জগতের হেতু; কিন্তু তাহাতে জগদুপাদানত্ব বা জগন্নিমিত্তত্ব প্রতিপন্ন হয় না। জগদ্রচনার বিষয় বিচার করিলেই তাহা বুঝা যায়। এই জগতের রচনা অতি বিচিত্র। বিচিত্র জগদ্রচনায় চেতনের অধিষ্ঠান পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং জড়ের দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয় না। ইহসংসারে দেখিতে পাই, চেতনের সাহায্য ব্যতীত ইষ্টকাদি দ্বারা কখনও প্রাসাদ রচনা সিদ্ধ হয় না। চ শব্দ দ্বারা অন্বয়ানুপপত্তি উপলব্ধি হইতেছে। বাহ্য ঘটাদিকে কখনও সুখাদি রূপে অন্বিত অর্থাৎ অবস্থিত দেখা যায় না। কেন না, সুখাদি ঐ সকলের বহির্ভূত ধর্ম্ম। বাহ্য বস্তুতে উহাদের সঙ্গতি হইতে পারে না। ঘটাদি সুখের হেতু বলিয়া তদ্রূপত্ব প্রতীত হয় মাত্র। নচেৎ, স্বরূপতঃ উহা সুখের নিমিত্ত বা উপাদান নয়।

যেমন প্রথম সূত্র, তেমনই দ্বিতীয় সূত্রও সাংখ্য-মত নিরাস-কল্পে প্রযুক্ত দেখি। দ্বিতীয় সূত্র, যথা,—"প্রবৃত্তেশ্চ। ২।" অর্থাৎ,—'প্রবৃত্তির দৃষ্টান্ত দ্বারাও প্রধানের তদ্রূপত্ব অর্থাৎ জগদুপাদানত্ব প্রতিপন্ন হয় না।' সূত্রের ভাষ্য, যথা,—

"জড়স্য চেতনাধিষ্ঠিতত্বে সতীতি শেষঃ। যস্মিন্নধিষ্ঠাতরি সতি জড়ং প্রবর্ত্ততে তস্যৈব সা প্রবৃত্তিরিতি নিশ্চিতং রথহয়াদৌ। ইত্থঞ্চ ফলতীত্যাদিকং প্রত্যুক্তম্। তত্রাপি চেতনাধিষ্ঠিতত্বাৎ তচ্চান্তর্য্যামিব্রাহ্মণাৎ। এতৎ পরত্র স্ফুটীভাবি। চোঽবধারণে। অহং করোমীতি চেতনস্যৈব প্রবৃত্তিদর্শনাৎ জড়স্য কর্ত্তৃত্বং নেতি বা। নমু প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সন্নিধিমাত্রেণ মিথো ধর্ম্মাধ্যাসাৎ জগদ্রচনোপপত্তিরিতি চেদুচ্যতে। অধ্যাস-হেতুঃ সন্নিধিঃ কিং তয়োঃ সদ্ভাবঃ কিং বা প্রকৃতিপুরুষগতঃ কশ্চিদ্বিকার ইতি। নাদ্যঃ মুক্তানামপ্যধ্যাসপ্রসঙ্গাৎ। অন্ত্যোঽপি ন তাবৎ প্রকৃতিগতো বিকারঃ অধ্যাসকার্য্যতয়াভিমতস্য তস্যাধ্যাসহেতুত্বাযোগাৎ ন চ পুরুষগত অস্বীকারাৎ॥"

চেতনাধিষ্ঠিত জড়েই প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়। যাহা অধিষ্ঠিত হইয়া জড়কে প্রবর্ত্তনা করে, সে প্রবৃত্তি সে অধিষ্ঠাতারই। রথ ও রথচালকের দৃষ্টান্তে ইহা উপলব্ধি হয়। ইহার প্রত্যুক্তিস্বরূপ বৃক্ষের ফলোৎপাদনত্ব উক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রমাণের জন্য ঐ স্থলেও চেতনাধিষ্ঠিতত্ব স্বীকৃত হয়। অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণে এ বিষয় উক্ত আছে। পরে এ বিষয় বিশদীকৃত করা হইতেছে। চ শব্দ অবধারণার্থ প্রযুক্ত। 'আমি করিতেছি'— এবম্প্রকার প্রয়োগে চেতনেরই কর্ত্তৃত্ব সূচিত হয়। প্রবৃত্তি-দর্শনে জড়ের কর্ত্তৃত্ব সপ্রমাণ হয় না। প্রকৃতি-পুরুষের সন্নিধি-মাত্রেই উভয়ের ধর্ম্মাধ্যাস-হেতু জগদ্রচনাও অনুপপত্তি হইয়া থাকে। অধ্যাস-হেতু সে সন্নিধি, তাহা প্রকৃতি-পুরুষের সদ্ভাবজনিত, কি প্রকৃতি-পুরুষগত কোনরূপ বিকারবশতঃ সাধিত হয়? সদ্ভাব-বশতঃ যে ঐরূপ ঘটিয়াছে, তাহা স্বীকার করা

যায় না; কেন-না, তাহাতে মুক্ত পুরুষের অধ্যাস-প্রসঙ্গ আসে। বিকার-ঘটিত উহা যে ঘটিয়াছে, তাহাও স্বীকার করা যায় না। কেন-না, পুরুষে বিকার অস্বীকার্য্য; অধ্যাস-কার্য্যরূপে অভিমত প্রকৃতিগত বিকারেরও অধ্যাস-হেতুত্বের অসম্ভাবনা। অতএব, প্রধানের বা পুরুষের জগৎ-কারণত্ব সৃষ্টি কর্তৃত্ব অসিদ্ধ হয়।

এক্ষেত্রে আরও একটী প্রশ্ন উঠে,—'দুগ্ধ আপনা-আপনিই দধিরূপে পরিণত হইয়া থাকে। একই বারিদ-বিমুক্ত অম্বু তাল-চূতাদি বিবিধ ফলে বিচিত্র রসরূপে পরিণত হয়। তদ্রূপ, একই প্রধান পুরুষ কর্ম্ম-বৈচিত্র্য-হেতু দেহভুবনাদি-রূপে পরিণত হইতে পারেন।' কিন্তু তৃতীয় সূত্রে তাহারও উত্তর দেওয়া হইয়াছে। যথা, পূর্ব্বপক্ষের প্রশ্ন এবং তাহার উত্তর,—

"ননু পয়ো যথা দধিভাবেন স্বতঃ পরিণমতে যথা চাম্বু বারিদমুক্তমেকরস-
মপি তালচূতাদিষু মধুরাম্লাদিবিচিত্ররসরূপেণ তথা প্রধানমপি পুরুষকর্ম্মবৈচি-
ত্র্যাৎ তনু ভুবনাদিরূপেণেতি চেৎ তত্রাহ। "পয়োঽম্বুবচ্চেৎ তত্রাপি।" ৩।"

উত্তরে তৃতীয় সূত্রে বলা হইতেছে,—"পয়োঽম্বুবচ্চেৎ তত্রাপি। ৩।" (২য় অঃ, ২য় পাঃ, ৩য় সূত্র।) উহার ভাষ্য, যথা,—

"তয়োঃ পয়োঽম্বুনোরপি চেতনাধিষ্ঠিতয়োরেব প্রবৃত্তিঃ ন তু স্বতঃ রথাদিদৃষ্টান্তেন
তথানুমানাৎ। তয়োস্তদধিষ্ঠিতত্বং চান্তর্য্যামিব্রাহ্মণাৎ সিদ্ধম্॥ ৩॥"

দুগ্ধ ও জল প্রভৃতি অচেতন পদার্থ চেতন কর্তৃক অধিষ্ঠিত অর্থাৎ মিলিত হইয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। রথাদির দৃষ্টান্ত হইতেই ইহা অনুমান করিতে পারি। অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণ হইতেই অচেতনে চেতনের অধিষ্ঠিতত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে।

অতঃপর চতুর্থ সূত্র। চতুর্থ সূত্রে বুঝান হইতেছে, প্রধান বা পুরুষ ব্যতীত অন্য কোনও কর্ম্মকর্ত্তার অস্তিত্ব যখন সৃষ্টির পূর্ব্বে সপ্রমাণ হয় না; তখন কেমন করিয়া বলিতে পারি যে, প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে? এ বিষয়ে সূত্র,—

"ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ॥ ৪॥"

"অপ্যর্থে চকারঃ। সৃষ্টেঃ প্রাক্ প্রধানব্যতিরেকেণ হেত্বন্তরানবস্থিতেরনপেক্ষত্বান্ন
কেবলস্য প্রধানস্য স্বপরিণামকর্তৃত্বম্। প্রধানব্যতিরিক্তস্তৎপ্রবর্ত্তকস্তন্নিবর্ত্তকো বা
হেতুরাদিসর্গাৎ পূর্ব্বং নাবতিষ্ঠতে ইতি যৎ স্বীকৃতং তস্যাপি পুনরুপেক্ষণাৎ।
চৈতন্যসন্নিধৌ হেত্বন্তরস্যাঙ্গীকারাদিতি যাবৎ। তথাচ কেবলজড়কর্তৃত্ববাদভঙ্গঃ।
কিঞ্চ ব্যতিরিক্তহেত্বভাবাৎ সন্নিধিসত্ত্বাচ্চ প্রলয়েঽপি কার্য্যোদয়প্রসঙ্গঃ। ন চ তদা-
দৃষ্টোদ্বোধাভাবাৎ কার্য্যাভাবঃ তদুদ্বোধস্যাপি তদৈবাপাদ্যমানত্বাৎ॥ ৪॥"

অপি শব্দে চকার বা সমুচ্চয়। সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রধানব্যতিরিক্ত হেত্বন্তরের অনবস্থিতি স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু প্রধানযোগে সৃষ্টিকর্তৃত্ব মানিতে হইলে সে অনবস্থিতি উপেক্ষিত সুতরাং প্রধানেরই স্বপরিণামকর্তৃত্ব প্রতিপন্ন হয়। অন্যথা প্রধান ব্যতিরিক্ত প্রবর্ত্তক, নিবর্ত্তক বা কোনও কারণই সৃষ্টি সম্বন্ধে থাকিতে পারে না। কিন্তু এবম্বিধ সৃষ্টি-ব্যাপারে সে মত উপেক্ষিত হইতেছে। চৈতন্যের সন্নিধানে হেত্বন্তরের অঙ্গীকার হয়। এইরূপে কেবল জড়কর্তৃত্ববাদ ভঙ্গ হয়। পরন্তু প্রলয় ও কার্য্যোদয় প্রসঙ্গ উত্থাপিত

হয়; কেন-না, প্রলয়-কালেও হেত্বন্তরের অভাব ও প্রধানের সান্নিধ্য থাকে। অদৃষ্টে উদ্বোধাভাবে কার্য্যাভাবও বলিতে পারি না। যেহেতু, তৎকালে তদুদ্বোধক অসম্ভব নহে।

বিবিধ বিতর্কে পরাজয়ের পরও সাংখ্যবাদিগণ বিতর্ক করিতে পারেন,—'তৃণপল্লবাদি যেমন গবাদি পশু কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া স্বতঃই ক্ষীরাকারে পরিণত হয়; মহদাদি তত্ত্বের আকারে পরিণত হইয়া প্রধানও তদ্রূপ অবস্থিত থাকিতে পারেন।' এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে,—"অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ।" (২অঃ, ২পাঃ, ৫ম সূত্র)।

সাংখ্যমত খণ্ডনে।

অর্থাৎ,—সর্ব্বত্র যখন সে ভাব পরিদৃষ্ট হয় না, সর্ব্বত্র যখন তৃণাদিকে ক্ষীরাকারে পরিণত হইতে দেখি না, তখন সে পরিণাম স্বভাবসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। এ বিষয়ে প্রশ্ন (ভাষ্যকারের) ও উত্তররূপে সূত্র (বেদান্তদর্শনের) উদ্ধৃত হইল; যথা,—

"নন্বু লতাতৃণপল্লবাদি বিনৈব হেত্বন্তরং স্বভাবাদেব ক্ষীরাকারেণ পরিণমতে তথা প্রধানমপি মহদাদ্যাকারেণেতি চেত্তত্রাহ—'অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ॥' ৫॥"

সূত্রের ভাষ্য এইরূপ লিখিত হইয়াছে; যথা,—

"অবধৃতৌ চশব্দঃ। নৈতচ্চতুরস্রম্। কুতঃ অন্যত্রাভাবাৎ। বলীবর্দ্দাদিভক্ষিতে তৃণাদিকে ক্ষীরাকারপরিণামভাবাদিত্যর্থঃ। যদি স্বভাবাদেব তৃণাদি ক্ষীরাত্মনা পরিণমতে তর্হিচত্বরাদিপতিতেঽপি তথা স্যান্ন চৈবমস্ত্যতো ন স্বভাবমাত্রং হেতুঃ কিন্তু ব্যক্তিবিশেষসম্বন্ধাৎ সর্ব্বেশসঙ্কল্প এব তথেতি॥"

অর্থাৎ,—'যেরূপ গবাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া তৃণপল্লবাদি ক্ষীরাকারে পরিণত হয়, সেইরূপ প্রধান পুরুষও মহদাদি তত্ত্বের আকারে পরিণত হন;—এবম্বিধ যুক্তিও অসঙ্গত। কেন-না, বলীবর্দ্দাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত তৃণাদিকে কেহ ক্ষীরাকারে পরিণত হইতে দেখেন নাই। সুতরাং তৃণাদির ক্ষীরাকারে পরিণতি স্বাভাবিক নহে। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে চত্বরাদিতে পতিত তৃণাদিরও ঐরূপ পরিণাম দেখা যাইত। তাহা যখন দেখা যায় না, তখন স্বভাবমাত্র পরিণামের হেতু নহে। ফলতঃ, ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে (গবাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া) ক্ষীরাদি ভাবে তৃণাদির পরিণতি ঘটুক, সর্ব্বেশ্বরের এইরূপ সঙ্কল্পই উহার কারণ। জড়ত্ব-প্রযুক্ত প্রধানের স্বতঃপ্রবৃত্তি বর্ত্তিতে পারে না।'

ভাষ্যকার পরিশেষে আরও দেখাইতেছেন, যদি পূর্ব্বপক্ষের সন্তোষের জন্য উহা (তৃণাদির ক্ষীরাকারে পরিণতি স্বাভাবিক—এরূপ) স্বীকার করিয়া লওয়াও যায়, তাহাতেও কোনও অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বেদান্ত-দর্শনের ষষ্ঠ সূত্রে সে তত্ত্ব বিশদীকৃত দেখি।

"প্রধানস্য জাড্যাৎ স্বতঃপ্রবৃত্তির্ন সমস্তীত্যাপাদিতম্। অথ ত্বন্মুখোল্লাসায় তাঞ্চেদভ্যুপগচ্ছামস্তথাপি ন কিঞ্চিত্তবাভীষ্টং সিধ্যেদিত্যাহ—'অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ॥' ৬॥"

এই ষষ্ঠ সূত্রের (অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ) ভাষ্য; যথা,—

"চতুর্থং নেত্যনুবর্ত্ততে। পুরুষো মাং ভুক্ত্বা মদ্দোষাননুভূয় মদৌদাসীন্যলক্ষণং মোক্ষং প্রাপ্স্যতীতি তদ্ভোগাপবর্গার্থাং প্রধানপ্রবৃত্তিং মন্যতে। প্রধানপ্রবৃত্তিঃ পরার্থা স্বতোঽপ্যভোক্তৃত্বাদুষ্ট্রকুঙ্কুমবহনবদিতি। অকর্ত্তাপি পুরুষো ভোক্তেতি চ মন্যতে। অকর্ত্তুরপি ফলোপভোগোঽন্নাদবদিতি। সৈষা প্রবৃত্তির্ন যুক্তা মন্তম্। কুতঃ তস্যাঃ স্বীকারে

ফলাভাবাৎ। পুরুষস্য প্রকৃতিদর্শনরূপো ভোগস্তদ্দোদাসীন্যরূপো মোক্ষশ্চ প্রবৃত্তেঃ ফলম্। তত্র ভোগস্তাবন্ন সম্ভবতি। প্রবৃত্তেঃ প্রাক্ চৈতন্যমাত্রস্য নির্ব্বিকারস্যাকর্ত্তুঃ পুরুষস্য তদ্দর্শনরূপবিকারাযোগাৎ। ন চাপবর্গঃ। প্রাগপি প্রবৃত্তেস্তস্য সিদ্ধত্বেন তদ্বৈয়র্থ্যাৎ। সন্নিধিমাত্রস্য ভোগহেতুত্বেতু মুক্তানামপি তদাপত্তিঃ তস্য নিত্যত্বাৎ॥"

ভাষ্যের ভাবার্থ,—'পরবর্ত্তী চারিটি সূত্রে ন (নহে) ভাব আসিবে। পুরুষ আমাকে (প্রধানকে) ভোগ করিয়া আমার (প্রধানের) দোষ অনুভব পূর্ব্বক আমাতে (প্রধানে) ঔদাসীন্য-লক্ষণ-রূপ মোক্ষ লাভ করিবেন; এইরূপ ভোগাপবর্গের জন্য প্রধানের প্রবৃত্তি অনুমান করা যায়। উষ্ট্র যেমন পরের জন্য কুঙ্কুম-ভার বহন করে, এ ক্ষেত্রে স্বয়ং ভোগ না করায় পরার্থে প্রধানের প্রবৃত্তি সূচিত হয়। অকর্ত্তা যে পুরুষ, এইরূপে তাঁহাতে ভোক্তৃত্ব আরোপ হইতে পারে। অন্নের প্রস্তুতকারী না হইয়াও অন্নের যেরূপ ভোক্তা হয়; পুরুষেও সেইরূপ ভোক্তৃত্বের ভাব আসে। অতএব, পুরুষের এবম্প্রকার প্রবৃত্তি কদাচ যুক্তিযুক্ত নহে। অপিচ, তাহা স্বীকারেও কোনও ফল নাই। কেন-না, প্রকৃতি-দর্শন-রূপ ভোগ ও তদ্বিষয়ে ঔদাসীন্য রূপ যে মোক্ষ, এতদুভয়ই প্রবৃত্তির ফল। তাহার (পুরুষের) ভোগ সম্ভব নহে। চৈতন্যমাত্র নির্ব্বিকার যে পুরুষ, তাহাতে প্রবৃত্তি অসিদ্ধ হয়। সন্নিধি-মাত্রকে ভোগের হেতু বলিলেও আপত্তি ঘটে; কেন-না, নিত্য মুক্ত পুরুষের ভোগ সম্ভব নহে।'

এক্ষেত্রে সাংখ্যবাদিগণ একটী প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন। তাঁহারা বলিতে পারেন,—'গতিশক্তিরহিত অথচ দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন পঙ্গু পুরুষের সহিত গতিশক্তিবিশিষ্ট অথচ দৃক্শক্তিরহিত অন্ধজনের মিলন হইলে যেমন গমনাদি কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে; অথবা অয়স্কান্ত মণির সন্নিধান-বশতঃ জড় লৌহ যেরূপ গতিশক্তিবিশিষ্ট হয়; সেইরূপ চিন্মাত্র পুরুষের সন্নিধান-হেতু অচেতন প্রকৃতিও তচ্ছায়া দ্বারা চেতনের ন্যায় তদর্থে (পুরুষের নিমিত্ত) সৃষ্টি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।' কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্তও যুক্তিযুক্ত নহে। সপ্তম সূত্রে সেই অযৌক্তিকতার বিষয় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; উত্তরে বলা হইয়াছে,—'ঐরূপ (অন্ধ-পঙ্গুর বা অয়স্কান্ত-লৌহের মিলনে গতি) গতি-কার্য্য লক্ষ্য হইলেও নির্লিপ্ত সুতরাং জড়বস্তুর ন্যায় পুরুষের স্বতঃপ্রবৃত্তি সপ্রমাণ হয় না।' পূর্ব্বপক্ষ-রূপে ভাষ্য-কারের প্রশ্ন ও উত্তর-পক্ষ-রূপে সূত্রের ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা,—

> "নন্থ যথা গতিশক্তিরহিতস্য দৃক্শক্তিসহিতস্য পঙ্গুপুরুষস্য সন্নিধানাদ্গতি-শক্তিমান্ দৃক্শক্তিরহিতোঽপ্যন্ধঃ প্রবর্ত্ততে যথা চায়স্কান্তাশ্মনঃ সন্নিধানাজ্জড়-মপ্যয়শ্চলতি এবং চিন্মাত্রস্য পুংসঃ সন্নিধানাদচেতনাপি প্রকৃতিস্তচ্ছায়য়া চেতনেব তদর্থে সর্গে প্রবর্ত্তেতেতি চেত্তত্রাহ—'পুরুষাশ্মবাদতি চেত্তথাপি।' ৭॥"

সূত্রের ভাষ্যে সাংখ্যের যুক্তি খণ্ডন করা হইতেছে; যথা,—

> "তথাপি তেনাপি প্রকারেণ জড়স্য স্বতঃপ্রবৃত্তির্ন সিদ্ধতি। পঙ্গোর্গতি-বৈকল্যেঽপি বর্ত্মদর্শনতদুপদেশাদয়োঽন্ধস্য দৃক্শক্তিবিরহেঽপি তদুপদেশ-গ্রহাদয়ো বিশেষাঃ সন্তি। অয়স্কান্তমণেশ্চায়ঃ সামীপ্যাদয়ঃ। পুরুষস্য তু

নিত্য নিষ্ক্রিয়স্য নির্ধর্ম্মকস্য ন কোঽপি বিকারঃ। সন্নিধিমাত্রেণ তস্মিন্ স্বীকৃতে তস্য নিত্যত্বান্নিত্যং সর্গো মোক্ষাভাবশ্চ প্রসজ্যেত। কিঞ্চ পঙ্গ্বন্ধাবুভৌ চেতনৌ অয়স্কান্তায়সী চ দ্বে জড়ে ইতি দৃষ্টান্তবৈষম্যং বিস্ফুটম্। ৭।"

ভাষ্যের ভাবার্থ এই যে,—'তথাপি এ প্রকারে জড়ে স্বতঃপ্রবৃত্তি সিদ্ধ হয় না। পঙ্গুর গতিবৈকল্য হইলেও সে বর্ত্মদর্শনে তৎপক্ষে উপদেশাদি দানে সমর্থ; এবং অন্ধজন দৃষ্টিশক্তিরহিত হইলেও পঙ্গুপ্রদত্ত উপদেশ-গ্রহণাদিতে সমর্থ। এইরূপ অয়স্কান্ত মণিরও লৌহ-সামীপ্য সাধিত হয়। কিন্তু পুরুষ নিত্য, নিষ্ক্রিয়, নির্ধর্ম্মক; এবং তাঁহাতে কোনরূপ বিকারই সম্ভবপর হয় না। সন্নিধিমাত্র বিকার যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তাঁহার নিত্যত্ব বশতঃ সৃষ্টির নিত্যত্ব সুতরাং মোক্ষাভাব প্রতিপন্ন হয়। অন্য পক্ষে, পঙ্গু ও অন্ধ উভয়েই চেতন এবং অয়স্কান্ত ও লৌহ উভয়েই জড়; এ হেতু দৃষ্টান্ত-বৈষম্যও পরিস্ফুট হইতেছে।'

সাংখ্যবাদিগণ আরও এক যুক্তির অবতারণা করেন। গুণ-ত্রিতয়ের উৎকর্ষ অপকর্ষ নিমিত্ত অঙ্গাঙ্গিভাব বশতঃ বিশ্ব সৃষ্টি হইয়া থাকে;—সাংখ্যবাদের এই এক প্রকৃষ্ট যুক্তি। অষ্টম সূত্রে ও তাহার ভাষ্যে সে যুক্তিরও খণ্ডন করা হইতেছে। যথা,—

"যত্তু গুণানামুৎকর্ষাপকর্ষবশেনাঙ্গাঙ্গিভাবাদ্বিশ্বসৃষ্টি-
রিতি মন্যতে তন্নিরস্যতি—'অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ।' ৮॥"

অর্থাৎ,—'অঙ্গিত্বই অনুপপত্তি হইতেছে।' এই সূত্রের ভাষ্য এইরূপ; যথা,—

"সত্ত্বাদীনাং সাম্যেনাবস্থিতিঃ প্রধানাবস্থা। তস্যাং চ নিরপেক্ষস্বরূপাণাং তেষাং কস্যচিদেকস্যাঙ্গিত্বং নোপপদ্যতে ইতরয়োস্তৎ সমত্বেন গুণীভাবাসম্ভবাৎ। তথা চ গুণানামঙ্গাঙ্গিভাবাসিদ্ধিঃ। ন চেশ্বরঃ কালো বা তৎকৃৎ অস্বীকারাৎ। যথাহ কপিলঃ। ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিরিতি। দিক্‌কালাবাকাশাদিভ্য ইতি চ। ন চ পুরুষস্তৎকৃৎ তস্য তত্রোদাসীন্যাৎ। তথা চ গুণবৈষম্যহেতুকঃ সর্গো নেতি। কিঞ্চৈবং হেত্বাভাবাৎ প্রতিসর্গেঽপি তে বৈষম্যং ভজেরন্। আদি সর্গে তু ন ভজেরন্নিতি। ৮॥"

ভাষ্যের ভাবার্থ এই,—'সত্ত্বাদি গুণের সাম্য ভাবে অবস্থিতিই প্রধান অবস্থা। অর্থাৎ, প্রধানের অবস্থিতির নামই সত্ত্বাদি গুণের সাম্য ভাব। এই অবস্থায় গুণসকল নিরপেক্ষ স্বরূপ থাকে বলিয়া কেহ কাহারও অঙ্গিত্ব হইতে পারে না। একটীকে অপরের অঙ্গিভাবে অবস্থিত বলিয়া স্বীকার করিলে তদিতর গুণদ্বয়ের সমত্ব-হেতু গুণিভাব অসম্ভব হয়। অর্থাৎ,—সত্ত্বগুণ যদি রজস্তমঃ গুণ প্রভৃতির সহিত মিশিয়া যায়, তাহা হইলে সত্ত্বগুণের অবিকার অবস্থা থাকে না। অতএব গুণ-সকলের অঙ্গাঙ্গিভাব এ ক্ষেত্রে অসিদ্ধ হয়। ঈশ্বর বা কাল যে সেই অঙ্গাঙ্গিভাবের কর্ত্তা হইতে পারে, তাহা অস্বীকৃত হইয়াছে। যেহেতু কপিল বলিয়াছেন,—'মুক্ত ও বদ্ধের অন্যতর ভাবের অভাব হেতু ঈশ্বরাসিদ্ধি ঘটে; অর্থাৎ,—ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় না।' আকাশ হইতেই দিক কাল উৎপন্ন; পুরুষ তাহাদের কর্ত্তা হইতে পারেন না; কেন-না, তিনি কর্ত্তৃত্ব

বিষয়ে সম্পূর্ণ-রূপ উদাসীন। অতএব গুণবৈষম্য-হেতু সৃষ্টির যুক্তি স্বীকার করা যায় না। অপিচ, হেতুর অভাব বশতঃ প্রতি সৃষ্টিতে বৈষম্য ঘটিলেও আদি-সৃষ্টিতে বৈষম্য ঘটিতে পারে না।'

এ ক্ষেত্রে সাংখ্যগণ আর একটী প্রশ্ন তুলিতে পারেন। তাঁহারা বলিতে পারেন,—কার্য্যানুরোধে গুণসকল বিচিত্র স্বভাব প্রাপ্ত হইবে, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। সে ক্ষেত্রে পূর্ব্বোক্ত দোষের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু নবম সূত্রে সে প্রশ্নের উত্তর ; যথা,—

"নমু কার্য্যানুরোধেন গুণা বিচিত্রস্বভাবা ভবন্তীত্যনুমেয়ম্। তেন নোক্ত-দোষাবকাশ ইতি চেত্তত্রাহ—'অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ॥' ৯॥"

অর্থাৎ,—এইরূপ অনুমানেও দোষের নিস্তার হয় না। কেন-না, উহাতে জ্ঞাতৃত্ব শক্তির বিয়োগ-ভাব দেখা যায়। সূত্রের ভাষ্যে এতদ্বিষয় এইরূপ আলোচিত হইয়াছে ; যথা,—

"বিচিত্র শক্তিকতয়া গুণানামনুমানেঽপি ন দোষান্নিস্তারঃ। কুতঃ জ্ঞেতি, জ্ঞাতৃত্ববিরহাদিত্যর্থঃ ইদমহমেবঞ্চ সৃজামীতি বিমর্শাভাবাদিতি যাবৎ। জ্ঞানশূন্যাজ্জড়ান্ন সৃষ্টিরিষ্টিকা দেরিবর্ত্তে চেতনাধিষ্ঠানাদিতি॥ ৯॥"

অর্থাৎ,—'বিচিত্র-শক্তি-হেতু গুণসমূহের অনুমানেও দোষের নিস্তার হয় না। কেন-না, এই আমি—এরূপ জ্ঞান, অথবা এই আমি সৃষ্টি করিতেছি—এ প্রকার বিচারের অসম্ভাবনা লক্ষ্য হয়। জ্ঞাতৃত্ববিরহ অর্থাৎ জ্ঞানশূন্য জড়পদার্থে সৃষ্টি অসম্ভব হয়। চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে অচেতন (ইষ্টক কাষ্ঠাদি) কোনও কার্য্য করিতে পারে না ; সেইরূপ গুণ-সকলও চৈতন্যময় পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান ভিন্ন সৃষ্টিকার্য্যে সমর্থ হয় না।'

এইরূপে বুঝা যায়, যিনি শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত পুরুষ, তিনি নিষ্ক্রিয় নির্লিপ্ত, তাঁহাতে কাহারও অধিষ্ঠান সম্ভবপর নহে এবং তিনি সৃষ্টি-কার্য্যের কখনও কারণ হইতে পারেন না।

সাংখ্যের প্রতিবাদের উপসংহার।

সাংখ্যমতের প্রতিবাদের উপসংহারেও বেদান্ত-দর্শনে সেই মত অভিব্যক্ত হইয়াছে। দশম সূত্র—"বিপ্রতিষেধাশ্চাসমঞ্জসম্।" অর্থাৎ,—বিপ্রতিষেধ বশতঃ বহুবিধ বিরোধ-হেতু অসামঞ্জস্য ঘটিতেছে। উক্ত "বিপ্রতিষেধাশ্চাসমঞ্জসম্" সূত্রের ভাষ্যে বিদ্যাভূষণ মহাশয় উপসংহার করিতেছেন ; ভাষ্য ; যথা,—

"পূর্ব্বোত্তরবিরোধাচ্চেদং কপিলদর্শনমসমঞ্জসং নিঃশ্রেয়সকামৈর্হেয়মিত্যর্থঃ। তথাহি প্রকৃতেঃ পারার্থ্যাদ্দৃশ্যত্বাচ্চ তস্যা ভোক্তা দ্রষ্টাধিষ্ঠাতা চ পুরুষ ইতি শরীরাদিব্যতিরিক্তঃ পুমান্ সংহতপরার্থত্বাদিত্যাদিভিরভ্যুপগম্য তস্য পুন-র্নির্ব্বিকারনির্ধর্ম্মক চৈতন্যত্বকর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বশূন্যত্বং কৈবল্যরূপত্বঞ্চাভিহিতম্। জড়ঃ প্রকাশাযোগাৎ প্রকাশঃ নির্গুণত্বান্ন চিদ্ধর্ম্মেত্যাদিভিঃ। গুণাবিবেক-বিবেকৌ পুংসো বন্ধমোক্ষৌ স্বীকৃত্য তৌ পুনর্গুণানামেব ন তু পুংস ইত্যুক্তম্। নৈকান্ততো বন্ধমোক্ষৌ পুরুষস্যাবিবেকাদৃতে প্রকৃতেরাঞ্জস্যাৎ সসঙ্গত্বাৎ পশুবদিত্যেবমাদয়োঽনেকে বিপ্রতিষেধাস্তৎ স্মৃতাবেব মৃগ্যাঃ॥ ১০॥"

ভাষ্যের ভাবার্থ,—'পূর্ব্বোক্ত বিরোধ ঘটায় অর্থাৎ মুক্তশুদ্ধ পুরুষের কর্তৃত্ব অসিদ্ধ হওয়ায়, কপিল-প্রবর্তিত দার্শনিক মতের অসামঞ্জস্য ঘটিতেছে। এই হেতু সাংখ্যমত নিঃশ্রেয়স-

মুক্তিকামী ব্যক্তিগণের নিকট হেয় বলিয়া গণ্য হইবে; প্রকৃতির পরার্থত্ব ও দৃশ্যত্ব হেতু ভোগকর্ত্তা দ্রষ্টাধিষ্ঠাতা পুরুষ শরীরাদি ব্যতিরিক্তরূপে পরিকল্পিত; 'সংহতপরার্থত্বাৎ' প্রভৃতি সূত্রে এবম্বিধ মত পরিব্যক্ত হইয়াছে। আবার সেই পুরুষই নির্ব্বিকার নির্দ্ধর্ম্মক চৈতন্যত্ব-কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-শূন্যত্ব কৈবল্যরূপত্ব বলিয়াও অভিহিত হইয়াছেন। অন্যদিকে 'জড়-প্রকাশা-যোগাৎ প্রকাশঃ নির্গুণত্বাৎ নোচিদ্ধর্ম্মা' প্রভৃতি সূত্র দ্বারা বিপরীত ভাব প্রকাশ পাইতেছে। গুণের বিবেক ও অবিবেক এতদুভয়ের উপর পুরুষের বন্ধমোক্ষ স্বীকার করা হইয়াছে। আবার ঐ বন্ধমোক্ষ গুণ সকলেরই অথচ পুরুষের নহে, এরূপ বলা হইয়াছে। অবিবেক ভিন্ন পুরুষের বন্ধমোক্ষ ঘটে না, আবার প্রকৃতি-সংসর্গেই পুরুষ পশুর ন্যায় বন্ধন-প্রাপ্ত হন,—এবম্বিধ অভিমতও প্রকাশ পাইয়াছে। এই প্রকার বিবিধ মতবিরোধ সাংখ্য-মতে দৃষ্ট হয়। সুতরাং মতবিরোধ-হেতু অসামঞ্জস্য-নিবন্ধন ঐ মত মান্য হইতে পারে না।

সাংখ্যমত নিরাস করিয়া অতঃপর আরম্ভবাদের (পরমাণুবাদের—বৈশেষিক মতের) নিরাস করা হইয়াছে। ভাষ্যকার বলিতেছেন,—'তার্কিকগণ কর্তৃক পার্থিবাদি চতুর্ব্বিধ পরমাণুর বিষয় কীর্ত্তিত হয়। সেই চতুর্ব্বিধ পরমাণু নিরবয়ব, রূপাদি-বিশিষ্ট, পারিমাণ্ডল্যপরিমাণ এবং প্রলয়কালে অনারব্ধ কার্য্যরূপে অবস্থিত।

পরমাণুবাদ নিরাস।

সৃষ্টিকালে ঐ সকল পরমাণু জীবাদৃষ্টাদি পুরঃসর হইয়া (পরমাণুর ক্রিয়োৎ-পত্তির কারণ হইয়া) দ্ব্যণুকাদি ক্রমে সাবয়ব স্থূলতর জগৎকার্য্য আরম্ভ করে। সেই পরমাণুদ্বয়ের ক্রিয়া অদৃষ্টসাপেক্ষ। তদ্দ্বারা উহাদের সংযোগ হইলে হ্রস্ব দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়। সে ক্ষেত্রে সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত-কারণ ক্রমে কার্য্য হয়। পরমাণুদ্বয় সমবায়ী, তৎসংযোগ অসমবায়ী ও জীবাদৃষ্ট নিমিত্ত কারণ। এইরূপে দ্ব্যণুকত্রয়ের সংযোগে ক্রিয়ার দ্বারা মহৎ ত্র্যণুক উৎপন্ন হইয়া থাকে। দুইটী অণুর দ্বারা ত্র্যণুকারম্ভ অসম্ভব। কেন-না, মহৎকার্য্যের উৎপত্তি-হেতু বহু কারণের আবশ্যক হয়। এবম্প্রকারে চারিটী ত্র্যণুক দ্বারা চতুরণুক হয় এবং তাহাতে অপর স্থূলতরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। স্থূল হইতে স্থূলতরের উৎপত্তি-ক্রমে মহতী পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। মহৎ অপ, মহৎ তেজ, মহান্ বায়ু—এইরূপে উৎপন্ন হয়। কার্য্যগত রূপাদি—স্বাশ্রয়-সমবায়ী কারণগত রূপাদি হইতে উৎপন্ন। কারণ-গুণ হইতেই কার্য্যগুণের আরম্ভ। এবম্প্রকারে উৎপন্ন পৃথিব্যাদির সংহারে পরমেশ্বর যখন অভিলাষ করেন, তখন পরমাণুতে ক্রিয়া আরম্ভ হয়; আর সেই ক্রিয়ার দ্বারা পরমাণুসমূহের বিভাগ-সংযোগনাশ প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে। দ্ব্যণুক-সকলের নাশে আশ্রয়-নাশ, ত্র্যণুকাদি নাশ, ক্রমে পৃথিব্যাদিও নাশপ্রাপ্ত হয়। পটের তন্তুনাশের ন্যায় পৃথিব্যাদির নাশ ঘটে। তদ্গত রূপাদির স্বাশ্রয়-নাশই জগদ্বিলয়। ইহাই পৃথিব্যাদি নাশের ক্রম। পরিমণ্ডল শব্দে পরমাণু এবং পরমাণুসমবেত পারিমাণই পারিমাণ্ডল্য বুঝিতে হইবে। দ্ব্যণুকই অণুসংজ্ঞক। তৎসমবেত পরিমাণ—অণুত্ব হ্রস্বত্ব। ত্র্যণুকাদির পরিমাণ—মহত্ব। এইরূপেই সৃষ্টি-প্রক্রিয়া চলিতেছে। এ বিষয়ে সংশয় এই যে, পরমাণু প্রভৃতি দ্বারা জগদারম্ভের সামঞ্জস্য ঘটিতে পারে না। ফলতঃ, আরম্ভবাদের মত এই যে, আত্মা অদৃষ্ট-বিশিষ্ট; সেই অদৃষ্টই আত্ম-সংযোগের হেতু। পরমাণুগত আদ্য ক্রিয়ার জন্য পরমাণু-যুগ্মের যে সংযোগ, তাহাই অদৃষ্ট-

বিশিষ্ট আত্মার সংযোগের হেতু। তাহা হইতে দ্ব্যণুকাদি উৎপন্ন। তদনুসারেই সৃষ্টির সম্ভাবনা বিহিত হয়। বলা বাহুল্য, একাদশ সূত্রে এই মতের খণ্ডন করা হইতেছে।

"অথারম্ভবাদো নিরস্যতে। তার্কিকা মন্যন্তে পার্থিবাদয়শ্চতুর্ব্বিধা পরমাণবো নিরবয়বা রূপাদিমন্তঃ পারিমাণ্ডল্য-পরিমাণাঃ প্রলয়কালেঽনারব্ধকার্য্যাস্তিষ্ঠন্তি সর্গকালে তু জীবাদৃষ্টাদিপুরঃসরাঃ সন্তঃ দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ সাবয়বং স্থূলতরং জগৎ কার্য্যমারভন্তে। তত্র দ্বয়োঃ পরমাণ্বোরদৃষ্টসাপেক্ষা ক্রিয়া তয়া সংযোগে সতি দ্ব্যণুকং হ্রস্বমুৎপদ্যতে। তত্র সমবায্যসমবায়িনিমিত্তকারণানি ক্রমাৎ পরমাণুযুগ্মতৎসংযোগ-জীবাদৃষ্টানীত্যেবমগ্রেঽপি। ততস্ত্রয়াণাং দ্ব্যণুকানাং ক্রিয়য়া সংযোগে সতি ত্র্যণুকং মহদুৎপদ্যতে। ন চ দ্বাভ্যামণুভ্যাং ত্র্যণুকারম্ভঃ কারণভূম্না কার্য্যমহত্ত্বোৎপাদনাৎ। এবং চতুর্ভিস্ত্র্যণুকৈশ্চতুরণুকং চতুরণুকৈরপরং স্থূলতরং তৈশ্চ স্থূলতরং তৈশ্চ স্থূলতমমিত্যেবং ক্রমেণ মহতী পৃথিবী মহত্য আপো মহত্তেজো মহান্ বায়ুশ্চোৎপদ্যতে। কার্য্যগতরূপাদিকন্তু স্বাশ্রয়সমবায়িকারণগতাদ্রূপাদেঃ। কারণগুণা হি কার্য্যগুণানারভন্তে। ইত্থমুৎপন্নান্ পৃথিব্যাদীনীশ্বরে সংজিহীর্ষৌ সতি পরমাণুষু ক্রিয়য়া বিভাগাৎ সংযোগনাশেন দ্ব্যণুকেষু নষ্টেষ্বাশ্রয়নাশাৎ ত্র্যণুকাদিনাশ ইতি ক্রমেণ পৃথিব্যাদের্নাশঃ। যথা পটস্য তন্তুনাশে। তদ্গতস্য রূপাদেস্তু স্বাশ্রয়নাশেনৈবেতি জগদ্বিলয় প্রকারঃ। কিঞ্চ পরমাণুরত্র পরিমণ্ডল সংজ্ঞস্তৎ সমবেতং পরিমাণং তু পারিমাণ্ডল্যমভিধীয়তে। দ্ব্যণুকমণুসংজ্ঞং তৎসমবেতং পরিমাণং ত্বণুত্বং হ্রস্বত্বঞ্চ। ত্র্যণুকাদি পরিমাণন্তু মহত্বঞ্চেতি প্রক্রিয়া। তত্র সংশয় পরমাণুভির্জগদারম্ভ সমঞ্জসো ন বেতি। তত্রাদৃষ্টবদাত্মসংযোগহেতুকং পরমাণুগতাদ্যক্রিয়াজন্যতদ্যুগ্মসংযোগারব্ধদ্ব্যণুকাদিক্রমেণ সৃষ্টেঃ সম্ভবাৎ সমঞ্জস ইতি প্রাপ্তে পরিহ্রিয়তে—'মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্॥' ১১॥"

অর্থাৎ,—'মহদ্দীর্ঘ বা হ্রস্ব পরিমণ্ডল অর্থাৎ অণু হইতে যথাক্রমে এই জগৎ উৎপন্ন—এই উক্তি সমীচীন নহে।' সূত্রের ভাষ্যে বিষয়টী এইরূপ বুঝান হইয়াছে; যথা,—

"ইহ বেতি চার্থে। পূর্ব্বতোঽসমঞ্জসমিত্যনুবর্ত্ততে। হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাং দ্ব্যণুকপরমাণুভ্যাং মহদ্দীর্ঘত্র্যণুকবত্তন্মতং সর্ব্বমসমঞ্জসম্। পরিমণ্ডলেভ্যো দ্ব্যণুকানি তেভ্যস্ত্র্যণুকানি তেভ্যশ্চতুরণুকাদিক্রমেণ পৃথিব্যাদীনামুৎপত্তিরিতিবদন্যাপি তৎপ্রক্রিয়া বিরুদ্ধেত্যর্থঃ। তথাহি নিরবয়বৈঃ পরমাণুভিঃ সাবয়বানি দ্ব্যণুকান্যারভ্যন্ত ইতি ন যুক্তম্। সাবয়বৈঃ ষড়্ভিঃ পার্শ্বৈঃ সংযুজ্যমানানাং তন্তুনামবয়বিপটারম্ভকত্বদর্শনাৎ। তস্মাৎ সপ্রদেশাঃ পরমাণবোঽঙ্গীকার্য্যাঃ। ইতরথা সহস্রপরমাণূনাং সংযোগেঽপি পারিমাণ্ডল্যানধিকপরিমাণতয়া প্রথিমানুপপত্তেরণুত্ব-হ্রস্বত্বমহত্ত্বাদ্যসিদ্ধিঃ। ন চ কারণভূমো কার্য্যমহত্ত্বোৎপাদকঃ মনঃকল্পনমাত্রত্বাৎ। তথাঙ্গীকৃতেঽপি প্রদেশভেদে তেঽপি সাংশাঃ স্বৈরংশৈস্তেঽপি পুনঃ স্বৈরিত্যনবস্থা অংশানন্ত্যসাম্যেন মেরুসর্ষপয়োস্তৌল্যপ্রসঙ্গশ্চ। তস্মান্মহদ্দীর্ঘত্র্যণুকং হ্রস্বদ্ব্যণুকোৎপন্নং হ্রস্বদ্ব্যণুকঞ্চ পরিমণ্ডলোৎপন্নমিতি রিক্তং বচঃ। ন চৈতৎ সূত্রং স্বদোষনিরাসকতয়া ব্যাখ্যেয়ম্ অস্য পাদস্য পরপক্ষাক্ষেপকত্বাৎ॥ ১১॥"

ভাষ্যের ভাবার্থ,—'এ মতে পূর্ব্বাপর অসামঞ্জস্যই সূচিত হইতেছে। হ্রস্ব-পরিমণ্ডল (দ্ব্যণুক) ও দ্ব্যণুক পরমাণু হইতে মহদ্দীর্ঘ ত্র্যণুকের উৎপত্তি প্রভৃতি মতের ন্যায় এ পক্ষের সর্ব্ববিধ মতেই অসামঞ্জস্য ঘটে। পরিমণ্ডল (পরমাণু) হইতে দ্ব্যণুক, তাহা হইতে ত্র্যণুক এবং তাহা হইতে চতুরণুকাদি ক্রমে যে পৃথিব্যাদির উৎপত্তি ঘটিয়াছে,—এরূপ সিদ্ধান্ত করিলে তৎপ্রক্রিয়া বিরুদ্ধ হয়। কেন-না, নিরবয়ব পরমাণু হইতে সাবয়ব দ্ব্যণুকাদির উৎপত্তি যুক্তিযুক্ত নহে। অবয়ববিশিষ্ট তন্তুর সংযোগেই অবয়বী পট উৎপন্ন হয়,—ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। এ হিসাবে, অবয়ববিশিষ্ট পরমাণুর বিষয় অঙ্গীকার বা স্বীকার করিয়া লইতে হয়। অন্যথা, সহস্র সহস্র পরমাণুর সংযোগেও পারিমাণ্ডল্যের (অণুর) অনধিক পরিমাণ-বিশিষ্ট পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং অণুত্ব, হ্রস্বত্ব, মহত্ত্ব প্রভৃতি অসিদ্ধ হয়। কারণ-বাহুল্য—কার্য্য-মহত্ত্ব উৎপাদক নহে। সে কেবল মনঃকল্পনা মাত্র। প্রদেশভেদ স্বীকার করিলেও অনবস্থা ঘটে। অর্থাৎ,—অংশ অংশ দ্বারা ইত্যাদি অংশেরই কল্পনা মনে আসে। এইরূপ অনন্ত অংশের সাম্য-স্থাপন করিতে যাইলে মেরু ও সর্ষপের তুল্যতা প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। এই সকল কারণে মহদ্দীর্ঘ ত্র্যণুক যে হ্রস্ব দ্ব্যণুক হইতে উৎপন্ন এবং হ্রস্ব দ্ব্যণুক যে পরিমণ্ডলোৎপন্ন,—এবম্বিধ উক্তি বাগাড়ম্বর বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এতৎপ্রসঙ্গে নিজপক্ষের দোষ নিরাস তো দূরের কথা; পরন্তু এতদ্দ্বারা পরপক্ষের আক্ষেপ বা আপত্তির কারণই প্রাপ্ত হওয়া যায়।'

এই পরমাণুবাদে আরও কত প্রকার অসামঞ্জস্য ঘটিতে পারে, অতঃপর দ্বাদশ সূত্রে সে তত্ত্ব আলোচিত হইতেছে। দ্বাদশ সূত্র; যথা,—"উভয়থাপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ॥" অর্থাৎ,—

পরমাণুবাদে অপরাপর আপত্তি।

ক্রিয়ার অভাবে পরমাণুর সংযোগ সিদ্ধ হইতে পারে না। অসংখ্য পরমাণু বিক্ষিপ্ত-ভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। কি প্রকারে তাহাদের সংযোগ সাধিত হইবে? কে সে সংযোগ-সাধনে সহায় হইবে? এ পক্ষে বিষম সমস্যা রহিয়া যাইতেছে। ভাষ্যকার সেই সমস্যার বিষয়ই উল্লেখ করিতেছেন; যথা,—

"পরমাণুক্রিয়াজন্য তৎসংযোগপূর্ব্বকদ্ব্যণুকাদিক্রমেণ তার্কিকৈর্জগদুৎপত্তিরিষ্যতে। তত্র পরমাণুক্রিয়া কিং পরমাণুগতাদৃষ্টজন্যা। কিংবাত্মগতাদৃষ্টজন্যেতি। নাদ্যঃ আত্মপুণ্যাপুণ্যজন্যাদৃষ্টস্য পরমাণুগতত্বাসম্ভবাৎ। নাপ্যন্ত্যঃ আত্মগতেন তেন পরমাণুগতক্রিয়োৎপত্ত্যসম্ভবাৎ। ন চ সংযুক্ত-সমবায়-সম্বন্ধাৎ সংভবিষ্যতি নিরবয়বানাং পরমাণূনাং নিরবয়বেনাত্মনা সংযোগানুপপত্তেঃ। তদেবমুভয়থাপি নাস্ত্যক্রিয়াজনকমদৃষ্টম্। জাড্যাচ্চ ন হ্যচেতনং চেতনানধিষ্ঠিতং স্বতঃ প্রবর্ত্ততে প্রবর্ত্তয়তি বেতি পরীক্ষিতং প্রাক্। ন চাত্মা বা তৎপ্রবর্ত্তকঃ। তদানুৎপন্ন-চৈতন্যস্য তস্যাপি তত্ত্বাৎ। ন চাদৃষ্টানুসারীশ্বরেচ্ছা তৎক্রিয়াহেতুঃ তস্যা নিত্যত্বেন নিত্যং তৎপ্রসঙ্গাৎ। ন চাদৃষ্টোদ্বোধাভাবাৎ প্রতিসর্গে তদভাবঃ তস্যাপি সামগ্রীসত্ত্বে হ্নাবশ্যকত্বাৎ। ততশ্চ নিয়তস্য কস্যচিৎ ক্রিয়াহেতোরভাবান্ন সা। পরমাণুষু তদভাবান্ন তৎসংযোগঃ। তদভাবাচ্চ ন দ্ব্যণুকাদিকমিত্যতস্তদভাবঃ সর্গাভাবঃ স্যাৎ।১২॥"

ভাষ্যের ভাবার্থ,—'জগতের উৎপত্তি বিষয়ে তার্কিকেরা বলিয়া থাকেন যে, পরমাণু-ক্রিয়ার জন্য তাহাদের যে সংযোগ, তাহা হইতে উৎপন্ন দ্ব্যণুকাদি ক্রমে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে।

কিন্তু ঐ পরমাণু-ক্রিয়া কি? উহা পরমাণুগত অদৃষ্ট জন্য অথবা আত্মগত অদৃষ্ট জন্য? আত্মগত পুণ্যাপুণ্য জন্য অদৃষ্টের পরমাণুগতত্ব আদৌ সম্ভবপর নহে। আবার সংযুক্ত-সমবায় সম্বন্ধেও উহার সম্ভাবনা নাই। কেন-না, নিরবয়ব পরমাণু-সমূহের সহিত নিরবয়ব আত্মার সংযোগ সিদ্ধ হয় না। অতএব আদ্য-ক্রিয়াজনক অদৃষ্ট উভয়ত্রই স্বীকার করা যায় না। জড়ত্ববশতঃও উহার সঙ্গতি নাই। অচেতন পদার্থ চেতন কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া কার্য্যের প্রবর্ত্তক বা কার্য্যে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয় না। এ বিষয় পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। আত্মাও প্রবর্ত্তক হইতে পারেন না। অনুৎপন্ন চৈতন্য পরমাণুর অচেতনত্বই তাহার কারণ। নিত্যত্ব হেতু অদৃষ্টানুসারী ঈশ্বরের ইচ্ছাও উহার কারণ নহে। পরমাণু অবিভাজ্য হেতু উহার ক্রিয়োৎপত্তি অসম্ভব। ক্রিয়ার অভাবে সংযোগাভাব। তাহাতে দ্ব্যণুকাদিরও অভাব; দ্ব্যণুকাদির অভাবে সৃষ্টিরও অভাব ঘটে।'

সমবায় স্বীকার করিলেও সামঞ্জস্য সাধিত হয় না। ত্রয়োদশ সূত্রে এই অসামঞ্জস্যের বিষয় পরিব্যক্ত হইয়াছে। যথা,—"সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ।" অর্থাৎ,—সমবায় স্বীকারেও সাম্য হেতু অসামঞ্জস্য ঘটে। এ সম্বন্ধে সূত্রের ভাষ্য; যথা,—

> "সমবায় স্বীকারাচ্চাসমঞ্জসং তন্মতম্। কুতঃ সাম্যাদিতি। পরমাণূনাং দ্ব্যণুকৈঃ সহ সমবায়ঃ সম্বন্ধস্তার্কিকৈরঙ্গীকৃতঃ। স খলু ন সম্ভবতি। তস্যাপি সম্বন্ধিত্ব সাম্যাৎ। তত্রাপি সমবায়াপেক্ষায়ামনবস্থাপত্তেঃ। তথাহি গুণক্রিয়াজাতিবিশিষ্ট বুদ্ধিং জনয়ন্ সমবায়স্তৈঃ সম্বন্ধ এব জনয়েদন্যথাতিপ্রসঙ্গাৎ। তথাচ সমবায়ান্তরাঙ্গীকারেঽনবস্থা। স্বরূপমেব তত্র সম্বন্ধ ইতি চেত্তর্হ্যত্রাপি স এবাস্ত কিং তেন। ন চ যুক্তঃ সোঽভ্যুপগন্তুম্। তস্য স্বরূপমাত্রতয়া সর্ব্বত্র সর্ব্বধর্ম্মপ্রাপ্তেঃ। কিঞ্চ সমবায়বাদিনাং বায়ৌ গন্ধঃ পৃথিব্যাং শব্দ আত্মনি রূপং তেজসি বুদ্ধিরিত্যাপদ্যেত। সমবায়স্যৈকত্বেন তত্তৎ সমবায়স্য তত্র সত্ত্বাৎ। ন চ তন্নিরূপিতঃ স নাস্তীতি বোধ্যং তত্তন্নিরূপিতত্বস্যাপি স্বরূপমাত্রত্বেন তস্যাপি তত্ত্বাৎ। অতিরিক্তস্য চ নিয়ত পদার্থবাদেঽসম্ভবাৎ। তস্মাদ্বিরুদ্ধস্তর্কসময়ঃ॥"

ভাষ্যের ভাবার্থ,—'সমবায়-স্বীকারেও ঐ মতে অসামঞ্জস্য ঘটে। কেন-না, তাহাতে সাম্যাদি কোথায় থাকে? পরমাণু সকলের দ্ব্যণুক-সমূহের সহিত সমবায়-সম্বন্ধ তার্কিকেরা স্বীকার করেন বটে; কিন্তু তাহা সম্ভবপর নহে। সম্বন্ধিত্বে উহার সাম্য দৃষ্ট হয়। তাহাতে সমবায়াপেক্ষায় অনবস্থাপত্তি ঘটে। সমবায় দ্বারা গুণাক্রিয়া-জাতিবিশিষ্ট বুদ্ধি উৎপন্ন হয়; আর তাহাতে সম্বন্ধ স্থাপিত করে। অন্যথা অতি-প্রসঙ্গ বা অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। সমবায়ান্তর অঙ্গীকারেও এইরূপ অনবস্থা ঘটে। উহাতে স্বরূপ-সম্বন্ধ ঘটিয়াছে বলিলে, পৃথক সমবায়-স্বীকারের হেত্বাভাব ঘটিয়া থাকে। সমবায়-অস্বীকারে স্বরূপ-সম্বন্ধ-স্বীকারে সর্ব্বত্র সর্ব্বধর্ম্মের প্রাপ্তিরূপ দোষ ঘটে। সমবায়বাদীদিগের মতে বায়ুতে গন্ধ, পৃথিবীতে শব্দ, আত্মাতে রূপ, তেজে বুদ্ধি প্রভৃতির অবস্থিতিতে আপত্তি উপস্থিত হয়। সমবায়ের একত্ব হেতু তত্তৎ সমবায়ের সত্ত্বাতেও দোষ সমুপস্থিত হইয়া থাকে। তন্নিরূপিত সমবায় তাহাতে নাই, এরূপ বুঝা যায় না। কেন-না, তত্তন্নিরূপিতত্ব স্বরূপ

মাত্র। অতএব নিরূপিতত্বের অস্তিত্ব আছে। নিয়তপদার্থবাদে অতিরিক্তের বিদ্যমানতা অসম্ভব। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এ বিষয়ে বিরুদ্ধ তর্কই ঘটিতেছে; সমবায়-স্বীকারেও * উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না।'

আরম্ভবাদ-মতের অসামঞ্জস্যের আরও বিবিধ হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ ও যোড়শ সূত্র সেই অসামঞ্জস্য-প্রদর্শনের সহায় বলিয়া ভাষ্যকার প্রমাণ করিয়াছেন। সূত্র-ত্রিতয়,—

"নিত্যমেব চ ভাবাৎ॥ ১৪॥"

"রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ॥ ১৫॥"

"উভয়থা চ দোষাৎ॥ ১৬॥"

সূত্র-ত্রিতয়ের ভাষ্য; যথা,—

"সমবায়স্য নিত্যত্বস্বীকারাত্তৎসম্বন্ধিনোঽপি জগতো নিত্যত্বপ্রসঙ্গাদসমঞ্জসং তন্মতম্॥ ১৪॥ পার্থিবাপ্যতৈজসবায়বীয়ানাং পরমাণূনাং রূপরসগন্ধস্পর্শবত্ত্বাঙ্গীকারাত্তেষু নিত্যত্বনিরবয়বত্ববিপর্য্যয়োঽনিত্যত্বসাবয়বত্বপ্রাপ্তিঃ স্যাৎ রূপাদিমতি ঘটাদৌ তথা দর্শনাদিতি স্বীকারপরিত্যাগাদসমঞ্জসং তন্মতম্॥ ১৫॥ পরমাণূনাং রূপাদ্যনঙ্গীকারে স্থূলপৃথিব্যাদেরপি তদ্ভাবাপ্তিঃ। তৎপরিজিহীর্ষয়া রূপাদ্যঙ্গীকারে তু প্রাগুক্তদোষ ইত্যুভয়থা ক্ষোদাক্ষমত্বাদসমঞ্জসং তন্মতম্॥ ১৬॥"

ভাষ্যের ভাবার্থ,—'সমবায়ের নিত্যত্ব স্বীকার অথচ তৎসম্বন্ধী জগতের অনিত্যত্ব প্রসঙ্গ,—এই বিপরীত মত হেতু পরমাণুবাদমতে অসামঞ্জস্য ঘটিতেছে। ১৪॥ পার্থিব, জলীয়, তৈজস এবং বায়বীয় পরমাণু-সমূহে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-বত্ত্ব অঙ্গীকার করিলে, উহাদের নিত্যত্ব নিরবয়বত্ব প্রভৃতি বিপর্য্যয় ঘটে। তাহাতে অনিত্যত্ব ও সাবয়বত্ব প্রাপ্তি প্রভৃতি হইয়া থাকে। রূপাদিবিশিষ্ট ঘটাদি দ্রব্যে অনিত্যত্বাদি দর্শনে একই মতের স্বীকার ও পরিত্যাগ হেতু সে মতের অসামঞ্জস্যই সপ্রমাণ হয়। ১৫॥ পরমাণুদিগের রূপাদি অনঙ্গীকারে স্থূল পৃথিব্যাদিরও তদভাব সূচিত হইয়া থাকে। এতৎপরিহারার্থ পৃথিব্যাদির রূপাদি অঙ্গীকারেও পূর্ব্বোক্ত দোষেরই আগম হইয়া থাকে। উভয়থা এবম্বিধ অপরিহার্য্য দোষ হেতু ঐ মত (বৈশেষিক মত) উপেক্ষিত হইতে পারে। ১৬॥'

এইরূপে সর্ব্বপ্রকারে আরম্ভবাদের অনুপাদেয়ত্ব প্রতিপন্নের জন্য সপ্তদশ সূত্রের অবতারণার বিষয় প্রকীর্ত্তিত হয়। সূত্রটী ও তাহার ভাষ্য যথাক্রমে নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা,—

"অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা। ১৭॥"

"কপিলাদিমতানাং কেনচিদংশেন শিষ্টৈর্ম্বাদিভিঃ পরিগ্রহাৎ কথঞ্চিদপেক্ষা স্যাৎ। অস্য তু পরমাণুকারণবাদস্য বেদবিরুদ্ধস্য তৈঃ কেনাপ্যংশেনাপরিগ্রহাদসঙ্গতেশ্চ নাত্র শ্রেয়োঽর্থিনামাপেক্ষা স্যাদিতি। ১৭॥"

অর্থাৎ,—'কপিলাদি ঋষির মত-সমূহের (সাংখ্যবাদের) কোনও কোনও অংশ মনু প্রভৃতি শিষ্ট ঋষিগণ গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং তদ্বিষয়ে কথঞ্চিৎ আস্থা স্থাপন করা যাইতে

* সমবায় সম্বন্ধ কাহাকে বলে, দর্শনশাস্ত্রে তাহার এইরূপ পরিচয় আছে; যথা,—"ঘটাদীনাং কপালাদৌ দ্রব্যেষু গুণকর্ম্মণোঃ। তেষু জাতেশ্চ সম্বন্ধ সমবায়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।"

পারে। কিন্তু পরমাণুকারণবাদ বেদবিরুদ্ধ। উহার কোনও অংশই শিষ্টজন-পরিগৃহীত নহে। সুতরাং শ্রেয়ার্থী জন কদাচ ঐ মতের অপেক্ষা করিবেন না।'

সাংখ্যবাদ ও পরমাণুবাদ নিরাস করিয়া অতঃপর বৌদ্ধমত নিরাস করা হইতেছে। ভাষ্যকার প্রথমে বৌদ্ধমতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতেছেন। বুদ্ধমুনির বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক অভিধেয় চারিটী শিষ্য-সম্প্রদায়। বৈভাষিকগণ বলেন,—'বাহ্য সকল পদার্থই প্রত্যক্ষগোচর।' সৌত্রান্তিক-গণের মতে—'বুদ্ধিবৈচিত্র্য-হেতু সর্ব্ববিষয় অনুমেয়।' যোগাচারগণ বলেন,—'সকলই অর্থশূন্য অসৎ। জ্ঞানই একমাত্র পরমার্থ ও সৎপদার্থ। বাহ্যবস্তু স্বপ্নতুল্য অসত্য।' মাধ্যমিকগণের মতে—'সকলই শূন্যময়।' স্থূলতঃ, এই সকলই বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের মত। সে মতে আরও প্রকাশ,—'ভাব পদার্থ সর্ব্বত্রই ক্ষণিক। তাহাদের মধ্যে ভূত-ভৌতিক এবং চিত্ত-চৈত্ত্য—এই দ্বিবিধ, সমুদায় বলিয়া স্বীকৃত। রূপ, বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার আখ্যায় পঞ্চ স্কন্ধ তাঁহারা স্বীকার করেন। খর, স্নেহ, উষ্ণ, চলন—এই চতুর্ব্বিধ স্বভাব—চতুর্ব্বিধ পার্থিব পরমাণু। ইহারাই পৃথিব্যাদি ভূত-চতুষ্টয়ে পরিণত হয়। সেই ভূতচতুষ্টয়ই দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয় রূপে প্রকাশমান। ভূত-ভৌতিক আত্মার রূপ-স্কন্ধ বাহ্য-পদার্থ। বিজ্ঞান-স্কন্ধ—অহংপ্রত্যয়-সমারূঢ় জ্ঞান-সমূহ। আত্মাই কর্ত্তা ও ভোক্তা। বেদনা-স্কন্ধ বলিতে সুখ-বেদনা ও দুঃখ-বেদনা বুঝায়। দেবদত্তাদি নামই—সংজ্ঞাস্কন্ধ। রাগ-দ্বেষ-মোহাদি চিত্তধর্ম্ম সংস্কার-স্কন্ধ। এই চারি স্কন্ধ সাধারণতঃ 'চিত্তচৈত্তিক' নামে অভিহিত হয়. সর্ব্বব্যবহারাস্পদ-স্বরূপ উহারা অন্তরে লীন থাকে। অতএব অন্তরের বিষয় সমুদায়ই চতুস্কন্ধীরূপ। এই সমুদায়-দ্বয়ই অশেষ জগৎ। এতদতিরিক্ত আকাশাদি অবস্তু মধ্যে গণ্য।' এইরূপে সংক্ষেপে বৌদ্ধ-মতের পরিচয় দিয়া ভাষ্যকার সংশয় উত্থাপন করিয়াছেন,—'এ কল্পনা কি যুক্তিযুক্ত?' এইরূপে জগদুৎপত্তির কল্পনা যে যুক্তিযুক্ত নহে, অষ্টাদশ সূত্রে তাহারই খণ্ডন করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ভাষ্যকারের উক্তি ও সূত্র; যথা,—

বৌদ্ধমত খণ্ডন।

"ইদানীং বুদ্ধমতং নিরাক্রিয়তে। তত্র বুদ্ধমুনের্বৈভাষিক-সৌত্রান্তিকযোগাচার-মাধ্যমিকাখ্যাশ্চত্বারঃ শিষ্যাঃ। তেষু বাহ্যঃ সর্ব্বোঽপ্যর্থ প্রত্যক্ষ ইতি বৈভাষিকঃ। বুদ্ধিবৈচিত্র্যাদর্থোঽনুমেয় ইতি সৌত্রান্তিকঃ। অর্থশূন্যং বিজ্ঞানমেব পরার্থ সৎ বাহ্যার্থস্তু স্বাপ্নতুল্য ইতি যোগাচারঃ। সর্ব্বং শূন্যমিতি মাধ্যমিকঃ। ইত্যেবং তে মতানি ব্রুবঃ। ভাবপদার্থঃ সর্ব্বত্র ক্ষণিকঃ। তত্রাদৌ ভূতভৌতিকশ্চিত্ত-চৈত্যশ্চেতি সমুদায় দ্বয়ং মন্যেতে। তথাহি রূপবিজ্ঞান-বেদনাসংজ্ঞাসংস্কারাখ্যাঃ পঞ্চস্কন্ধাঃ ভবন্তি। তেষু খরস্নেহোষ্ণচলনস্বভাবাঃ পার্থিবাদয়শ্চতুর্ব্বিধাঃ পরমাণবঃ পৃথিব্যাদিভূতচতুষ্টয়রূপেণ সংহন্যন্তে। তচ্চতুষ্টয়ঞ্চ দেহেন্দ্রিয়বিষয়রূপেণেতি স এষ ভূতভৌতিকাত্মা রূপস্কন্ধো বাহ্যসমুদায়ঃ। অহংপ্রত্যয়সমারূঢ়ো জ্ঞানসন্তানো বিজ্ঞান-স্কন্ধঃ। স এব কর্ত্তা ভোক্তা চাত্মা। সুখবেদনা দুঃখবেদনাচ বেদনাস্কন্ধঃ। দেবদত্তাদি নামধেয়ং সংজ্ঞাস্কন্ধঃ। রাগদ্বেষমোহাদিশ্চৈতসিকো ধর্ম্মঃ সংস্কার-স্কন্ধঃ। ত এতে চত্বারঃ স্কন্ধাশ্চিত্তচৈত্তিকাঃ কথ্যন্তে। সর্ব্বব্যবহারাস্পদত্বেন

চান্তঃ সংহন্যন্তে। তদয়মান্তরঃ সমুদায়শ্চতুস্কন্ধীরূপঃ। ইদমেব সমুদায়দ্বয়মশেষং জগৎ। এতদন্যদাকাশাদিকমবস্তুভূতমিতি। অত্র সংশয়। এষা সমুদায়দ্বয়কল্পনা যুক্তা ন বেতি। এতেনৈব জগদ্ব্যবহারোপপত্তের্যুক্তেতি প্রাপ্তে প্রতিবিধত্তে—

"সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ॥ ১৮॥"

অর্থাৎ,—'উভয়-সমুদায়কে জগতের হেতু স্বীকার করিলেও তাহার অপ্রাপ্তি অর্থাৎ অসিদ্ধি ঘটে। এরূপ ক্ষেত্রে সমুদায়ী-সমূহের অচেতনত্ব এবং তদতিরিক্ত স্থির-চেতনের সংঘাতাভাব ঘটিতেছে। সুতরাং ঐরূপ যুক্তি অসিদ্ধ। সর্ব্বত্রই ভাব-ক্ষণিকত্ব অঙ্গীকৃত। স্বতঃপ্রবৃত্তি স্বীকার করিলেও তৎসাতত্য-প্রসঙ্গ ঘটে; অর্থাৎ, সতের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিতে হয়। অতএব মূল কল্পনা অযৌক্তিক প্রতিপন্ন হইতেছে।'

ভাষ্যের ভাষায় সূত্রটী এইরূপ বুঝান হইয়াছে; যথা—

"যোঽয়মুভয়সংঘাতহেতুক উভয়বিধঃ সমুদায়ো নিরূপিতস্তস্মিন্ স্বীকৃতেঽপি তদপ্রাপ্তির্জগদাত্মকসমুদায়াসিদ্ধিঃ। সমুদায়িনামচেতনত্বাদন্যস্য চ সংহন্তুঃ স্থিরচেতনস্যাভাবাৎ। স চ ভাবক্ষণিকত্বাঙ্গীকারাৎ। স্বতঃপ্রবৃত্ত্যুরীকৃতৌ তৎসাতত্যপ্রসঙ্গ। তস্মাদযুক্তা তৎকল্পনা॥ ১৮॥"

পূর্ব্বোক্ত উভয় সংঘাত হেতু যে উভয়বিধ সমুদায় নিরূপিত হয়, তাহা স্বীকার করিলেও তাহার অপ্রাপ্তি-বশতঃ জগদাত্মক সমুদায়ের অসিদ্ধি ঘটে। সমুদায়-সমূহের অচেতনত্ব এবং তদতিরিক্ত স্থির-চেতনের সংঘাতাভাব-বশতঃ ঐ দোষ ঘটে। কেন-না, বৌদ্ধমতে সর্ব্বত্রই ভাবক্ষণিক স্বীকার করা হইয়াছে, দেখিতে পাই। স্বতঃ-প্রবৃত্তির বিষয় স্বীকার করিলেও তৎসাতত্য-প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। অতএব ঐরূপ কল্পনা যুক্তিযুক্ত নহে।

এ ক্ষেত্রে আরও কয়েকটী কথা উঠিতে পারে। অবিদ্যাদিকেই সংঘাত-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যাইতে পারে। কিন্তু ভাষ্যকার সে আপত্তিরও খণ্ডন করিতেছেন। প্রথমে পূর্ব্বপক্ষরূপে বৌদ্ধপক্ষের যুক্তি এবং উত্তরে বেদান্ত-সূত্র (১৯শ সূত্র) ও তাহার ভাষ্য এ পক্ষে প্রমাণ-স্বরূপ পরিগৃহীত হইতে পারে। বৌদ্ধমতের স্বপক্ষে যুক্তি—

"নন্বু সৌগতসময়ে বিদ্যাদয়ো মিথো হেতুফলভাবমাপন্নাঃ স্বীক্রীয়ন্তে অপ্রত্যাখ্যেয়াশ্চ তে সর্ব্বেষাং তেষু চ মিথস্তথাভাবেন ঘটীযন্ত্রবৎ সন্ততমাবর্ত্তমানেষর্থাক্ষিপ্তঃ সঙ্ঘাতস্তমন্তরেণৈষামসিদ্ধেঃ। তে চাবিদ্যা সংস্কারো বিজ্ঞানং নামরূপং ষড়ায়তনং স্পর্শো বেদনা তৃষ্ণোপাদানং ভবো জাতির্জরামরণং শোকঃ পরিবেদনা দুঃখং দুর্ম্মনস্তা চেতি।"

অর্থাৎ,—'কেহ বলিতে পারেন, সৌগতসময়ে (বৌদ্ধমতে) অবিদ্যাদি হেতুফলভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই মত স্বীকার করিলেও উহা কেহ প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না। কেন-না, হেতুফলভাবে ঘটীযন্ত্রবৎ সন্ততঃ আবর্ত্তমান পদার্থের সংঘাত ঘটে; আর তদ্দ্বারাই আক্ষিপ্ত হয়। সংঘাত ভিন্ন অবিদ্যা প্রভৃতি অসিদ্ধ। অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নাম, রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, জরা, মরণ, শোক, পরিবেদনা, দুঃখ, দুর্ম্মনস্ত—এইগুলিই সংঘাত।' ফলতঃ, অবিদ্যাদির সংঘাত-হেতু জগদ্ব্যাপার সাধিত হয়,—ইহাই স্থূল মর্ম্ম।

কিন্তু উহাতেও যুক্তি-বৈষম্য রহিয়া যায়। উনবিংশ সূত্রে সে বৈষম্য প্রদর্শিত হইয়াছে। ইতরেতর অবিদ্যাদির প্রত্যয়ত্ব (হেতু) নিবন্ধন যে উৎপত্তি (সংঘাত) ঘটিতেছে, তাহা স্বীকার করা যায় না। সূত্র ও তাহার ভাষ্য অভিনিবেশ-সহকারে অধ্যয়ন করিলেই এতদ্বিষয়ক অযৌক্তিকতা সম্যক উপলব্ধি হইবে। সূত্র ও ভাষ্য; যথা,—

"ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ॥ ১৯॥"

"প্রত্যয়শব্দো হেতুবাচী। অবিদ্যাদীনাং পরস্পরহেতুত্বাদুপপন্নঃ সঙ্ঘাত ইতি তদুক্তং তন্ন। কুতঃ উৎপত্তীতি। তেষাং পূর্ব্বপূর্ব্বমুত্তরোত্তরস্যোৎপত্তিমাত্রং প্রতিনিমিত্তং স্যান্ন তু সঙ্ঘাতং প্রতি কিঞ্চিৎ তদস্তীতি। কিঞ্চ ভোগার্থং সঙ্ঘাতঃ। ন চ ক্ষণিকেষ্বাত্মসু ভোগঃ সম্ভবতি। তদ্ধেতোর্ধর্ম্মাধর্ম্মাদেস্তৈঃ পূর্ব্বমসম্পাদনাৎ। ন চ তৎসন্তানেন স সম্পাদিতঃ। তস্য স্থায়িত্বে সর্ব্বক্ষণিকত্বপ্রতিজ্ঞাব্যাকোপাৎ। ক্ষণিকত্বে প্রাগুক্তদোষানতিবৃত্তেঃ। তস্মাদসঙ্গতঃ সৌগতসময়ঃ॥ ১৯॥"

ভাষ্যের ভাবার্থ,—'প্রত্যয় শব্দ হেত্বর্থজ্ঞাপক। অবিদ্যা প্রভৃতির পরস্পর হেতুত্ব-বশতঃ উপপন্ন যে সংঘাতের বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে। কিরূপে তাহা উৎপন্ন হইতে পারে? তাহাদিগের পূর্ব্ব পূর্ব্ব ও উত্তরোত্তর উৎপত্তি মাত্রের প্রতিনিমিত্ত হইতে পারে না। সংঘাতেরও প্রতিনিমিত্ততা থাকিতে পারে না। যেহেতু, ভোগের জন্যই সংঘাত হইয়া থাকে। কিন্তু ক্ষণিক যে আত্মা, তাহাতে ভোগ সম্ভবপর নহে। ভোগ-হেতুক ধর্ম্মাধর্ম্মাদির পূর্ব্বে অসম্পাদন জন্য ভোগের সম্ভাবনা থাকে না। আত্ম-সন্তানের (নিত্যত্বহেতু) দ্বারা তাহাদের (ধর্ম্মাধর্ম্মাদির) উৎপত্তিও সম্পন্ন হয় না। কেন-না, তাহার স্থায়িত্বে সর্ব্বক্ষণিত্ব-প্রতিজ্ঞায় ব্যাঘাত জন্মে। সুতরাং ক্ষণিকত্বে প্রাগুক্ত দোষ অবশ্যম্ভাবী হয়। এই সকল কারণে সৌগতমত অসঙ্গত বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে।'

অবিদ্যাদির পারম্পারিক হেতুত্বেও দোষ দৃষ্ট হয়। বিংশ সূত্রে ভাষ্যকার সেই দোষ প্রদর্শন করিতেছেন। ভাষ্যকারের উক্তি ও বেদান্ত-দর্শনের সূত্র নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে;—

"ইদানীমবিদ্যাদীনাং মিথো হেতুত্বং দূষয়তি।
'উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ॥' ২০॥"

অর্থাৎ,—'উত্তরোৎপাদে পূর্ব্ব-কারণের নিরোধ ঘটে।' এ সম্বন্ধে সূত্রের ভাষ্য; যথা,—

"নেত্যনুবর্ত্ততে। ক্ষণভঙ্গবাদিনো মন্যন্তে উত্তরস্মিন্ ক্ষণে উৎপদ্যমানে-পূর্ব্বঃ ক্ষণো নিরুধ্যেত ইতি। উত্তরক্ষণবর্ত্তিনি কার্য্যে জায়মানে সতি পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তিকারণং বিনশ্যতীতি তদর্থঃ। ন চৈবমুরীকুর্ব্বতাবিদ্যাদীনাং মিথো হেতুহেতুমদ্ভাবঃ শক্যো বিধাতুং নিরুদ্ধস্য পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তিনো নিরুপাখ্যত্বে-নোত্তরক্ষণবর্ত্তিহেতুতানুপপত্তেঃ। কারণং হি কার্য্যানুস্যূতং দৃষ্টম্। ২০॥"

ভাষ্যের ভাবার্থ,—'এখানেও পূর্ব্ব সূত্রের ন (নহে) অনুবর্ত্তন উপলব্ধি হইতেছে। ক্ষণভঙ্গবাদীদের মত এই যে, উত্তরকালে উৎপাদ্যমান অর্থাৎ সঞ্জাত পূর্ব্বক্ষণ নিরোধ হয়। উত্তর-ক্ষণবর্ত্তী কার্য্যের উৎপত্তি হেতু পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তী কারণ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ইহাই মর্ম্মার্থ। কিন্তু এতদ্দ্বারা অবিদ্যাদির পরস্পর হেতুহেতুমদ্ভাবের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ

হওয়া যায় না। পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তী নিরুদ্ধ কারণের নিরুপাখ্যত্ব (অসত্ত্ব) উত্তরক্ষণবর্ত্তী হেতুতার অনুপপত্তির কারণ বলিয়া মনে হয়। কারণই কার্য্যমাত্রে অনস্যূত দেখিতে পাই।'

বৌদ্ধমতাবলম্বীরা অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি কল্পনা করেন। বীজের অনুপমর্দ্দনে (অর্থাৎ নিষ্পীড়ন ভিন্ন) অঙ্কুর প্রাদুর্ভূত হয়,—ইহাই তাঁহাদের হেতুবাদ। একবিংশ সূত্রে বৌদ্ধদিগের সেই মত খণ্ডিত হইয়াছে। এ বিষয়ে ভাষ্যকারের উক্তি, সূত্র ও তদ্ভাষ্য নিম্নে প্রকটন করা যাইতেছে; যথা,—

"অসতঃ সদুৎপত্তিং তে মন্যন্তে। নানুপমর্দ্দ্য প্রাদুর্ভাবাদিতি। তাং দূষয়তি।

'অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যৌগপদ্যমন্যথা॥' ২১॥"

"অসত্যুপাদানে চেৎ কার্য্যং তদা স্কন্ধহেতুকা সমুদায়োৎপত্তিরিতি প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গঃ। সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বং চোৎপদ্যেত উৎপন্নঞ্চাসৎ। অন্যথোপাদানাচ্চেৎ কার্য্যং তর্হি যৌগপদ্যং কার্য্যকারণয়োঃ সহাবস্থিতিঃ স্যাৎ কার্য্যানুস্যূতস্যো-পাদানত্বাৎ। তথাচ ভাবক্ষণিকত্বমতভঙ্গঃ। তস্মান্নাসতঃ তদুৎপত্তিঃ॥ ২১॥"

ভাষ্যের ভাবার্থ,—'উপাদানের অবিদ্যমানে যদি কার্য্যোৎপত্তি সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে স্কন্ধহেতুক সমুদায় উৎপত্তি এই যে প্রতিজ্ঞা, ইহা ভঙ্গ হইয়া যায়। তাহা হইলে (উপাদান ভিন্ন বস্তু উৎপন্ন হইলে) সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্ববস্তু উৎপন্ন হইতে পারে। অসৎ হইতে অসতেরই উপপত্তি ঘটে। উপাদান—কার্য্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। কার্য্যানুস্যূত উপাদান যদি অসৎ না হইয়া সৎ হইত, তাহা হইলে কার্য্য ও উপাদান সমভাবে সর্ব্বদা অবস্থান করিত। তাহাতে ভাবক্ষণিকত্ব মতের অসিদ্ধতা সপ্রমাণ হইত। এই সকল কারণে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি কদাচ স্বীকার করা যায় না।'

বৌদ্ধমতাবলম্বিগণের মতে দীপনির্ব্বাণের ন্যায় ঘটাদির নাশ স্বীকার করা হয়। দ্বাবিংশ সূত্রে সে মতের দোষ খ্যাপন করা হইতেছে। এ বিষয়ে প্রথমে ভাষ্যকারের মন্তব্য, সূত্র এবং পরিশেষে সেই সূত্রের ভাষ্য নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে; যথা—

"দীপস্যেব ঘটাদের্নিরন্বয়ং বিনাশং মন্যন্তে। তং দূষয়তি।

'প্রতিসংখ্যাপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ॥' ২২॥"

"ভাবানাং ধীপূর্ব্বকো ধ্বংস প্রতিসংখ্যানিরোধঃ। তদ্বিলক্ষণস্ত্বপ্রতিসংখ্যা-নিরোধঃ। আবরণাভাবমাত্রমাকাশম্। এতত্রয়ং নিরুপাখ্যং শূন্যমিতিযাবৎ। তদন্যৎ সর্ব্বং ক্ষণিকম্। যদুক্তম্। বুদ্ধিবোধ্যং ত্রয়াদন্যৎ সংস্কৃতং ক্ষণিকং চেতি। তত্রাকাশং পরত্র নিরাকরিষ্যতি। নিরোধৌ তাবন্নিরাকরোতি প্রতিসংখ্যেতি। এতয়োর্নিরোধয়োরপ্রাপ্তিরসম্ভবঃ স্যাৎ। কুতঃ অবিচ্ছেদাৎ। সতো নিরন্বয়-বিনাশাভাবাৎ। অবস্থান্তরাপত্তিরেব সতো দ্রব্যস্যোৎপত্তির্বিনাশশ্চ। অবস্থাশ্রয়ো দ্রব্যং ত্বেকং স্থায়ীতি ন চ দীপনাশস্য নিরন্বয়ত্ববীক্ষণাদন্যত্রাপি তথাস্থিতি বাচ্যম্ অবস্থান্তরাপত্তেরেবান্যত্র নাশত্বে নিশ্চিতে দীপেঽপি তস্যা এব তত্ত্বেন নিশ্চেয়-ত্বাৎ। অনুপলব্ধস্ত্বতিসৌক্ষ্ম্যাদেব। সদ্বস্তুনো নিরন্বয়শ্চেদ্বিনাশস্তর্হি ক্ষণানন্তরং বিশ্বং নিরুপাখ্যং পদ্যেতস্যঞ্চ ন ভবের্ন চৈবমস্তি। তস্মাদনুপপন্ন সঃ॥ ২২॥"

অর্থাৎ,—'বুদ্ধিপূর্ব্বক ভাবসমূহের ধ্বংস-সাধনের নাম—প্রতিসংখ্যানিরোধ। তদ্বৈলক্ষণ্যই অপ্রতিসংখ্যানিরোধ। আবরণাভাবমাত্র বলিতে আকাশকে বুঝায়। এই তিনটীই নিরুপাখ্য শূন্য বলিয়া অভিহিত হয়। এতদ্ভিন্ন অন্য সকলই ক্ষণিক নামে পরিচিত। কথিত হয়, তিনটী ভিন্ন অন্য সকল পদার্থ বুদ্ধিবোদ্ধ্য, সংস্কৃত ও ক্ষণিক। আকাশের বিষয় পরে নিরাকৃত হইবে। এক্ষণে নিরোধদ্বয়ের বিষয়ই নিরাকরণ করা যাইতেছে। নিরোধদ্বয়ের অপ্রাপ্তি বা অসম্ভবের কারণ—অবিচ্ছেদ এবং সদ্বস্তুর নিরন্বয়বিনাশাভাব। অবস্থান্তরাপত্তি—সৎদ্রব্যের উৎপত্তি ও বিনাশ। অবস্থাত্রয়েও দ্রব্যের স্থায়িত্ব। দীপনাশে নিরন্বয়ত্ব (শূন্যত্ব) দর্শনে অন্যত্র ঐ ভাব মনে আসিতে পারে না। অবস্থান্তরাপত্তি নাশরূপে নিশ্চিত হইলে, দীপেও অবস্থান্তরাপত্তিরই নিশ্চয় করিতে হয়। অতি-সূক্ষ্মত্ব-নিবন্ধন উহা উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। সদ্বস্তুর বিনাশ যদি নিরন্বয় বা শূন্যত্ব হইত, তাহা হইলে ক্ষণান্তরে বিশ্বকে নিরুপাখ্য (শূন্য) দেখিতে হইত এবং কাহারও নিজের অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইত না। এই সকল কারণে এই মত মান্য করা যাইতে পারে না। এইরূপে বুঝা যায়, এ মত অপ্রামাণ্য।'

অনন্তর বৌদ্ধ-মতানুগত মুক্তি-সম্বন্ধে দোষ প্রদর্শন করা হইতেছে। ত্রয়োবিংশ সূত্র ও তাহার ভাষ্য তদর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। সূত্র ও তাহার ভাষ্য যথাক্রমে; যথা,—

"অথ তদভিমতাং মুক্তিং দূষয়তি।

'উভয়থা চ দোষাৎ ॥' ২৩ ॥"

"ত্রিষু মণ্ডূকপ্লুত্যা নেত্যনুবর্ত্ততে। যোঽয়ং সংসারহেতোরবিদ্যাদের্নিরোধো বৌদ্ধৈর্মোক্ষোঽভিমতঃ। স কিং সাক্ষাত্তত্ত্বজ্ঞানাৎ স্যাৎ স্বয়মেব বা। নাদ্যঃ নির্হেতুকবিনাশস্বীকারবৈয়র্থ্যাৎ নেতরঃ। সাধনোপদেশনৈরর্থক্যাদিত্যুভয়থাপি বিচারাসহত্বাত্তদভিমতো মোক্ষোঽপি ন সিধ্যতি ॥ ২৩ ॥"

অর্থাৎ,—'মণ্ডূকপ্লুতি অনুসারে পর্য্যায়ক্রমে তিনটী সূত্রে ন (নহে) ভাব অনুবর্ত্তিত হইয়াছে। বৌদ্ধগণ সংসার-হেতুভূত অবিদ্যার নিরোধকে মোক্ষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। কিন্তু সে মোক্ষ কি প্রকারে উৎপন্ন হয়? তাহা তত্ত্বজ্ঞানোৎপন্ন?—না, স্বয়ং উৎপন্ন! তত্ত্বজ্ঞান-জনিত নহে। কেন-না, তাহা হইলে নির্হেতুক বিনাশ (অপ্রতিসংখ্যানিরোধ) বিফল হইয়া যায়। স্বয়ং-উৎপন্নও উহাকে বলা যাইতে পারে না। আপনা-আপনি মোক্ষলাভ হইয়াছে স্বীকার করিলে, সাধনোপদেশাদি বৃথাই প্রযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এই প্রকারে উভয় মতই বিচারে দাঁড়াইতে পারে না। সুতরাং বৌদ্ধাভিমত মোক্ষও অসিদ্ধ হয়।'

অন্য দিকে আবার আকাশাদির যে শূন্যতা (নিরুপাখ্যত্ব) কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাও যুক্তির উপর দাঁড়াইতে পারে না। এ বিষয়ে ভাষ্যকারের উক্তি, চতুর্ব্বিংশ সূত্র এবং তাহার ভাষ্য নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা,—

"অথাকাশস্য নিরুপাখ্যত্বং নিরস্যতে।

'আকাশে চাবিশেষাৎ ॥' ২৪ ॥"

"আকাশে বা নিরুপাখ্যতাভিমতা সা ন সম্ভবতি। কুতঃ অবিশেষাৎ। ইহ

শ্যেন উৎপততীতি প্রতীত্যা তত্রাপি পৃথিব্যাদিবদ্ভাবরূপত্বাৎ গন্ধাদিগুণানাং পৃথিব্যাদি বস্ত্বাশ্রয়ত্বদর্শনাচ্ছব্দ গুণস্যাপ্যাকাশো বস্তুভূত এবাশ্রয় ইত্যনুমানাচ্চ। বায়ুরাকাশসংশ্রয় ইতি শ্রুত্যুক্ত্যসঙ্গতেশ্চ। অপি চ আবরণাভাবমাত্রমাকাশমিতি ন শক্যং বক্তুং ক্ষোদাক্ষমত্বাৎ। তথাহি ন তাবৎ প্রাগভাবাদিত্রয়মাকাশঃ। পৃথিব্যাদেরাবরণস্য সত্ত্বেন তদপ্রতীতিপ্রসঙ্গাৎ বিশ্বং নিরাকাশং স্যাৎ। আকাশস্য সত্ত্বেন পৃথিব্যাদ্যপ্রতীতিপ্রসঙ্গাচ্চ। নাপ্যন্যোন্যাভাবঃ তস্য তত্বদাবরণ গতত্বেন তন্মধ্যাকাশাপ্রতীতিপ্রসঙ্গাদিতি যৎকিঞ্চিদেতৎ। যত্রাবরণভাবস্তদাকাশমিতি চেত্তর্হি বস্তুভূতমেব তৎ আবরণাভাবেন বিশেষিতত্বাৎ। তস্মাৎ পৃথিব্যাদিবদ্ভাবভূতমেবাকাশং ন তু নিরুপাখ্যম্॥ ২৪॥"

অর্থাৎ,—'আকাশের নিরুপাখ্যতার (শূন্যতার) বিষয় অনুমান করা হইয়াছে। কিন্তু উহা সম্ভবপর নহে। অবিশেষ-বশতঃই সেই অসম্ভবতা খ্যাপন করা যাইতে পারে। আকাশে শ্যেন পক্ষী উড্ডীয়মান—এই যে প্রতীতি, এতদ্দ্বারা আকাশেও পৃথিব্যাদিবৎ ভাবরূপত্ব অনুভূত হয়। অপিচ, গন্ধাদি গুণসমূহ পৃথিব্যাদি বস্তুর আশ্রয় দেখিয়া এবং শব্দগুণ আকাশের আশ্রয় জানিয়া, অধিকন্তু বায়ু আকাশের সহিত সংশ্রিত এবম্প্রকার উক্তি অসঙ্গত হয় বলিয়া, পৃথিব্যাদির সহিত আকাশের বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না; সুতরাং আকাশকে শূন্য বলা যাইতে পারে না। অপিচ, আবরণাভাব মাত্র আকাশ—এরূপ উক্তিও যুক্তিযুক্ত নহে; কেন-না, আকাশকে প্রাগভাবাদি অভাবত্রয়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। পৃথিব্যাদির আবরণের সত্ত্বা উপলব্ধি হয়। তাহার অপ্রতীতি প্রসঙ্গ হেতু (অভাব বশতঃ) বিশ্ব নিরাকাশ হয়। এদিকে আবার আকাশের সত্তার বিষয় অঙ্গীকার করিলে সদ্বস্তুর অপ্রতীতিবৎ পৃথিব্যাদিরও অপ্রতীতি প্রতিপন্ন হয়। উহাকে (আবরণাভাব রূপ আকাশকে) অন্যোন্যাভাবও মনে করা যাইতে পারে না। অন্যোন্যাভাব আবরণেরই অন্তর্গত। তাহা স্বীকার করিলে পৃথিবী-মধ্যগত আকাশের অপ্রতীতি-প্রসঙ্গ দোষ ঘটে। এ পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। যেখানে আবরণের অভাব, সেখানে যদি আকাশের কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে তাহাতে আকাশের বস্তুভূতত্ব স্বীকার করিতে হয়। তদনুসারে আকাশ যে আবরণাভাবরূপ একটী বস্তু, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। এইরূপে আকাশ অভাবভূত পদার্থ না হইয়া পৃথিব্যাদির ন্যায় ভাবভূত পদার্থই সপ্রমাণ হইয়া যায়। সে হিসাবে আকাশকে কখনই নিরুপাখ্য বা শূন্য বলা যাইতে পারে না।'

যে ক্ষণিকবাদ লইয়া গবেষণার অবধি নাই, পঞ্চবিংশ সূত্রের অনুসরণে সে ক্ষণিকবাদেও দোষ প্রদর্শিত হইতেছে। এ বিষয়ে ভাষ্যকারের উক্তি, বেদান্ত-দর্শনের সূত্র ও তাহার ভাষ্য পর্য্যায়ক্রমে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। যথা,—

"অথ ভাবস্য ক্ষণিকত্বং দূষয়তি।

'অনুস্মৃতেশ্চ॥' ২৫॥"

"পূর্ব্বানুভূতবস্তুবিষয়া ধীরনুস্মৃতিঃ। প্রত্যভিজ্ঞেতি যাবৎ। সমস্তং বস্তু তদেবেদমিতি পূর্ব্বানুভূতমনুসন্ধীয়তেঽতঃ ক্ষণিকত্বং ভাবস্য ন। ন চ সেয়ং গঙ্গা

তদিদং দীপার্চ্চিরিতিবৎ সাদৃশ্যনিবন্ধনা ন তু বস্ত্বৈক্যনিবন্ধনা সেতি বাচ্যং সাদৃশ্যগ্রহীতুরেকস্য স্থায়িনো ভাবেন তদযোগাৎ। কিঞ্চ বাহ্যে বস্তুনি কদাচিৎ সংশয়ঃ স্যাত্তদেবেদং তৎসদৃশং বেতি। আত্মনি তুপলব্ধরি ন কদাচিৎ অন্যানুভূতেঽন্যস্মৃত্যসম্ভবাৎ। ন চ সন্তানৈক্যং নিয়ামকং স্থায়িসন্তানস্বীকারে স এব স্থির আত্মেতি মতান্তরাপত্তেঃ। অস্বীকারেঽন্যস্মৃত্যসিদ্ধেঃ। অপি চ কিং নাম ক্ষণিকত্বম্। কিং ক্ষণসম্বন্ধঃ কিং বা ক্ষণেনৈবোৎপত্তিবিনাশৌ। ন তাবদাদ্যঃস্থায়িনঃ ক্ষণসম্বন্ধসত্ত্বাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ প্রত্যক্ষবাধাৎ। এতেন দৃষ্টিসৃষ্টিরপি নিরাকৃতা। অত্রাপ্যর্থাৎ ক্ষণিকত্ব স্বীকারাৎ। তস্মান্ন ক্ষণিকো ভাবঃ॥ ২৫ ॥"

ভাষ্যের ভাবার্থ,—'অনুস্মৃতি বলিতে পূর্ব্বানুভূত বস্তু-বিষয়িণী ধী (বুদ্ধি) বুঝিতে হইবে। ঐ শব্দে প্রত্যভিজ্ঞা বুঝায়। সমস্ত বস্তু পূর্ব্বানুভূত—এই জ্ঞানে যে পূর্ব্বানুভূতত্ব ভাব আসে, তাহাতে ক্ষণিক ভাব ব্যর্থ হয়। এই সেই গঙ্গা, ঐ সেই দীপশিখা ইত্যাদি প্রতীতি সাদৃশ্য-নিবন্ধনা, পরন্তু ঐক্য-নিবন্ধনা নহে—এরূপ কথনই সিদ্ধান্ত হয় না। স্থায়িভাব ভিন্ন সাদৃশ্য-গ্রহীতার পূর্ব্বানুস্মৃতি জন্মে না। বাহ্য-বস্তুতে কথনও কথনও সংশয় হইলেও হইতে পারে; ইহা কি সেই বস্তু বা ইহা তৎসদৃশ বস্তু—এরূপ সংশয় বস্তুবিশেষে ঘটিতে পারে। কিন্তু উপলব্ধি-কর্ত্তার আত্মাতে সে সংশয় সম্ভবপর নহে। অন্যোন্যভূত পদার্থে অন্যের অনুস্মৃতি অসম্ভব হইতে পারে। কিন্তু সন্তানৈক্যই (জ্ঞানধারার একতাই) যে বুদ্ধিনিয়ামক হইবে, তাহা বলা যায় না। জ্ঞানধারার স্থায়িত্ব-স্বীকারে আত্মার স্থিরত্ব উপপত্তি হয়। কিন্তু স্থির আত্মা বৌদ্ধগণ অস্বীকার করেন। অস্বীকারের স্মরণই অসিদ্ধ। ক্ষণিকত্বই বা কাহাকে কহে? ক্ষণসম্বন্ধ-হেতু ক্ষণিক অথবা ক্ষণে উৎপত্তি-বিনাশের নামই ক্ষণিক। ক্ষণিক-সম্বন্ধ-হেতু ক্ষণিক সংজ্ঞা সঙ্গত হয় না। কেন-না, স্থায়িবস্তুও ক্ষণ-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হয়। আবার, ক্ষণে উৎপত্তি ক্ষণে বিলয় হেতু ক্ষণিক সংজ্ঞা—এবম্বিধ দ্বিতীয় সিদ্ধান্তও অসঙ্গত। উহাতে প্রত্যক্ষের বাধা জন্মে। ইহাতে দৃষ্টিসৃষ্টিও নিরাকৃত হয়। সে মতে ক্ষণিকত্ব স্বীকার অর্থতঃ নামে মাত্র দেখিতে পাই। এই সকল কারণে ক্ষণিকভাব যুক্তিতে তিষ্ঠিতে পারে না।'

ইহার পর সৌত্রান্তিকগণের একটী বিশেষ মত খণ্ডন করা হইতেছে। সে মত এই যে, জ্ঞানে পীতাদি বর্ণ ও আকার সমর্পিত হইলে, সেই জ্ঞানগত আকার পদার্থ-নাশের পরও অন্তরে বিদ্যমান থাকে। এতদনুসারে অর্থ-বৈচিত্র্য দ্বারাই জ্ঞান-বৈচিত্র্য সাধিত হয়। সৌত্রান্তিকগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। ষড়্‌বিংশ সূত্রে এই মত খণ্ডিত হইয়াছে। এ বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষরূপে ভাষ্যকারের উক্তি এবং সূত্র ও তদ্ভাষ্যে তাহার উত্তর; যথা;—

"স্বকীয়ং পীতাদ্যাকারং জ্ঞানে সমর্প্য বিনষ্টোঽপ্যর্থো জ্ঞানমতেন পীতাদ্যাকারেণানুমীয়তে। অতোঽর্থবৈচিত্র্যকৃতমেব জ্ঞানবৈচিত্র্যমিতি সৌত্রান্তিকমতং দূষয়তি।

'নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ॥' ২৬॥"

"অসতো বিনষ্টস্য পীতাদ্যর্থস্য পীতাদিরাকারো জ্ঞানে ন সম্ভবতি। কুতঃ অদৃষ্টত্বাৎ। ধর্ম্মিণি বিনষ্টে ধর্ম্মস্যান্যত্র সম্বন্ধাদর্শনাৎ। ন চানুমেয়ো ঘটাদির্ন তু প্রত্যক্ষ ইতি শক্যং
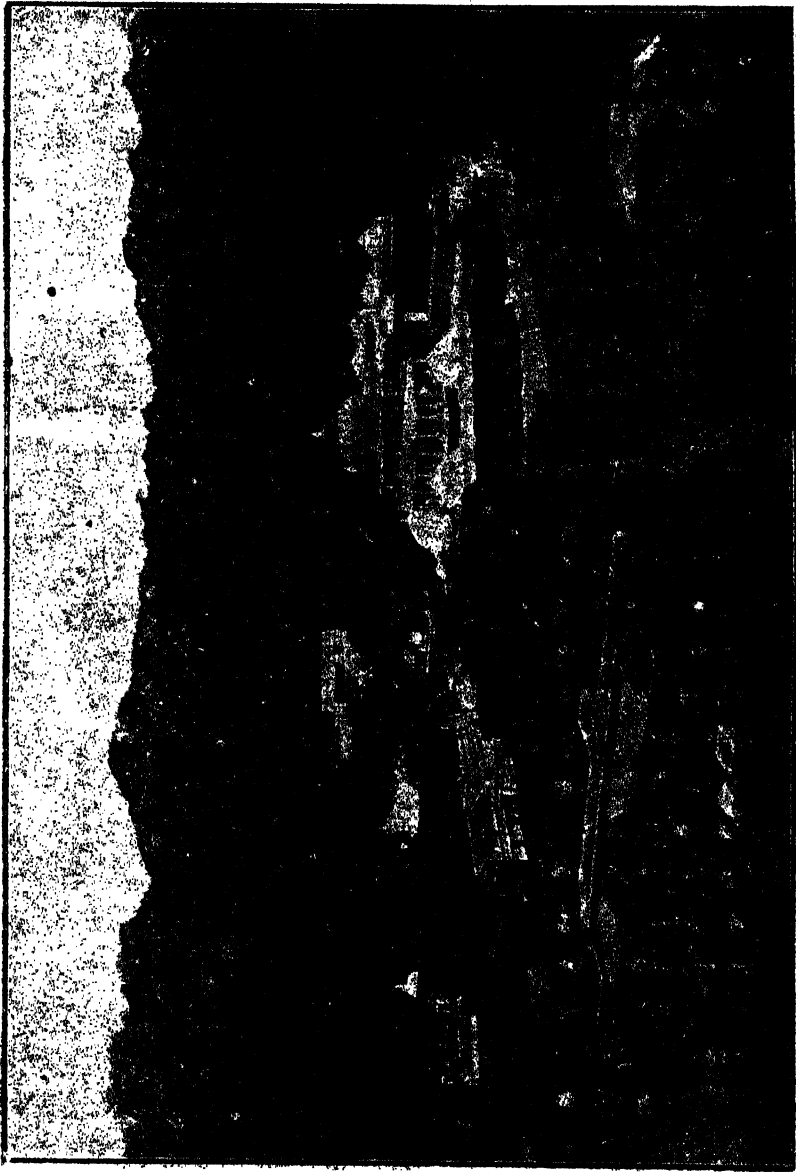
আবু-পর্ব্বতস্থ দিলওয়ারা মন্দির।

ভণিতুম। প্রত্যক্ষেণ জানামীতি প্রতীতৈ্যব তন্নিরাসাদিতি সৌত্রান্তিকাসাধারণো দোষঃ। তস্মাৎ প্রত্যক্ষো ঘটাদির্ন তু জ্ঞানগতেন তদাকারেণানুমীয়তে ইতি॥ ২৬॥"
অর্থাৎ,—'অদৃষ্ট-হেতু অসতের সম্ভাবনা নাই; অসৎ অর্থ—বিনাশ-প্রাপ্ত। যাহা অসৎ, তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। পীতাদি অসৎ বস্তুর যে পীতাদি আকার, সেই আকার জ্ঞানে থাকা সম্ভব নহে। উহা যখন অদৃষ্ট, তখন উহার বিদ্যমানতার অভাব। যে বস্তু যে ধর্ম্মাক্রান্ত, সে বস্তু বিনষ্ট হইলে তদ্ধর্ম্মের সম্বন্ধ অন্যত্র অদৃষ্ট বলিতে পারা যায়। ঘটাদি প্রত্যক্ষ পদার্থকে, উহা প্রত্যক্ষ নহে—অনুমেয়, এরূপ বলিতে পারি না। যাহাকে প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহার প্রতীতি দ্বারাই বিপরীত মত নিরাস হয়। সৌত্রান্তিকগণের এবম্বিধ ভ্রান্তি গুরুতর বলিয়া মনে হয়। প্রত্যক্ষীভূত ঘটাদি জ্ঞানগত তদাকারে অনুমেয়, এরূপ উক্তি কদাচ যুক্তিযুক্ত নহে।'

এইরূপে বুঝা যায়, ক্ষণিক বলিলেও দোষ আসে, অসতে সতের আরোপেও ত্রুটি ঘটে। সপ্তবিংশতি সূত্রে উভয়বিধ দোষের বিষয় ব্যক্ত হইতেছে। সূত্র ও তদ্ভাষ্য; যথা—

"উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ॥ ২৭॥"

"এবং ভাবক্ষণিকতয়াসদুৎপত্তৌ স্বীকৃতায়ামুদাসীনানামুপায়শূন্যানামপ্যুপেয়সিদ্ধিঃ স্যাৎ ক্ষণভঙ্গবাদে ভাবমাত্রস্য পরক্ষণস্থিত্যভাবাদিষ্টানিষ্টাপ্তিপরিহারয়োর্লোকদৃষ্টয়োরহেতুকত্ব-মতোঽনুপায়বতামপি তৎপ্রাপ্তিঃ স্যাৎ। উপেয়লিপ্সুঃ কশ্চিদপি কুত্রাপ্যুপায়ে ন প্রবর্ত্তেত স্বর্গায় মোক্ষায় বা ন কোঽপি প্রযতেত। ন চৈবমস্তি সর্ব্বস্যাপ্যুপেয়ার্থিনঃ সোপায়তা তয়ৈবোপেয়লাভশ্চ প্রতীয়তে। তস্মাদ্বিশ্বপ্রতারণার্থমেতয়োঃ প্রবৃত্তিঃ। যৌ কিল ভাবভূতস্কন্ধহেতুকাং সমুদায়োৎপত্তিং স্বীকৃত্যাপি পুনরভাবাদ্ভাবোৎপত্তিমূচতুঃ ক্ষণিকানামপ্যাত্মনাং স্বর্গাপবর্গসাধনান্যুপাদিদিশতুরিতি তুচ্ছস্তৎ সিদ্ধান্তঃ॥ ২৭॥"
অর্থাৎ,—'ভাব-পদার্থ ক্ষণিক হইলে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি স্বীকার আবশ্যক হয়। আর তাহাতে উপায়শূন্য উদাসীনের উপেয়-সিদ্ধি ঘটিয়া যায়। ক্ষণভঙ্গবাদে ভাবমাত্রের উৎপত্তি-মাত্রেই অভাব ঘটে। তাহাতে ইষ্টানিষ্টপরিহার-রূপ লোকদৃষ্ট-হেতু বৃথা হইয়া আসে। তাহাতে নিরুপায়ের স্বতঃই উপায় হইয়া যায়। এ মত মানিতে গেলে, কেহ আর উপায়লিপ্সু হইয়া উপায়ে প্রবৃত্ত হইবে না; কেহই আর স্বর্গাপবর্গলাভের নিমিত্ত যত্নবান রহিবে না। কিন্তু তাহাই কি রীতি? তাহাই কি শিক্ষা? সকলেই উপেয়ার্থী হইয়া উপায়ের জন্য প্রযত্নপর। উপায়ই উপেয়-প্রাপ্তির হেতুভূত। এইরূপে বুঝা যায়, কেবল বিভ্রান্ত করাই ঐ মতের লক্ষ্য। ভাবভূতস্কন্ধহেতুক সমুদায়োৎপত্তি স্বীকারের পর পুনরভাবাদ্ভাবোৎপত্তি অর্থাৎ অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি পরিকল্পিত হয়; অপিচ, ক্ষণিক আত্মার স্বর্গাপবর্গ-সাধনের উপদেশ দেওয়া হয়। এই সকল কারণে তাঁহাদিগের মত তুচ্ছ বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়।'

এবম্প্রকার বিতর্কের ফলে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকের মত খণ্ডন করা হয়। তৎপরে এক্ষণে বিজ্ঞানমাত্রবাদী যোগাচারের মত নিরাসের জন্য অন্যরূপ যুক্তি গৃহীত হইতেছে। কথিত হয়, বাহ্য-বস্তুতে অভিনিবিষ্ট শিষ্য-বিশেষের অনুরোধ-ক্রমে বাহ্যার্থ-প্রক্রিয়া-সূচক এই

মত সুগত মুনি প্রবর্ত্তিত করেন। পরন্তু ঐ মত তাঁহার অভিপ্রায়-সম্মত ছিল না। কেন-না, অন্য সকল স্কন্ধের তাৎপর্য্য এই বিজ্ঞান-স্কন্ধ মধ্যে নিবিষ্ট। বিজ্ঞেয় ঘটাদি বিজ্ঞানাতিরিক্ত নহে। উহাই (বিজ্ঞানই) অর্থাকারে পরিকল্পিত; তদ্ব্যতীত ব্যবহার-সিদ্ধি অসম্ভব ও স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হয়। বাহ্যার্থাস্তিবাদীরা জ্ঞানে অর্থকারত্ব ধর্ম্ম স্বীকার করেন। নচেৎ, ঘটজ্ঞান পটজ্ঞান ব্যবহার উপপত্তি হয় না। এরূপ হইলে, জ্ঞান দ্বারা ব্যবহার-সিদ্ধি ঘটিলে, বাহ্য বস্তুর অঙ্গীকারে কি প্রয়োজন? আন্তর জ্ঞানে ঘট-পর্ব্বতাদির আকার সম্বন্ধে সন্দেহ করা যায় না। জ্ঞান প্রকাশমান; নিরাকারের প্রকাশ সম্ভবপর নহে। এ মতে জ্ঞানের সাকারত্ব স্বীকার করিতে হয়। বাহ্যবস্তুর অভাবে বুদ্ধি-বৈচিত্র্য ঘটিতে পারিবে না, এরূপ সংশয়-স্থলে বাসনা-বৈচিত্র্য হইতে বুদ্ধি-বৈচিত্র্যের সম্ভাবনাও মনে করা যায়। বাসনা-হেতুক বৈচিত্র্যকে অন্বয়-ব্যতিরেকে অবধারণ করা যাইতে পারে। জ্ঞান জ্ঞেয়-পদার্থের সহোপলম্ভ নিয়ম হেতু জ্ঞানজ্ঞেয়-পদার্থের অভেদ সূচিত হয়। জ্ঞানাত্মকই জ্ঞেয় বস্তু। সর্ব্ববস্তু জ্ঞানাত্মক—এরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত কি না, সংশয় হইতে পারে। কিন্তু স্বপ্নবৎ অর্থ ব্যতিরেকে ব্যবহার-সিদ্ধি হেতু পৃথক বলিয়া অঙ্গীকার করিলেও, ফলে অনতিরিক্ত দর্শন যে জ্ঞানাত্মক, তাহা যুক্তিযুক্ত সপ্রমাণ হয়। এই প্রকারে পূর্ব্বপক্ষ খ্যাপন করিয়া অষ্টাবিংশতি সূত্রের অবতারণায় তদ্ভাষ্যে এ মতের খণ্ডন করা হইতেছে। পূর্ব্বপক্ষ, সূত্র ও ভাষ্য যথাক্রমে নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা,—

> "তদেবং বৈভাষিকে সৌত্রান্তিকে চ নিরস্তে বিজ্ঞানমাত্রবাদী যোগাচারঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে। বাহ্যে বস্তুন্যভিনিবেশমানান্ কাংশ্চিচ্ছিষ্যাননুরুধ্য বাহ্যার্থপ্রক্রিয়েয়ং সুগতেন রচিতা। তস্যাং ন তস্যাশয়ঃ বিজ্ঞানস্কন্ধমাত্রতাৎপর্য্যাৎ। তথাহি বিজ্ঞেয়ো ঘটাদ্যর্থো বিজ্ঞানান্নাতিরিচ্যতে। তস্যৈবার্থাকারত্বাৎ। ন চার্থান্ বিনা ব্যবহারাসিদ্ধিঃ তান বিনাপি স্বপ্নবৎ সিদ্ধেঃ। বাহ্যার্থাস্তিত্ববাদিনাপি জ্ঞানেঽর্থাকারত্বং ধর্ম্মোঽবশ্যং মন্তব্যঃ। কথমন্যথা ঘটজ্ঞানং পটজ্ঞানমিতি ব্যবহারোপপত্তিঃ। তথা চ তেনৈব তৎসিদ্ধৌ কিমর্থৈঃ। নন্বু কথমান্তরং জ্ঞানং ঘটপর্ব্বতাদ্যাকারকম্। মৈবম্। জ্ঞানং কিল প্রকাশমানম্। নিরাকারস্য তস্য প্রকাশাসম্ভবাৎ সাকারমেব তৎ। নন্বু কথমসতি বাহ্যেঽর্থেধীবৈচিত্র্যম্। বাসনাবৈচিত্র্যাদ্ভবেৎ। বাসনাহেতুকস্য তদ্বৈচিত্র্যস্যান্বয়ব্যতিরেকাভ্যামবধারণাৎ। জ্ঞানজ্ঞেয়য়োঃ সহোপলম্ভনিয়মাদপি ন জ্ঞেয়ং জ্ঞানাদ্ভিন্নম্। কিন্তু জ্ঞানাত্মকমেবেতি। ইহ সংশয়ঃ। সর্ব্বজ্ঞানাত্মকমিতি যুজ্যতে ন বেতি স্বপ্নবদ্বিনাপ্যর্থান্ জ্ঞানেনৈব ব্যবহারসিদ্ধেঃ পৃথক্ তদঙ্গীকারে ফলানতিরেকাচ্চ যুজ্যতে ইতি প্রাপ্তে—"

'নাভাব উপলব্ধেঃ ॥ ২৮ ॥'

"নাভাব উপলব্ধেঃ"—এই সূত্রের ভাষ্য; যথা,—

> "বাহ্যার্থস্যাভাবো ন শক্যো বক্তুম্। কুতঃ উপলব্ধেঃ। ঘটস্য জ্ঞানমিত্যাদৌ জ্ঞানান্যস্যার্থস্যোপলম্ভাৎ। ন চোপলব্ধমপলপন্ প্রাহ্যবাক্ প্রেক্ষাবতাম্। ন চ নাহমন্যং নোপলভে অপি তু জ্ঞানান্যং নোপলভে ইতি বাচ্যম্। উপলব্ধিবলেনৈব তদন্যতায়া গলে নিপাতনাৎ। ঘটমহং জানামীত্যাদৌ জ্ঞাধাত্বর্থং সকর্ম্মকং

সকর্তৃকঞ্চ সর্ব্বো লোকঃ প্রত্যেতি প্রত্যায়য়তি চাগ্যান্। তেন জ্ঞানমাত্রং সাধয়ন্ সকলোপহাসহেতুরিতি ভিন্নোঽর্থো জ্ঞানাৎ। নমু জ্ঞানাগুশ্চেদ্ঘটাদিস্তস্য প্রকাশঃ কথং জ্ঞানে চেৎ তর্হ্যেকস্মিন্ সর্ব্বস্য প্রকাশঃ স্যাৎ অগ্যত্বাবিশেষাদিতি চেন্ন। তদ্ভিন্নেঽপি তস্মিন্ যত্র বিষয়তাখ্যঃ সম্বন্ধস্তস্যৈব নাগ্যস্যেতি ব্যবস্থানাৎ। পীতরক্তাদি বিষয়কসমূহালম্বনস্য বিরুদ্ধনানাপীতাদ্যাকারাসম্ভবাচ্চ। যত্তু সহোপ-লম্ভনিয়মাদর্থো জ্ঞানান্মেতি তদসৎ সাহিত্যস্বার্থভেদহেতুকত্বাৎ। ততশ্চ তয়ো-স্তন্নিয়মো হেতুফলভাবনিমিত্তো মন্তব্যঃ। কিঞ্চ বাহ্যমর্থং নিরস্যতা সৌগতেন তস্য পৃথকসত্বং স্বীকৃতম্। যত্তদন্তর্জ্ঞেয়ং রূপং তদ্বহির্বদবভাসত ইতি তদুক্তেঃ। অন্যথা বৎকারণাসম্ভবঃ। নহি বন্ধ্যাপুত্রো বন্ধ্যাপুত্রবদিতি কশ্চিদাচক্ষীত॥ ২৮॥"

ভাষ্যের ভাবার্থ,—বাহ্যার্থের অভাব স্বীকার করিতে পারা যায় না। যেহেতু উহা উপলব্ধি হইতেছে। 'ঘটের জ্ঞান' ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞানাতীত অন্য বস্তু উপলব্ধ হয়। প্রত্যক্ষের যে উপলব্ধি, তাহা অপলাপ করিলে, সে অপলাপ জ্ঞানিগণের অগ্রাহ্য হয়। আমি অন্য বস্তু উপলব্ধি করিতে পারি না অথবা জ্ঞানাতিরিক্ত অন্য বস্তু আমার উপলব্ধ হয় না,—এবম্প্রকার উক্তি এ ক্ষেত্রে অগ্রাহ্য। জ্ঞানে উপলব্ধ হয় না,—এতদ্বাক্য ব্যবহারেই জ্ঞানাতীত বাহ্য বস্তু বোধ সিদ্ধ হয়। 'আমি ঘট জানি'—ইত্যাদি জ্ঞা-ধাত্বর্থ বাক্য সকর্ম্মক, সকর্তৃক এবং সর্ব্বলোক-প্রত্যয়ের হেতুভূত। জ্ঞা-ধাতুতে জ্ঞানমাত্র বুঝায়—এ কথা বলিলে, উপহাসাস্পদ হইতে হয়। ঘটাদি বস্তু জ্ঞান হইতে অভিন্ন বলিতে গেলে, জ্ঞানে উহার প্রকাশ কি প্রকারে সিদ্ধ হয়? এইরূপে ঘটের জ্ঞান অস্বীকার করিলে সকল বস্তুরই জ্ঞান অস্বীকার করিতে হয়। কারণ, ব্রহ্মাণ্ডের সকলই জ্ঞান হইতে ভিন্ন প্রতিপন্ন হয়। অতএব ঐ প্রকার যুক্তি অসঙ্গত। জ্ঞানের সহিত যাহার সম্বন্ধ হইবে, তাহাই জ্ঞানে প্রকাশ পাইবে। তদ্ভিন্ন অন্য কিছু জ্ঞানে উদ্ভাসিত হইবে না। ইহা ভিন্ন অন্য ব্যবস্থা হইতে পারে না। পীতরক্তাদি-বিষয়ক সমূহাবলম্বন অর্থাৎ সমষ্টিভাবে পীতরক্তাদির জ্ঞান, বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন পীত-রক্তাদির আকারেও সম্ভব হয় বটে; কিন্তু তদ্দ্বারা সমূহাবলম্বনে সমষ্টিতে নানাত্ব-ভাব আসিতে পারে না। যাঁহারা বলেন, যখন জ্ঞান ও বিষয়ের পরস্পর কার্য্যকারণভাব লক্ষ্য হয়, তখন বিষয় ও জ্ঞান অভিন্ন; কিন্তু তাঁহাদের সে মতও যুক্তিযুক্ত নহে। কেন-না, সাহিত্য অর্থ—ভেদজ্ঞানেরই বোধক। এ বস্তু অন্য বস্তুর সহিত বিদ্যমান আছে বলিলে, দুই বস্তুর স্বতন্ত্রতা উপলব্ধি হয়। এই সকল কারণে হেতুভাব ও ফলভাব বোধক বলিয়া ঐ নিয়মকে স্বীকার করিতে হইবে। সৌগতমতাবলম্বিগণ বাহ্য অর্থ—বাহ্য বস্তু নিরাস করিয়া তাহার পৃথক সত্বা অঙ্গীকার করেন। যাহা অন্তর্গত জ্ঞেয়রূপ, বহির্ভাগে তাহারই বিকাশ—এবম্বিধ উক্তি দ্বিবিধ-ভাব-প্রকাশক। যাহা অন্তর্বর্ত্তী জ্ঞেয়রূপ, তাহা বাহ্য-বস্তুর ন্যায় প্রকাশমান,—এই 'যাহা' ও 'তাহা' শব্দই ও তদ্ভাবই পৃথক সত্বা প্রকাশ করে। 'বহির্বদবভাসত' অর্থাৎ বাহ্য বস্তুর ন্যায় প্রকাশমান—এতদন্তর্গত 'বৎ' বা 'ন্যায়' শব্দ দ্বারাই দ্বি-ভাব খ্যাপন করা হইতেছে। 'বন্ধ্যা-পুত্র' কখনও 'বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায়' এরূপ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয় না।

এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। স্বপ্নে অনেক পদার্থ মানসপটে উদয় হয়। অনেক সময় সে সকল পদার্থ অলীক বাসনাহেতুক। সংসারে নিত্য-দৃশ্যমান্ পদার্থকেও সেইরূপ মনে করা যাইতে পারে। বাহ্য ভিন্ন বাসনা-জনিত জ্ঞান-বৈচিত্র্য স্বপ্নে যে ব্যবহার আনয়ন করে, জাগ্রৎ অবস্থাতেও সেই ব্যবহার পরিকল্পিত হউক;—এবম্বিধ যে বৌদ্ধমত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস দেখি; উনত্রিংশ সূত্রে সে মতের নিরাস করা হইয়াছে। এ বিষয়ে ভাষ্যকারের উক্তি, বেদান্ত-দর্শনের উনত্রিংশ সূত্র ও সেই সূত্রের ভাষ্য নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে; যথা,—

"অথ ব্যাহ্যার্থান্ বিনাপি বাসনাহেতুকেন জ্ঞানবৈচিত্র্যেণ স্বপ্নে যথা ব্যবহার এবং সর্ব্বং জাগরেঽপি স্যাদিতি দৃষ্টান্তেন সাধিতং দূষয়তি।

'বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ॥ ২৯ ॥'

"চশব্দোঽবধারণে। স্বপ্নে মনোরথে চ যথা ঘটাদ্যর্থাকারকজ্ঞানমাত্রসিদ্ধো ব্যবহারস্তথা জাগরেঽপি ভবেদিত্যেতন্ন সম্ভবতি। কুতঃ বৈধর্ম্ম্যাৎ। স্বপ্নজাগরপ্রাপ্তয়োর্ব্বস্তুনোরসাধর্ম্ম্যাদেব স্বপ্নে থল্বনুভূতঃ স্মর্য্যতে জাগরে তু প্রত্যক্ষেণানুভূয়তে। স্বপ্নোপলব্ধং ক্ষণদ্বয়-মাত্রেণান্যদন্যদ্ভবতি বাধিতঞ্চ বোধে। জাগরোপলব্ধং তু বর্ষশতানন্তরমপি তদ্ধর্ম্মকম-বাধিতঞ্চেতি। কিঞ্চ সপ্নেঽনুভূতং স্মর্য্যত ইতি প্রত্যুক্তিমাত্রং বোধ্যম্। স্বমতস্তু স্বমাত্রানু-ভাব্যং তাবন্মাত্রসময়ং বস্তু স্বপ্নে পরেশঃ সৃজতীতি সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হীত্যাদিনা বক্ষ্যতে॥২৯॥"

ভাষ্যের ভাবার্থ,—'বৈধর্ম্ম্য হেতু স্বপ্নাদিবৎ অবধারণ করা যায় না। স্বপ্নে ও মনোরথে ঘটাদির জ্ঞান যেরূপ হয়, জাগরণে ব্যবহার-কালে সেরূপ স্বীকার করা যায় না। উভয়কালে স্বপ্নে ও জাগরণে সম্পূর্ণ বৈধর্ম্ম্য দৃষ্ট হয়। স্বপ্নজাগরণ-প্রাপ্ত বস্তুর মধ্যে স্বাধর্ম্ম্য নাই। স্বপ্নে পূর্ব্বানুভূত বিষয় স্মৃতিপথে উদয় হয়; জাগরেণ প্রত্যক্ষের অনুভূতি ঘটে। স্বপ্নোপলব্ধ পদার্থাদি ক্ষণদ্বয়মাত্রে ভাবান্তর প্রাপ্ত হয়। স্বপ্নাপগমে সে ভাব বাধিত বা লোপপ্রাপ্তও হইতে পারে। জাগ্রদবস্থায় পরিদৃষ্ট বস্তুর ভাব শতবর্ষ পরেও রূপান্তর-প্রাপ্ত হয় না। আরও, স্বপ্নে অনুভূত বস্তু যে পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর অনুসরণ, এরূপ বলিলে প্রত্যুক্তি মাত্র বোধগম্য হয়। কিন্তু তাহা উঁহাদের স্বমত নহে। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু তৎকালে পরমেশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল, 'সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি' ইত্যাদি বাক্যে বুঝিতে পারা যায়।'

আরও এক কথা, বস্তুর সত্ত্বা ভিন্ন বাসনা-বৈচিত্র্য-হেতু যে জ্ঞানবৈচিত্র্য সিদ্ধ হয়, এতদুক্তিও সমীচীন নহে। ত্রিংশ সূত্রে সেই মতের নিরাস হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ভাষ্য-কারের উক্তি, সূত্র ও তাহার ভাষ্য পর্য্যায়ক্রমে নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে; যথা,—

"যত্তূক্তং বিনাপ্যর্থান্ বাসনাবৈচিত্র্যাজ্জ্ঞানবৈচিত্র্যমুপ-পদ্যত ইতি তন্নিরাসায়াহ।

'ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ ॥ ৩০ ॥'

"বাসনানাং ভাবো ন সম্ভবতি। কুতঃ অনুপলব্ধেঃ তন্মতে বাহ্যার্থাপ্রাপ্তেঃ। অর্থমূলা কিল বাসনার্থান্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধা। তব ত্বর্থানঙ্গীকারাৎ সা ন সম্ভবেৎ ॥ ৩০ ॥"

অর্থাৎ,—'অনুপলব্ধি হেতু সত্ত্বা স্বীকার করা যায় না। বাসনার সত্ত্বা সম্ভব নহে। উহা

অনুপলব্ধ। সে মতে বাহ্যার্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। অর্থমূলা বাসনা, অর্থান্বয়-ব্যতিরেক-ভিন্ন বাসনা সিদ্ধ হয় না। অঙ্গীকার করিলেও বাহ্যার্থের অভাবে বাসনা অস্তিত্বহীন হয়।'

আরও, বাসনা সংস্কার-বিশেষ। স্থির আশ্রয় ব্যতীত তাহার অস্তিত্ব সম্ভবপর নহে। একত্রিংশ সূত্রে এ তত্ত্ব বিশদীকৃত। ভাষ্যকারের উক্তি, সূত্র ও ভাষ্য যথাক্রমে; যথা,—

"কিঞ্চ বাসনা নাম সংস্কারবিশেষঃ। স চ স্থিরমাশ্রয়ং বিনা ন সম্ভবতীত্যাহ।

'ক্ষণিকত্বাচ্চ।' ৩১॥

"নেত্যনুবর্ত্ততে। বাসনাশ্রয়ঃ স্থিরঃ পদার্থো নৈব তেঽস্তি। কুতঃ ক্ষণিকত্বাৎ। প্রবৃত্তিবিজ্ঞানস্যালয়বিজ্ঞানস্য চ সর্ব্বস্য ক্ষণিকত্বাঙ্গীকারাৎ। ন হি ত্রিকালস্থির-সম্বন্ধিনি চেতনেঽসতি দেশকালনিমিত্তসাপেক্ষবাসনাধ্যানস্মরণাদিব্যবহারঃ সম্ভবেৎ। তথা চাশ্রয়াভাবান্ন সা তদভাবাচ্চ ন তদ্বৈচিত্র্যমিতি তুচ্ছো বিজ্ঞানমাত্রবাদঃ॥ ৩১॥"

অর্থাৎ,—'বাসনা যখন সংস্কার-বিশেষ, তখন স্থির আশ্রয় ভিন্ন উহার অস্তিত্বাভাব স্বীকার করিতে হয়। ক্ষণিকবাদ হিসাবেই এই মত দৃঢ় হয়। যখন সকলই ক্ষণিক, তখন বাসনার আশ্রয় সেই স্থির পদার্থ কোথায় রহিল? প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান, আলয়-বিজ্ঞান—সকলই ক্ষণিক বলিয়া অঙ্গীকৃত। ত্রিকাল-স্থির-সম্বন্ধী চেতন পদার্থ না থাকিলে দেশকাল-নিমিত্ত-সাপেক্ষ বাসনা-ধ্যান-স্মরণাদির ব্যবহার অসম্ভব। সুতরাং আশ্রয়-ভাব না থাকায় বাসনারও অভাব ঘটে। তাহার অভাবে তদ্বৈচিত্র্য এবং তজ্জনিত জ্ঞান-বৈচিত্র্য কিছুই উপলব্ধি হয় না। সুতরাং বিজ্ঞানবাদ হেয় বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়।'

এই প্রকারে যোগাচারবাদ খণ্ডন করিয়া শূন্যবাদী মাধ্যমিক মত খণ্ডিত হইয়াছে। সে মতের সারতত্ত্ব-বিবৃতি উপলক্ষে ভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষ রূপে প্রথমে বলিতেছেন,—

"এবং যোগাচারেঽপি নিরস্তে সর্ব্বশূন্যত্ববাদী মাধ্যমিকঃ প্রতিপদ্যতে। বুদ্ধেন বাহ্যার্থান্ বিজ্ঞানঞ্চাঙ্গীকৃত্য বিনেয়বুদ্ধ্যারোহায় সোপানবত্তত্র ক্ষণিকত্বাদি কল্পিতম্। ন তু তে তচ্চ বর্ত্তন্তে। শূন্যমেব তত্ত্বং তদাপত্তিরেব মোক্ষ ইত্যেব তন্মতরহস্যম্। যুক্তঞ্চৈতৎ। শূন্যস্যাহেতুসাধ্যত্বেন স্বতঃসিদ্ধেঃ। সতো হেত্বপেক্ষিণোঽপ্যুৎপত্ত্যনিরূপণাচ্চ। তথাহি। ন তাবদ্ভাবাদুৎপত্তিঃ সতঃ। অনষ্টাদ্বীজাদিতোঽঙ্কুরাদ্যুৎপত্ত্যদর্শনাৎ। নাপ্যভাবাৎ। নষ্টাদ্বীজাদিতো জাতস্যাঙ্কুরাদের্নিরূপাখ্যতাপাতাৎ। ন চ স্বতঃ। আত্মাশ্রয়তাপত্তেরানর্থক্যাচ্চ। ন তু পরতঃ। পরত্বাবিশেষেণ সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বোৎপত্তি-প্রসঙ্গাৎ। এবমুৎপত্ত্যভাবাদ্বিনাশাভাবঃ। তস্মাদুৎপত্তিবিনাশসদসদাদিকং বিভ্রমমাত্র-মতঃ শূন্যমেব তত্ত্বমিতি। ইহ সংশয়ঃ। শূন্যমেব তত্ত্বমিতি যুক্তং ন বেতি। শূন্যস্য স্বতঃ-সিদ্ধেরিতরেষাং পদার্থানাং ভ্রান্তিবিজৃম্ভিতত্বেনাসত্ত্বাচ্চ যুক্তমিতি প্রাপ্তে নিরস্যতি।"

অর্থাৎ,—'অতঃপর যোগাচারবাদীদিগকে নিরস্ত করিয়া, সর্ব্বশূন্যত্ববাদী মাধ্যমিকাদিগের মতের প্রতিবাদ করা হইতেছে। বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক বাহ্যার্থ ও বিজ্ঞান—স্বীকৃত হওয়ার পর বিনেয়বুদ্ধিতে আরোহণের সোপানস্বরূপ ক্ষণিকত্বের কল্পনা দেখিতে পাই। মাধ্যমিকগণের মধ্যে সে ভাব বিদ্যমান নাই। অর্থাৎ, বাহ্যার্থ বা বিজ্ঞান তাঁহারা স্বীকার করেন না। শূন্যই তত্ত্ব আর তদাপত্তিই মোক্ষ,—ইহাই সে মতের রহস্য। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের যুক্তি

এই যে, অহেতু সাধ্যের জন্যই শূন্য স্বতঃসিদ্ধ। সদ্বস্তু হেত্বপেক্ষী অর্থাৎ কারণান্তরের মুখাপেক্ষী হইলে তাহার সদ্ভাব থাকে না; ফলে উৎপত্তি-নিরূপণ-হেতু সতের সঙ্গে বিঘ্ন ঘটে। সুতরাং ভাব-পদার্থ হইতে সতের উৎপত্তি সিদ্ধ হয় না। অনষ্ট-বীজে অঙ্কুরোদ্গম দেখিতে পাই না। আবার একেবারে অভাব (অসৎ অবিদ্যমান) হইতেও উৎপত্তি সিদ্ধ হয় না। নষ্টবীজ-জাত অঙ্কুর—ইহাতে নিরুপাখ্য (মিথ্যা) বলিয়া সিদ্ধ হয়। আবার অঙ্কুরের স্বতোৎপত্তি বলা যায় না। তাহাতে আত্মাশ্রয়তা ও আনর্থক্য দোষ ঘটে। পর হইতেও উৎপত্তি সিদ্ধ হয় না। সেরূপ স্বীকারে পরত্বের অবিশেষ হেতু সর্ব্ববস্তু হইতেই সর্ব্ববস্তুর উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়। এরূপে উৎপত্তি-বিনাশ উভয়েরই অভাব ঘটে। এ হিসাবে উৎপত্তি-বিনাশ সৎ-অসৎ সকলই বিভ্রম—শূন্যই তত্ত্ব। এ ক্ষেত্রে সংশয় উঠিতে পারে,—শূন্য যে তত্ত্ব, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। মাধ্যমিকেরা তাহাতে বলেন, শূন্য স্বতঃসিদ্ধ, আর তদতিরিক্ত পদার্থ ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত। সুতরাং, সেই মতই যুক্তিযুক্ত।' কিন্তু বেদান্ত-দর্শনের দ্বাত্রিংশ সূত্রে সে মতের নিরাস করা হইতেছে। বেদান্ত-দর্শনের সেই দ্বাত্রিংশ সূত্র ও তাহার ভাষ্য; যথা,—

"সর্ব্বথানুপপত্তেশ্চ ॥ ৩২ ॥"

"নেতান্নুবর্ত্তনীয়ম্। শূন্যমিতি বদন্ ভাবমভাবং ভাবাভাবং বা প্রতিপাদয়েৎ। সর্ব্বথা নাভিমত সিদ্ধিঃ। কুতঃ অনুপপত্তেরযুক্তত্বাৎ। তথাহি আদ্যেঽনিষ্টাপত্তিঃ। দ্বিতীয়ে প্রতিপাদয়িতুর্ভাবস্য তৎসাধনস্য চ সত্ত্বাৎ সর্ব্বশূন্যতাহানিঃ। তৃতীয়ে তু বিরোধোঽনিষ্টতা চেতি। কিঞ্চ যেন প্রমাণেন শূন্যং সাধ্যং তস্য শূন্যত্বে শূন্যবাদহানিঃ তস্য সত্যত্বে সর্ব্বসত্যতাপ্রসঙ্গশ্চেতি দুষ্টঃ শূন্যবাদঃ। এবং মিথো বিরুদ্ধত্রিমতীনিরূপণাজ্জগৎপ্রতারকতা বুদ্ধস্যাবসীয়তে। লোকায়তিকাদি মতানি অতিতুচ্ছত্বাদ্ভগবতা সূত্রকারেণ প্রত্যাখ্যাতুং নোট্টঙ্কিতানীতি বেদিতব্যম্। এতেন বৌদ্ধ-নিরাসেন তৎসদৃশো মায়ী চ নিরস্তঃ। ক্ষণিকত্বমনুসৃত্য দৃষ্টি-সৃষ্টিবর্ণনাৎ শূন্যবাদমাশ্রিত্য বিবর্ত্তনিরূপণাচ্চ তস্য তৎসাদৃশ্যম্॥ ৩২ ॥"

অর্থাৎ,—'সর্ব্বথা অনুপপত্তি ঘটিতেছে। উহারা যে শূন্য বলেন, উহা ভাব, অভাব বা ভাবাভাব, কিছুই প্রতিপন্ন হয় না। সর্ব্বপ্রকারেই অভিমত অসিদ্ধ হয়। কোনও যুক্তিই যুক্তিযুক্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত হয় না। অদৃষ্ট বা যাহা শূন্য, উহাতে আদ্যের অর্থাৎ ভাবরূপত্বের অস্বীকারে উহার তাদৃশত্বে অনিষ্ট ঘটে। দ্বিতীয়তঃ, উহার অভাবরূপত্ব-স্বীকারে প্রতিপাদয়িতার এবং তৎসাধনের সত্ত্বা হেতু সর্ব্বশূন্যত্বের হানি হয়। তৃতীয়ে অর্থাৎ ভাবাভাব সম্বন্ধে বিরোধ ও অনিষ্ট দুই-ই ঘটিতে পারে। অপিচ, যে প্রমাণে শূন্য সাধ্য হয়, সেই প্রমাণের দ্বারা তাহার শূন্যত্বে শূন্যবাদে হানি ঘটে। আরও তাহার সত্যত্ব স্বীকার করিলে সর্ব্বসত্যতাপ্রসঙ্গ-হেতু শূন্যবাদ দুষ্ট হয়। এবম্বিধ পরস্পর-বিরুদ্ধ মতত্রয়ের নিরূপণে বুদ্ধের জগৎপ্রতারকতাই স্বীকার করিতে হয়। লোকায়ত-দিগের মতের অতিতুচ্ছতা-হেতু ভগবান সূত্রকার তাহার প্রতিবাদের চেষ্টা করেন নাই। যাহা হউক, এই প্রকারে বৌদ্ধমতের নিরাসে তৎসদৃশ মায়াবাদীদিগের মতও খণ্ডন

করা হইল,—ইহাই বুঝিতে হইবে। ক্ষণিকবাদ মতের অনুসরণেই দৃষ্টি-সৃষ্টি বর্ণন এবং শূন্যবাদাশ্রয়ে বিবর্ত্তবাদ-নিরূপণ প্রভৃতি হেতু ঐ সকল মায়াবাদী সম্প্রদায় বৌদ্ধমতের সহিতই সাদৃশ্য-সম্পন্ন; অর্থাৎ—বৌদ্ধমতের খণ্ডনে ঐ সকল মতও খণ্ডিত হয়।'

সাংখ্যবাদ, আরম্ভবাদ এবং বিভিন্ন বৌদ্ধমত খণ্ডন পূর্ব্বক অতঃপর জৈনমতে দোষ প্রদর্শন করা হইতেছে। এই উপলক্ষে ভাষ্যকার প্রথমে জৈন-দর্শনের একটী সংক্ষিপ্ত সার মর্ম্ম প্রদান করিয়াছেন। তাহার পর সেই সকল মতের কি কি অসামঞ্জস্য আছে, তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। "অথ জৈনা দূষ্যন্তে"— এবম্প্রকার সূচনা আরম্ভ করিয়া জৈনমতের সার-নিষ্কাষণপূর্ব্বক ভাষ্যকার দেখাইতেছেন,— জৈনগণ কি মত ব্যক্ত করিয়া কিরূপ ভ্রম-প্রমাদে পতিত হইয়াছেন।

জৈনমতের প্রতিবাদ।

"তে মন্যতে। পদার্থো দ্বিবিধঃ। জীবোঽজীবশ্চেতি। তত্র জীবশ্চেতনঃ কায়-পরিমাণং সাবয়বঃ। অজীবঃ পঞ্চবিধঃ ধর্ম্মাধর্ম্মপুদ্গলকালাকাশভেদাৎ। গতি-হেতুর্ধর্ম্মঃ। স্থিতিহেতুরধর্ম্মশ্চ ব্যাপকঃ। বর্ণগন্ধরসস্পর্শবান্ পুদ্গলঃ। স চ দ্বিবিধঃ পরমাণুস্তৎসঙ্ঘাতশ্চ। বায়্বগ্নিজলপৃথিবীতনুভুবনাদিকঃ। পৃথিব্যাদিহেতবঃ পরমাণবো ন চতুর্ব্বিধাঃ কিন্ত্বেকস্বভাবাঃ। স্বভাবপরিণামাত্তু পৃথিব্যাদিরূপো-বিশেষঃ। কালস্ত্বতীতাদিব্যবহারহেতুরণুশ্চ। আকাশস্ত্বেকোঽনন্তপ্রদেশশ্চেতি। তদেবং ষড়মী পদার্থা দ্রব্যরূপাস্তদাত্মকমিদং জগৎ। তেষু চাণুভিন্নানি পঞ্চ-দ্রব্যাণ্যস্তিকায়া ইত্যাখ্যায়ন্তে। জীবাস্তিকায়ো ধর্ম্মাস্তিকায়োঽধর্ম্মাস্তিকায়ঃ পুদ্গ-লাস্তিকায়ঃ আকাশাস্তিকায় ইতি। অস্তিকায়শব্দোঽনেকদেশবর্ত্তিদ্রব্যবাচী। জীবস্য মোক্ষোপযোগিতয়া বোধ্যান্ সপ্তপদার্থান্ বর্ণয়ন্তি। জীবাজীবাস্রবসম্বর-নির্জরবন্ধমোক্ষা ইতি। তেষু জীবঃ প্রাগুক্তো জ্ঞানাদিগুণকঃ। অজীবস্তু ভোগ্য-জাতম্। আস্রবত্যনেন জীবো বিষয়েষ্বিত্যাস্রব ইন্দ্রিয়সঙ্ঘাতঃ। সংবৃণোতি বিবেকাদিকমিতি সম্বরোঽবিবেকাদিঃ। নিঃশেষেণ জীর্য্যত্যনেন কামক্রোধাদিরিতি নির্জরঃ কেশোল্লুঞ্চনতপ্তশিলারোহণাদিঃ। কর্ম্মাষ্টকেনাপাদিতো জন্মমরণপ্রবাহো-বন্ধঃ। তদষ্টকং চৈবম্। চত্বারি ঘাতিককর্ম্মাণি পাপবিশেষরূপাণি যৈর্জ্ঞানদর্শন-বীর্য্যসুখানি স্বাভাবিকান্যপি জীবস্য প্রতিহন্যন্তে। চত্বারি ত্বঘাতিকর্ম্মাণি পুণ্যবিশেষ-রূপাণি যৈর্দেহসংস্থানতদভিমানতৎকৃতসুখদুঃখাপেক্ষোপেক্ষাসিদ্ধিঃ। স্বশাস্ত্রোক্ত সাধনৈস্তদষ্টকাদ্বিমুক্তস্যাবির্ভূতস্বাভাবিকাত্মরূপস্য জীবস্য সদোর্দ্ধগতিরলোকাকাশ-স্থিতির্ব্বা মুক্তিঃ। সম্যগ্‌জ্ঞানদর্শনচারিত্র্যাখ্যং রত্নত্রয়ং তৎসাধনম্। তানেতান্ পদার্থান্ সপ্তভঙ্গিনা ন্যায়েনাবস্থাপয়ন্তি। স যথা স্যাদস্তি ১ স্যান্নাস্তি ২ স্যাদবক্তব্যঃ ৩ স্যাদস্তি চ নাস্তি চ ৪ স্যাদস্তি চাবক্তব্যশ্চ ৫ স্যান্নাস্তি চাবক্তব্যশ্চ ৬ স্যাদস্তি চ নাস্তি চাব্যক্তব্যশ্চেতি ৭। স্যাদিতি কথঞ্চিদিত্যর্থেঽব্যয়ম্। সপ্তানাং নিয়মানাং ভঙ্গা বিদ্যন্তে যস্মিন্ প্রতিপাদ্যতয়েতি সপ্তভঙ্গী। সত্ত্বম্ ১ অসত্ত্বং ২ সদসত্ত্বং ৩ সদসদ্বিল-ক্ষণত্বং ৪ সত্ত্বে সতি তদ্বিলক্ষণত্বম্ ৫ অসত্ত্বে সতি তদ্বিলক্ষণত্বং ৬ সদসত্ত্বে সতি তদ্বিল-ক্ষণত্বম্ ৭ ইতিবাদিভেদেন পদার্থবিষয়াঃ সপ্ত নিয়মাস্তবন্তি। তত্তজ্জার্থময়ং ন্যায়ঃ। স

চ সর্ব্বত্রাবশ্যকঃ সর্ব্বস্য পদার্থস্য সত্ত্বাসত্ত্বনিত্যত্বানিত্যত্বভিন্নত্বাভিন্নত্বাদিভির্ধর্ম্মৈর-নৈকান্তিকত্বাৎ। তথাহি যদ্যেকান্ততো বস্তুস্ত্যেব তর্হি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বাত্মনাস্ত্যে-বেতি ন তদীপ্সাজিহাসাভ্যাং কথঞ্চিৎ কদাচিৎ কুত্রচিৎ কশ্চিৎ প্রবর্ত্তেত নিবর্ত্তেত বা। প্রাপ্তস্যাপ্রাপ্তত্বাৎ হেয়হানাসম্ভবাচ্চ। অনেকান্তপক্ষে তু কথঞ্চিৎ কচিৎ কদাচিৎ কস্যচিৎ কেনচিদ্রূপেণ সত্ত্বে হানোপাদানসম্ভবাৎ। প্রবৃত্তিনিবৃত্তিশ্চোপ-পদ্যেত। দ্রব্যপর্য্যায়াত্মকং কিল সর্ব্বং বস্তু। তত্র দ্রব্যাত্মনা সত্ত্বাদিকমুপপদ্যেত। পর্য্যায়াত্মনা ত্বসত্ত্বাদিকম্। পর্য্যায়াস্তু দ্রব্যাবস্থাবিশেষাঃ। তেষাং ভাবাভাবাত্মকতয়া সত্ত্বাসত্ত্বাদেরুৎপত্তিরিতি। ইহ সন্দিহ্যতে। আর্হতোক্তা জীবাদয়ঃ পদার্থাস্তথা যুজ্যন্তে ন বেতি। সপ্তভঙ্গিনো ন্যায়স্য সাধকস্য সত্ত্বাৎ যুজ্যন্তে ইতি প্রাপ্তে পরিহরতি।"

ভাবার্থ,—'জীব ও অজীব;—পদার্থ এই দুই প্রকার। জৈনগণ এইরূপ মত ব্যক্ত করেন। জীবের স্বরূপ এই যে, জীব—চেতন, কায়পরিমাণ ও সাবয়ব। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পুদ্গল, কাল ও আকাশ ভেদে অজীব-পদার্থ পঞ্চবিধ। ধর্ম্ম—গতিহেতু। অধর্ম্ম—স্থিতিহেতু ও ব্যাপক। পুদ্গল—বর্ণ-গন্ধ-রস-স্পর্শবিশিষ্ট। পরমাণু ও তৎসংঘাত ভেদে পুদ্গল দ্বিবিধ। সংঘাত বলিতে বায়ু অগ্নি জল পৃথিবী তনু ও ভুবনাদিকে বুঝায়। পৃথিব্যাদির হেতুভূত পরমাণু চতুর্ব্বিধ নহে; উহা একস্বভাব-বিশিষ্ট। সেই স্বভাব-পরিণাম-হেতু পৃথিব্যাদি রূপ-বিশেষ-সংজ্ঞিত। অতীতাদি ব্যবহার হেতু যে কাল, তাহা অণুস্বরূপ। আকাশ একমাত্র ও অনন্তবিস্তৃত। এই সর্ব্ববিধ পদার্থ দ্রব্যরূপ। ইহা লইয়াই এই জগৎ। তাহাদের মধ্যে অণু ভিন্ন পঞ্চ পদার্থ অস্তিকায় আখ্যায় অভিহিত হয়; যথা—জীবাস্তিকায়, ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তিকায়, পুদ্গলাস্তিকায়, আকাশাস্তিকায়। অস্তিকায় শব্দে অনেকদেশবর্ত্তী দ্রব্য বুঝায়। উহাতে জীবের মোক্ষোপযোগী সপ্ত পদার্থের বর্ণনা উপলব্ধি হয়; যথা—জীব, অজীব, আস্রব, সম্বর, নির্জ্জর, বন্ধ ও মোক্ষ। পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানাদি গুণ যাহাতে আছে, তাহাই জীব। অজীব—তাহার ভোগ্য-পদার্থ মধ্যে গণ্য। ইন্দ্রিয়-সংঘাত-বশতঃ জীব যে বিষয়াসক্ত হয়, তাহারই নাম—আস্রব। বিবেকাবরণকারী অবিবেককে সম্বর নামে অভিহিত করা যায়। নির্জ্জর বলিতে কাম-ক্রোধাদি নিঃশেষে জীর্ণ করার বা পরিহার করার ভাব বুঝায়। কেশলুঞ্চন, তপ্তশিলারোহণাদি—কামক্রোধাদি জীর্ণ করার কার্য্য মধ্যে পরিগণিত। অষ্টবিধ কর্ম্মের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া যে জন্মমরণপ্রবাহ উৎপন্ন হয়, তাহাই বন্ধ। সেই অষ্ট কর্ম্ম এইরূপ; যথা—চতুর্ব্বিধ ঘাতিকর্ম্ম; উহা পাপবিশেষ-রূপ; উহাতে জীবের স্বাভাবিক জ্ঞান, দর্শন, বীর্য্য, সুখ বিনষ্ট হয়। অপর চারিটী কর্ম্মের নাম—অঘাতিকর্ম্ম; উহা পুণ্যবিশেষ রূপ; উহার দ্বারা দেহ-সংস্থান, দেহাভিমান, তৎকৃত সুখ-দুঃখের অপেক্ষা ও উপেক্ষা প্রতিপন্ন হয়। স্বশাস্ত্রোক্ত সাধন-সমূহের সাহায্যে কর্ম্মাষ্টক হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। তাহাতে স্বাভাবিক আত্মস্বরূপে আবির্ভাব ঘটে। তখন জীব ঊর্দ্ধগতিলাভে অলোকাকাশে অবস্থিতি করে বা মুক্তি প্রাপ্ত হয়। সম্যগ্-জ্ঞান, সম্যক্-দর্শন, সম্যক্-চারিত্র্য অভিধেয় রত্নত্রয় সেই সাধন-স্বরূপ। পূর্ব্বোক্ত ঐ পদার্থ-সকল সপ্তভঙ্গিন্যায়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সপ্তভঙ্গিন্যায় যথা—(১) স্যাদস্তি, (২)

স্যান্নাস্তি, (৩) স্যাদবক্তব্য, (৪) স্যাদস্তি চ নাস্তি চ, (৫) স্যাদস্তি চাবক্তব্যশ্চ, (৬) স্যান্নাস্তি চাবক্তব্যশ্চ, (৭) স্যাদস্তি চ নাস্তি চাবক্তব্যশ্চ। * কথঞ্চিৎ অর্থে 'স্যাৎ' শব্দ অব্যয় রূপে ব্যবহৃত। যাহাতে সপ্তবিধ নিয়মের ভঙ্গ প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাই সপ্তভঙ্গিন্যায়। (১) সত্ত্ব, (২) অসত্ত্ব, (৩) সদসত্ত্ব, (৪) সদসদ্বিলক্ষণত্ব, (৫) সত্ত্বে তদ্বিলক্ষণত্ব, (৬) অসত্ত্বে তদ্বিলক্ষণত্ব, (৭) সত্ত্বাসত্ত্বে তদ্বিলক্ষণত্ব—পদার্থ বিষয়ে এই এই সপ্ত নিয়ম বাদিভেদে নির্দ্দিষ্ট হয়। তাহা ভঙ্গের জন্যই এই ন্যায়। সকল প্রকার পদার্থের সত্ত্বাসত্ত্ব, নিত্যত্বানিত্যত্ব, ভিন্নত্বাভিন্নত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম-সমূহের অনৈকান্তিকত্ব বা অনিশ্চয়তা হেতু সর্ব্বত্র এই সপ্তভঙ্গিন্যায়ের আবশ্যক। যদি একান্তই বস্তুর অস্তিত্ব থাকে, তাহা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বাত্মনে থাকিবেই থাকিবে। ঈপ্সা বা জিহাসা বশতঃ তাহা কদাচিৎ কোনও স্থানে কোনও প্রকারে প্রবর্ত্তিত বা নিবর্ত্তিত হইবে না। প্রাপ্য-বস্তুর অপ্রাপ্তত্ব হেতু এবং হেয় বস্তুর পরিত্যাগ অসম্ভব হেতু ঐরূপ হয়। অনেকান্তপক্ষে—অনির্ণীত স্বরূপত্ব পক্ষে—কচিৎ কোথাও কাহারও কোনরূপ সত্ত্ব থাকিলেই তাহার পরিত্যাগ বা গ্রহণ সম্ভবপর। এতদ্দ্বারাই প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি সিদ্ধ হয়। পর্য্যায়ই দ্রব্যাবস্থা-বিশেষ। তাহাদের ভাব ও অভাব হেতু যথাক্রমে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব উপপন্ন হয়। অর্হতত্ত্ব জীবাদি পদার্থে যুক্তিযুক্ত কি না, এই সংশয় নিবারণ সপ্তভঙ্গি-ন্যায়ের দ্বারা সাধিত হয়। †

---

* সপ্তভঙ্গিন্যায়ে প্রযুক্ত উক্তি কয়েকটীর মর্ম্মার্থ আমরা পূর্ব্বে (এই খণ্ডের ৭১ম পৃষ্ঠায়) প্রদান করিয়াছি। বিষয়টী আর একটু বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য পণ্ডিত-প্রবর শ্যামলাল বাচস্পতি মহাশয়ের ব্যাখ্যা হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—'স্যাৎ অস্তি'—যদি কোনরূপে থাকে, তবে আছে—এই কথঞ্চিৎ অস্তিত্ব-জ্ঞাপক ন্যায়ই প্রথম ন্যায়। 'স্যান্নাস্তি'—যদি কোনরূপে থাকে, এই অসত্ত্ববিবক্ষাসূচক ন্যায়ই দ্বিতীয় ন্যায়। 'স্যাদবক্তব্যঃ'—যদি কোনরূপে থাকে, তবে অবক্তব্য, এইটী ক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় বিবক্ষায় তৃতীয় ন্যায়। 'স্যাদস্তি চ নাস্তি চ'—যদি কোনরূপ থাকে তবে আছে অথবা নাই, এইটী যুগপৎ প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় বিবক্ষায় চতুর্থ ন্যায়। সত্ত্ব ও অসত্ত্ব—এককালে বলা অশক্য, এইটী বুঝাইবার নিমিত্তই এই চতুর্থ ন্যায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। 'স্যাদস্তি চাবক্তব্যশ্চ'—প্রথম ও চতুর্থের ক্রমবিবক্ষায় পঞ্চম ন্যায়। ইহার অর্থ—যদি কোনরূপে থাকে, তবে আছে অথচ উহা অবক্তব্যই। 'স্যান্নাস্তি চাবক্তব্যশ্চ'—যদি কোনরূপে না থাকে, তবে নাই, অথচ উহা অবক্তব্যই। এইটী দ্বিতীয় ও চতুর্থের বিবক্ষায় ষষ্ঠ ন্যায়। 'স্যাদস্তি চ নাস্তি চাবক্তব্যশ্চ'—যদি কোনরূপে থাকে তবে আছে, যদি কোনরূপে না থাকে তবে নাই, অথচ অবক্তব্যই। এইটী প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থের বিবক্ষায় সপ্তম ন্যায়।"

† জৈন-সম্প্রদায় কিরূপ দৃষ্টান্তের সহিত এই "স্যাদ্বাদ" প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কি আকারে কি ভাবে এ তত্ত্ব বিশদীকৃত হয়, তাহার আভাষ এস্থলে প্রদান করা যাইতেছে। *An Epitome of Jainism* গ্রন্থে তাহার যে পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, আমরা এস্থলে তাহার একটু আভাষ দিতেছি।

"Form I.—'স্যাদস্ত্যেব সর্ব্বমিতি সদংশকল্পনা বিভজনেন প্রথমোভঙ্গঃ।' as for example—'স্যাৎ অস্ত্যেব ঘটঃ' i. e. *May be, partly* or in a *certain sense* the jar exists.

"Form II.—'স্যান্নাস্ত্যেব সর্ব্বমিতি পর্য্যুদাস কল্পনা বিভজনেন দ্বিতীয়োভঙ্গঃ।' as "নাস্ত্যেব ঘটঃ" i. e. *May be, partly* or in a *certain sense* the jar does not exist.

"Form III.—"স্যাদস্ত্যেব স্যান্নাস্ত্যেবেতি ক্রমেণ সদংশাসদংশ কল্পনা বিভজনেন তৃতীয়োভঙ্গঃ।" as "স্যাৎ অস্তি নাস্ত্যেব ঘটঃ"—*May be, partly* or in a *certain sense* the jar exists as well as in a sense it does not exist.

কিন্তু ঐ মত যে যুক্তিযুক্ত নহে, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য ভাষ্যকার ত্রয়স্ত্রিংশ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন। বেদান্ত-দর্শনের সেই সূত্র ও তাহার ভাষ্য; যথা,—

"নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ ॥ ৩৩ ॥"

"নৈতে পদার্থান্তেন ন্যায়েনাত্মানমুপলব্ধুং ক্ষমাঃ। কুতঃ একস্মিন্নিতি। একস্মিন ধর্ম্মিনি যুগপৎ সত্ত্বাদিবিরুদ্ধধর্ম্মসমাবেশাযোগাদেবেত্যর্থঃ। ন হ্যেকং বস্ত্বেকদা শৈত্যোষ্ণ্যভাগবীক্ষতে কাপি। কিঞ্চ অনেকান্তপক্ষে স্বর্গনরকমোক্ষাণাং মিথঃ সঙ্কীর্ণত্বাৎ স্বর্গায় নরকহানায় মোক্ষায় চ সাধনবিধির্ব্যর্থঃ স্যাৎ। এবং ঘটাদীনামপি তথাত্বাদুদকার্থী বহ্নিনা প্রবর্ত্তেত গৃহার্থী তু বায়ুনা। ন চ তত্র ভেদস্যাপি সত্ত্বা-

"Form IV.—"স্যাদবক্তব্যমেবেতি সমসময়ে বিধিনিষেধয়োরনির্ব্বচনীয় কল্পনা বিভজনয়া চতুর্থোভঙ্গঃ।" as "স্যাদবক্তব্য এব ঘটঃ"—May be, *partly* or in a *certain sense* the jar is *indesoribable*.

"Form V.—"স্যাদস্ত্যেব স্যাদবক্তব্যমেবেতি বিধিপ্রাধান্যেন যুগপদ্বিধিনিষেধা নির্ব্বচনীয় স্থাপন কল্পনা বিভজনায় পঞ্চমোভঙ্গঃ।" as "স্যাদস্ত্যেব স্যাদবক্তব্য ঘটঃ"—May be, *partly* or in a *certain sense* the jar *exists* as well as in a certain sense it is *indescribable*.

"Form VI.—"স্যান্নাস্ত্যেব স্যাদবক্তব্যমেবেতি নিষেধপ্রাধান্যেন যুগপন্নিষেধ বিধ্যনির্ব্বচনীয় কল্পনা বিভজনয়া ষষ্ঠোভঙ্গঃ।" as "স্যান্নাস্ত্যেব সাদবক্তব্য'। May be, *partly* or in a *certain sense* the jar is *not* and indescribable in a *certain sense* as well.

"Form VII.—"স্যাদস্ত্যেব স্যান্নাস্ত্যেব স্যাদবক্তব্যমেবেতি ক্রমাৎ সদংশাসদংশপ্রাধান্যকল্পনয়া যুগপদ্বিধিনিষেধানির্ব্বচনীয় স্থাপনা কল্পনা বিভজনয়া চ সপ্তমোভঙ্গঃ।' as "স্যাদস্ত্যেব নাস্ত্যেব অবক্তব্য"—*May be partly* or in a *certain sense* the jar is and *is not* and is *indescribable* as well as in a *certain sense*."

স্যাদ্বাদ প্রতিষ্ঠার জন্য সপ্তভঙ্গী ন্যায়ের অবতারণা। স্যাদ্বাদের মূল তত্ত্ব বুঝিলে সপ্তভঙ্গী ন্যায়ের উপযোগিতা উপলব্ধি হয়। এই স্যাদ্বাদ-তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ মর্ম্মস্বরূপ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল; যথা,—"Nothing can be truly apprehended unless we take it in the light of not only what it is but also what *it is not* ;...because this *notness* of the factors imparts individuality and reality to what it is....True apprehension can only be possible if we take it in the light of not what it is only ; but also what it is not as well....The most firm convictions which we have cherished from our cradles without the least hesitation, are backed up and supported also by the vigorous rules and canons of formal logic whose fundamental principle, as we have seen before, is the laws of indentity and contradiction that A is A, cannot be *not*-A. But now we come to a new vision of things in which A appears to be not merely A but *not*-A as well ; because A is real in so far it stands in relation with what is *not*-A. The true life of A would then consist not only in A as formal logic teaches us but also in *not*-A. The ideal nature of a thing consists, therefore, not only in assertion of its being but also at the same time in the denial of it—in that which comprehends those antagonistic elements and yet harmonises and explains them." সপ্তভঙ্গিন্যায়ের যুক্তি-প্রভাবে জৈন-দার্শনিকগণ স্যাদ্বাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই সপ্তভঙ্গিন্যায়ের প্রভাবেই সকল চিন্তার ও পদার্থের সত্য তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়,—ইহাই তাঁহাদের অভিমত।

ছুদকাস্তর্থিনো বহ্ন্যাদিতো নিবৃত্তিরূপপদ্যেতেতি বাচ্যম্ অভেদস্যাপি সত্ত্বেন বৃত্তের-প্যাবশ্যকত্বাৎ। অপি চ নির্দ্ধার্য্যাঃ পদার্থা নির্দ্ধারসাধনানি ভঙ্গা নির্দ্ধারকো জীবো নির্দ্ধারশ্চ তৎফলং সর্ব্বমেতৎ স্যাদস্তীত্যাদিবিকল্পোপন্যাসেন সত্ত্বাসত্ত্বাদিধর্ম্মকতয়া নিশ্চিতবপূর্ব্বেদিতিলূতাতন্তুবৎ ক্রট্যমানোঽসৌ ন্যায়ঃ। কিমস্য পরীক্ষয়া॥ ৩৩॥"

ভাষ্যের ভাবার্থ,—'একে বিরুদ্ধধর্ম্মীর সমাবেশ অসম্ভব। এই ন্যায়ে এক পরমাত্মায় সকল পদার্থ উপলব্ধি করা যাইতে পারে না। এক ধর্ম্মীতে যুগপৎ সত্ত্বাদি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ সিদ্ধ হয় না। একই বস্তু একই সময়ে শীতোষ্ণভাবে অবস্থিত কখনও দেখিতে পাই না। অনেকান্তপক্ষে স্বর্গ-নরক-মোক্ষ এক করিয়া লইলে স্বর্গলাভে মোক্ষলাভে নরক-যন্ত্রণা-নিরোধে সাধন-বিধি ব্যর্থ হইয়া যায়। ঘটাদিকে মিশ্রিতভাবে ভাবিলে উদকার্থীকে বহ্নির নিকট এবং গহার্থীকে বায়ুর নিকট প্রার্থী হইতে হয়। আবার ভেদ থাকিলেও উদকার্থীর বহ্নিতে কার্য্যসিদ্ধি হয় না। অভেদের অস্তিত্বেও ভেদের ন্যায় প্রবৃত্তির আবশ্যক হয়। পদার্থ-মাত্র নির্দ্ধার্য্য। নির্দ্ধারসাধন—ভঙ্গসকল। নির্দ্ধারক জীব তাহার ফলনির্দ্ধারক। 'স্যাদস্তি' ইত্যাদির বিকল্পে ব্যাখ্যায় সত্ত্বাসত্ত্বাদি ধর্ম্মের অনিশ্চয়তাই সাধিত হইতেছে। ফলে সপ্তভঙ্গিন্যায় লূতাতন্তুবৎ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। সুতরাং উহার বিচারের কোনই আবশ্যকতা পরিদৃষ্ট হয় না।'

ইহার পর, সূত্রকার আত্মার দেহ-পরিমাণত্বের বিষয়ে প্রতিবাদ করিতেছেন। ভাষ্যকারের উক্তি বেদান্তদর্শনের চতুস্ত্রিংশ সূত্র এবং তদ্ভাষ্য সেই সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। যথা,—

"অথাত্মনো দেহপরিমাণত্বং প্রত্যাচষ্টে।

'এবং চাত্মাকার্ৎস্ন্যম্॥' ৩৪॥"

"যথৈকস্মিন্ সত্ত্বাসত্ত্বাদিবিরুদ্ধধর্ম্মযোগো দোষ এবমাত্মনোঽকার্ৎস্ন্যঞ্চ সঃ। তথাহি। দেহপরিমাণো জীব ইতি মতম্। তস্য বালদেহপরিমিতস্য যুবাদি দেহে পর্য্যাপ্তির্ন স্যাৎ। মনুষ্যদেহপরিমিতস্য তস্যাদৃষ্টবিশেষলব্ধে করিশরীরে চ তথা সর্ব্বাঙ্গীণসুখদুঃখানুপলম্ভশ্চ পুনর্মশকদেহেঽসমাবেশশ্চেতি॥ ৩৪॥"

অর্থাৎ,—'একই বস্তুর সত্ত্বাসত্ত্ব বিরুদ্ধধর্ম্মযোগ দোষদুষ্ট। আত্মার অকার্ৎস্ন্য (সম্পূর্ণত্ব) সেইরূপ দোষাবহ। দেহপরিমাণ জীব—এই যে মত, সর্ব্বথা সমভাবে প্রযোজ্য কি? বালদেহ-পরিমাণ, যুবার দেহে কদাচ পর্য্যাপ্ত নহে; অর্থাৎ, যদি মনে করা যায়—জীব বালকের দেহ-পরিমিত; তাহাকে আবার যুবাদেহ-পরিমিত, কি প্রকারে বলিতে পারি? মনুষ্য-দেহ-পরিমিত জীব অদৃষ্টবিশেষ লাভ করিয়া করিশরীরে যদি পর্য্যবসিত হয়; তাহা হইলে তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ সুখ-দুঃখ অনুপলব্ধ থাকে। আবার মশকাদি দেহে তাহার সমাবেশ হইতে পারে না।'

কেহ হয় তো বলিতে পারেন, জীবের অনন্ত-অবয়বত্ব স্বীকার করিলে এ বিরোধ পরিহার করা যাইতে পারে। কিন্তু পঞ্চত্রিংশ সূত্রে সে মতও খণ্ডন করা হইতেছে। সূত্র ও ভাষ্য; যথা—

"ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ॥ ৩৫॥"

"নম্বনন্তাবয়বস্য জীবস্য বালযুবাদিদেহান্ করিতুরগাদিদেহান্ বা ভজতঃ

ক্রমাদবয়বাপগমোপগমাভ্যাং বৈপরীত্যেন চ তত্তদ্দেহপরিমিতত্বমবিরুদ্ধমিতি চেন্ন। কুতঃ বিকারাদিভ্যঃ। তথা সতি জীবে বিকারানিত্যতাপ্রসঙ্গাৎ। কৃতহান্য কৃতাভ্যাগমাভ্যাঞ্চেতি যৎকিঞ্চিদেতৎ। যত্তু মুক্তিকালিকেন দেহাঘটিতেন নিত্যেন পরিমাণেন বিশিষ্টে জীবে ন বিকারাদিরিতি বদন্তি তচ্চ মন্দম্। তস্য জন্যত্বাজন্যত্বসত্বাসত্বাদিবিকল্পৈ স্থৈর্য্যাসম্ভবাৎ॥ ৩৫॥"

অর্থাৎ—'জীব অনন্ত অবয়ববিশিষ্ট। আর সেই হেতু সে বালযুবাদি দেহ অথবা করি-তুরগাদির দেহ প্রাপ্ত হইতে পারে,—এরূপ উক্তিও যুক্তিযুক্ত নহে। কেন-না, অবয়বের অপগম উপগম হেতু যে বৈপরীত্য, তাহাতে তত্তদ্দেহ-পরিমিতত্বের বিরুদ্ধতা ঘটে; এবং জীবের বিকারাদি স্বীকার করিতে হয়। জীবের বিকার স্বীকার করিলে, অনিত্যতা-কৃত হানি অকৃতভ্যাগম প্রভৃতি অপরিহার্য্য হয়। মুক্তিকালিক অপরিমাণভূত দেহ নিত্য। তাহা পরিমাণবিশিষ্ট ও বিকারাদি-সম্ভব হইলে পূর্ব্বোক্তি অসঙ্গত হয়। জন্যত্বাজন্যত্ব-হেতু সত্যাসত্য-বিকল্প-বশতঃ জীবের স্থৈর্য্যত্ব নিত্যত্ব অসম্ভব হইয়া পড়ে।'

উপসংহারে জৈনাভিমত মুক্তির বিষয়েও দোষ প্রদর্শন করা হইতেছে। ষটত্রিংশ সূত্রে ও তাহার ভাষ্যে সেই ভাব প্রকাশমান। বেদান্ত-দর্শনের সূত্র ও তদ্ভাষ্য; যথা—

"অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষাৎ॥ ৩৬॥"

"ন চেত্যনুবর্ত্ততে। অন্ত্যাবস্থিতের্মোক্ষাবস্থায়াশ্চাবিশেষাৎ। সংসারাবস্থাতো বিশেষাভাবায় যুক্তো জৈনসিদ্ধান্তঃ। অবিশেষঃ কুতঃ উভয়েতি। সদোর্দ্ধগতিরলোকাকাশস্থিতিশ্চ মুক্তিরুক্তা তয়োরুভয়োর্মুক্তিত্বেন নিত্যত্বাঙ্গীকারাৎ। ন হি সদোর্দ্ধং গচ্ছন্নিরাশ্রয়তয়া বা তিষ্ঠন্ কশ্চিৎ সুখীভবতি। ন চ সদেহস্য তথাত্বং দুঃখায় ন তু নির্দেহস্যেতি বাচ্যম্। তদাবয়বস্য চ দেহবত্তারবত্বাৎ। ন চ সা সা চ নিত্যেতি শক্যং বক্তুং ক্রিয়াত্বেন বিনাশধ্রোব্যাৎ। তস্মাত্তুচ্ছমেত জৈনমতং হাসপাটবমবগাহয়তি লোকানিতি। এতেন বিশ্বং সদসদ্ভিন্নম্ ঔপনিষদমপি ব্রহ্ম সর্ব্বশব্দাবাচ্যমিত্যাদি বিরুদ্ধং জল্পন্ জৈনসমো মায়ী চ দূষিতঃ॥ ৩৬॥"

অর্থাৎ,—'নিত্যত্ব হেতু উভয় অবস্থার মধ্যে কোনও বিশেষ ভাব নাই। অন্ত্যাবস্থিত (সংশয়াবস্থা) ও মোক্ষাবস্থা অবিশেষ-ভাবাপন্ন। জৈনসিদ্ধান্ত মতে সংসারাবস্থাতে কোনও বিশেষভাব যুক্ত হয় না। উভয়ই অবিশেষ—এই হেতু জীবের সদা উর্দ্ধগতি এবং অলোকাকাশস্থিতি, মুক্তির বিষয় উক্ত হইয়া থাকে। উভয়ত্রই মুক্তিত্ব-লাভ-প্রসঙ্গে নিত্যত্ব অঙ্গীকার করিতে হয়। সদা উর্দ্ধগতি অথবা অলোকাকাশে নিরাশ্রয়ভাবে অবস্থিতি এতদুভয় অবস্থায় কাহাকেও সুখী হইতে দেখা যায় না, অথবা কাহারও সুখী হওয়ার সম্ভাবনা নাই। জীব স্বদেহ, সুতরাং সে অবস্থা দুঃখকর। এ হেতু জীবকে নির্দেহও বলা যায় না। কেন-না, সে অবস্থায়ও দেহ-বৎ অবয়বের ভাব আসে। অপিচ, ঐ অবস্থাদ্বয়কে নিত্যও বলিতে পারা যায় না। কেন-না, ক্রিয়াত্বহেতু উহার বিনাশ নিশ্চিত। এই সকল কারণে জৈনমত জনসাধারণের নিকট উপহাসাস্পদ। বিশ্ব সদসদ্ভিন্ন ও উপনিষৎ প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবাক্যের অতীত—বিরুদ্ধ-মতের কল্পনাকারী জৈনসথা মায়াবাদীরাও এবম্বিধ যুক্তিতেই পরাস্ত হন।'

জৈনাদি মত নিরাস করিয়া অতঃপর পাশুপতাদি মতের খণ্ডন করা হইতেছে। সেই মতের পরিচয় ও প্রতিবাদ প্রসঙ্গে ভাষ্যকার লিখিতেছেন,—'এক্ষণে পাশুপতাদি মত (শৈব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি পাশুপত সম্প্রদায়ভুক্ত) প্রত্যাখ্যাত হইতেছে। পাশুপতাদিমতে কার্য্য, কারণ, যোগ, বিধি ও দুঃখান্ত—এই পঞ্চ পদার্থ স্বীকার করা হয়। পশুপতি ঈশ্বর কর্তৃক পশুপাশ-বিমোক্ষণের জন্য এই মত উপদিষ্ট হইয়াছিল। এতদনুসারেই এই মত 'পাশুপত মত' নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। এ মতে—পশুপতিই নিমিত্ত-কারণ, মহদাদিই কার্য্য, ওঁকার-পূর্ব্বক ধ্যানাদিই যোগ, ত্রৈকালিক্ স্নানই বিধি, এবং দুঃখান্তই মোক্ষ। যাঁহারা গণপত্য ও সৌর সম্প্রদায়ভুক্ত তাঁহারা যথাক্রমে গণপতিকে ও দিনপতিকে নিমিত্ত-কারণ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। তদনুসারে গণপতি বা সূর্য্য হইতে প্রকৃতি ও কাল দ্বারা বিশ্ব-সৃষ্টি সাধিত হয়। গণপতির বা সূর্য্যের উপাসনা দ্বারা জীব তৎসামীপ্য লাভ করিয়া অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষ লাভ করে। গাণেশ ও সৌর সম্প্রদায়ের ইহাই অভিমত।' এ বিষয়ে ভাষ্যকারের উক্তি—

পাশুপত মত নিরাস।

"ইদানীং পাশুপতাদিমতানি প্রত্যাখ্যাতি। তত্র পাশুপতা মন্যন্তে। কারণ-কার্য্যযোগবিধিদুঃখান্তাঃ পঞ্চ পদার্থাঃ পশুপাশবিমোক্ষণায়েশ্বরেণ পশুপতি-নোপদিষ্টাঃ। তত্র পশুপতিঃ নিমিত্তকারণং মহদাদি কার্য্যং ওঁকারপূর্ব্বকো ধ্যানাদির্যোগঃ ত্রিসবনস্নানাদির্বিধিঃ দুঃখান্তো মোক্ষ ইতি। এবং গণপতির্দিন-পতিশ্চেশ্বরো নিমিত্তকারণং তস্মাত্তস্মাচ্চ প্রকৃতিকালদ্বারা বিশ্বসৃষ্টিঃ তদুপাসনয়া তদন্তিকমুপাগতস্য জীবস্য দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তির্মোক্ষ ইতি গাণেশাঃ সৌরাশ্চাহুঃ।"

এক্ষণে পাশুপতাদি মতের সিদ্ধান্তও যুক্তিযুক্ত কি না, তাহা বিচার করা হইতেছে। কুলালাদি চক্রের নিমিত্তত্ব-দর্শন-হেতু ঘটাদি-কর্ত্তা তদ্রূপ সাধন দ্বারা মোক্ষ লাভ করিতে পারেন,—এবম্বিধ পূর্ব্বপক্ষ প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহার খণ্ডনার্থ সপ্তত্রিংশ সূত্রের অবতারণা করা হইতেছে। প্রথমে ভাষ্যকার কর্তৃক উপস্থাপিত পূর্ব্বপক্ষের সংশয় এবং তৎপরে মতের খণ্ডন উপলক্ষে সপ্তত্রিংশ সূত্র ও তাহার ভাষ্য প্রকটিত হইয়াছে। যথা,—

"তত্র সংশয়ঃ। পাশুপতাদিসিদ্ধান্তো যুক্তো ন বেতি। ঘটাদিকর্ত্তৃণাং কুলালাদীনাং নিমিত্তত্বস্যৈব দর্শনাত্তদুক্তসাধনৈর্মোক্ষস্যাপি সম্ভবাৎ যুক্ত ইতি প্রাপ্তে—

'পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ॥' ৩৭॥"

"নেত্যনুবর্ত্ততে। পত্যুঃ সিদ্ধান্তো নোপযুজ্যতে। কুতঃ অসামঞ্জস্যাৎ বেদবিরোধাৎ। বেদঃ খল্বেকস্যৈব নারায়ণস্য বিশ্বৈকহেতুতাং তদন্যস্য ব্রহ্ম রুদ্রাদেস্তৎকার্য্যতামভিধত্তে তদর্পিতবর্ণাশ্রমধর্ম্মজ্ঞানভক্তিহেতুকং মোক্ষঞ্চ। তথা হ্যথর্ব্বসু পঠ্যতে। তদাহুরেকো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মান ঈশানো নাপো নাগ্নিসোমৌ নেমে দ্যাবাপৃথিবী নক্ষত্রাণি ন সূর্য্যঃ স একাকী ন রমতে তস্য ধ্যানান্তস্থস্য যত্র স্তোমমুচ্যতে তস্মিন্ পুরুষাশ্চতুর্দ্দশ জায়ন্তে। একা কন্যা দশেন্দ্রিয়াণি মন একাদশং তেজো দ্বাদশমহঙ্কারস্ত্রয়োদশঃ প্রাণাশ্চতুর্দ্দশ আত্মা পঞ্চদশঃ বুদ্ধিঃ পঞ্চতন্মাত্রাণি পঞ্চভূতানীত্যাদি। তস্য ধ্যানান্তস্থস্য ললাটাত্র্যক্ষঃ শূলপাণিঃ পুরুষো জায়তে বিভ্রচ্ছ্রিয়ং সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং তপো বৈরাগ্যমিত্যাদি।

তত্র ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখোঽজায়তেত্যাদি চ। তেষ্বেবানাত্র। অথ পুরুষ হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়েত্যারভ্য নারায়ণাদ্ব্রহ্মা জায়তে নারায়ণাদ্রুদ্রো জায়তে নারায়ণাৎ প্রজাপতিঃ প্রজায়তে নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে নারায়ণাদষ্টৌ বসবো জায়ন্তে নারায়ণাদেকাদশ রুদ্রা জায়ন্তে নারায়ণাদ্-দ্বাদশাদিত্যা জায়ন্তে ইত্যাদি। ঋক্ষু চ। অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ। যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্ অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবেহন্ত বা উ অহং জনায় সমদং কৃণোমি অহং দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশেত্যাদি। অথ যজুঃষু। তমেতং বেদানুবচনেনেত্যাদি। বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য ইত্যাদি চ। স্মৃতয়োঽপি বেদানুসারিণ্যোঽসকৃদেতদর্থমাহুঃ। যে তু পশুপত্যাদয়ঃ শব্দাঃ স্ববাচ্যানাং সর্ব্বেশতাং সর্ব্বকারণতাং চ প্রকাশয়ন্তঃ কচিদুপলভ্যন্তে তে কিল নারায়ণাত্মকতাদৃশস্ববাচ্যবাচিন এব স্যুরুক্তশ্রুত্যবিরোধাৎ। সমন্বয় লক্ষণনির্ণয়াচ্চেতি সর্ব্বমবদাতম্॥ ৩৭॥"

ভাষ্যের ভাবার্থ,—'পূর্ব্বোক্ত (পাশুপতাদি মতের) সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে। ঐ সকল মতের অসামঞ্জস্যের কারণ—ঐ সকল মত বেদবিরুদ্ধ। নারায়ণই বিশ্বের একমাত্র হেতু; তদতিরিক্ত ব্রহ্ম-রুদ্রাদি কর্তৃক তৎকার্য্য সাধিত। বেদে এইরূপ উপদেশ আছে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মও জ্ঞানভক্তি-মোক্ষের হেতুভূত। অথর্ব্বোপনিষদে দেখিতে পাই—আদিতে এক নারায়ণ বিদ্যমান ছিলেন। তখন ব্রহ্মা, ঈশান, বরুণ, অগ্নি, সোম, স্বর্গ, পৃথিবী, নক্ষত্র-সমূহ, সূর্য্য প্রভৃতি কিছুই ছিল না। তাঁহার ধ্যান-প্রভাবে তাঁহা হইতে চতুর্দ্দশ পুরুষ উৎপন্ন হয়। এক কন্যা, দশ ইন্দ্রিয়, একাদশ মন, দ্বাদশ তেজ, ত্রয়োদশ অহঙ্কার, চতুর্দ্দশ প্রাণ, পঞ্চদশ আত্মা, বুদ্ধি, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চভূত প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। ধ্যানস্থিত সেই নারায়ণের ললাট হইতে ত্রিনেত্র শূলপাণি পুরুষের উদ্ভব হয়। তাঁহাতে সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, তপ, বৈরাগ্য ইত্যাদি যুক্ত ছিল। তাঁহা হইতে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। অনন্তর সেই পুরুষ নারায়ণ প্রজাসৃষ্টির অভিলাষী হইয়া সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করেন। তাহাতে নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন, নারায়ণ হইতে রুদ্র উৎপন্ন হন, নারায়ণ হইতে প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন, নারায়ণ হইতে ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন, নারায়ণ হইতে অষ্টবসু জন্মগ্রহণ করেন, নারায়ণ হইতে একাদশ রুদ্র উৎপন্ন হন, নারায়ণ হইতে দ্বাদশ আদিত্য জন্মগ্রহণ করেন। ঋক, যজুঃ সর্ব্বত্রই নারায়ণের এইরূপ প্রাধান্য পরিকীর্ত্তিত। তদর্পিত কর্ম্মাদিই মোক্ষ। স্মৃতিও এ পক্ষে বেদের অনুসরণ করিয়া উপদেশ দিয়াছেন। পশুপতি প্রভৃতি শব্দে সেই সর্ব্বেশতা সর্ব্বকারণতা প্রকাশ পাওয়ায় উহার দ্বারা নারায়ণকেই বুঝাইতেছে। এ প্রকার অর্থের সমন্বয়-সাধনে ঐ সকল মতের সামঞ্জস্য সাধিত হইতে পারে।'

যাঁহারা বেদবিরোধী, অনুমানের দ্বারা ঈশ্বরের নিমিত্তমাত্র কল্পনা করেন, তাঁহাদিগের যুক্তি মান্য করিতে হইলে লৌকিক দৃষ্টান্তানুসারে সম্বন্ধাদি স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহা বিচারে দাঁড়াইতে পারে না। অষ্টত্রিংশ ও ঊনচত্বারিংশ সূত্রে এবং সূত্রদ্বয়ের ভাষ্যে সে অযৌক্তিকতা প্রদর্শিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বপক্ষ রূপে ভাষ্যকারের উক্তি, সূত্র দুইটী এবং তাহাদের ভাষ্য নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল; যথা,—

"অথ বেদবিরোধিনাং তেষামনুমানেনৈব নিমিত্তমাত্রেশ্বরকল্পনা। তথা সতি লোকদৃষ্টানুসারেণ সম্বন্ধাদি বাচ্যম্। তচ্চ বিকল্পাসহমিত্যাহ।"

'সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ॥' ৩৮॥

"পত্যুর্জগৎকর্তৃত্বসম্বন্ধো নোপপদ্যতে অদেহত্বাদেব। সদেহস্যৈব কুলালাদের্মৃদাদি সম্বন্ধদর্শনাৎ সম্বন্ধোঽনুপপন্নঃ॥ ৩৮ ॥"

'অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ॥' ৩৯॥

"ইয়মপ্যদেহত্বাদেব। সদেহো হি কুলালাদির্ধরাত্বধিষ্ঠানঃ কার্য্যং কুর্ব্বন্ দৃশ্যতে॥ ৩৯॥"

অর্থাৎ,—'সম্বন্ধে অনুপপত্তি বশতঃ মত অপ্রতিষ্ঠিত হয়। ঈশ্বরের অদেহত্ব হেতু তাঁহার জগৎকর্তৃত্ব সম্বন্ধ সপ্রমাণ হয় না। দেহবিশিষ্ট কুলালাদির সহিত মৃত্তিকাদির সম্বন্ধ দেখিয়া অদেহী ঈশ্বরের সহিত তদ্রূপ সম্বন্ধ অনুপপন্ন হয়। ৩৮॥ অধিষ্ঠানের অনুপপত্তিও পূর্ব্বোক্ত মতের অসম্ভবত্ব প্রতিপন্ন করে। তাঁহার অদেহত্ব সুতরাং অধিষ্ঠানাভাব। কুললাদি ও মৃত্তিকাদি সদেহ সুতরাং অধিষ্ঠানে অবস্থিত হইয়াই কার্য্য করে, দেখিতে পাওয়া যায়। ৩৯।'

এ ক্ষেত্রে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে,—জীব দেহরহিত ছিল। দেহের ও ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানে তাঁহার সদেহত্ব হইল। ঈশ্বরেও সেইরূপ প্রধানের অধিষ্ঠান ঘটিতে পারে। তাহার উপরে চত্বারিংশ সূত্র প্রযুক্ত রহিয়াছে। পূর্ব্বপক্ষ রূপে ভাষ্যকারের উক্তি, চত্বারিংশ সূত্র ও তাহার ভাষ্য যথাক্রমে নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা,—

"নন্বদেহস্যৈব জীবস্য দেহেন্দ্রিয়াদি যথাধিষ্ঠানমেবং পত্যুরপি তাদৃশস্য প্রধানং তৎ স্যাদিতি চেত্তত্রাহ।

'করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ॥' ৪০॥"

"প্রলয়ে প্রধানমস্তি। তচ্চ করণমিব ক্রিয়োপকারকমধিষ্ঠায় পতির্জগৎ কুর্য্যাদিতি ন শক্যং বক্তুম্। কুতঃ ভোগাদিভ্যঃ। করণস্থানীয়প্রধানে পাদানহানাদিনা জন্মমরণপ্রাপ্ত্যা সুখদুঃখভোগানীশ্বরত্বপ্রসঙ্গাৎ॥ ৪০॥"

অর্থাৎ,—'করণবৎ ভোগাদিও বলা যাইতে পারে না। প্রলয়ে প্রধান বিদ্যমান থাকেন। তিনি করণ-স্বরূপ। তাঁহার অধিষ্ঠানে জগৎপতি জগৎসৃষ্টি করেন, ইহাও যুক্তিযুক্ত বলা যাইতে পারে না। তাঁহার ভোগাদি কোথায়? করণ-স্থানীয় প্রধানের উপাদানহানি হেতু জন্মমরণপ্রাপ্তিরূপ যে সুখদুঃখভোগ, তাহাতেই অনীশ্বরত্ব প্রসঙ্গ আসে।'

অদৃষ্ট-অনুরোধে যদি কেহ জগৎপতির কিঞ্চিদ্দেহাদি কল্পনা করেন; যদি কেহ এরূপ বলেন যে, ইহলোকে পুণ্যপ্রভাবে যেমন মানুষ রাজদেহ ধারণ করে; যেমন অধিষ্ঠানভূত রাষ্ট্রের অধিপতি হয়; ইহাও সেইরূপ। কিন্তু তাহাতেও দোষ আসে। একচত্বারিংশ সূত্রে ও তদ্ভাষ্যে সেই দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বপক্ষরূপে ভাষ্যকারের উক্তি এবং তদ্দোষ-প্রদর্শনে বেদান্ত-দর্শনের একচত্বারিংশ সূত্র ও তাহার ভাষ্য; যথা—

"নন্বদৃষ্টানুরোধেন পত্যুঃ কিঞ্চিদ্দেহাদিকং কল্প্যম্। দৃশ্যতেহ্যগ্রপুণ্যো রাজা সদেহঃ সাধিষ্ঠানশ্চ রাষ্ট্রস্যেশ্বরঃ ন তু তদ্বিপরীত ইতি চেৎ তত্র দূষণং দর্শয়তি।

'অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা ॥ ৪১ ॥"

"এবং সতি দেহাদিসম্বন্ধঘটিতমন্তবত্ত্বং তস্য জীববৎ স্যাৎ অসার্ব্বজ্ঞঞ্চ। ন হি কর্ম্মাধীনস্য সার্ব্বজ্ঞ্যং যুজ্যতে। তথা চাবিনাশী সর্ব্বজ্ঞশ্চেত্যভ্যুপগমক্ষতিঃ। ন চৈবং ব্রহ্মবাদে কোঽপি দোষঃ তস্য শ্রুতিমূলত্বাৎ। দর্শিতং চেদং শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাদিত্যত্র। পতীনাং স্বাতন্ত্র্যমিহ নিরস্তম্। তদীয়ত্বেন সৎকারস্ত্বঙ্গীক্রিয়তে। এবঞ্চ পাশুপতাদি ত্রিমতী পরিহারার্থমেষা পঞ্চসূত্রী পরিহার হেতুসামান্যাৎ। অতঃ পত্যুরিত্যবিশেষোল্লেখঃ। তার্কিকাদিসম্মতেশ্বরকারণতানিরাসার্থং সেত্যন্যে ॥ ৪১ ॥"

অর্থাৎ,—'ইহাতে অন্তবত্ত্ব (শেষত্ব) ও অসর্ব্বজ্ঞতা দোষ ঘটে। দেহাদি সম্বন্ধ থাকিলেই তাহা অন্তবত্ত্ব আর তাহা জীববৎ অসার্ব্বজ্ঞ হয়। কর্ম্মাধীন জীবে সর্ব্বজ্ঞত্ব কখনও প্রযুক্ত হইতে পারে না। অতএব অবিনাশী ও সর্ব্বজ্ঞ প্রভৃতি যে বিশেষণ, তাহা নিরর্থক প্রতিপন্ন হয়। ব্রহ্মবাদে এরূপ দোষ সঙ্গত নহে। কেন-না, উহা শ্রুতিমূলক। শ্রুতি—শব্দ-মূলকত্ব। শাস্ত্রে ইহাই দেখিতে পাই। অতএব জগৎপতিগণের স্বাতন্ত্র্য নিরাশ করা হইল। ত্বদীয়ত্ব (ঈশ্বরত্ব) হেতু সৎকার অঙ্গীকার করিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ সূত্র পাশুপতাদি তিনটী মত পরিহারার্থ প্রযুক্ত। পতি ইতি শব্দের অবিশেষ উল্লেখ, সাম্য-হেতুই মনে করিতে হইবে। তার্কিকাদি-সম্মত ঈশ্বরকারণতা নিরাসার্থও উক্ত সূত্র-পঞ্চকের অবতারণা হইয়াছে বলিয়াও কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন।'

পাশুপতাদি মতের খণ্ডনানন্তর শক্তিবাদে দোষ প্রদর্শন করা হইয়াছে। শাক্তগণের মত এই যে, শক্তিই বিশ্বের হেতু। তিনি সার্ব্বজ্ঞ-সত্যসঙ্কল্পাদি গুণবতী। এ মত যুক্তিযুক্ত কি অসম্ভব—এবম্বিধ সংশয়ের নিরাসার্থ শাক্তগণ বলিয়া থাকেন যে, শক্তি যখন তাদৃশ গুণশালিনী, তখন তাঁহা হইতেই যে বিশ্বসৃষ্টি, তাহা উপপন্ন হইতে পারে। এবম্প্রকার পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনার্থ "উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ"—এই দ্বিচত্বারিংশ সূত্রের ও তাহার ভাষ্যের অবতারণা। পূর্ব্বপক্ষ রূপে ভাষ্যকারের উক্তি, বেদান্ত-দর্শনের সূত্র ও তাহার ভাষ্য নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল; যথা—

শক্তিবাদ নিরাস।

"অথ শক্তিবাদং দূষয়তি। সার্ব্বজ্ঞসত্যসঙ্কল্পাদিগুণবতী শক্তিরেব বিশ্বহেতুরিতি শাক্তা মন্যন্তে। তৎসম্ভবেন্ন বেতি বিচিকিৎসায়াং তাদৃশ্যা তয়া বিশ্বসৃষ্ট্যুপপত্তেঃ সম্ভবেদিতি প্রাপ্তে প্রত্যাচষ্টে।

'উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ॥' ৪২ ॥"

"নেত্যাকর্ষণীয়ম্। ইহাপি বেদবিরোধাদনুমানেনৈব শক্তিকারণতা কল্পনীয়া। তেন লোকদৃষ্টৈব যুক্তির্ব্বক্তব্যা। ততশ্চ শক্তির্বিশ্বজনয়িত্রীতি নোপপদ্যতে। কুতঃ কেবলায়াস্তস্যাস্তদুৎপত্ত্যযোগাৎ। ন হি পুরুষানমুগৃহীতাভ্যঃ স্ত্রীভ্যঃ পুত্রাদয়ঃ সম্ভবন্তো বীক্ষ্যন্তে লোকে। সার্ব্বজ্ঞ্যাদিকং ত্বপ্রেক্ষ্যাভিহিতং লোকেঽদর্শনাৎ ॥ ৪২ ॥"

অর্থাৎ,—উৎপত্তি অসম্ভব হেতু শক্তিবাদ যুক্তিযুক্ত নহে। ইহাতে বেদবিরোধ ঘটে। কেন-না, অনুমানের দ্বারা শক্তির জগৎকারণত্ব কল্পিত হয়। এই হেতু এ বিষয়ে লৌকিক যুক্তির প্রয়োগের আবশ্যকতা অনুভূত হইতেছে। তাহাতে শক্তির বিশ্বজনয়িত্রী ভাব উপপন্ন হয়

না। কেবল শক্তির দ্বারা জগদুৎপত্তি অসম্ভব। পুরুষানুগ্রহ ব্যতীত স্ত্রীর পুত্রাদি সম্ভব হয় না। পুরুষ-সংসর্গ-শূন্যতায় শক্তির উৎপত্তি অবিচার্য্য এবং ইহলোকে দৃষ্ট হয় না।

এ ক্ষেত্রে যদি বলা হয়, শক্তির অনুগ্রহকর্ত্তা পুরুষ, পুরুষের দ্বারা অনুগৃহীত হইয়াই শক্তি বিশ্বোৎপত্তিতে সমর্থা হন,—তাহাও স্বীকার করা যায় না। ত্রিচত্বারিংশ সূত্রে এ মতের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হইতেছে। পূর্ব্বপক্ষরূপে ভাষ্যকারের উক্তি, বেদান্ত-দর্শনের ত্রিচত্বারিংশ সূত্র ও তাহার ভাষ্য যথাক্রমে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল; যথা,—

"অথাস্তি শক্তেরনুগ্রহকর্ত্তা পুরুষস্তেনানুগৃহীতা তু সা তদ্ধেতুরিতি মতম্। তত্রাহ।

'ন চ কর্ত্তুঃ করণম্॥' ৪৩॥"

"যদি শক্ত্যনুগ্রাহকঃ পুরুষোঽপ্যঙ্গীকার্য্যস্তর্হি তস্যাপি বিশ্বোৎপত্ত্যুপযোগিদেহেন্দ্রিয়াদি করণং নাস্তীতি নানুগ্রহোপপত্তিঃ। সতি চ তস্মিন্ প্রাগুক্তদোষানতিবৃত্তিঃ॥ ৪৩॥"

অর্থাৎ,—'যদি শক্তির অনুগ্রাহক পুরুষকেও স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বিশ্বোৎপত্তির উপযোগী দেহেন্দ্রিয়াদির স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু নির্দেহ পুরুষে সেরূপ সম্ভবে না। সুতরাং তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত দোষের প্রতিনিবৃত্তি হয় না।'

নিত্যজ্ঞানেচ্ছাদি গুণ-সম্পন্ন বলিয়া স্বীকার করিলেও সে দোষের নিরাস হয় না। চতুশ্চত্বারিংশ সূত্রে ও তাহার ভাষ্যে সূত্রকার তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন। যথা,—

"নন্ নিত্যজ্ঞানেচ্ছাদি গুণকোঽসাবিতি চেৎ তত্রাহ—

'বিজ্ঞানাদিভাবে বা তৎপ্রতিষেধঃ॥' ৪৪॥"

"তস্য পুরুষস্য নিত্যজ্ঞানেচ্ছাদিকরণমস্তীতি চেত্তর্হি তদপ্রতিষেধো ব্রহ্মবাদান্তর্ভাবঃ। তত্র তাদৃশাৎ পুরুষাদ্বিশ্ব সৃষ্ট্যঙ্গীকারাৎ॥ ৪৪॥"

অর্থাৎ,—'বিজ্ঞানাদি ভাবে ও তাহার প্রতিষেধে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত ব্যর্থ হয়। কেন-না, পুরুষকে মৃত্যু-জ্ঞানেচ্ছাদিময় মনে করা এবং তাহার প্রতিষেধ ব্রহ্মবাদেরই অন্তর্গত। সেইরূপে পুরুষেই বিশ্বসৃষ্টি কার্য্য স্বীকৃত হয়।'

নিঃশ্রেয়সকামিগণের নিকট শক্তিমাত্র কারণবাদ যে আবরণীয় হইতে পারে না, পঞ্চচত্বারিংশ সূত্রে তাহাই প্রতিপন্ন করা হইতেছে। পূর্ব্বপক্ষ রূপে ভাষ্যকারের উক্তি, বেদান্তদর্শনের সূত্র ও তাহার ভাষ্য যথাক্রমে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল; যথা,—

"শক্তিমাত্রকারণতাবাদস্তু নিঃশ্রেয়সকামৈরণাদরণীয় এবেত্যুপসংহরতি—

'বিপ্রতিষেধাচ্চ॥' ৪৫॥"

"সর্ব্বশ্রুতিস্মৃতিযুক্তিবিরোধাত্তুচ্ছঃ শক্তিবাদঃ। শ্রুতয়ঃস্মৃতয়শ্চৈব যুক্তয়শ্চেশ্বরং পরম্। বদন্তি তদ্বিরুদ্ধং যো বদেত্তস্মান্ন চাধম ইতি হি স্মৃতিঃ। চশব্দে-নোৎপত্ত্যসম্ভবাদিতি হেতুঃ সমুচ্চিতঃ। তদেবং সাংখ্যাদিবর্ত্মনাং দোষ-কণ্টকবৈশিষ্ট্যাৎ তদ্রহিতং বেদান্তবর্ত্মৈব শ্রেয়োঽর্থিভিরাস্থেয়মিতি॥ ৪৫॥"

অর্থাৎ,—'বিপ্রতিষেধ (তুল্যবলবিরোধ) বশতঃ শক্তিবাদ নিঃশ্রেয়স কারণ হইতে পারে না। শক্তিবাদ সর্ব্বশ্রুতিস্মৃতি যুক্তিবিরোধহেতু তুচ্ছ। শ্রুতিস্মৃতি মতে ঈশ্বর 'পরম' বলিয়া উক্ত আছেন। যাহাতে তাহার বিরুদ্ধ মত ব্যক্ত হয়, তাহা অধম। স্মৃতিতে এইরূপ উক্তি আছে।

চ শব্দে বিশ্বোৎপত্তির অসম্ভাবনা খ্যাপিত হইতেছে। এবম্বিধ নানা কারণে সাংখ্যাদি পথ দোষকণ্টকবিশিষ্ট মনে করিয়া শ্রেয়ার্থী ব্যক্তিগণ বেদান্তবর্ত্ম অনুসরণ করিবেন।'

বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়, এইরূপ বিভিন্ন প্রকার বিচার-বিতর্কের অবতারণায় আপন-আপন মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে প্রযত্নপর হইয়াছেন। এই একই বেদান্ত-সূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীমৎ বলদেব বিদ্যাভূষণ যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যে অনেক স্থলে তাহার আবার প্রকারান্তর দেখা যায়। বিদ্যাভূষণ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা-কল্পে নারায়ণ বিষ্ণুকেই সর্ব্বকারণ-রূপে প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে যে যুক্তি অবলম্বন শ্রেয়ঃ বলিয়া অনুভব করিয়াছেন; শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের 'সোঽহং"-বাদ-খ্যাপনে তাহা অন্যরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুর মধ্যেই ভাব-প্রবাহের যখন এতাদৃশ বিভিন্নতা, তখন অন্য সম্প্রদায়ে সে বিভিন্নতা যে গুরুতর হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। তাই বেদান্ত-সূত্রে বা তাহার ব্যাখ্যায় ভারতীয় বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্ম্মমতের অযৌক্তিকতা প্রতিপাদনের যেমন চেষ্টা হইয়াছে; অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের দর্শনকারগণও তেমনই তদিতর সম্প্রদায়ের মতকে তর্ক-কুঠারে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। একদেশদর্শী-রূপে এক পক্ষের যুক্তিই আমরা প্রকাশ করিলাম বটে; কিন্তু একটু স্থির-ধীর-ভাবে দেখিলে অন্য-পক্ষের যুক্তিও বড় অল্প তীক্ষ্ণ-ধার-সম্পন্ন বলিয়া মনে হয় না। দৃষ্টান্তস্থলে বেদান্ত-মত খণ্ডনে, জৈন-দার্শনিকগণের কয়েকটী অচ্ছেদ্য যুক্তির অবতারণা করাও এ ক্ষেত্রে তাই আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছি। অধিক বলিব কি, শঙ্করাবতার শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের যুক্তিও যে অনেক স্থলে ছিন্ন হইতে পারে, সে আলোচনায় অনেকেরই তাহা প্রতীতি হইবে। পূর্ব্বোক্ত "নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ" (২য় পাদ, ২য় অঃ, ৩৩শ সূত্র) সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্যও 'অস্তি নাস্তি' মূলক জৈনমতের প্রতিবাদ করিয়াছেন; বলিয়াছেন,—"উষ্ণ ও শৈত্য যেমন একযোগে অবস্থিতি করিতে পারে না, 'অস্তিত্ব' ও 'নাস্তিত্ব' সেইরূপ একই পদার্থ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না।" কিন্তু জৈন-দার্শনিকগণ তাহার কি উত্তর দিয়া থাকেন, তাহাও অনুধাবন করিয়া দেখা যাইতে পারে। অধুনা-প্রকাশিত জৈন-সম্প্রদায়ের একখানি ইংরাজী গ্রন্থে এ সম্বন্ধে কিরূপ যুক্তি-তর্ক অবলম্বিত হইয়াছে, নিম্নে তাহা প্রকাশ করিতেছি। * সেই ইংরাজী অংশের

পরস্পরের বিতর্ক-বিতণ্ডা।

---

* "Such is the criticiism which Shankar makes taking his stand on the *Sutra* "Not; because of the Impossibility in one"—(নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ) of the *Vendanta Sutras* by *Vyasa.* Or, in other words, 'it is impossible', remarks Shankar, 'that contradictory attributes, such as *being* and *non-being* should at the same time belong to one and the same thing'....But when he starts his criticism with the startling remark that, *being* and *non-being* cannot co-exist in one and the same thing, we begged to differ from him. Shankar puts all through his arguments a great stress on the Law of Contradiction....

"When the Formal Logic laid down the Law of Contradiction as the highest law of thought, what it evidently meant is simply this that distinction is necessary

মর্ম্মার্থ,—একই পদার্থ সম্বন্ধে 'আছে ও নাই' ('অস্তি' ও 'নাস্তি') শব্দ প্রয়োগে বিরুদ্ধ-বাদ-জনিত দোষ ঘটে;—শঙ্করাচার্য্য এই হিসাবেই ঐ কথা কহিয়া থাকিবেন। তর্কবাদে

অস্তি-নাস্তির সমাবেশ অসম্ভব নয়।

এ পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাব একই পদার্থে তিষ্ঠিতে পারে না সত্য; কিন্তু চিন্তার মধ্যে, মননে বা সঙ্কল্পে, এ যুক্তির স্থান অবশ্যই আছে। কোনও পদার্থ যদি নির্দ্দিষ্টরূপে নির্ণীত ও সংজ্ঞাপ্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে তৎ-সম্বন্ধে চিন্তা ও জ্ঞান মুহ্যমান হয়। যাহা 'ক' এবং যাহা 'ক'-নহে, তাহাকে যদি একই পদার্থ বলি, অভিন্ন-বাক্যে সংজ্ঞিত করি, তাহা হইলে সেই বাক্যেরও কোনও অর্থ পরিগ্রহ

---

for thought. Unless things are definitely what they are and are kept to their definition, thought and knowledge become imposible. For instance, if *A* and *not-A* be the same it is hardly possible to find any meaning even in the simplest statements, for the nature of the thing becomes absolutely indefinite and so indeterminate. Hence Formal Logic teaches that thought is distinction and is not possible without it."

"But is thought simply a distinction and nothing else? Is the distinction absolute and ultimate? We, the Jains, would undoubtedly say that it can never be absolute distinction. If thought is distinction yet it implies at the same time relation. Everything implies something other than it: 'This implies That"; 'Now implies Then'; 'Here implies There'; and the like. Each thing, each aspect of reality is possible only in relation to and distinct from some other aspect of reality. If so, A is only possible in relation to and distinct from *not-A*. Thus, by marking one thing off from another, it, at the same time, connects one thing with another. A thing which has nothing to distinguish from, is as impossible as equally unthinkable is the thing which is absolutely separated from all others so as to have no community between them. An absolute distinction would be self-contradictory for it would cut off every connection or relation of the thing from which it is distinguished. The principle of absolute contradiction is suicidal; because it destructs itself,...

"To illustrate let us take the instance of the jar. I say that the jar is a finite object. Now, what do we mean by finite thing is that it is limited in extent. And the question may be raised: is the limit self-imposed or imposed from without. Or, in other words, is the limit created by the object itself or is it due to the presence of another which limits it. The answer must be that it is limited by something else. Now, may it not be said that the jar is finite only by virtue of something else? It is what it is only in relation with something else, without which its existence as such would be impossible. So the Law of Contradiction, if it speaks of absolute difference, is manifestly a suicidal principle.

"Take any thought-determination and the same principle will hold good. The

হয় না। গাহারা পরস্পর প্রকৃতিবিরুদ্ধ, তাহাদের অভিন্নত্ব কি প্রকারে সম্ভবপর? সাধারণ তর্কবাদ এই কারণেই শিক্ষা দেয়,—চিন্তায় পার্থক্য আছেই, আর সে পার্থক্য ভিন্ন চিন্তার

---

jar is what it is, because it serves certain purpose, has certain shape, certain colour &c· These different ideas constituting one whole is what we know as the jar. May it not be said then that this whole of the different ideas is what it is only by virtue of some thing or some other which is its negative? For if we try to hold this *commonplace* whole of ideas to the exclusion of its negative, if we try to hold it to itself it disappears.

"We submit, therefore, that such a remark as made by Sankara is due to his gross misunderstanding of the dialectic principle of our reasoning. For, as we interpret and use the principle it is all right. We, the Jains, hold that every thought or being *is* only in relation to the fourfold nature of *itself*. But *is not* in relation to the fourfold nature of the *other* (সর্ব্বমস্তিস্বরূপেণ পররূপেণ নাস্তি চ) : for instance, the jar when it is thought in relation to (I) its own constituent substance—earth ; (ii) its own locality of existence in space—Calcutta ; (iii) its own period of coming into existence in time—Summer ; and (iv) its own mode of existence as revealed in its colour (red or the like) and capacity for containing and carrying such and such quantity of water, the jar is said to exist, *i. e.* only in relation and particular combination of the fourfold nature of itself known techincally as *Svachatustaya*, the jar *is* (অস্তি), and has the nature and character of *being* (সৎরূপ). But when thought of in relation and particular combination of the fourfold elements, *viz*, constituent substance, locality, period and mode (দ্রব্যক্ষেত্রকালভাব) as belonging to the *other*, say, the picture, the jar *is not* (নাস্তি) and is of the nature of *non-being* (অসৎরূপ). Thus the picture is the *negation of the jar* and *viceversa* the jar is the *negation of the picture*. Everything *is* in relation only to the fourfold elements of *itself* but *is not* in relation only to the fourfold elements belonging to the *other*. If it were, otherwise, were everything said to exist in either relation *of itself* as well as of the *other*, then every thought and being, making up this our universe would have been transformed into one uniform homogeneous whole ; then light and darkness, knowledge and ne-science, being and non-being, unity and plurality, eternity and non-eternity, knowledge and the means thereof, all that go in pairs of opposites, and the like must needs be one homogeneous mass, so to speak, of one uniform nature and character without any difference and distinction between one and the other or between the parts of one and the same thing. But such homogeneity of nature and character in things all round us is contradicted by our sense perception which reveals but differences and diversities in things and realities.

"And now to turn the table, when you, Shankar, say 'Being is *Brahman*', you must

অস্তিত্বই অসম্ভব। আবার শুধুই যে পার্থক্য আছে, তাহাও নহে। পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি সম্বন্ধও বিদ্যমান। প্রত্যেক পদার্থই তাহার অতিরিক্ত অন্য পদার্থের বিষয় স্মরণ করাইয়া দেয়। 'এইটি' বলিলে 'সেইটি'র ভাব মনে আসে; 'এখানে' বলিলে 'সেখানে'র সম্বন্ধ জাগরুক হয়; 'এখন' বলিলে 'তখন'-কার স্মৃতি উদয় হইয়া থাকে। এইরূপ প্রত্যেক পদার্থ, প্রত্যেক সদ্ভাব, অন্য ভাবের বা অবস্থার সহিত সম্বন্ধযুক্ত আছেই আছে। এ যদি মানিতে হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বলিতে পারি, যাহা 'ক' এবং যাহা 'ক'-নহে—এ দুইয়ের মধ্যে সম্বন্ধও অঙ্গীকার করিতে হয়। এইরূপে বুঝা যায়, একের সহিত অন্যের বৈপরীত্য বিজ্ঞাপন করিলেই তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধের বিষয়ও সপ্রমাণ হইয়া যায়। অন্যের সহিত যাহার প্রভেদ নাই এমন যে পদার্থ, তাহার অস্তিত্ব অসম্ভব ও অচিন্তনীয়। সর্ব্বতোভাবে বৈপরীত্যসম্পন্ন পার্থক্য-বিশিষ্ট পদার্থের অস্তিত্ব-খ্যাপন স্বতঃবিরোধ-জ্ঞাপক; কেন-না, অন্য হইতে পৃথক সত্ত্বা মনন করিলেই সে 'অন্যের' সম্বন্ধ আপনা-আপনিই আসিয়া পড়িবে। এবংবিধ বৈপরীত্য-বাদ সম্পূর্ণ-রূপ যুক্তিহীন। নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের চিন্তায়, তাহার বিপরীত বিষয়ের সহিত সম্বন্ধের বিষয় নিশ্চয়ই সূচিত হয়। দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টী এইরূপে বুঝিতে পারা যায়। মনে করুন, এই একটী ঘট—সীমা-বিশিষ্ট পদার্থ। উহাকে সীমা-বিশিষ্ট মনে করিলেই উহার সীমার একটা পরিমাণ আছে, বুঝিতে হয়। কিন্তু সেই সীমা উহার আত্মগত বা অন্য কোনও পদার্থের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট? উহার সে সীমা ও নিজে করিয়াছে—না, অন্য কিছুর বিদ্যমানতা-হেতু ঘটিয়াছে? এখানে নিশ্চয়ই বুঝা যায়, ঐ ঘট ভিন্ন 'অন্য কিছু' উহার সীমার নির্দ্দেশক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অতএব প্রতিপন্ন হয়, ঐ ঘটের সীমা তদিতর পদার্থ দ্বারাই সূচিত হয়; এবং ঘটের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইলেই অন্য কিছু (ঘট ভিন্ন অন্য কিছু) মান্য করিতে হয়। এইরূপ ঘট মনে করিলে, তাহার আকার, বর্ণ প্রভৃতির বিষয় মনে আসে। সেই সকল বিভিন্ন ভাব-উপাদান লইয়াই ঘট-পদার্থের অস্তিত্ব। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলেই বুঝা যায়, যে বিভিন্ন ভাব-সমষ্টি ঘট-পদার্থের জ্ঞাপক; তাহা ঐ ঘটে আছে অথবা নাই—'ঘট' শব্দের উল্লেখে সেই উভয় ভাবই জ্ঞাপন করে। এইরূপে, ঘটের অস্তি-নাস্তি-মূলক যে সাধারণ ধর্ম্ম, তাহার প্রত্যাখ্যান করিলে ঘটের ঘটত্বই লোপ পায়। অতএব, এ পক্ষে শঙ্করাচার্য্যের যে যুক্তি, তাহা প্রমাদ-পরিশূন্য নহে। জৈন-দর্শনের মতে প্রত্যেক পদার্থই তাহার আত্মগত চতুর্ব্বিধ বিষয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত; পরন্তু পরগত সে চতুর্ব্বিধ বিষয়ের সহিত সে কোনরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট নহে। "সর্ব্বমস্তি স্বরূপেন পররূপেন নাস্তি চ";

---

have to admit that when *Brahman* is thought of in relation to what is *other* than Being, it is equal to Non-being (অসৎ). If you don't admit this, the Non-being of *Brahman* as what is *other* than the nature of Being itself, then your *Brahman* would be of the nature of *Non-Being*, say of Ne-science or illusion as well. But this would lead to the deterioration of the true nature of your *Brahma* which is but *existence* pure and simple."—Vide, *An Epitome of Jainism*.

অর্থাৎ, আত্ম-রূপের সহিত তাহার যে সম্বন্ধ, পর-রূপের সহিত তাহার সে সম্বন্ধ নাই। সেই ঘটের দৃষ্টান্তই এ পক্ষে প্রমাণ-স্বরূপ মনে করা যাইতে পারে। ঘটের অস্তিত্ব (বিদ্যমানতা) সপ্রমাণ হয়—চতুর্ব্বিধ বিষয়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ-হেতু। প্রথম—'দ্রব্য;' মৃত্তিকা ঘটের উপাদানভূত, সুতরাং 'দ্রব্য' বিষয়ে মৃত্তিকার সহিত তাহার সম্বন্ধ আছে বলিতে পারি। দ্বিতীয়—'ক্ষেত্র' (স্থান); ঘট কলিকাতায় বা যে স্থানেই অবস্থিত হউক, সেই ক্ষেত্রের (স্থানের) সহিত তাহার সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। তৃতীয়—'কাল'; শীত বা গ্রীষ্ম যে কালেই তাহার বিদ্যমানতার বিষয় অনুভব করা যাউক, তাহার সহিত তাহার সম্বন্ধ অপরিহার্য্য। চতুর্থ—'ভাব' (বর্ণাদি); ঘট শ্বেত বর্ণ হইতে পারে, কৃষ্ণ বর্ণ হইতে পারে, অথবা তাহাতে জলাদি ধারণের একটা পরিমাণ থাকিতে পারে; এবংবিধ সম্বন্ধকেই ঘটের চতুর্থ সম্বন্ধ বলিয়া স্বীকার করা যায়। ফলতঃ, পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ সম্বন্ধই (স্ব-চতুষ্টয়) ঘটের 'অস্তি' ভাব-জ্ঞাপক এবং তদ্দ্বারাই ঘট 'সৎ রূপ' অভিধায়ে অভিহিত হইয়া থাকে। অন্যপক্ষে 'পটের' দৃষ্টান্ত অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক। ঐরূপ দ্রব্য-কাল-ক্ষেত্র-ভাব চতুর্ব্বিধ বিষয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়াই পটের পটত্ব প্রতিপন্ন হয়; কিন্তু সাদৃশ্য-সম্বন্ধ সত্ত্বেও পট—পটই, পট কখনও ঘট নহে। সেখানে 'পটের' 'অস্তি'-ভাব অঙ্গীকার করিব বটে; কিন্তু ঘটের 'নাস্তি'-ভাব স্বীকার করিতে হইবেই; সেখানে ঘট 'নাস্তি', ঘট অসৎ-রূপ। এইরূপে ঘটের ক্ষেত্রে পটের 'নাস্তি'-ভাব এবং পটের ক্ষেত্রে ঘটের 'নাস্তি'-ভাব পর্য্যায়ক্রমে মানিয়া লইতে হয়। ফলতঃ, প্রত্যেক পদার্থই তাহার আত্মগত চতুর্ব্বিধ উপাদান-বিষয়ে 'অস্তি'-ভাবাপন্ন; আর পরগত সে চতুর্ব্বিধ উপাদান-বিষয় তাহার 'নাস্তিত্ব'-জ্ঞাপক। যদি বলা যায়—প্রত্যেক পদার্থই প্রত্যেক পদার্থের সহিত পূর্ব্বোক্ত আত্মগতভাবে ও পরগত-ভাবে সম্বন্ধযুক্ত আছে; তাহা হইলে সকলই অভিন্ন এক হইয়া দাঁড়ায়; তাহা হইলে, আলোক ও অন্ধকার, জ্ঞান ও অজ্ঞান, জীব ও অজীব, একত্ব ও বহুত্ব, সান্ত ও অনন্ত, জ্ঞান ও জ্ঞানের পন্থা, পরস্পর-বিপরীত-ভাবাপন্ন সমস্তই অভিন্ন একপিণ্ডাকারে পরিণত হইয়া যায়। তখন কোনও পদার্থের সহিত কোনও পদার্থেরই আর পার্থক্য স্বীকার করিতে পারা যায় না। কিন্তু সে অভিন্নত্ব—সে একত্ব আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির ধ্যান-ধারণার অগম্য। কেন-না, জ্ঞানে বস্তুপক্ষে ও সত্যপক্ষে স্বাতন্ত্র্য ও বিভিন্নতাই প্রকট হইয়া আছে। এ ক্ষেত্রে স্বয়ং শঙ্করের বাক্যই শঙ্করের সিদ্ধান্তের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায় না কি? তিনি যখন বলিলেন—"জীবই ব্রহ্ম"; তখনই কি স্বীকার করিয়া লওয়া হইল না—ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধে 'জীব' স্বতন্ত্র 'অসৎ' পদার্থ। যদি ইহা অস্বীকার কর, সকলই অভিন্ন এক বলিয়া অঙ্গীকার কর, তাহা হইলে জীব হইতে স্বতন্ত্র সেই যে অজীব (অসৎ), তাহাকেও ব্রহ্ম বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। তাহা হইলে, তোমার যে 'ব্রহ্ম', তিনিও 'অসৎ অজ্ঞান বা মায়া' মধ্যে পরিগণিত হন। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্তে, ব্রহ্মের যে প্রকৃত স্বরূপ—সেই যে বিশুদ্ধ সৎ, তাহা উড়িয়া যায়। অতএব 'অস্তি' স্বীকার করিতে হইলেই 'নাস্তি' স্বীকার আবশ্যক হইয়া পড়ে; "নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ"—সূত্রই ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়।

বাদ-বিবাদের অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব্বেই তো বলিয়াছি, যে পক্ষ যখন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, যে পক্ষে যখন জ্ঞানী মনীষিগণের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; সে পক্ষের সুতীক্ষ্ণ বিতর্ক-অস্ত্রে অপর পক্ষ তখনই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সকল ধর্ম্ম-মতের অভ্যুদয় সম্বন্ধেই এই দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। সাংখ্যগণ যখন জ্ঞানে গুণে গৌরবান্বিত হন, তখনই তাঁহারা অন্যান্য দার্শনিক-সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। বৈদান্তিকগণের মধ্যে যখন শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় মহাপুরুষের অবির্ভাব হয়, তখন অপর সকল মতবাদই বেদান্তবাদের নিকট নতশির হইয়াছিল। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হয়—সে কোন্ সময়ে?—যখন ভারতবর্ষের জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিগণ প্রায় সকলেই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পরিপোষণ-কল্পে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। জৈন-ধর্ম্মের সুপ্রতিষ্ঠা বিষয়েও ঐ একই জ্ঞানবলের সহায়তা স্বীকার করিতে হয়। জ্ঞানাগ্নি প্রকৃষ্টরূপে প্রজ্বলিত না হইলে পারিপার্শ্বিক পদার্থ-নিচয়কে ভস্মসাৎ করিবেই বা কি প্রকারে? আর তাহার দিব্য-জ্যোতিঃই বা বিকাশ পাইবে কি প্রকারে? সুতরাং যে পক্ষ যখনই আপন জ্যোতিঃ-বিস্তারে সমর্থ হইয়াছে, যে পক্ষ যখনই প্রতিপক্ষকে নিষ্প্রভ করিতে পারিয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে—তখনই সে পক্ষ এক অসামান্য অলৌকিক জ্ঞানালোক লাভ করিয়াছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়কে বিচারে পরাভূত করিয়া আপন সম্প্রদায়ের প্রাধান্য-খ্যাপন অমানুষিক অনৈসর্গিক শক্তিমত্তার লক্ষণ, সন্দেহ নাই। সেই শক্তি যখন যে পথে স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে, সেই পথই তখন সরল সুগম ও সৎপথ মধ্যে গণ্য হইয়াছে। অথবা ভাবান্তরে বলিতে গেলে বলিতে পারি, বিভিন্ন সমাজের বিপরীত প্রকৃতির মানুষের জন্য যে পথ যখন উপযোগী বলিয়া স্থির করিয়াছেন, সেই পথই তখন শ্রীভগবান ধর্ম্মান্তরের মধ্য দিয়া প্রকারান্তরে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। নচেৎ, কোনও ধর্ম্মমতই মানুষকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করিবার জন্য প্রবর্ত্তিত হয় নাই, এবং কোনও ধর্ম্মপথকেই আমরা কণ্টকাকীর্ণ বলিয়া মনে করিতে পারি না। এ জগতে নানা প্রকৃতির নানা লোক বসতি করে। জ্ঞানের তারতম্য সকলেরই মধ্যে দৃষ্ট হয়। সুতরাং, তাহাদের সকলের জন্য একরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা কখনই বিহিত হইতে পারে না। আমরা মনে করি, সেই কারণেই ধর্ম্মমতের বিভিন্নতা,—শিক্ষা-প্রণালীর তারতম্য ভাব। কোন্ ধর্ম্মমত যে উচ্চ এবং কোন্ ধর্ম্মমত যে অনুচ্চ, এ ক্ষেত্রে সে ভাব আমাদের মনে আদৌ স্থান পাইতেছে না। পরন্তু সাধকের ও সাধনার তারতম্য অনুসারে সকল ধর্ম্মের মধ্যেই উচ্চানুচ্চ গতিলাভের পথ পরিস্কৃত হইয়া আছে। এক্ষণে এ ক্ষেত্রে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে,—তবে বিরোধ-বিতণ্ডা কেন? তবে বিভিন্ন দার্শনিক মতের দ্বন্দ্বে সত্যতত্ত্ব এত জটিল করিয়া তুলিয়াছে কেন? নানা প্রকারে এ প্রশ্নের সমাধান করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, সৎকথার আলোচনায়, মনে সদ্ভাব বদ্ধমূল হয়;—সত্যের সন্ধানে মন সৎপথে প্রধাবিত হইতে শিখে। দ্বিতীয়তঃ, ভ্রান্তি বুদ্ধি স্বাভাবিকী; অসতে প্রবৃত্তি মানুষের চিত্ততোষিণী; সুতরাং মিথ্যার মধ্য দিয়া, বিতর্কের মধ্য দিয়া, ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, চিত্ত যদি সত্যের প্রতি প্রধাবিত হয়;—এ পক্ষে সে প্রয়াসও ব্যর্থ নহে, মনে করা

সর্ব্বদর্শন সার-প্রসঙ্গ।

যাইতে পারে। অবশ্য দার্শনিকগণ এতদুভয় বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া বিতর্কে প্রবৃত্ত হন কি না, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু শাস্ত্রালোচনায় শুভফল-প্রাপ্তি পক্ষে বিশ্বাসবান্ হইতে পারিলে, বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের বিতর্ক-বিতণ্ডার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তই উপপন্ন হয়। বিতর্ক কি লইয়া? বিতণ্ডা কিসের জন্য? মাত্র নাম ও সংজ্ঞা ভিন্ন অন্য আর কিসের বিরোধ মনে হইতে পারে? মূলে সকলই এক দেখি; বস্তুপক্ষে সকলেরই অনুসন্ধেয় একই সামগ্রী বলিয়া বুঝিতে পারি; অথচ, পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্বের পারসীমা নাই। সকলেরই সন্ধানের বিষয়—'সৎ' (সত্য)। 'সৎ' (সত্য) যাহা, তাহা চিরদিনই 'সৎ' (সত্য) আছে। যাহা আজ 'সৎ' (সত্য), তাহা কাল 'অসৎ' (মিথ্যা) হইতে পারে না। অপিচ, যাহা একরূপে 'সৎ' (সত্য), তাহা অন্যরূপে 'অসৎ' (মিথ্যা) কথনই সম্ভবপর নহে। 'সৎ' (সত্য) যাহা, সকল কালে সকল অবস্থায় তাহা 'সৎ' (সত্য) আছে। বিতর্ক—কেবল তাহার স্বরূপ বুঝাইবার জন্য। যাঁহার যেরূপ বুদ্ধি, যেরূপ জ্ঞান, তিনি সেইভাবে উহা বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। বিতণ্ডা তদ্ভিন্ন আর অন্য কিছুই নয়। কেহ কহিলেন,—স+ত্য=সত্য হয়; কেহ কহিলেন—স্+অ+ত্+য্+অ=সত্য হয়। বিতণ্ডা প্রায় এই রকমেরই। কেহ বা ভাষান্তরে ভাবান্তরে 'সচ', কেহ বা 'ট্রুথ' (truth) ইত্যাদি রূপেও সত্যের নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। বস্তুপক্ষে যাহা, তাহা অপরিবর্ত্তিত রহিল; কেবল তাহা বুঝানর জন্যই যত গণ্ডগোল ঘটিল। এইরূপে, মানুষকে যেমন সত্যের অনুসন্ধিৎসু দেখি, তেমনই আবার তাহাকে তাহার এই সাংসারিক আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য লালায়িত দেখি। সেই যে তাহার আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির অবস্থা-কল্পনা, সেখানেই আবার কত বিরোধ? নাম-সংজ্ঞাই কতবিধ! কেহ কহিলেন—মোক্ষ, কেহ কহিলেন—মুক্তি, কেহ কহিলেন—কৈবল্য, কেহ কহিলেন—নিঃশ্রেয়স্, কেহ কহিলেন—নির্ব্বাণ, কেহ কহিলেন—সোঽহং, কেহ কহিলেন—সত্ত্ব। যতই সংজ্ঞার ও বিশেষণের পার্থক্য থাকুক না কেন, দার্শনিকগণের সেই যে অবস্থার পরিকল্পনা, বস্তুপক্ষে তাহা কথনই বিভিন্ন হইতে পারে না। আহার্য্য বলিলে যাহা বুঝায়, অন্ন বলিলেও তাহাই বুঝায়। স্বর্ণস্থালী বলিলে যাহা বুঝায়, সোণার পাত্র বলিলেও তাহাই বুঝায়। অতএব, অনুসন্ধেয় বিষয় সম্বন্ধে কোনই পার্থক্য প্রতিপন্ন হয় না। দ্বন্দ্ব কেবল—অনুসন্ধানের পদ্ধতি লইয়া। তাহাও আবার অনেক স্থলে একই পরিণামমূলক; অথচ, দৃষ্টি-বিভ্রম-হেতু বিষম বৈষম্য-মূলক বলিয়া অনুভূত হয়। আমরা 'বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের বাদ-বিতণ্ডা' অভিধায়ে এই যে প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছি, এবং ইহারই মধ্যে এক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অপর সম্প্রদায়ের প্রতি যে তীব্র বিতর্ক বাণ নিক্ষিপ্ত হইতে দেখিয়াছি; তাহারই যদি মূল অনুসন্ধান করি, স্বরূপ অবগত হইবার চেষ্টা করি, তাহাতেই বা কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই না কি—বুঝিতে পারি না কি—বিভ্রম তাঁহাদের নয়। বিভ্রম আমাদেরই বুঝিবার। বলদেব বিদ্যাভূষণের ভাষ্যে বেদান্ত-সূত্রের ব্যাখ্যায় যে মত পরিব্যক্ত হইয়াছে, তাহাতে বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রতি অনেক স্থলে অন্যায় আক্রমণ হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। তবে তিনি যে সম্প্রদায়ের পরিপোষক, যে সম্প্রদায়ের শুভ-কামনায় তিনি গৃহীতব্রত, তাঁহার পক্ষে

ঐরূপ ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক নহে। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে নারায়ণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইবার উপদেশ দিতে গিয়া তিনি যদি বৈষ্ণবেতর সম্প্রদায়ের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সম্প্রদায় যতটুকু অগ্রসর হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা অনেক দূরে পিছাইয়া পড়িত। সুতরাং আপন সম্প্রদায়ের উন্নতির পথ প্রদর্শন পক্ষে তিনি যে পন্থা পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে দোষ প্রদর্শন করিতে চাহি না। অধিকারিবিশেষের নিকট কীর্ত্তিত হইলে, অনেক স্থলে সাম্যে বৈষম্য ও বৈষম্যে সাম্য আনয়ন করে। যে আশীবিষ সাক্ষাৎ মৃত্যু-স্বরূপ, বিজ্ঞ ভিষকের হস্তে তাহাই আবার প্রাণ-রক্ষার উপাদানভূত ভেষজে পরিণত হইয়া থাকে। তত্ত্বাভিজ্ঞ ও তত্ত্বানভিজ্ঞ জনের নিকট একই সামগ্রী বিপরীত ফল প্রদান করিয়া থাকে, তাহা আমরা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। অতএব সকল স্থলে সমান শিক্ষা প্রচার অযৌক্তিক বলিয়াই মনে করি। বলদেবের ব্যাখ্যা যখন প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার আবশ্যকতা ছিল—ইহাই মনে করিতে হইবে। কিন্তু তদ্দ্বারা কেহ যেন বিভ্রান্ত না হন, অন্যান্য বাদে কোনও সত্য নাই বলিয়া ভ্রমে না পড়েন,—এ সকল কথা বলিবার ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য।

তার পর, এ প্রসঙ্গে বাদ-প্রতিবাদ সূত্রে যে বিষয়টী বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, জৈনাচার্য্যগণের প্রবর্ত্তিত 'স্যাদ্বাদে' এবং "নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ" এই বেদান্ত-সূত্রের শঙ্করাচার্য্য-কৃত ব্যাখ্যায় যে বিষম সংঘর্ষ ঘটিয়াছে; তাহার কি কোনও নিরাস হইতে পারে না? শঙ্করাচার্য্য বিভ্রম-গ্রস্ত, কি জৈনাচার্য্যগণ বিভ্রমগ্রস্ত, কে তাহা সাহস করিয়া কহিতে পারেন? ঐ দুই বিপরীত মতের মধ্যে কি কোনরূপ সমতা দৃষ্ট হয় না? আমরা কিন্তু মনে করি, দুই মতের কোনও মতই প্রমাদ-পূর্ণ নহে। শঙ্করাচার্য্য যাহা খ্যাপন করিয়াছেন, তাহাও ঠিক; আবার জৈনাচার্য্যগণ যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাও অঠিক নহে। দুই সম্প্রদায় দুই ভাবে দুই দিক হইতে লক্ষ্য করিয়াছেন। সুতরাং দৃষ্ট বস্তু দুই ভাবে প্রতিভাত বা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দুই-জন মহাসাগর দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। একজন প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সংবাদ দিলেন,—'মহাসাগর অনন্তবিস্তৃত'; আর একজন ফিরিয়া আসিয়া ঘোষণা করিলেন,—'মহাসাগর অতলস্পর্শী।' অজ্ঞজন মনে করিল, ঐ দুই জনের একজন নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা কহিয়াছেন। অথচ দুই জনই যে সত্য কথা কহিয়াছেন, তাহা সুনিশ্চিত। কিন্তু দুই জনের মুখে দুইরূপ পরিচয় শুনিয়া অজ্ঞ জনের মনে মহাসাগর সম্বন্ধে যদি ভ্রম-ধারণা জন্মে, তাহার জন্য তাঁহারা কখনই অসত্যবাদী হইতে পারেন না। সাধারণ-বোধ্য এবম্বিধ সাদৃশ্য খ্যাপন—তর্ক-শাস্ত্র মতে দোষদুষ্ট হইতে পারে। কিন্তু বস্তুপক্ষে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, উভয় ব্যাখ্যাই একার্থ-বোধক। এক ব্যাখ্যা 'বস্তু'-মূলক, অপর ব্যাখ্যা—'ভাব'-মূলক। যখন প্রকৃত সেই 'সৎ' পদার্থকে (পদার্থ সংজ্ঞাই দিতে হইল) বুঝাইতে হইবে, তখন তাহার সহিত অন্যের (অসতের) সম্বন্ধ কখনই সূচিত হইবে না বা হইতে পারে না। 'সৎ'—অবিমিশ্র; সতের সহিত অসতের, সত্যের সহিত মিথ্যার সংযোগ নিশ্চয়ই অঙ্গীকার করা যায় না। শঙ্করাচার্য্য যে উপমা প্রদান করিয়াছেন, শৈত্যের সহিত উষ্ণতা একত্র থাকিতে পারে

সেই 'একে' সকলই সম্ভব।

না বলিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন; তাহাতেই বুঝা যায়, তিনি 'বস্তু'-পক্ষ ধরিয়াই বিচার করিয়া গিয়াছেন। আর জৈন-দার্শনিকগণ যে দিক দিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা ভাবানুগত বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে। লক্ষ্য—স্বরূপ-তত্ত্ব-প্রকটন। যিনি যে ভাবে সত্য-তত্ত্ব ব্যক্ত করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছেন, তিনি সেই ভাবেই তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ দুই দিক হইতে দুই ভাবে দেখার দরুণ ব্রহ্মের পরিচয়ে শ্রুতি কখনও বলিয়াছেন—'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে', 'বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা'; কখনও বলিয়াছেন—'নিগুর্ণং পরমং ব্রহ্ম'। ফলতঃ, যিনি সর্ব্বস্বরূপ, তিনি নিগুর্ণ হইলেও গুণময়, আবার গুণময় হইলেও নিগুর্ণ। তিনি অবিদ্যমান্ হইলেও বিদ্যমান্, বিদ্যমান্ হইলেও অবিদ্যমান্। এই লক্ষ্য রাখিয়া "নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ" সূত্রের অর্থ অন্যরূপেও উপপত্তি করিতে পারি। আর তাহা হইলে, বোধ হয় সকল সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রকার বিরোধ ভঞ্জন হইয়া যাইতে পারে। ঐ সূত্রের অর্থ যদি করি—'একে সকলই সম্ভব', তাহাতেও দোষ হয় না। যেখানে দুই 'ন' আগম ('ন' একস্মিন্ 'ন' সম্ভবাৎ); সেখানে 'হাঁ' অর্থ স্বীকার সমীচীন নহে কি? পূর্ব্বাপর অর্থসঙ্গতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও এ ভাব মনে আসিতে পারে। পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বাত্রিংশ সূত্রে "সর্ব্বথানুপপত্তেশ্চ' বাক্যে, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব ধর্ম্ম-মত-সমূহের খণ্ডন করিয়া তাহাদের অনুপপত্তির বিষয় ঘোষণা করা হইল। শেষ বলা হইল,— "নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ।" অর্থাৎ, আর সকল প্রকার বিষয় বিতর্কের স্থান; কিন্তু 'এক' স্বীকার করিলে সকলই সম্ভব হয়, অর্থাৎ সর্ব্ব-সম্ভবের হেতু—সেই 'এক'; সেই 'একে' সকলই সম্ভবপর। আমরা এই দৃষ্টিতেই দেখি। এই দৃষ্টিতেই বিভিন্ন বিপরীত দার্শনিক মতবাদের সামঞ্জস্য সাধিত হয়। সর্ব্বদর্শনের যদি কিছু সার নিষ্কাষণ করিতে পারা যায়, সেই 'এক' স্বীকারই সেই সার-নিষ্কাষণের ভিত্তিস্থানীয়। সেই একের অস্বীকার-হেতুই নাস্তিক্যাদি দর্শন হেয় বলিয়া পরিগণিত। আর, সেই একের অঙ্গীকার হেতু অন্যান্য দর্শন-শাস্ত্র-সমূহ জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত, এবং বিতর্কের সহস্র বিভেদের মধ্যেও পরস্পর সমতা-প্রাপ্ত। দর্শন-শাস্ত্রের সমন্বয়-সাধনে অনুসন্ধিৎসু হইলে, অনুসন্ধানকারী সুনিশ্চয় সে সন্ধান লাভ করিতে সমর্থ হন। স্বরূপ অবগত হওয়াই সকল দর্শনের মূল লক্ষ্য। কেহ বলেন—বিবেকোদয়েই নিঃশ্রেয়স; কেহ বলেন—অবিদ্যার উন্মূলনই অভীষ্ট ফল-লাভ; কেহ বলেন—পরমাত্মা জীবাত্মার সাক্ষাৎকারই মোক্ষ; কেহ বলেন—তত্ত্ব-জ্ঞানেই মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ভাবাভাবে এইরূপ সামান্য পার্থক্য থাকিলেও প্রক্রিয়া-পদ্ধতির মধ্যে সামান্য ইতর-বিশেষ থাকিলেও, মূল বিষয় সর্ব্বত্রই অভিন্ন দেখিতে পাই। প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক প্রভৃতির যে অধিকার অবসান, তাহারই নাম—সর্ব্বদুঃখনাশ। সাংখ্যের এই যে সিদ্ধান্ত; যোগ সাধনার মধ্যেও ইহাই অভিব্যক্ত। কিবা বৈশেষিক, কিবা ন্যায়, সর্ব্বত্রই ঐ ভাবেরই ক্রীড়া দেখি। কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞান সঞ্চয় কর, জ্ঞান-মূলে স্বরূপ প্রত্যক্ষ কর,—এ ভিন্ন নূতন শিক্ষা কি আর আছে? কি আর থাকিতে পারে?

—— * ——

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রাগভারতেতিহাসে প্রথম সম্রাট।

[ধর্ম্মশক্তিই রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা করে,—ধর্ম্মশক্তির সাহায্যেই চন্দ্রগুপ্ত রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন;—চন্দ্রগুপ্ত কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন,—তাঁহাকে জৈন-ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া বিশ্বাস করিবার যুক্তি-পরম্পরা;—চন্দ্রগুপ্তের অমরত্বে চাণক্যের প্রভাব,—কালিদাস যেমন বিক্রমাদিত্যকে অমর করিয়া গিয়াছেন,—চাণক্য সেইরূপ চন্দ্রগুপ্তকে অমর করিয়া রাখিয়াছেন;—চন্দ্রগুপ্তের আবির্ভাব-কাল,—তাঁহার অভ্যুদয় ও রাজ্যকাল সম্বন্ধে নানা মতের আলোচনা,—জৈন মতে তাঁহার রাজ্যাব্দ;—অসাধারণ মানুষ চাণক্য,—তাঁহার ন্যায় মহাজ্ঞানী, মহা-রাজনীতিক এবং মহা-শক্তিশালী পুরুষ অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করে;—চাণক্যের বংশাদির বিবরণ এবং তাঁহার সহিত চন্দ্রগুপ্তের মিলন-বৃত্তান্ত;—'অর্থশাস্ত্র' রচনায় চাণক্যের কৃতিত্ব,—তদ্দ্বারা চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যশাসন-প্রণালীর আভাষ-প্রাপ্তি;—চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে স্বদেশে ও বিদেশে যে সকল কিম্বদন্তী প্রচারিত আছে, তাহার সার নিষ্কাষণ;—চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বে বিবিধ বিদ্যার উৎকর্ষ সাধন,—সে সাম্রাজ্য সভ্য-সমুন্নত সমাজের আদর্শ-স্থানীয়।]

ধর্ম্ম-শক্তিই রাজ-শক্তি প্রতিষ্ঠা করে।

প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্ত-খ্যাপনে আমাদিগকে পুনঃপুনঃ ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে হইতেছে। আধুনিক ইতিহাসের ধারানুসারী কেহ হয় তো প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন—ইতিহাস লিখিতে গিয়া এ অবান্তর প্রসঙ্গ কেন? কিন্তু প্রসঙ্গ যে অবান্তর নহে, একটু চিন্তা করিলেই তাহা বোধগম্য হয়। কেন-না, ভারতবর্ষে যত ধর্ম্মমতের ও যত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে, সেই সকল ধর্ম্মমতের ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রাধান্যের উপরই ভারতের রাজশক্তি প্রতিষ্ঠান্বিত দেখিতে পাই। ভারতের ধর্ম্মনৈতিক উন্নতিই তাহার রাজনৈতিক উন্নতির মূলীভূত প্রতিপন্ন হয়। আধুনিক ইতিহাসের গণ্ডীর বাহিরে যে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করি, সেখানে তো সে ভাব পরিস্ফুট হইয়া আছেই; পরন্তু অধুনা যাহা 'প্রাগ-ঐতিহাসিক কাল' বলিয়া বিঘোষিত হয়, সেখানেও সেই দৃশ্য দেখিতে পাই। মাসিডনাধিপতি আলেকজাণ্ডারের ভারতাগমনে পর হইতে ভারতের ইতিহাসের আরম্ভ বলিয়া যাঁহারা মনে করেন; তাঁহাদিগের প্রতীতির জন্য দেখাইতে পারি, সে ইতিহাসেরও আরম্ভ—ধর্ম্মের ভিত্তির উপর। আলেকজাণ্ডার যখন ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হন, তখন কোন্ শক্তির ক্রিয়া পরিলক্ষিত হইয়াছিল? কেবল অস্ত্রবলে নহে, কেবল বাহুবলে নহে,—এক দৈবশক্তির ক্রিয়াই তখন ভারতবর্ষকে রক্ষা করিয়াছিল;—এক ঐশী-শক্তির লীলাই তাৎকালিক বিচ্ছিন্ন ভারত-রাজ্যকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া বিস্তৃত বিশাল অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্য মধ্যে পরিগণিত করিয়াছিল। সেই সময়ের কথাই বলিতেছি,—যখন রাজ-চক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে অধিরূঢ়,—যখন আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ তাঁহার প্রাধান্যের নিকট নতশির। তাৎকালিক ভারতের রাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক অবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে, ভারতে ধর্ম্মশক্তির সহিত রাজশক্তির অভেদ্য অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের

বিষয়ে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মিবে। যে জৈনধর্ম্মের পরিচয়-প্রসঙ্গে এই খণ্ড 'পৃথিবীর ইতিহাসের' অনেক স্থান পর্য্যবসিত হইয়াছে; সেই জৈন-ধর্ম্ম-রূপ শক্তির বিদ্যুৎ-প্রবাহ তখন হৃদয়ে হৃদয়ে ক্রীড়া করিতেছিল। চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় শক্তিশালী তেজস্বী পুরুষে সেই ধর্ম্মমতের প্রভাব মণিকাঞ্চন সংযোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। জৈনধর্ম্ম যেমন 'অস্তির' পার্শ্বে 'নাস্তির' সংযোগ ঘোষণা করে; আসক্তির পার্শ্বে অনাসক্তির (ত্যাগের) ক্রিয়াও সে সময়ে সেইরূপ প্রবল হইয়াছিল। জৈনধর্ম্ম যখন শিক্ষা দিল—ত্যাগই সার-সামগ্রী; আর জনসঙ্ঘ যখন দলে দলে সেই ত্যাগের মহীয়সী মহিমায় মুগ্ধ হইয়া পড়িল; মেধাবী চন্দ্রগুপ্ত সেই সুযোগ গ্রহণ করিলেন,—সেই ত্যাগের অস্ত্রে আপনার শক্তি-সঞ্চয়ে সমর্থ হইলেন। সুবিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক যেমন একই কেন্দ্র-শক্তিকে নানা ভাবে নানা রূপে পরিচালন করিতে সমর্থ হন; অগ্নি ও জলের সমবায়ে সৃষ্ট বাষ্পশক্তি লইয়া তিনি যেমন আপন ইচ্ছামত কখনও রেলগাড়িতে, কখনও বা ষ্টীমারে, আবার কখনও বা অন্য কোনরূপ কল-পরিচালনে নিযুক্ত করেন; জৈনধর্ম্মের অভ্যুদয়রূপ সত্বশক্তিকে লইয়া অশেষ ধী-শক্তি-সম্পন্ন চন্দ্রগুপ্ত সেইরূপ শত্রু-দলনে সাম্রাজ্য-স্থাপনে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিলেন। শক্তি যদি প্রস্তুত থাকে, আর কৃতী ব্যক্তির যদি সে শক্তি করতলগত হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা তিনি যথেচ্ছ সুফল লাভ করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? জৈনধর্ম্মমতের প্রাধান্যে মানুষের মন মায়া-মমতা-পরিশূন্য হইয়াছিল; এমন কি, আত্মদেহে পর্য্যন্ত—জীবন-ধারণে পর্য্যন্ত তাঁহাদের স্পৃহা ছিল না। এইরূপ সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাস-ব্রতধারী জৈনগণের সহায়তা পাইয়াই সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠায় চন্দ্রগুপ্ত কৃতকার্য্যতা লাভ করেন, তাৎকালিক ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিলে ইহাই সিদ্ধান্ত হয়। এখানে একটী সংশয়-প্রশ্ন উঠিতে পারে। সর্ব্বত্র জীবদর্শন এবং জীবে দয়া যাঁহাদের ধর্ম্ম-শিক্ষার মূল, তাঁহারা কেন লোকবিধ্বংসকারী বিষম সমরে সহায় হইবেন? কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি তো, ত্যাগে ও আসক্তিতে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, শক্তির ক্রিয়া এক দিক দিয়া হইবেই হইবে। আমরা তাই 'সকাম' ও 'নিষ্কাম' শব্দদ্বয়কে অনেক সময় সমানার্থ-বোধক বলিয়া মনে করি। সে হিসাবে, যে জন যত নিষ্কাম, সে জন তত সকাম নির্দ্দেশ করিতে পারি। *

---

* মহামতি কবিরের একটী দোঁহায় এই উক্তির সম্পূর্ণ সার্থকতা দেখিতে পাই। কবির বলিয়াছেন,—"বন্ধন নিরবন্ধন ভয়া নিরবন্ধন বন্ধন হোয়।" বিভিন্ন পণ্ডিত এই পংক্তির বিভিন্নরূপ অর্থ নিষ্কাষণ করিতে পারেন। অর্থ হইতে পারে—'যে জন ভগবানের চরণে বাঁধা পড়িয়াছে, তাহার ভব-বন্ধন মুক্ত হইয়াছে; কিন্তু যে জন সে চরণে আপনাকে বাঁধিতে পারে নাই, সংসারের বন্ধন তাহাকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।' অর্থ হইতে পারে—'বন্ধনই নিরবন্ধন অর্থাৎ আসক্তিই অনাসক্তি; এবং নিরবন্ধনই বন্ধন অর্থাৎ অনাসক্তিই আসক্তি।' বস্তুপক্ষে দুই অর্থ ই এক। আর, তদনুসারেই আমরা বলিতে পারি, সকামই নিষ্কাম, নিষ্কামই সকাম যখন ইহসংসারে পুত্রকলত্রাদির বা ধন-সম্পত্তির প্রতি মানুষ আসক্ত হয়. তখনই তাহার আসক্তিকে সকাম বলা যায়। কিন্তু তাহার সে আসক্তি যখন সেই ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তখন তাহার সে আসক্তি অনাসক্তি মধ্যে গণ্য হয়;—তাহার বন্ধন তখন নিরবন্ধন হইয়া যায়। উপস্থিত ক্ষেত্রে এই হিসাবে নিষ্কামকে সকাম বলিতে পারি যে, তাঁহারা সকল সংসার-কামনা পরিহার-পূর্ব্বক নিষ্কাম হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু জগতের জীবের হিতসাধন-কামনা তাঁহাদের অন্তরে জাগরূক হইয়াছিল;—তাঁহাদের বন্ধন নিরবন্ধন হইলেও নিরবন্ধন বন্ধন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ফলতঃ, জৈনধর্ম্মের অনুরাগী জনরূপ নিষ্কাম অস্ত্র-সমূহ প্রস্তুত ছিল। অস্ত্র নিজে নিষ্কাম হইলেও কামনার অংশভূত জনের হস্তে পড়িয়া তাহার ক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছিল; আর তাহারই প্রভাবে চন্দ্রগুপ্তের মৌর্য্য-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম, প্রাগ্-ভারতীয় ইতিহাসেও ধর্ম্মশক্তিকেই রাজ-শক্তির প্রতিষ্ঠাতৃরূপে প্রকট দেখি।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, চন্দ্রগুপ্ত কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন? তিনি হিন্দু ছিলেন, কি বৌদ্ধ ছিলেন, কি জৈন ছিলেন,—তিনি কোন্ ধর্ম্ম মান্য করিতেন? অধুনা মৌর্য্যরাজবংশকে সুতরাং চন্দ্রগুপ্তকে পারস্যের অধিবাসী এবং পারসিক রক্তসংশ্রবযুক্ত বলিয়া এক মত বিঘোষিত হইয়া থাকে।* সে মত যে ভিত্তিহীন কল্পনা মাত্র, তাহাতে সংশয় নাই। সুতরাং সে মতে আদৌ আস্থাস্থাপন করিতে পারা যায় না। অপিচ, চন্দ্রগুপ্ত যে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মানুসারী হিন্দু-নৃপতি ছিলেন, তৎপক্ষেও কোনও প্রমাণ নাই। পরন্তু মাতৃ-পক্ষে দোষাশ্রিত বলিয়াই তাঁহার বিষয় প্রখ্যাত আছে। বৌদ্ধনৃপতিগণের নামের মধ্যেও তাঁহার নাম সন্নিবিষ্ট দেখি না। এদিকে জৈন-শাস্ত্রে ও জৈন-প্রবাদাদিতে তাঁহার সম্বন্ধ সর্ব্বথা প্রকীর্ত্তিত দেখি। চন্দ্রগুপ্ত যে একজন গোঁড়া জৈন ছিলেন, জৈন-গ্রন্থের একটী বর্ণনায় তাহা বেশ উপলব্ধি হয়। এক সময়ে মগধ-রাজ্যে দ্বাদশবর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। জৈনাচার্য্য ভদ্রবাহু (ভদ্রবহু) আপন দলবল সহ সেই সময় দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে গমন করেন। মহীশূর-রাজ্যের 'শ্রাবণ বেলগোলা' নামক স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া তাঁহারা বসতি করিয়াছিলেন। সেই হইতে 'শ্রাবণ বেলগোলা' এক পবিত্র স্থান বলিয়া প্রখ্যাত আছে। সেই পবিত্র ক্ষেত্রে ভদ্রবাহু জৈন-রীতি অনুসারে ধ্যানস্থ হইয়া অনশনে দেহত্যাগ পূর্ব্বক নির্ব্বাণ লাভ করেন। তত্রত্য জৈনমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য আপনাকে ভদ্রবাহুর অনুবর্ত্তী শিষ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন। সেখানে প্রচার, এবং জৈন-গ্রন্থাদিতেও প্রকাশ,—রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্ত সেই ভদ্রবাহুর সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং গুরুর অনুগমন করিয়া

চন্দ্রগুপ্ত কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন?

---

* ডক্টর স্পুনার (Dr. Spooner) এই মতের প্রধান প্রবর্ত্তক। পাটলীপুত্র-নগর সান্নিধ্যে কুমড়াহার পল্লীতে আম্রকাননে (এই স্থান নবনির্ম্মিত পাটনা-সহরের পূর্ব্বাংশে রেল-লাইনের দক্ষিণে বাঁকিপুর ষ্টেসনের পূর্ব্ব-দক্ষিণে অবস্থিত) একটী স্তূপখনন কালে একটী অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই অট্টালিকায় শত-স্তম্ভযুক্ত একটী প্রকোষ্ঠ 'হল' ছিল, তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। সেই অট্টালিকার হলের ও স্তম্ভাদির গঠনাদি দৃষ্টে, তিনি সিদ্ধান্ত করেন, পার্শিপোলিশ-সহরের শত-স্তম্ভযুক্ত 'হলের' আদর্শে ঐ 'হল' নির্ম্মিত হইয়াছিল। আর তাহা হইতে তিনি প্রতিপন্ন করিতে চান, জোরওয়াষ্ট্রীয়ান-ধর্ম্মাবলম্বী পারসিকগণ কর্ত্তৃক, ভারত ইতিহাসের জোরওয়াষ্ট্রীয়ান্ শাসন-কালে (Zoroastrian period of Indian History) ঐ অট্টালিকা প্রস্তুত হয়। চন্দ্রগুপ্তের জননী মুরদিগের কন্যা বলিয়া মুরা নামে পরিচিতা হন; আর তদনুসারে মুর হইতে মৌর্য্যবংশের উৎপত্তি প্রতিপন্ন হয়। এবংবিধ নানা যুক্তির অবতারণায় তিনি মৌর্য্যগণকে পারসিকগণের সংশ্রবযুক্ত নৃপতি বলিয়া পরিচিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।—'আর্কিয়লজিকেল রিপোর্ট ১৯১৩-১৪ (Archæological Report 1913-14, Eastern Circle) প্রভৃতিতে এ বিষয়ের গবেষণা আছে। তবে স্পুনারের ঐ মত এখনও আর্কিয়লজিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট কর্ত্তৃক সর্ব্বথা পরিগৃহীত হয় নাই। সুতরাং ঐ বিষয়ে এখন আর বাদ-প্রতিবাদ বৃথা। যাহা হউক, ঐ সিদ্ধান্ত আদৌ ভিত্তিহীন।

গুরুর সঙ্গে 'শ্রাবণ বেলগোলায়' কিছুকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। অধিকন্তু এরূপও কিম্বদন্তী আছে যে, চন্দ্রগুপ্ত সেইখানেই গুরুর আদেশে অনশনে তনুত্যাগ করেন। * যাহা হউক, এই উপলক্ষে, দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে, দাক্ষিণাত্যে যে জৈনধর্ম্মের প্রচার হইয়াছিল, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। স্থানীয় প্রবাদাদির সঙ্গে এবং জৈন-শাস্ত্রের নানা-স্থানে এই ঘটনা যেরূপভাবে বিজড়িত হইয়া আছে, তাহা কোনক্রমেই উপেক্ষা করা যায় না। জৈন-সম্প্রদায় যে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর দুই শাখায় বিভক্ত হন, জৈনধর্ম্মের ইতিহাসে যেটি একটী বিশিষ্ট ঘটনা; তাহাও এই বিষয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত সে ঘটনাটী এই,—মহাবীর স্বামীর দেহত্যাগের প্রায় দুই শতাব্দী পরে, যখন চন্দ্রগুপ্ত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন—সেই সময়ে, মগধ-রাজ্যে দ্বাদশবর্ষ-ব্যাপী ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ভদ্রবাহু (ভদ্রবহু) তখন জৈন-সম্প্রদায়ের আচার্য্য-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দুর্ভিক্ষের ভীষণ গ্রাস হইতে জৈন-সন্ন্যাসীদিগকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে শিষ্যানুচরবর্গকে সঙ্গে লইয়া তিনি দাক্ষিণাত্যে কর্ণাট-প্রদেশ যাত্রা করেন। জৈন-ধর্ম্মাবলম্বী অবশিষ্ট যাঁহারা এ দেশে থাকেন, তাঁহারা জৈনাচার্য্য স্থূলভদ্রের তত্ত্বাবধানে অবস্থিত রহেন। সেই সুদীর্ঘ-কাল-ব্যাপী দুর্ভিক্ষের প্রকোপে ব্যতিব্যস্ত হইয়া, জৈন-ভিক্ষুগণ "সিদ্ধান্ত"-শাস্ত্র-সমূহ একরূপ বিস্মৃত হইয়া যান। পরিশেষে, দুর্ভিক্ষ নিবৃত্ত হইলে, জৈনশাস্ত্র-সমূহ সঙ্কলন করিবার জন্য, পাটলিপুত্র নগরে জৈন-ভিক্ষুগণের একটী সঙ্ঘ আহুত হয়। ভদ্রবাহু তখনও দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবৃত্ত হন নাই। সুতরাং সে সঙ্ঘে তিনি যোগদান করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, সেই সঙ্ঘে জৈন-ধর্ম্মগ্রন্থ-সমূহ সঙ্কলিত হওয়ার পর হইতে, জৈনগণের আচার-ব্যবহার কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া আসে। পূর্ব্বে নির্গ্রন্থগণ সকলেই যেরূপ-ভাবে নগ্নদেহে বিচরণ করিতেন, এখন সে ভাব পরিত্যক্ত হয়। সন্ন্যাসিগণ এখন হইতে শ্বেতবর্ণের পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। অন্যপক্ষে, দুর্ভিক্ষের প্রকোপে যে সম্প্রদায় দেশত্যাগী হইয়াছিলেন, তাঁহারা নগ্নদেহেই বিচরণ করিতেন। দুর্ভিক্ষ শান্ত হওয়ার পর তাঁহারা যখন দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, তাঁহাদের মধ্যে নগ্নদেহে বিচরণের প্রথা তখনও পূর্ণভাবেই বিদ্যমান ছিল। সুতরাং নবমতাবলম্বী শ্বেতবস্ত্রপরিধানকারী জৈন-সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহারা আর মিশিতেই সম্মত হইলেন না। অপিচ, পাটলিপুত্র-সহরের সঙ্ঘে সঙ্কলিত ধর্ম্ম-শাস্ত্রের প্রতি তাঁহারা সম্পূর্ণরূপ বীতস্পৃহ রহিলেন। তাঁহাদের নিকট সে শাস্ত্র-গ্রন্থ-সমূহ বিলুপ্ত গ্রন্থ মধ্যেই পর্য্যবসিত হইল। এই প্রকারে দুই মতের ও দুই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়া গেল। শ্বেত-বস্ত্রপরিহিত সম্প্রদায় 'শ্বেতাম্বর' নামে এবং নগ্ন-দেহে-বিচরণকারী সম্প্রদায় 'দিগম্বর' নামে পরিচিত হইলেন। ৮২ খৃষ্টাব্দে এই পার্থক্য পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইয়া পড়ে। সম্পূর্ণরূপ নগ্নতাকেই দিগম্বরগণ সম্যগত্ব-লাভ পক্ষে আবশ্যক

শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায়ের উৎপত্তি।

* কোন্ সময়ে কি ভাবে চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু সংঘটিত হয়, তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। এক মতে, চন্দ্রগুপ্ত,—২১৮ পূর্ব্ব-খ্রীষ্টাব্দে দেহ-ত্যাগ করেন, এবং সেই সময় তাঁহার পুত্র বিন্দুসার রাজপদ প্রাপ্ত হন। অন্য মতে প্রকাশ,—সেই দুর্ভিক্ষ ৩০১ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল এবং সেই সময় জৈনগণের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে গিয়া তিনি অনশনে জীবন বিসর্জ্জন দেন।

বলিয়া মনে করেন। শ্বেতাম্বরগণের মতে—বস্ত্র-পরিধানেও সম্যগত্ব-লাভে কোনও বিঘ্ন ঘটে না। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এবংবিধ পার্থক্যের একটী বিশিষ্ট কারণ আছে। 'কেবল জ্ঞান' বা পূর্ণত্ব-লাভের মূলীভূত কারণ—সর্ব্ববিধ কামনা পরিত্যাগ। ক্ষুধা তৃষ্ণা আহার বিহার প্রভৃতি সকল কামনার কবল হইতে যিনি পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন, তিনিই 'কেবলী' হইতে পারেন। যিনি তেমনভাবে সর্ব্বত্যাগে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার আবার অন্যাবরণ বস্ত্রের আবশ্যক কি? দিগম্বরগণ এইরূপ চিন্তার ফলেই বস্ত্র পরিত্যাগ করেন। শ্বেতাম্বরগণ তদ্রূপ ত্যাগের উপযোগিতা অস্বীকার করেন না বটে; কিন্তু তাঁহারা বলেন—যখন সংসারে বিচরণ করিতে হইবে, তখন বস্ত্রের আবশ্যকতা নিশ্চয়ই আছে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মত-পার্থক্যের ইহাই মূল কারণ বটে; কিন্তু এ ভিন্ন আরও কয়েকটী বিশিষ্ট কারণ আছে। তন্মধ্যে চুরাশী প্রকার মতানৈক্যের বিষয় প্রাচীন গ্রন্থাদিতেই লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই; এবং তদ্দরুণ নানাবিধ সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই সকল মতানৈক্যের মধ্যে স্ত্রী-গণকে সম্প্রদায় হইতে পরিবর্জ্জন করা একটী প্রধান মতানৈক্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। দিগম্বরগণের মতে, রমণী-সম্প্রদায় মুক্তির অধিকারী নহেন; কিন্তু শ্বেতাম্বরগণ স্ত্রী-পুরুষ সকলকে সমভাবে মুক্তির অধিকারী বলিয়া স্বীকার করেন। এ বিষয়ে দিগম্বরগণের এতটাই গোঁড়ামী বা বাড়াবাড়ি যে, তাঁহারা তাঁহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত কুমারী মল্লীকে (উনবিংশতি তীর্থঙ্করের কন্যা) রমণী বলিয়াই স্বীকার করেন না। সে মতে—সে কুমারী নারী-বেশী পুরুষ মধ্যে পরিগণিত। অন্য পক্ষে আবার কি দিগম্বর কি শ্বেতাম্বর, যাঁহারা জ্ঞানের উচ্চমার্গে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহারা কিন্তু এ সকল মতবিরোধ লইয়া বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত নহেন। তাঁহারা বলেন,—'শ্বেতাম্বরই হউন, আর দিগম্বরই হউন, অথবা বৌদ্ধ বা অন্য মতাবলম্বীই হউন, যিনি সর্ব্বত্র আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যিনি সর্ব্বজীবেই পরমাত্মার অধিষ্ঠান দেখিতে পাইয়াছেন; তিনিই মুক্তির অধিকারী হইয়াছেন।' যাহা হউক, যে ঘটনা উপলক্ষে জৈন-ধর্ম্মসম্প্রদায় দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল, তাহার সহিত চন্দ্রগুপ্তের নাম যখন সংযুক্ত রহিয়াছে এবং তিনি যখন জৈন-সম্প্রদায়ের রক্ষার জন্য ও সেই ধর্ম্ম পালন জন্য প্রাণত্যাগ পর্য্যন্ত করিয়াছেন বলিয়া প্রচারিত আছে; তখন চন্দ্রগুপ্তকে জৈনধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন অন্য ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া কখনই ঘোষণা করিতে পারা যায় না। পরন্তু জৈনধর্ম্মের নবীন উদ্দীপনার প্রভাবেই তিনি যে নব সাম্রাজ্য-স্থাপনে সফলকাম হইয়াছিলেন, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। তাঁহার রাজত্বের প্রতিষ্ঠা এবং সে রাজ্যের ধ্বংস-সাধন—অভ্যুদয় ও অধঃপতন—দুই দিকেই ধর্ম্ম-সংশ্রব যেন প্রকট হইয়া আছে। যখন তাঁহার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন জৈন-সম্প্রদায় একসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন; তখন তাঁহাদের মধ্যে কোনই মত-ভেদ উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে, তাঁহার সৌভাগ্য-সূর্য্য যখন অস্তমিত-প্রায়; তখনই জৈন-সম্প্রদায় বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। সঙ্ঘশক্তিই যে অভ্যুদয়-প্রতিষ্ঠার মূল, আর বিচ্ছিন্নতাই যে অধঃপতনের ও বিশৃঙ্খলার হেতুভূত, এতদিতিহাসেও সেই সিদ্ধান্ত মনোমধ্যে স্থান প্রাপ্ত হয়।

একণে দেখা যাউক, চন্দ্রগুপ্ত কোন্ সময়ে মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; কোন্ সময়ে তাঁহার একছত্র প্রভাব ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়াছিল? বলা বাহুল্য, এ সম্বন্ধে মতান্তরের অবধি নাই। এমন কি, তাঁহার নাম লইয়াও অনেক বিতর্ক আছে। পৌরাণিক মতের অনুসরণ করিলে, চন্দ্রগুপ্তের স্থান ভারত-ইতিহাসের কোন্ পৃষ্ঠায় নির্দ্দিষ্ট হয়, সে আলোচনা পূর্ব্বেই করিয়াছি। * পরন্তু পুরাণ-পরম্পরার সহিত তাঁহার সম্বন্ধের স্মৃতি-মূল উৎপাটিত করিয়া, বর্ত্তমান ইতিহাসের ধারা অনুসারে, আলেকজাণ্ডারের ভারত-প্রবেশ-চেষ্টার প্রাক্কাল হইতেই সূত্র ধরিয়া, যদি চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বাদির কাল নির্দ্দেশ করিবার প্রয়াস পাই, তাহাতেই বা কি তথ্য অধিগত হয়? সে মতে, চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল যে সময়ে নির্দ্দিষ্ট হয়, তদ্বিষয় আমরা পূর্ব্বেও আলোচনা করিয়াছি। † মেগাস্থিনীস আনুমানিক ৩০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে উপস্থিত থাকিয়া ভারতের বৃত্তান্ত-সম্বলিত 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। সেই সূত্র ধরিয়া এবং আলেকজাণ্ডার প্রভৃতির আক্রমণ-প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ ৩২১ বা ৩২২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ২৯৬ বা ২৯৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, সাকুল্যে প্রায় ২৪ বা ২৫ বৎসর কাল, চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এদিকে চন্দ্রগুপ্তকে জৈন-ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহাদের গণনাক্রমে ঐ রাজত্বকাল আর একরূপ নির্দ্দিষ্ট হয়। জৈন-সাধারণের মত এই যে,—মহাবীর স্বামী ৫২৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে (অর্থাৎ বিক্রম-সংবতের ৪৭০ বৎসর পূর্ব্বে) নির্ব্বাণ লাভ করেন; এবং ঐ ৪৭০ বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ৫২৭ পূর্ব্ব-খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৫৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের (৫২৭—৪৭০=৫৭) মধ্যে চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। সিংহল-দেশের বিবরণে চন্দ্রগুপ্ত ২৮ বৎসর রাজত্ব করেন বলিয়া প্রকাশ আছে। এদিকে জৈনমতক্রমে ঐ সময়ের মধ্যে (৪৭০ বৎসরে) বহু বিভিন্ন রাজবংশের অভ্যুদয়-বিবরণ অবগত হওয়া যায়। দুইখানি জৈনগ্রন্থে ('তিত্থুগালিয়া পয়ন্না' এবং 'তীর্থদ্ধার প্রকীর্ণক') ঐ সময়ের রাজন্যবর্গের এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হই। যথা,—

চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয়-কাল।

(১) "জং রয়ণিং সিদ্ধিগও অরহং তিত্থংকরো মহাবীরো।
তং রয়ণিমবংতিএ অভিসিত্তো পালও রায়া॥
পালগরন্নো সট্ঠী পণ পন্ন সয়বিয়াণ নংদাণং।
মুরুআণং অট্ঠসয়ং তীসা পুণ পূস মিত্তাণং॥
বলভিত্ত ভানুমিত্তা সট্ঠীচত্তায় হোংতি নরসেণে।
গদ্দভ সয়মেগং পুণ পডিবন্নোতো সগো রায়া॥
পংচয় মাসা পংচয় বাসা ছচ্চে বহুংতি বাসসয়া।
পরিনিব্বয়স্স অরহতো উপ্পন্নো সগো রায়া॥"

(২) "জং রয়ণিং কালগও অরিহা তিত্থংকরো মহাবীরো।

---

* "পৃথিবীর ইতিহাস", প্রথম খণ্ড, মহাভারত প্রসঙ্গে, ২৭৭—২৮৯ পৃষ্ঠায়, সে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

† "পৃথিবীর ইতিহাস", পঞ্চম খণ্ড. ৮৬—৮৮ পৃষ্ঠা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

তং রয়ণিং অবংতিবই অহিসিত্তো পালগো রায়া ॥
সট্ঠী পালগ রন্নো পণ পন্ন সয়ংতু হোই নংদানং।
অট্ঠসয়ং মুরিয়াণং তীসং চিঅ পুস্সমিত্তস্স ॥
বলমিত্ত ভানুমিত্তা সট্ঠীবরসাণি চত্ত নরবহণী।
তহ গদ্দভিল্লরজ্জং তেরস বরিসা সগস্স চউ ॥"

উপরি-উদ্ধৃত বর্ণনাদ্বয়ের ভাবার্থ,—তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী যে দিন নির্ব্বাণ-লাভ করেন, সেই দিন অবন্তীর রাজা পুলকের রাজ্যাভিষেক হয়। পুলক ৬০ বৎসর রাজত্ব করেন। তাহার পর নন্দবংশীয় ৯ জন নৃপতি ১৫৫বর্ষ কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে মৌর্য্য-বংশীয় রাজগণের রাজত্ব-কাল ১০৮ বৎসর। তদন্তে পুষ্পমিত্র ৩০ বৎসর রাজত্ব করেন। তার পর বালমিত্র ও ভানুমিত্র রাজা হন। তাঁহারা ৬০ বৎসর রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রাজত্বের পর নলবাহন বা নববাহন (নহবহণ, নভোবাহণ) সিংহাসন প্রাপ্ত হন এবং ৪০ বৎসর রাজত্ব করেন। ইহার পর গর্দ্দভিল্ল (গদ্দভিল্ল) ১৩ বৎসর এবং শক (সগ) রাজা ৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত ঐ বর্ণনায় মহাবীর স্বামীর নির্ব্বাণ হইতে শক রাজগণের রাজত্ব-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত রাজগণের নাম ও রাজত্ব-শাসনকাল নিম্নরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; যথা,—

(১)	মহাবীর স্বামীর নির্ব্বাণ-লাভ	৫২৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে।
(২)	রাজা পুলক	৫২৭—৪৬৭ „
(৩)	নন্দ-রাজগণ	৪৬৭—৩১২ „
(৪)	মৌর্য্য-রাজগণ	৩১২—২০৪ „
(৫)	পুষ্পমিত্র	২০৪—১৭৪ „
(৬)	বালমিত্র ও ভানুমিত্র	১৭৪—১১৪ „
(৭)	নলবাহন বা নববাহন	১১৪—৭৪ „
(৮)	গর্দ্দভিল্ল	৭৪—৬১ „
(৯)	শকরাজগণ	৬১—৫৭ „

প্রসিদ্ধ জৈন-গ্রন্থকার হেমচন্দ্র 'পরিশিষ্ট পর্ব্বে' যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে—

'এবং চ শ্রীমহাবীরে মুক্তে বর্ষশতে গতে। পংচ পংচাশদধিকে চ চন্দ্রগুপ্তোঽভবন্নৃপঃ ॥"

মহাবীর স্বামীর নির্ব্বাণ-লাভের ১৫৫ বৎসর পরে অর্থাৎ ৩৭২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে চন্দ্রগুপ্তের বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত যখন ভদ্রবাহুর সমসাময়িক বলিয়া পরিচিত, তখন ঐরূপ কাল-নির্দ্দেশ প্রমাদ-পরিশূন্য বলিয়া মনে হয় না। কেন-না, ভদ্রবাহুর বিদ্যমান-কাল যে ৩৭১—৩৫৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায় না। এরূপ হিসাবে প্রায় ৬০ বৎসরের ব্যবধান থাকিয়া যায়। জৈনগণের অধিকাংশ প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে (পূর্ব্বে এই মতই উদ্ধৃত হইয়াছে) ৩১২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-প্রাপ্তিকাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হেমচন্দ্র এ সম্বন্ধে গণনায় ৬০ বৎসরের ভুল করিয়া থাকিবেন। রাজা পুলকের রাজত্ব-কাল তাঁহার হিসাবে বাদ পড়িয়াছে বলিয়াই মনে হয়। জৈন-গ্রন্থোক্ত আরও

কয়েকটী বিশিষ্ট ঘটনায় এ ভ্রম বিশেষ-রূপে বোধ-গম্য হইতে পারে। জৈন গ্রন্থাদিতে প্রকাশ, মহাবীর প্রভু যখন ধর্ম্মালোচনায় ব্রতী ছিলেন, রাজা শ্রেণিক তখন রাজগৃহের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। ঐ শ্রেণিক—রাজা প্রসেনজিতের পুত্র। সেই প্রসেনজিৎ—বিম্বিসার বা বাম্ভাসার নামেও পরিচিত ছিলেন। মহাবীর স্বামীর সম-সাময়িক রাজা শ্রেণিকের উত্তরাধিকারী পুত্রের নাম অশোকচন্দ্র বা কুণিক। তিনি রাজগৃহ হইতে চম্পা-নগরীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। উদায়ী—তাঁহারই পুত্র ও উত্তরাধিকারী। পাটলীপুত্র-নগর এই উদায়ী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা উদায়ী চম্পা হইতে পাটলীপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। উদায়ীর কোনও সন্তান-সন্ততি ছিল না। তাঁহার মৃত্যুর পর নন্দ-রাজগণ পাটলী-পুত্রের সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহাদের উচ্ছেদ-সাধনে চন্দ্রগুপ্ত রাজা হন। মহাবীর স্বামীর নির্ব্বাণের পর রাজা কুণিক হইতে রাজা উদায়ীর রাজ্যশাসনকাল, গণনায় প্রায় ৬০ বৎসর দাঁড়াইতে পারে। এ দিক দিয়াও, হিসাবে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকাল ৩১২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে প্রতিপন্ন হয়। জৈনগণের ইহাই সিদ্ধান্ত। যাহা হউক, এই ৩১২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যপ্রাপ্তি-কাল বলিয়া মনে করিলে, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের গণনার সহিতও বিশেষ কিছু অসামঞ্জস্য থাকে না। ৩১৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ মৌর্য্য-সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার অব্দ বলিয়া আমরা পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছি।* ৩১২ আর ৩১৫—এ দুই হিসাবে পার্থক্য বড়ই অল্প। সে ঘোর বিপ্লব-বিশৃঙ্খলার দিনে ঠিক কোন্ দিন তিনি সিংহাসন অধিকার করিলেন এবং ঠিক কোন্ দিন লোকে তাঁহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিল, তাহা সঠিক নির্দ্দেশ করা কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নাই। তবে ৩১২ বা ৩১৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ নির্দ্দিষ্ট করিলেই সকল দিকে সামঞ্জস্য সাধিত হয়। এ হিসাবের সহিত মেগাস্থিনীসের ভারতে অবস্থিতি-কালের হিসাবের সামঞ্জস্যও রক্ষিত হইয়া যায়।

কি স্বদেশে কি বিদেশে রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে অনেক ইতিহাস অনেক কাহিনী অনেক কিম্বদন্তী প্রচারিত আছে। তিনি কি অবস্থা হইতে কি শক্তি-প্রভাবে বিশাল ভারত-সাম্রাজ্যের আধিপত্য-লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন; ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক সকলেরই এখন তাহা গবেষণার বিষয়। তিনি 'মুরা' নাম্নী এক দাসীর গর্ভজাত পুত্র বলিয়া প্রখ্যাত। অথচ, তিনি ভারতবর্ষের একচ্ছত্র অধিপতি;—ইতিহাসে তিনি অমর হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই প্রতিষ্ঠার মূল কি? কে তাঁহাকে ভারতের ইতিহাসে আজ অমর করিয়া রাখিয়াছে? হইতে পারেন—তিনি প্রতিভা; হইতে পারে—তাঁহাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিল। কিন্তু প্রতিভার অঙ্কুর আপনি শুকাইয়া যায় না কি—যদি উপযুক্ত সময়ে জলসেচন না পায়! অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আপনা-আপনিই নির্ব্বাপিত হয় না কি—তাহাতে যদি ঘৃতাহুতি না পড়ে—তাহাতে যদি ইন্ধন-সংযোগ না ঘটে! চন্দ্রগুপ্ত-প্রতিভা পরিস্ফুট হওয়ার বা চন্দ্রগুপ্ত-অগ্নিস্ফুলিঙ্গে দিগ্দাহী অনলের সৃষ্টি হওয়ার এক শুভ-সংযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। সে সংযোগ—সেই অসাধারণ ধীশক্তিশালী ব্রাহ্মণ—চাণক্য। মহাকবি কালিদাস যেমন

চন্দ্রগুপ্তের অমরত্বে চাণক্য।

* "পৃথিবীর ইতিহাস", পঞ্চম খণ্ড, ৩০—৩১ পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্যকে অমর করিয়া রাখিয়াছেন, চন্দ্রগুপ্তও সেইরূপ মহামন্ত্রী চাণক্যের প্রভাবে ইতিহাসে অমর হইয়া আছেন। আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে প্রবেশের চেষ্টা না পাইলেও, মেগাস্থিনীস আসিয়া দূতরূপে ভারতের রাজধানীতে অবস্থিতি না করিলেও, পাশ্চাত্য-প্রদেশে 'সান্দ্রাকোট্টাস' ইত্যভিধায়ে এই ভারতীয় নৃপতির নাম পরিকীর্ত্তিত না থাকিলেও, একমাত্র চাণক্যই চন্দ্রগুপ্তকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিতেন এবং ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ, অধুনা যাঁহারা চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে কোনরূপ গবেষণা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—তাঁহারা প্রায় সকলেই, চাণক্যের প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। কূটদর্শী সমালোচকগণ চাণক্যকে যতই মসীবর্ণে চিত্রিত করুন; তাঁহাদের কূটকল্পনা-মূলে যতই তিনি হেয় বলিয়া পরিগণিত হউন; ইউরোপের ম্যাকিয়াভেলী বা বিষমার্কের সহিত তুলনায় যতই তাঁহাকে নিম্নতম স্থানে স্থাপন করিবার চেষ্টা হউক; কিন্তু, সকল দিক সমানভাবে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে, মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে,—চাণক্যের ন্যায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত, অসাধারণ রাজনৈতিক এবং অমানুষিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি জগতে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। চন্দ্রগুপ্ত-রূপ অস্ত্র অবলম্বন করিয়া তিনি যে মহৎ কার্য্য সাধিত করিয়া যান, তাহার তুলনা নাই। একদিকে বৈদেশিক আক্রমণের বিভীষিকায়, অন্যদিকে আত্মদ্রোহের ঝঞ্ঝাবাতে, ভারতবর্ষের সিংহাসন টলটলায়মান হইয়া আসিয়াছিল;—মহাসমুদ্র-বক্ষে বীচিবিক্ষুব্ধ তরণীর ন্যায় ভারতবর্ষ প্রমাদ গণিতেছিল। সে ঘোর দুর্দ্দিনে ভারত-তরণীর কর্ণধার-রূপে চাণক্যের সহায়তা চন্দ্রগুপ্ত যদি না পাইতেন; পরিণাম কি সর্ব্বনাশকর হইত, কে বলিতে পারে? সেই জন্যই বলিতে ইচ্ছা হয়,—'চাণক্য! যত কলঙ্ক-কালিমায় কলুষিত করিয়াই তোমায় চিত্রিত করুক না কেন, কৌটিল্যাদি যতই কুনামে তোমায় লোক-সমাজে নিন্দনীয় করিবার চেষ্টা হউক না কেন, তোমার অভাব সকল দেশ সকল সময়ে অনুভব করিবেই করিবে!' চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অথবা তাঁহার একছত্র প্রভাবে ভারতের রাজশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করার জন্য যে কেবল চাণক্য প্রখ্যাতি-সম্পন্ন, তাহা নহে;—মহামতি চাণক্যের মন্ত্রিত্ব-ফলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক যে অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছিল, তাহাতেই চাণক্যের স্মৃতি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া আছে। চাণক্য কিরূপ ঐকান্তিকতার সহিত কি ভাবে সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পাইয়াছিলেন এবং কিরূপে তৎকর্ত্তৃক রাজ্যের শৃঙ্খলা ও জনহিতকর বিধি-বিধানসমূহ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; উপন্যাসে, নাটকে, কিম্বদন্তীতে—বিশেষতঃ তাঁহার অমূল্য গ্রন্থপত্রে, তাহার নিদর্শন দেদীপ্যমান্ রহিয়াছে। 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকে চাণক্যের যে চরিত-চিত্র দেখিতে পাই, * তাহাতে তাঁহার চরিত্র সহস্র দোষদুষ্ট হইলেও তাঁহার ন্যায় অধ্যবসায়ী তীক্ষ্ণধী ও কর্ম্মী পুরুষ সংসারে বিরল বলিয়াই বুঝিতে পারি। লোকমুখে কিম্বদন্তীতেও তাঁহার অসাধারণ শক্তি-মত্তার পরিচয় প্রাপ্ত হই। তাঁহার চরিত্রের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ উপাদান—তাঁহার প্রণীত ও সঙ্কলিত গ্রন্থ-রত্ন-সমূহ। তাঁহার

* "পৃথিবীর ইতিহাস" চতুর্থ খণ্ডে 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকের আলোচনায় এতদ্বিবরণ দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থ-রত্ন চন্দ্রগুপ্তকেও যেমন অমর করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহার নিজেকেও সেইরূপ অমরত্ব প্রদান করিয়াছে। চন্দ্রগুপ্তের ও চাণক্যের বিষয় আলোচনা করিতে হইলে, তাই এখন চাণক্যের রচনাবলিই এক প্রধান উপাদান-মধ্যে গণ্য হয়। একদিকে গ্রীক-রাজদূত মেগাস্থিনীসের বিবরণ, অন্যদিকে চাণক্যের গ্রন্থ-রাজি—তুলনায় সমালোচনায় এই দুইয়ের সামঞ্জস্য-সাধনেই চন্দ্রগুপ্ত-চাণক্যের মহীয়সী মহিমার নিদর্শন পরিদৃশ্যমান্।

চন্দ্রগুপ্তের সহিত চাণক্যের সম্বন্ধ এতই অচ্ছেদ্য যে, চন্দ্রগুপ্তের কথা কহিতে হইলে, চাণক্যের বিষয় সর্ব্বাগ্রে মনোমধ্যে উদিত হয়। আর, চাণক্যের বিষয় আলোচনা করিতে করিতে, চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকাল, শাসন-প্রণালী এবং তাৎকালিক সমাজের আচার-ব্যবহার সকল বিষয়েই অভিজ্ঞতা জন্মে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণের গবেষণার ফলে, মহাকবি কালিদাসের যেমন অনেক নাম ও অনেক কাজ অধুনা প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে; মহামন্ত্রী চাণক্যেরও সেইরূপ নানা নাম ও নানা কাজ পরিকল্পিত বা প্রমাণিত হইতে চলিয়াছে। শৈশবে "শিশুবোধকে" আমরা চাণক্য-পণ্ডিতের এক অপরূপ প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া এবং তাঁহার নামে প্রচারিত কতকগুলি নীতিবাক্য কণ্ঠস্থ করিয়া, তাঁহার সম্বন্ধে যে ধারণা হৃদয়-মধ্যে পোষণ করিবার প্রয়াস পাইতাম; যৌবনে বিদ্যালয়-পাঠ্য ইতিহাসে তাঁহাকে মৌর্য্য-রাজবংশের প্রতিষ্ঠামূলে দণ্ডায়মান দেখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে আর এক ধারণা অন্তরে স্থান দিতে বাধ্য হইতাম; পরিশেষে এক্ষণে বার্দ্ধক্যের সীমায় উপনীত হইয়া নব নব অভিজ্ঞতার ফলে তাঁহাকে আর এক নূতন মানুষ বলিয়া—অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষ-প্রবর বলিয়া—ধারণা জন্মিতেছে। এখন দেখিতেছি—চাণক্য অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, অলৌকিক জ্ঞানী ছিলেন, অদ্বিতীয় রাজনীতিক ছিলেন এবং একজন প্রখ্যাত-নামা প্রতিভাসম্পন্ন গ্রন্থকার ছিলেন। এক 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থের আবিষ্কার হওয়ায়, তাঁহার যশের পরিমাণ যেন সহস্রগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। "অর্থশাস্ত্রের" বিষয়-বিন্যাস ও রচনা-প্রণালী পরবর্ত্তী রাজন্যবর্গের ও কবিগণের নিকট যুগপৎ সমাদৃত হইয়াছিল। অধিক কি, অর্থশাস্ত্রের ভাষা ও ভাব, দণ্ডীর এবং কালিদাসের রচনার মধ্যেও স্থান পাইয়াছে বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।* এদিকে অশোক-স্তম্ভাদির লিপি-মধ্যেও অর্থশাস্ত্রের

অসাধারণ মানুষ চাণক্য।

* কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের প্রণীত 'প্রাচীন হিন্দুর রাষ্ট্রনীতি' সংক্রান্ত ইংরাজী গ্রন্থের ভূমিকায় প্রফেসার শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এই দুইটি বিষয় প্রতিপন্ন করার জন্য বিশেষ গবেষণা প্রকাশ করিয়াছেন। দণ্ডী প্রণীত "দশ-কুমার-চরিত" সংস্কৃত-সাহিত্যের এক রত্নস্থানীয়। সেই 'দশকুমার-চরিতে' অর্থশাস্ত্র হইতে যে সকল পংক্তি পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহার কয়েকটী পংক্তি নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে; যথা,—"আয়ব্যয়ানং অহ্নঃ প্রথমেঽষ্টমে ভাগে শ্রোতব্যং"; "দ্বিতীয়ে অন্যোঽন্যং বিবদমানানাং প্রজানাং আক্রোশৈঃ দহ্যমানকর্ণঃ কষ্টং জীবতি"; "তৃতীয়ে স্নাতুং ভোক্তুঞ্চ লভতে"; "চতুর্থে হিরণ্য প্রতি-গ্রহায় হস্তং প্রসারয়ন্নেব উত্তিষ্ঠতি"; ইত্যাদি। এইরূপ, মহাকবি কালিদাস যে স্থানে স্থানে অর্থশাস্ত্রের শব্দাদির অনুকরণ করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ;—E. g. Mallinath on *Raghuvansa*, Sarga 17, Sloka 49; "অথ কৌটিল্য:—কার্য্যাণাং নিয়োগ-বিকল্প-সমুচ্চয়া ভবন্তি অনেনৈবোপায়েন নান্যেনেতি নিয়োগঃ অনেন অন্যেনবেতি বিকল্পঃ অনেন চেতি সমুচ্চয়ঃ ইতি", which is taken from the *Arthasasta*, Bk. ix, Ch vii, pr. 147. *Ibid*, Sloka 55:—"অত্র কৌটিল্য:—ক্ষীণাঃ প্রকৃতয়ো লোভং লুব্ধা যান্তি বিরাগতামৃ্তা

ভাষার অনুসরণ দেখিতে পাই। * এইরূপে যাঁহার ভাষা ও ভাব দেশের প্রসিদ্ধ কবিগণ কর্তৃক অনুকৃত হয় এবং যাঁহার প্রযুক্ত শব্দাদি রাজকীয় অনুজ্ঞাদিতে পরিগৃহীত হয়, তিনি যে সাহিত্য-সংসারে যথেষ্ট প্রখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোনই সংশয় আসিতে পারে না। বিশেষতঃ, অর্থশাস্ত্র-প্রণয়নে তিনি যেরূপ সর্ব্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন এবং সকল মতের সামঞ্জস্য-সাধনে দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী যে মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের ও ভূয়োদর্শনের ফল বলিয়াই সপ্রমাণ হয়। † তার পর, "ন্যায়ভাষ্যের" রচয়িতা বলিয়া এবং "নীতি-শাস্ত্রের" প্রবর্ত্তক বলিয়া তাঁহার অশেষ প্রখ্যাতির বিষয় অবগত হওয়া যায়। 'বাৎস্যায়ন' নামে পরিচিত থাকিয়া তিনিই 'ন্যায়ভাষ্য' প্রণয়ন করিয়া যান; আবার কামন্দকীয় 'নীতিসারে' তাঁহারই প্রভাব পরিস্ফুট হয়। 'কামসূত্র' গ্রন্থ তিনিই প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন—এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধানে চাণক্যের বিভিন্ন নামে বিভিন্ন কীর্ত্তির নিদর্শন প্রাপ্ত হই। প্রসিদ্ধ জৈন-গ্রন্থকার হেমচন্দ্র তদীয় 'অভিধানচিন্তামণিতে' চাণক্যের নাম-সংজ্ঞার এইরূপ পরিচয় প্রদান করেন,—"বাৎস্যায়নে মল্লনাগঃ কুটিলশ্চণকাত্মজঃ। দ্রামিলঃ পক্ষিলস্বামী বিষ্ণুগুপ্তোঽঙ্গুলশ্চ সঃ।" কামন্দকীয় নীতিসারের জয়মঙ্গল-টীকায় শঙ্করাচার্য্যের উক্তিতে প্রকাশ,—"বিষ্ণুগুপ্তায়েতি সাংস্কারিকী সংজ্ঞা, চাণক্যঃ কৌটিল্য ইতি জন্মভূমি গোত্র নিবন্ধনে।" আবার, টীকান্তরে দেখিতে পাই,—"কুটো ঘটস্তং ধান্যপূর্ণং লান্তি সংগৃহ্ণন্তি ইতি কুটলাঃ কুম্ভীধান্যা ইতি প্রসিদ্ধিঃ। অতএব তেষাং গোত্রাপত্যং কৌটিল্যো বিষ্ণুগুপ্তো নাম।" আবার ন্যায়-ভাষ্যের 'তাৎপর্য্য-টীকাকার' বাচস্পতি মিশ্রের মতে—'ন্যায়-ভাষ্যের রচয়িতা বাৎস্যায়নের প্রকৃত নাম—পক্ষিল স্বামী।' এ বিষয়ে তাঁহার উক্তি;—"অথ ভগবতা

বিরক্তা যাত্যামিত্রং বা ভর্ত্তারং ঘ্নন্তি বা স্বয়ম্", which corresponds to *Artha*, Bk. vii, ch v, pr. 108-110. অধিক উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক। এইরূপ, উক্ত সর্গের ৫৬, ৭৬ ও ৮১ শ্লোকের সহিত এবং অষ্টাদশ সর্গের ৫০ শ্লোকের সহিত অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন অংশের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। কুমারসম্ভবেও এবংবিধ সাদৃশ্যের অসদ্ভাব নাই। *Vide*, Mr. Law's *Studies in Ancient Hindu Polity.*

* "Some of the technical and peculiar words of *Arthasartra*...have been used in the Edicts of Asoka....These are যুতা: (Rock Ed. III.) equivalent to যুক্তাঃ of Kautilya (p. 57) ; রাজুকা (R. Ed. III) corresponding to রজ্জুক in চোররজ্জুক of Kautilya (p. 232) ; পাষণ্ডেষু (R. Ed. v &c) which occurs in Kautilya (p. 144 and elsewhere) ; সমাজ (R. Ed. I.) which corresponds to সমাজ in the phrase উৎসবসমাজ of Kautilya (p. 121) ; মহামাতা (R. Ed. XII) which is equivalent to মহামাত্র of Kautilya (p 58 and elsewhere), and the like." *Ibid.*

† অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাই,—যে বিষয়ে তিনি কোনরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ-ব্যক্তিগণ তাঁহার পূর্ব্বে কি বলিয়া গিয়াছেন, তাহার আলোচনা আছে। দৃষ্টান্ত-স্থলে 'অমাত্যোৎপত্তি' নামক অষ্টম অধ্যায়ের উল্লেখ করি। অমাত্য-নির্ব্বাচন বিষয়ে ভরদ্বাজ, বিশালাক্ষ, পরাশর, পিশুন, কৌণপদন্ত, বাতব্যাধি, বাহুদন্তী প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনগণের মত প্রথমে পরিব্যক্ত হইয়াছে। শেষে তাঁহার স্বমত প্রকাশ পাইয়াছে। ইহারই নাম পাণ্ডিত্য ও ভূয়োদর্শন।

অক্ষপাদেন নিঃশ্রেয়সহেতৌশাস্ত্রে প্রণীতেঽপ্যুৎপাদিতে চ ভগবতা পক্ষিলস্বামিনা কিমপরমবশিষ্যতে যদর্থং বার্ত্তিকারম্ভঃ।" এই সকল বিষয়ের আলোচনায়, বিষ্ণুগুপ্ত, কৌটিল্য, চাণক্য, পক্ষিলস্বামী, বাৎস্যায়ন, মল্লনাগ, দ্রমিল প্রভৃতি বিভিন্ন নামে তাঁহার পরিচিত থাকার পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। অপিচ, টীকাসকলের তাৎপর্য্যানুসরণে এবং ধাত্বর্থে চাণক্যাদি শব্দের যে অর্থ উপলব্ধি হয়, তাহাতেও ঐ সকল নাম একই ব্যক্তির সম্বন্ধে প্রযুক্ত বুঝিতে পারি। "চণকস্য মুনের্গোত্রাপত্যং চণক-গর্গাদি যঞ্"—এ হিসাবে চণক-মুনির বংশজ বলিয়া চাণক্য নাম হওয়া সম্ভবপর। আবার শঙ্করাচার্য্যের টীকাক্রমে বাস-গ্রামের নামানুসারে চাণক্য নাম হইতে পারে।* কৌটিল্য নাম এক মতে—গোত্রজ; অন্য মতে বংশানুগত। চাণক্যের পূর্ব্ব পুরুষগণ 'কুটল' বা 'কুম্ভীধান্য' সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন, তদনুসারে সেই বংশজ ব্যক্তি 'কৌটিল্য' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন; এও এক মত। পুরাণাদিতে কৌটিল্য নামই দেখি। বিষ্ণুপুরাণের মতে, কৌটিল্য ব্রাহ্মণের চক্রান্তে নন্দবংশোচ্ছেদে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে কৌটিল্য ব্রাহ্মণ বলিয়াই উল্লিখিত আছে। বায়ু-পুরাণে, ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে ও মৎস্য-পুরাণে কৌটিল্য নামেই সে ব্রাহ্মণ পরিচিত। অর্থশাস্ত্রের রচয়িতাও কৌটিল্য অভিধায়ে অভিহিত। 'ইঁহার ক্রোধানলে নন্দ নৃপতি বিনষ্ট ও ইঁহারই চক্রান্তে মন্ত্রিপুত্র চন্দ্রগুপ্ত তৎ-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলে, ইনি তাঁহার মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, এই কুটিলতার মূল-স্বরূপ বলিয়া ইনি কৌটিল্য নামে অভিহিত হন।' এই মতই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। যাহা হউক, চাণক্য, কৌটিল্য প্রভৃতি নাম যখন একই ব্যক্তি-সম্বন্ধে প্রযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তখন ঐ সকল নামের সর্ব্ববিধ কার্য্যের সহিত সেই একই ব্যক্তির সম্বন্ধ সপ্রমাণ হইয়া যায়। তবে পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে প্রধানতঃ তিনি কৌটিল্য নামেই পরিচিত; এবং জৈন-গ্রন্থাদিতে চাণক্য নামে অভিহিত। 'স্থবিরাবলিচরিত' জৈন-গ্রন্থে চাণক্যের যে জীবনবৃত্ত হেমচন্দ্র প্রকাশ করিয়াছেন, বিবিধ উপকথা পূর্ণ হইলেও, তাহা পুরাণ-বর্ণিত নন্দ-বংশোচ্ছেদ-কাহিনীর সহিত সাদৃশ্য-সম্পন্ন; সেখানে চাণক্য নন্দবংশের ধ্বংস-সাধনে চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণের সহায়তাকারী। প্রাকৃত-ভাষায় লিখিত 'জৈনসূত্র' নামে এক ধর্ম্ম-গ্রন্থ আছে; চন্দ্রগুপ্তের রাজস্ব-সচিব-রূপে চাণক্যের কৃতিত্বের যশোঘোষণা তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। 'ঋষিমণ্ডলপ্রকরণ-বৃত্তি' নামক জৈন-গ্রন্থে চাণক্যের ও চন্দ্রগুপ্তের বন্ধুত্ব প্রকীর্ত্তিত। এই গ্রন্থে প্রকাশ,—তাঁহাদের মিত্রতা-সম্বন্ধ-হেতু নন্দের সংহার সাধিত ও নন্দরাজ্য আক্রান্ত হইয়াছিল। বৌদ্ধদিগের গ্রন্থে, 'সমন্তপশাদিকা'

চাণক্য-নামের উল্লেখ।

---

* গ্রামের নামে 'চাণক্য' নাম হইয়াছিল, এবংবিধ উক্তিতে চাণক্যের বাসস্থানের বিষয়ে একটা ভাব মনে আসিতে পারে। চাণক্য বাঙ্গালী ছিলেন এবং বর্ত্তমান চাণক (বারাকপুর) তাঁহার জন্মস্থান ছিল, ইহাতে তাহা মনে আসে না কি? জব চার্ণকের নাম অনুসারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে চাণক গ্রামের নামকরণ হইয়াছিল বলিয়া যে একটা কিম্বদন্তী ছিল; সে মত এখন উল্টাইয়া গিয়াছে। জব চার্ণকের অস্তিত্বের বহু পূর্ব্বেও ঐ চাণক্-গ্রাম যে ছিল, কর্ণেল ইউল প্রাচীন পুঁথি-পত্রের প্রমাণ দৃষ্টে অনেক দিন পূর্ব্বে তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। এ অবস্থায় ঐ প্রাচীন গ্রামের সহিত সেই প্রাচীন মনীষির সম্বন্ধ-স্থাপনের উপাদান-সংগ্রহ কষ্ট হইতে পারে না কি?

নামক বিনয়পিটকের ভাষ্যে, এবং মহানাম স্থবির-কৃত মহাবংশের টীকায়, চাণক্যের প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। কামন্দকীয় 'নীতিসারে' নন্দবংশের উচ্ছেদ ও চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক উল্লেখে চাণক্যের বন্দনা করা হইয়াছে। সেই সূত্রে কয়েক পংক্তি কবিতায় তাঁহাকে যেন জীবন্ত প্রত্যক্ষ হয়। সে কবিতা-পংক্তি-কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল; যথা,—

"বংশে বিশালবংশ্যানামৃষীণামিব ভূয়সাম্।
অপ্রতিগ্রাহকণাং যো বভুব ভুবিবিশ্রুতঃ॥
জাতবেদাইবার্চ্চিষ্মান্ বেদান্ বেদবিদাং বরঃ।
যোঽধীতবান্ সুচতরশ্চতুরোঽপ্যেক বেদবৎ॥
যস্যাভিচারবজ্রেণ বজ্রজ্বলনতেজসঃ।
পপাত মূলতঃ শ্রীমান্ সুপর্ব্বা নন্দপর্ব্বতঃ॥
একাকী মন্ত্রশক্ত্যা যঃ শক্ত্যা শক্তিধরোপমঃ।
আজহার নৃচন্দ্রায় চন্দ্রগুপ্তায় মেদিনীম্॥
নীতিশাস্ত্রামৃতং ধীমানর্থশাস্ত্রমহোদধেঃ।
সমুদ্দধ্রে নমস্তস্মৈ বিষ্ণুগুপ্তায় বেধসে॥"

'মুদ্রারাক্ষস' নাটকেও এই ব্যাপারই পরিবর্ণিত রহিয়াছে। পরিশেষে—অর্থশাস্ত্র। অর্থশাস্ত্রের একটী উপসংহার-বাক্যে, তিনি যে নন্দ-রাজগণের কবল হইতে বিলুপ্তপ্রায় বিদ্যা, শিল্প ও জন্মভূমির উদ্ধার-সাধন করিয়াছিলেন, তাহার জীবন্ত-বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়; যথা,—

"যেন শাস্ত্রং চ শস্ত্রং চ নন্দরাজগতা চ ভূঃ।
অমর্ষেণোদ্ধৃতান্যাশু তেন শাস্ত্রমিদংকৃতম্॥"

যেমন অর্থশাস্ত্রে, তেমনই কামন্দকের 'নীতিসারে' চাণক্যের মহিমা পরিকীর্ত্তিত। কামন্দক তো চাণক্যকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। প্রচারও এই যে, প্রমাণও এই যে, চাণক্য-নীতি সঙ্কলন করিয়াই কামন্দক প্রতিষ্ঠাপন্ন হন। চাণক্য যে বেদবিদ্‌দিগের শ্রেষ্ঠ, চাণক্য যে বিদ্বানগণের বরণীয়—কামন্দকের উক্তিতে তাহা পুনঃপুনঃ বিঘোষিত দেখি; নীতিসারের প্রথমেই দেখি, কামন্দক গুরুর জয়-ঘোষণা উপলক্ষে কহিতেছেন,—'যিনি অর্থ-শাস্ত্ররূপ মহাসমুদ্র মন্থন করিয়া রাষ্ট্র-বিজ্ঞান-রূপ অমৃত উদ্ধার করিয়াছেন, তাঁহাকে প্রণতি করি।' তার পর তিনি বলিয়াছেন,—'এই বিজ্ঞান রাজন্যবর্গের বিশেষ প্রিয় বলিয়া আমি সেই সর্ব্ববিদ্যাবিশারদের গ্রন্থের সার-সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইতেছি।' চাণক্যের গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সারই যে কামন্দকের প্রতিষ্ঠার মূল, ঐ উক্তিতে তাহাই উপলব্ধি হয়। চাণক্যের জ্ঞান-সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—'যো বভুব ভুবিবিশ্রুত'; 'বেদবিদাং বরঃ', 'বিদ্যানাং পারদৃশ্চনঃ'; অপিচ,—

"দর্শনাৎ তস্য সদৃশী বিদ্যানাং পারদৃশ্চনঃ।
রাজবিদ্যা প্রিয়তয়া সংক্ষিপ্তগ্রন্থমর্থবৎ॥"

তার পর, কামন্দক তাঁহার নীতিসারে অর্থ-শাস্ত্রের যে অনুসরণ করিয়াছেন, * তাহা নানারূপে

* অর্থশাস্ত্রের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও চতুর্দ্দশ খণ্ড-সমূহ নীতিসারে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। তদ্ভিন্ন অন্যান্য অংশ, কোথাও রূপান্তরে, কোথাও যথেচ্ছ ভাবে বিন্যস্ত আছে—প্রতিপন্ন হয়।

প্রতিপন্ন হয়। অর্থ-শাস্ত্রের কয়েকটি অধ্যায় সংক্ষেপে নীতিসারে পরিগৃহীত হইয়াছে এবং কয়েকটি অধ্যায় একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। এবংবিধ কারণে কেহ কেহ কৌটিল্য ও কামন্দক উভয়কেই 'নীতিসার' গ্রন্থের প্রবর্ত্তক বলিয়া খ্যাপন করিয়া গিয়াছেন। * ফলতঃ, দণ্ডীর 'দশকুমারচরিতে', কালিদাসের 'রঘুবংশ' প্রভৃতি কাব্যে এবং 'নীতিসারে' কৌটিল্যের 'অর্থ-শাস্ত্র" যে প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে, তাহাতে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না। আর, ঐ সকল সম্বন্ধ-হেতু 'অর্থ-শাস্ত্রের' বিদ্যমান-কাল সম্বন্ধেও একটা ভাব মনো-মধ্যে জাগরূক হয় ও একটা প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতে জানিতে পারি যে, কালিদাস, কামন্দক, দণ্ডী ও অশোক প্রভৃতির পূর্ব্বে অর্থ-শাস্ত্র প্রণীত ও প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্ত হইয়াছিল।

অর্থ-শাস্ত্রের প্রকৃত প্রণেতা কে?

অর্থ-শাস্ত্র প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও, উহার প্রণেতৃ-সম্বন্ধে কিন্তু অনেক প্রকার সংশয়-প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। প্রধান সংশয়,—কৌটিল্য নামধেয় কোনও নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি কর্ত্তৃক ঐ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, অথবা কৌটিল্য-সংজ্ঞিত রাজনৈতিক-সম্প্রদায়ের ঐ প্রকার মত বলিয়াই উহা কৌটিল্য-শাস্ত্র-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল? সাংখ্য-মত বলিতে যেমন সাংখ্য-সম্প্রদায়-ভুক্ত পণ্ডিতগণের মত বুঝাইয়া থাকে; কৌটিল্য অর্থ-শাস্ত্র বলিতে, তদ্রূপ সম্প্রদায়গত কোনও ভাব মনে আসে না কি? অথবা, কৌটিল্য নামা কোনও ব্যক্তির রচনাও ঐ গ্রন্থে আছে এবং রাজনীতি-তত্ত্বজ্ঞ অপরের রচনাও উহাতে স্থান পাইয়াছে? এ প্রকার সংশয়-প্রশ্ন উত্থাপনের কয়েকটী বিশিষ্ট কারণ দেখিতে পাওয়া যায়; এবং প্রাচ্য পাশ্চাত্য বহু মনীষি তৎপক্ষে মস্তিষ্ক পরিচালনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন; এবং তাঁহাদের সে বিতর্কের ফলে অনেক নূতন তথ্য প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে সে আলোচনারও একটু আভাষ প্রদান আবশ্যক মনে করি। বাদ-প্রতিবাদ-রূপে দুই জন জর্ম্মাণ-পণ্ডিতের গবেষণার বিষয় প্রথমে উল্লেখ করিতেছি। মূল তত্ত্ব তাহাতে বোধ-গম্য হইবে। অর্থশাস্ত্রে 'ইতি কৌটিল্য' এবং 'নেতি কৌটিল্য' বাক্য-দ্বয় অনধিক দ্বিসপ্ততি স্থানে প্রযুক্ত দেখা যায়। তদ্দৃষ্টে হিলব্রাণ্ট † সিদ্ধান্ত করেন যে, ঐ গ্রন্থ এক ব্যক্তির রচনা নহে, উহাতে সম্প্রদায়-বিশেষের মত প্রকাশ পাইয়াছে। প্রোফে-সর জেকবী ‡ তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিবাদের সারমর্ম্ম এই যে, ভারতবর্ষের গ্রন্থকারগণ অপরের মতের প্রতিবাদে প্রায়ই প্রথম পুরুষ অহং-বাচক শব্দ প্রয়োগ করেন না; বিনয়-প্রদর্শন-ব্যপদেশে তাঁহারা প্রতিবাদে প্রায়ই তৃতীয় পুরুষ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ঐ অর্থশাস্ত্রকে সম্প্রদায়গত গ্রন্থ মনে করিতে গেলে, সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক যে কে

---

* 'সোমদত্ত-উৎপত্তি কথা' গ্রন্থে দুই স্থানে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে। এক স্থানে (প্রথম খণ্ড, প্রথম অধ্যায়ে) কৌটিল্যকে ও কামন্দককে নীতিশাস্ত্রের রচয়িতা বলা হইয়াছে; এবং আর এক স্থানে (দ্বিতীয় অধ্যায়ে) দণ্ডনীতির পরিচয় প্রসঙ্গে উক্ত আছে,—'মৌর্য্য সম্রাটের উপকারের জন্য ছয় সহস্র শ্লোকে গ্রথিত করিয়া আচার্য্য বিষ্ণুগুপ্ত সংক্ষিপ্তভাবে এই দণ্ডনীতি গ্রন্থ প্রকটন করেন।'

† Hillebrandt—*Das Kautiliyasastra und Verwandtes*, Breslau, 1908.

‡ Prof. Jacobi—*Sitzungsberichte der Koniglich Preussischen Akademie der Wissenschaften*, xxxviii, 1912, pp. 832-849.

ছিলেন এবং শিষ্যানুশিষ্যক্রমে কিরূপে উহা ঐভাবে উপস্থিত হইল, তাহার একটা উল্লেখ বা নিদর্শন কোথাও পাওয়া যাইত। তার পর, ঐ রাজনৈতিক মতকে যদি কৌটিল্য-সম্প্রদায়ের মত অভিধায়ে অভিহিত করিতে হয়, তাহা হইলে সেই অসাধারণ রাজনীতিককেই, যাঁহার মন্ত্রণাবলে অতবড় সেই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইল—তাঁহাকেই, ঐ মতের প্রবর্ত্তক বলিয়া মানিতে হইবে। সে শক্তিশালী পুরুষের পক্ষে অসম্ভব কি থাকিতে পারে? কল্পনায় আসিতে পারে না, অথচ প্রত্যক্ষ ব্যাপার—ইউরোপের বিষমার্ক দৈনন্দিন গুরুকার্য্যভার বহন করিয়াও বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপকগণের সহিত মিলিত হইয়া রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করিতেন; সেইরূপ, অসম্ভব—অথচ সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়,—অশেষ রাজকার্য্যের মধ্যে বেষ্টিত থাকিয়াও, শিক্ষার্থিগণকে তিনি রাষ্ট্রনীতি শিক্ষা দিতেন; আর, তাহারই ফলে, কৌটিল্য-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে তিনি এক নূতন শক্তির সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন। তাই অর্থশাস্ত্র, কৌটিল্য-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তিত মত-প্রতিষ্ঠাপক গ্রন্থ-মধ্যে পরিগণিত। তবে 'অর্থশাস্ত্রের' গ্রন্থকার যে একই ব্যক্তি—চাণক্য কৌটিল্য, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার পক্ষে আরও যে দুই একটা বিশিষ্ট কারণ নাই, তাহা মনে করিতে পারি না। অর্থশাস্ত্র যে বিভিন্ন গ্রন্থকারের রচনা, অপিচ উহা যে কৌটিল্য-নামা ব্যক্তিবিশেষের রচনা নহে, তৎপক্ষে দ্বিবিধ প্রমাণ সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ দেখা যায়। প্রথমতঃ,—অর্থশাস্ত্রের ভাষা এতই বিভিন্ন প্রকৃতির যে, সে রচনা অভিন্ন ব্যক্তির বলিয়া মনে হয় না। দ্বিতীয়তঃ, 'কৌটিল্য' (কুটিল-স্বভাবসম্পন্ন) এই নিন্দনীয় নামেই বা গ্রন্থকার আপনাকে পরিচিত করিবেন কেন? প্রথম যুক্তির প্রতিপোষক এই যে, অর্থশাস্ত্রের রচনায় দেখি, কোথাও সূত্র-সাহিত্যের অনুস্মৃতি, কোথাও নিরুক্তের অনুকৃতি, কোথাও ভাষ্য (গদ্য), কোথাও কবিতা। সে সকল যে এক কালের ও এক লেখকের রচনা, তাহাতে ঘোর সন্দেহ আসে। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' হইতে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

(১) "সযোনীয়ব্যূহশ্মশান-গ্রাম-পথাশ্চষ্ট দণ্ডাঃ।"
"চতুর্দণ্ডস্সেতুবনপথঃ।"
"দ্বিদণ্ডোহস্তিক্ষেত্রপথ।"
"পঞ্চারত্নয়ো রথপথশ্চত্বারঃ পশুপথঃ।"
"দ্বৌ ক্ষুদ্রপশুমনুষ্যপথঃ।"

(২) "দেশঃ পৃথিবী; তস্যাং হিমবৎসমুদ্রান্তরমুদীচীনং
যোজনসহস্রপরিমাণং অতির্য্যক্ চক্রবর্ত্তিক্ষেত্রম্।"

(৩) "আকরকর্ম্মান্তদ্রব্যহস্তিবনব্রজবণিক্পথপ্রচরান্
বারিস্থলপথপণ্যপত্তনানি চ নিবেশয়েৎ।"

(৪) "বিদ্যাবিনীতো রাজাহি প্রজানাং বিনয়ে রতঃ।
অনন্যাং পৃথিবীং ভুঙ্ক্তে সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।"

প্রথম দৃষ্টিতে দেখিলে, এ সকল রচনা বিভিন্ন কালের ও বিভিন্ন জনের রচনা বলিয়াই

প্রতীত হয় বটে; আর তাহাতে একজনকে অর্থ-শাস্ত্রের প্রণেতা বলিতে মনে সংশয় আসে সত্য; কিন্তু আর কয়েকটি বিশেষ বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে সে সংশয় স্বতঃই দূরীভূত হইয়া যায়। অর্থশাস্ত্রের ভাষায় যে বিভিন্ন সময়ের ভাষার ছায়াপাত ঘটিয়াছে, তাহার কারণ কি? কারণ এই যে, গ্রন্থকার সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী অসাধারণ পাণ্ডিত্য-সম্পন্ন ছিলেন। যাঁহার অভিজ্ঞতা যত অধিক, তাঁহার রচনায় তাহা তদ্রূপ পরিস্ফুট। এ বিষয়ে সাধারণভাবে একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই এক বাঙ্গালা ভাষার রচনায়, আমরা সচরাচরই দেখিতে পাই, টোলের পণ্ডিতগণের রচনা-প্রণালী একপ্রকার এবং ইংরাজীনবীশগণের রচনা আর একপ্রকার। প্রথমোক্তে সংস্কৃতশব্দবাহুল্য; দ্বিতীয়োক্তে ইংরাজী শব্দের আড়ম্বর। তাই একই বিষয়ের বর্ণনায় অনেক সময় দ্বিবিধ লিপিমুখে দ্বিবিধ মূর্ত্তি প্রকট দেখি। অভিজ্ঞতার অনুরূপ ভাষা-ভাব যে লেখনী-মুখে প্রকাশ পায়, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। পণ্ডিতপ্রবর চাণক্যের কণ্ঠাগ্রে সর্ব্বশাস্ত্র বিদ্যমান ছিল। তাহারই নিদর্শন তাঁহার গ্রন্থে প্রকাশমান। এই শাস্ত্রানুগত দেশে যে সম্বন্ধে যে ভাবে যেরূপ বাক্য প্রকাশ করা সমীচীন, তিনি সেই ভাবেই সেই বাক্য বিন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচনা-প্রণালী সেই তত্ত্বই বিজ্ঞাপিত করিতেছে। আপন অভীষ্ট-সিদ্ধির সহায়তার জন্য, কোনও কোনও স্থলে পূর্ব্ব-মহাজনগণের বাক্য তিনি যথাযথ উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়াও মনে করিতে পারি। অতএব রচনা-প্রণালীর বিভিন্নতা-দৃষ্টে অর্থশাস্ত্র যে বিভিন্ন লেখকের রচনা, তাহা প্রতিপন্ন হয় না। তার পর, ঐ রচনার মধ্যে অভিনব এক সাম্যভাব প্রত্যক্ষ হয়। ঐ গ্রন্থ যে এক সময়ে একজন গ্রন্থকার কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও রচিত হয়, উহার ভাষা তাহা প্রমাণ করে। একই ভাষা—প্রদেশ-ভেদে বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছে। একই বাঙ্গালা ভাষা বা একই হিন্দী ভাষা নানা আকারে প্রকাশমান্। একই সংস্কৃতভাষার রচনার মধ্যে যতই সাদৃশ্য থাকুক, কাল-গত বা প্রদেশ-গত পার্থক্য আপনা-আপনিই প্রকাশ পায়। কালিদাসের এবং ভবভূতির রচনা তুলনায় সমালোচনা করিলে, প্রাদেশিক স্বতন্ত্রতা অল্পাধিক উপলব্ধি হইবেই হইবে। শ্রুতির ভাষায় ও স্মৃতির ভাষায় কালগত পার্থক্য আপনিই বোধগম্য হয়। কিন্তু অর্থশাস্ত্রে সে বৈষম্য আদৌ দৃষ্ট হইবে না। স্থানে স্থানে ভাষা জটিল কুটিল হইলেও, উহা যে একই সময়ের সঙ্কলিত ও লিখিত—একই প্রদেশের ভাষা, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। এই স্থলে কৌটিল্য চাণক্যের বাসভূমি বা জন্মস্থান সম্বন্ধে একটা দৃঢ় ধারণা মনোমধ্যে বদ্ধমূল হইতে পারে।

চাণক্য বাঙ্গালী কি না?

যে ভাষা, যে ভাব বা যে বর্ণনা দৃষ্টে মহাকবি কালিদাসকে আমরা বাঙ্গালী বলিয়া সিদ্ধান্ত করি, অর্থশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র প্রভৃতির ভাষা-ভাব-বর্ণনা আলোচনা করিলে, কৌটিল্য চাণক্যকেও সেইরূপ বাঙ্গালী বলিয়া ধারণা জন্মিতে পারে। তাঁহার বাস-গ্রামের বিষয় আলোচনায়, বঙ্গদেশের সহিত তাঁহার সংশ্রব প্রতিপন্ন হয়। * এদেশে ইংরেজ আগমনের পূর্ব্বে বা সমসময়ে চাণক্য-নীতির প্রচার-প্রাধান্য স্মরণেও

* যেমন ২৪-পরগণায় চাণক (বারাকপুর) আছে, তেমনই রাঢ়ে বীরভূম-জেলায়ও এক চাণক গ্রাম আছে।

এদেশের সহিত তাঁহার সংস্রবের কথা মনে আসে। আবার অন্য দেশ অপেক্ষা এই বঙ্গদেশেই বা কেন চাণক্য নামের প্রভাব এত অধিক দৃষ্ট হয়? ফলতঃ, চতুর্ব্বিধ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে, চাণক্যকে বঙ্গদেশবাসী ভিন্ন অন্যদেশীয় বলিয়া মনে করা যায় না। প্রথম,—তাঁহার ভাষার সহিত বঙ্গদেশ-প্রচলিত সংস্কৃত ভাষার সাদৃশ্য; দ্বিতীয়,—তাঁহার চাণক্য নাম জন্মস্থান 'চাণক' গ্রাম হইতে উৎপন্ন এবং বঙ্গদেশে ঐ নামধেয় গ্রামের বিদ্যমানতা; তৃতীয়,—অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশে তাঁহার বিষয় অত্যধিক প্রচারিত আছে; চতুর্থ,—বঙ্গদেশ-প্রচলিত বিবিধ আচার-ব্যবহারের অনুসরণ তাঁহার গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। * কেহ কেহ চাণক্যকে পঞ্চনদ-প্রদেশের অধিবাসী এবং তক্ষশিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিষয়-সমূহ বিচার করিয়া দেখিলে, সে সিদ্ধান্ত আদৌ ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন হয়। তক্ষশিলায় চন্দ্রগুপ্তের প্রাধান্য বিস্তৃত হইয়াছিল এবং তৎসূত্রে তথায় চাণক্যাদির গতিবিধি ছিল। এ ভিন্ন, তাঁহার রচনায়, আচার-ব্যবহারে বা জন্ম-গোত্রে সে পরিচয় কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পরন্তু, তাঁহার পিতৃপুরুষগণ ধান্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন, এ জন্য তাঁহার যে 'কৌটিল্য' নাম হয়, তক্ষশিলায় বাসের বিষয় মনে করিতে গেলে প্রাচীন টীকাকারগণের সে সিদ্ধান্তের সার্থকতাও থাকে না। ধান্য-সম্পৎ বঙ্গদেশেরই নিজস্ব; পঞ্জাবের তক্ষশিলায় ধান্যোৎপত্তির ও সঞ্চয়ের সম্ভবনা অল্পই মনে আসিতে পারে। সে হিসাবে, যবের বা গমের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে বরং বিচার্য্য বিষয় হইত। কিন্তু অর্থশাস্ত্রে তণ্ডুলের বিষয়ই পুনঃপুনঃ উক্ত হইয়াছে। † তার পর, মন্ত্রিত্বের উপযোগী রাজনৈতিক তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি বঙ্গদেশীয় উদ্যোগী পুরুষেই শোভা পায়। রাজপদ-প্রদানে বঙ্গদেশের ক্রিয়া আধুনিক ইতিহাসে এতই প্রকট হইয়া আছে যে, ঐ হিসাবেও চাণক্যকে বাঙ্গালী বলা যায়। কেহ কেহ কহেন যে, কুটিল অর্থশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া তিনি 'কৌটিল্য' নামে পরিচিত হন। কিন্তু তাহা বিশ্বাস করা যায় না। আপনাকে অপরের হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য কেহ কখনও তদ্রূপ সংজ্ঞা গ্রহণ করে না। সাধারণ মানুষের এরূপ প্রকৃতি কখনই স্বীকার করা যায় না। ‡ ভগবদ্ভক্ত আপনাকে

সে গ্রাম যে প্রাচীন, তাহাতে কোনও সংশয় নাই। এখন কোন্ চাণকের সহিত চাণক্যের সম্বন্ধ স্থির হইতে পারে, অনুসন্ধিৎসুগণ তাহার সন্ধান লউন।

* পরবর্ত্তী অংশে এই বিষয়ের আলোচনা আছে।

† "কাষ্ঠপঞ্চবিংশতি পলং তণ্ডুলপ্রস্থসাধনম্।" ইত্যাদি অর্থশাস্ত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, ১১শ অধ্যায় প্রভৃতিতে তণ্ডুলের উল্লেখ দ্রষ্টব্য।

‡ রাজ-চক্রবর্ত্তী অশোকের অনুশাসনে 'দেবনাং প্রিয়' উপাধি দেখা যায়। কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে, ঐ উপাধি গৌরবজনক নহে; উহা হেয়-অর্থ-জ্ঞাপক; পাণিনি তাঁহার সূত্রে "দেবানাং প্রিয় ইতি মূর্খে" অর্থাৎ মূর্খ অর্থে 'দেবানাং প্রিয়' বাক্যের প্রয়োগ হইয়া থাকে,—এইরূপ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ আবার প্রতিবাদ করিয়া বলেন,—"অশোক অসাধারণ শক্তিশালী এবং অতি বুদ্ধিমান রাজা ছিলেন। তিনি আপনার গৌরব ঘোষণা করিতে যাইয়া, 'দেবানাং প্রিয়' উপাধি গ্রহণে, লোক-সমাজে আপনাকে হেয় প্রতিপন্ন করিবেন,—ইহা কখনই মনে হয় না। দেবানাং প্রিয় ইতি মূর্খে—এ উক্তি পাণিনির নহে;

'দাসানুদাস' বলিয়া পরিচিত করিতে পারে ; কিন্তু ঘোর বিষয়-বুদ্ধি-সম্পন্ন জনে সেরূপ সম্ভবে না। সুতরাং 'কৌটিল্য' যে চাণক্যের বংশগত উপাধি, তাহা অস্বীকার করা যায় না। আর, তাহা অস্বীকার করিতে না পারিলে, চাণক্যকে বঙ্গদেশবাসী বলিয়াই মানিয়া লওয়া আবশ্যক হয়। বংশগত উপাধি,—নীচার্থবোধকই হউক, আর যাহাই হউক, মানুষ তাহা ব্যবহার করিতে কখনও কুণ্ঠিত হয় না। উচ্চশ্রেণীর পূজ্য ব্রাহ্মণ "ঢাক ঢোল" উপাধিতে পরিচিত আছেন বলিয়া যদি কেহ তাঁহাকে ব্রাহ্মণেতর বর্ণ বলিয়া মনে করে, সে তাহার অনভিজ্ঞতা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। অতএব, চাণক্যের কৌটিল্য সংজ্ঞা দেখিয়া অধুনা যাঁহারা নাটকে ও উপন্যাসে তাঁহাকে ঘোর কুটিল ব্রাহ্মণ রূপে অঙ্কিত করিতেছেন, সে তাঁহাদের বিষম ভ্রান্তি। তার পর, যে জন কুটিল রাজনীতি (দণ্ডনীতি) শাস্ত্রের প্রবর্ত্তনা করিতে গিয়া আপনাকে 'কৌটিল্য' অভিধায়ে অভিহিত করিয়া যান, তিনি সাধারণ মানুষ নহেন,—তিনি নিশ্চয়ই অসাধারণ মহাপুরুষ। বুঝিতে হয়—তিনি জ্ঞান-পথে এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, লোকরক্ষার জন্য ঐ নীতির প্রবর্ত্তনা করিলেও উহা যে কুটিল বুদ্ধির পরিচায়ক, সুতরাং ঐ নীতি-প্রবর্ত্তকরূপে তিনি কৌটিল্য-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইবার উপযুক্ত,—তাহাই মুক্ত-কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। ইহা তাঁহার নীচত্বের নহে, পরন্তু মহত্বেরই পরিচায়ক।* চাণক্য অসাধারণ শক্তিশালী মহামনা পুরুষ ছিলেন, এতদ্দৃষ্টান্তে তাহাই উপলব্ধি হয়।

চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের সম্মিলন সম্বন্ধে নানাবিধ গল্প-উপাখ্যান প্রচলিত আছে। কবি-নাট্যকারের কল্পনা কতরূপে কতভাবে সে চিত্র যে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রকাশ,—দরিদ্র ব্রাহ্মণ চাণক্য একদিন ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া নন্দরাজের ভবনে ভিক্ষাপ্রার্থী হইয়াছিলেন ; আর রাজা তাঁহাকে ভৃত্যের দ্বারা অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। সেই অপমানের প্রতিশোধ-গ্রহণ-উদ্দেশ্যে চাণক্য রাজ-প্রতিদ্বন্দ্বী চন্দ্রগুপ্তের সহিত মিলিত হন।

চন্দ্রগুপ্ত-চাণক্যের মিলন।

পরন্তু উহা ভট্টজিদীক্ষিতের।" অধুনা 'His Majesty' বলিতে যে উচ্চ ভাব উচ্চ ধারণা মনে আসে, তৎকালে 'দেবানাং প্রিয়' উপাধিতে সেই ভাব সূচিত হইত।' রাজচক্রবর্ত্তী অশোক যে সময়ে 'দেবানাং প্রিয়' বলিয়া আপনাকে ঘোষণা করিয়াছিলেন, সে সময় ঐ উপাধি অগৌরবজনক ছিল না। অশোক একজন বিখ্যাত রাজনীতিক ছিলেন। তিনি আপনাকে নির্ব্বোধ প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত 'দেবানাং প্রিয়' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান সমীচীন নহে। অশোক-প্রবর্ত্তিত অনুশাসন-সমূহে 'পাষণ্ড' শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ঐ শব্দে তৎকালে 'পরিষৎ' অর্থ সূচিত হইত। কিন্তু ক্রমশঃ উহার অর্থ-বিকৃতি ঘটিয়াছে। 'দেবানাং প্রিয়' এবং 'পাষণ্ড' শব্দের ন্যায় 'কৌটিল্য' শব্দেরও পরবর্ত্তিকালে অর্থ-বিকৃতি ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারি। হিন্দু ও পারসিকগণের বিবাদের ফলে, দেব ও অসুর শব্দের যে অর্থ-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল, এ প্রসঙ্গে তাহারও উল্লেখ করা যাইতে পারে। হিন্দুগণ, পারসিকগণের উপাস্যদেবতাকে অসুর সংজ্ঞা প্রদান করেন ; আবার পারসিকগণ হিন্দুদিগের দেবতাকে সুর নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। সেইরূপ মনে হয়, যাঁহারা চাণক্যের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, তাঁহারা কৌটিল্য' শব্দে মন্দ অর্থ সূচিত করিয়া, তাঁহাকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। নচেৎ, অসাধারণ প্রজ্ঞাসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক চাণক্য আপনার নামের সহিত ঐরূপ হেয় উপাধি সংযোগ করিয়া লোক-সমাজে নিন্দনীয় হইবেন,—এরূপ মনে করা যাইতে পারে না।

অন্য মতে প্রকাশ, শত্রুদলনে চাণক্যের ঐকান্তিকতা দেখিয়া চন্দ্রগুপ্ত তাঁহাকে আপনার দলভুক্ত করিয়া লন। এ ক্ষেত্রে শত্রু-দমনে তাঁহার একাগ্রতার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ পিপীলিকার দ্বারা কুশমূল-ধ্বংসের উপাখ্যান কথিত হয়। * কিন্তু এ সকল উপাখ্যানের মূল কারণ কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। চাণক্যের ন্যায় মহাজ্ঞানী পণ্ডিত ক্ষুধায় কাতর হইয়া রাজার ভোজনাগারে প্রবেশ করেন এবং ভৃত্যগণ কর্তৃক বিতাড়িত ও অপমানিত হন; আর সেই জন্যই নন্দ-রাজ্যের উচ্ছেদ সাধিত হইয়াছিল;—এবম্বিধ কিম্বদন্তীতে আস্থা স্থাপন কদাচ সমীচীন নহে, কুশমূল-ধংসের উপাখ্যানও কল্পনা বলিয়াই মনে হয়। † পরন্তু চন্দ্রগুপ্তের সহিত চাণক্যের মিলনের অপর কোনও নিগূঢ় কারণ আছে, সিদ্ধান্ত হইতে পারে। সে কারণের নির্দ্দেশ অপর কেহ করিয়াছেন কি না, আমরা আজিও সন্ধান পাই নাই। চাণক্য-নীতি ও অর্থ-শাস্ত্র আলোচনা করিতে করিতে যে নিদর্শন আমরা পাইয়াছি এবং যে ভাব আমাদের মনে আসিয়াছে, তাহাই এ স্থলে উল্লেখ করিতেছি। অর্থ-শাস্ত্রে লিখিত আছে,—

"যেন শাস্ত্রং চ শস্ত্রং চ নন্দরাজগতা চ ভূঃ। অমর্ষেণোদ্ধৃতান্যাশু তেন শাস্ত্রমিদং কৃতম॥"

শ্লোকটীতে অর্থ-শাস্ত্রের রচয়িতা আপনার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,—'এই শাস্ত্র (অর্থশাস্ত্র) প্রণয়ন করিয়াছেন কে?—না, যিনি শাস্ত্রকে, শস্ত্রকে এবং নন্দরাজাধিকৃত পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।' এই উক্তিতে কি বুঝিতে পারি? বুঝিতে পারি না কি—তখন শাস্ত্র (ধর্ম্মকর্ম্ম) লোপ পাইতে বসিয়াছিল, শস্ত্রে বা যুদ্ধবিদ্যায় জনসাধারণকে বঞ্চিত করা হইয়াছিল, আর ভূ বা রাজ্য নন্দরাজ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। অর্থাৎ,—বিশৃঙ্খলা বা ব্যভিচার তখন প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অর্থশাস্ত্রের প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে আবার দেখিতে পাই,—

"অপনীতো হি দণ্ডঃ মাৎস্যন্যায়মুদ্ভাবয়তি।
বলীয়ানবলং হি গ্রসতে দণ্ডধরাভাবে॥" ইত্যাদি।

এই উক্তিতেও বুঝিতে পারি, তখন নন্দরাজগণ বিলাস-ব্যসনে এতই উন্মত্ত হইয়াছিলেন যে, সুশাসনের প্রতি তাঁহাদের আদৌ লক্ষ্য ছিল না। ব্যভিচার ও অরাজকতার প্রাবল্যে রাজ্যে হাহাকার উপস্থিত হইয়াছিল। দুর্ব্বলের পীড়ন দেশের সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইত; নন্দরাজগণের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সুতরাং নন্দরাজগণের উচ্ছেদে রাজ্যে সুশাসন-সুশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য চন্দ্রগুপ্তের সহিত চাণক্যের মিলন সংঘটিত হইয়াছিল। অর্থশাস্ত্রের আলোচনায় আরও বুঝিতে পারি,—নন্দ ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী ছিলেন এবং হিন্দুর আচার-ব্যবহার মান্য করিতেন না। ধর্ম্ম-কর্ম্ম তখন লোপ পাইতে বসিয়াছিল; ব্যভিচার-

* "পৃথিবীর ইতিহাস", চতুর্থ খণ্ডে 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকের আলোচনা-প্রসঙ্গে এতদ্বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

† এ সম্বন্ধে কথিত হয়, ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ চাণক্য নন্দের ভোজনাগারে গমন করিয়া তাঁহার আসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। তাহাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া কেশাকর্ষণে চাণক্যকে বহিষ্কৃত করিবার আদেশ দেন। ভৃত্যেরা রাজার আজ্ঞানুসারে শিখা ধারণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে অপমানিত ও বিতাড়িত করে। ব্রাহ্মণ তখন প্রতিজ্ঞা করেন,—যতদিন না নন্দ-বংশের উচ্ছেদ করিতে পারিবেন, ততদিন আর সে শিখা বন্ধন করিবেন না। ব্রাহ্মণের সেই প্রতিহিংসানলেই নন্দ-বংশ ধ্বংস হয়।

বিশৃঙ্খলা প্রবল হইয়া পড়িয়াছিল। বুঝিলাম,—নন্দ-বংশীয় রাজগণের রাজত্বকালে, ব্যভিচার-বিশৃঙ্খলার প্রাবল্যে, দেশ উৎসন্ন-প্রায় হইয়াছিল; বুঝিলাম,—তাঁহাদের রাজত্ব-কালে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রাধান্য প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। আরও বুঝিলাম—অধর্ম্মের উচ্ছেদ-সাধনে ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠায় দেশে সুশাসন-সুপালন প্রবর্ত্তনার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও, চন্দ্রগুপ্তের সহিত বাঙ্গালী চাণক্যের মিলন কিরূপে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে? এ বিষয়ে কয়েকটী যুক্তির অবতারণা করিতে পারি। প্রথমতঃ—চন্দ্রগুপ্তকে যদি বাঙ্গালী বলিয়া মানিয়া লই এবং তিনি বঙ্গদেশের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া যদি স্বীকার করি,* তাহা হইলে নৈকট্য-সূত্রে চাণক্যের ও চন্দ্রগুপ্তের মিলনের অস্বাভাবিকতা কতকটা বিদূরিত হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ—'মুদ্রারাক্ষস' নাটকে দেখিতে পাই, একদা ব্রাহ্মণ চাণক্য আপনার কুটীর-সম্মুখস্থ পথের কুশ উৎপাটন করিতে-ছিলেন। রাজমন্ত্রী শটকার প্রাতঃভ্রমণে বহির্গত হইয়া ব্রাহ্মণকে তদবস্থ দেখিতে পান। কারণ জিজ্ঞাসায় জানিতে পারেন, ব্রাহ্মণের পদে কুশমূল বিদ্ধ হওয়ায় তাঁহার বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, কুশ-উৎপাটনে ব্রাহ্মণের এতাধিক একাগ্রতা দর্শনে মন্ত্রীর মনে হয়,—ঐ ব্রাহ্মণ যদি কোনও রাজার প্রতি ক্রুদ্ধ হন, তাহা হইলে সে রাজার মূলোচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। আপন অভিপ্রায় সিদ্ধির উদ্দেশ্যে চাণক্যের সহিত শটকার মিলিত হন। রাজধানীর এক প্রান্তে চাণক্যের পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় রাজবাড়ীতে এক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে চাণক্য রাজা কর্ত্তৃক অপমানিত হন। তাঁহার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক রাজভৃত্যগণ তাঁহাকে সভাস্থল হইতে বিতাড়িত করে। রাজবংশের উচ্ছেদ-সাধন না করিয়া শিখাবন্ধন করিবেন না বলিয়া চাণক্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। এই সময় চন্দ্রগুপ্তের প্রতিও রাজা মহানন্দ বিরক্ত হইয়া পড়েন। চন্দ্রগুপ্ত রাজপুরী হইতে বিতাড়িত হন। এই সূত্রে, নন্দবংশোচ্ছেদ কামনায়, চাণক্যের সহিত আসিয়া চন্দ্রগুপ্ত মিলিত হইয়াছিলেন।† 'মুদ্রারাক্ষসের' এ উক্তিও সমীচীন কিনা, বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। চাণক্য রাজধানীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেন। দলে দলে শিক্ষার্থী আসিয়া তাঁহার নিকট বিদ্যা-শিক্ষা করিত। তাঁহার যশঃখ্যাতি দিগ্দিগন্তে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। এরূপ অবস্থায় তাঁহার জ্ঞান-গবেষণার বিষয় রাজার বা রাজপুরুষগণের অপরিজ্ঞাত ছিল—ইহাও মনে হয় না। সুতরাং এরূপ কিংবদন্তীতে আস্থা স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত নহে। তৃতীয়তঃ,—পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের গবেষণায় প্রতিপন্ন হয়, চন্দ্রগুপ্তের পিতা—মোরীয় রাজ-দুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই মোরীয় রাজ-কন্যার গর্ভে চন্দ্রগুপ্তের জন্ম হয়। বঙ্গদেশবাসী ব্রাহ্মণ চাণক্য মোরীয় রাজের সভাপণ্ডিত বা দ্বারপণ্ডিত ছিলেন,—এ ধারণাও মনে আসিতে পারে। সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী মহাজ্ঞানী চাণক্য মোরীয় রাজসভায় বরণীয় আসন লাভ করিবেন, ইহা অস্বাভাবিক নহে। পরবর্ত্তিকালে মহাকবি কালিদাস প্রভৃতি যেমন রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, চাণক্যও সেইরূপ মোরীয় রাজসভায়

---

* পরবর্ত্তী পৃষ্ঠ-সমূহে, চন্দ্রগুপ্তের পিতৃ-পরিচয় ও জাতি প্রভৃতি প্রসঙ্গে এতদ্বিষয়ের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

† "পৃথিবীর ইতিহাস" চতুর্থ খণ্ডে 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন; আর সেই সূত্রে চন্দ্রগুপ্তের সহিত চাণক্যের পরিচয় সংঘটিত হয়; এবং পরে যখন চন্দ্রগুপ্ত মহাপদ্মানন্দ কর্তৃক রাজ্য হইতে বিতাড়িত হন, সেই সময় তিনি মাতামহালয়ে চাণক্যের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন;—এরূপ মনে করা যাইতে পারে। অধুনা দেশীয় রাজগণ-শাসিত অধিকাংশ রাজ্যে বাঙ্গালীর প্রভাব দৃষ্ট হয়। অধিকাংশ উচ্চ-রাজপদ বাঙ্গালীর অধিকৃত। প্রাচীন কালেও যে সেরূপ ছিল না, তাহা মনে হয় না। দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির জটিল সমস্যার সমাধানে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব চির-কালই দেদীপ্যমান। চাণক্যের ন্যায় অসাধারণ ধী-শক্তিশালী মহাজ্ঞানী পণ্ডিতের প্রভাব মৌরীয়-রাজধানীতে বিস্তৃত ছিল।

আদর্শ শাসন-প্রণালী।

অর্থ-শাস্ত্র বা অর্থনীতি—চাণক্যের অসাধারণ কৃতিত্বের নিদর্শন। তাঁহার ন্যায় অদ্বিতীয় রাজনীতিজ্ঞ এ সংসারে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণের কেহ কেহ বলেন—চাণক্য, ম্যাকিয়াভেলি অপেক্ষাও অদ্বিতীয় শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। যাহা হউক, অর্থ-শাস্ত্রের আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই, চাণক্য সর্ব্ববিদ্যার পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। আর তাহা হইতে বুঝিতে পারি, চন্দ্রগুপ্তের সুশাসনে রাজকীয় বিভিন্ন বিভাগের কিরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। অর্থশাস্ত্রে যদিও সরাসরিভাবে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের বা রাজ্য-শাসন-প্রণালীর উল্লেখ দৃষ্ট হয় না; কিন্তু তথাপি অর্থশাস্ত্রে যেরূপভাবে রাজ্যের ও শাসন-প্রণালীর আভাষ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়—রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-রক্ষা-প্রণালী বর্ণনাই অর্থশাস্ত্র-প্রণয়নের প্রধান উদ্দেশ্য। দৃষ্টান্তস্থলে অর্থশাস্ত্র হইতে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে বিষয়টী বেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে। শ্লোক কয়টী; যথা,—

১। "বিদ্যাবিনীতো রাজা হি প্রজানাং বিনয়ে রতঃ।
অনন্যাং পৃথিবীং ভুঙ্‌ক্তে সর্ব্বভূতহিতে রতঃ॥"

২। "তদ্বিরুদ্ধবৃত্তিরবশ্যেন্দ্রিয়শ্চাতুরন্তোঽপি রাজা সদ্যো বিনশ্যতি।"

৩। "দেশঃ পৃথিবী। তস্যাং হিমবৎসমুদ্রান্তরমুদীচীনং
যোজন সহস্র পরিমাণং অতির্য্যক্ চক্রবর্ত্তিক্ষেত্রম্॥"

উপরি-উদ্ধৃত শ্লোক-ত্রিতয় হইতে আমরা বুঝিতে পারি, চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব হিমালয় হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; কেহ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না; তাঁহার একছত্র শাসন রাজ্যের সর্ব্বত্র বিস্তৃত ছিল। ইত্যাদি। রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যশাসনকালে, তাঁহার ন্যায় অপর কোনও অদ্বিতীয় শক্তিশালী রাজার পরিচয় পাওয়া যায় না। অথবা, এমন কোনও রাজার উল্লেখ পুরাণাদিতে অথবা পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের বর্ণনায় দৃষ্ট হয় না, যাঁহার রাজ্য হিমালয় হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, অর্থশাস্ত্রে যে রাজ্যের ও রাজ্যশাসনপ্রণালীর উল্লেখ আছে, তাহা রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্তের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে। রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বে বিবিধ-বিষয়িণী উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থশাস্ত্র-বর্ণিত পণ্যাধ্যক্ষ, শুল্কাধ্যক্ষ, নাগরিক প্রভৃতি শব্দের আলোচনায় বুঝিতে পারি, বাণিজ্য-বিষয়ে ভারতবর্ষ তৎকালে শীর্ষ-

স্থান অধিকার করিয়াছিল। বাণিজ্যের সুশৃঙ্খলার জন্য নানা বিভাগে নানা আখ্যার উচ্চাচ্চ কর্ম্মচারিসমূহ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ, কিবা বিচারক্ষেত্রে, কিবা ব্যবহারবিধানে, কিবা স্থাপত্য-বিষয়ে, কিবা শিল্প-বাণিজ্যে, কিবা খনিজ-বিস্তার, কিবা পশু-বিভাগে—সর্ব্বত্র সুশিক্ষিত রাজকর্ম্মচারীর নিয়োগে রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যশাসন-প্রণালী সভ্য-সমুন্নত সমাজের আদর্শ-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। পশুপালন ও পশু-সংরক্ষণ জন্য চারণ-ভূমির সুব্যবস্থায় চন্দ্রগুপ্তের যেরূপ প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়; পয়ঃ-প্রণালী প্রভৃতি খননে দেশে জলসরবরাহের সুবন্দোবস্তে তাঁহার সেইরূপ আয়াস পরিদৃষ্ট হয়। দেশের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সংবাদ আদান-প্রদানের সুব্যবস্থা যেমন তাঁহার অশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক; দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির ও ঔষধাদি সরবরাহের সুবন্দোবস্ত প্রভৃতিও সেইরূপ তাঁহার অশেষ জনহিতৈষণার পরিজ্ঞাপক।* ফলতঃ, যে দিক দিয়াই দেখি, যে ভাবেই আলোচনা করি না কেন, রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-শাসনপ্রণালী যে সভ্য-সমুন্নত সমাজের আদর্শ-স্থানীয় ছিল, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

চন্দ্রগুপ্তের বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ নানারূপ গবেষণা করিয়াছেন। কিন্তু কেহই স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। কোথায় তাঁহার জন্মস্থান, তিনি কোন্ বংশ সমুদ্ভূত, তাঁহার পিতার নাম কি, কি সূত্রে তিনি পাটলিপুত্র রাজ-ধানীতে উপনীত হইয়াছিলেন,—এ সম্বন্ধে নানা বাদ-বিতণ্ডা দেখিতে পাই। পাশ্চত্য পণ্ডিতগণ এবং তাঁহাদের অনুসরণে এদেশীয় পণ্ডিতগণের কেহ কেহ বলিয়াছেন,—চন্দ্রগুপ্ত মুরা নাম্নী দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন।† আবার কেহ কেহ নীচ-বংশসম্ভূত বলিয়া তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন। কেহ কেহ আবার বলিয়াছেন,—মুরা তাঁহার পিতামহী ছিলেন। গ্রীক ঐতিহাসিক প্লুটার্ক এবং জাষ্টিনাস্ প্রভৃতির মতে চন্দ্রগুপ্ত নীচবংশোদ্ভব ছিলেন বলিয়া আলেকজাণ্ডার তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। এমন কি, আলেকজাণ্ডারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, তিনি চন্দ্রগুপ্তের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। ডিওডোরাসের বর্ণনায়ও আমরা দেখিতে পাই,—আলেকজাণ্ডারের প্রশ্নের উত্তরে পুরুরাজ বলিয়াছিলেন, 'গাঙ্গ্যপ্রদেশের সেই রাজা অতি নীচ-বংশোদ্ভব।' ঐতিকহাসিক রিজ ডেভিডসও ঐরূপ মতই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া দেখিলে পাশ্চত্য পণ্ডিতগণের ঐরূপ সিদ্ধান্ত ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন হইতে পারে। চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা যাহাই হউক না কেন, আমাদের ধারণা কিন্তু তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থের এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতের কাহারও কাহারও মতের আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়,—চন্দ্রগুপ্ত রাজপুত্র ছিলেন

চন্দ্রগুপ্তের বংশ-পরিচয়।

---

* এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদ-সমূহে দ্রষ্টব্য।

* এ বিষয়ে ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথের উক্তি,—"Chandragupta Maurya presumably was considered to be a Khatriya—his *minister* Chanakya or Kautilya certainly was a Brahmin."—Vide, *Early History of India*, p. 408. ম্যাকক্রিণ্ডলে বলিয়াছেন,—"He was born in humble life."

এবং তিনিই মগধের রাজ-সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। এ সম্বন্ধে আমাদের যুক্তি নিম্নে প্রকটন করিতেছি। বিষ্ণুপুরাণের প্রাচীনত্ব অবিসংবাদিত। তাহাতে লিখিত আছে—

"ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূমিপালা ভবিষ্যন্তি, স চৈকচ্ছত্রামনুল্লঙ্ঘিতশাসনো মহাপদ্মঃ পৃথিবীং ভোক্ষ্যতি ॥ ৫ ॥ তস্যাপ্যষ্টৌ সুতাঃ সুমাল্যাদ্যা ভবিতারঃ। তস্য চ মহাপদ্মাস্যানু পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি। মহাপদ্মঃ, তৎপুত্রাশ্চ একং বর্ষশতমবনীপতয়ো ভবিষ্যন্তি। নবৈব তান্ নন্দান্ কৌটিল্যো ব্রাহ্মণঃ সমুদ্ধরিষ্যতি ॥ ৬ ॥ তেষামভাবে মৌর্য্যাশ্চ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি। কৌটিল্য এব চন্দ্রগুপ্তং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি ॥ ৭ ॥

উপরি-উদ্ধৃত অংশের "তেষামভাবে মৌর্য্যাশ্চ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি" প্রভৃতি বাক্যের টীকায় টীকাকার লিখিয়াছেন,—"চন্দ্রগুপ্তঃ নন্দস্যৈব পত্ন্যন্তরস্য মুরাসংজ্ঞস্য পুত্রং মৌর্য্যাণাং প্রথমম্।" অর্থাৎ,—নন্দের মুরা নাম্নী পত্নীর গর্ভে চন্দ্রগুপ্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনিই মৌর্য্যদিগের মধ্যে প্রথম। তবেই বুঝা যাইতেছে—চন্দ্রগুপ্ত হীনবংশ-সম্ভূত ছিলেন না। তিনি রাজা নন্দের প্রকৃত উত্তরাধিকারী এবং নন্দরাজ্য তাঁহারই প্রাপ্য। অপিচ, মুরা দাসী ছিলেন না,—তিনি নন্দের পরিণীতা পত্নী। পাশ্চাত্য পণ্ডিত কর্ণেল মেকেঞ্জিও এই মতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।* তিনি দক্ষিণ-দেশীয় এক পণ্ডিতের নিকট হইতে তৈলঙ্গ-ভাষায় লিখিত একখানি সংস্কৃত-গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই গ্রন্থে মুরার সম্বন্ধে লিখিত ছিল,—'কলিযুগের প্রারম্ভে নন্দরাজগণ পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। নন্দরাজের দুই মহিষী—মুরা ও সুনন্দা। এক সময়ে রাজা নন্দ মহিষীদ্বয় সমভিব্যাহারে কোনও সিদ্ধ-পুরুষের আশ্রমে গমন করেন। সিদ্ধপুরুষের পদপ্রক্ষালনান্তর রাজা সেই জল উভয় রাণীর মাথায় ছিটাইয়া দেন। মুরা অতি ভক্তিসহকারে সিদ্ধপুরুষের পাদোদক গ্রহণ করেন। আর তাহারই ফলে তিনি অতি সুকান্ত এক পুত্র প্রাপ্ত হন।' ডাক্তার বিলের মতে প্রকাশ,—চন্দ্রগুপ্ত মোরীয় নগরের রাণীর পুত্র।† যাহা হউক, যে দিক দিয়াই দেখি, যে ভাবেই আলোচনা করি, তাহাতেই প্রতিপন্ন হয়,—রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্তই রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন। তিনি রাজবংশজাত রাণীর সন্তান। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে তাঁহাকে দাসীপুত্র বলিয়াছেন, তাহা অপ্রামাণ্য—আদৌ ভিত্তিহীন। চন্দ্রগুপ্তের সম্বন্ধে দেশে ও বিদেশে নানারূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। দক্ষিণদেশীয় পুঁথিতে প্রকাশ,—চন্দ্রগুপ্তের শৌর্য-বীর্য্য প্রভৃতি দর্শনে নন্দগণ তাঁহার প্রতি বিশেষ ঈর্ষান্বিত হন। সুতরাং নন্দ-গণের চক্রান্তে তাঁহাকে কিছুদিন বন্দিভাবে কালযাপন করিতে হয়। এই সময় সিংহলরাজ একটি মোমের সিংহ পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া নন্দরাজা-গণের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি বলিয়া পাঠান, যদি কেহ পিঞ্জর না খুলিয়া সিংহকে

চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে বিবিধ-কাহিনী।

---

* *Vide*, H. H. Wilson, *Theatre of the Hindus*, Vol. II, (Ed. 1835)

† "The Buddhists affirm that Asoka belonged to the same family as Buddha because he was descended from Chandragupta, who was the child of the Queen of one the sovereigns of Moriyanagar."—Bill's *Records of the Western World*, Vol. I. P. *XVII*.

চালাইতে পারেন, তাহা হইলে সিংহলরাজ তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া মানিয়া লইবেন। নন্দরাজগণ ভাবিয়া আকুল। পিঞ্জর না খুলিয়া কিরূপে সিংহ চালাইবেন, নন্দরাজ স্থির করিতে পারিলেন না। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন,—'যদি তাঁহার প্রাণ রক্ষা হয়, তাহা হইলে তিনি চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন।' নন্দরাজগণ তাহাতে সম্মত হইলেন। চন্দ্রগুপ্ত একটী উত্তপ্ত লৌহ-শলাকা সিংহের গাত্রে অর্পণ করিলেন। মোমের সিংহ গলিয়া গেল। চন্দ্রগুপ্ত কারামুক্ত হইলেন। অতঃপর নন্দরাজগণের নিকট অশেষ ধনসম্পৎ প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রগুপ্ত রাজার ন্যায় সুখৈশ্বর্য্যে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতেও তিনি নন্দরাজগণের ঈর্ষার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন না। নন্দ-রাজগণ তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, চন্দ্রগুপ্ত একদিন ভ্রমণকালে দেখিতে পাইলেন, এক ব্রাহ্মণ পায়ে কুশ বিদ্ধ হওয়ায় ক্রমাগত কুশ গাছ ছিঁড়িতেছেন। চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পরিশেষে তাঁহারই সহায়তায় নন্দবংশের উচ্ছেদে চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। বিনয়পিটক এবং মহাবংশ প্রভৃতি বৌদ্ধ-গ্রন্থের টীকায় চন্দ্রগুপ্তের সম্বন্ধে আর একরূপ উপাখ্যান পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে দেখিতে পাই—ধননন্দের নিকট অপমানিত হইয়া চাণক্য বিন্ধ্যারণ্যে পলাইয়া যান। সেখানে তিনি আপনার অসাধারণ বুদ্ধি-কৌশলে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করেন। অর্থবলে বলীয়ান হইয়া তাঁহার মনে অপর এক ব্যক্তিকে মগধের রাজা করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠে। এই সময় চন্দ্রগুপ্তের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হয়। ইত্যাদি। চন্দ্রগুপ্তের বিষয় উল্লিখিত বৌদ্ধ-গ্রন্থদ্বয়ে যাহা লিখিত আছে, তাহা গল্প বা উপকথা বলিয়াই অনেকে সিদ্ধান্ত করেন। যাহা হউক, ঐ সকল গ্রন্থের আলোচনায় জানিতে পারি,—রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্ত মোরীয়-নগরের নৃপতির দৌহিত্র ছিলেন। মোরিয়নগর যখন শত্রু কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়, চন্দ্রগুপ্তের মাতা তখন গর্ভবতী ছিলেন। রাজা শত্রুহস্তে নিহত হইলে তিনি পলায়ন করিয়া পুষ্পপুরে তাঁহার ভ্রাতার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। যথাকালে তাঁহার একটী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। নবজাত শিশুকে একটী মৃৎপাত্রে শোয়াইয়া তিনি সেই মৃৎপাত্রটী এক খোঁয়াড়ের দরজায় রাখিয়া আসেন। অরক্ষিতের রক্ষক স্বয়ং ভগবান। বোধ হয় তাঁহারই নিদেশক্রমে চন্দ্র নামা একটী বৃষভ শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে থাকে।* শিশুকে তদবস্থ দেখিয়া জনৈক রাখালের মনে বাৎসল্যের সঞ্চার হয়। রাখাল শিশুকে আপন গৃহে লইয়া গিয়া লালন-পালন করিতে থাকে। এক ব্যাধ রাখালের বন্ধু ছিল। ব্যাধ আদর করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে আপন গৃহে লইয়া গেল। সেখানে চন্দ্রগুপ্ত অপর রাখাল-বালকগণের সহিত গোমেষাদি চরাইতে লাগিলেন। একদিন রাখাল বালকগণের সহিত খেলা করিতে করিতে তাঁহার মনে রাজা হওয়ার সাধ জাগরিত হইল। রাখাল বালকগণের সকলের সম্মতিক্রমে চন্দ্রগুপ্ত রাজা হইলেন। অপর সকলের কেহ মন্ত্রী, কেহ সেনাপতি, কেহ কোতয়াল, কেহ প্রজা প্রভৃতি হইল। রাজা হইলেই রাজ্যশাসন আবশ্যক, বিচার-

* কেহ কেহ বলেন, চন্দ্র নামা বৃষভ কর্ত্তৃক গুপ্ত রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া শিশুর নাম চন্দ্রগুপ্ত হয়।

ব্যবস্থার প্রয়োজন। তাহাও ঠিক হইয়া গেল। বিচারালয় বসিল; চন্দ্রগুপ্ত বিচারকের আসনে উপবেশন করিলেন। অপরাধের তারতম্যানুসারে দণ্ডের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। এইরূপ একদিন বিচারে অপরাধীর হাত পা কাটিয়া দিবার আদেশ হইল। কিন্তু কুঠার বা ছুরিকা কিছুই নাই; কি করিয়া হাত পা কাটিয়া দেওয়া হইবে; রাজানুচরগণ ভাবিয়া আকুল হইল। তাহাদিগকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় দেখিয়া চন্দ্রগুপ্ত গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—"আমার আদেশ। ছাগ-শৃঙ্গে হাত-পা কাটিয়া দেও।" তাহাই হইল। শৃঙ্গের আঘাতে হাত-পা দ্বিখণ্ডিত হইয়া পড়িল। রাজার আদেশ প্রতিপালিত হইল। চন্দ্রগুপ্ত পুনরায় তাহা জুড়িয়া দিবার আদেশ করিলেন। অমনি হাত-পা পূর্ব্ববৎ যথাস্থানে বিন্যস্ত হইল। এই সময় ঘটনাক্রমে চাণক্য সেই স্থানের সন্নিকটে গমন করিয়াছিলেন। এই অদ্ভুতপূর্ব্ব ব্যাপার স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার মনে হইল,—এ বালক নিশ্চয়ই সামান্য রাখাল-বালক নহে; বালক নিশ্চয়ই কোনও মহাপুরুষ হইবে। অতঃপর চন্দ্রগুপ্তকে সঙ্গে লইয়া চাণক্য সেই ব্যাধের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ব্যাধকে যথোচিত পুরস্কার দিয়া চন্দ্রগুপ্তকে বিদ্যাশিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করিলেন। ব্যাধ এত অর্থ কখনও দেখে নাই। অর্থলাভে ব্যাধ বশীভূত হইল। চন্দ্রগুপ্তকে দান করিতে সে আর কোনও আপত্তি করিল না। চন্দ্রগুপ্তকে আপন আশ্রমে লইয়া আসিয়া চাণক্য তাঁহার গলায় স্বর্ণসূত্র পরাইয়া দিলেন। চাণক্যের সুশিক্ষায় চন্দ্রগুপ্ত কিছুদিন পরে অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। রাজকুমার পর্ব্বতও চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় চাণক্যের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। চাণক্য তাঁহারও গলায় স্বর্ণসূত্রের মালা পরাইয়া দিয়াছিলেন। একদিন শিষ্যদ্বয় সহ চাণক্য নিদ্রা যাইতেছিলেন। হঠাৎ চাণক্যের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি কুমার পর্ব্বতকে ডাকিয়া কহিলেন,—"এই অসি লও। যাও, চন্দ্রগুপ্তের কণ্ঠ হইতে স্বর্ণ-সূত্র লইয়া আইস। সূত্রগাছি খুলিবে না বা ছিঁড়িবে না—এমনই ভাবে আনিতে হইবে।" পর্ব্বত তীক্ষ্ণধার অসি-হস্তে অগ্রসর হইলেন বটে; কিন্তু সূত্র-গ্রহণে কৃতকার্য্য হইলেন না। পরদিন চাণক্য ঐরূপভাবে চন্দ্রগুপ্তের হস্তে অসি প্রদান করিয়া পর্ব্বতের কণ্ঠ হইতে স্বর্ণসূত্র আনিবার আদেশ করিলেন। চন্দ্রগুপ্ত বিষম সমস্যায় পড়িলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—'সূত্র ছিঁড়িবে না—খুলিতেও পারিব না। তবে কি উপায়ে সূত্র আনিব! চাণক্যের আদেশ পালন করিতেই হইবে। তবে কি পর্ব্বতের মস্তকচ্ছেদনই চাণক্যের অভিপ্রেত! সূত্র-গ্রহণ করিতে হইলে তবে কি আমাকে তাহার মস্তকচ্ছেদ করিতে হইবে?' যাহা হউক, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পর্ব্বতের মস্তকচ্ছেদন করাই চন্দ্রগুপ্ত স্থির করিলেন। তাহাই হইল। চন্দ্রগুপ্ত অসির আঘাতে পর্ব্বতের মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া চাণক্যের পদতলে স্বর্ণসূত্র রক্ষা করিলেন। চাণক্য বিশেষ চমৎকৃত হইলেন। চন্দ্রগুপ্তের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি চন্দ্রগুপ্তকে সর্ব্ববিদ্যায় উপদেশ দিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই চন্দ্রগুপ্ত একজন বিচক্ষণ ও বহুজ্ঞ পণ্ডিত মধ্যে পরিগণিত হইলেন। বৌদ্ধগ্রন্থে অতঃপর চন্দ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। সেখানে দেখিতে পাই,—প্রথমে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় না। চাণক্যের সঞ্চিত অর্থবলে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া প্রথমে যদিও তিনি জনাকীর্ণ নগর ও জনপদ অধিকার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন;

কিন্তু জনসাধারণের সমবেত আক্রমণে পরাজিত হইয়া চাণক্য সমভিব্যাহারে তাঁহাকে পলায়নপর হইতে হইয়াছিল। যাহা হউক, যুদ্ধে পরাজয়ের পর উভয়ে কিছুদিন বনে বনে ভ্রমণ করেন। পরে ছদ্মবেশে জনসাধারণের অভিপ্রায় জানিবার উদ্দেশ্যে বন পরিত্যাগ করিয়া উভয়ে নগরে নগরে ঘুরিতে আরম্ভ করেন। এই অবস্থায় ভ্রমণ করিতে করিতে উভয়ে এক দিন এক গ্রামে উপনীত হন। সেই গ্রামে এক রমণী আপনার পুত্রকে পিষ্টক খাওয়াইতেছিলেন। বালক পিষ্টকের চারি পাশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল মধ্যস্থল হইতে খাইতেছিল এবং তাহা ফেলিয়া দিয়া পুনরায় পিষ্টক চাহিতেছিল। রমণী ক্রুদ্ধা হইয়া পুত্রকে তিরস্কার-ছলে বলিল,—'তোর আচরণ, দেখিতেছি, রাজা চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যজয়ের ন্যায়।' বালক তাহাতে জিজ্ঞাসা করিল,—'কেন মা, কেন এরূপ কহিতেছ? চন্দ্রগুপ্তই বা কি করিয়াছিলেন, আর আমিই বা কি করিতেছি?' পুত্রের এবম্বিধ প্রশ্নে মাতা উত্তর দিলেন,—'কেন বৎস, তুমি তো পিষ্টকের মধ্যস্থল খাইতেছ, আর চারি পার্শ্ব পরিত্যাগ করিতেছ! চন্দ্রগুপ্ত রাজা হইবার আশায়, তোমারই মত রাজ্যের চারি ধার সীমান্ত-প্রদেশ-সমূহ পরিত্যাগ করিয়া একেবারে কেন্দ্রস্থল নগর-জনপদাদি আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার এ নির্ব্বুদ্ধিতার ফলে সৈন্যগণ শত্রুপরিবেষ্টিত হইয়া নিহত হইতেছে।'* রমণীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে চন্দ্রগুপ্তের জ্ঞানোদয় হয়। চন্দ্রগুপ্ত আপনার নির্ব্বুদ্ধিতার বিষয় বুঝিতে পারিয়া তৎপ্রতিকারার্থ বদ্ধপরিকর হন। যাহা হউক, অতঃপর পুনরায় বহুতর সৈন্য সংগৃহীত হইল। এবার চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত একযোগে দেশজয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমশঃ পাটলিপুত্র আক্রান্ত হইল। ধননন্দ †

* সিংহল-দেশীয় সংস্করণে মহাবংশের টীকায় এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। ঐ অংশের ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা,—"In one of the villages a woman (by whose hearth Chandragupta had taken refuge) baked a Chupatty and gave it to her child. He, leaving the edges ate only the centre and throwing the edges away, asked for another cake. Then she said,—'This boy's conduct is like Chandragutta's attack on the kingdom.' The boy said,—'Why, mother, what am I doing, and what has Chandragutta done?' 'Thou, my dear', said she, 'throwing away the outside of the cake, eatest the middle only. So Chandragutta, in his ambition to be a monarch, without beginning from the frontiers and taking the towns in order as he passed, has invaded the heart of the country..........and his army is surrounded and destroyed. *That* was *his* folly." &c.—Quoted by Rhys Davids in his *Buddhist India*.

† মহাবংশে নন্দবংশের শেষ রাজা ধননন্দ নামে পরিচিত হইয়া আছেন। পণ্ডিতগণের মতে, রাজা নন্দ অতিশয় লোভপরতন্ত্র ছিলেন বলিয়া তিনি ঐ নামে অভিহিত হন। চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন-সাং তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। প্যাটলিপুত্র নগরের সন্নিকটস্থ যে পাঁচটী স্তূপ অশোকের স্তূপ বলিয়া অভিহিত হয়, প্রত্নতত্ত্ববিৎ বিলের মতে ঐ স্তূপ-সমূহ অশোকের নহে; উহা রাজা নন্দ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ঐ স্তূপ-পঞ্চক তাঁহার ধনাগার মধ্যে পরিগণিত ছিল। (*Vide*, Beal's *Buddhist Records of the Western World*, Vol. II.) মুদ্রারাক্ষস নাটকেও নন্দরাজগণ অত্যন্ত লোভ-পরতন্ত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

যুদ্ধে নিহত হইলেন। চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্রের সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন। এই সময় চন্দ্রগুপ্তের গুপ্তশত্রুর আশঙ্কা চাণক্যের মনে বলবৎ হয়। কেহ হয় তো তাঁহাকে কোনও দিন বিষ প্রয়োগ করিতে পারে,—এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে বিষ-পানে অভ্যস্ত করেন। চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে স্বদেশে যেমন নানা উপাখ্যান প্রচলিত আছে, বিদেশে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থেও তাঁহার সম্বন্ধে সেইরূপ নানা কাহিনী দেখিতে পাই। গ্রীক ঐতিহাসিক জাষ্টিনাস্ লিখিয়া গিয়াছেন,—আলেকজাণ্ডার ক্রোধ-পরবশ হইয়া চন্দ্রগুপ্তের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। চন্দ্রগুপ্ত পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া তিনি যখন পরিক্লান্ত দেহে বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই সময় এক সিংহ লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। কিন্তু সিংহ তাঁহার প্রাণবধ না করিয়া গা চাটিয়া চলিয়া যায়। এই ঘটনায় চন্দ্রগুপ্তের মনে আশার সঞ্চার হয়। তিনি সৈন্য-সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন এবং পরিশেষে বিপুল বাহিনীর অধিনায়ক হইয়া গ্রীকসৈন্য পরাস্ত করিয়া-ছিলেন। কোনও কোনও গ্রন্থে প্রকাশ,—চন্দ্রগুপ্ত বিপুল সৈন্যের সাহায্যে দেশজয়ে বহির্গত হইয়াছেন, এমন সময় এক বন্যহস্তী তাঁহাকে আপন পৃষ্ঠে তুলিয়া লয়। * পাশ্চাত্য কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে চন্দ্রগুপ্ত নন্দ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া মহাবীর আলেকজাণ্ডারের সহিত সাক্ষাৎ করেন; বলেন,—'মগধরাজ নন্দের কু-শাসনে দেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। তিনি যদি সসৈন্যে মগধের দিকে অগ্রসর হন, তাহা হইলে মগধ-রাজ্য সহজেই তাঁহার পদানত হইতে পারে।' † কিন্তু আলেকজাণ্ডার মগধ-আক্রমণে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। যাহা হউক, উল্লিখিত উপাখ্যান-পরম্পরা হইতে কি বুঝিতে পারি? উহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় না কি, রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্ত

* এ বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের উক্তি,—"Justin (xv. 4), on Greek authority, tells two graceful stories of the effect upon animals of the marvellous nature of the king. Once, when, as a fugitive from his foes, he lay down overtaken, not by them, but by sleep, a mighty lion came and ministered to him by licking his exhausted frame. And again, when he had collected a band of followers and went forth once more to the attack, a wild elephant came out of the Jungle, and bent low to receive Chandragupta on his back." *Vide*, Rhys David's *Buddhist India*.

†। গ্রীক ঐতিহাসিক প্লুটার্ক তাঁহার গ্রন্থে এই বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই অনুসরণে ঐতিহাসিক ভিন্সেন্ট স্মিথ লিখিয়াছেন,—"In some way or other young Chandragupta incurred the displeasure of his kinsman, Mahapadma Nanda, the reigning King of Magadha, and was obliged to go into exile. During his banishment he had the good fortune to see Alexander, and is said to have expressed the opinion that the Macedonian King, if he had advanced, would have made an easy conquest of the great Kingdom on the Ganges, by reason of the extreme unpopularily of the reigning monarch."—*Vide*, Vincent A. Smith, *The Early History of India*.

দেশবাসীর কিরূপ শ্রদ্ধার, ভক্তির ও আদরের সামগ্রী ছিলেন! অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন না হইলে, অশেষ সদ্‌গুণাবলীর সমাবেশ না থাকিলে, পরোপকারে জীবন উৎসর্গ করিতে না পারিলে, কেহ কখনও দেশবাসীর হৃদয় অধিকার করিতে সমর্থ হয় না। আর ব্যক্তি-বিশেষে ঐ সকল সদ্‌গুণাবলীর সমাবেশ না থাকিলে দেশবাসী গাথায় উপাখ্যানে তাঁহার স্মৃতি আবদ্ধ রাখিতে প্রয়াস পায় না। চন্দ্রগুপ্ত সকল সদ্‌গুণের আধার ছিলেন। তাই দেশবাসী তাঁহাকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিত; আর তাহারই নিদর্শন-স্বরূপ নানা গাথার অবতারণায় তাঁহার স্মৃতি হৃদয়ে হৃদয়ে গ্রথিত রাখিবার প্রয়াস দেখিতে পাই। অনেকে মনে করেন, দেশপতি সম্রাটের বা প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে ঐরূপ উপাখ্যানাদির অবতারণা প্রায়শঃই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু উহা ভিত্তিহীন উপকথা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

চন্দ্রগুপ্ত বাঙ্গালী।

পুরাণাদির আলোচনায় এবং পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের সিদ্ধান্তের সার নিষ্কাষণে প্রতিপন্ন হয়,—রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্ত ক্ষত্রিয়-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা মোরীয়-নগরের রাজকন্যা ছিলেন, কেহ কেহ লিখিয়া গিয়াছেন যে, এই মোরীয়-নগর শাক্য-বংশের কোনও রাজকুমার কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মোরীয়-নগরের অবস্থানাদির বিষয় নিঃসংশয়ে সপ্রমাণ হয় না।* চৈনিক পরিব্রাজক সুং-উং ও হুয়েন-সাং প্রভৃতি মোরীয়-নগরের নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বর্ণনায় প্রকাশ,—উদয়ন-রাজ্যে মোরীয়নগর অবস্থিত।

* বৌদ্ধগণের মহাবংশ গ্রন্থে এই মোরীয়-নগর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে এক কিংবদন্তী আছে। তাহা এই,—যুবরাজ বিরূধকের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া শাক্য-বংশীয় কতিপয় যুবক হিমবন্ত দেশে পলায়ন করেন। বুদ্ধদেব সে সময় জীবিত ছিলেন। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক নিবিড় বনমধ্যে এক অতি মনোরম স্থান তাঁহাদের দৃষ্টি-পথে পতিত হয়। তাঁহারা দেখিতে পান, সেই স্থানে স্বচ্ছ-তোয় সরিৎসমূহ সদা প্রবাহিত, নানা-জাতীয় বিহঙ্গের কল-কাকলীতে সে স্থান সদা মুখরিত; নানা শ্রেণীর ময়ূরের কেকাধ্বনিতে ও আনন্দ-নৃত্যে সে স্থান সদা প্রফুল্লিত। সেই মনোরম স্থানে উপনীত হইয়া শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে যুবকগণ নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়েন। কথিত হয়, এই সময় ময়ূরগণ কর্ত্তৃক পর্ব্বত হইতে জল আনীত হয় এবং যুবকগণ সেই জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করেন। এই ঘটনা হইতে তাঁহাদের বংশাবলী ময়ূর, ময়ূরীয় বা মোরীয় আখ্যা প্রাপ্ত হয়। *Vide* St. Martin, *Memoire* and Max Muller, *History of Ancient Sanskrit Literature.* চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান, হুয়েন-সাং প্রভৃতির গ্রন্থ-পত্রে এই মোরীয়-রাজগণের প্রতিষ্ঠিত উদয়ন-রাজ্যের পরিচয় দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত হয় রাজা প্রসেনজিতের পুত্র বিরূধক, শাক্যগণের নিকট বিদ্যা-শিক্ষার্থ গমন করেন। শাক্য-রাজ্যের এক প্রান্তে একটী ধর্ম্মালয়ের নিকট তিনি রথ হইতে অবতীর্ণ হন। কথিত হয়, বুদ্ধদেবের জন্য ঐ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। যাহা হউক, বিরূধকের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শাক্যগণ সেই স্থানে উপস্থিত হন এবং বুদ্ধদেবের মন্দির অপবিত্র করিয়াছেন বলিয়া বিরূধককে ভর্ৎসনা করেন। অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া বিরূধক রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই ঘটনার কিছুকাল পরে রাজা প্রসেনজিতের মৃত্যু হয়; বিরূধক রাজ-সিংহাসন প্রাপ্ত হন। সিংহাসন-প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই তিনি অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ জন্য শাক্য-রাজ্য আক্রমণ করেন। শাক্যগণের চারি ব্যক্তি সে আক্রমণে বাধা প্রদান করে। শাক্য-বংশীয় অপরাপর ব্যক্তি তাহাদের এ আচরণে তাহাদের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠে। ফলে তাহারা রাজ্য হইতে বিতাড়িত হয়। নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া তাহারা উত্তর দিকে পার্ব্বত্য-প্রদেশে পলায়ন করেন।

কপিলাবস্তু হইতে বিতাড়িত শাক্যবংশীয় এক যুবক তথায় রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে সোয়াতনগর—হিন্দুকুশ ও চিত্রলের মধ্যবর্ত্তী উদ্যানক দেশে অবস্থিত ছিল। তাহা হইলে চন্দ্রগুপ্ত পঞ্জাব অঞ্চলের অধিবাসী বলিয়া সপ্রমাণ হয়। কিন্তু নাম প্রভৃতির আলোচনায় আমাদের মনে ভিন্ন ভাব অঙ্কুরিত হয়। উপাখ্যানের উপকথার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া যদি তাঁহার নামকরণাদির বিষয় আলোচনা করি, তাহা হইলে আমরা কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই না কি—তাঁহার নামকরণে বঙ্গদেশের প্রভাবই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে! পঞ্জাব বা বিহার অঞ্চলে বা উত্তর-ভারতে এরূপ নাম-সংজ্ঞায় কাহাকেও অভিহিত হইতে দেখি না। ঐ সকল স্থানের বা দেশের নাম-করণ-পদ্ধতির বিষয় আলোচনা করিলে বুঝিতে পারি, ঐ সকল দেশে 'গুপ্ত' উপাধী কাহারও নাই। রামেশ্বর, রামনারায়ণ, বিন্ধ্যেশ্বরী, রাজগণেশ্বর, কমলেশ্বরীপ্রসাদ এবং তদনুরূপ নাম-সংজ্ঞা প্রভৃতির আধিক্যই উত্তর-দেশীয় নামকরণে প্রবল হইয়া আছে। এ হিসাবে চন্দ্রগুপ্ত উত্তর ভারতের লোক না হওয়াই সম্ভব। গ্রীক ঐতিহাসিক ডিওডোরাসের বর্ণনায় প্রকাশ,—আলেকজাণ্ডারের ভারতাগমন সময়ে 'গঙ্গারিদে' দেশে এক প্রবলপরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তাঁহার বিংশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য, দুই লক্ষ পদাতিক সৈন্য, দুই সহস্র রথ এবং তিন চারি সহস্র হস্তী ছিল। গ্রীক-ভাষায় সেই রাজার নাম—'চন্দ্রমেশ' (Xandrames) রূপে উচ্চারিত হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্তের নামই যে ভাষান্তরে রূপান্তরিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে

সেই পার্ব্বত্য-প্রদেশে তাঁহাদের একজন হিমতল রাজ্যের, একজন উদয়ন রাজ্যের, একজন রোমীয় রাজ্যের এবং একজন কোশাম্বীর (শাম্বীর) অধিপতি হন। শাক্য-বংশীয় যুবক কর্ত্তৃক উদয়ন-রাজ্য অধিকারের একটী বিবরণ 'সি-উ কি' গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। 'সি-উ-কি'র বর্ণনায় প্রকাশ,—শাক্য-বংশীয় যুবক পথশ্রমে কাতর হইয়া 'লান-পো-লু' পর্ব্বতের পথে বিশ্রামার্থ উপবেশন করেন। এমন সময় এক রাজহংস তাঁহার সম্মুখে অবতরণ করে। তিনি রাজহংসের পৃষ্ঠে আরোহণ করেন। রাজহংস তাঁহাকে লইয়া আকাশে উড্ডীন হয়। 'লান-পো-লু' পর্ব্বতে 'ড্রাগন' সর্পের আকৃতি-বিশিষ্ট এক হ্রদ ছিল। যুবককে লইয়া রাজহংস সেই হ্রদের তীরে অবতরণ করে। যুবককে সেই স্থানে রক্ষা করিয়া রাজহংস চলিয়া যায়। যুবক হ্রদের তীরে এক বৃক্ষমূলে নিদ্রিত অবস্থায় পড়িয়া থাকেন। এই সময় এক নাগ-নন্দিনী সেই স্থানে উপস্থিত হন এবং মনুষ্য-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে শুশ্রূষা করিতে থাকেন। এই সূত্রে নাগরাজের সহিত যুবকের পরিচয় হয়। নাগরাজ উদয়ন-রাজ্যের বিষয় তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিয়া রাজ্য-অধিকারের জন্য যুবককে উদ্বুদ্ধ করিলেন। নাগ-রাজের পরামর্শমত তিনি উপঢৌকন সহ 'উ-চাং-না' (উদয়ন) রাজ্যের রাজার নিকট উপস্থিত হন। উদয়ন-রাজ উপঢৌকন গ্রহণ জন্য অগ্রসর হইলে যুবক অসির আঘাতে তাঁহাকে নিহত করেন। *Vide*, Beal's Buddhist Records of the Western World, Vols. I. II. এই উদয়ন-রাজ্যের অবস্থিতি সম্বন্ধে নানা মতান্তর দৃষ্ট হয়। ফা-হিয়ান এই রাজ্যকে 'উ-চাং' নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। প্রাকৃত ভাষায় ইহা 'উজ্জান' রূপে উচ্চারিত হইয়াছে। মিষ্টার ইউল বলিয়াছেন,—উদয়ন-রাজ্য পেশোয়ারের উত্তরে স্বাত নদীর তীরে অবস্থিত। হুয়েন-সাং উহার বিস্তৃতি প্রভৃতির যে পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেও অনুমান হয়, উদয়ন-রাজ্য হিন্দুকুশ পর্ব্বতের দক্ষিণে অবস্থিত এবং দরদ-রাজ্যের দক্ষিণে চিত্রল হইতে সিন্ধুনদের মোহানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। (Vide, *Yule Marco Polo*) সুং-উং বলিয়াছেন,—ঐ রাজ্য সুং-লিং পর্ব্বতের সানুদেশে ভারতবর্ষের উত্তরে ঐ রাজ্য অবস্থিত। উহার ন্যায় উর্ব্বর দেশ কচিৎ দৃষ্ট হইত। কাহারও কাহারও মতে, সোয়াতের সন্নিকটে উহার অবস্থিতি নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

কোনই সন্দেহ নাই। চন্দ্রগুপ্ত যে 'গঙ্গারিদে' দেশের রাজা ছিলেন, সেই দেশ বঙ্গদেশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। 'গঙ্গারিদে' দেশ বলিতে তৎকালে গঙ্গাতীরবর্ত্তী রাঢ় দেশকে বা গৌড়-দেশকে বুঝাইত।* বঙ্গদেশ সে সময়ে গৌরবের উচ্চ-চূড়ায় সমারূঢ় ছিল। মহাবীর আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণে অগ্রসর হন, সে সময় 'গঙ্গারাঢ়ী' নামধেয় সৈন্তগণ তাঁহাকে বাধা প্রদান করে। গঙ্গাতীরবর্ত্তী রাঢ় অঞ্চলের অধিবাসীরা 'গঙ্গারাঢ়ী' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক, 'গঙ্গারিদেশ' শব্দের আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, গ্রীক-ঐতিহাসিক-বর্ণিত রাজা 'চন্দ্রমেশ' বা চন্দ্রগুপ্ত বঙ্গদেশেই রাজত্ব করিতেন; আর গঙ্গাতীরবর্ত্তী রাঢ়-দেশে তাঁহার রাজধানী ছিল। নবদ্বীপের সন্নিকটস্থ সমুদ্রগড়ে গুপ্তবংশীয় রাজা সমুদ্রগুপ্তের রাজধানী ছিল, পৃথিবীর ইতিহাস চতুর্থ খণ্ডে তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্ত—সমুদ্রগুপ্তের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন কি না,—তাহাও এস্থলে বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। বংশ-পর্য্যায়ের আলোচনায় সমুদ্রগুপ্ত প্রভৃতির সহিত চন্দ্রগুপ্তের পর্য্যায় নির্দ্দেশ করা সুকঠিন হইলেও কেহ কেহ চন্দ্রগুপ্তকে 'গুপ্ত'-বংশের আদি বলিয়া অনুমান করেন। গুপ্তবংশীয়গণ আপনাদের নামের শেষে 'গুপ্ত' শব্দ ব্যবহার করিতেন; যথা—সমুদ্রগুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত, ঘটোৎকচগুপ্ত, কুমারগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত প্রভৃতি। চন্দ্রগুপ্তের নামের সহিত ঐ সকল নামের সাদৃশ্য দেখিয়া তাঁহাদের এরূপ অনুমান অমূলক বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, এতৎপ্রসঙ্গে আর একটী কথা মনে আসে। অধুনা যেমন একাধিক রাজধানী প্রতিষ্ঠার বিষয়ে প্রয়াস দেখিতে পাই, প্রাচীনকালেও যে সেরূপ প্রয়াস ছিল না, তাহা স্বীকার করা যায় না। আধুনিক গ্রীষ্মাবাস, শৈলাবাস প্রভৃতির ন্যায় চন্দ্রগুপ্তেরও একাধিক রাজধানী ছিল বলিয়া অনুমান হয়। যেমন পাটলিপুত্র নগরে তেমনই বঙ্গ-দেশের অন্তর্গত রাঢ় প্রদেশে গঙ্গাতীরবর্ত্তী সমুদ্রগড়ে তাঁহার দ্বিতীয় রাজধানী ছিল, ইহাই সিদ্ধান্ত হয়। কৌটিল্য-প্রণীত অর্থশাস্ত্রে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-শাসনপ্রণালীর বিষয় উল্লিখিত আছে। তাহাতে চাণক্য পুনঃপুনঃ ধান্ত-সংগ্রহের ও ধান্য-রক্ষার বিষয় বলিয়া গিয়াছেন। সুজলাসুফলা শস্তশ্যামলা বঙ্গদেশের উৎপন্ন-দ্রব্যের মধ্যে ধান্যই সর্ব্বপ্রধান। এক বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্য কোথাও এত প্রচুর পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হয় না। চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে পুনঃপুনঃ ধান্যের প্রাধান্য পরিকীর্ত্তিত হওয়ায় বুঝিতে পারি, চন্দ্রগুপ্তের প্রধান রাজধানী বঙ্গদেশেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। চাণক্য—চন্দ্রগুপ্তের দক্ষিণ-হস্ত-স্থানীয় ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার আদেশমতই কার্য্য করিতেন, কদাচ তাঁহার সঙ্গ ছাড়িতেন না। এ হিসাবে, যে দেশে অধিক দিন অতিবাহিত হয়, রাজার বা রাজমন্ত্রীর সেই দেশের অভিজ্ঞতাই অধিক হইয়া থাকে। তাই মনে হয়, চন্দ্রগুপ্ত বঙ্গদেশেরই লোক, আর বঙ্গদেশেই তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। আর সেই জন্যই চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে বঙ্গদেশীয় আচার-ব্যবহারের, বঙ্গদেশোৎপন্ন শস্যাদির ও বঙ্গদেশীয় রীতিনীতির এতাধিক উল্লেখ দেখিতে পাই।

---

* পৃথিবীর ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ডে, 'প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-বিভব' প্রসঙ্গে এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—০•০—

প্রাগ্‌ভারতেতিহাসে এক আদর্শ রাজ্য।

[আদর্শ-রাজ্যের আদর্শ,—ইংরেজ-রাজত্বে তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন-পরম্পরা;—জন-সংখ্যানির্দ্ধারণে আদর্শ,—প্রাচীন ও আধুনিক পদ্ধতি,—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সে প্রথার নিদর্শন;—ব্যবহার-বিধির ও রাজবিধির ব্যবস্থায় আদর্শ,—রাজ্যশাসনে ব্যবহার-শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা,—প্রাচীন ও আধুনিককালে তাহার আদর্শের তুলনা;—ঋণ, চুক্তি, দান, বিক্রয় প্রভৃতির প্রসঙ্গ;—বিভিন্ন প্রদেশে গমনাগমনের ও সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থায় আদর্শ,—নদী-নালা প্রভৃতি খননে এবং বাণিজ্যাদির উৎকর্ষ-সাধনে সে আদর্শ পরিস্ফুট;—পশু-সংরক্ষণের বিধান-পরম্পরা,—চারণভূমি প্রভৃতির বন্দোবস্তে সে ব্যবস্থায় বিশেষ উৎকর্ষ-সাধনের দৃষ্টান্ত,—তৎকার্য্য-সাধনে বিভিন্ন আখ্যায় কর্ম্মচারী-নিয়োগ,—জলসরবরাহের ব্যবস্থায় জলকষ্ট-নিবারণের বন্দোবস্ত;—জনহিতকর বিবিধ বিধান,—স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা,—চিকিৎসাদির বন্দোবস্ত,—দুর্ভিক্ষ, জলকষ্ট, বন্যা প্রভৃতি নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণ;—বিবিধ আদর্শের পরিচয়,—উপসংহারে বিবিধ বক্তব্য।]

আদর্শ রাজ্য।

এ সংসারে যাহা অনুকরণযোগ্য, সাধারণতঃ তাহাই আদর্শ মধ্যে পরিগণিত। রাজা বল, রাজ্য বল, রাজত্ব বল—সকলের সম্বন্ধেই এ উক্তি প্রযোজ্য। যে রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণ-প্রণালী অপরের অনুকরণীয়—বিবিধ-বিষয়িণী উন্নতিতে যে রাজ্য সুখৈশ্বর্য্যের চরম সীমায় উপনীত, মানুষ প্রধানতঃ তাহাকেই আদর্শ রাজ্য অভিধায়ে অভিহিত করিয়া থাকে। কি প্রাচীনকালে, কি আধুনিককালে—সকল কালেই এ উক্তির সার্থকতা পরিলক্ষিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ অধুনাতন ইংরেজ-রাজত্বের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইংরেজ-রাজত্বের সর্ব্বতোমুখী উন্নতির প্রতি লক্ষ্য করিলে উহাকে 'আদর্শ-রাজ্য' নামে অভিহিত করিতে পারি। জনসংখ্যা-নির্দ্ধারণে প্রজাসাধারণের অভাব-অভিযোগ-নিরূপণ এবং খাদ্যাদি সরবরাহের সুবন্দোবস্ত যদি আদর্শ-রাজ্যের লক্ষণ হয়; তাহা হইলে ইংরেজ-রাজত্বে তাহার পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাই। প্রজাসাধারণের শিক্ষাদান-কল্পে সুশিক্ষা-বিস্তারের উপায়-পরম্পরা নির্দ্ধারণ যদি আদর্শ রাজ্যের নিদর্শন হয়; তাহা হইলে, ইংরেজ রাজত্বে সে আদর্শ পূর্ণ-প্রকটিত। পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতি খননে দেশে জল-সরবরাহের ব্যবস্থা-বন্দোবস্তে দেশবাসীর জলকষ্ট নিবারণ যদি আদর্শ রাজ্যের আদর্শ উপাদান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়; তাহা হইলে ইংরেজ রাজত্বে সে উপাদান সর্ব্বথা বিদ্যমান। রোগনিবারণকল্পে দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থায় বিবিধ প্রয়াস যদি আদর্শ-রাজ্যের এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া উক্ত হয়; তাহা হইলে ইংরেজ-রাজত্বে তাহার পূর্ণ বিদ্যমানতা প্রত্যক্ষ করি। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতির বিস্তারে রাজ্যের উন্নতি-সাধন যদি আদর্শ-রাজ্যের আদর্শ মধ্যে পরিগণিত হয়; তাহা হইলে ইংরেজ-রাজত্বে সে আদর্শের পরাকাষ্ঠা বিদ্যমান দেখি। দেশের বিভিন্ন স্থানে সংবাদ-আদান-প্রদানের এবং বিভিন্ন দেশে গতিবিধির সু-ব্যবস্থা যদি আদর্শ রাজ্যের পরিচয়-চিহ্ন মধ্যে গণ্য হয়;

তাহা হইলে ইংরেজ রাজত্বে সে পরিচয় পূর্ণ প্রতিভাত দেখিতে পাই। এইরূপ যে দিক দিয়াই দেখি, যে ভাবেই আলোচনা করি, অধুনা ইংরেজ-রাজত্ব সর্ব্ব বিষয়েই আদর্শ মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু আধুনিক কালের আদর্শ রাজ্য-সমূহের বিষয় আলোচনা করা, এ প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য নহে। প্রাচীনকালে, খৃষ্ট-জন্মের তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে, ভারতীয় নৃপতি-শাসিত কোনও রাজ্যে পূর্ব্বোক্ত আদর্শ-সমূহের কোনও নিদর্শন পরিলক্ষিত হয় কি না—তাহাই এ প্রসঙ্গের প্রধান আলোচ্য।

১। জনসংখ্যা-নির্দ্ধারণে আদর্শ।

[প্রাচীন ভারতে লোক-গণনা ;—ইংরেজ-রাজত্বে লোক-সংখ্যা নিরূপণের প্রয়াস,—তাহার পরিচয়,—অধুনাতন লোক-গণনা পদ্ধতি ;—জনসংখ্যা-নির্দ্ধারণের প্রয়োজনীয়তা ;—প্রাচীনকালের গণনা-পদ্ধতি,—অর্থ-শাস্ত্রে তাহার বিশিষ্ট পরিচয় ;—নগরাদির লোক-গণনা-প্রসঙ্গ ;—ভূমি-পরিমাণাদির বিষয় ;—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোক-গণনা-পদ্ধতি,—তৎপরিচয়ে প্রাচীন আদর্শ পরিস্ফুট।]

প্রাচীন ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনায় আদর্শ-রাজ্যের বিবিধ লক্ষণের কতকটা আভাষ পাওয়া যাইতে পারে। দেশের জনসংখ্যা-নির্দ্ধারণ এবং তদ্দ্বারা শাসন-প্রণালীর সুব্যবস্থা—একতম আদর্শ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কোন্ দেশে বা কোন্ জনপদে কত লোক বাস করে, প্রতি জনপদের শাসন-সংরক্ষণ জন্য কি পরিমাণ রাজকর্ম্মচারী নিয়োগ আবশ্যক, এবং সেই সেই স্থানে কি পরিমাণ খাদ্য-শস্যাদির আমদানি-রপ্তানি করা প্রয়োজন—সুশাসন সুপালন প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত কল্পে এ সকল বিষয় নির্দ্ধারণ করা রাজার একটী প্রধান কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত। এতাদৃশ দূরদৃষ্টি না থাকিলে দুর্ভিক্ষের প্রবল পেষণে দেশ হয় তো উৎসন্ন যাইতে পারে, শাসন-শৃঙ্খলার কু-ব্যবস্থায় দেশে অনাচার-ব্যভিচার প্রবল হওয়াও সম্ভবপর। তাই দেশের জন-সংখ্যা নির্দ্ধারণের প্রয়োজনীয়তা। খৃষ্ট-জন্মের প্রায় তিন শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে এ প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল, অর্থশাস্ত্রের আলোচনায় তাহা প্রতিপন্ন হয় ; আর অধুনা-প্রচলিত পদ্ধতির সহিত তুলনায় সে পদ্ধতি যে কোনও অংশে হীন ছিল না, তাহা বুঝা যায়। সুতরাং প্রথমতঃ আধুনিক নিয়ম-পদ্ধতির উল্লেখ করিয়া প্রাচীন ভারতবর্ষের জন-সংখ্যা-নিরূপণ-পদ্ধতির আলোচনা করিলে বিষয়টী বেশ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে।

ভারতে লোক-গণনা।

সুসভ্য ইংরেজ রাজত্বে জন-সংখ্যা-নিরূপণের ব্যবস্থা অতি অল্পদিন পূর্ব্বে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। 'সেন্সাস রিপোর্ট' বা লোক-সংখ্যা-নিরূপক বিবরণী হইতে বুঝিতে পারি—১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম লোক-গণনা আরম্ভ হয়। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে লোক-গণনা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত থাকিলেও ইংরেজ-রাজত্বে ইহার পূর্ব্বে এ প্রথা প্রবর্ত্তনার কোনরূপ উল্লেখ গ্রন্থপত্রে দৃষ্ট না। বলা বাহুল্য, প্রথম গণনা সময়ে দেশীয় নৃপতিগণের শাসিত রাজ্যসমূহ গণনার মধ্যে আসে না। গণনা-পদ্ধতিও তখন অসম্পূর্ণ ছিল, ব্যবস্থা-বন্দোবস্তও এত ব্যাপক ছিল না। এমন কি, দূরবর্ত্তী স্থান-সমূহ তখন দৃষ্টির অন্তরালেই রহিয়া যাইত। এইরূপে ভারতের সকল প্রদেশ গণনায় অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় নানারূপ অসুবিধার সূত্রপাত হয়।

আধুনিক পদ্ধতি।

তাই পরবর্ত্তী লোক-গণনায় তাহা সংশোধনের প্রয়াস দেখিতে পাই। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী দ্বিতীয়বার লোক-গণনার সময় পূর্ব্ববারের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি নিরাকৃত হয়। কিন্তু সে সময়ও কাশ্মীর, বেলুচিস্থান ও দূরবর্ত্তী অপরাপর অনেক জনপদ বাদ পড়িয়া যায়। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ২৬এ ফেব্রুয়ারী তারিখের লোক-গণনায় বিশেষ বিস্তৃত আয়োজনের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সে সময় বেলুচিস্থান, সীমান্ত-প্রদেশ-সমূহ, আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি এবং দেশীয় নৃপতিগণের শাসিত রাজ্য-সমূহ গণনায় অন্তর্ভুক্ত হয়। সেই হইতে এই নিয়মে গণনা-পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষে পাঁচ বার লোক-গণনা হইয়াছে। নিম্নে তাহা প্রকটিত হইল; যথা,—

প্রথমবার লোক-গণনা—১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ২১এ ফেব্রুয়ারী।
দ্বিতীয়বার লোক-গণনা—১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী।
তৃতীয়বার লোক-গণনা—১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ২৬এ ফেব্রুয়ারী।
চতুর্থ বার লোক-গণনা—১৯০১ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ্চ।
পঞ্চমবার লোক-গণনা—১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ্চ।

এই সকল লোক-গণনায় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা নিম্নরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—

বৎসর	পুরুষ		স্ত্রী		মোট
১৮৭২ খৃষ্টাব্দ	১০,৬০,৫৫,৫৪৫	+	১০,০১,০৬,৮১৫	=	২০,৬১,৬২,৩৬০
১৮৮১ খৃষ্টাব্দ	১২,৯৯,৪৯,২৯০	+	১২,৩৯,১৭,০৪০	=	২৫,৩৮,৯৬,৩৩০
১৮৯১ খৃষ্টাব্দ	১৪,৬৭,৬৯,৬২৯	+	১৪,০৫,৪৫,০৪২	=	২৮,৭৩,১৪,৬৭১
১৯০১ খৃষ্টাব্দ	১৪,৯৯,৫১,৮২৪	+	১৪,৪৪,০৯,২৩২	=	২৯,৪৩,৬১,০৫৬
১৯১১ খৃষ্টাব্দ	১৬,১৩,৩৮,৯৩৫	+	১৫,৩৮,১৭,৪৬১	=	৩১,৫১,৫৬,৩৯৬

ভারতবর্ষে কোন্ কোন্ জাতি বসতি করে, এবং তাহাদের কোন্ জাতির সংখ্যা-পরিমাণ কত, ১৯১১ খৃষ্টাব্দের লোক-গণনায় তাহা এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে; যথা,—

জাতি	পুরুষ		স্ত্রী		মোট
১। হিন্দু ..	১০,৩৫,৮১,১৬৪	+	৮৮,২০,০৬৮	=	১১,২৪,০১,২৩২
২। মুসলমান ..	৪৪,৬১,৩৭১	+	৩৭,৫০,৬১৩	=	৮২,১১,৯৮৪
৩। খৃষ্টান ..	৪,৬৪,৮৮৮	+	৩,৬১,৪০২	=	৮,২৬,২৮৯
৪। বৌদ্ধ ..	৩,৫৫,৮৩২	+	৩,৫৩,৩৯১	=	৭,০৯,২২৩
৫। জৈন ..	১,৯৪,৭৪১	+	১,৭৪,৪৩৭	=	৩,৬৯,১৭৮
৬। শিখ ..	১,৩২,৮০২	+	৭১,৩৪০	=	২,০৪,১৩৩
৭। ইহুদী ..	৯,৩৪০	+	৮,৬৭৮	=	১৭,০১৮
৮। জেরওয়াষ্ট্রীয়ান	৪৪,৩৬৯	+	৪২,১৯৯	=	৮৬,৫৬৮
৯। য্যানিমিষ্টিক ..	৬১,৮৭৩	+	৩৯,৮৯০	=	১,০১,৭৬৩
১০। অন্যান্য জাতি..	২৪,৯২৪	+	১১,৯১৬	=	৪২,৮৪০

এই বিশাল ভারত-সাম্রাজ্যে যে ভাবে এত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গণনা-প্রণালী পরিচালিত

হয়, তাহা কম কৃতিত্বের নিদর্শন নহে। সমগ্র ভারতবর্ষ চৌদ্দটী প্রদেশ বা বিভাগে এবং সতেরটী ষ্টেটে বা দেশীয় নৃপতিগণের শাসিত রাজ্যে বিভক্ত হয়। ভারতবর্ষের সেই চৌদ্দটী বিভাগ—আসাম, বেলুচিস্থান, বঙ্গদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কুর্গ, মধ্যপ্রদেশ (সেণ্ট্রাল প্রভিন্স), আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, বিহার ও উড়িষ্যা, ব্রহ্মদেশ, পঞ্জাব, যুক্তরাজ্য (ইউনাইটেড প্রভিন্স), উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, আজমীড় মাড়োয়ার। দেশীয় নৃপতিদিগের রাজ্য-সমূহ ইহার অন্তর্ভুক্ত হয় না। ইংরেজ-শাসিত এই চৌদ্দটী বিভাগে ২১৫৩টী সহর ও ৭২০,৩৪২টী গ্রাম নির্দ্দিষ্ট হয়। যাহা হউক, এই চৌদ্দটী বিভাগের এক একটী সাধারণতঃ ভিন্ন ভিন্ন 'ব্লক' বা চকে বিভক্ত হইয়া থাকে। ত্রিশটী হইতে পঞ্চাশটী পর্য্যন্ত পরিবার এক একটী চকের অন্তর্ভুক্ত হয়। এক এক জন 'ইনিউমারেটর' বা গণনাকারীর উপর এক এক চকের লোক-গণনার ভার ন্যস্ত থাকে। চকের পরই 'সার্কেল' বা চক্র। দশটী হইতে পনেরটী চকে বা ব্লকে সংগঠিত এক একটী 'সার্কেলের' পরিদর্শনের ভার 'সুপারভাইজার' বা পরিদর্শকের প্রতি ন্যস্ত থাকে। প্রায় পাঁচ শত পরিবার এইরূপ এক একটী 'সার্কেলের' অন্তর্ভুক্ত হয়। গণনকারীর কার্য্যাবলীর জন্য পরিদর্শকগণ দায়ী থাকেন। নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক সার্কেল বা চক্র লইয়া, দেশ-প্রচলিত শাসন-প্রথানুযায়ী, এক একটী তহশীল বা তালুক প্রভৃতি সংগঠিত হয়। 'সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট' নামধেয় কর্ম্মচারী এক একটী তহশীলের বা তালুকের কার্য্য-পরিদর্শক। সর্ব্বোপরি যে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন—তিনি কমিশনার। এক এক বিভাগের বা প্রদেশের জন্য এইরূপ এক এক জন কমিশনার নিযুক্ত হইয়া থাকেন। ভারতবর্ষে অধুনা লোক-গণনায় যেরূপ বিরাট আয়োজনের আবশ্যক হয়, ইউরোপে সেরূপ আয়োজনের প্রয়োজন হয় না। ভারতীয় প্রথা হইতে ইউরোপীয় প্রথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সেখানে প্রত্যেক পরিবারের প্রধান ব্যক্তি কর্ত্তৃপক্ষগণের জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিয়া পাঠাইয়া থাকেন।

জনসংখ্যা নির্দ্ধারণের আবশ্যকতা।

দ্বিসহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে এইরূপ লোক-গণনা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, প্রাচীন গ্রন্থ-পত্রের আলোচনায় তাহা প্রতিপন্ন হইতে পারে। মাসিডনাধিপতি মহাবীর আলেক-জাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার সেনাপতি সেলিউকাস নিকাটর ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হন। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় মেগাস্থিনীসকে দূতরূপে রাখিয়া যান। চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীতে অবস্থানকালে মেগাস্থিনীস ভারতের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। মেগাস্থিনীসের গ্রন্থ-পত্রে প্রকাশ,—সে সময়ে ভারতবর্ষে লোকগণনা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন রাজকর্ম্মচারী নিয়োগে অধুনা যেমন জন্ম-মৃত্যুর সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা হয়, প্রাচীনকালে, খৃষ্ট-জন্মের তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে, সে প্রথা প্রচলিত ছিল। * চাণক্য-প্রণীত অর্থ-শাস্ত্রের আলোচনায়

* "The *third body* of superintendents consists of those who inquire when and how births and deaths occur, with the view not only of levying a tax but also in order that births and deaths among both high and low may not escape the cognizance of Government—Vide, Megasthenes, *Fragments.*

মেগাস্থিনীসের উক্তির সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। রাজ্য-মধ্যে কোথায় কোন্ জনপদ আছে, কোন্ জনপদে কি প্রকৃতির কত লোক বসতি করে, কোন্ প্রদেশের ঐশ্বর্য্য-সম্পৎ কিরূপ,—শাসন-শৃঙ্খলার সৌকর্য্য-সাধনে এ সকল বিষয় অবশ্য জ্ঞাতব্য। চাণক্যের ন্যায় অসাধারণ শক্তিশালী সর্ব্বশাস্ত্রবিদের দৃষ্টিতে এরূপ আবশ্যকীয় বিষয় উপেক্ষিত হইতে পারে না। তাই তিনি তাঁহার অর্থ-শাস্ত্রে লোক-গণনার বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অধুনা-প্রচলিত পদ্ধতির সহিত সম্পূর্ণ সাদৃশ্য না থাকিলেও, উহা যে সভ্য-সমুন্নত রাজ্যের আদর্শ-প্রণালী, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

আধুনিক লোক-গণনা নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কর্ম্মচারী নিয়োগে সমাহিত হইয়া থাকে। কিন্তু অর্থশাস্ত্র-বর্ণিত প্রাচীনকালে লোক-সংখ্যা-নিরূপণ জন্য একটী স্বতন্ত্র স্থায়ী রাজকীয় বিভাগ নির্দ্দিষ্ট ছিল। কেবল জনসংখ্যা-নিরূপণের সঙ্গে সঙ্গে রাজস্ব-সংগ্রহ, হিসাব-পরিদর্শন, ভূমি-পরিমাণ-নির্দ্ধারণ প্রভৃতি কার্য্যের ভারও ঐ বিভাগের কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত থাকিত। বিভাগীয় প্রধান কর্ম্মচারী 'সমাহর্ত্তা' অভিধায়ে অভিহিত হইতেন। আধুনিক 'কলেক্টর-জেনারেল' উপাধির সহিত ঐ উপাধি সাদৃশ্য-সম্পন্ন। তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যবলীর মধ্যেও বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। রাজ্যের এক নির্দ্দিষ্ট অংশ বা বিভাগ তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন ছিল। সমাহর্ত্তার অধীনস্থ প্রদেশ চারি ভাগে বিভক্ত হইত; এক এক ভাগের জন্য এক এক জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতেন। এই সকল বিভাগের উপর যিনি কর্ত্তৃত্ব করিতেন, সেই কর্ম্মচারী 'স্থানিক' সংজ্ঞায় অভিহিত ছিলেন। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কতকগুলি গ্রামের সমাবেশে 'স্থানিক'-গণের তত্ত্বাবধানে এক একটী জেলা সংগঠিত হইত। এক এক জন স্থানিকের অধীনে আবার 'গোপ' নামধেয় কর্ম্মচারী ছিলেন। এক একটি জেলাকে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে বিভক্ত করিয়া, এক এক জন গোপকে দশটি বা পনেরটি নির্দ্দিষ্ট গ্রামের তত্ত্বাবধান-ভার প্রদান করা হইত। গোপদিগের কার্য্যাবলী স্থানিকগণ পরিদর্শন করিতেন; আবার স্থানিকগণের কার্য্য-পরিদর্শনের ভার সমাহর্ত্তৃগণের উপর ন্যস্ত ছিল।* এ সম্বন্ধে অর্থ-শাস্ত্রের উক্তি; যথা,—

প্রাচীন গণনা-পদ্ধতি।

"সমাহর্ত্তা চতুর্ধা জনপদং বিভজ্য জ্যেষ্ঠ-মধ্যম-কনিষ্ঠবিভাগেন গ্রামাগ্রং পরিহারক-মায়ুধীয়ং ধান্যপশুহিরণ্যকুপ্যবিষ্টিকরপ্রতিকরমিদমেতাবদিতি নিবন্ধয়েৎ। তৎ-প্রদিষ্টঃ পঞ্চগ্রামীং দশগ্রামীং বা গোপশ্চিন্তয়েৎ। এবং চ জনপদচতুর্ভাগং স্থানিকঃ শ্চিন্তয়েৎ। গোপস্থানিকস্থানেষু প্রদেষ্টারঃ কার্য্যকরণং বলিপ্রগ্রহং চ কুর্য্যুঃ।"

এতাধিক ব্যবস্থাবন্দোবস্ত সত্ত্বেও সকল কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয় কিনা, তাহা দেখিবার জন্য 'ইনস্পেক্টর' বা 'প্রদেষ্টা' নিযুক্ত ছিলেন। স্থানিক ও গোপগণের কার্য্য পরিদর্শনই এই সকল কর্ম্মচারী নিয়োগের উদ্দেশ্য। কিন্তু এ ব্যবস্থাও যথেষ্ট বলিয়া মনে হইত না। 'প্রদেষ্টা'-গণ ব্যতীত অপর এক শ্রেণীর কর্ম্মচারীর উল্লেখ অর্থশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

---

* এই অংশে বর্ণিত 'সমাহর্ত্তা' সংজ্ঞক কর্ম্মচারীকে আমরা 'ডিভিশনাল কমিশনার' এর সহিত তুলনা করিতে পারি। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেরের সহিত 'স্থানিকের' এবং সবডিভিশনাল অফিসারের সহিত 'গোপ' সংজ্ঞক কর্ম্মচারীর তুলনা করা যায়।

তাঁহারা 'গুপ্তচর' আখ্যায় অভিহিত হইতেন। তাঁহারা রাজ্যমধ্যে বিভিন্ন বেশে বিচরণ করিয়া সমাহর্ত্তা সমীপে গোপনে সংবাদ সরবরাহ করিতেন। * এইরূপে বিভিন্ন দায়িত্ব-পূর্ণ রাজকর্ম্মচারীর নিয়োগে বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংবাদ-সংগ্রহের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত ছিল। গুপ্তচরগণের কার্য্যের বিষয়ে অর্থ-শাস্ত্রে এইরূপ উল্লিখিত আছে; যথা,—

"সমাহর্ত্তৃপ্রদিষ্টাশ্চ গৃহপতিকব্যঞ্জনা যেষু গ্রামেষু প্রণিহিতাস্তেষাং গ্রামাণাং ক্ষেত্র-গৃহকুলাগ্রং বিদ্যুঃ। মানসঞ্জাতাভ্যাং ক্ষেত্রাণি, ভোগপরিহারাভ্যাং গৃহাণি, বর্ণকর্ম্মাভ্যাং কুলাণি চ। তেষাং জঙ্ঘাগ্রং আয়ব্যয়ৌ চ বিদ্যুঃ।...প্রস্থিতাগতানাং চ প্রবাসাবাস-কারণমনর্থ্যানাং চ স্ত্রীপুরুষাণাং চারপ্রচারং চ বিদ্যুঃ। এবং সমাহর্ত্তৃপ্রদিষ্টাস্তাপ-সব্যঞ্জনাং কর্ষকগোরক্ষকবৈদেহকাণামধ্যক্ষাণাং চ শৌচাশৌচং বিদ্যুঃ।...পুরাণ-চৌরব্যঞ্জনাশ্চান্তেবাসিনশ্চৈত্যচতুষ্পথশূন্যপদোদপাননদীনিপানতীর্থায়তনাশ্রমারণ্যশৈল-বনগহনেষুস্তেনামিত্রপ্রবীরপুরুষাণাং চ প্রবেশনস্থানগমনপ্রয়োজনান্যুপলভেরণ্।"

অর্থাৎ,—জমীজমার জরীপ এবং রাজস্ব আদায় ভিন্ন গুপ্তচরগণের আরও কতকগুলি কার্য্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। কোন্ গ্রামে কত লোক বাস করে, প্রতি গ্রামে কতগুলি গৃহস্থের অবস্থিতি এবং কত পরিবারের বাস, প্রতি গৃহস্থের জাতি ও পেশা, কোন্ পরিবার রাজস্ব প্রদান করিয়া থাকে এবং কোন্ পরিবার রাজস্ব প্রদান করে না, প্রভৃতি নির্দ্ধারণ গুপ্তচরগণের কার্য্য-মধ্যে গণ্য। এতদ্ব্যতীত প্রতি গৃহস্থের আয়-ব্যয়-নিরূপণ এবং তাহার গো-মেষাদির সংখ্যা-নির্দ্দেশ প্রভৃতিও ইঁহাদের কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। এতদ্ব্যতীত, গুপ্তচরগণকে আরও কতকগুলি গোপনীয় কার্য্য সম্পাদন করিতে হইত। বৈদেশিকগণের আগমনের ও নির্গমনের কারণ অনুসন্ধান, লোক জনের গতায়াত পর্য্যবেক্ষণ, কুচরিত্র বা সন্দেহ-যুক্ত স্ত্রী-পুরুষের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি কার্য্য গুপ্তচরগণকে গৃহস্থের বেশ ধারণ করিয়া (গৃহপতিকব্যঞ্জনাঃ) সম্পন্ন করিতে হইত। সাধু-সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া তাঁহারা কৃষকের, মেষপালকের, সওদাগরগণের এবং রাজকীয় পরিদর্শকগণের সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। চোরের বেশ ধারণ করিয়া গুপ্তচরগণ তাঁহাদের অনুচরবর্গসহ তীর্থস্থান-সমূহে, স্নানালয়ে, জনশূন্য স্থানে, পর্ব্বতে এবং পুরাতন ভগ্ন স্থানসমূহে চোর, শত্রু এবং অসচ্চরিত্র ব্যক্তির চাল-চলন পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত থাকিতেন। * গোপগণের কর্ত্তব্য বিষয়ে অর্থশাস্ত্রে নিম্নরূপ বিবরণ পরিদৃষ্ট হয়। কৌটিল্য প্রণীত অর্থশাস্ত্রের দ্বিতীয় কল্পে লিখিত আছে,—

"তেষু চৈতাবচ্চাতুর্ব্বর্ণ্যমেতাবন্তঃ কর্ষকগোরক্ষকবৈদেহকারুকর্ম্মকরদাসাশ্চৈতাবচ্চ দ্বিপদচতুষ্পদমিদং চৈষ হিরণ্যবিষ্টিশুল্কদণ্ডসমুত্তিষ্ঠতীতি। গৃহাণাং চ করদাকরদসং-খ্যানেন।"..."কুলানাং চ স্ত্রীপুরুষাণাং বালবৃদ্ধকর্ম্মচরিত্রাজীবব্যয়পরিমাণং বিদ্যাৎ।"

অর্থাৎ,—গ্রাম্য কর্ম্মচারী গোপগণ প্রত্যেক গ্রামের লোক-সংখ্যা গণনা করিয়া, তন্মধ্য হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতির লোক-সংখ্যা নিরূপণ করিবেন। প্রতি গ্রামে কত ব্রাহ্মণ, কত ক্ষত্রিয়, কত বৈশ্য ও কত শূদ্র বাস করেন, তাহা নির্দ্ধারণ

* অর্থশাস্ত্র-বর্ণিত এই গুপ্তচরগণের কার্য্য এক হিসাবে অধুনা-প্রবর্ত্তিত 'সি-আই-ডি' বিভাগের কর্ম্মচারী-দিগের কার্য্যাবলীর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

করিয়া প্রত্যেক গ্রামের কৃষিজীবী, গোপালক, বৈদেহক (ব্যবসায়ী), কারুকর্ম্মকর (শিল্পী), দাস (ক্রীতদাস) প্রভৃতির সংখ্যা-পরিমাণ তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিবেন। প্রত্যেক গ্রামের দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জন্তুর সংখ্যা নিরূপণ, প্রতি গ্রামের হিরণ্য (স্বর্ণ), বিষ্টি (বেগার), শুল্ক ও দণ্ড প্রভৃতির পরিমাণ নির্দ্ধারণ প্রভৃতিও গোপগণের কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য। এতদ্ব্যতীত, গ্রামের কোন্ পরিবার রাজসরকারে করপ্রদান করিয়া থাকেন এবং কোন্ পরিবার কর প্রদান করেন না,—তন্নিরূপণও গোপগণের কার্য্য। প্রতি গ্রামের বালক বৃদ্ধ যুবা স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতির সংখ্যা নির্ণয় করিয়া তাহাদের চরিত্র, আজীব (আয়), ব্যয়, পেশা (কর্ম্ম) প্রভৃতি নির্দ্ধারণ করিবার ভারও গোপগণের উপর ন্যস্ত ছিল।

প্রাদেশিক লোক-গণনা-পদ্ধতির বিষয় উল্লেখ করিয়া, অতঃপর অর্থশাস্ত্রকার নগরসমূহের ও রাজধানীর লোক-গণনা-পদ্ধতির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। এ ব্যবস্থায় 'নাগরক' * অভিধেয় কর্ম্মচারী, প্রাদেশিক গণনায় প্রধান কর্ম্মচারী 'সমাহর্ত্তার' স্থান অধিকার করিয়া আছেন। প্রদেশাদির লোক-সংখ্যা গণনায় যেরূপ স্থানিক, গোপ প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা হইয়া থাকে; সহর ও রাজধানীর লোকগণনায়ও ঐ সকল কর্ম্মচারী নিয়োগের বিষয় অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাদেশিক গণনায় গোপগণের ন্যায়, নগরাদির লোকসংখ্যা-নিরূপণে গোপ-গণের উপর অবস্থাভেদে দশটি, পনেরটি এবং কোনও কোনও স্থলে চল্লিশটি পরিবারের পর্য্যন্ত জনসংখ্যা-নিরূপণের ভার অর্পিত হয়। প্রতি গৃহস্থের জাতি, গোত্র, পরিচয়, পেশা প্রভৃতি নির্দ্ধারণের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আয়-ব্যয়-পরিমাণ নিরূপণও গোপগণের কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত। † নাগরকগণের কার্য্য-সমূহের জটিলতা ও গুরুত্ব নিরাস করে এক বিশিষ্ট বিধান সে সময়ে প্রবর্ত্তিত ছিল। ধর্ম্মালয়ের বা আতিথিশালার অধ্যক্ষদিগের উপর "নাগরকের" কোনও কোনও কার্য্য-সম্পাদনের ভার ন্যস্ত থাকিত। তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটি এই—"ধর্ম্মাবস্থিনঃ পাষণ্ডি-পথিকানাবেদ্যবাসয়েয়ুঃ। প্রত্যয়িতাগতৌ চ নিবেদয়েৎ। অন্যথা রাত্রিদোষং ভজেৎ। ক্ষেমরাত্রিষু ত্রিপণং দদ্যাৎ।" ধর্ম্মালয়ে বা অতিথিশালায় কোনও অপরিচিত আগন্তুক ব্যক্তি উপস্থিত হইলে, অধ্যক্ষদিগকে স্থানিকের নিকট তাহাদের আগমন ও নির্গমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিতে হইত। পরিবারের প্রধান ব্যক্তির উপরও কোনও আগন্তুকের আগমনের ও প্রস্থানের সংবাদ রাজকর্ম্মচারীদিগের নিকট বিজ্ঞাপিত করিবার আদেশ ছিল। নগরের নিয়ম অনুসারে প্রতি ব্যবসায়ীকে, প্রতি শিল্পীকে এবং প্রতি চিকিৎসককে নাগরকের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে হইত। কেহ স্বাস্থ্যের নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে কি না, কেহ ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়মাদি লঙ্ঘন করিয়াছে কি না প্রভৃতি

সহরাদির লোক-গণনা-পদ্ধতি।

* নাগরকের কার্য্যাবলীর বিষয় আলোচনায় মনে একটী ধারণা বদ্ধমূল হয়। আধুনিক সহর-নগরের 'পুলিশ কমিশনার'-দিগের সহিত নাগরকের তুলনা হইতে পারে। উভয়ের কর্ত্তব্যের মধ্যেও বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না।

† অর্থ-শাস্ত্রের "নাগরকপ্রণিধি" প্রকরণে এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়; যথা,—"সমাহর্ত্তৃবন্নাগরকো নগরং চিন্তয়েৎ। দশকুলীং গোপো বিংশতিকুলীং চত্বারিংশৎকুলীং বা। স তস্যাং স্ত্রী-পুরুষাণাং জাতিগোত্র-নামকর্ম্মভিঃ জঙ্ঘাগ্রমায়ব্যয়ৌ চ বিদ্যাৎ। এবং দুর্গচতুর্ভাগং স্থানিকশ্চিন্তয়েৎ।"

সংবাদ প্রদান করিবার ভার তাঁহাদিগের উপর ন্যস্ত ছিল। কি ধর্ম্মালয়ের বা অতিথি-শালার অধ্যক্ষ, কি পরিবারের প্রধান ব্যক্তি, কি চিকিৎসক, কি ব্যবসায়ী, কি শিল্পী—যদি কেহ ঐ সকল সংবাদ-সরবরাহে শৈথিল্য প্রদর্শন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহা-দিগকে গুরুদণ্ড ভোগ করিতে হইত। নগরের ও রাজধানীর শাসন-সংরক্ষণের সুব্যবস্থার জন্য এইরূপ বিধি বিহিত ছিল।

জনসংখ্যা-নির্দ্ধারণের ভার যে সকল কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত ছিল, জরিপাদি দ্বারা ভূমি-পরিমাণ নির্দ্ধারণ তাঁহাদিগকেই করিতে হইত। কোন্ গ্রামে কি পরিমাণ জমি আছে, জরিপ দ্বারা তাহা নিরূপণ করিয়া কর্ম্মচারিগণ প্রতি গ্রামের সীমানা নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন। উত্তম-মধ্যম-অধম অনুসারে তাঁহারা প্রতি গ্রামের জমি সকল চিহ্নিত করিতেন। কোন্ জমী কোন্ ফসলের উপযোগী, কোন্ জমী উর্ব্বর ও কোন্ জমী অনুর্ব্বর, কোন্ জমী উচ্চ, কোন্ জমী নিম্ন, জলকর, বনকর প্রভৃতি নির্দ্ধারণ করা তাঁহাদেরই কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য ছিল। উদ্যান, বনভূমি, ধর্ম্মমন্দির, তীর্থস্থান, অতিথিশালা, অনাথ আশ্রম, সমাধিস্থল, চারণভূমি, রাজ-পথ প্রভৃতির সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া তৎসংক্রান্ত হিসাব-সংরক্ষণ প্রভৃতিও ঐ সকল কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হইত। যাঁহারা পরিদর্শক (ইনস্পেক্টর) ও গুপ্তচর এবং ওভারসিয়ার অভিধায়ে অভিহিত হইতেন, তাঁহারা এই বিভাগের জমিজমা, গৃহ ও পরিবার সংক্রান্ত হিসাব-পত্র পর্য্যালোচনা করিতেন মাত্র। এ বিষয়ে অর্থশাস্ত্রের উক্তি,—

জরিপাদির বিষয়।

"সোমাবরোধেন গ্রামাগ্রং কৃষ্টাকৃষ্টস্থলকেদারারামষণ্ডবাটবনবাস্ত-চৈত্যদেবগৃহ-সেতুবন্ধশ্মশানসত্রপ্রপাপুণ্যস্থানবিবীতপথিসংখ্যানেন ক্ষেত্রাগ্রং। তেন সীম্নাং ক্ষেত্রাণাং চ মর্য্যাদরণ্যপথিপ্রমাণ সম্প্রদান বিক্রয়ানুগ্রহপরিহারনিবন্ধান্ কারয়েৎ।"

প্রাচীন ভারতে, খৃষ্ট-জন্মের প্রায় তিন শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে এইরূপে গণনা-ক্রিয়া সমাহিত হইত। রাজ্যের সকল সংবাদ পরিজ্ঞাত হওয়া রাজপুরুষদিগের রাজ্য-শাসন-বিজ্ঞানে অশেষ উপকারী। অর্থ-বিজ্ঞানের দিক দিয়া দেখিলেও উহার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। অধুনা যেমন সন্দেহ-যুক্ত ব্যক্তির গতিবিধির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবার ব্যবস্থা আছে, আর তাহা যেমন রাজ্যরক্ষার পক্ষে এক বিশিষ্ট নীতি বলিয়া উক্ত হয়; প্রাচীন-কালের ঐরূপ ব্যবস্থাও রাজ্যরক্ষার-পক্ষে অল্প সহায় ছিল না। রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্তের বিস্তৃত বিশাল রাজ্যের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, তৎকালে এইরূপ বিধি প্রবর্ত্তনার বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। তখন চারিদিকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের সমাবেশ ছিল; বৈদেশিক গুপ্তচরের গমনাগমনের সম্ভাবনাও অল্প ছিল না। তাই বহিঃশত্রুর আক্রমণ নিবারণকল্পে পূর্ব্বোক্ত বিবিধ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনা একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। উত্তম-মধ্যম-অধম অনুসারে গ্রাম-সমূহের বিভাগে এক দিকে যেমন সৈন্য-সংগ্রহের পথ প্রশস্ত হইয়াছিল; অধিবাসিবৃন্দের আয়-ব্যয়-নির্দ্ধারণে অন্যদিকে কর-বৃদ্ধির ও কর-সংগ্রহের উপায় তেমনি সুগম হইয়া আসিয়াছিল। ফলতঃ, এই সকল বিধি-ব্যবস্থা যে আদর্শ-রাজ্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রাচীনকালে ও আধুনিককালে ভারতবর্ষে যেরূপভাবে লোক-গণনা কার্য্য নির্ব্বাহ হইত, পূর্ব্বোক্ত পৃষ্ঠাসমূহে তাহার কথঞ্চিৎ আভাষ প্রদত্ত হইয়াছে। পৃথিবীর অপরাপর দেশে ঐ প্রথা কিরূপভাবে প্রচলিত ছিল বা আছে, এক্ষণে তাহার আলোচনা করিতেছি। বাইবেলের অন্তর্গত 'ওল্ড টেষ্টামেণ্টের' 'এক্সোডাস' অংশে লোক-গণনার একটু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেখানে সৈন্ত-সংখ্যা-নিরূপণ-কল্পে লোক-সংখ্যা-নির্দ্ধারণে ইজরেল জাতির বিবিধ প্রয়াসের বিষয় উল্লিখিত আছে। তাঁহাদের প্রতি সম্প্রদায়ের লোক-সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্ম 'ইনিউমারেটার' বা গণনাকারী নিযুক্ত হইয়াছিল; আর কেবলমাত্র বিশ বৎসর হইতে তদূর্দ্ধ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ব্যক্তি গণনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন। তবে তাঁহাদের মধ্যে 'লিভাইট' সম্প্রদায় স্বতন্ত্ররূপে গণনার আমলে আসিয়াছিলেন। লিভাইটগণের মধ্যে যাঁহারা ত্রিশ বৎসরের কম বয়স্ক ছিলেন, তাঁহাদিগকে গণনার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। ইহার পর রাজা সলোমন জনসংখ্যা-নির্দ্ধারণের প্রয়াস পান। ধর্ম্মাধিকরণের পুরোহিত নিয়োগ উপলক্ষে তাঁহার এই ব্যবস্থার পরিচয় পাই। অতঃপর জোয়াব একবার জনসংখ্যা-নিরূপণের চেষ্টা করেন। এ বিষয়ে তাঁহার ততটা মত ছিল না। কিন্তু ডেভিডের আদেশে তাঁহাকে লোক-গণনায় প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। তখনও ইজরেল জাতির সৈনিক পুরুষগণ মাত্র গণনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন। ইজরেল জাতি যে সময়ে বন্দী অবস্থায় বাবিলনে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সে সময়েও তাঁহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা হয়। বন্ধনমুক্ত হইয়া, জেরুজিলামে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তাঁহারা ঐ তালিকা প্রকাশ করেন। পারস্ত-দেশে লোক-গণনা প্রথার প্রবর্ত্তনার বিবিধ পরিচয় প্রাপ্ত হই। বিভিন্ন বিভাগের ঐশ্বর্য্যসম্পৎ নির্দ্ধারণে করবৃদ্ধি করা—উহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। চীনদেশে প্রাচীনকালে এ পদ্ধতি প্রবর্ত্তনার পরিচয় পাওয়া যায়। পারস্তদেশে যেরূপ করবৃদ্ধির জন্ম ঐশ্বর্য্য-সম্পদের হিসাব লওয়া হইত; চীনদেশেও সেইরূপ তাৎকালিক সৈন্তশক্তি নির্দ্ধারণ-কল্পে এবং প্রাদেশিক কর-সংগ্রহের জন্ম ঐ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। মিশর-রাজ আমাসিসের রাজত্বকালে প্রতি ব্যক্তির পেশা প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিবার নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়। অসদুপায়ে জীবিকানির্ব্বাহের পথ রুদ্ধ করাই—উহার উদ্দেশ্য। গ্রীক-ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের গ্রন্থপত্রে প্রকাশ,—প্রসিদ্ধ রাজনীতিক সোলন কর্ত্তৃক এথেন্সে প্রথম গণনা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তবে রোমই যে এই গণনা-প্রথা দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। রোমে 'সেন্সর' অভিধায়ে এক শ্রেণীর রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। প্রথমতঃ দেশের জনসংখ্যা নির্দ্ধারণ করা তাঁহাদের প্রধান কার্য্য ছিল। দেশের লোক-সংখ্যা গণনা করিয়া তাঁহারা প্রথমে তাহাদের ঐশ্বর্য্য-সম্পদের তালিকা প্রস্তুত করিতেন। রাজস্ব সংগ্রহ করা এবং দেশবাসীর চরিত্রোন্নতির ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের ভার তাঁহাদেরই উপর ন্যস্ত ছিল। 'ভিলা পাবলিকা' নামক অট্টালিকার 'ক্যাম্পাস মার্টিয়াস' অংশে 'সেন্সর'-দিগের কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 'সেন্সাস' গ্রহণ বা লোক-সংখ্যা নিরূপণ জন্ম তাঁহাদিগের নাম 'সেন্সর' হয়। সার্ভিয়াস টুলিয়াসের রাজত্বকালে

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গণনা-পদ্ধতি।

রোম-সাম্রাজ্যের প্রথম 'সেন্সাস' গ্রহণ করা হয়। তাঁহার রাজত্বে অতঃপর প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর ঐরূপ লোক-গণনার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তখন, লোকগণনার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি পরিবারের বিষয়-সম্পত্তির, গো-মেষাদির এবং ক্রীতদাস প্রভৃতির হিসাব লওয়ার ব্যবস্থা ছিল। প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে গ্রেট-বৃটেনে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। গ্রেট-বৃটেনে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম লোক-সংখ্যা-নিরূপণের চেষ্টা হইয়াছিল। সেই সময় হইতে আজি পর্য্যন্ত প্রতি দশ বৎসর অন্তর গ্রেট-বৃটেনের লোক-সংখ্যা গণনা করা হইয়া থাকে। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে আয়র্লণ্ডের অধিবাসীর সংখ্যা-নিরূপণের প্রয়াস দেখি। কিন্তু তখন সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় আয়র্লণ্ডের লোক-গণনার আয়োজন হয়। সে সময়ও প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারা যায় না। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে পুনঃপুনঃ চেষ্টা চলিতে থাকে। তিন চারি বার ব্যর্থ-উদ্যমের পর আয়র্লণ্ডের কৃষিসম্পদের একটী নির্দ্দিষ্ট তালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল। যাহা হউক, ইহার পর ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে 'রেজেষ্টারী' প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। প্রতি গৃহস্থকে 'সেন্সাস' কার্য্যালয়ে যাইয়া ঐ সংক্রান্ত সমস্ত সংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া আসিতে হইত। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে স্কটলণ্ডে ঐ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ১৮৬১ ও ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের পর হইতেই নিয়ম হয়,—'সেন্সাস' কর্ম্মচারিগণ প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতে তাঁহাদের জ্ঞাতব্য-বিষয়-সম্বলিত মুদ্রিত তালিকা রাখিয়া যাইবেন। পরিবারের প্রধান ব্যক্তি ঐ তালিকা পূর্ণ করিয়া 'সেন্সাস' কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। এই পদ্ধতি আজি পর্য্যন্ত গ্রেট-বৃটেনে প্রবর্ত্তিত আছে। ১৮০১ খৃষ্টাব্দের পর ইংলণ্ডে কোন্ কোন্ তারিখে লোক-গণনা হইয়াছিল, তাহার একটু আভাষ পাওয়া যায়। তাহাতে জানিতে পারি, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে, ২রা এপ্রিল রবিবার রাত্রিতে লোকগণনা কার্য্য সমাহিত হইয়াছিল। শনিবার প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতে একটি করিয়া তালিকা রাখিয়া আসার ব্যবস্থা হয়। ঐ তালিকা পূর্ণ করিয়া গৃহস্থের প্রধান ব্যক্তি উহা সোমবার ফিরাইয়া দেন। তালিকায় নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সন্নিবিষ্ট ছিল;—পরিবারের প্রত্যেকের নাম, স্ত্রী বা পুরুষ, প্রত্যেকের বয়স, পদবী, পেশা বা ব্যবসায়, অবস্থাদির পরিচয়, গৃহের প্রধান ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ, ঐ দিন রাত্রিতে যাহারা সেই গৃহে রাত্রিযাপন করিয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকের জন্মস্থান প্রভৃতি। পরিবারস্থ কোনও ব্যক্তি অন্ধ, কালা, বোবা, উন্মাদ বা নপুংসক আছে কি না; ৬ বৎসর হইতে ১৩ বৎসর বয়সের বালক-বালিকাগণ স্কুলে বা গৃহশিক্ষকের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করে কিনা প্রভৃতি বিষয়ের তথ্য সংগ্রহের বিষয়ও তালিকার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছিল। আজি কালি সকল সুসভ্য জাতিই জনসংখ্যা-নির্দ্ধারণের পক্ষপাতী। তাই এ বিষয়ে সকলেরই প্রয়াস দেখিতে পাই। ফরাসী-রাজ্য ফ্রান্সে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর লোক-গণনা হয়। বেলজিয়মে ও অষ্ট্রিয়ায় প্রতি তিন বৎসর অন্তর এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যে প্রতি দশ বৎসর অন্তর লোক-সংখ্যা নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা আছে। এইরূপ প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক জনপদে লোক-সংখ্যা নির্দ্ধারণের প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় অধুনা পৃথিবীর জনসংখ্যার একটা পরিচয় পাওয়া যায়। বিগত কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদের যে লোকসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়,

সমগ্র পৃথিবীতে প্রায় ১৬২ কোটী ৩০ লক্ষ লোক বাস করে। সে বিবরণ এই,—

১।	ইউরোপ	...	...	৪০০,০০০,০০০
২।	এসিয়া	...	...	৯০০,০০০,০০০
৩।	আফ্রিকা	...	...	১৭০,০০০,০০০
৪।	উত্তর আমেরিকা	...	...	১১০,০০০,০০০
৫।	দক্ষিণ আমেরিকা	...	...	৩৫,০০০,০০০
৬।	ওশেনিয়া	...	...	৮,০০০,০০০

পৃথিবীর প্রায় সকল মহাদেশেই ইংরেজ-রাজ্যের প্রভাব বিস্তৃত। সমগ্র ইংরেজাধিকৃত রাজ্য-সমূহে ৪৩৫,০০০,০০০ লোক বাস করে। ইংরেজাধিকৃত রাজ্য-সমূহের এবং ইংরেজের সহিত সন্ধিবদ্ধ কোনও কোনও মহাদেশের লোক-সংখ্যা নিম্নরূপ নির্দ্দিষ্ট হয়; যথা,—

১।	গ্রেটবৃটেন যুক্তরাজ্য	...	...	৪৫,৪০৭,০৩৭
২।	ভারতবর্ষ	...	...	৩১৫,০০০,০০০
৩।	চীনদেশ	...	...	৪০০,০০০,০০০
৪।	রুশিয়া	...	...	১৭৩,৫০০,০০০
৫।	জাপান	...	...	৫০,০০০,০০০
৬।	আমেরিকার যুক্তরাজ্য	...	...	৯২,০০০,০০০
৭।	যুক্ত-রাজ্যের অতিরিক্ত লোকসংখ্যা		...	১০,০০০,০০০
৮।	ইংরেজের অধীনস্থ রাজ্যসমূহ	...	...	১৫,০০০,০০০

২। ব্যবহার-বিধানে আদর্শ।

[ব্যবহার-বিধানে ধর্ম্মই মূল,—শাস্ত্রোক্ত বিধান-পরম্পরা; শাস্ত্র-গ্রন্থে ব্যবহারের পরিচয়,—অর্থশাস্ত্রে ব্যবহার বিধি;—ব্যবহার প্রকার,—বিবাদ-বিভাগ,—অষ্টাদশ বিবাদ;—বিচারালয় সংগঠন;—দ্বিবিধ বিচারালয়—ধর্ম্মস্থীয় ও কণ্টকশোধন,—দ্বিবিধ বিচারালয়ে বিচার্য্য বিভিন্ন বিবাদ;—পঞ্চায়তি প্রথা;—ব্যবহার-প্রণালী;—ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত প্রণালীর সহিত সাদৃশ্য;—বিচার-বিষয়ে অবলম্বনীয় প্রণালী;—বাদী, প্রতিবাদী, পরোক্ত দোষ প্রভৃতি;—পঞ্চবন্ধ প্রভৃতি জরিমানার বিষয়;—সাক্ষী প্রভৃতির ব্যবস্থা;—চুক্তিবিষয়ক ব্যবস্থা;—সম্ভূয়-সমুত্থান-প্রকরণে অবলম্বনীয় বিধি;—নক্তকৃত প্রভৃতি চুক্তির পর্য্যায়;—ঋণদান, বিক্রয়, নিক্ষেপ, উপনিধি প্রভৃতি চুক্তির পর্য্যায়;—নিলাম ও ক্রয়াধিকার বিষয়ক ব্যবস্থা,—ঋণ-সংক্রান্ত বিধান;—গচ্ছিত সম্পর্কীয় ব্যবহার;—আধি, আদেশ, বিক্রয়, দান, দায় প্রভৃতি সংক্রান্ত ব্যবহার-প্রণালী;—যৌথ ব্যবহার বিষয়;—বিবিধ বিবাদ প্রতিকার;—শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে ব্যবহার প্রণালীর উল্লেখে তাহার বিশেষ পরিচয়।]

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—"শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ। সম্যক্ সঙ্কল্পজঃ কামো ধর্ম্মমূলমিদং স্মৃতম্॥" অর্থাৎ,—শ্রুতি, স্মৃতি, পূর্ব্ব-মহাজনগণের অনুষ্ঠিত আচার-পরম্পরা, আত্মপ্রীতি এবং সম্যক-সঙ্কল্প-জনিত শাস্ত্রানুমোদিত কামনা,—ইহাই ধর্ম্মের বা ব্যবহার-জ্ঞানের মূল। শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি সম্যক্‌জ্ঞানের নিদর্শন। সম্যক্ জ্ঞান—ধর্ম্মের মূল—ব্যবহারেরও মূল। সুতরাং ধর্ম্মেরও যাহা আদি, ব্যবহারেরও তাহাই আদি। ধর্ম্মের প্রমাণই ব্যবহারের

ব্যবহার-বিধানে ধর্ম্মই মূল।

প্রমাণ। আর্য্য-হিন্দুগণ চিরদিনই ধর্ম্মপ্রাণ। ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠায় চিরদিনই তাঁহারা বদ্ধ-পরিকর। ধর্ম্মের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্যই তাঁহাদের সর্ব্ব-শাস্ত্রের পরিকল্পনা। তাই অতি প্রাচীন কাল হইতে ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যেই ব্যবহার-শাস্ত্রের বীজ নিহিত দেখিতে পাই ;—তাই হিন্দুর ব্যবহার-বিধির পরিচয়-প্রদান-প্রসঙ্গে ধর্ম্ম-শাস্ত্রের আলোচনা আবশ্যক হইয়া পড়ে। শাস্ত্রকার (যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, প্রথম অধ্যায়, ৩—৫ শ্লোক) বলিয়াছেন,—

"পুরাণ-ন্যায় মীমাংসা-ধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ। বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশ ॥
মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ। যমাপস্তম্বসংবর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী ॥
পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগৌতমৌ। শাতাতপ বসিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজকাঃ ॥"

অর্থাৎ,—পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদাঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, ছন্দ, এই ষড়বেদাঙ্গ) এবং চারি বেদ—এই চৌদ্দটী পুরুষার্থ-সাধন জ্ঞান ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির কারণ। মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গোতম, শাতাতপ এবং বসিষ্ঠ,—ইঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন।' প্রাচীন ভারতের ব্যবহার-বিধির বিষয় সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, এই সকল ধর্ম্ম-শাস্ত্রের আলোড়ন আবশ্যক হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে বলিয়াছি,—ধর্ম্ম ও ব্যবহার অভিন্ন; ধর্ম্মের যাহা মূল,—ব্যবহারেরও তাহাই মূল। আমাদের, শাস্ত্রদর্শী হিন্দুগণের বিশ্বাস—পরব্রহ্ম সর্ব্ব-জ্ঞানাধার। তিনি সর্ব্altবিধ জ্ঞানের সর্ব্ববিধ ধর্ম্মের এবং সর্ব্ববিধ ব্যবহারের মূল হেতু। হিন্দু তাই—তন্মুখ-নিঃসৃত ধর্ম্মকেই সর্ব্ববিষয়ে প্রধান ও আদি বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে এবং ব্যবহার-শাস্ত্র তাঁহারই উদ্ভাবিত বলিয়া স্বীকার করে।

শাস্ত্র-গ্রন্থে পরিচয়।

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে ব্যবহার-শাস্ত্রের পরিচয় পাই। বেদাদি হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থ পর্য্যন্ত সকল শাস্ত্র-গ্রন্থেই ব্যবহার-শাস্ত্রের বিষয় কিছু-না-কিছু উল্লিখিত হইয়াছে। শাস্ত্র-গ্রন্থাদিকে হিন্দুগণ ভগবানের মুখ-নিঃসৃত বলিয়া তৎপ্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি করিয়া থাকেন। ব্যবহার-শাস্ত্র সম্বন্ধেও তাঁহাদের সেই একই ধারণা। বিশ্ব-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্ট-প্রাণিসমূহকে বিশেষ বিশেষ নিয়মে আবদ্ধ করিবার আবশ্যক হয়। তাই শাস্ত্রাদির মধ্য দিয়া নানারূপ বিধি-ব্যবস্থার পরিকল্পনা। অধর্ম্মজনিত পীড়া চিরকালই লোকে ভোগ করিয়া থাকে। পীড়িত ব্যক্তি সর্ব্বকালেই ধর্ম্মাধিকরণে অধর্ম্মকৃত ক্ষতির প্রতিকার পাইবার অধিকারী। ধর্ম্মাধিকরণ যে নিয়ম অনুসারে ক্ষতি-পূরণের ব্যবস্থা করিতেন, সেই সমুদায় নিয়মের সমষ্টি লইয়াই ব্যবহার-শাস্ত্র। অতি প্রাচীন কাল হইতে দেখিতে পাই, ব্যবহার-বিধানে রাজার বা সম্রাটের প্রাধান্য অতি অল্পই ছিল। ব্যবহার-শাস্ত্র ভগবানের উদ্ভাবিত বলিয়া স্বয়ং রাজাও তাহা মান্য করিতে বাধ্য হইতেন। এ হিসাবে প্রজা-সাধারণের অপরাধের বিচার-ব্যবস্থায় আদিকালে রাজার কোনই কর্ত্তৃত্ব ছিল না বলিয়া মনে হয়। স্বয়ম্ভুর মুখনিঃসৃত বিধিব্যবস্থায় রাজা পরিচালিত হইতেন; তাই এক হিসাবে রাজাও সে ব্যবহারের অধীন ছিলেন। হিন্দুগণ সম্রাটকে ভগবানের প্রতিরূপ বলিয়া মান্য করিয়া

থাকেন। তাই পরবর্ত্তিকালে রাজবিধি-সমূহ শাস্ত্রবর্ণিত ব্যবহার-বিধির ন্যায় ভক্তি-সহকারে মান্য হইতে থাকে। স্মরণাতীতকাল হইতে যে সকল আচার-ব্যবহার বিভিন্ন দেশে বা বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রবর্ত্তিত ছিল, পরিশেষে তাহাও ক্রমশঃ ব্যবহার-বিধির অন্তর্ভুক্ত হয়। এইরূপে প্রাচীন-কালে হিন্দুদিগের যে ব্যবহার-বিধি প্রচলিত ছিল, তাহার সহিত পরবর্ত্তি-কালে দেশ-বিশেষের, জাতি-বিশেষের বা সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যে প্রচলিত রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার প্রভৃতি মিশিয়া যায়। আর সেই হইতে পূর্ব্ব-মহাজনগণে অনুষ্ঠিত স্মরণাতীত্‌কাল-প্রচলিত রীতি-নীতি-সমূহ ব্যবহার-পদবাচ্য হয়।

অর্থ-শাস্ত্রে ব্যবহার-বিধি।

প্রাচীন-ভারতের ব্যবহার-শাস্ত্রের বিষয় আলোচনা করিলে বুঝা যায়, পূর্ণ-পরিণতির কালেও ব্যবহার-শাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে পৃথক হয় নাই। প্রাচীন রোম প্রভৃতির ইতিহাস আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, সেই সকল দেশে পরবর্ত্তিকালে ব্যবহার-শাস্ত্র ক্রমশঃ ধর্ম্ম হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছিল, এবং স্বতন্ত্র-ভাবে পরিপুষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু ব্যবহার-শাস্ত্রকে সকল কালেই ধর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন। তাই আমাদের ব্যবহার-শাস্ত্র ধর্ম্ম-শাস্ত্রের একটি অঙ্গ এবং ধর্ম্ম-শাস্ত্রের অঙ্গরূপেই উহা পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছে। আধুনিক কালের ন্যায় ব্যবহার-প্রণালীর বিস্তারিত বিধির পরিচয় অতি প্রাচীনকালের বেদাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। অতি প্রাচীন সংহিতাদিতেও তাহার বিশেষ কোনও নিদর্শন নাই। তবে যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতায় ঐরূপ বিস্তৃত ব্যবহার-প্রণালীর কিছু কিছু আভাষ পাওয়া যায়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সম্যক জ্ঞান—ধর্ম্মের বা ব্যবহারের মূল। জ্ঞান-প্রভাবে যাহা ন্যায়সঙ্গত বা ধর্ম্ম-সঙ্গত বিবেচিত, তাহাই ব্যবহার মধ্যে পরিগণিত। সংহিতা-পুরাণাদি ভিন্ন পরবর্ত্তী অপর কোনও গ্রন্থে ব্যবহার-শাস্ত্রের কোনও নিদর্শন বর্ত্তমান আছে কিনা, তদ্বিষয়ে বিশেষ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে কৌটিল্য-প্রণীত অর্থশাস্ত্রে ব্যবহার-বিধির বিস্তৃত পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে, দেখিতে পাই। অনেকে বলেন,—'কৌটিল্য আপনার অর্থশাস্ত্রে কতকগুলি লৌকিক ব্যবহারের উল্লেখ করিয়াছেন। সে সমুদায় ধর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।' কিন্তু নিরপেক্ষ-ভাবে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র আলোচনা করিলে তাঁহাদের ঐ যুক্তি আদৌ ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন হয়। ন্যায়ান্যায় নিরূপণ করিয়া সহজ-বুদ্ধিতে বিচার করিতে হইলে যেরূপ পদ্ধতি অবলম্বন আবশ্যক, প্রাচীন ঋষিগণ তাহাই উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সহজবুদ্ধিবিরুদ্ধ কোনও পদ্ধতি প্রচলন করিবার প্রয়াস পান নাই। ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র পর্য্যন্ত শাস্ত্রগ্রন্থ-সমূহের আলোচনায় আমরা তাহাই বুঝিতে পারি। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হইতে আরও প্রতিপন্ন হয়,—ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যতীত স্বতন্ত্র একটি রাজ-নীতিশাস্ত্র ছিল। লৌকিক ব্যবহার প্রভৃতি তাহার অন্তর্ভুক্ত হইত। কিন্তু সেগুলিও ধর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। অতি প্রাচীন-কালের বেদাদি শাস্ত্রবর্ণিত ব্যবহার-বিধির বিষয় ছাড়িয়া দিয়া, অর্থশাস্ত্র-বর্ণিত খৃষ্টজন্মের তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বের ব্যবহার-শাস্ত্রের ইতিহাস আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, তৎকালে যে ব্যবহার-বিধি প্রচলিত ছিল,

তাহা সভ্য-সমুন্নত সমাজের এক বিশিষ্ট আদর্শ। দ্বিসহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ব্যবহার-শাস্ত্র যে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল, অর্থশাস্ত্রের আলোচনায় তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ব্যবহার শব্দের অর্থ-নির্ণয়ে পণ্ডিতগণ নানারূপ গবেষণা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে আমরা যাহাকে 'ল' বা আইন বলি, পণ্ডিতগণের মতে, তাহা ব্যবহার পদবাচ্য নহে। শাস্ত্রকারগণ ব্যবহার শব্দের যেরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে ব্যবহার শব্দে 'মকদ্দমা' বুঝায়, উহাতে আইনের কোনও সম্পর্ক নাই। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—'আবেদয়তি চেদ্রাজ্ঞে ব্যবহারপদং হি তৎ।' অর্থাৎ,—স্মৃতি কিম্বা আচার-বিরুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে শত্রু-কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া রাজার নিকট উৎপীড়নের বিবরণ নিবেদন করিলে, তাহা ব্যবহারের বিষয় হইবে। তবেই বুঝা যাইতেছে, যাহা বিবাদ, তাহাই ব্যবহার-পদবাচ্য; বিবাদই মকদ্দমা। সকল শাস্ত্রই রাজধর্ম্ম-বর্ণন-ব্যপদেশে ব্যবহার-ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন। রাজার ধর্ম্ম-কর্ম্মের মধ্যে প্রজাগণের অভাব-অভিযোগের ন্যায়-বিচার অবশ্য কর্ত্তব্য। সেই ন্যায়-বিচারের প্রণালী-পরম্পরার উল্লেখে রাজধর্ম্মের অঙ্গরূপে ব্যবহার-বিষয় সকল শাস্ত্রেই পরিবর্ণিত হইয়াছে। আর তদুপলক্ষে শাস্ত্রকারগণ বিবাদ-প্রকরণের বিস্তৃত একটি বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। সে বিবরণ; যথা—

ব্যবহার-প্রকার।

"প্রত্যহং দেশদৃষ্টৈশ্চ শাস্ত্রদৃষ্টৈশ্চ হেতুভিঃ। অষ্টাদশসু মার্গেষু নিবদ্ধানি পৃথক পৃথক ॥
তেষামাদ্যমৃণদানং নিক্ষেপোঽস্বামিবিক্রয়ঃ। সম্ভূয় চ সমুত্থানং দত্তস্যানপকর্ম্ম চ ॥
বেতনস্যৈব চাদানং সংবিদশ্চ ব্যতিক্রমঃ। ক্রয়বিক্রয়ানুশয়ো বিবাদ স্বামিপালয়োঃ ॥
সীমাবিবাদধর্ম্মশ্চ পারুষ্যে দণ্ডবাচিকে। স্তেয়ঞ্চ সাহসঞ্চৈব স্ত্রী সংগ্রহণমেব চ ॥
স্ত্রী-পুং ধর্ম্মো বিভাগশ্চ দ্যূতমাহ্বয় এব চ। পদান্যষ্টাদশৈতানি ব্যবহারস্থিতাবিহ ॥"

তবেই বুঝা যাইতেছে,—রাজা শাস্ত্রসম্মত সাক্ষিলেখ্যাদি দ্বারা দেশ, জাতি ও কুলাচারগত হেতু অনুসারে অষ্টাদশ প্রকার বিবাদমূলক ব্যবহার-কার্য্য বিচার করিবেন। সেই অষ্টাদশ বিধ বিবাদ-বিষয়ের মধ্যে ঋণদান, নিক্ষেপ, অস্বামিবিক্রয়, সম্ভূয়সমুত্থান, দত্তাপ্রদানিক, বেতনদান, সংবিদব্যতিক্রম, ক্রয়বিক্রয়ানুশয়, স্বামিপাল-বিবাদ, সীমা-বিবাদ, বাক্‌পারুষ্য, স্তেয়, সাহস, স্ত্রী-সংগ্রহণ, স্ত্রীপুরুষ-ধর্ম্মবিভাগ, দ্যূত এবং আহ্বয়—ব্যবহার বিষয়ে এই অষ্টাদশ পাদ উক্ত হইয়াছে। দণ্ডপারুষ্য, বাক্‌পারুষ, সাহস, স্তেয় প্রভৃতির বিষয় আলোচনায় বুঝা যায়, প্রাচীনকালে দণ্ডনীয় অপরাধের অর্থাৎ ফৌজদারী প্রভৃতির সংখ্যাই অধিক ছিল। তাহার আনুষঙ্গিকরূপে অপরাপর অপরাধের উদ্ভব পরবর্ত্তিকালে হইয়াছে। ঋণ-সংক্রান্ত বিস্তৃত বিধানের উল্লেখে মনে হয়, সে সময়ে ঋণ-গ্রহণ ও ঋণ-দান বিশেষ-ভাবে প্রচলিত ছিল এবং সেই ঋণ-পরিশোধ না করিতে পারিলে ঋণগ্রহণকারী গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত হইতেন। যাহা হউক, অন্যান্য শাস্ত্রের তুলনায় অর্থশাস্ত্রে প্রাচীনকালের ব্যবহার-বিধির কি পরিচয় বিদ্যমান রহিয়াছে, তদ্বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। সে আলোচনায় দুই সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বের প্রাচীন ভারতের বিচার-পদ্ধতির কতকটা আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সুশাসন সুপালন পক্ষে ব্যবহার-বিধি বিশেষ প্রয়োজনীয়, সকলেই তাহা স্বীকার করেন। প্রজা-সাধারণের হিত-সাধন-কল্পে তাই ন্যায়-বিচারের আবশ্যকতা। নিরপরাধের দণ্ড এবং অপরাধীর মুক্তি ন্যায়-বিচারের লক্ষণ নহে। ইহা ধর্ম্ম ও ব্যবহার বিরুদ্ধ। ইহাতে ধর্ম্মের পীড়ন, অধর্ম্মের প্রশ্রয় হয়। আর তাহাতে রাজ্য উৎসন্ন যায়। একাকী বিচার করিতে গেলে ভ্রম-প্রমাদ হওয়ার সম্ভাবনা, ন্যায়-বিচারের ব্যাঘাত হওয়াও বিচিত্র নহে। তাই শাস্ত্রকারগণ সপারিষদ রাজাকে ধর্ম্মাধিকরণে উপবেশন করিবার ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। অর্থ-শাস্ত্রেও সেইরূপ বিচারালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা আছে। অর্থশাস্ত্রমতে তৎকালে দ্বিবিধ বিচালয় সংগঠিত হইত। প্রথম—'ধর্ম্মস্থীয়' দ্বিতীয়—'কণ্টকশোধন'। উভয় বিচারালয়ের গঠন-পদ্ধতি বিভিন্ন; বিচার-প্রণালীও স্বতন্ত্র। বিভিন্ন শ্রেণীর মকদ্দমা ঐ দুই বিভিন্ন বিচারালয়ে মীমাংসা হইত। ধর্ম্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞ তিন জন ব্রাহ্মণ এবং তিন জন রাজ-অমাত্য 'ধর্ম্মস্থীয়' বিচারালয়ের বিচারকের আসনে সমাসীন ছিলেন।* কিন্তু 'কণ্টকশোধন' বিচারালয়ে কেবলমাত্র তিন জন অমাত্যের অথবা তিন জন 'প্রদেষ্টার' বিচারাসনে উপবেশনের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। বিচারাদলতের গঠন-প্রণালীর বিষয় উল্লেখ করিয়া অতঃপর অর্থ-শাস্ত্রকার ঐ সকল বিচারালয়ের বিচার-ক্ষমতার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। ব্যক্তিগত বিবাদের বা ব্যবহারের মীমাংসার ভার 'ধর্ম্মস্থীয়' বিচালয়ের উপর ন্যস্ত ছিল। কিন্তু রাজা, রাজ্য বা সাধারণ সংক্রান্ত এবং হত্যাবিষয়ক বিবাদের বা ব্যবহারের মীমাংসা 'কণ্টক-শোধন' বিচারালয়ে নিষ্পন্ন হইত। প্রথমোক্ত বিচারালয়ের বিচারে সামান্য পরিমাণ অর্থদণ্ড প্রদত্ত হইলেই অপরাধী অব্যাহতি লাভ করিত; কিন্তু শেষোক্ত বিচারালয়ে অপরাধের তারতম্য অনুসারে যেমন স্বল্প দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল, তেমনি অপরাধীকে গুরুদণ্ডও ভোগ করিতে হইত। অবস্থা-বিশেষে 'কণ্টক-শোধন' বিচারালয় মৃত্যু-দণ্ডের আদেশ দিবারও অধিকারী ছিলেন। এই দ্বিবিধ বিচারা-

বিচারালয়-সংগঠন।

---

* আধুনিক দেওয়ানী বিচারালয়—এই 'ধর্ম্মস্থীয়' বিচারালয়েরই কতকটা রূপান্তর। 'কণ্টকশোধন' বিচারা-লয়ের সহিত ফৌজদারী বিচারালয়ের অনেক বিষয়ে তুলনা হইতে পারে। সংহিতাদিতে বিচারালয়-গঠন সম্বন্ধে যে প্রণালী দৃষ্ট হয়, অর্থশাস্ত্র-বর্ণিত 'ধর্ম্মস্থীয়' বিচারালয় সংগঠনের পদ্ধতি তাহার অনুরূপ। এ সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন,—

"সোঽস্য কার্য্যাণি সম্পশ্যেৎ সভ্যৈরেব ত্রিভির্বৃতঃ। সভামেব প্রবিশ্যাগ্র্যামাসীনঃ স্থিত এব বা॥
যস্মিন দেশে নিষীদন্তি বিপ্রা বেদবিদস্ত্রয়ঃ। রাজ্ঞশ্চাধিকৃতো বিদ্বান্ ব্রহ্মণস্তাং সভাং বিদুঃ॥"

অর্থাৎ,—'বিদ্বান ব্রাহ্মণ তিন জন সভ্যের সহিত ধর্ম্মাধিকরণ সভায় প্রবেশ করিয়া উপবিষ্ট বা উত্থিত ভাবে রাজ-কার্য্য সমুদায় সম্পন্ন করিবেন। যে সভায় ঋক যজু ও সামবেদ বেত্তা ঐরূপ তিন জন সভ্য ব্রাহ্মণ এবং রাজপ্রতিনিধি অধিষ্ঠান করেন, সেই সভাকে ব্রহ্মসভা কহে।' যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় এই সংখ্যার একটু আধিক্য দেখিতে পাই। যাজ্ঞবল্ক্য চারি জন বেদ-পরায়ণ ব্রাহ্মণের বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বৃহস্পতি-সংহিতায় বেদজ্ঞ ও ধর্ম্মজ্ঞ পাঁচ, সাত বা তিন জন ব্রাহ্মণের অধিষ্ঠানের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু পরাশর সকল মতের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন,—বেদজ্ঞ অগ্নিহোত্র তিন জন বা চারি জন ব্রাহ্মণ পরিষদের সভ্য হইবেন। যথা,—"চত্বারো বা ত্রয়োবাপি বেদবন্তোঽগ্নিহোত্রিণঃ। ব্রাহ্মণানাং সমর্থা যে পরিষৎ সা বিধীয়তে।" কাত্যায়ন-সংহিতায় বণিক সভ্যের বিষয় উল্লেখ আছে। ব্যবসা-বাণিজ্য-সংক্রান্ত ব্যবহারাদির বিচার-কালে অভিজ্ঞ বণিক সভ্যের প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়া বুঝা যায়।"

লয়ে যে সকল ব্যবহারের বা বিবাদের মীমাংসা হইত, নিম্নে তাহা প্রকটিত হইল; যথা,—
১। ধর্ম্মস্থীয় বিচারালয় নিম্নলিখিত বিবাদ মীমাংসার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,—(১) ব্যবহার-স্থাপনা (চুক্তির বা স্বীকার-পত্রের যাথার্থ্য-নির্ণয়); (২) সময়স্থানপাকর্ম্ম (কার্য্যের চুক্তি ভঙ্গ); (৩) সাম্যাধিকার, ভৃতকাধিকারঃ (চাকর ও মনীবের এবং মজুর ও নিয়োগ-কর্ত্তার সম্বন্ধ নির্ণয়); (৪) দাসকল্পঃ (ক্রীতদাস বিচার), (৫) ঋণাদানম্ (ঋণ আদায়) (৬) উপনিধিকম্ (গচ্ছিত ধন); (৭) বিক্রীতক্রীতানুশয় (নিলাম ও তত্রহিত সংক্রান্ত বিষয়); (৮) দত্তস্থানপাকর্ম্ম (দান-প্রত্যাহার); (৯) সাহসম্ (চৌর্য্য ও দস্যুতা); (৯) দণ্ডপারুষ্যম্ (দাঙ্গা, মারপিট প্রভৃতি); (১০) বাক্যপারুষ্যম্ (মানহানি প্রভৃতি); (১১) দ্যূতসমাহ্বয়ম (জুয়াখেলা); (১২) অস্বামিবিক্রয় (ভূস্বামী ব্যতীত অন্য কর্ত্তৃক ভূমি বিক্রয় অর্থাৎ সত্বাধিকারী ভিন্ন একজনের জমী অন্য কর্ত্তৃক বিক্রয়); (১৩) স্বস্বামিসম্বন্ধ (স্বামিত্বের সত্বাদির বিষয়), (১৪) সীমাবিবাদঃ, মর্য্যাদাস্থাপনম্ (জমীর সীমানা লইয়া বিবাদ-বিসম্বাদ প্রভৃতি); (১৫) বাস্তুকম্ (গৃহনির্ম্মাণ বিষয়ক বিবাদ); (১৬) বাস্তু-বিক্রয় (অস্থাবর ও স্থাবর সম্পর্কীয় বিবাদ); (১৭) বিবিতক্ষেত্রপথহিংসা (কৃষিকার্য্য, চারণ-ভূমি এবং রাজপথ সংক্রান্ত বিবাদ); (১৮) বাধা-বাধিকম্ (বিবিধ বিষয়ক বাধা-বিপত্তি); (১৯) বিবাহসংযুক্তম্, বিবাহধর্ম্ম, স্ত্রীধনকল্প (স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের কর্ত্তব্য বিষয়ক বিবাদ, দায় প্রভৃতি); (২০) সম্ভূয়সমুত্থান (যৌথ-কারবার সংক্রান্ত বিবাদ); (২১) দায়বিভাগঃ, দায়ক্রমঃ (উত্তরাধিকার বিষয়ক ব্যবহার); (২২) প্রকীর্ণকানি (বিভিন্ন জাতীয় ব্যবহার); (২৩) বিবাদ-পদ-নিবন্ধঃ (বিচার-প্রণালীর পদ্ধতি-সংক্রান্ত ব্যবহার) প্রভৃতি।
২। 'কণ্টকশোধন' বিচারালয়ের প্রতি নিম্নলিখিত বিবাদ-বিচারের ভা[illegible] ছিল; যথা,—(১) কারুকররক্ষণম্ (কারুকার বা শিল্পিগণের রক্ষার ব্যবস্থা-[illegible]); (২) বৈদেহরক্ষণম্ (বৈদেহ বা পণ্য-ব্যবসায়ীদিগের রক্ষা-কল্পে ব্যবহার); (৩) উপনিপাত-প্রতিকারঃ (জাতীয় বিপদ নিবারণ-কল্পে উপায়-পরম্পরা উদ্ভাবন সংক্রান্ত বিবাদ); (৪) গূঢ়াজীবিনাং রক্ষা (অসচ্চরিত্রগণের দমন); (৫) সিদ্ধব্যঞ্জনৈর্ম্মানবপ্রকাশনম্ (সন্ন্যাসীবেশী গুপ্তচরগণ কর্ত্তৃক অপরাধী ধৃতকরণ সম্পর্কীয় ব্যবহার); (৬) শঙ্করূপকর্ম্মাভিগ্রহঃ (সন্দেহ করিয়া অথবা বমাল দস্যু-তস্করাদির গ্রেপ্তার বিষয়ক বিবাদ); (৭) আশুমৃতকপরীক্ষা (পোষ্টমর্টেম বা মৃত ব্যক্তির শরীর ব্যবচ্ছেদ পরীক্ষা) (৮) বাক্যকর্ম্মানুযোগঃ (জেরা প্রভৃতি); (৯) সর্ব্বাধিকরণরক্ষণম্ (সরকারী কার্য্যালয়-সমূহে শিষ্টতা-সংরক্ষণ); (১০) একাঙ্গবধনিষ্ক্রয়ঃ (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি ছেদনের পরিবর্ত্তে অর্থদণ্ড প্রভৃতির ব্যবস্থা); (১১) শুদ্ধশ্চিত্রশ্চদণ্ডকল্পঃ (যন্ত্রণায় বা বিনা যন্ত্রণায় মৃত্যুদণ্ড); (১২) কন্যাপ্রকর্ম্ম (ব্যভিচার, অবৈধ সহবাস প্রভৃতি); (১৩) অতিচারদণ্ড (বিভিন্ন অপরাধের দণ্ড বিষয়ক বিবাদ) ইত্যাদি।
ধর্ম্মস্থীয় এবং কণ্টকশোধন বিচারালয়ে যে সকল প্রকার অপরাধেরই অভিযোগ উপস্থিত হইত, তাহা নহে। গ্রামের প্রধান ব্যক্তি এবং বয়োবৃদ্ধগণও কোনও কোনও বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিতেন। গ্রামের প্রধান ব্যক্তি—অর্থশাস্ত্রে 'গ্রামিক' সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছেন। তিনি সরাসরিভাবে কোনও কোনও অপরাধের শেষবিচার করিবার অধিকারী

ছিলেন। এমন কি, অবস্থা-বিশেষে তিনি চোর, ডাকাত ও বদমাইশদিগকে গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দিতেও পারিতেন। শাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রিগণ সমভিব্যহারে রাজা যে বিচারালয়ে সমাসীন হইতেন, সেই বিচারালয়ে সকল মকদ্দমার আপিল হইত। এইরূপে বিচারালয়াদির বিবরণ প্রদান করিয়া অর্থশাস্ত্রকার অতঃপর বিচারালয় স্থাপনের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গ্রাম-সমূহের মধ্যে প্রতি 'সংগ্রহণে', প্রতি 'দ্রোণমুখে', প্রতি 'জনপদসন্ধিতে' পূর্ব্বোক্ত বিচারালয়-সমূহ প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থা ছিল।†

বিচারালয়াদি প্রতিষ্ঠার পর বিচার-প্রণালী নির্ণয় করা প্রয়োজন। কি প্রণালীতে বিচার-কার্য্য নিষ্পন্ন হইবে, বিবাদ-মীমাংসায় কি রীতি অবলম্বন আবশ্যক, অর্থশাস্ত্রকার অতঃপর তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সে ব্যবস্থায় চারিটী মূল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার উপদেশ অর্থশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। অর্থশাস্ত্র-মতে ব্যবহার-শাস্ত্রের চারিটী পাদ; প্রথম—ধর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্র-বর্ণিত ব্যবহার-বিধি; দ্বিতীয়—'ব্যবহার' অর্থাৎ পক্ষগণের পরস্পর চুক্তি বা অঙ্গীকার; তৃতীয়—'চরিত্র' অর্থাৎ লৌকিক বা স্মরণাতীত-কাল-প্রচলিত প্রথা; এবং চতুর্থ—'রাজশাসন' অর্থাৎ রাজার প্রবর্ত্তিত বিধি-বিধান। এই পাদ-চতুষ্টয় বিষয়ে অর্থশাস্ত্রের 'বিবাদপদনিবন্ধঃ' অংশে এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়; যথা,—

ব্যবহার প্রণালী।

"ধর্ম্মশ্চ ব্যবহারশ্চ চরিত্রং রাজশাসনম্। বিবাদার্থ চতুষ্পাদঃ পশ্চিমঃ পূর্ব্ববাধকঃ॥
অত্র সত্যস্থিতো ধর্ম্মো ব্যবহারস্তু সাক্ষিষু। চরিত্রং সংগ্রহে পুংসাং রাজ্ঞামাজ্ঞা তু শাসনম্॥"

ধর্ম্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, ব্যবহার সাক্ষি-সাপেক্ষ এবং রাজশাসন রাজাজ্ঞার অনুবর্ত্তী। যাহা লোকাচার বা স্মরণাতীতকাল প্রচলিত প্রথা, তাহা জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়া থাকে। কিন্তু অবস্থা-ভেদে এই মূল বিষয়-চতুষ্টয়ের মধ্যেও সময় সময় পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয়। এইরূপ বিরোধস্থলে বিচার-বিভ্রাট হওয়া সম্ভবপর। ব্যবহার-াদ-চতুষ্টয়ের এই বিরোধ-ভঞ্জন-ব্যপদেশে তাই অর্থশাস্ত্রকার নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন,—

"অনুশাসদ্ধি ধর্ম্মেণ ব্যবহারেণ সংস্থয়া। ন্যায়েন চ চতুর্থেন চতুরস্তাং মহীং জয়েৎ॥
সংস্থয়া ধর্ম্মশাস্ত্রেণ শাস্ত্রং বা ব্যবহারিকম্। যস্মিন্নর্থে বিরুধ্যেত ধর্ম্মেণার্থং বিনিশ্চয়েৎ॥
শাস্ত্রং বিপ্রতিপদ্যেত ধর্ম্মন্যায়েন কেনচিৎ। ন্যায়স্তত্র প্রমাণং স্যাত্তত্র পাঠো হি নশ্যতি॥"

ধর্ম্ম ও ব্যবহারের বিরোধে অথবা চরিত্র ও রাজশাসনের বিতণ্ডায় পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবল হইবে;

* এই ব্যবস্থাকে পঞ্চায়তি ব্যবস্থা বলা যায়। যে সময় রাজার আদালত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তখন পঞ্চায়তি বিচারালয়েই বিচার-কার্য্য নিষ্পন্ন হইত। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এ বিষয়ে বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে। মেগাস্থিনীস রাজ-আদালতে মকদ্দমার সংখ্যা অল্প দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন, ভারতবাসীরা তৎকালে মামলা-মকদ্দমা জানিত না। কিন্তু অধিকাংশ মকদ্দমা এইরূপ পঞ্চায়তি আদালতে বিচার হইত বলিয়া আদালতে তাহা যাইত না এবং সেই জন্যই মেগাস্থিনীস মকদ্দমার সংখ্যা অল্প দেখিতে পাইয়াছিলেন।

† আট শত গ্রামের মধ্যে যে কয়টী গ্রাম প্রধান নির্ব্বাচিত হইত, তাহার এক একটী 'স্থানীয়' নামে অভিহিত হইত। এইরূপ, চারি শত গ্রামের মধ্যে যে কয়টী প্রধান, তাহা দ্রোণমুখ; এবং দশটী গ্রামের মধ্যে যে কয়টী প্রধান, তাহা 'সংগ্রহণ' অভিধায়ে অভিহিত হইয়াছিল। রাজ্যের দুইটী প্রদেশের সন্ধিস্থলে যে স্থান অবস্থিত, তাহাই জনপদসন্ধি। এই স্থান—সন্ধিস্থলের কেন্দ্রমধ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল অর্থশাস্ত্রে 'জনপদ-নিবেশ' প্রসঙ্গে ইহার বিস্তৃত আলোচনা আছে।

অর্থাৎ, ধর্ম্মের ও ব্যবহারের পরস্পর দ্বন্দ্বে ধর্ম্মই মান্য এবং চরিত্রের ও রাজশাসনের পরস্পর বিতণ্ডায় চরিত্রই বরণীয় হইবে। রাজানুশাসন—ধর্ম্ম, ব্যবহার ও চরিত্র প্রভৃতির অনুবর্ত্তী হওয়া প্রয়োজন। সংস্থার ও ব্যবহারিকের অর্থাৎ লোকাচার ও চুক্তির পরস্পর বিরোধস্থলে ধর্ম্মের অনুশাসন অনুসারে বিচার-কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে হইবে। তবে রাজানুশাসনের এবং ন্যায়ের মধ্যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইলে ন্যায়ই প্রামাণ্য। সেখানে রাজানুশাসন কার্য্যকরী হইবে না। * রাজ-সকাশে আবেদন করিলেই বিবাদ ব্যবহারবাচ্য হইয়া থাকে। বিচারপ্রার্থী আবেদন করিবার পর বিচার-কালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সর্ব্বাগ্রে লিপিবদ্ধ করিতে হয়। যথা,—(১) বিবাদীর সম্মুখে বাদীকে আপনার দাবীর বিষয় বলিতে হয়; বিচারক তাহা লিখিয়া লন। এইরূপ লিখন-প্রণালী সংহিতা-শাস্ত্রে ভাষা নামে অভিহিত হইয়াছে। (২) নির্দ্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করিতে হইবে; অর্থাৎ—ঠিক যে দিন অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা লিখিবে। সঙ্গে সঙ্গে বৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ এবং দিন প্রভৃতিরও উল্লেখ করিতে হইবে। (৩) অপরাধের বা বিবাদের প্রকৃতি; অর্থাৎ কি বিষয় লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। (৩) ঘটনার স্থান বা কোন্ স্থানে বিবাদ ঘটিয়াছে। (৪) যদি ঋণ-সংক্রান্ত হয়, তাহা হইলে ঋণের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। (৫) বাদীর ও বিবাদীর বা অভিযোক্তার ও অভিযুক্ত ব্যক্তির বাসস্থান, গ্রাম, জাতি, গোত্র, নাম ও পেশা প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিয়া বিচার করিতে হইবে যে, প্রকৃতপক্ষে তাহাদের এই বিবাদের কোনও হেতু আছে কি না। (৬) উভয় পক্ষের জবানবন্দী অর্থাৎ বিবাদ-সংক্রান্ত উভয় পক্ষের বক্তব্য ও সাক্ষী প্রমাণাদি। এই সকল বিষয় যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়া বিচারকগণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার আলোচনা করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিবেন। †

---

* এ বিষয়ে স্মৃতিশাস্ত্রের উক্তি; যথা,—

"শ্রুতেদ্বৈধে স্মৃতেদ্বৈধে স্থলভেদ প্রকল্পতে। শ্রুতিস্মৃতি বিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী॥"

"স্মৃত্যোর্ব্বিরোধে ন্যায়স্তু বলবান ব্যবহারতঃ।

অর্থশাস্ত্রাৎ তু বলবৎ ধর্ম্মশাস্ত্রম্ ইতি স্থিতিঃ॥"—যাজ্ঞবল্ক্য, ২য় অধ্যায়, ২১ম শ্লোক।

"শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধ যত্র দৃশ্যতে।

তত্র শ্রৌতং প্রমাণস্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা।"—ব্যাস-সংহিতা।

"অস্বর্গ্যং লোকবিদ্বিষ্টং ধর্ম্যম্ অপ্যাচরেন্ন তু॥"—মিতাক্ষরা।

† স্মৃতি-শাস্ত্রে বিবাদ-প্রণালী-বর্ণন-প্রসঙ্গে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। স্মৃতি অনুসারে এতদ্ব্যতীত আহ্বান ও আসেধ প্রভৃতির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। 'আসেধ' কতকটা আধুনিক 'ইঞ্জাংসন' (Injunction) বা নিষেধের মত। মন্বাদি স্মৃতিতে আহ্বান ও আসেধ বিষয়ে বিশেষ কোনও ব্যবস্থা নাই। কাত্যায়নের বচনে এতৎসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। সে মতে অর্থী উপস্থিত হইবা মাত্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে,—"কা বার্ত্তা কা চ তে পীড়া।" অতঃপর কে, কোন্ সময়, কি বিষয়ে পীড়া উৎপাদন করিয়াছে, তাহা অবগত হইয়া রাজা পীড়া-প্রদান-কারীকে 'আহ্বান' করিবেন। ইত্যাদি। বিচার এড়াইবার জন্য অপরাধী যদি আহ্বানের পূর্ব্বে বা আহ্বানের পর পলায়ন করিবার চেষ্টা পায়, তাহা হইলে তাহাকে 'আসেধ' বা নিবৃত্ত করিবার ব্যবস্থা ছিল। 'আসেধ' শব্দের অর্থ মিতাক্ষরা বলিয়াছেন,—'রাজাজ্ঞয়াবরোধঃ।' রাজাদেশে নিবৃত্তি। আসেধ চতুর্ব্বিধ; যথা—'স্থানাসেধ, কালাসেধ, প্রবাসাসেধ ও কর্ম্মাসেধ। চতুর্ব্বিধ 'আসেধের' ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে টীকাকার বলিয়াছেন,—"অস্মাৎ স্থানাদযদি স্বমস্ত গচ্ছতি তব রাজকীয়াজ্ঞা অয়ং স্থানাসেধ উচ্যতে; অস্মাৎ পত্তনাৎ ইয়ন্তকালং যাবদ্যদি গচ্ছসি

অতঃপর অর্থশাস্ত্রে 'পরোক্ত' দোষের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। অনবধানতা-বশতঃ পক্ষগণ আপনাদের বক্তব্য বিষয়ে দ্বিরুক্তি, অতিশয়োক্তি প্রভৃতি করিয়া থাকেন। সেই জন্য বিবাদ-বর্ণন-কালে অর্থশাস্ত্রকার পক্ষগণকে এই কয়টী বিষয়ে সাবধান হইবার উপদেশ দিয়াছেন; যথা,—(১) বিচার্য্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া পক্ষগণের বিষয়ান্তর গ্রহণ; অর্থাৎ,—যে বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে, বিচারকালীন সেই বিরোধীয় বিষয় পরিত্যাগ করিয়া অবান্তর বিষয় প্রমাণের চেষ্টা। (২) পূর্ব্ব-প্রদত্ত বিবরণের সহিত পরবর্ত্তী বিবরণের অসামঞ্জস্য; (৩) পক্ষগণ ব্যতীত অপর ব্যক্তির মতামত গ্রহণের পক্ষে জিদ করণ। অর্থাৎ,—যাহার মতামতের কোনও আবশ্যকতা নাই, বিচারকালে তাহার মতের উপর নির্ভর করিবার জন্য বিচারকের নিকট জিদ প্রকাশ। (৪) বিচার্য্য বিষয়ের বা প্রশ্ন-সমূহের উত্তর করিতে করিতে

'পরোক্ত' দোষ।

অয়ং কালকৃত আসেধঃ; যত্র উচ্চলিতস্তত্র যদি যাস্যসীতি প্রবাসাদাসেধোঽয়ম্। অস্মিন্ কর্ম্মণি যদি লগিষ্যসি ইতি কর্ম্মন্ আসেধোঽয়ম্।" অধুনা যেমন অপরাধীকে নির্দ্দিষ্ট স্থান পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করা হয়, স্থানাসেধ সেইরূপ। Internment সম্বন্ধে আজকাল এই বিধি অবলম্বিত। আজ কাল কোনও কোনও অপরাধীকে স্বগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবার বিষয়ে রাজসরকার হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হয়। প্রবাসাসেধ তদনুরূপ। কালাসেধ ও কর্ম্মণাসেধ যথাক্রমে—নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য কোনও কাজে নিবৃত্তি এবং কোনও নির্দ্দিষ্ট কার্য্য হইতে বিরতি। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, আধুনিক কালে প্রাচীন-কালের প্রথাই রূপান্তরে প্রবর্ত্তিত। স্মৃতির মতে বিচার-প্রণালীর (Procedure) প্রথম অংশ 'ভাষা' নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহাতে বাদীকে প্রথমে বিবাদীর সম্মুখে আপনার দাবীর পুনরুল্লেখ করিতে হয়। বিচারক তাহা লিপিবদ্ধ করেন। এই লিখনের নাম—ভাষা। যাজ্ঞবল্ক্য এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার মতে—

প্রত্যর্থিনোঽগ্রতো লেখ্যং যথাবেদিতমর্থিনা। সমামাসতদর্দ্ধাহর্নামজাত্যাদি চিহ্নিতম্॥"

অর্থাৎ,—লেখ্যে বার, মাস, পক্ষ, তিথি, বারাদি ও বাদী প্রতিবাদীর নাম জাত্যাদি উল্লিখিত হইবে। মহর্ষি ব্যাসও তাঁহার সংহিতায় সে আভাষ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী ব্যবহার-গ্রন্থ প্রভৃতিতেও এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। 'ব্যবহারময়ূখ' গ্রন্থে এতৎসম্বন্ধে যে প্রণালীর বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহা এই; যথা,—

"দেশশ্চৈব তথা স্থানং সন্নিবেশ স্তথৈব চ। জাতিঃ সংজ্ঞাধিবাসশ্চ প্রমাণং ক্ষেত্র নাম চ॥

পিতৃ-পৈতামহশ্চৈব পূর্ব্ব-রাজানুকীর্ত্তনম্। স্থাবরেষু বিবাদেষু দশৈতানি প্রবেশয়েৎ॥"

স্থাবর-সংক্রান্ত বিবাদে দশটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যথা,—দেশ, স্থান, সন্নিবেশ, জাতি, সংজ্ঞা, বাসস্থান, প্রমাণ, ক্ষেত্র, নাম, পিতৃপিতামহ, পূর্ব্ব-রাজগণের বিবরণ প্রভৃতি। আরজী সংক্ষেপ হইবে, অথচ তাহাতে বাদীর সকল বক্তব্য থাকিবে। ইত্যাদি। মিতাক্ষরা-ধৃত স্মৃতি-বচন প্রভৃতিতেও ঐরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়।

"অর্থবদ্ধর্ম্মসংযুক্তম পরিপূর্ণমনাকুলম্। সাধ্যবদ্বাচকপদং প্রকৃতার্থানুবন্ধী চ॥

প্রসিদ্ধমবিরুদ্ধং চ নিশ্চিত সাধনে ক্ষমম্। সংক্ষিপ্তং নিখিলার্থং চ দেশকালাবিরোধী চ॥

বর্ষর্ত্তুমাসপক্ষাহা বেলাদেশপ্রদেশবৎ। স্থানাবসথসাধ্যাখ্যা জাত্যাকারবয়োযুতম্॥

সাধ্যপ্রমাণসংখ্যাবদাত্মপ্রত্যর্থিনামবৎ। পরাত্মপূর্ব্বজানেক-রাজনামভিরঙ্কিতম্॥

ক্ষমালিঙ্গাত্মপীড়াবৎ কথিতাহর্ত্তৃদায়কম্। যদাবেদয়তি রাজ্ঞে তদ্ভাষেত্যভিধীয়তে॥"

ব্যবহার-শাস্ত্রোক্ত এই সকল উক্তি হইতে বুঝা যায়, প্রাচীনকালের বিচার-প্রণালী বেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল। বিশুদ্ধ অর্থ ও ধর্ম্ম-সংযুক্ত ভাষায় আরজী বা আবেদন লিখিতে হইত। আরজি সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ পরিপূর্ণ-অর্থ-জ্ঞাপক এবং বৎসর, মাস, পক্ষ, বেলা, দেশ, প্রদেশ, স্থান, গৃহ, সাধ্য বস্তুর নাম, বিবাদীর জাতি, আকার বয়স প্রভৃতির যথাযথ উল্লেখ করিতে হইত। এইরূপ আরও অনেকানেক বিষয় আরজিতে উল্লেখ করিবার নিয়ম ছিল।

নিরুত্তর হওয়া এবং বিচারক কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াও নিরুত্তর থাকা। (৫) পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট প্রশ্ন ভিন্ন নূতন প্রশ্নের উত্থাপন। (৬) নিজকৃত পূর্ব্ব-বিবরণ প্রত্যাহার করা। (৭) নিজের সাক্ষীর বর্ণনা অস্বীকার করা। (৮) নিষিদ্ধ-স্থলে গোপনে সাক্ষীর সহিত কথাবার্ত্তা বলা; অর্থাৎ—যেখানে সাক্ষীর সহিত পরামর্শ করা অবৈধ, সেরূপ ক্ষেত্রে সাক্ষীর সহিত গোপনে কথোপকথন। এই অষ্টবিধ দোষ 'পরোক্ত' দোষ বলিয়া অর্থশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। মন্বাদি সংহিতা-শাস্ত্রেও এ সকল বিষয়ের উল্লেখ আছে। মনু বলিয়াছেন,—

"আদেশ্যং যশ্চ নিশতি নির্দ্দিশ্যাপহ্নুতে চ যঃ। যশ্চাধরোত্তরানর্থান্ বিগীতান্ নাববুধ্যতে॥
অপদিশ্যাপদেশ্যঞ্চ পুনর্যস্ত্বপধাবতি। সম্যক্ প্রণিহিতঞ্চার্থং পৃষ্টঃ সন্নাভিনন্দতি॥
অসম্ভাষ্যে সাক্ষিভিশ্চ দেশে সম্ভাষতে মিথঃ। নিরুচ্যমানং প্রশ্নঞ্চ নেচ্ছেদ্‌যশ্চাপি নিষ্পতেৎ॥
ব্রূহীত্যুক্তশ্চ নাব্রূয়াদুক্তঞ্চ ন বিভাবয়েৎ। ন চ পূর্ব্বাপরং বিদ্যাৎ তস্মাদর্থাৎ স হীয়তে॥"

অর্থাৎ,—'যে সাক্ষী ঘটনাক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল না, সেইরূপ সাক্ষী মান্য করিয়া যে বাদী পরে তাহা অস্বীকার করে; অথবা যে বাদী বিশৃঙ্খল ও পরস্পর-বিরোধী বাক্য ব্যবহার করিয়া থাকে; যে বাদী তাহার আরজীতে মূল বিষয় প্রথমে একরূপ উল্লেখ করিয়া পরে তাহা হইতে স্বতন্ত্র বিষয়ের বর্ণন করে, অথবা সম্যক-স্বীকৃত পূর্ব্ব বিষয় জিজ্ঞাসিত হইয়া পরে তাহা স্বীকার করিতে চাহে না; যে বাদী অসম্ভাব্য প্রদেশে লইয়া গিয়া সাক্ষীদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহে অথবা রীতিমত জিজ্ঞাসা করিলে প্রশ্নের উত্তর দিতে চাহে না বা ধর্ম্মাধিকরণ হইতে স্থানান্তরে যায় না; ধর্ম্মাধিকরণ কোনও বিষয় বলিতে বলিলে, যে কথা কহে না অথবা যে আবেদিত বিষয় প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করে না; যে বাদী সাধ্য সাধন কিছুই জানে না;—এরূপ বাদী প্রার্থিত বিষয়ে নিরাশ হয় অর্থাৎ তাহার দাবী অগ্রাহ্য হইয়া থাকে।' যাহা হউক, এই সকল 'পরোক্ত দোষ' ভিন্ন অর্থশাস্ত্রে আরও কতকগুলি 'পরোক্ত' দোষের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। বিবাদী যখনই বিবাদীর বিষয়ে জবাব প্রদান করিবে অর্থাৎ আপনার দোষ অস্বীকার করিবে, বাদীকে সেই দিনই তাহার উত্তর দিতে হইবে। তিনি সেই দিনই সাক্ষ্যাদি মান্য করিয়া মকদ্দমা চালাইবার জন্য প্রস্তুত হইবেন। কারণ, বিবাদী জবাব দিলেই বুঝা যায় যে, সে মকদ্দমা চালাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। বাদী যদি আত্ম-পক্ষ-সমর্থনে অপারক হন, তাহা হইলে তাঁহাতে পরোক্ত দোষের উদ্ভব হয়। তবে বিবাদী যদি বিবাদ-প্রতিবাদে প্রস্তুত না থাকিত, তাহা হইলে জবাবের জন্য তাহাকে সময় দিবার নিয়ম বিধিবদ্ধ ছিল। এ ক্ষেত্রে তিন দিন বা সাত দিন সময় দিবার নিয়ম। * এইরূপ অবকাশ পাইয়াও বিবাদী যদি আত্মপক্ষ-সমর্থনে অপারক হইত, তাহা হইলে তাহার প্রতি

* সংহিতাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে অবকাশের পরিচয় পাওয়া যায়। মহর্ষি মনুর স্মৃতিতে অবকাশের বিষয় স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হয় নাই। অর্থীর দণ্ডাদির বিষয় উল্লেখ ব্যপদেশে তিনি বলিয়াছেন,—"নচেৎ ত্রিপক্ষাৎ প্রব্রূয়াদ্ধর্ম্মং প্রতিপরাজিতা।" অর্থাৎ—'ত্রিপক্ষের মধ্যে (অর্থী) যদি কিছু না বলে, তবে তাহাকে (রাজা) ধর্ম্মতঃ দোষী করিবেন।' ইহাতে বুঝা যায়, জবাবের জন্য ত্রিপক্ষ সময় দিবার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। মনুর সংহিতায় আর একটী বিশেষ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। সেটী তামাদি-সংক্রান্ত। ইংরাজীতে ইহা 'লিমিটেশন

তিন পণ বা বার পণ অর্থ-দণ্ড প্রদান করিবার ব্যবস্থা ছিল। তিন পক্ষের মধ্যেও যদি বিবাদী প্রতিবাদে সমর্থ না হইত, তাহা হইলে সে 'পরোক্ত' দোষে দুষ্ট হইত। বাদী তখন তাঁহার দাবীকৃত বিষয় বিবাদীর নিকট আদায় লইবার অধিকারী হইতেন। কিন্তু বিবাদী যদি বাদীর নিকট চাকরী স্বীকার করিতে সম্মত হইতেন, তাহা হইলে বাদী ইচ্ছা করিলে বিবাদীর বিষয় পরিত্যাগ করিতে পারিতেন। যে বিবাদী আদৌ আপনার পক্ষ সমর্থন জন্য উপস্থিত হইত না, তাহার পক্ষেও ঐরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। অন্যপক্ষে বাদী যদি আপনার দাবী সপ্রমাণ করিতে না পারিতেন, তাঁহার প্রতিও দণ্ডের আদেশ হইত। মৃতব্যক্তির বিরুদ্ধে তাঁহার দাবী অপ্রমাণিত হইলে, তিনি মৃত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সংক্রান্ত কোনও কোন কার্য্য সম্পন্ন করিতে বাধ্য হইতেন। পরোক্ত-দোষে অপরাধীর 'পঞ্চবন্ধ' বা 'দশবন্ধ' দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল।।* দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রভৃতি ফৌজদারী বিবাদ ভিন্ন অন্য সময়ে প্রতিবাদী, পূর্ব্ব-মকদ্দমা নিষ্পত্তি না হওয়ায় পর্য্যন্ত, বাদীর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারিবে না। অথবা, একই অপরাধের জন্য কিংবা সদৃশ বিষয়ে প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে একই সময়ে একাধিক অভিযোগ উপস্থিত করা বিধিবিরুদ্ধ ছিল। তবে ফৌজদারী (দণ্ড, পারুষ্য, সাহস, স্তেয়) প্রভৃতি ব্যবহারে ইহার ব্যতিক্রম হইত।†

(Limitalon) বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অর্থী যদি তিন বৎসরের মধ্যে আপনার প্রাপ্য বিষয়ের দাবী না করেন, তাহা হইলে ঐ সময়ের পর তাঁহার দাবী অগ্রাহ্য হইবে—মনু তাহা স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়াছেন। (মনু-সংহিতা, অষ্টম অধ্যায়, ৩০শ ও ৩১শ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় অর্থীর বর্ণনা শুনিবামাত্রই প্রত্যর্থীকে জবাব দিতে হইত। সুতরাং অবকাশ দিবার কোনও বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না বলিয়াই বোধ হয়। তবে বিশেষ বিশেষ স্থলে অবকাশ প্রদানের বিষয় যাজ্ঞবল্ক্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। পারুষ্য-সাহসাদি ব্যতীত অন্য স্থলে যাজ্ঞবল্ক্য যথেচ্ছ সময় দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহা বিচারকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যথা,—"বিবাদয়েৎ সদ্য এব কালোঽন্যত্রেচ্ছয়া স্মৃতঃ।" বাকপারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য, স্তেয়, ঋণ প্রভৃতি সংক্রান্ত বিবাদে মহর্ষি নারদ সদ্য-বিচারের ব্যবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে এক দিন, তিন দিন বা সাত দিন অবকাশ দেওয়ার বিধি তাঁহার গ্রন্থে দৃষ্ট হয়; যথা—"শ্বো লেখনং বা লভেত্র্যহং সপ্তাহমেব বা।" কাত্যায়ন ও বৃহস্পতি সংহিতাদ্বয়ে বিবাদের গুরুত্বের তারতম্যানুসারে অল্প বা অধিক সময় দিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। কাত্যায়ন বলিয়াছেন,—"কালং শক্তিং বিদিত্বা তু কার্য্যানাঞ্চ বলাবলম্‌ অল্পং বা বহু বা কালং দদ্যাৎ প্রত্যর্থিনে প্রভু।" কাত্যায়ন-সংহিতার একটী বচন উদ্ধৃত করিয়া জীমূতবাহন বলিয়াছেন,—অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে অবস্থাবিশেষে পাঁচ দিন, তিন দিন, সপ্তাহ বা তিন পক্ষ পর্য্যন্ত সময় দেওয়া যাইতে পারে। অধুনা ইংরেজ-রাজপ্রবর্ত্তিত বিচারালয়-সমূহে অবকাশ দেওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত আছে বটে; কিন্তু তাহার বাঁধাবাঁধি কোনও নিয়ম নাই। বিচারক যদৃচ্ছা অবকাশ দিয়া থাকেন। যাহা হউক, এই সকল বিষয়ের আলোচনায় বুঝা যায়, অবকাশ দিবার প্রথা নূতন নহে। ইহা অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতের ব্যবহার-শাস্ত্রে প্রবর্ত্তিত আছে।

* পঞ্চবন্ধ বা দশবন্ধ—দাবীর পরিমাণের পঞ্চমাংশ বা দশমাংশ।

† একই প্রতিপক্ষের উপর বিভিন্ন বিষয় এবং বহু বিষয় সংক্রান্ত বিবাদ চাপান প্রাচীন-কালের ব্যবহার শাস্ত্রে যেমন নিষিদ্ধ ছিল, তেমনি একটী বিবাদীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন বাদীর মকদ্দমা উপস্থিত করা শাস্ত্র-বিগর্হিত বলিয়া উক্ত হইত। মহর্ষি কাত্যায়ন এ সম্বন্ধে স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

"ন চৈকস্মিন্‌ বিবাদে তু ক্রিয়াস্যাদ্বাদিনোর্দ্বয়ং। ন চার্থসিদ্ধিরুভয়োর্ন চৈকত্র ক্রিয়াদ্বয়ম্‌।"

অর্থশাস্ত্রকার তাই বলিয়াছেন,—"অভিযুক্তো ন প্রত্যভিযুঞ্জতি অন্যত্র কলহসাহসসার্থসমবায়েভ্য। ন চাভিযুক্তেঽভিযোগোঽস্তি।" সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে, একই বিষয়ে একাধিক বিবাদ, একসঙ্গে দুই অর্থীর স্বতন্ত্র বিবাদ এবং বহু-বিষয়-ঘটিত বিবাদ একসঙ্গে উপস্থিত হইতে পারিত না। এতদ্ব্যতীত, স্বয়ং রাজা বা রাজকর্মচারী কোনও বিবাদ উপস্থিত করিবার অধিকারী ছিলেন না। মন্বাদি স্মৃতিতেও তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। মনু বলিয়াছেন,—

"নোৎপাদয়েৎ স্বয়ং কার্য্যং রাজা নাপ্যস্য পুরুষঃ।
ন চ প্রাপিতমন্যেন গ্রসেদর্থং কথঞ্চন॥"

অর্থাৎ,—ধনলোভে লোকের মধ্যে বিবাদ জন্মান বা অপরের প্রাপ্য অর্থে লোভ করা, রাজার বা রাজপুরুষের কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু পরে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। প্রথমতঃ, রাজা স্বয়ং ব্যবহার-দ্রষ্টা ছিলেন না। তাই ব্যবহার-উৎপাদনে তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। কিন্তু ক্রমশঃ রাজার দায়িত্ব-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে ঐ ক্ষমতা প্রদানের আবশ্যক হইয়া পড়ে। পণ্ডিতগণ তখন উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করেন যে, কোনও কোনও বিষয়ে রাজার প্রতি ব্যবহার-উৎপাদনের ক্ষমতা অর্পণ না করিলে রাজদ্রোহ প্রভৃতিতে তাঁহার রাজ্য-রক্ষা কঠিন হইয়া উঠিবে। তাই জীমূতবাহন, বীরমিত্রোদয়, বৃহস্পতি প্রভৃতি সংহিতাগ্রন্থে রাজার ও রাজপুরুষের ব্যবহার উৎপাদানের ক্ষমতার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। স্তেয়, সাহস, দণ্ডপারুষ্য প্রভৃতি বিষয়ে রাজার ঐরূপ ব্যবহার উৎপাদনের বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ ব্যবহার উৎপাদন সম্বন্ধে জীমূতবাহন বলিয়াছেন,—

"অষ্টাদশপদো বাদো বিচার্য্যো বিনিবেদিতঃ। সন্ত্যন্যানি পদান্যত্র তানি রাজা বিশেৎ স্বয়ম্॥"
ষড়্ভাগহরণং শুল্কং সময়াতিক্রমো নিধিঃ। বধঃ সংহরণং স্তেয়মাসেধাজ্ঞাব্যতিক্রমঃ।"

ছল প্রভৃতি রাজদ্রোহ-বিষয়ক বিবাদ স্বয়ং রাজা বা রাজকর্মচারী উৎপাদন করিতে পারিবেন,—বীরমিত্রোদয়ে তাহার ব্যবস্থা আছে। *

যাজ্ঞবল্ক্যেও এইরূপ উক্ত দেখিতে পাই। তিনি বলিয়াছেন,—"অভিযোগমনস্তীর্য্য নৈনং প্রত্যভিযোজয়েৎ। অভিযুক্তং মান্যেন নোক্তং বিপ্রকৃতং নয়েৎ॥" অর্থাৎ—বিবাদীর বিরুদ্ধে একজন কর্ত্তৃক আরোপিত দোষের যত দিন পর্য্যন্ত মীমাংসা না হইবে, ততদিন অপর কেহ সে বিবাদীর বিরুদ্ধে পাণ্টা অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারিবে না। তবে কলহ, সাহস, স্তেয়, পারুষ্য প্রভৃতি বিষয়ে এ নিয়মের ব্যতিক্রমের বিষয় যাজ্ঞবল্ক্য উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে "কুর্য্যাৎ প্রত্যভিযোগঞ্চ কলহে সাহসেষু চ।" আধুনিক-কাল-প্রচলিত আইনাদিতেও এ বিষয় নিষিদ্ধ হইয়াছে। আধুনিক Multifariouness এবং Misjoinder of Charges প্রভৃতি বাধার ন্যায় প্রাচীন কালেও উক্তরূপ বিবিধ বাধার বিষয় সংহিতা ও অর্থশাস্ত্র প্রভৃতিতে উল্লিখিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ১২ ধারায় আছে,—"Where a plaintiff is precluded... from instituting a further suit in respect of any particular cause of action, he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action. বিচারকও এরূপ ক্ষেত্রে ঐরূপ মকদ্দমার বিচার করিবেন না। যথা—(Sec. 10) "No court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly or substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties." ইত্যাদি।

* রাজদ্রোহ (সিডিশন), 'ডিফেন্স' ও অস্ত্র-সংক্রান্ত অপরাধের অভিযোগ সম্রাটের করিবার অধিকার এখনও আছে। ঐ সকল অপরাধের বিচারের জন্য বিশেষ বিশেষ বিধিও বিধিবদ্ধ হইয়াছে। প্রাচীন কালের ব্যবহার সহিত কোনও কোনও বিষয়ে তাহার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সে সকল বিষয় পরে আলোচিত হইয়াছে।

বিবাদ-সম্পর্কীয় পরোক্তাদি বিবিধ দোষের বিষয় উল্লেখ করিয়া অতঃপর অর্থশাস্ত্রকার সাক্ষী বিষয়ক নিয়মাবলী বিবৃত করিয়াছেন। কোনও বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হইলেই তন্মীমাংসার্থ রাজার নিকট আবেদন করিতে হয়। প্রথম আবেদন, দ্বিতীয় বিবাদীর বা প্রত্যর্থীর উত্তর, তৃতীয় সাক্ষ্যাদির দ্বারা প্রমাণ, চতুর্থ সিদ্ধি—বিবাদ বিষয়ে প্রাচীন ব্যবহার-শাস্ত্রের ইহাই ব্যবস্থা। * বিবাদ সপ্রমাণ করিতে হইলে সাক্ষীর প্রয়োজন। মন্বাদি স্মৃতি-শাস্ত্রে তাই সাক্ষী সংক্রান্ত বিস্তৃত বিধি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সে সকল বিষয় পরবর্ত্তী অংশে আলোচিত হইবে। প্রথমতঃ অর্থশাস্ত্রোক্ত সাক্ষী প্রকরণের বিষয় উল্লেখ করিতেছি। স্মৃত্যাদির ন্যায় অর্থশাস্ত্রেও গুপ্তচর-নিয়োগে বিবাদের প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধানের ব্যবস্থা আছে। গুপ্তচরগণ বিবাদের যাথার্থ্য নির্ণয় জন্য নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া বিচারকগণের নিকট তাহা বিবৃত করিতেন। কৌটিল্য প্রণীত অর্থ-শাস্ত্রের 'বিবাদপদনিবন্ধে' এ বিষয় নিম্নরূপ উক্ত হইয়াছে; যথা,—

সাক্ষি-ব্যবস্থা

"পূর্ব্বোত্তরার্থব্যাঘাতে সাক্ষিবক্তব্য কারণে চারহস্তাচ্চ নিষ্পাতে প্রদেষ্টব্যঃ পরাজয়ঃ।"

কিন্তু এই চারগণের প্রদত্ত বিবরণ গ্রহণের বা প্রত্যাখ্যানের বিষয় বিচারকগণ বিবেচনা পূর্ব্বক নির্দ্ধারণ করিতেন। যেখানে সাক্ষীদিগের বিবরণ পরস্পর-বিরোধী এবং সামঞ্জস্য-বিহীন—বাদীর বর্ণনার সহিত সম্পূর্ণ অনৈক্য; বিশেষতঃ যেখানে সাক্ষীর ও বাদীর বর্ণনার সহিত গুপ্তচরের বর্ণনার অমিল দৃষ্ট হইবে;—সেই সকল স্থলে বিচারকগণ বিশেষ বিবেচনার সহিত গুপ্তচরগণের সংগৃহীত তথ্য গ্রহণ করিবেন। বিচার-বিভ্রাট ঘটিলে বিচারকগণও দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইতেন না। সেই জন্য গুপ্তচরগণের প্রদত্ত বিবরণ বিশেষ বিবেচনার সহিত বিচার করিবার ব্যবস্থা ছিল। তাই প্রথমতঃ গুপ্তচরগণের প্রতি অবিশ্বাস স্থাপনের বিষয় অর্থশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। প্রথমে বিবাদ বিষয়ে তাহাদের প্রদত্ত বিবরণ অসত্য বলিয়া মনে করিয়া লওয়া হইত। পরে ক্রমে তাহার বিচার করিয়া সত্য নির্ণয় করা অর্থশাস্ত্রের বিধি ছিল। অর্থশাস্ত্র-মতে বাদী যদি তাহার অভিযোগ প্রমাণের জন্য সাক্ষী উপস্থিত

---

* যাজ্ঞবল্ক্যের মতে ব্যবহারের এই চতুষ্পাদ—ভাষা, পক্ষ, প্রতিপ্রজ্ঞা এবং সিদ্ধি বা তদ্বিপরীত বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,—

"প্রত্যর্থিনোঽগ্রতো লেখ্যং যথাবেদিতমর্থিনা।

শ্রুতার্থস্যোত্তরং লেখ্যং পূর্ব্বাবেদকসন্নিধৌ। ততোঽর্থী লেখয়েৎ সদ্যঃ প্রতিজ্ঞাতার্থসাধনম্।

তৎসিদ্ধৌ সিদ্ধিমাপ্নোতি বীপরীতমতোঽন্যথা। চতুষ্পাদ্ব্যবহারোঽয়ং বিবাদেষূপদর্শিতঃ॥"

'অর্থী যাহা নিবেদন করিয়াছে, প্রত্যর্থীর সমক্ষে বিচারক ঠিক তাহাই লিখিবেন'—এইরূপে প্রথম ভাষাপাদ। ভাষার্থ শ্রবণ করিবার পর প্রতিবাদী যাহা বলিবে, বাদীর সমক্ষে তৎসমস্ত লেখাইতে হইবে। এইরূপে দ্বিতীয় উত্তর পাদ। বাদী তৎক্ষণাৎ আত্মপক্ষের প্রমাণ লিখাইবে; এইরূপে তৃতীয়—ক্রিয়াপাদ। প্রমাণ ঠিক হইলে, জয়লাভ অথবা তদ্বিপরীত ফল। ব্যবহারের এই চতুর্ব্বিধ সাধ্যাসিদ্ধিপদ উক্ত হইয়াছে। অধুনা বিচারালয়-সমূহে এই পদ্ধতিই অনুসৃত হইয়া থাকে। ব্যবহারের চারি পাদ অধুনা আরজী (Plaint), জবাব (Written Statement), প্রমাণ (Proof), রায় ফয়সালা (Judgment) নামে উক্ত হয়। বিবাদ প্রমাণ করিবার জন্য পূর্ব্বেও সাক্ষী প্রভৃতি গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল, এখনও আছে। মন্বাদি স্মৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সকল স্মৃতিতেই এই সাক্ষ্যাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

করিতে না পারিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার মকদ্দমা নষ্ট হইত না। তবে সে সকল মকদ্দমার প্রকারভেদ আছে। যে স্থলে মজুর কাজ করিয়া তাহার বেতন পাইত না, সেস্থলে যদি সেই দাস বা মজুরের কোনও সাক্ষী না থাকিত, তাহা হইলেও তাহার মকদ্দমায় সিদ্ধিলাভ হইত।* মনুসংহিতায় সাক্ষী বিষয়ক একটী বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। বিচারালয়ে কিরূপ সাক্ষী প্রদান করিতে হইবে, সাক্ষী কিরূপ প্রকৃতির হওয়া আবশ্যক, সেখানে তাহার বিশেষ বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। সে মতে, অভিযোক্তাকে সাক্ষী, লেখ্য (দলিলাদি) বা অন্য প্রমাণ বিচারালয়ে উপস্থিত করিতে হইত। অপিচ, বিবাদী যদি দাবী অস্বীকার করে, তাহা হইলে তিন জন উত্তমর্ণ সাক্ষীর দ্বারা বাদী তাঁহার দাবীর বিষয় সপ্রমাণ করিবেন,—মনু তাহা বলিয়া গিয়াছেন। অর্থশাস্ত্রেও উভয় পক্ষের অনুমোদিত তিন জন সাক্ষীর বিষয় (অনুমতাঃ, প্রাত্যয়িকা ও শূচয়ঃ) উল্লিখিত হইয়াছে। অর্থশাস্ত্র-মতে ঋণ-বিষয়ে দুই জন সাক্ষীই যথেষ্ট। যথা,—"প্রাত্যয়িকাশ্‌শুচয়োঽনুমতা বা ত্রয়োঽবরার্থ্যাঃ পক্ষানুমতৌ বা দ্বৌ ঋণং প্রতি ন ত্বেবৈকঃ।" কিন্তু এক জন সাক্ষী সর্ব্বত্র অগ্রাহ্য। সংহিতা-মতে কৃতদার, পুত্রবান এবং একদেশনিবাসী ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র জাতীয় সাক্ষী মান্য করার বিধি। ঋণ-সংক্রান্ত বিবাদেই এইরূপ ব্যবস্থা। তবে অনাপৎকালে অর্থাৎ স্তেয় দণ্ডাদি ফৌজদারী সংক্রান্ত ব্যবহারে যে কোনও সাক্ষী মান্য করার বিষয় মনু বলিয়া গিয়াছেন; যথা,—

সংহিতা-মতে সাক্ষিপ্রকরণ।

"পৃষ্টোঽপব্যয়মানস্তু কৃতাবস্থো ধনৈষিণা। ত্র্যবরৈঃ সাক্ষিভির্ভাব্যো নৃপ ব্রাহ্মণসন্নিধৌ॥
যাদৃশা ধনিভিঃ কার্য্যা ব্যবহারেষু সাক্ষিণঃ। তাদৃশান্ সংপ্রবক্ষ্যামি যথা বাচ্যমৃতঞ্চ তৈঃ॥
গৃহিণঃ পুত্রিণো মৌলাঃ ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রযোনয়ঃ। অর্থ্যুক্তা সাক্ষ্যমর্হন্তি ন যে কেচিদনাপদি॥"

সকল বর্ণের মধ্যেই যাঁহারা সত্যবাদী, যাঁহাদের কর্ত্তব্য জ্ঞান আছে এবং যাঁহারা অলুব্ধ, তাঁহাদিগকে সাক্ষী মান্য করা যায়। কিন্তু ইহার বিপরীত-গুণাবলম্বী হইলে তাহাদিগকে ত্যাগ করিবার ব্যবস্থা মনু প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার মতে, যাহাদের সহিত অর্থসম্বন্ধ আছে, যাহারা মিত্র, যাহারা সাহায্যকারী ভৃত্যাদি, যাহারা ক্রূরস্বভাবসম্পন্ন, এবং যাহারা ব্যাধিগ্রস্ত ও অন্য দোষ দুষ্ট;—তাহাদের সাক্ষী বিচারক গ্রহণ করিবেন না। রাজা, কারুজীবী, সূপকার, নট, বহুবেদজ্ঞ, ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী, দাস, দস্যু, বৃদ্ধ, শিশু, নীচজাতি, অন্ধ-খঞ্জাদি বিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তি, আর্ত্ত, মত্ত, উন্মত্ত, ক্রুদ্ধ, তস্কর, স্ত্রীলোক প্রভৃতিও মনুর মতে সাক্ষ্য-প্রদানের অধিকারী নহেন। এ বিষয়ে তাঁহার উক্তি; যথা,—

"আপ্তাঃ সর্ব্বেষু বর্ণেষু কুর্য্যাঃ কার্য্যেষু সাক্ষিণঃ। সর্ব্বধর্ম্মবিদোঽলুব্ধা বিপরীতাংস্তু বর্জ্জয়েৎ॥
নার্থসম্বন্ধিনো নাপ্তা ন সহায়া ন বৈরিণঃ। ন দৃষ্টদোষাঃ কর্ত্তব্যা ন ব্যাধ্যার্ত্তা ন দূষিতাঃ॥
ন সাক্ষী নৃপতিঃ কার্য্যা ন কারুককুশীলবৌ। ন শ্রোত্রিয়ো ন লিঙ্গস্থো ন সঙ্গেভ্যো বিনির্গতঃ॥
নাধ্যধীনো ন বক্তব্যো ন দস্যুর্ন বিকর্ম্মকৃৎ। ন বৃদ্ধো ন শিশুর্নৈকো নান্ত্যো ন বিকলেন্দ্রিয়ঃ॥
নার্ত্তো ন মত্তো নোন্মত্তো ন ক্ষুত্তৃষ্ণোপপীড়িতঃ। ন শ্রমার্ত্তো ন কামার্ত্তো ন ক্রুদ্ধো নাপি তস্করঃ॥"

* এখনকার দিনে সাক্ষী ভিন্ন প্রায়ই মকদ্দমা চলে না। এমন কি, রেজেষ্টারীকৃত দলিলাদিও সাক্ষীর দ্বারা সপ্রমাণ করাইতে হয়।
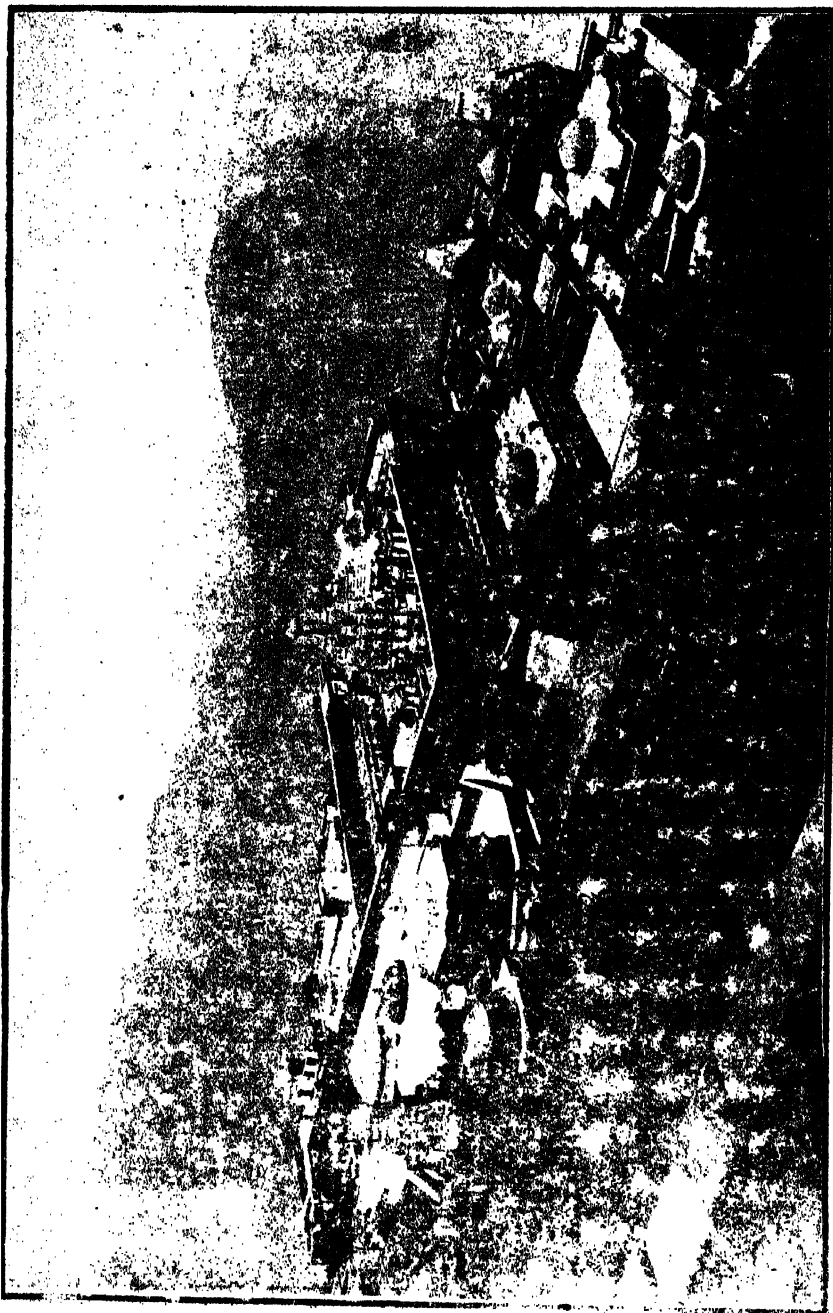
গির্ণার-পর্ব্বতের জৈন-মন্দির।

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায়ও অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। তিনিও তপঃনিষ্ঠ সদ্বংশজাত সত্যবাদী পুত্রবান সম্পত্তিশালী তিন জন সাক্ষী বিবাদ-প্রমাণার্থ বিচারালয়ে উপস্থিত করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাঁহার মতে, স্ত্রী, বালক, কিতব, সন্ন্যাসী, বিকলেন্দ্রিয় প্রভৃতির সাক্ষী ব্যবহার-প্রমাণে অগ্রাহ্য। নিম্নে 'যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার' (দ্বিতীয় অধ্যায়, ৬৯ম—৭৩ম শ্লোক) উক্তি উদ্ধৃত হইল; যথা,—

"তপস্বিনো দানশীলাঃ কুলীনাঃ সত্যবাদিনঃ। ধর্ম্মপ্রধানা ঋজবঃ পুত্রবন্তো ধনান্বিতাঃ॥
ত্র্যবরাঃ সাক্ষিণো জ্ঞেয়াঃ শ্রৌতস্মার্ত্তক্রিয়ারতাঃ। যথাজাতি যথাবর্ণং সর্ব্বে সর্ব্বেষু বা স্মৃতাঃ॥
শ্রোত্রিয়াস্তাপসা বৃদ্ধা যে চ প্রব্রজিতাদয়ঃ। অসাক্ষিণস্তে বচনান্নাত্র হেতুরুদাহৃতঃ॥
স্ত্রীবৃদ্ধবালকিতবমত্তোন্মত্তাভিশস্তকাঃ। রঙ্গাবতারিপাষণ্ডিকূটকৃদ্বিকলেন্দ্রিয়াঃ॥"
পতিতাপ্তার্থসম্বন্ধিসহায়রিপুতস্করাঃ। সাহসী দৃষ্টদোষশ্চ নির্দ্ধূতাদ্যাস্ত্বসাক্ষিণঃ॥"

যাজ্ঞবল্ক্যে সবর্ণ ও স্বজাতি সাক্ষীর বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে,—উদ্ধৃত শ্লোক কয়টী হইতে তাহা সপ্রমাণ হয়। স্বজাতি বা সবর্ণ সাক্ষী না মিলিলে সকল বর্ণীয় ব্যক্তিই সকল জাতীয় ও সকল বর্ণীয় সাক্ষী মান্য করিতে পারেন—যাজ্ঞবল্ক্য তাহার ব্যবস্থা দিয়াছেন। গৌতম-সংহিতায় এ বিষয়ে বিশেষ কোনও ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না। নিজ কর্ম্মে আনন্দিত, রাজার বিশ্বাস্য, পক্ষপাতশূন্য ও দ্বেষ-বর্জ্জিত শূদ্রজাতীয় ব্যক্তি বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষেই সাক্ষী হইতে পারে,—গৌতম তাহার স্পষ্ট ব্যবস্থা দিয়াছেন। বহু সাক্ষীর বিষয়ও তিনি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। গৌতমের উক্তি হইতে বুঝা যায়, শূদ্রদিগের উল্লিখিত গুণপরম্পরা না থাকিলে তাঁহারা সাক্ষী হইতে পারিতেন না। ইহা হইতে আরও বুঝা যায় যে, দ্বিজাতি-গণের সাক্ষ্যই প্রামাণ্য ছিল। তবে গৌতমে সাক্ষি-বিষয়ে একটী বিশেষ ব্যবস্থা লক্ষিত হয়। গৌতমের মতে, যিনি কোনও পক্ষেরই মানিত সাক্ষী নহেন, তিনি যদি রাজা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হন, তাহা হইলে তিনিও সাক্ষি-মধ্যে গণ্য হইবেন। এতদ্ব্যতীত অমানিত অনুরুদ্ধ ব্যক্তিও, গৌতমের মতে, সাক্ষী দিতে পারিতেন। * মন্বাদির ন্যায় বিষ্ণু-সংহিতায় সাক্ষী ও অসাক্ষী সম্বন্ধে এ সুদীর্ঘ তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। "অথ সাক্ষিণঃ"—এইরূপ আরম্ভ করিয়া, বিষ্ণু (বিষ্ণু-সংহিতা, অষ্টম অধ্যায়, ১ম—৩য় শ্লোক, দ্রষ্টব্য) বলিতেছেন,—

"ন রাজশ্রোত্রিয়প্রব্রজিতকিতবতস্করপরাধীনস্ত্রীবালসাহসিকাতিবৃদ্ধমত্তোন্মত্তাভিশ-
স্তপতিতক্ষুত্তৃষার্ত্তব্যসনিরাগান্ধাঃ॥ ২॥ রিপুমিত্রার্থসম্বন্ধিবিকর্ম্মদৃষ্টদোষসহায়াশ্চ॥"

গৌতম অমানিত অজিজ্ঞাসিত সাক্ষীকেও সাক্ষী-শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু বিষ্ণু সেরূপ সাক্ষীকে অসাক্ষী পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বলিয়াছেন,—"অনির্দ্দিষ্টস্তু সাক্ষিত্বে যশ্চোপেত্য ব্রূয়াৎ। একশ্চাসাক্ষী॥" এতদ্ব্যতীত একজন সাক্ষীর বাক্যও অগ্রাহ্য। বিষ্ণুও গৌতমের ন্যায় একাধিক বা বহু সাক্ষীর ব্যবস্থা দিলেন। বিষ্ণু-সংহিতা-মতে সদ্বংশজাত, সচ্চরিত্র, ধনবান, যজ্ঞশীল, তপঃনিষ্ঠ, পুত্রবান্, ধার্ম্মিক, অধীতবেদ, সত্যবাদী ও ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধ

---

* আধুনিক বিচার-আমলে অমানিত সাক্ষীর সাক্ষ্য আদালত গ্রাহ্য করেন না। উভয় পক্ষকেই এখন পূর্ব্ব হইতে সাক্ষীদিগের নামধামাদি সম্বলিত দরখাস্ত বিচারকের নিকট দাখিল করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন উপস্থিত-ক্ষেত্রে কোনও অমানিত ব্যক্তি সাক্ষী দিতে পারেন না। তবে বিশেষ বিশেষ স্থলে এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। সে বিষয় পরে উল্লিখিত হইবে।

(তর্কশাস্ত্র, ঋক্‌যজুঃসামবেদ ও কৃষিশিল্পবাণিজ্যাদি বিষয়ক শাস্ত্র—এই সকল বিষয়ে পারদর্শী) ব্যক্তিগণ সাক্ষী হইবার উপযুক্ত। এ বিষয়ে বিষ্ণুসংহিতার উক্তি; যথা,—

"অথ সাক্ষিণঃ ॥ ৭ ॥ কুলজা বৃত্তিবিত্তসম্পন্না যজ্ঞানস্তপস্বিনঃ পুত্রিণো ধর্ম্মজ্ঞা অধীয়ানাঃ সত্যবন্তস্ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধাশ্চ ॥ ৮ ॥ অভিহিতগুণসম্পন্ন উভয়ানুমত একোঽপি ॥ ৯ ॥"

এইরূপ গুণসম্পন্ন উভয় পক্ষের মানিত এক ব্যক্তিও বিষ্ণু-সংহিতার মতে সাক্ষী হইবার উপযুক্ত। ইহাই হইল সাধারণ বিধি। কিন্তু বাক্‌পারুষ্য (গালি-গালাজ), দণ্ডপারুষ্য (আঘাতাদি মারপিট), চৌর্য্য, সাহস (দস্যুতা প্রভৃতি), সংগ্রহণ (পরস্ত্রীহরণ) প্রভৃতি ফৌজদারী-সংক্রান্ত ব্যবহারে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। বিষ্ণুর মতে, এই সকল বিচারে সাক্ষীর গুণাগুণ পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই; অর্থাৎ—এই সকল বিষয়ে সকল জাতীয় ও সকল বর্ণীয় সাক্ষীই বিচারালয়ে গ্রহণ করা যাইতে পারে। যথা,—"স্তেয়সাহসবাগ্দণ্ডপারুষ্যসংগ্রহণেষু সাক্ষিণো ন পরীক্ষ্যাঃ।" উভয় পক্ষের মানিত এক সাক্ষীর বিষয়ে মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য এক মত। ফৌজদারী-সংক্রান্ত ব্যাপারে সাক্ষীর গুণাগুণ পরীক্ষার অপ্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও মনুতে ও যাজ্ঞবল্ক্যে একই উক্তি দৃষ্ট হয়। যথা,—"সাহসেষু চ সর্ব্বেষু স্তেয়সংগ্রহণেষু চ। বাগ্দণ্ডয়োশ্চ পারুষ্যে ন পরীক্ষেত সাক্ষিণঃ ॥" মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সাক্ষীর অধিকার বিষয়ে যাহা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, অর্থশাস্ত্রে তাহার অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। কোন্ ব্যক্তি সাক্ষী দিবার অধিকারী, কোন্ ব্যক্তি অধিকারী নহে এবং কিরূপ সাক্ষীর প্রমাণ বিচারকের গ্রহণীয় হইবে, তৎসম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রে একটী বিস্তৃত বিবরণ বিধিবদ্ধ আছে। তাহাও স্মৃত্যাদির অনুরূপ। অর্থশাস্ত্র মতে, 'যাহারা সহায়, যাহারা আবদ্ধ বা বন্দী, যাহারা আতক অর্থাৎ 'ঋণী', যাহারা অর্থসম্বন্ধে অর্থীর সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত, যাহারা বৈরী, যাহারা ন্যঙ্গ অর্থাৎ অন্নদাস, যাহারা ধৃতদণ্ড অর্থাৎ শাস্তিপ্রাপ্ত,—তাহারা সাক্ষী দিবার অধিকারী নহে। এতদ্ব্যতীত, রাজা, শ্রোত্রিয় অর্থাৎ বেদপারগ, গ্রামভৃত অর্থাৎ ভিক্ষান্ন-জীবী, কুষ্ঠি ও ব্রণী অর্থাৎ কুষ্ঠ ও ক্ষত-রোগগ্রস্ত ব্যক্তি, পতিত অর্থাৎ সমাজ হইতে বিতাড়িত ব্যক্তি, চণ্ডাল, অহংবাদী, স্ত্রীলোক, রাজপুরুষ বা রাজ-কর্ম্মচারী, শ্যাল (শ্যালক) বা স্ত্রীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তি—অর্থশাস্ত্র মতে, ইঁহারা কেহই বিচারালয়ে সাক্ষী দিবার অধিকারী নহেন। তবে, পারুষ্য, স্তেয় ও সংগ্রহণ প্রভৃতি ফৌজদারী-সংক্রান্ত বিবাদে স্ত্রী-সম্পর্কিত ব্যক্তি ও সহায় সকলেই সাক্ষ্য দিতে পারেন। ফৌজদারী সংক্রান্ত ব্যবহারে সাক্ষীর অনধিকার অধিকার বিচারের আবশ্যকতা নাই,—অর্থশাস্ত্রকার সে ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। অপিচ, স্ত্রী হউন বা পুরুষ হউন, যাঁহারা বিবাদীয় বিষয় অবগত আছেন, উল্লিখিত স্তেয়-পারুষ্যাদি বিবাদে তাঁহারা সকলেই সাক্ষ্য দিবার অধিকারী। কেবল-মাত্র রাজা ও তাপস—এই নিয়মের বহির্ভূত। আধুনিক কালেও রাজা সাক্ষী-শ্রেণীভুক্ত হন না। তবে রাজকর্ম্মচারিগণ এবং রাজ-ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ—আবশ্যক অনুসারে সকলেরই বিচারালয়ে সাক্ষ্য দিবার ব্যবস্থা অধুনা প্রচলিত আছে। *

---

* ইংরেজ-রাজ-প্রবর্ত্তিত বিধানেও এ সকল বিষয় দৃষ্ট হয়। সাক্ষীর গুণাগুণ সম্বন্ধে 'সাক্ষী বিষয়ক আইনে' স্পষ্টতঃ লিখিত আছে,—"All persons shall be competent to testify unless the Court con-

বিচারালয়ে বিচারকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া সাক্ষ্য দিবার পদ্ধতি যেমন আধুনিক-কালে বিহিত আছে; সে পদ্ধতি প্রাচীনকালেও সেইরূপ ভাবে প্রচলিত ছিল। মন্বাদি সংহিতায় সে বিধি দৃষ্ট হয়। তার পর সাক্ষীদিগের সত্যপাঠের ব্যবস্থা। আধুনিক-কালে

সত্য-পাঠ।

এবং প্রাচীন-কালে একইরূপ বিধানের পরিচয় পাই। অর্থশাস্ত্রেও সে ব্যবস্থা আছে। বিচারকের সম্মুখে 'কাঠগড়ায়' দাঁড়াইয়া এখন যেমন সাক্ষীদিগকে বলিতে হয়,—"আমি যাহা বলিব, সকলই সত্য হইবে; সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলিব না"; প্রাচীন-কালের ব্যবহার-বিধানে শাস্ত্রাদিতে তদনুরূপ বিধি বিধিবদ্ধ আছে। তবে অধুনা-প্রচলিত প্রথার সহিত তুলনায় প্রাচীনকালের পদ্ধতিতে একটু প্রকারভেদ দৃষ্ট হয়। এখন জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলকেই একরূপ সত্যে আবদ্ধ করা হয়। কিন্তু প্রাচীনকালের পদ্ধতি সেরূপ নহে। তখন বিভিন্ন জাতিকে বিভিন্ন সত্যে আবদ্ধ হইতে হইত। প্রথমে ব্রাহ্মণ, তৎপরে ক্ষত্রিয়, তাহার পর বৈশ্য এবং সর্ব্বশেষে শূদ্র সত্যে আবদ্ধ হইতেন। এইরূপ ক্রমপর্য্যায়েই সাক্ষ্য গৃহীত হইবার নিয়ম ছিল। অর্থশাস্ত্র-গ্রন্থে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ভেদে বিভিন্ন প্রকার সত্যপাঠের বিষয় উক্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, উদকুম্ভ ও অগ্নি সম্মুখে রাখিয়া সত্যপাঠ করিবেন,—এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। ব্রাহ্মণ সাক্ষী হইলে তাঁহাকে বলা হইত,—'আপনি সত্য বলুন।' ক্ষত্রিয়ের এবং বৈশ্যের সত্যপাঠ অন্যরূপ, যথা,—'যদি তোমার সাক্ষী মিথ্যা হয়, তাহা হইলে তোমার অর্জ্জিত পুণ্য নষ্ট হইয়া যাইবে। নরকপাল-নির্ম্মিত ভিক্ষাপাত্র-হস্তে তোমাকে তোমার শত্রুর নিকট ভিক্ষা-প্রার্থনা করিতে হইবে।" শূদ্রকে বলা হইত,—'মিথ্যা কথা বলিলে তোমার সকল ধর্ম্ম নষ্ট হইবে; তোমার মৃত্যুর পর রাজা তোমার অর্জ্জিত সকল পুণ্যের ফলভাগী হইবেন; রাজার পাপের ভাগ তুমি গ্রহণ করিবে। অধিকন্তু তোমার প্রতি কঠোর দণ্ডের বিধান হইবে।' এইরূপে সত্যাবদ্ধের পর বিরোধীয় বিষয় সম্বন্ধে সাক্ষিদিগের বক্তব্য শ্রবণের ব্যবস্থা। উপস্থিত বিবাদ সম্বন্ধে সাক্ষিগণ কি দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিবার বিধান অর্থ-শাস্ত্রকার প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে অর্থ-শাস্ত্রের উক্তি; যথা,—

"ব্রাহ্মণোদকুম্ভাগ্নিসকাশে সাক্ষিণঃ পরিগৃহ্ণীয়াৎ। তত্র ব্রাহ্মণং ব্রূয়াৎ 'সত্যং ব্রূহীতি'; রাজন্যং বৈশ্যং বা 'মা তবেষ্টাপূর্ত্তফলং কপালহস্তঃ শত্রুবলং ভিক্ষার্থী গচ্ছে'রিতি। শূদ্রজন্ম 'মরণান্তরে যদ্বঃ পুণ্যফলং তদ্রাজানং গচ্ছেৎ। রাজ্ঞশ্চ কিল্বিষং যুষ্মান্ অন্যথাবাদে দণ্ডশ্চানুবন্ধঃ। পশ্চাদপি জ্ঞায়েৎ যথাদৃষ্টশ্রুতম।"

---

siders that they are prevented from understanding the questions put to them or to give *rational* answers to those questions, by tender years, extreme old age, disease, whether of body or mind, or any other cause of the same kind." Vide, *Indian Evidence Act*, Section. 118. বাক্‌শক্তিবিহীন সাক্ষী এ বিধানে সাক্ষ্য দিবার উপযুক্ত। মুখে বলিবার ক্ষমতা না থাকিলে সে লিখিয়া সাক্ষ্য দিবার অধিকারী। ভারতীয় সাক্ষী বিষয়ক আইনে এ বিষয় বিধিবদ্ধ আছে; যথা,—"A witness who is unable to speak may give his evidence in any other manner in which he can make it intelligible, as by writing, or by sign; but such writing must be written or the signs made, in open court. Evidence so given shall be deemed to be oral evidence.—Section 119.

এই সত্যপাঠ প্রসঙ্গে মনুসংহিতায় নিম্নরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। মনু (অষ্টম অধ্যায়) বলিয়াছেন,—"দেবব্রাহ্মণসান্নিধ্যে সাক্ষ্যং পৃচ্ছেদৃতং দ্বিজান্। উদঙ্মুখান্ প্রাঙ্মুখান্ বা পূর্ব্বাহ্ণে বৈ শুচিঃ শুচীন্॥ ব্রূহীতি ব্রাহ্মণং পৃচ্ছেৎ সত্যং ব্রূহীতি পার্থিবম্। গোবীজকাঞ্চনৈর্বৈশ্যং শূদ্রং সর্ব্বৈস্তু পাতকৈঃ॥ ব্রহ্মঘ্নে যে স্মৃতা লোকা যে চ স্ত্রীবালঘাতিনঃ। মিত্রদ্রুহঃ কৃতঘ্নস্য তে তে স্যুর্ব্রুবতো মৃষা॥ জন্মপ্রভৃতি যৎকিঞ্চিৎ পুণ্যং ভদ্র ত্বয়া কৃতম্। তৎ তে সর্ব্বং শুনো গচ্ছেদ্‌যদি ব্রূয়াস্ত্বমন্যথা॥" অর্থাৎ,—প্রাড়বিবাক শুচি হইয়া পূর্ব্বাহ্নকালে দেবতা-প্রতিমা-সন্নিধানে অথবা ব্রাহ্মণ-সমীপে শুচি দ্বিজগণকে সাক্ষ্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন। সেই সাক্ষীরা সে সময়ে উত্তর বা পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া থাকিবেন। ব্রাহ্মণগণকে 'বল', ক্ষত্রিয়কে 'সত্য করিয়া বল', বৈশ্যকে 'গো বীজ ও সুবর্ণ দ্বারা শপথ করিয়া বল' ও শূদ্রকে 'সমুদয় পাতকের দ্বারা শপথ করিয়া বল'—বর্ণবিশেষে প্রাড়বিবাক সাক্ষীদিগকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিবেন। ব্রাহ্মণ-হন্তা, বালক-হন্তা, মিত্রদ্রোহী ও কৃতঘ্নের যে যে লোক প্রাপ্তি শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে, সাক্ষ্যস্থলে মিথ্যা বলিলে সেই সেই লোক প্রাপ্তি হয়। হে ভদ্র! জন্মাবধি তুমি যে কিছু পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছ, সে সমুদায় পুণ্য কুক্কুরে গমন করিবে, যদি তুমি সাক্ষ্যস্থলে মিথ্যা বল। ইত্যাদি। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও এইরূপ দিব্যের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় দিব্য-প্রকরণে তাহার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। বিষ্ণু-সংহিতায়ও (অষ্টম অধ্যায়) সাক্ষিদিগের দিব্য সম্বন্ধে অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। সাক্ষিগণ যদি ধর্ম্মঘট করিয়া এক সপ্তাহের মধ্যে সত্য কথা ব্যক্ত না বলে, তাহা হইলে, অর্থশাস্ত্র মতে, সেই সকল সাক্ষীর বার পণ অর্থদণ্ড হইবে। অপিচ, তাহারা যদি এক পক্ষের মধ্যে বিচারালয়ে উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে দাবীকৃত বিষয় সাক্ষিদিগের নিকট আদায় লইবার ব্যবস্থা অর্থশাস্ত্রকার প্রদান করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্যে এই দিন-পরিমাণের কিছু আধিক্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু মনুতে এ বিষয়ের বিশেষ কোনও উল্লেখ নাই। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—ষট্‌চত্বারিংশ দিবস মধ্যে যদি সাক্ষিগণ সাক্ষ্য প্রদান না করে, তাহা হইলে তাহাদের নিকট হইতে সুদসমেত দাবী আদায় করা যাইতে পারিবে।

ব্যবহার ক্রম।

কোন্ পক্ষের সাক্ষী প্রথম গ্রহণযোগ্য, প্রথমে কোন্ পক্ষকে বিবাদ সপ্রমাণ করিতে হইবে,—তাহা বিচার্য্য। ভাষার্থ শ্রবণের পর প্রতিবাদী যাহা বলিবে, তৎসমস্ত বাদীর সম্মুখে লেখ্য। অনন্তর সাক্ষী প্রভৃতির দ্বারা বাদী আত্মপক্ষ স-প্রমাণ করিবেন। এস্থলে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে,—প্রতিবাদীর স-প্রমাণ উত্তর লেখনের পর, বাদী আত্মপক্ষ সমর্থন করিবে; না,—বাদীর ভাষার ন্যায় কেবলমাত্র প্রতিবাদীর উত্তর-লেখনের পর, সাক্ষী প্রভৃতি দ্বারা বাদী আত্ম-পক্ষ সমর্থন করিবে? এই সন্দেহ-নিরসনার্থ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—"সাক্ষিষূভয়তঃ সৎসু সাক্ষিণঃ পূর্ব্ববাদিনঃ। পূর্ব্বপক্ষেঽধরীভূতে ভবন্ত্যুত্তরবাদিনঃ।" অর্থাৎ,—উভয় পক্ষের সাক্ষী উপস্থিত থাকিলে, প্রথম বাদীর সাক্ষিগণকে জিজ্ঞাসা করিবে; কিন্তু বাদীর পক্ষ দুর্ব্বল হইলে, প্রতিবাদীর সাক্ষিগণকেই প্রথমে জিজ্ঞাসা করিবে।' বিষ্ণুরও ঐরূপ ব্যবস্থা। তিনি বলিয়াছেন,—"দ্বয়োর্ব্বিবদমানয়োর্যস্য পূর্ব্ববাদস্তস্য সাক্ষিণঃ প্রষ্টব্যাঃ। আধর্ষ্যং

কার্য্যবশাদ্‌যত্র পূর্ব্বপক্ষস্য ভবেৎ তত্রপ্রতিবাদিনোঽপি॥" বিবাদকারী দুই পক্ষের মধ্যে যাহার পূর্ব্ববাদ অর্থাৎ যে বাদী, তাহার সাক্ষিগণকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করিবে। আর কার্য্যবশতঃ যেখানে পূর্ব্বপক্ষের হীনতা হয়, সেখানে প্রতিবাদীর সাক্ষিগণকে জিজ্ঞাসা করিবে। মিতাক্ষরায়ও এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। মিতাক্ষরায় দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টী বুঝান হইয়াছে। সে মতে, উভয় পক্ষের সাক্ষিগণ উপস্থিত থাকিলে যিনি বলিতেছেন, 'এতকাল পূর্ব্বে আমাকে অমুকে ইহা দান করিয়াছে, এতদিন আমি ইহা ভোগ করিয়া আসিতেছি'—তাঁহার সাক্ষিগণকেই প্রথমে জিজ্ঞাসা করিবে। আবার, অপর ব্যক্তি বা প্রতিপক্ষ যদি পূর্ব্বেই বলিয়া থাকেন যে, 'পূর্ব্বে এ সম্পত্তি বিবাদীর ছিল, এক্ষণে এই কারণে আমার হইয়াছে; তাহা হইলে এই ব্যক্তির সাক্ষিগণকেই প্রথমে জিজ্ঞাসা করিবে, অর্থাৎ পূর্ব্ব-পক্ষ তাহার বক্তব্য প্রমাণ করিলে পর উত্তর-পক্ষের সাক্ষী লইবার নিয়ম। মহর্ষি নারদের মত এই সকল মতের সহিত অভিন্ন। তবে এ সকল বিষয়ে সংহিতামতে পক্ষাভাষ, নিহ্নব, প্রত্যবস্কন্দন, প্রাঙ্‌ন্যায় প্রভৃতির বিচার করা আবশ্যক। পক্ষাভাষের বিষয় একমাত্র যাজ্ঞবল্ক্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল ভাষা (আরজী বা অভিযোগের বিষয়) ভাষাবৎ প্রতীয়মান হইলেও উহা প্রকৃতপ্রস্তাবে ভাষা নহে, তাহাই পক্ষাভাষ। যাজ্ঞবল্ক্য-মতে পক্ষাভাষ ছয় প্রকার; যথা,—"অপ্রসিদ্ধং নিরাবাধং নিরর্থং নিষ্প্রয়োজনং। অসাধ্য বা বিরুদ্ধং বা পক্ষাভাসং বিবর্জ্জয়েৎ॥" প্রথম—অপ্রসিদ্ধ পক্ষাভাষ; যেমন, রাম আমার আকাশকুসুম লইয়াছে, দিতেছে না। দ্বিতীয়—নিরাবাধ পক্ষাভাষ; যেমন, আমার ঘরের দীপালোকে রাম কার্য্য করে। তৃতীয়—নিরর্থ পক্ষাভাষ, অর্থাৎ যাহার কোনও অর্থ হয় না; যেমন, কডম্বুবচুনরিত, হরকরকম্ব ইত্যাদি। চতুর্থ—নিষ্প্রয়োজন পক্ষাভাষ; যেমন, রাম আমার বাড়ীর নিকট অধ্যয়ন করে। পঞ্চম—অসাধ্য পক্ষাভাষ; যেমন, শ্যাম আমাকে দেখিয়া হাসিয়াছিল। ষষ্ঠ—বিরুদ্ধ পক্ষাভাষ—যেমন, রাম আমাকে গালিগালাজ করিয়াছে। এই সকল পক্ষাভাষের বিষয় ব্যবহার আমলে আসিতে পারে না এবং ব্যবহারের বিষয় হয় না। সুতরাং বিচার-কালে বিচারক তৎপ্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিবেন। অন্যপক্ষে, প্রত্যর্থী যদি 'নিহ্নব' করে, অর্থাৎ অর্থীর দাবীকৃত সমস্ত বিষয় অস্বীকার করে, আর অর্থী যদি তাহার কিয়দংশ সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হয়; তাহা হইলে বিচারক অর্থীকে তাহার দাবীকৃত সমস্ত বিষয় প্রত্যর্থীকে দেওয়াইতে বাধ্য করিবেন। এ বিষয়ে বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্য উভয়েই একমত। যাজ্ঞবল্ক্যে (যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭ম শ্লোক) যথা,—

"নিহ্নুতে লিখিতং নৈকমেকদেশবিভাবিতঃ।
দাপ্যঃ সর্ব্বং নৃপেণার্থং ন গ্রাহ্যস্বনিবেদিতঃ॥"

অর্থাৎ,—'প্রতিবাদী যদি বলে আমি কিছুই লই নাই, এমত স্থলে যদি অপলাপিত দ্রব্য সকলের মধ্যে অন্ততঃ একটী দ্রব্যও প্রতিবাদীর নিকট প্রাপ্য বলিয়া সপ্রমাণ হয়; তাহা হইলে রাজা বাদীর লিখিত সকল বস্তুই প্রতিবাদীর নিকট হইতে দেওয়াইবেন। কিন্তু বাদী ভাষাকালে যে বস্তুর উল্লেখ করে নাই অথচ তৎপরে করিয়াছে, তাহা আর দেওয়া যাইবে না।' মহর্ষি বিষ্ণুও বলিয়াছেন,—"সর্ব্বাপলাপোক-

দেশবিভাবিতোঽপি সর্ব্বং দত্তাৎ।" অর্থাৎ,—যে অধমর্ণ সকল ঋণের অপলাপ করে, উত্তমর্ণ তৎসমস্তের কিয়দংশের প্রমাণ করিলে, উত্তমর্ণ-কথিত সমস্ত ঋণ অধমর্ণ পরিশোধ করিতে বাধ্য হইবে।' প্রত্যবস্কন্দন সম্বন্ধে সংহিতা-শাস্ত্রে বিশেষ কিছু উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। তবে প্রত্যবস্কন্দন হইতে এই বুঝা যায় যে, দাবীকৃত বিষয় স্বীকার করিয়া, প্রত্যর্থী যুক্তিযুক্ত উত্তর দ্বারা আপনাকে দাবী হইতে মুক্ত করিতে পারে। দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টী বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। রামের পিতা শ্যামের নিকট হইতে ঋণ করিয়াছে। রামের পিতার মৃত্যু হওয়ায় শ্যাম, রামের নিকট হইতে পিতৃঋণ আদায়ের জন্য নালিশ করিল। রাম যদি প্রমাণ করাইতে পারে যে, তাহার পিতা শ্যামের নিকট হইতে যে ঋণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃত বটে; তবে উহা 'মাক্ষিক' ঋণ বলিয়া রাম ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য নয়; তাহা হইলে রামের এই উত্তর 'প্রত্যবস্কন্দন' অভিধায়ে অভিহিত হইতে পারে। কিন্তু রাম যদি তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে সে ঋণদায় হইতে মুক্ত হইবে না। অতঃপর 'প্রাঙ্‌ন্যায়ের' বিষয়। ইহা আধুনিক আইনের একটী বিশেষ বিধি। একবার যে বিরোধীয় বিষয় নিষ্পত্তি হইয়াছে, পুনরায় তদ্বিষয়ে বাদী আর বিবাদীর বিরুদ্ধে মকদ্দমা উত্থাপন করিতে পারিবে না,—প্রাঙ্‌ন্যায়ের ইহাই তাৎপর্য্য। *

* প্রত্যবস্কন্দন—ইংরেজী ভাষায় Admission and Avoidance বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রাঙ্‌ন্যায়—*Res Judicata* অর্থাৎ পূর্ব্ব-মীমাংসিত বিষয়ে পুনরায় ব্যবহার-স্থাপনে নিষেধাদেশ। দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের (Civil Proceduce Code) ১১শ ধারায় (Sec. 11) আছে,—"No Court shall try any suit or issue in which the matter directly or substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties, or between parties under whom they or any of them claim, litigating under the same title, in a Court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised, and has been heard and finally decided by such Court."

একবার যাহা মীমাংসিত হইয়াছে, পুনরায় সে সংক্রান্ত বিবাদ চলিবে না—প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণেরও ইহাই অভিমত। সে ব্যবস্থা-প্রসঙ্গে মহর্ষি নারদ বলিয়াছেন,—

"নির্ণীতে ব্যবহারে তু প্রমাণমফলং ভবেৎ। লিখিতং সাক্ষিণো বাপি পূর্ব্বমাবেদিতং ন চেৎ॥
যথা পক্কেষু ধান্যেষু নিষ্ফলাঃ প্রাবৃষোগুণাঃ। নির্ণীতব্যবহারাণাং প্রমাণমফলা তথা॥"

ব্যবহার একবার নির্ণীত হইলে পুনরায় তৎসম্বন্ধে প্রমাণ-প্রয়োগ নিষ্ফল। সাক্ষি দ্বারা বা লেখ্য সাহায্যে পূর্ব্ব-আবেদিত বিষয় প্রমাণ করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া থাকে। যেমন বর্ষার জলবর্ষণ পক্ক ধান্যের কোনও উপকারে আসে না; ব্যবহার একবার নির্ণীত হইয়া গেলে তৎসম্বন্ধে পুনরায় প্রমাণাদি প্রদানও সেইরূপ ফলোপধায়ক হয় না। কিন্তু এ বিষয়ে একটী আপত্তির কথা উঠিতে পারে। সে আপত্তি—বিচারকালীন যে বিষয়ের নিষ্পত্তি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পক্ষগণের অনবধানতা-বশতঃ বিচারকালে তাহা উত্থাপিত হয় নাই; সে সকল বিষয়ে কি ব্যবস্থা বিহিত হইবে? শ্যাম রামের নিকট ৫০০৲ টাকা পাইত। কিন্তু সে যদি প্রথমে উহার আংশিক দাবী সম্বন্ধে ব্যবহার উপস্থিত করে, তাহা হইলে পরে সে তাহার অবশিষ্ট দাবী লইয়া মকদ্দমা স্থাপন করিতে পারিবে কি না। কিন্তু ব্যবহার-শাস্ত্র সকল কালেই সকল অবস্থায়ই বলিয়াছেন,—"ক্রিয়াং বলবতীং মুক্ত্বা দুর্ব্বলং যোঽবলম্বতে। স জয়েঽবধৃতে সভ্যৈঃ পুনস্তাং নাপ্নুয়াৎ ক্রিয়াং॥" অর্থাৎ,—কোনও অবস্থাতেই পূর্ব্ব-মীমাংসিত বিষয়-সম্পর্কে পুনর্ব্যবহার উপস্থিত হইতে পারিবে না। এই অনধিকার বিষয়ে

অর্থীর ও প্রত্যর্থীর উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্যে উল্লিখিত বিষয় সকল বিচার করিবার বিধি-শাস্ত্রকারগণ বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বিচার-কালে উত্তরাদিরও দোষগুণ বিচার করা বিচারকগণের এক প্রধান কর্ত্তব্য। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—'অসন্দিগ্ধ, অনাকুল, অব্যাখ্যান, অগম্য প্রভৃতি দোষে দুষ্ট হইলে তাহা অসদুত্তর মধ্যে পরিগণিত হইবে। এরূপ হইলে সে উত্তর গ্রহণীয় নহে। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে নিম্নে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইল। যথা,—

"পক্ষস্থ ব্যাপকং সারমসন্দিগ্ধমনাকুলম্। অব্যাখ্যানগম্যমেতদুত্তরং তদ্বিদো বিদুঃ॥
প্রস্তুতাদল্পমব্যক্তং ন্যূনাধিকমসঙ্গতং। অব্যাপ্যসারং সন্দিগ্ধং প্রতিপক্ষং ন লঙ্ঘয়েৎ॥
সন্দিগ্ধমন্যৎ প্রকৃতাদল্পমিতি চ ভূরি চ। পক্ষৈকদেশব্যাপ্যেব তত্তু নৈবোত্তরং ভবেৎ॥
যদ্ব্যস্তপদমব্যাপি নিগূঢ়ার্থং তথাকুলম্। ব্যাখ্যাগম্যমসারঞ্চ নোত্তরং স্বার্থসিদ্ধয়ে॥
পক্ষৈকদেশে যৎ সত্যমেকদেশে চ কারণং। মিথ্যাচৈকদেশে স্যাৎ সঙ্করাত্তদনুত্তরং॥"

ভাষা সম্বন্ধে যেমন বিবিধ দোষ-গুণের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, উত্তর সম্বন্ধেও তদনুরূপ

দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ১১ ধারা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। ঐ ধারা বিষয়ে অপরাপর যে সকল মন্তব্য আছে। নিম্নে তাহার কয়েকটী উদ্ধৃত করা গেল। তাহাতে বিষয়টী বেশ বোধগম্য হইবে; যথা—

Explanation I.—The expression 'former suit' shall denote a suit which has been decided prior to the suit in question whether or not it was instituted prior thereto.

Explanation II.—The matter above referred to must in the former suit have been alleged by one party and either decided or admitted expressly or impliedly by the other.

Explanation IV.—Any matter which might or ought to have been made ground of defence or attack in such former suit shall be deemed to have been a matter directly and substantialy in issue in such suit.

Explanation V.—Any relief claimed in the plaint, which is not expressly granted by the decree, shall, for the purposes of this section, be deemed to have been refused.

কোনও কোনও বিষয়ে সংহিতা-শাস্ত্রে এ বিষয়ের ব্যতিক্রম দেখা যায়। গ্রামবৃদ্ধগণ বা কুলশ্রেণীকগণ যে বিচার করিতেন, সে সম্বন্ধে পুনর্ব্বার ব্যবহার উপস্থাপিত করিবার বিধি নারদ প্রদান করিয়াছেন। স্বয়ং রাজার বিচারেও এই ব্যবস্থা দেখা যায়। রাজার বিচার যদি ঠিক থাকে, তাহা হইলে দাবীকৃত বিষয়ের দ্বিগুণ দণ্ড প্রদান করিবার অঙ্গীকারে পক্ষগণ মীমাংসিত বিষয়ে পুনরায় বিবাদ সংস্থাপন করিতে পারিতেন। আর একটী বিষয়ে পুনর্ব্যবহারের বিষয় শাস্ত্রাদিতে দৃষ্ট হয়। সেটী বিচারকের দোষে বা পক্ষপাতিতায় যদি কেহ পরাজিত হয়, আর পক্ষ যদি সেই দোষ সপ্রমাণ করে, তাহা হইলে সে বিষয় সম্পর্কে পুনর্ব্বিচারের ব্যবস্থা শাস্ত্রাদিতে দেখা যায়। তবে কোনও পক্ষ যদি আপনার দোষে পরাজিত হইত, তাহা হইলে তাহার উপস্থাপিত ব্যবহারের আর পুনর্ব্বিচার চলিত না। এতদ্ভিন্ন স্ত্রীলোক, মত্ত বা উন্মত্ত, আর্ত্ত, ব্যসনী, বালক প্রভৃতি কর্তৃক উৎপাদিত ব্যবহার বিচার আসনে আসা নিষিদ্ধ ছিল। এতদংশের উক্তি আপিল সংক্রান্ত ব্যবস্থার ন্যায়। সাক্ষী প্রভৃতির দোষে কোনরূপ অবিচার হইয়াছে বলিয়া যদি পক্ষের মনে ধারণা হইত, আর পক্ষ যদি তাহা সপ্রমাণ করিতে পারিত, তাহা হইলেও পূর্ব্ব-নিষ্পন্ন বিষয়ের পুনর্ব্বিচার হওয়ার ব্যবস্থা ছিল। বিবাদী বাদীর নামে প্রত্যভিযোগ (Cross case) উপস্থিত করিতে পারিত। সে বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। অধুনা-প্রচলিত ব্যবহার-শাস্ত্রেও তাহার বিধান আছে।

বিধি, শাস্ত্রকারগণ বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভাষা যেমন অর্থসংযুক্ত, পরিপূর্ণ, অনাকুল, স্পষ্ট, নিরলঙ্কার, অবিরুদ্ধ, অসম্বদ্ধ, নিশ্চিত ও প্রমাণযোগ্য হওয়া আবশ্যক; উত্তরও সেইরূপ অর্থসংযুক্ত, প্রমাণযোগ্য, সঙ্গত ও অসন্দিগ্ধ হওয়া প্রয়োজন। তাহা না হইলে নানাবিধ দোষসংযুক্ত উত্তর ধর্ম্মাধিকরণে গ্রহণীয় নহে। উত্তরে যে নানাবিধ দোষ সংক্রামিত হইতে পারে এবং তাহা দুরীকরণে অর্থীর ও প্রত্যর্থীর উভয়েরই যে চেষ্টা করা বিধেয়, শাস্ত্রকারগণ তাহা মুক্তকণ্ঠে কহিয়া গিয়াছেন। অতি প্রাচীন শাস্ত্র-গ্রন্থ মন্বাদি সংহিতায় এ সকল বিষয়ে বিশেষ বিধি বিধিবদ্ধ হয় নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী সংহিতা প্রভৃতিতে ইহার বিশেষ বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। নারদাদি ঋষিগণের যে সকল বচন পরবর্ত্তী সংহিতা-সমূহে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে ব্যবহার-শাস্ত্র-সম্পর্কীয় এ সকল বিষয় বেশ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। সংহিতাকারগণ উত্তরের দোষ-প্রদর্শন-ব্যপদেশে বলিয়াছেন;—

"অন্যার্থমর্থহীনঞ্চ প্রমাণাগমবর্জ্জিতম্। লেখ্যং হীনাধিকং ভ্রষ্টং ভাষাদোষাস্তদাহৃতা।
লব্ধব্যং যেন যদ্যস্মাৎ স তত্তস্মাদবাপ্নুয়াৎ। ন তু অন্যোন্যমথাঽস্যস্মাদিত্যন্যার্থমিদং ত্রিধা॥
মনসাঽপি ধ্যাতস্তন্মিত্রেণেহ শক্রবৎ। অতোঽনয়া মহাক্ষান্ত্যাত্বমিহাবেদিতো ময়া॥
দ্রব্যপ্রমাণহীনং যৎ পুলাকাশ্রয়বর্জিতম্। প্রমাণবর্জিতং নাম লেখ্যদোষং তমুৎসৃজেৎ॥
আগমবর্জ্জিতং দোষং পূর্ব্ববাদে বিসর্জ্জয়েৎ।
বিন্দুমাত্রবিহীনা বা পদবর্ণবিদুষ্টা বা। হীনাধিকা ভবেদ্ব্যর্থা তাং যত্নেন বিবর্জয়েৎ॥
ভ্রষ্টং তু দুঃখিতং যৎস্যাজ্জলতৈলাদিভির্হতম্। ভাষায়াং তদপি স্পষ্টং বিস্পষ্টার্থং বিসর্জ্জয়েৎ॥
সত্যা ভাষা ন ভবতি যদ্যপি স্যাৎ প্রতিষ্ঠিতা। বহিশ্চেদ্ভ্রশ্যতে ধর্ম্মান্নিয়তাদ্ব্যবহারিকাৎ॥
গন্ধমাদনসংস্থস্য ময়াস্যাদাসীত্তদর্পিতম্। ব্যবহারিকধর্ম্মস্য বাহ্যমেতন্নসিধ্যতি॥
অন্যাক্ষরনিবেশেন অন্যার্থগমনেন চ। আকুলং চ ক্রিয়াদানং ক্রিয়া চৈবাকুলা ভবেৎ॥"

পক্ষগণের বিবাদীয় বিষয় ভিন্ন উত্তরে অবান্তর বিষয়ের সংযোজনা হইলে অথবা অর্থহীন বাক্যের সমাবেশ থাকিলে, সে উত্তর অপ্রামাণ্য—বিচারালয়ে গ্রহণযোগ্য নহে। প্রমাণযোগ্য বিষয়ের অসমাবেশেও উহা গ্রহণযোগ্য হয় না। দ্রব্যপরিমাণবিহীন অর্থাৎ দাবীকৃত বিষয়ের অনুল্লেখ, পুলকাশ্রয়বর্জ্জিত, প্রমাণবিরহিত লেখ্য পরিত্যাজ্য। পরন্তু পূর্ব্ববাদে যদি শাস্ত্রবর্জ্জিত দোষ-সমূহের সমাবেশ থাকে, তাহা হইলে তাহাও পরিত্যাগ করিবে। উত্তরকালীন যে সকল ভাষা প্রভৃতির ব্যবহার হয়, তাহা যদি বিন্দুমাত্রহীন, পদবর্ণবিদুষ্ট হয় এবং তাহাতে যদি হীনাধিক ও ব্যর্থসংযুক্ত পদের ব্যবহার থাকে, তাহা হইলে তাহাও পরিবর্জ্জনীয়। জল-তৈলাদি হত, ভ্রষ্ট, বিস্পষ্টার্থ এবং অবিশুদ্ধভাষাযুক্ত লেখ্যও অব্যবহার্য্য। উত্তর যদি এই সকল দোষে দুষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহা পরিত্যাগ করিবার ব্যবস্থা শাস্ত্রকারগণ প্রদান করিয়া গিয়াছেন।* তবে এ সকল নিয়মেরও ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। পরে যখন এই

---

১ এই অংশকে এবং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী অংশ সমূহকে কেহ কেহ 'দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের' প্লিডিং (Pleading) সংক্রান্ত অধ্যায়ের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে, সংহিতোক্ত বচনসমূহ প্লিডিং সংক্রান্ত বাক্যের সহিত সাদৃশ্য-সম্পন্ন। দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ঐ অংশ হইতে আমরা দুই একটী বিষয় নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। তাহার সহিত মিলাইয়া দেখিলে বিষয়টী বেশ বুঝা যাইবে। যথা,—"Pleading

সকল বিষয় লইয়া তর্ক-বিতর্ক উঠে,—প্রাঙ্‌ন্যায়, প্রত্যবস্কন্দন প্রভৃতি এবং দাবীকৃত বিষয়ের আংশিক স্বীকার বা অস্বীকার, এরূপ ব্যবহার বিধিসঙ্গত কি না; তখন ক্রমশঃ পরিবর্ত্তনের ধারা উপলব্ধি হয়। অর্থযুক্ত ও ধর্ম্মসঙ্গত এবং পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ উত্তরই ব্যবস্থা-সঙ্গত। তবে যেখানে উত্তর সঙ্কীর্ণ বা প্রভূতার্থজ্ঞাপক, সেখানে প্রধান বিষয়টীই প্রথম বিচার্য্য। এতদ্ব্যতীত উত্তরের যাথার্থ্য অযাথার্থ্য নির্ণয় করাও বিধি। কেবল-মাত্র সত্য নির্ণন করাই প্রাচীন ব্যবহার-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য; আর সেই উদ্দেশ্য-সাধন-কল্পেই

---

shall mean plaint or written statement. (2) Every pleading shall contain, and contain only, a statement in a coincise form of the material facts on which the party pleading relies for his claim or defence, as the case may be,......Dates, sums and numbers shall be expressed in figures. (7) No pleading shall, except by way of amendment, raise any new ground of claim or contain any allegation of facts inconsistent with the previous pleadings of the party pleading the same."

"(1) Every suit shall, as far as practicable, be framed so as to afford ground for final decision upon the subjects in dispute and to prevent further litigation concerning them. 2 (i) Every suit shall include the whole of the claim which the plaintiff is entitled to make in respect of the cause of action; but a plaintiff may relinquish any portion of his claim in order to bring the suit within the jurisdiction of any court. (ii) Where a plaintiff omits to sue in respect of or intentionally relinquishes, any portion of his claim, he shall not afterwards sue is respect of the portion so omitted or relinquished. (iii) A person entitled to more than one relief in respect of the same cause of action may sue for all or any of such reliefs; but if he omits, except with the leave of the court, to sue for all such reliefs, he shall not afterwards sue for any relief so omitted."

"The plaint shall contain the following particulars:—(a) the name of the Court in which the suit is brought; (b) the name, description and place of residence of the plaintiff; (c) the name, description and place of residence of the defendant, so far as they can be ascertained; (d) where the plaintiff or the defendant is a minor or a person of unsound mind, a statement to that effect; (e) the facts constituting the cause of action and when it rose; (f) the fact showing that the court has jurisdiction; (g) the relief the plaintiff claims. &c.

"The plaint shall be rejected in the following cases:—(a) Where it does not disclose a cause of action; (b) Where the relief claimed is undervalued, but the plaint is written upon paper insufficiently stamped &c.; (c) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by law." &c.

এতদ্ভিন্ন আরও অনেক বিষয় দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের 'প্লিডিং'-সংক্রান্ত বিধানে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক বিষয়ে প্রাচীন বিধি-বিধান-সমূহের সহিত তাহার সাদৃশ্য আছে। কিন্তু বাহুল্য ভয়ে এস্থলে তাহা উল্লিখিত হইল না।

শাস্ত্রকারগণের যত কিছু প্রয়াস। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তদুদ্দেশ্য সাধন জন্ম তাই বলিয়াছেন,—

"ছলং নিরস্য ভূতেন ব্যবহারান্ নয়েন্নৃপঃ।
ভূতমপ্যনুপন্যস্তং হীয়তে ব্যবহারতঃ॥"

অর্থাৎ,—'বিচারক বাদী-প্রতিবাদীর প্রমাণাদি কথিত বিষয় নিরাকরণ পূর্ব্বক ব্যবহার-কার্য্যকে উদ্‌ঘাটিত সত্যের সহিত যোজিত করিবেন। কারণ, প্রকৃত সত্য বিষয়ও অনুপন্যস্ত থাকিলে ব্যবহারে হীন হইয়া থাকে।' তবে সকল স্থলেই যে একমাত্র শাস্ত্রবর্ণিত বিধি অনুসৃত হইবে, তাহা নহে; যুক্তি প্রভৃতিও কোনও কোনও স্থলে বিচার্য্য। বর্ণধর্ম্ম, জনপদধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম এবং লোকাচার প্রভৃতিও বিবেচ্য। ধর্ম্ম-শাস্ত্রের সহিত যুক্তি প্রভৃতির সমন্বয়-সাধন করিয়া বিচার করাই বিধেয়। শাস্ত্রকার তাই বলিয়াছেন,—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনিশ্চয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥"

সাক্ষী লেখ্যাদি বিবিধ বিভিন্ন প্রমাণ গ্রহণান্তর বিচারকগণ সিদ্ধি বা জয়পত্র প্রদান করিবেন। বিচারকালে তাঁহাদিগকে পূর্ব্বোল্লিখিত ভাষা, উত্তর প্রভৃতির দোষ-গুণ বিচার করা একান্ত প্রয়োজন। শাস্ত্রকারগণ সকলেই সে বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন। অর্থশাস্ত্রকারও বিচার-বিষয়ে বিবিধ দোষ-গুণ পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধি বা জয়পত্র দিবার বিধি বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

সিদ্ধি।

তাঁহার মতে যেখানে সাক্ষীদিগের উক্তি পরস্পর-বিরুদ্ধ, সেখানে অধিকাংশ 'শুচয়ঃ' ও 'অনুমতাঃ' সাক্ষীর উক্তির উপর নির্ভর করিতে হইবে। যাঁহারা পবিত্রচিত্ত এবং উভয় পক্ষের অনুমোদিত সাক্ষী, এরূপ ক্ষেত্রে সাক্ষীদ্বৈধ স্থলে, বিচারকগণ তাঁহাদের কথার উপরই বিশ্বাস স্থাপন করিয়া জয়পত্র প্রদান করিবেন। কিন্তু সাক্ষিগণের বিরুদ্ধ উক্তির বিষয় আলোচনা করিয়া বিচারক যদি মধ্যপন্থা অবলম্বনের আবশ্যকতা অনুভব করেন, তাহা হইলে সেই ভাবেই জয়পত্র দিবার বিধান অর্থশাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। যদি কোনরূপেই বিচারকগণ সাক্ষিদিগের বিরুদ্ধ উক্তির সমালোচনা করিয়া তাহার সামঞ্জস্য-সাধনে স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সমর্থ না হন, তাহা হইলে বিবাদীয় বিষয় রাজার প্রাপ্য হইবে। বাদীর দাবী যদি আংশিক সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে অবশিষ্ট অংশ রাজার প্রাপ্য। পক্ষান্তরে যদি সাক্ষিগণের উক্তিতে বাদীর প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক দাবী সপ্রমাণ হয়, অর্থাৎ বাদী যে স্থলে ১০০৲ এক শত টাকা দাবী করিয়াছেন, সাক্ষিগণ যদি প্রমাণ দ্বারা ২০০৲ দুই শত টাকা সাব্যস্ত করে; তাহা হইলে অতিরিক্ত অংশ রাজকোষে সঞ্চিত হইবে। নিকটবর্ত্তী সাক্ষিগণ অর্থাৎ যাহাদিগকে উপস্থিত করিতে বিশেষ আয়াস পাইতে হয় না, সেইরূপ সাক্ষিদিগকে পক্ষগণ বিচারালয়ে উপস্থিত করিবেন। কিন্তু যাঁহারা দূরদেশে বাস করেন, সেরূপ সাক্ষী উপস্থিত করিতে হইলে, সাক্ষিগণের প্রতি 'স্বামিবাক্য' বা 'সমন' দিবার বিধি অর্থশাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। পরাজিত পক্ষ বিজিত পক্ষের সাক্ষীর সকল ব্যয়ভার বহন করিতে বাধ্য হইতেন। সাক্ষীর খোরাকি (পুরুষভৃতি), পাথেয় প্রভৃতি সকল ব্যয়ভারই পরাজিত পক্ষ বহন করিবেন,—অর্থশাস্ত্রকার বিশেষ ভাবে তাহা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। এই সকল বিষয় সংহিতা-শাস্ত্রাদিতেও

আলোচিত হইয়াছে। মনু (অষ্টম অধ্যায়, ৭৩ম এবং ১১৬ম—১১৮ম শ্লোক) বলিয়াছেন,—
"বহুত্বং পরিগৃহ্ণীয়াৎ সাক্ষিদ্বৈধে নরাধিপঃ। সমেষু তু গুণোৎকৃষ্টান্ গুণিদ্বৈধে দ্বিজোত্তমান্॥"
"যস্মিন্ যস্মিন্ বিবাদে তু কৌটসাক্ষ্যং কৃতং ভবেৎ। তত্তৎকার্য্যং নিবর্ত্তেত কৃতঞ্চাপ্যকৃতং ভবেৎ॥
লোভান্মোহাদ্ভয়ান্মৈত্রাৎ কামাৎ ক্রোধাত্তথৈব চ। অজ্ঞানাদ্বালভাবাচ্চ সাক্ষ্যং বিতথমুচ্যতে॥"
অর্থাৎ,—'সাক্ষিদ্বৈধ স্থলে রাজা বহু সাক্ষীর প্রমাণ গ্রাহ্য করিবেন। কিন্তু সমান হইলে গুণোৎকৃষ্ট সাক্ষীদিগের বাক্যের দ্বারা সত্যনির্ণয় করিবেন। আবার গুণীর দ্বৈধস্থলে যাহারা ক্রিয়াবান, তাহাদের সাক্ষ্যে সত্য নির্ণয় করিবেন।...যে যে বিবাদে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রকাশ পাইবে, রাজা সেই সেই মকদ্দমার বিচার নিবর্ত্তিত করিবেন। মিথ্যা সাক্ষ্য বলে বিচার সম্বন্ধে যাহা কিছু কৃত হইয়াছে, তাহা অকৃতের ন্যায় গণ্য হইবে। লোভ ভয়, মোহ, স্নেহ, কাম ও ক্রোধ হেতু যে সাক্ষ্য প্রদত্ত হইয়াছে এবং অজ্ঞানে অমনোযোগে যে সাক্ষ্য দেওয়া হয়, সেই সাক্ষ্য বিতথ সুতরাং অগ্রাহ্য।' বিষ্ণুসংহিতায়ও একই রূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। বিষ্ণুসংহিতোক্ত শ্লোক-কয়টী (অষ্টম অধ্যায়, ৩৯ম ও ৪০ম শ্লোক দ্রষ্টব্য) মনুসংহিতার শ্লোকেরই অনুরূপ। প্রায় প্রতি বাক্যেই মিল দেখিতে পাওয়া যায়। মহর্ষি বিষ্ণুর মতেও 'সাক্ষিদ্বৈধ স্থলে এবং বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষের সাক্ষিগণই 'কূটসাক্ষী' বলিয়া প্রতিপন্ন না হইলে, বিচারক বহুত্ব গ্রহণ করিবেন, অর্থাৎ যে পক্ষে অধিক সাক্ষী, সেই পক্ষকে জয়পত্র দিবেন। সমান হইলে উৎকৃষ্ট-গুণসম্পন্ন সাক্ষীরাই গ্রাহ্য। সমানগুণসম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণ সাক্ষিগণই প্রমাণ। কূটসাক্ষী যে যে বিবাদে মিথ্যা বলিবে, তত্তৎ বিবাদ-ঘটিত কার্য্য নিবৃত্ত হইবে অর্থাৎ সেইখানেই কার্য্য শেষ করিতে হইবে, আর কৃতকার্য্যও অকৃতবৎ গণ্য হইবে।' যাজ্ঞবল্ক্যের মতে,—

"দ্বৈধে বহূনাং বচনং সমেষু গুণিনাস্তথা। গুণিদ্বৈধে তু বচনং গ্রাহ্যং যে গুণবত্তমাঃ॥
যস্যোচুঃ সাক্ষিণঃ সত্যাং প্রতিজ্ঞাং স জয়ী ভবেৎ। অন্যথাবাদিনো যস্য ধ্রুবং তস্য পরাজয়ঃ॥
উক্তেঽপি সাক্ষিভিঃ সাক্ষ্যে যদন্যে গুণবত্তমাঃ। দ্বিগুণা বান্যথা ব্রূয়ুঃ কূটাঃ স্যুঃ পূর্ব্বসাক্ষিণঃ॥"
অর্থাৎ,—'দুই পক্ষ হইতে সাক্ষ্য প্রদান করিলে বহুলোক যে কথা বলে, তাহাই গ্রাহ্য। দুইপক্ষে সমান লোক থাকিলে গুণবান ব্যক্তিগণের এবং দুই পক্ষেই সমান গুণবান লোক থাকিলে, যাহারা অধিক গুণবান, তাহাদিগেরই কথা গ্রাহ্য। সাক্ষিগণ, যাহার লিখিত প্রতিজ্ঞাকে সত্য বলিয়া প্রকাশ করে, সে জয়ী হয়; এবং যাহার লিখিত প্রতিজ্ঞায় অন্যরূপ বলে, তাহার পরাজয় নিশ্চিত। কতিপয় সাক্ষী একরূপ বলিয়া গেলেও যদি অন্য পক্ষীয় বা স্বপক্ষীয় অপরাপর অতিশয় গুণবান ব্যক্তি কিম্বা বহু লোক অন্যরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহা হইলে পূর্ব্বসাক্ষিগণ কূটসাক্ষী হইবে।' সুতরাং তাহাদের সাক্ষ্য বিচার আমলে আসিবে না। যাহা হউক, এই সকল অতি প্রাচীনকালের কথা ছাড়িয়া দিয়া খৃষ্টজন্মের দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থশাস্ত্রোক্ত ব্যবহার-শাস্ত্রের আলোচনায় আমরা বুঝিতে পারি, যে সময়ও ভারতের ব্যবহার-শাস্ত্র পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠান্বিত ছিল এবং তৎকাল-প্রচলিত বিধান-সমূহ আধুনিক বিধি-নিয়মাদি হইতে কোনও অংশে হীন ছিল না। এখন বিচারক কর্ত্তৃক কোনরূপ বিচার-বিভ্রাট ঘটিলে, বিচারক বিনাদণ্ডেই

অব্যাহতি পান; কিন্তু সে সময়ে, সেই সুদূর অতীতকালে, বিচারকগণকেও কৃতকর্ম্মের ফলভাগী হইতে হইত। অর্থশাস্ত্রের আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, বিচারক নিরপেক্ষভাবে এবং অমিত অধ্যবসায়ের সহিত বিচার-কার্য্য নিষ্পন্ন না করিলে, তাঁহার প্রতি গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। যদি বিচারক কোনও পক্ষকে ভয়প্রদর্শন করিতেন, তিরস্কার করিতেন, অথবা বিচারালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেন, তাহা হইলে তাঁহার 'প্রথম সাহস দণ্ড' হইবার ব্যবস্থা ছিল। বিচারক যদি সাক্ষীকে অবান্তর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন, তিনি যদি কোনও আবশ্যকীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় বিরত থাকিতেন, পক্ষের কোনও সদুত্তর লিপিবদ্ধ না করিতেন অথবা পক্ষকে তাহার পূর্ব্ববর্ণনা প্রদান করিয়া তদ্বিষয়ে তাহাকে কোনও বিষয় শিক্ষা দিতেন; তাহা হইলে তাঁহার 'মধ্যম সাহস' দণ্ড হইবার ব্যবস্থা অর্থশাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। পরন্তু বিচারক যদি কোনও অনাবশ্যকীয় বিষয়ের অনুসন্ধান উপলক্ষে বিচার-কার্য্য সমাধা করিতে অযথা বিলম্ব করিতেন, অকারণ কারণের অছিলায় মকদ্দমা মুলতবী রাখিয়া বিচারালয় ব্যতীত অপর স্থানে তিনি বিবাদীয় বিষয়ের মীমাংসা করিতেন, পক্ষদিগকে উদ্দেশ্যভ্রষ্ট করিয়া বিপথে পরিচালিত করিবার প্রয়াস পাইতেন, অথবা সাক্ষীদিগকে সন্ধান বলিয়া দিয়া তাহাদিগের সাক্ষ্য-প্রদানে সহায়তা করিতেন; তাহা হইলে সেই বিচারক 'উত্তম সাহস' দণ্ডে * দণ্ডিত

বিচারকের দণ্ড।

---

* অর্থদণ্ডের যে ত্রিবিধ প্রকার-ভেদ ছিল, তাহা 'সাহস' নামে উক্ত হইত। যথা,—প্রথম সাহস দণ্ড, মধ্যম সাহস দণ্ড, উত্তম সাহস দণ্ড। এই সাহস দণ্ডের পরিমাণ কিরূপ ছিল, মনু-সংহিতায় তাহার সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মনু যেরূপে সাহস দণ্ডের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা বুঝাইবার জন্য, মনুসংহিতা হইতে নিম্নে কয়েকটী শ্লোক (অষ্টম অধ্যায়, ১৩২শ—১৩৮শ শ্লোক) উদ্ধৃত হইল; যথা,—

"জালান্তরগতে ভানৌ যৎ সূক্ষ্মং দৃশ্যতে রজঃ। প্রথমং তৎ প্রমাণানাং ত্রসরেণুং প্রচক্ষতে॥
ত্রসরেণবোঽষ্টৌ বিজ্ঞেয়া লিক্ষৈকা পরিমাণতঃ। তা রাজসর্ষপস্তিস্রস্তে ত্রয়ো গৌরসর্ষপঃ॥
সর্ষপাঃ ষড়্‌যবো মধ্যস্ত্রিযবন্ত্বেককৃষ্ণলম্। পঞ্চকৃষ্ণলকো মাষস্তে সুবর্ণস্তু ষোড়শ॥
পলং সুবর্ণাশ্চত্বারঃ পলানি ধরণং দশ। দ্বে কৃষ্ণলে সমধৃতে বিজ্ঞেয়ো রৌপ্যমাষকঃ॥
তে ষোড়শ স্যাদ্ধরণং পুরাণশ্চৈব রাজতম্। কার্ষাপণস্তু বিজ্ঞেয়স্তাম্রিকঃ কার্ষিকঃ পণঃ॥
ধরণানি দশ জ্ঞেয়াঃ শতমানস্তু রাজতঃ। চতুঃসৌবর্ণিকো নিষ্কো বিজ্ঞেয়স্তু প্রমাণতঃ॥
পণানাং দ্বে শতে সার্দ্ধে প্রথমঃ সাহসঃ স্মৃতঃ। মধ্যমঃ পঞ্চ বিজ্ঞেয়ঃ সহস্রন্ত্বেব চোত্তমঃ॥"

অর্থাৎ,—'সূর্য্যের কিরণ পতিত হইলে গবাক্ষবিবর হইতে যে ধূলিসমূহ উড্ডীয়মান হয়, উহার মধ্যে যে ধূলিকণা অতিশয় সূক্ষ্ম দৃষ্ট হইয়া থাকে; পরিমাণ-গণনায় উহা প্রথম গণ্য। উহাকে ত্রসরেণু বলে। ঐ ত্রসরেণুর আট গুণে এক লিক্ষ হয়; তার তিন গুণে এক রাজসর্ষপ এবং রাজসর্ষপের চারি গুণে গৌরসর্ষপ হয়। ছয় সর্ষপে এক যবমধ্য; তিন যবে এক কৃষ্ণল, পাঁচ কৃষ্ণলে এক মাষা এবং উহার ষোড়শ গুণে এক সুবর্ণ হয়। চারি সুবর্ণে এক পল। দশ পলে এক ধরণ এবং দুই কৃষ্ণলে এক রৌপ্যময় মাষা হয়। ষোড়শ রূপামাষায় এক রূপ্যধরণ বা পুরাণ হয়। এক কার্ষিক বা আশীরতি পরিমিত তাম্রকে পণ বা কার্ষাপণ বলে। পূর্ব্বোক্ত দশ ধরণে এক রাজত শতমান এবং চারি সুবর্ণে এক নিষ্ক হয়। আড়াই শত পণে এক প্রথম সাহস, পাঁচ শত পণে এক মধ্যম সাহস এবং সহস্র পণে উত্তম সাহস।' তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে,—প্রথম সাহস দণ্ডে দুই হাজার রতি, মধ্যম সাহস দণ্ডে চারি হাজার রতি এবং উত্তম সাহস দণ্ডে আট হাজার রতি তাম্র দণ্ড দিতে হইত।

হইতেন। * প্রথম বার উপরোক্ত দোষ করিলে বিচারকের প্রতি যে দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল, দ্বিতীয় বারে তাঁহার প্রতি তাহার দ্বিগুণ দণ্ড প্রদান করা হইত। অন্যায়রূপে কাহারও অর্থদণ্ড প্রদান করিলে, অপরাধের তারতম্য অনুসারে, বিচারক ধর্ম্মস্থ বা প্রদেষ্টা নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড ভোগ করিতেন। অবৈধ শারীরিক শাস্তির জন্য তাঁহাদের প্রতি তদনুরূপ শারীরিক দণ্ড প্রদান করা হইত, অথবা দণ্ডের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের প্রতি অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা বিহিত ছিল। কিন্তু সে অর্থদণ্ড শারীরিক দণ্ডের অনুপাতে বিহিত হইত। অর্থাৎ,—যে অপরাধে যেরূপ শারীরিক দণ্ডের পরিবর্ত্তে যেরূপ অর্থদণ্ডের বিধান রহিয়াছে, অপরাধী বিচারককে সে অপরাধে তাহার দ্বিগুণ অর্থদণ্ড দিতে হইত। পক্ষান্তরে যে বিচারক কোনও ন্যায়সিদ্ধ ব্যবহারকে অমূলক সাব্যস্ত করিয়া মিথ্যা ব্যবহার উৎপাদনে সহায়তা করিতেন, তিনি সেই ব্যবহারোক্ত দাবীর আটগুণ দণ্ডে দণ্ডিত হইতেন। অর্থশাস্ত্র-মতে বিচারকের প্রতি দণ্ড-দানের এই বিধান। কিন্তু বিচারকগণের অপরাধের শাস্তিবিধান কে করিবেন, তৎসম্বন্ধে বিহিত কোনও আদেশ অর্থশাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। বিচারকগণের প্রতি দণ্ডাদেশের যেরূপ বিধি, বিচারালয়ের কর্ম্মচারীদিগের অপরাধে তাহাদের প্রতিও দণ্ডের সেইরূপ ব্যবস্থা অর্থশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। পক্ষদিগের বর্ণনা যিনি লিপিবদ্ধ করিবেন, তাঁহার কার্য্যশৈথিল্যের বা অপব্যবহারের দণ্ডের ব্যবস্থা এইরূপ উক্ত হয়; যথা,—তিনি যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক বর্ণিত বিষয় লিপিবদ্ধ না করেন; অবক্তব্য বিষয় অর্থাৎ পক্ষগণ যাহা বলে নাই, তাহা লিখিয়া লন; অস্পষ্ট-ভাবে বর্ণিত বিষয় যদি তিনি লিপিবদ্ধ না করেন, অথবা সুস্পষ্ট-ভাবে বর্ণিত বিষয় অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থযুক্ত করিয়া দেন; তাহা হইলে তাঁহার প্রতি 'উত্তম সাহস' দণ্ডের ব্যবস্থা। অপিচ, অপরাধের তারতম্য অনুসারে অনুরূপ দণ্ডদানের বিষয়ও অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, বিচারালয় (ধর্ম্মস্থীয়) হইতে অপরাধী পলায়ন করিতে না পারে, 'চারক' (হাজত) ও 'বন্ধনাগার' (জেলখানা) প্রভৃতিতে অপরাধীদিগকে সুরক্ষিতভাবে আবদ্ধ রাখা হয়;—তদ্বিষয়েও বিবিধ বিধান অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

শাস্ত্র-গ্রন্থাদিতে আপিলাদির বিষয় উল্লিখিত আছে। এখন যেমন মুন্সেফ বা সবডিভিশনাল মাজিষ্টরের বিচারের আপিল জজের বা মাজিষ্টরের নিকট হয় এবং তাহা হইতে হাইকোর্ট ও হাইকোর্ট হইতে প্রিভি-কৌন্সিল পর্য্যন্ত আপিল হইবার ব্যবস্থা আছে; আর প্রিভি-কৌন্সিলের বিচারের আপিল যেমন হাইকোর্টে হয় না বা হাইকোর্টের বিচারের আপিল যেমন জজের নিকট আসিতে পারে না;—অতি প্রাচীনকালে ভারতীয় ব্যবহার-শাস্ত্রেও আপিল-সংক্রান্ত সেই বিধি বিধিবদ্ধ ছিল। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় এ সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। আপিল সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,

আপিলের ব্যবস্থা।

---

* বিচারকের দণ্ড বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় লিখিত আছে,—"দুর্দ্দৃষ্টাংস্তু পুনর্দৃষ্ট্বা ব্যবহারান্ নৃপেণ তু। সভ্যাঃ সজয়িনো দণ্ড্যা বিবাদাদ্দ্বিগুণং দমম্॥" কু-দৃষ্ট ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বিচার করিয়া রাজা সেই বিবাদে পরাজিতের যে দণ্ড হইয়াছে, বিচারক, সভ্যগণ ও জেতা—ইহাদিগের প্রত্যেক ব্যক্তির তাহার দ্বিগুণ দণ্ড করিবেন।'

—"নৃপোণাধিকৃতাঃ পূগাঃ শ্রেণয়োঽথ কুলানি চ। পূর্ব্বং পূর্ব্বং গুরু জ্ঞেয়ং ব্যবহারবিধৌ নৃণাম॥" অর্থাৎ,—'রাজনিযুক্ত গ্রামবাসী বা নগরবাসী সমস্ত লোক, নানা জাতীয় জনসমূহ এবং নিজ নিজ বন্ধু-বান্ধববর্গ—ব্যবহারার্থী মনুষ্যদিগের ব্যবহার-কার্য্যে এই সকলের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব উল্লিখিত ব্যক্তি পর পর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।' নারদ ও কাত্যায়নের মতেও উহাই বিধি। তাঁহারাও বলিয়াছেন,—"কুলানি শ্রেণয়শ্চৈব গণাশ্চাধিকৃতো নৃপঃ। প্রতিষ্ঠা ব্যবহারাণাম্ পূর্ব্বেভ্যস্তুত্তরোত্তরঃ॥" অপর এক স্মৃতি গ্রন্থেও ঐরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়; যথা,—"গ্রামে দৃষ্টঃ পুরে যাতি পুরে দৃষ্টস্তু রাজনি। রাজ্ঞা দৃষ্টঃ কুদৃষ্টো বা নাস্তি পৌনর্ভবো বিধিঃ॥" এখানেও সকলের সকল বিচারেরই আপিল ঊর্দ্ধতন বিচারালয়ে হইবার বিধি। কিন্তু রাজা যে বিচার করেন, অন্যায় অবৈধ হইলেও তাহার আর আপিল চলিবে না। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিচারক। তাঁহার বিচারের আপিল কাহার নিকট হইবে? কিন্তু কোনও কোনও স্থলে যে রাজার বিচারেও আপিল না হইত, তাহা নহে। সে ক্ষেত্রে পক্ষগণকে দণ্ডের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইতে হইত। যাহা হউক, এ সকলের আলোচনায় বুঝা যায়, প্রাচীনকালে বহু নগর-জনপদে বিবিধ বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। তদ্ব্যতীত ইংলণ্ডের প্রাচীন কালের বিচারকের ন্যায় ভ্রমণকারী 'ইটিনারারি' বিচারক নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া বিচার-কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেন। তাঁহাদের বিচারের আপিলও পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইবার ব্যবস্থা ছিল। চাণক্য-প্রণীত অর্থশাস্ত্রে বিচারকগণের দণ্ড-প্রসঙ্গে ইহার আভাষ পাওয়া যায়। উচ্চ বিচারালয়ে আপিল না হইলে, বিচারকের দোষ-গুণ সাব্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা অতি অল্প। সুতরাং সিদ্ধান্ত হয়, অর্থশাস্ত্র মতে, উচ্চ হইতে উচ্চতর, উচ্চতর হইতে উচ্চতম বিচারালয়ে পূর্ব্ববিচারের আপিল হওয়ার বিধি। স্বয়ং রাজা, মন্ত্রী ও ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে, যে বিচারালয়ে অধিষ্ঠিত হইতেন, তাহাই ছিল—সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়। অর্থশাস্ত্রের 'রাজপ্রণিধি' প্রকরণে এ বিষয়ের বিধান দৃষ্ট হয়। অর্থশাস্ত্রে চারিটী বিচারালয়ের উল্লেখ আছে। প্রতি সংগ্রহণে, প্রতি দ্রোণমুখে, প্রতি স্থানীয়ে এবং প্রতি জনপদসন্ধিতে বিচারালয় প্রতিষ্ঠার বিধান অর্থ-শাস্ত্রকার প্রদান করিয়াছেন। সে সময়ে প্রতি সংগ্রহণে স্থাপিত বিচারালয়-নিষ্পাদিত ব্যবহারের আপিল দ্রোণমুখে প্রতিষ্ঠিত বিচারালয়ে হইত; দ্রোণমুখ বিচারালয় হইতে স্থানীয় বিচারালয়ে এবং স্থানীয় বিচারালয় হইতে জনপদসন্ধিতে প্রতিষ্ঠিত বিচারালয়ে আপিলাদি হইবার ব্যবস্থা ছিল;—এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। গ্রামিক ও গ্রামবৃদ্ধগণ যে বিচারাদি সম্পন্ন করিতেন, তাহারও আপিল ঐরূপ ক্রমপর্য্যায় অনুসারে হইবার ব্যবস্থা ছিল।

আদর্শ-রাজ্যের আর এক আদর্শ চুক্তি-সংক্রান্ত ব্যবহার বিধানে। প্রাচীন ভারতে এই ব্যবহার-বিধি কিরূপ স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছিল এবং কি ভাবে পূর্ণ-পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, এতৎপ্রসঙ্গে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ প্রদান করিতেছি।

চুক্তি ও তৎপ্রকারভেদ।

প্রাচীন ভারতের ব্যবহার-বিধির প্রধান উপাদান,—শাস্ত্র-গ্রন্থ-সমূহ। স্মৃত্যাদি বহু প্রাচীন শাস্ত্র-গ্রন্থ-সমূহে এবং খৃষ্টজন্মের প্রায় তিন শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত অর্থশাস্ত্রে এতদ্বিষয়ের বিশেষ আলোচনা আছে। এস্থলে অর্থ-

শাস্ত্রোক্ত চুক্তির বিষয় উল্লেখ-প্রসঙ্গে স্মৃত্যাদি বর্ণিত বিধি-বিধান-সমূহ বিবৃত করিবার প্রয়াস পাইতেছি। কোনও নির্দ্দিষ্ট বিষয় সম্পাদন জন্য কেহ কাহারও সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে, ঐ প্রতিজ্ঞা চুক্তি মধ্যে গণ্য হয়। এরূপ প্রতিজ্ঞা দুই বা বহু ব্যক্তির পরস্পরের মধ্যে হইতে পারে, সঙ্ঘদ্বয় বা বহু সঙ্ঘ মধ্যে হইতে পারে। ব্যক্তিবিশেষ, সঙ্ঘ-বিশেষের সহিত এরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে পারেন। এ হিসাবে চুক্তি বহুবিধ। বিবাহ, দায়, ঋণ, সম্ভূয়-সমুত্থান, দাসকল্প, উপনিধি, ভৃত্যাধিকার প্রভৃতি সকলই চুক্তিপর্য্যায়ভুক্ত। এরূপ প্রতিজ্ঞা বা চুক্তি যেরূপে নিষ্পন্ন হয়, তাহা এই ;—যদি কেহ স্বেচ্ছাক্রমে কাহারও নিকট কোনও বিষয়ে কোনও প্রস্তাব উত্থাপন করেন, আর অপর ব্যক্তি যদি প্রস্তাবকারীর সে প্রস্তাবে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া সম্মত হন ; তাহা হইলে, দ্বিতীয় ব্যক্তির স্বীকারোক্তিতে প্রতিজ্ঞা নিষ্পন্ন হইয়া যায়। সেই প্রতিজ্ঞাই—চুক্তি। এইরূপ প্রতিজ্ঞা বা অঙ্গীকার হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ পক্ষ-সমূহের কোনও কার্য্যে রতি বা বিরতি ভাব উপলব্ধি হয়। চুক্তি দ্বিবিধ—সিদ্ধ ও অসিদ্ধ। যে চুক্তি বা অঙ্গীকৃত বিষয় সম্পাদনে প্রতিপক্ষকে আইনতঃ বাধ্য করা যায় না,—তাহা অসিদ্ধ-চুক্তি পর্য্যায়ভুক্ত। আর, যে চুক্তি-সম্পাদনে পক্ষগণ আইনতঃ বাধ্য এবং যাহার অসম্পাদনে পক্ষগণ আইনতঃ দণ্ডনীয় হন, তাহাই সিদ্ধ-চুক্তি মধ্যে পরিগণিত। চুক্তি সিদ্ধ হইলে, উহা সমভাবে সকল পক্ষের প্রতি প্রযুজ্য। তবে ঐ চুক্তি বা অঙ্গীকার পক্ষগণকে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া সম্পন্ন করার বিশেষ বিধি শাস্ত্র-গ্রন্থ-সমূহে পরিদৃষ্ট হয়। অর্থশাস্ত্র-মতে সিদ্ধ চুক্তিতে নিম্নোদ্ধৃত গুণ-সমূহ বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন ; যথা—

"তস্মাৎ সাক্ষিমদচ্ছন্নং কুর্য্যাৎ সম্যগ্বিভাষিতম্। স্বে পরে বা জনে কার্য্যং দেশকালাগ্র-বর্ণতঃ॥" "স্বে স্বে তু বর্গে দেশে কালে চ স্বকরণকৃতা সম্পূর্ণচারাস্তুদ্ধদেশা দৃষ্টরূপ-লক্ষণপ্রমাণগুণাস্সর্ব্বব্যবহারা সিদ্ধেয়ুঃ। পশ্চিমং ত্বেষাং করণমদেশাধিবর্জং শ্রদ্ধেয়ুঃ॥"

অর্থাৎ,—চুক্তি-পত্রে পক্ষগণের বক্তব্য সম্যক্‌রূপে উল্লিখিত থাকিবে। আচ্ছন্ন-ভাবে অর্থাৎ গোপনে সম্পাদিত হইবে না, সাক্ষীর সমক্ষে উহা নিষ্পন্ন করিতে হইবে। চুক্তিপত্র—দেশ, কাল ও বর্গ (জাতি ও শ্রেণী) প্রভৃতি বিষয়ক নীতি-সমূহের অনুবর্ত্তী হওয়া আবশ্যক। চুক্তিতে পক্ষগণের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এবং রূপ অর্থাৎ যে অবস্থায় চুক্তি নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহা, সুস্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত হইবে। চুক্তি-সম্পাদনে কোনরূপ 'অপগ্রহণ' অর্থাৎ অবৈধ উপায় অবলম্বনের ভাব বর্ত্তমান থাকিবে না। পরন্তু চুক্তিকারী পক্ষগণ 'প্রমাণগুণযুক্ত' অর্থাৎ চুক্তি-সম্পাদনে ন্যায়তঃ উপযুক্ত হওয়া আবশ্যক।' স্থূলতঃ, ব্যবহারবিধির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া যে 'সম্পূর্ণচার' চুক্তি নিষ্পন্ন হয়, কৌটিল্য-মতে, তাহাই সিদ্ধ। অর্থশাস্ত্রের উক্তি হইতে বুঝা যায়, চুক্তি-সম্পাদন সময়ে সাক্ষী একান্ত আবশ্যক এবং ঐ বিষয়ক দলিলাদি নিষ্পন্ন করিতে হইলে, সে সাক্ষী নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু মৌখিক চুক্তি-বিধানে কোনমতেই সাক্ষী পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। সে ক্ষেত্রে অসাক্ষিক মৌখিক চুক্তি অসিদ্ধ হয়। অর্থশাস্ত্র-মতে—তিরোহিত, নক্তকৃত, অন্তর-গারকৃত, অরণ্যকৃত, উপধিকৃত, উপহ্বরকৃত চুক্তি অপ্রামাণ্য। এরূপ স্থলে পক্ষগণের 'প্রথম সাহস' দণ্ড বিহিত। এ বিষয়ে অর্থশাস্ত্রের 'ব্যবহার-স্থাপনা' অংশে এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়,—

অসিদ্ধ চুক্তি ও বিশেষ বিধি।

"তিরোহিতান্তরগারনক্তারণ্যোপধ্যুপহ্বরকৃতাংশ্চ ব্যবহারান্ প্রতিষেধয়েয়ুঃ। কর্ত্তৃ-কারয়িতুশ্চ পূর্ব্বসাহসদণ্ডঃ। শ্রোতৃণামেকৈকং প্রত্যর্ধদণ্ডাঃ। শ্রদ্ধেয়ানাং তু দ্রব্যব্যপনয়ঃ।" ইহাই হইল সাধারণ নিয়ম। কিন্তু অবস্থা-বিশেষে এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। নক্তকৃত বা রাত্রে নিষ্পন্ন চুক্তি-ব্যবহার অপ্রামাণ্য অসিদ্ধ হইলেও যে স্থলে কোনও শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা থাকিত, সে ক্ষেত্রে ইহা অসিদ্ধ হইত না। বিবাহ-ব্যাপারে অথবা রাজানুমোদিত বিষয়েও ইহার সার্থকতা দেখা যায়। যথা,—"সাহসানুপ্রবেশ কলহ বিবাহ রাজনিয়োগযুক্তাঃ পূর্ব্বরাত্র-ব্যবহারিণাং চ রাত্রিকৃতাস্‌সিদ্ধেয়ুঃ।" যে ক্ষেত্রে স্ত্রীলোক 'অনিষ্কাষিণী' অর্থাৎ অসূর্য্যম্পশ্যা এবং রোগিণী, সে ক্ষেত্রে দায় প্রভৃতি বিষয়-ব্যাপারে এবং বিবাহ-সম্পর্কে 'অন্তরগার' ব্যবহার অসিদ্ধ হইত না; যথা,—"দায়নিক্ষেপোপনিধি বিবাহযুক্তা স্ত্রীণামনিষ্কাসিনীনাং ব্যাধিতানাং চামূঢ়সংজ্ঞানামন্তরগারকৃতাস্‌সিদ্ধেয়ুঃ।" অর্থাৎ,—পর্দ্দানসীন ও রোগিণী স্ত্রীলোকগণের পক্ষে এ বিধি অপ্রযোজ্য। তাঁহারা যদি প্রকৃতিস্থ থাকেন, তাহা হইলে দায় (বিষয়-সম্পত্তি বিভাগ বিষয়ক ব্যাপার), নিক্ষেপ, উপনিধি ও বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে অন্তরগার ব্যবহার অসিদ্ধ হইবে না। সার্থ (ব্যবসায়ী), ব্রজাশ্রম (গোপালক), ব্যাধ, চার (গুপ্তচর) ও মধ্যেঘরণ্যচর (কার্য্যোপলক্ষে যাঁহাদিগকে প্রায়ই অরণ্যে ভ্রমণ করিতে হয়) প্রভৃতি কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন 'অরণ্যকৃত' ব্যবহার অসিদ্ধ হয় না,—অর্থশাস্ত্রে সে ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। যথা,—"সার্থব্রজাশ্রমব্যাধচারাণাং মধ্যেঘরণ্যচরণামরাণকৃতাস্‌সিদ্ধেয়ুঃ।" উপহ্বর ব্যবহার সকল স্থলেই নিষিদ্ধ। অন্দর ও অরণ্য ভিন্ন অন্য যে কোনও গোপনীয় স্থান—উপহ্বর পর্য্যায়ভুক্ত। কিন্তু কেবলমাত্র যৌথ-বিষয়ে উপহ্বর ব্যবহার নিষিদ্ধ নহে—অর্থশাস্ত্রের ইহা ব্যবস্থা। এ সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রকারের উক্তি,—"মিথস্‌সমবায়ে চোপহ্বরকৃতাঃ সিদ্ধেয়ুঃ। অতোঽন্যথা ন সিদ্ধেয়ুঃ।" যৌথসংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কিত ভিন্ন অন্যত্র উপহ্বর ব্যবহার অসিদ্ধ। তিরোহিত ব্যবহার বিষয়েও বিশেষ বিধান আছে। দাসকল্প এবং কর্ম্মকরকল্প ভিন্ন অন্যত্র তিরোহিত ব্যবহার সিদ্ধ হয় না। ইহাও গোপনে অর্থাৎ তৃতীয় ব্যক্তির অজানিতভাবে সম্পাদিত হইয়া থাকে। এ হিসাবে অন্তরগার, অরণ্য, উপহ্বর সকলই ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়। তিরোহিত ব্যবহারে সাক্ষী অপ্রয়োজনীয়। যেমন, ভৃত্যের বেতনাদি-সংক্রান্ত চুক্তি সাধারণ্যে অপ্রকাশ্য থাকে; আর যেখানে ঋণকারীর সম্মানের লাঘব হওয়ার সম্ভাবনা, সেখানেও তৎকর্ত্তৃক সম্পাদিত ব্যবহার প্রকাশ করা হয় না। সুতরাং বিচারকালে বিচারককে পক্ষদিগের উক্তির উপর নির্ভর করিতে হয় অথবা প্রচলিত লৌকিক প্রথার উপর বিচারকগণ নির্ভর করিয়া থাকেন। এইরূপে ব্যবহার সুসিদ্ধ না হইলে, গুপ্তচর নিযুক্ত করা অথবা 'কুশলাঃ' বা পারদর্শী ব্যক্তির অভিমত গ্রহণ করা বিধি। অর্থশাস্ত্রকার 'তিরোহিত' ব্যবহার বিষয়ে একটী বিশেষ বিধি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা,—"পরোক্ষেণাধিকর্ণগ্রহণমবক্তব্যকরা বা তিরোহিতাস্‌সিদ্ধেয়ুঃ।" "গূঢ়াজীবিষু চোপাধিকৃতাস্‌সিদ্ধেয়ুঃ।" * পূর্ব্বে স্থান ও কাল সম্বন্ধে যে

* চুক্তি-বিষয়ক আধুনিক ব্যবহার-শাস্ত্রে এ সকল বিষয় উল্লিখিত হয় নাই। এখন চুক্তির কালাকাল সম্বন্ধে কোনও বিচার নাই। এখন পক্ষগণের সম্মতি এবং উপযুক্ত সাক্ষী থাকিলে যে কোনও সময়ে চুক্তি নিষ্পাদিত হইতে পারে। কিন্তু প্রাচীনকালের বিধানে যে তাহা নিষিদ্ধ ছিল, পূর্ব্ববর্ত্তী অংশ হইতে তাহা সপ্রমাণ হয়।

বিশেষ বিধান উল্লিখিত হইয়াছে, চুক্তি-ব্যবহার সিদ্ধ কি অসিদ্ধ তাহা বিচার-কল্পে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন। যে ক্ষেত্রে পক্ষগণের স্বহস্তাঙ্কিত দলিলাদি দ্বারা চুক্তি নিষ্পন্ন হয়, সে ক্ষেত্রে সাক্ষীর আবশ্যকতা অনুভব হয় না। সংহিতা প্রভৃতিতেও এ সম্বন্ধে অনুরূপ বিধি পরিদৃষ্ট হয়। মনু বলিয়াছেন,—সাক্ষিলেখ্যাদি দ্বারা ব্যবহার সপ্রমাণ করিতে হইবে। আর সে লেখ্য 'সকরণ' না স্বেচ্ছা-প্রণোদিত লেখ্য হওয়া আবশ্যক। অপিচ, অসামর্থ্য পক্ষে বা অবস্থা-বিশেষে সে 'করণ' বা লেখ্য পরিবর্ত্তিত হওয়াও সম্ভবপর হইতে পারে। চুক্তি-বিষয়ে দেশ, রূপ, কাল প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিবার বিষয় মনুও বলিয়া গিয়াছেন। মনুসংহিতা হইতে এতদ্বিষয়ক কয়েকটী শ্লোক (অষ্টম অধ্যায়, ৪৫ম, ৫১—৫২ম ও ১৫৪ম শ্লোক দ্রষ্টব্য) নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা,—

সংহিতা-মতে চুক্তির বিষয়।

"সত্যমর্থঞ্চ সম্পশ্যেদাত্মানমথ সাক্ষিণঃ। দেশং রূপঞ্চ কালঞ্চ ব্যবহারবিধৌ স্থিতঃ॥
অর্থেঽপিব্যয়মানস্তু করণেন বিভাবিতম্। দাপয়েদ্ধনিকস্যার্থং দণ্ডলেশঞ্চ শক্তিতঃ॥
অপহ্নবেঽধমর্ণস্য দেহীত্যুক্তস্য সংসদি। অভিযোক্তা দিশেদ্দেশ্যং করণং বান্যদুদ্দিশেৎ॥
ঋণংদাতুমশক্তো যঃ কর্ত্তুমিচ্ছেৎ পুনঃ ক্রিয়াম্। স দত্বা নির্জ্জিতাং বৃদ্ধিং করণং পরিবর্ত্তয়েৎ॥"

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা-মতেও স্বকরণ ব্যবহারে সাক্ষীর আবশ্যক হয় না। উভয় পক্ষ স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক যে চুক্তি-ব্যবহার নিষ্পন্ন করে, তাহা অসাক্ষিক হইলেও বিচারক তাহা সিদ্ধ বলিয়া গণ্য করিবেন। সকরণ লেখ্যাদি বা চুক্তি-ব্যবহার সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য (দ্বিতীয় অধ্যায়, ৮৬ম—৯১তম শ্লোক) এক বিস্তৃত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল; যথা,—

"যঃ কশ্চিদর্থো নিষ্ণাতঃ স্বরুচ্যা তু পরস্পরম্। লেখ্যন্তু সাক্ষিমৎ কার্য্যং তস্মিন্ ধনিকপূর্ব্বকম্॥
সমামাসতদর্দ্ধাহর্নামজাতিস্বগোত্রকৈঃ। সব্রহ্মচারিকাত্মীয়পিতৃনামাদিচিহ্নিতম্॥
সমাপ্তেঽর্থে ঋণী নাম স্বহস্তেন নিবেশয়েৎ। মতং মেঽমুকপুত্রস্য যদত্রোপরিলেখিতম্॥
সাক্ষিণশ্চ স্বহস্তেন পিতৃনামকপূর্ব্বকম্। অত্রাহমমুকঃ সাক্ষী লিখেয়ুরিতি তে সমাঃ॥
উভয়াভ্যর্থিতেনৈতন্ময়া হ্যমুকসূনুনা। লিখিতং হ্যমুকেনেতি লেখকোঽন্তে ততো লিখেৎ॥
বিনাপি সাক্ষিভির্লেখ্যং স্বহস্তলিখিতন্তু যৎ। তৎপ্রমাণং স্মৃতং লেখ্যং বলোপধিকৃতাদৃতে॥"

অর্থাৎ,—'উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ পরস্পর সম্মতিক্রমে বৃদ্ধি-সময়াদি বিষয়ের যে ব্যবস্থা করিবেন, ভবিষ্যতে বিস্মৃত্যাদি নিবন্ধন তাহার বৈপরীত্য না ঘটে, এই জন্য সেই সকল বিচারঘটিত সাক্ষিযুক্ত লেখ্যপত্র প্রস্তুত করিবে। তাহাতে প্রথমে ধনীর নাম লিখিত হইবে। সে লেখ্য — বর্ষ, মাস, পক্ষ, দিন, নাম, জাতি, গোত্র, সব্রহ্মচারিক (মাধ্যন্দিন প্রভৃতি শাখাধ্যয়নপ্রযুক্ত সংজ্ঞাবিশেষ, যেমন অমুক মাধ্যন্দিন, ইত্যাদি) এবং নিজ পিতৃনামাদি দ্বারা চিহ্নিত হওয়া আবশ্যক। অনন্তর তাহাতে ব্যবস্থিত বিষয় লিখিত হইলে, আমি অমুকের পুত্র অমুক, ইহার উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা আমার সম্মত—এই কয়েকটী কথা অধমর্ণ স্বহস্তে সন্নিবেশিত করিবেন। অতঃপর সেই লেখ্যে সাক্ষিগণ পিতৃনাম লেখন পূর্ব্বক লিখিবে যে, আমি অমুক এ বিষয়ে সাক্ষী রহিলাম। সাক্ষিগণ সংখ্যায় ও গুণে সমান হইবে। অনন্তর আমি অমুকের পুত্র, অমুক ঋণী ও ধনীর প্রার্থনানুসারে ইহা লিখিলাম'—সর্ব্বশেষে লেখক ইহা লিখিবে। সাক্ষী ব্যতীতও স্বহস্ত-লিখিত লেখ্য প্রমাণ হইবে। কিন্তু বলাৎকার বা লোভপ্রদর্শন অথবা ক্রোধাদি

প্রকাশ দ্বারা নিষ্পাদিত কৃত হইলে, তাহা প্রামাণ্য হইবে না।' যাজ্ঞবল্ক্যের মতে সাক্ষিযুক্ত লেখ্য প্রমাণ। তাঁহার মতে, সিদ্ধ-লেখ্য স্থলে করণ, লক্ষণ, স্থান, কাল প্রভৃতি বিবেচ্য এবং তাহা উভয় পক্ষের সম্মত হওয়া আবশ্যক। এ সকলের অনুল্লেখে লেখ্য—অপ্রমাণ। অপিচ স্বহস্তাঙ্কিত সকরণ লেখ্য অসাক্ষিক হইলেও তাহা প্রমাণ মধ্যে গণ্য। তবে অবৈধ অসদুপায়ে নিষ্পাদিত লেখ্য অগ্রাহ্য। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা মতেও অন্তরগার, অরণ্য প্রভৃতি স্থানে সম্পাদিত চুক্তি অপ্রামাণ্য। যে সকল স্থলে চুক্তি অসিদ্ধ, যাজ্ঞবল্ক্য তাহার একটী তালিকা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার (দ্বিতীয় অধ্যায়, ৩২শ—৩৩শ শ্লোক) মতে—

"বলোপধিবিনির্ব্বৃত্তান্ ব্যবহারান্ নিবর্ত্তয়েৎ। স্ত্রীনক্তমন্তরাগারবহিঃশত্রুকৃতাংস্তথা॥
মত্তোন্মত্তার্ত্তব্যসনিবালভীতাদিযোজিতঃ। অসম্বন্ধকৃতশ্চৈব ব্যবহারো ন সিধ্যতি॥"

অর্থাৎ,—'বল বা ভয়নিষ্পন্ন, স্ত্রীলোককৃত, নিশাকালকৃত, গৃহাভ্যন্তরকৃত, গ্রামবহির্দ্দেশকৃত এবং শত্রুকৃত ব্যবহার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কর্তৃক দৃষ্ট হইলেও পরিবর্ত্তিত হইবে। মত্ত, উন্মত্ত, পীড়িত, ব্যসনযুক্ত, বালক, ভীত, নগরাদি বিরুদ্ধ ও অনিযুক্ত সম্বন্ধশূন্য ব্যক্তি—এই সকল লোকে যে ব্যবহার উত্থাপিত করে, তাহা অসিদ্ধ।' মনুরও সেই মত। তিনিও বলিয়াছেন,—"অন্তর্ব্বেশ্মণ্যরণ্যে বা শরীরস্যাপি চাত্যয়ে।" বিষ্ণুসংহিতায় লেখ্য-প্রকরণে এতদ্বিষয়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বিষ্ণুর মতেও স্বহস্তলিখিত অসাক্ষিক লেখ্য প্রমাণ, আর বল-পূর্ব্বক নিষ্পন্ন লেখ্য অপ্রমাণ। তিনিও করণ, লক্ষণ, স্থান, কাল প্রভৃতি যথাযথ-রূপে সন্নিবিষ্ট লেখ্যকে প্রমাণ মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। কোন্ লেখ্য প্রমাণ এবং কোন্ লেখ্য অপ্রমাণ, সে সম্বন্ধে বিষ্ণু-সংহিতায় এক বিস্তৃত বিবরণ পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল; যথা,—

"অথ লেখ্যং ত্রিবিধম্। রাজসাক্ষিকং সসাক্ষিকমসাক্ষিকঞ্চ॥ রাজাধিকরণে তন্নিযুক্তকায়স্থকৃতং তদধ্যক্ষকরচিহ্নিতম্ রাজসাক্ষিকম্॥ যত্র ক্বচন যেন কেনচিল্লিখিতং সাক্ষিভিঃ স্বহস্তচিহ্নিতং সসাক্ষিকম্। স্বহস্তলিখিতমসাক্ষিকম্॥ তদ্বলাৎকারিতমপ্রমাণম্॥ উপধিকৃতাশ্চ সর্ব্ব এব॥ দূষিতকর্ম্মদুষ্টসাক্ষ্যঙ্কিতং তৎ সসাক্ষিমপি॥ তাদৃগ্বিধেন লিখিতঞ্চ। স্ত্রীবালাস্বতন্ত্রমত্তোন্মত্তভীত-তাড়িতকৃতঞ্চ॥ দেশাচারবিরুদ্ধং ব্যক্তাধিকৃতলক্ষণমলুপ্তক্রমাক্ষরং প্রমাণম্॥"

অর্থাৎ,—'লেখ্য ত্রিবিধ—রাজসাক্ষিক, সসাক্ষিক ও অসাক্ষিক। রাজবিচারালয়ে রাজ-নিযুক্ত মুহুরী দ্বারা লিখিত বিচারালয়াধ্যক্ষের হস্ত ইত্যাদি দ্বারা চিহ্নিত লেখ্য—রাজ-সাক্ষিক।* যে কোনও স্থানে যে কোনও ব্যক্তির লিখিত সাক্ষিগণের হস্তচিহ্নিত লেখ্য—সসাক্ষিক। আর স্বহস্তলিখিত লেখ্য—অসাক্ষিক। তাহা বলপূর্ব্বক সাধিত হইলে অপ্রমাণ; আর ছলপূর্ব্বক কৃত সকল দলিলই অপ্রমাণ। দূষিত-কর্ম্মদুষ্ট সাক্ষিগণের অঙ্কিত লেখ্য সসাক্ষিক হইলেও তাহা প্রমাণ মধ্যে গণ্য নহে। স্ত্রীলোক, বালক, পরাধীন, মত্ত, উন্মত্ত, ভীত এবং তাড়িত ব্যক্তির কৃত লেখ্যাদি অপ্রমাণ। দেশাচারের অবিরুদ্ধ,

* আদালত প্রভৃতি হইতে আজিকালি সহি-মোহরাঙ্কিত যে দলিলাদি পাওয়া যায়, তাহা রাজসাক্ষিক লেখ্য মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। রাজসাক্ষিক লেখ্যাদির লক্ষণ সম্বন্ধে সংহিতায় যে বিধান আছে, সহি-মোহরাঙ্কিত দলিলাদির সহিত তাহার তুলনায় এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

সুস্পষ্ট হস্তচিহ্নে চিহ্নিত, অলুপ্তবর্ণমালাযুক্ত সুযোগ্য ব্যক্তির লেখ্যই প্রমাণ।' গৌতমাদি সংহিতায় এতৎসংক্রান্ত বিশেষ কোনও ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয় না। সম্ভবতঃ সে সময়ে এই সকল বিধানের আবশ্যকতা ছিল না। নক্তকৃত, অন্তরগারকৃত, অরণ্যকৃত প্রভৃতি ব্যবহার বিষয়ে অর্থশাস্ত্রকার যে সকল বিশেষ বিধি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, স্মৃতিশাস্ত্রে সে সকল বিশেষ বিধির উল্লেখ নাই। শাস্ত্রকারগণ কেবলমাত্র ঐরূপ ব্যবহার অসিদ্ধ বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয়, পরবর্ত্তিকালে, কৌটিল্যাদির সময়ে, ঐ সকল বিশেষ বিধানের আবশ্যক হইয়াছিল। হিন্দুর বিবাহাদি কার্য্য দিনমানে সম্পন্ন হয় না। সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি শেষ মধ্যেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং যদি নক্তকৃত চুক্তিবিষয়ক বিধানের কঠোরতা সমভাবে অনুসৃত হয়, তাহা হইলে বিবাহাদি ব্যাপার একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। আর সেই জন্যই বোধ হয় পূর্ব্বরাত্রব্যবহার সুসিদ্ধ বলিয়া অর্থশাস্ত্রকার বিশেষ বিধি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু 'অপররাত্রকৃত' ব্যবহার সকল কালেই তিনি অসিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ ব্যবসায়ী, চর, ব্যাধ, যৌথ প্রভৃতি বিষয়ে অর্থশাস্ত্রে বিশেষ বিশেষ বিধি বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কারণ, বিশেষ বিধির অবতারণা না হইলে অনেক সময় প্রকৃতিপুঞ্জের বিবিধ ক্লেশদায়ক অবস্থা সংঘটিত হইতে পারিত। তাই তন্নিবারণার্থ ঐ সকল বিশেষ বিধি প্রবর্ত্তনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছিল। স্মৃত্যাদির সময় দিনমানে বিবাহাদি কার্য্য নিষ্পন্ন হইত,—তাহা বলাও সঙ্গত নহে। বিবাহাদি ভিন্ন অন্য বিষয়ে নক্তকৃত ব্যবহার নিষিদ্ধ, স্মৃতিশাস্ত্রকারগণের সম্ভবতঃ ইহাই অভিমত। *

* ভারতীয় চুক্তি-বিষয়ক আইনে এই সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিধিবদ্ধ আছে। কোন্ চুক্তি সিদ্ধ ও কোন্ চুক্তি অসিদ্ধ, তাহাতে সে বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাই। সিদ্ধ ও অসিদ্ধ চুক্তি সম্বন্ধে ঐ আইনে (Indian Contract Act) যাহা বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা হইতে নিম্নে মাত্র কয়েকটী বিষয় উদ্ধৃত হইতেছে। তদ্দ্বারা বুঝা যাইবে, স্বকরণকৃত বা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ব্যবহার সিদ্ধ; তদ্ভিন্ন অবৈধ উপায়ে সম্পাদিত চুক্তি অসিদ্ধ।

"All agreements are contracts if they are made by the *free consent* of parties *competent* to contract for a *lawful consideration* and with a *lawful object*, and are not hereby expressly declared to be void."

"Two or more persons are said to consent when they *agree upon the same thing* in the same sense."

"Consent is said *to be free* when it is not caused by (1) coercion, (2) undue influence, (3) fraud, (4) misrepresentation and (5) mistake."

"When consent to an agreement is caused by *coercion*, fraud, or misrepresentation, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused."

"When consent to an agreement is caused by *undue influence*, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused."

"The consideration or object of an agreement is lawful unless (1) it is forbidden by law; or (2) is of such a nature that, if permitted, it would defeat the provisions of any law; or (3) is fraudulent; or (4) involves or implies injury to the person or

অতঃপর চুক্তির লক্ষ্য (উদ্দেশ্য) ও বেতন (দাবী) সম্পর্কে চুক্তি-ব্যবহারের অসিদ্ধতার বিষয়। অর্থশাস্ত্র মতে লক্ষ্য ও বেতন বিধিসঙ্গত হইবে। প্রচলিত বিধান অনুসারে এবং ন্যায়-যুক্তিতে তাহা বিচার আমলে আসিবার উপযুক্ত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু যে স্থলে এক পক্ষ অপর পক্ষের প্রতি অযথা সুযোগ লইবার চেষ্টা করে, সে ক্ষেত্রে যে চুক্তি-ব্যবহার সম্পাদিত হয়, তাহা কদাচ বিধিসঙ্গত নহে; সুতরাং বিচার আমলে উহা অসিদ্ধ হয়। * এ সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্র-প্রণেতা একটী সুন্দর দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন। কোনও ব্যক্তি নদী-গর্ভে নিমজ্জমান,—স্রোতমুখে দূরদূরান্তে সংবাহিত হইতেছে; অথবা কোনও ব্যক্তি কোনও হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে যদি কেহ তাহাকে উদ্ধার করিতে যায় এবং সে জন্য তাহার বিপন্নাবস্থায়, সুযোগ বুঝিয়া উদ্ধার-কর্ত্তা যদি তাহাকে তাহার

অসিদ্ধ চুক্তির বিষয়।

---

property of another or the court regards it as immoral or opposed to public policy. In each of these cases, the consideration or object of an agreement is said to be unlawful. Every agreement, of which the object or consideration is unlawful, is void."

"If any part of a single consideration for one or more objects, or any one or any part of any one of several considerations for a single object, is unlawful, the agreement is void." "An agreement made without consideration is void."

"Agreements, the meaning of which is not certain or capable of being made certain, are void." "Agreements by way of wager are void and no suit shall be brought for recovering anything alleged to be won on any wager, or entrusted to any person to abide the result of any game or other uncertain event on which any wager is made."

এতদ্ভিন্ন পাত্র কাল প্রভৃতির সম্বন্ধে আরও অনেক বিষয় চুক্তি-বিষয়ক আইনে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে এস্থলে তাহা উল্লিখিত হইল না। প্রাচীন ব্যবহার-শাস্ত্রোক্ত নক্তকৃত, অন্তরগারকৃত ব্যবহারাদির বিষয় ইহাতে বিশেষ কিছু উল্লিখিত হয় নাই। এখন ঐ সকল বিষয় বিচার আমলে আসে না।

* বর্ত্তমানে এতদ্দেশে যে চুক্তি বিষয়ক আইন প্রচলিত আছে, তাহাতেও 'undue influence' বা অবৈধ সুযোগে নিষ্পন্ন চুক্তি অসিদ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। উক্ত আইনের ১৫শ ধারার মতে এইরূপে নিষ্পাদিত ব্যবহার অবৈধ। পরবর্ত্তী ধারায় এই অবৈধ সুযোগের বিষয় বুঝান হইয়াছে; যথা,—"A contract is said to be induced by *undue influence* where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other, and uses that position to obtain an unfair advantage over the other."

এইরূপে যে ব্যবহার সম্পাদিত হয়, চুক্তিকারী ইচ্ছা করিলে সে চুক্তি ভঙ্গ করিতে পারে। তাহাতে সে কোনরূপ অপরাধে অপরাধী হয় না। কেন-না, বিপন্ন অবস্থায় পড়িয়া তাহাকে ঐরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে তাহার কোনও সম্মতি ছিল না বা স্বাধীন ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াও সে উহা সম্পাদন করে নাই। যথা,—"When consent to an agreement is caused by undue influence, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused."—*Indian Contract Act*, Sec. 19A.

যথাসর্ব্বস্ব বিষয়-সম্পত্তি প্রভৃতি দান করিবার অঙ্গীকারে আবদ্ধ করেন অথবা বাধ্য হইয়া উদ্ধার-কর্ত্তার নিকট সে যদি সপরিজন দাসত্ব-স্বীকারের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়; তাহা হইলে সে চুক্তি বা অঙ্গীকার সিদ্ধ হইবে না। এরূপ চুক্তি নীতিবিরুদ্ধ, ন্যায়বিগর্হিত এবং ধর্ম্মপ্রতিবাধক। এই প্রকার চুক্তির অঙ্গীকৃত বিষয়, উদ্ধার-কর্ত্তা কোনরূপেই পাইবার যোগ্য নহেন। তবে শাস্ত্র-পারদর্শী ব্যক্তিগণের সিদ্ধান্তে যদি তিনি কিছু পাইবার অধিকারী হন, বিচারক তাঁহাকে সেইরূপ দাবী প্রদান করিবেন;—অর্থশাস্ত্রের ইহাই অভিমত। এ সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রের (দাসকল্পঃ কর্ম্মকরকল্পঃ দ্রষ্টব্য) উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল; যথা,—

"নদীবেগজ্বালাস্তেনব্যালোপরুদ্ধং সর্ব্বস্বপুত্রদারাত্মদানেনার্ত্তস্ত্রাতারমাহূয় নিস্তীর্ণঃ কুশলপ্রদিষ্টং বেতনং দদ্যাৎ। তেন সর্ব্বত্রার্ত্তদানানুশয়া ব্যাখ্যাতাঃ॥"

বারাঙ্গনার প্ররোচনায় তৎপ্রণয়ী ব্যক্তি কর্ত্তৃক সম্পাদিত অথবা প্রণয়ীর প্ররোচনায় বা ভীতি-প্রদর্শনে বারাঙ্গনা কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন যে অঙ্গীকার বা চুক্তি, তাহাও অসিদ্ধ। এইরূপ অবৈধ উপায়ে সম্পাদিত ব্যবহার বিচারে তিষ্ঠিতে পারে না। ছলকর্ত্তৃক নিষ্পন্ন চুক্তিও সে হিসাবে অসিদ্ধ। * 'উপধিকৃত' চুক্তি এই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। তবে বিশেষ বিশেষ স্থলে ইহার প্রতিষেধের বিষয়ও দৃষ্ট হয়। এস্থলে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ রাজ-নিযুক্ত গুপ্তচরের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল চর কর্ত্তৃক ছলপূর্ব্বক নিষ্পন্ন চুক্তি অসিদ্ধ হয় না। সে সকল স্থলে এমন অবস্থা সংঘটিত হয় যে, ছলচাতুরী ভিন্ন কার্য্য সিদ্ধ হইবার সম্ভবনা নাই; সে সকল স্থলে ঐরূপ পন্থাই অবলম্বনীয়;—অর্থশাস্ত্রের তাহা অভিমত। চোর চুরি করিয়াছে; অপহৃত দ্রব্যের সন্ধান মিলিতেছে না। এ ক্ষেত্রে চোরের সহিত সৌহার্দ্দ্যস্থাপনে গুপ্তচর যদি মূল্য-প্রদানের অঙ্গীকারে তাহার সহিত চুক্তি-সর্ত্তে আবদ্ধ হয় এবং তাহার ফলে যদি অপহৃত দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়া চর চুক্তি-ভঙ্গ করে—দ্রব্যের মূল্য না দেয়; তাহা হইলে চরগণের কোনও অপরাধ হইবে না। কারণ, তাহাদের নিষ্পাদিত ছলকর্ত্তৃক সম্পন্ন চুক্তি অসিদ্ধ বলিয়া শাস্ত্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পরন্তু চৌর্য্যাপরাধে চোরের দণ্ড হইবে। ছলাধিকৃত চুক্তির জন্য চরগণের প্রতি কোনও দণ্ডবিধান হইবে না। † চোরও চরগণের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবহার স্থাপন করিবার

---

* ছল-নিষ্পন্ন চুক্তি অসিদ্ধ—ভারতীয় চুক্তি-বিষয়ক আইনে তাহার বিধান আছে। আইনকর্ত্তা বলিয়াছেন,—"When consent to an agreement is caused by...fraud, misrepre-sentation &c. the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused.—The *Indian Contract Act.*

† অধুনা ছল-নিষ্পন্ন সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার অসিদ্ধ বলিয়া ব্যবহার-শাস্ত্রে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই আইনের ঊনবিংশ ধারায় এতদ্বিষয় দৃষ্ট হয়। ছল অনেক প্রকারের হইতে পারে। কোনও অপ্রকৃত বিষয়কে প্রকৃত বলিয়া প্রদর্শন করিলে, তাহা ছল মধ্যে গণ্য। প্রকৃত বিষয় গোপন রাখিলেও ছল হয়। স্থূলতঃ, যদ্দ্বারা কাহাকেও প্রতারিত করা যায়, তাহাই ছল। কার্য্যে হউক, বাক্যে হউক, ব্যবহারে হউক, প্রতারণার চেষ্টা থাকিলেই তাহা ছল মধ্যে গণ্য হইবে। ছলের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে ভারতীয় চুক্তিবিষয়ক আইনে নিম্নরূপ দৃষ্ট হয়; যথা,—"Fraud means and includes any of the following acts committed by a party to a contract, or with his connivance, or by his agent, with intent to deceive another party thereto or his agent, or to induce him to enter into

অধিকারী নহে। গুপ্তচর সম্বন্ধে মনুসংহিতায়ও ঐরূপ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। সেস্থলে নিক্ষেপাদি ব্যবহার-বিষয় প্রসঙ্গে গুপ্তচরের উল্লেখ। নিক্ষেপকারী চাহিলে যদি গচ্ছিত ধন কেহ না দেয়, তাহা হইলে উক্ত ধন-নির্ণয়ার্থ প্রাড়বিবাক ছলনাদির আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিতেন, আর তাহাতে তাঁহার বা চরের কোনও অপরাধ হইত না। মনুসংহিতা হইতে এতৎ-সম্বন্ধে কয়েকটী শ্লোক (অষ্টম অধ্যায়, ১৮১ম—১৮৪ম শ্লোক) নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা,—

"যো নিক্ষেপং যাচ্যমানো নিক্ষেপ্তুর্ন প্রযচ্ছতি। স যাচ্যঃ প্রাড়্বিবাকেন তন্নিক্ষেপ্তুরসন্নিধৌ॥
সাক্ষ্যভাবে প্রণিধিভির্বয়োরূপসমন্বিতৈঃ। অপদেশৈশ্চ সন্ন্যস্য হিরণ্যং তস্য তত্ত্বতঃ॥
স যদি প্রতিপদ্যেত যথান্যস্তং যথাকৃতম্। ন তত্র বিদ্যতে কিঞ্চিদ্‌যৎ পরৈরভিযুজ্যতে॥
তেষাং ন দদ্যাদ্‌যদি তু তদ্ধিরণ্যং যথাবিধি। উভৌ নিগৃহ্য দাপ্যঃ স্যাদিতি ধর্ম্মস্য ধারণা॥"

অর্থাৎ,—'নিক্ষেপকারী চাহিলে পর গচ্ছিত দ্রব্য যে না দেয়, নিক্ষেপকারীর অসাক্ষাতে প্রাড়বিবাক তাহার এইরূপ বিচার করিবেন;—সাক্ষীর অভাবে বয়স্ক ও রূপবান চর দ্বারা প্রাড়বিবাক ছলক্রমে ঐ ব্যক্তির নিকট হিরণ্যাদি দ্রব্য গচ্ছিত করাইবেন। পরে নিক্ষেপ-কারী চর প্রার্থনা করিলে পর, সে যদি ঐ গচ্ছিত দ্রব্য যে রূপে ও যে ভাবে দেওয়া হইয়াছিল, সেইরূপে ও সেইভাবে প্রত্যর্পণ করে, তবে উহার প্রতি অপরের অভিযোগের কোনও কারণ নাই,—ইহা বুঝিতে হইবে। যদি ঐ চরদিগের নিক্ষেপদ্রব্য না দেয়, তবে উহাকে নিগ্রহ করিয়া রাজা উহা হইতে উভয় নিক্ষেপই দেওয়াইবেন।' মনুসংহিতা ভিন্ন অন্য কোনও সংহিতাগ্রন্থে চর দ্বারা ব্যবহার-নির্ণয়ের বিষয় বিশেষভাবে উক্ত হয় নাই।

অর্থশাস্ত্র মতে যে সকল অসিদ্ধ চুক্তি স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে সিদ্ধ ও প্রামাণ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে 'তিরোহিত' চুক্তি অন্যতম। ইহার বেশ একটু বিশেষত্ব আছে।

তিরোহিত চুক্তি।

তিরোহিত শব্দে পরোক্ষ বুঝায়। অর্থ-শাস্ত্রের ইহাই অভিমত। মানব-দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থিত বা সম্পাদিত বিষয় পরোক্ষ; সুতরাং সাধারণের অজানিত বা অজ্ঞাত। আবার যাহা অবক্তব্য, তাহাও তিরোহিত। এ হিসাবে, অন্তরগারকৃত, অরণ্যকৃত, উপহ্বরকৃত, নক্তকৃত—সকল প্রকার চুক্তি বা অঙ্গীকার 'তিরোহিত' পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্তরগার ও অরণ্য প্রভৃতি স্থলে এবং

---

the contract :—(1) The suggestion, as a fact, of that which is not true by one who does not believe it to be true: (2) The active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact. (3) A promise made without any intention of performing it. (4) Any other act fitted to deceive: (5) Any such act or omission as the law specially declares to be fraudulent."

সকল প্রকার অঙ্গীকারেই স্বাধীন ইচ্ছার বা সম্মতির প্রয়োজন। যখন সম্মতি জ্ঞাপন বা বলিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াও পক্ষ-বিশেষ নির্ব্বাক থাকে, সেখানে এ বিধি প্রযোজ্য নহে। 'ভারতীয় কণ্ট্রাক্ট য়াক্ট' আইনে আছে—"Mere silence as to facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud unless the circumstance of the case are such that, regard being had to them, it is the duty of the person keeping silence to speak, or unless his silence is, in itself, equivalent to speech."

রাত্রিকালে যে সকল ব্যবহার নিষ্পাদিত হয়, তাহা প্রায়ই সাধারণের অবিদিত; সুতরাং তিরোহিত। রাত্রিকালে সকল স্থানই অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়; আর সেই জন্য যে কোনও স্থান মনুষ্য-দৃষ্টির অন্তরালে থাকিতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে, তিরোহিত শব্দে দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থিত বুঝায় এবং তাহা হইতে স্থান, অবস্থা ও কাল সম্বন্ধে একটা বিশিষ্ট ধারণা মনোমধ্যে উদয় হয়। সে সকল লুক্কায়িত স্থানে সম্পাদিত হইলে অঙ্গীকৃত বিষয় বা চুক্তি অসাক্ষিক হয় অর্থাৎ সাধারণের অবিদিত থাকে। সে সকল ব্যবহার অসিদ্ধ,—ইহাই সাধারণ নিয়ম। পূর্ব্বে এ বিষয় উক্ত হইয়াছে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ স্থলে যে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে এবং সে সম্বন্ধে যে বিশেষ বিধি কৌটিল্য বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে (৩১২ পৃষ্ঠায়) লিপিবদ্ধ করিয়াছি। 'তিরোহিত' চুক্তি যে ক্ষেত্রে সিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার বিশেষ বিধি উক্ত হইয়াছে, তাহা এই,—"পরোক্ষেণাধিকর্ণগ্রহণমবক্তব্যকরা।" অধিক ঋণ গ্রহণ স্থলে এবং অবক্তব্য বিষয়ে তিরোহিত চুক্তি সিদ্ধ প্রতিপন্ন হইতে পারে। বিষয়টী বিশদ করিবার জন্য একটী দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতেছি। রাম একজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তিনি দেশের প্রধান, সাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। অবস্থা-বিশেষে পড়িয়া তাঁহাকে অধিক পরিমাণ ঋণ করিতে হইল। এই ঋণগ্রহণের বিষয় সাধারণ্যে প্রচারিত হইলে, তাঁহার সে উচ্চ-সম্মানের লাঘব হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। এ স্থলে তিনি যে ঋণপত্র লিখিয়া দিবেন, তাহা সাধারণ্যে প্রচারিত না হইলেও এবং সাক্ষী প্রভৃতি না থাকিলেও তাহা অসিদ্ধ নহে। অন্য সকল অবস্থায় তিরোহিত চুক্তি ব্যর্থ হইবে; কিন্তু এ অবস্থায় উহা সিদ্ধ এবং প্রামাণ্য—অর্থশাস্ত্রের ইহাই অভিমত। অন্যপক্ষে 'অব্যক্তকর' তিরোহিত চুক্তিও উপেক্ষণীয় নহে। কারণ, সময় সময় এমন অবস্থা আসিয়া পড়ে যে, সে অবস্থার বিষয় সাধারণ্যে ব্যক্ত করা যায় না। সেরূপ অবস্থায় লোকে বাধ্য হইয়া যদি কাহারও সহিত কোনও অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়, তাহা হইলেও সে অঙ্গীকার বা চুক্তি সিদ্ধ-পর্য্যায়ভুক্ত। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ অর্থশাস্ত্রকার বারাঙ্গনার ও তৎপ্রণয়ীর অঙ্গীকারাদির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। অসদুপায়ে অযথা সুযোগ গ্রহণে যদি ঐ চুক্তি নিষ্পন্ন না হয়, তাহা হইলে, তিরোহিত পর্য্যায়ভুক্ত হইলেও, ঐরূপ চুক্তি সুসিদ্ধ হইবে। কিন্তু তাহাতে যদি কোনও অবৈধ ক্ষমতা পরিচালনার বিষয় সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে সে চুক্তি সিদ্ধ হইবে না,—পূর্ব্বে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। তিরোহিত চুক্তি কেবল রাত্রিকালে নিষ্পন্ন হওয়ারই নিয়ম। কিন্তু অন্যান্য চুক্তি সকল কালে সকল সময়ে এবং সকল অবস্থায় নিষ্পন্ন হইতে পারে। এ হিসাবে, অন্তরাগারকৃত প্রভৃতি চুক্তি-সমূহ হইতে ইহার একটু স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। অন্তরগারকৃত ব্যবহার—অন্দরমহলে সম্পন্ন হইবে; তাহা দিনমানেও হইতে পারে, রাত্রিকালেও হইতে পারে। অরণ্যকৃত ও উপহ্বরকৃত ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধেও ঐরূপ উক্তি প্রযোজ্য। আর এক পার্থক্য—অবক্তব্যত্ব ও নির্জ্জনতা বিষয়ে। তিরোহিত চুক্তির ইহাই বিশেষত্ব। কিন্তু অন্তরগারকৃত প্রভৃতি চুক্তি সম্বন্ধে এ বিশেষত্ব না থাকিতেও পারে। ঐরূপ বিশেষত্ব না থাকিলেও উহা তিরোহিত পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। অরণ্যকৃত, নক্তকৃত, উপহ্বরকৃত সকল প্রকার চুক্তি, ঐ বিশেষত্ব বর্জ্জিত হইলেও, তিরোহিত মধ্যে গণ্য।

বর্গ (জাতি, বর্ণ প্রভৃতি), লক্ষ্য (উদ্দেশ) ও বেতন (দাবী) * প্রভৃতি চুক্তি-ব্যহারের একটী প্রধান অঙ্গ। ঐ সকলের আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, বর্গ প্রভৃতির বিষয় যথাযথ উল্লিখিত না হইলে চুক্তি-ব্যবহার যুক্তির উপর তিষ্ঠিতে পারিত না। বর্গ-সম্বন্ধে কৌটিল্য আপন উদ্দেশ্য বিশেষ-ভাবে ব্যক্ত করেন নাই। বর্গ বলিতে চুক্তি-বিষয়ক কোন্ কোন্ বিষয় উহার অন্তর্ভুক্ত হয়, অর্থশাস্ত্রে তাহার বিশেষ কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে উহা হইতে অনুমান হয়, সবর্ণ ব্যক্তির সমক্ষে চুক্তি-ব্যবহার সম্পন্ন করাই কৌটিল্যের অভিমত। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের সাক্ষাতে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের সাক্ষাতে, বৈশ্য বৈশ্যের সম্মুখে এবং শূদ্র শূদ্রের সমক্ষে চুক্তি-ব্যবহার সম্পাদন করিবেন,—বর্গ শব্দের ব্যবহারে কৌটিল্য সেই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন বলিয়া অনুমান হয়। আবার স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকের সাক্ষাতে, পুরুষ পুরুষের সাক্ষাতে অঙ্গীকারবদ্ধ হইবেন,—তাহাও সিদ্ধান্ত হইতে পারে। স্বজাতি সবর্ণ ও সবৃত্তিজীবী ব্যক্তির সমক্ষে চুক্তি-ব্যবহার নিষ্পন্ন হইবার ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু যে সকল ক্ষেত্রে ঐরূপ ব্যক্তির অভাব হয়, সে অবস্থায় স্বজাতি সবর্ণ অথচ ভিন্ন-ব্যবসায়ী ব্যক্তিও সাক্ষী মধ্যে গণ্য হইতে পারে। তদভাবে বিভিন্ন বর্ণের ও বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তির সমক্ষে ব্যবহার নিষ্পন্ন হওয়ার বিধি কৌটিল্য বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে সংহিতা-শাস্ত্রের উক্তি-সমূহ অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল। মনু (অষ্টম অধ্যায়, ৬৮ম শ্লোক) বলিয়াছেন,—

বর্গ, লক্ষ্য বেতন প্রভৃতি।

"স্ত্রীণাং সাক্ষ্যং স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুর্দ্বিজানাং সদৃশা দ্বিজাঃ। শূদ্রাশ্চ সন্তঃ শূদ্রাণামন্ত্যানামন্ত্যযোনয়ঃ॥"

অর্থাৎ,—'স্ত্রীদিগের সাক্ষী স্ত্রীলোক হইবে, দ্বিজের সাক্ষী সদৃশ দ্বিজ হইবে; সাধু শূদ্রের শূদ্র সাক্ষী এবং নীচ জাতির সাক্ষী নীচজাতিই হওয়া উচিত।' কিন্তু অন্তরগার প্রভৃতি ব্যবহারে যে কোনও সাক্ষীর বিষয় মনু উল্লেখ করিয়াছেন। (অষ্টম অধ্যায়, ৬৯ম—৭০ম শ্লোক) যথা,—

"অনুভাবী তু যঃ কশ্চিৎ কুর্য্যাৎ সাক্ষ্যং বিবাদিনাম্। অন্তর্বেশ্মন্যরণ্যে বা শরীরস্যাপি চাত্যয়ে॥
স্ত্রিয়াপ্যসম্ভবে কার্য্যং বালেন স্থবিরেণ বা। শিষ্যেন বন্ধুনা বাপি দাসেন ভৃতকেন বা॥"

এ সকল স্থলে সাক্ষী বিচার করা নিষ্প্রয়োজন,—মনু বলিয়া গিয়াছেন। স্বজাতি সবর্ণ ব্যক্তির সমক্ষে ব্যবহারাদি নিষ্পন্ন করিবার ব্যবস্থা বিষয়ে মনুর সহিত যাজ্ঞবল্ক্য একমত। কিন্তু বিষ্ণু বা গৌতম সংহিতায় এ সকল বিষয়ের বিশেষ কোনও উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। অর্থশাস্ত্র মতে, চুক্তিকারী পক্ষগণ 'প্রমাণগুণযুক্ত' অর্থাৎ চুক্তি-সর্ত্তে আবদ্ধ হইবার যোগ্য ও অধিকারী কিনা, তাহা বিচার করা প্রয়োজন। উপযুক্ত পাত্র ভিন্ন চুক্তি অসিদ্ধ—পূর্ব্বে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। † দারিদ্র্যপীড়নে প্রপীড়িত আর্ত্তব্যক্তি; কোপনস্বভাব, মদোন্মত্ত

---

* কৌটিল্যোক্ত বেতন—ইংরাজী ভাষার Consideration এর সহিত তুলনা করা যায়। বেতন অর্থে যে বিষয়ের জন্য চুক্তি-ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়। শ্যামের নিকট ১০,০০০৲ টাকা লইয়া রাম তাহার একখানি বাড়ী শ্যামের নিকট বিক্রয় করিতে স্বীকার করিল। এস্থলে শ্যামের ১০,০০০৲ টাকা দিবার অঙ্গীকার, রামের বাড়ী সম্বন্ধে 'বেতন' পর্য্যায়ভুক্ত; আর রামের বাড়ী, শ্যামের ১০,০০০৲ টাকা সম্পর্কে 'বেতন' মধ্যে গণ্য। এইরূপ-ভাবে বেতন নির্দ্ধারণ ব্যবহার-শাস্ত্র-সম্মত।

† চুক্তিকর্ত্তার যোগ্যতা সম্বন্ধে ভারতীয় চুক্তি-বিষয়ক বিধানে এইরূপ বিধি দৃষ্ট হয়; যথা,—"Every person

মদ্যপায়ী, উন্মাদগ্রস্ত এবং অপগৃহীত ব্যক্তি—ইহাদের সহিত ব্যবহার-বিধানে আবদ্ধ হওয়া কদাচ কর্ত্তব্য নহে। * মন্বাদি স্মৃতিগ্রন্থে এতদনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। আর্ত্ত প্রভৃতির নিষ্পাদিত ব্যবহার নিষিদ্ধ হইলেও যদি তাহারা ঐরূপ ব্যবহার-বিধানে কোনও উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে ব্যবহার সিদ্ধ হয়,—অর্থশাস্ত্রের 'দাসকল্পে' এ বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। অর্থশাস্ত্রের আর একটী বিশেষ বিধি—'এজেণ্ট' বা প্রতিনিধির দ্বারা ব্যবহার সম্পাদন। কে কাহার প্রতিনিধি রূপে এইরূপ ব্যবহারসম্পন্ন করিবার অধিকারী, তৎসম্বন্ধে কৌটিল্য যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল ; যথা,—

"অপাশ্রয়বদ্ভিশ্চ কৃতাঃ, পিতৃমতা পুত্রেণ, পিত্রা পুত্রবতা, নিষ্কুলেন ভ্রাতা, কনিষ্ঠেনাবিভক্তাংশেন, পতিমত্যা পুত্রবত্যা চ স্ত্রিয়া, দাসাহিতকাভ্যাং অপ্রাপ্তা-তীতব্যবহারাভ্যাং, অভিশস্তপ্রব্রজিতব্যঙ্গব্যসনিভিশ্চান্যত্রনিসৃষ্টব্যবহারেভ্যঃ।"

অর্থাৎ,—আশ্রয়বদ্ভি বা আশ্রিত ব্যক্তিগণ, আশ্রয়দাতার অনুজ্ঞা অনুসারে তাঁহার প্রতিনিধি-স্বরূপ আশ্রয়দাতার পক্ষে চুক্তি-ব্যবহার সম্পন্ন করিতে পারে। পিতার প্রতিনিধিরূপে পুত্র, ভিন্ন-পরিবার-ভুক্ত জ্ঞাতি ভ্রাতা ভ্রাতার প্রতিনিধি-স্বরূপ, একান্নবর্ত্তী কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতিনিধি হইয়া ব্যবহার সম্পাদন করিবার অধিকারী। স্বামীর পক্ষে স্ত্রী, পুত্রের পক্ষে মাতা, প্রভুর পক্ষে কর্ম্মচারী বা ক্রীতদাস, অপ্রাপ্তব্যবহার বা নাবালক সাবালকের পক্ষে প্রতিনিধি-স্বরূপ ব্যবহার-কার্য্য সম্পাদন করিলে সে ব্যবহার সিদ্ধ হইবে। এতদ্ভিন্ন যাঁহারা 'অতীত-ব্যবহার' অর্থাৎ যাঁহারা নির্দ্দিষ্ট বয়ঃকাল অতিক্রম করিয়াছেন, অভিশস্ত (শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি), প্রব্রজিত (সন্ন্যাসী), ব্যঙ্গ (বিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তি) এবং ব্যসনী (ব্যসনাসক্ত ব্যক্তি) অন্য কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলে, তাঁহার পক্ষ হইয়া, চুক্তি-ব্যবহার সম্পন্ন করিতে পারেন। আর তাঁহাদের কৃত সে ব্যবহার অসিদ্ধ হয় না। মত্ত, উন্মত্ত, বৃদ্ধ, স্থবির প্রভৃতি ব্যবহার-স্থাপনায় বা ব্যবহার-সম্পাদনে অধিকারী নহে এবং তাহাদের নিষ্পাদিত ব্যবহার অসিদ্ধ,—মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু, গৌতম প্রভৃতি সংহিতাকারের ইহা অভিমত। এতদ্বিষয় পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু কৌটিল্যের মতে, তাঁহারা অপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইলে তাঁহাদের প্রতিনিধি-স্বরূপ ব্যবহার-

is competent to contract who is of age of majority according to law to which he is subject, and who is of sound mind, and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject....A person who is usually of unsound mind, but occasionally of sound mind, may make a contract when he is of sound mind. A person who is usually of sound mind, but occasionally of unsound mind, may not make a contract when he is of unsound mind."

* উন্মাদগ্রস্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত ব্যবহার নিষিদ্ধ বলিয়া সর্ব্বত্র বিহিত হইয়াছে কিন্তু যাহারা সময় সময় উন্মাদগ্রস্ত হয় এবং সময় সময় প্রকৃতিস্থ থাকে, তাহাদের প্রকৃতিস্থ থাকা সময়ে নিষ্পন্ন ব্যবহার অসিদ্ধ হয় না, ভারতীয় চুক্তি-বিষয়ক আইনে তাহা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। আবার প্রকৃতিস্থ অথচ রোগাক্রান্ত জন যখন রোগ-যন্ত্রণায় প্রলাপ বকিতে থাকে, সে সময় তাহার নিষ্পাদিত ব্যবহার সুসিদ্ধ নহে। Vide, *Indian Contract Act*, Sec. 11.

সম্পাদন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। তাঁহারা স্বয়ং কোনও বিষয়ে চুক্তি-ব্যবহার নিষ্পন্ন করিতে পারেন কিনা,—কৌটিল্য তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন নাই। সংহিতা গ্রন্থাদিতেও প্রতিনিধির দ্বারা ব্যবহার-স্থাপনার বিষয় বিবৃত হইয়াছে। নারদাদি ঋষির মতে, পিতা ভ্রাতা পুত্র বা অপর কোনও নিযুক্ত ব্যক্তি নিয়োগকর্ত্তার প্রতিনিধিরূপে ব্যবহার-সম্পাদনের অধিকারী। কিন্তু কেহ যদি অনিযুক্ত হইয়া কাহারও পক্ষে ব্যবহার উপস্থিত করেন, তিনি ন্যায়তঃ দণ্ডনীয়। এইরূপ ব্যবহারে যদি ব্যবহার-উত্থাপনকর্ত্তার পরাজয় হয়, তাহা হইলে তিনি তাহার ক্ষতিপূরণ করিবেন। যাহার পক্ষে তিনি ব্যবহার উত্থাপন করিয়াছেন, তিনি সে জন্য দায়ী হইবেন না; তিনি ক্ষতি-পূরণ করিতেও বাধ্য নহেন। বিষ্ণু-সংহিতায় প্রতিনিধি দ্বারা সাক্ষ্য দিবার ব্যবস্থা আছে। নির্দ্দিষ্ট সাক্ষী মৃত বা দেশান্তরগত হইলে, যাহারা তাহার বক্তব্য অবগত থাকিবে, তাহারাই প্রমাণ—বিষ্ণুতে এ বিধান দেখিতে পাই। তিনি বলিয়াছেন,—"উদ্দিষ্ট সাক্ষিণি মৃতে দেশান্তরগতে বা তদভিহিতশ্রোতারঃ প্রমাণম্॥" এতদ্ব্যতীত সংহিতা-গ্রন্থে এমন সকল অবস্থার বিষয়ও উল্লিখিত হইয়াছে, যেখানে পূর্ব্ব-পক্ষ বা প্রতিনিধি দ্বারা ব্যবহার সম্পাদন সম্ভবপর ছিল না। অপ্রাপ্ত-ব্যবহার ও অতীতব্যবহার প্রভৃতি ব্যক্তির ব্যবহার-যোগ্যতা ছিল না,—সকল সংহিতায়ই তাহার উল্লেখ আছে। অভিশস্ত ও বহিস্কৃত ব্যক্তি যেমন কৌটিল্য মতে স্বয়ং ব্যবহার-সম্পাদনের অযোগ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, সংহিতাদির মতেও তাঁহাদের সেই অযোগ্যতা নির্ণীত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য (দ্বিতীয় অধ্যায়, ৩৩ম শ্লোক) বলিয়াছেন,—

"মত্তোন্মত্তার্ত্তব্যসনিবালভীতাদিযোজিতঃ। অসম্বন্ধকৃতশ্চৈব ব্যবহারো ন সিদ্ধ্যতি॥"

অপর এক স্মৃতি-গ্রন্থে আছে,—"যশ্চ রাজ্ঞা বিবর্জ্জিত ভবেদ্বাদঃ ধর্ম্মবিদ্ভিরুদাহৃত।" যাহারা রাজদণ্ডে দণ্ডিত অথবা সমাজ-বহিস্কৃত, তাহারা মৃতের মধ্যে গণ্য; আর সেই জন্য তাহাদের সম্পাদিত ব্যবহার সকল কালেই অসিদ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহাদের নিষ্পাদিত ব্যবহার সম্বন্ধে কৌটিল্য বিশেষ কোনও মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। অপরের প্রতিনিধি-স্বরূপ তাহারা অপরের পক্ষে ব্যবহার সম্পাদন করিবার অধিকারী,—তিনি কেবলমাত্র ইহাই বলিয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহার-সম্পাদন-যোগ্যতা সম্বন্ধে কৌটিল্যের অভিমত স্মৃতির অনুসারী। নিষিদ্ধ-স্থলে অপরের সহিত অর্থ-সম্বন্ধে যুক্ত হওয়া স্ত্রীলোকের পক্ষে ন্যায়-বিগর্হিত,—কৌটিল্য সে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। অর্থশাস্ত্রের 'বিবাহ-সংযুক্তে—প্রতিষেধ' অংশে এতদ্বিষয়ের উল্লেখ আছে।

অসাক্ষিক ভিন্ন অন্য সকল প্রকার ব্যবহারেই সাক্ষীর প্রয়োজন; আর বিশেষ বিশেষ কাল ও স্থান ব্যতীত অসাক্ষিক ব্যবহার প্রমাণ মধ্যে গণ্য হয় না;—পূর্ব্ববর্ত্তী অংশ-সমূহে এ সকল বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু সে সাক্ষীরও প্রকারভেদ ছিল। সাক্ষী—সত্য ও মিথ্যা উভয়ই হইতে পারিত। মিথ্যাসাক্ষী স্থলে নানারূপ দণ্ডের বিধান স্মৃতি-শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। সে দণ্ড—ব্রাহ্মণের পক্ষে একরূপ বিহিত হইত; ক্ষত্রিয়ের পক্ষে একরূপ ব্যবস্থা ছিল। বৈশ্যের পক্ষে একরূপ এবং শূদ্রের পক্ষে অন্যরূপ দণ্ডের বিধান বিধিবদ্ধ হইয়াছিল।

সাক্ষ্যের প্রকার।

কাম-ক্রোধ-লোভ-অনবধানতা-অজ্ঞানতা প্রভৃতি ভেদে মিথ্যা সাক্ষ্য চারি ভাগে বিভক্ত। ক্রোধাধীন হইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে তিন হাজার পণ, লোভাধীন মিথ্যা সাক্ষীর এক হাজার পণ, কামাধীন মিথ্যা সাক্ষীর আড়াই হাজার পণ, অজ্ঞানতা-বশতঃ মিথ্যা সাক্ষী দিলে দুই শত পণ এবং অনবধানতাবশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে এক শত পণ দণ্ডের বিষয়—মনু বিহিত করিয়াছেন।* যাজ্ঞবল্ক্য এবং বিষ্ণু এতদ্বিষয়ে অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তবে যে স্থলে সত্য-কথা কহিলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের প্রাণবধ হয়, সেস্থলে সত্য অপেক্ষা মিথ্যা-কথনই প্রশস্ত; আর সে মিথ্যাকথনে কোনও দণ্ড হইবে না;—স্মৃতিশাস্ত্রকারগণের ইহা অভিমত। মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, বিষ্ণু-সংহিতা, গৌতম-সূত্র ও বসিষ্ঠ-সংহিতা হইতে এতদ্বিষয়ক শ্লোক-কয়টী যথাক্রমে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

"শূদ্রবিট্‌ক্ষত্রবিপ্রাণাং যত্রর্তোক্তৌ ভবেদ্বধঃ।
তত্র বক্তব্যমনৃতং তদ্ধি সত্যাদ্বিশিষ্যতে॥"—মনু।
"বর্ণিনাস্তু বধো যত্র তত্র সাক্ষ্যনৃতং বদেৎ।
তৎপাবনায় নির্ব্বাপ্যশ্চরুঃ সারস্বতো দ্বিজৈঃ॥"—যাজ্ঞবল্ক্য।
"সাক্ষিণশ্চ সত্যেন পূয়ন্তে। বর্ণিনাং যত্র বধস্তত্রানৃতেন॥"—বিষ্ণু।
"নানৃতবচনে দোষো জীবনঞ্চেত্তদধীনং।"—গৌতম।
"উদ্বাহকালে রতিসম্প্রয়োগে প্রাণাত্যয়ে সর্ব্বধনাপহারে।
বিপ্রস্য চার্থে অনৃতং বদেয়ুঃ পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি॥"—বসিষ্ঠ।

* মিথ্যা-সাক্ষ্য দেওয়া ও মিথ্যা-ব্যবহার-স্থাপন—চিরকালই দূষণীয়। প্রাচীন-কালের ব্যবহার-শাস্ত্রে এতদ্বিষয় যেমন দণ্ডনীয় বলিয়া বিহিত; ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের বিধান অনুসারেও উহা তেমনি দণ্ডার্হ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। দণ্ডবিধি আইনের (Indian Penal Code) বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন-রূপ দণ্ডের বিধান আছে এস্থলে সে সকলের পুঙ্খানুপুঙ্খ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সাধারণ বিধি যাহা, তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল; যথা,—"Whoever intentionally give false evidence in any stage of a judicial proceeding or fabricates false evidence for the purpose of being used in any stage of a judicial proceeding, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine; and whoever intentionally gives or fabricates false evidence in any other case shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine."—Sec. 193.

"Whoever with intent to cause injury to any person, institutes, or causes to be instituted, any criminal proceeding against that person, or falsely charges any person with having committed an offence, knowing that there is no just or lawful ground for such proceeding or charge against that person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine."—Sec. 211.

এইরূপ, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইবার উপযোগী মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিলে, অভিযোগকারীর সাত বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের আদেশ হইতে পারে। এই প্রকার মকদ্দমা স্থলে মিথ্যা সাক্ষী দিলে, সাক্ষীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পর্য্যন্ত হইবার বিধি, দণ্ডবিধি আইনে বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

অধুনা যেমন অর্থী, প্রত্যর্থী ও সাক্ষীদের উত্তরাদি লিপিবদ্ধ করিবার প্রথা বর্ত্তমান আছে ; প্রাচীন কালেও সে প্রথার বিদ্যমানতার পরিচয় পাওয়া যায়। এখন যেমন উত্তর লিখিবার পর তাহা উত্তরকারীকে শুনাইবার ব্যবস্থা বিহিত আছে ; প্রাচীনকালেও সে প্রথা বর্ত্তমান ছিল,—প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রন্থান্তর হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। কথিত হয়,—শ্লোকটী কাত্যায়ন কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছিল। কিন্তু আধুনিক সংস্করণে শ্লোকটী দৃষ্ট হয় না। সে শ্লোকটী এই,—

"পূর্ব্বপক্ষং স্বভাবোক্তং প্রাড়্‌বিবাকোঽভিলিখয়েৎ।
পাণ্ডুলেখেন ফলকে ততঃ পত্রে বিশোধিতম্॥"

অর্থী, প্রত্যর্থী প্রভৃতির উত্তর এ হিসাবে প্রথমে পত্রে লেখা হইত না। প্রথমতঃ প্রাড়বিবাক্ বা বিচারক মৃত্তিকা-ফলকে উহা লিখিয়া লইতেন। পরে উত্তরকারীকে উহা শুনাইতে হইত। উত্তরকারী যদি বিশুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিত, তাহা হইলে সে উত্তর পত্রে লিপিবদ্ধ করিবার নিয়ম ছিল। কিন্তু প্রত্যর্থী কোনও উত্তর না দিলে, অর্থীর দাবী সপ্রমাণ হইয়া যাইত। অর্থী যদি তাহার ভাষার কোনও পরিবর্ত্তন সাধন করিবার অভিলাষী হইতে, তাহা হইলে প্রত্যর্থীর উত্তর-দানের পূর্ব্বে তাহার বর্ণিত ভাষার ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারিত। কিন্তু প্রত্যর্থীর উত্তর-দানের পর আর কোনও পরিবর্ত্তন চলিত না।* ছলে, বলে বা স্তোক-বাক্যে যে সকল ব্যবহার সম্পন্ন হইত, তাহা অসিদ্ধ—স্মৃতি-শাস্ত্রকার ও অর্থশাস্ত্রকার সকলেরই এই অভিমত। মনু বলিয়াছেন,—'বলপূর্ব্বক যাহা কিছু দত্ত হয়, বলপূর্ব্বক যাহা কিছু ভুক্ত হয়, বলপূর্ব্বক যাহা কিছু লিখিত হয়,—বলপূর্ব্বক যাহা কিছু কৃত হয়,—তাহার সকলই অকৃত বা অসিদ্ধ।

"বলাদ্দত্তং বলাদ্ভুক্তং বলাদ্যচ্চাপি লেখিতম্। সর্ব্বান্ বলকৃতানর্থানকৃতান্ মনুরব্রবীৎ॥"

এই সকল বিষয় সপ্রমাণ করিবার জন্য প্রাড়বিবাক স্বেচ্ছাক্রমে উভয় পক্ষেরই অমানিত তৃতীয় ব্যক্তিকে ব্যবহারের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন। আর সেই ব্যক্তি যদি যথাদৃষ্ট ও যথাশ্রুত সত্য কথা বলিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সে উত্তর সমাদৃত হইত। ব্যবহার-সপ্রমাণে দ্বিবিধ ক্রিয়ার বিষয় শাস্ত্র-গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথম—মানুষী ; দ্বিতীয়—দৈবী। সাক্ষী লেখ্যাদি দ্বারা যে ব্যবহার সপ্রমাণ করা হয়, সেই সাক্ষী-লেখ্যাদি প্রমাণ মানুষী। আর যেখানে সাক্ষী বা লেখ্য কিছুই নাই, সেখানে দিব্য বা শপথ দ্বারা

---

* বিচারালয়ে আজিকালি যে পদ্ধতি অনুসৃত হয়, প্রাচীন পদ্ধতি হইতে তাহা একটু স্বতন্ত্র। প্রত্যর্থীর উত্তর দিবার পূর্ব্বে অর্থী ভাষার আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারিতেন। কিন্তু দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের 'প্লিডিং' অংশে দেখা যায়, অর্থী ও প্রত্যর্থী যে কোনও সময়ে ভাষার পরিবর্ত্তন-সাধন করিতে পারেন। এ সম্বন্ধে নিম্নে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইল,—"The Court may at any stage of the proceeding allow either party to alter or amend his pleadings in such manner and on such terms as may be just and all such amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real questions in controversy between the parties." প্রত্যর্থীর উত্তরের আবশ্যকানুরূপ পরিবর্ত্তন-সাধনের বা সংশোধনের বিষয় স্মৃতি-শাস্ত্রাদিতে বিশেষ কিছু উল্লিখিত হয় নাই। কিন্তু এখনকার বিধান মতে অর্থী ও প্রত্যর্থী উভয় পক্ষই ভাষার ও উত্তরের আবশ্যক-মত পরিবর্ত্তন-সাধন করিতে পারেন।

ব্যবহার নিষ্পন্নের ব্যবস্থা হয়;—তাহাই হইল দৈব্য। বিষয়টী সুগম ও সহজবোধ্য করিবার নিমিত্ত মনু-সংহিতা হইতে একটী শ্লোক (৮ম অধ্যায়, ১০৯ম শ্লোক) উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

"অসাক্ষিকেষু ত্বর্থেষু মিথো বিবদমানয়োঃ।
ন বিন্দংস্তত্ত্বতঃ সত্যং শপথেনাপি লম্ভয়েৎ॥"

অসাক্ষিক সর্ব্বপ্রকার বিবাদ-স্থলেই মনু দিব্য-ধারণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের বিধান অন্যরূপ। তিনি বিশেষ বিশেষ স্থলে, রাজদ্রোহ ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি গুরুতর অভিযোগ সম্বন্ধে, দিব্য-ধারণের ব্যবস্থা দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি (২য় অধ্যায়),—

"মহাভিযোগেষেতানি শীর্ষকস্থেঽভিযোক্তারি॥" ৯৭॥
"নৃপার্থেষ্বভিযোগে চ বহেয়ুঃ শুচয়ঃ সদা॥" ১০১॥

বিষ্ণুসংহিতার মতেও গুরুতর অভিযোগ ভিন্ন অন্যত্র দিব্য-গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু যে ক্ষেত্রে প্রত্যর্থীর নির্দ্দেশমত অর্থী দণ্ড-গ্রহণে স্বীকার করিতেন, সে ক্ষেত্রে দিব্য প্রমাণ প্রশস্ত ছিল। তবে, গুরুতর অভিযোগাদি বিষয়ে অর্থীর ঐরূপ শপথের আবশ্যক হইত না। দিব্য দ্বারা ব্যবহার-নির্ণয় সে ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়ম মধ্যে পরিগণিত ছিল। স্থূল-দৃষ্টিতে দেখিলে, গুরুতর অভিযোগ ভিন্ন অন্য ক্ষেত্রে, সাক্ষী প্রভৃতি স্থলে, দিব্য-প্রমাণের অনাবশ্যকতার বিষয় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। আর একটী কথা—চুক্তি-ব্যবহার-সংক্রান্ত। চুক্তির প্রকৃতি সম্বন্ধে শাস্ত্রকার যে বিধানের উল্লেখ করিয়াছেন, তদনুসারে সর্ব্বপ্রকার করণই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়। অর্থশাস্ত্রে ও স্মৃতি-গ্রন্থাদিতে ঋণাদান, বিক্রয়, নিক্ষেপ, উপনিধি, প্রতিভূ, সম্ভূয়-সমুত্থান, দাসকল্প, কর্ম্মকরকল্প প্রভৃতি চুক্তি-ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। দায় প্রভৃতিও এক হিসাবে চুক্তির অন্তর্গত। বন্ধকও চুক্তি-পর্য্যায়ভুক্ত।

চুক্তি-নিষ্পাদিত ব্যবহার-বিশেষে প্রতিভূর আবশ্যকতা অনুভূত হয়। প্রাচীন সংহিতা-গ্রন্থে ঋণাদান-সংক্রান্ত বিধানে প্রতিভূর প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। অবস্থা-ভেদে কৌটিল্যও প্রতিভূ বা জামিনের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন বটে; কিন্তু তাহাও ঋণ, দান-বিক্রয় প্রভৃতির প্রসঙ্গেই উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন-কালে ঋণদান ও ঋণ-গ্রহণ মুখ্য ব্যাপার ছিল। শাস্ত্রকারগণ তাই ঐ সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ সমূহ প্রথমে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন;—ঋণ-প্রকরণের বাহুল্য দৃষ্টে এই ধারণাই প্রবল হয়। প্রতিভূ তিন প্রকার—দর্শন-প্রতিভূ, প্রত্যয়-প্রতিভূ ও দান-প্রতিভূ। এতদ্ব্যতীত যে প্রতিভূ, তাহা 'আধি' নামে অভিহিত হইয়াছে। অপরাধী ধৃত হইয়াছে; যিনি তাহাকে আবশ্যক মত দেখাইয়া দিবার অঙ্গীকারে প্রতিভূ বা জামিন হন, তিনি—দর্শন-প্রতিভূ। ঋণদান স্থলে, ঋণদাতার অবিশ্বাস উৎপন্ন হইলে যিনি প্রতিভূ হইয়া বলেন,—'এ ব্যক্তি ঠকাইবে না, ইহাকে ঋণ দিতে পারেন, ইনি বিশ্বাসী;—তিনি প্রত্যয়-প্রতিভূ। আর 'ঋণকারী ঋণ না দিলে, আমি তাহা দিব'—এইরূপ অঙ্গীকারে যিনি প্রতিভূ বা জামিন হন, তিনি দান-প্রতিভূ। এতদ্ভিন্ন সম্পত্তি, অলঙ্কার প্রভৃতি বন্ধক রাখিলে, ঐ সম্পত্তি বা অলঙ্কার 'আধি' নামক জামিন পর্য্যায়ভুক্ত হয়। পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ প্রতিভূর দায়িত্ব-সম্বন্ধে সংহিতা-শাস্ত্রে নানা বিধান বিহিত আছে। ঋণকারী যদি ঋণ-পরিশোধ না করে, তাহা হইলে প্রতিভূদিগের

প্রতিভূ প্রসঙ্গ।

নিকট হইতে ঐ ঋণ আদায় হইবে। প্রতিভূগণের মৃত্যু হইলে, তাঁহাদিগের উত্তরাধিকারিগণ ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য হইবেন। এ সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন; যথা,—

"যো যস্য প্রতিভূস্তিষ্ঠেদ্দর্শনায়েহ মানবঃ। অদর্শয়ন্ স তং তস্য প্রযচ্ছেৎ স্বধনাদৃণম্॥
দর্শনপ্রাতিভাব্যে তু বিধিঃ স্যাৎ পূর্ব্বচোদিতঃ। দানপ্রতিভুবি প্রেতে দায়াদানপি দাপয়েৎ॥
অদাতরি পুনর্দাতা বিজ্ঞাতপ্রকৃতাবৃণম্। পশ্চাৎপ্রতিভুবি প্রেতে পরীপ্সেৎ কেন হেতুনা॥
নিরাদিষ্টধনশ্চেৎ তু প্রতিভূঃ স্যাদলং ধনঃ। স্বধনাদেব তদ্দদ্যান্নিরাদিষ্ট ইতি স্থিতিঃ॥"

অর্থাৎ,—'যে যাহার দর্শন-প্রতিভূ বা হাজির জামিন থাকিবে, সে যদি যথাকালে অধমর্ণকে উপস্থিত করিয়া না দিতে পারে, তবে উত্তমর্ণের ঋণ তাহাকে দিতে হইবে। দান-প্রতিভূ সম্বন্ধে বিধান এই যে, পিতা মাল জামিন রাখিয়া মরিয়া গেলে পুত্রাদি দায়াদগণকে ঐ ঋণ দিতে হইবে। যদি দর্শন-প্রতিভূ বা প্রত্যয়-প্রতিভূ অধমর্ণের নিকট হইতে ঋণ-শোধনের উপযোগী উচিত ধন গ্রহণ করিয়া প্রতিভূ হইয়া মরিয়া যান, তাহা হইলে পুত্রগণকে অর্থ দ্বারা উত্তমর্ণের ঋণ দিতে হইবে।' এতৎ-সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য, মনুর সহিত একমত। তিনিও বলিয়াছেন,—দর্শন-প্রতিভূ বা দান-প্রতিভূ যদি আপনাদের কথা ঠিক না রাখেন, তাহা হইলে রাজা তাঁহাদের দ্বারা উত্তমর্ণের অর্থ দেওয়াইবেন।' কিন্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে,—যদি ইতিমধ্যে তাঁহাদিগের পরলোক প্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে কিরূপ বিধান বিহিত হইবে? তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—'দানের প্রতিভূর অভাবে তৎপুত্র দ্বারা রাজা উত্তমর্ণের প্রদত্ত ধন দেওয়াইবেন। এ সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি; যথা,—

"দর্শনে প্রত্যয়ে দানে প্রতিভাব্যং বিধীয়তে। আদৌ তু বিতথে দাপ্যাবিতরস্য সুতা অপি॥
দর্শনপ্রতিভূর্যত্র মৃতঃ প্রাত্যয়িকোঽপি বা। ন তৎ পুত্রা ঋণং দদ্যুর্দদ্যুর্দানায় যে স্থিতাঃ॥"

বিষ্ণু-সংহিতায়ও সেই একই উক্তি দেখিতে পাই। বিষ্ণুও বলিয়াছেন,—দর্শনে, প্রত্যয়ে ও দানে প্রতিভূত্ব বিহিত হয়। কথা ঠিক না থাকিলে অর্থাৎ অধমর্ণ উত্তমর্ণের ঋণ না দিলে (রাজা উত্তমর্ণের প্রদত্ত অর্থ) প্রথম দুই জনের নিকট হইতে দেওয়াইবেন।' যথা,—"দর্শনে প্রত্যয়ে দানে প্রাতিভাব্যং বিধীয়তে। আদ্যৌ তু বিতথে দাপ্যাবিতরস্য সুতা অপি॥" কিন্তু বহু ব্যক্তি যে স্থলে প্রতিভূত্ব গ্রহণ করেন, তখন তাহার বিধান অন্যরূপ। মনুতে এ সম্বন্ধে কোনও বিশেষ বিধি দৃষ্ট হয় না। গৌতমাদিও কোনও বিশেষ বিধান বিধিবদ্ধ করেন নাই। কেবল যাজ্ঞবল্ক্য ও বিষ্ণু সংহিতাদ্বয়ে এতৎসম্বন্ধে স্বতন্ত্ররূপ ব্যবহারের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—"বহুবঃ স্যুর্যদি স্বাংশৈর্দদ্যুঃ প্রতিভুবো ধনম্। একচ্ছায়াশ্রিতেষ্বেষু ধনিকস্য যথা রুচিঃ॥" অর্থাৎ,—যদি অনেক ব্যক্তি অংশ নির্দ্দেশ করিয়া একজনের প্রতিভূ হয়, তাহা হইলে, যে যেরূপ অংশে প্রতিভূ, সে সেইরূপ দিবে। আর যদি বিশেষ অংশ নির্দ্দেশ না করিয়া সকলে মিলিয়া অধমর্ণের সদৃশ হয়, তাহা হইলে উত্তমর্ণের অভিপ্রায় অনুসারে প্রতিভূগণ অর্থ দিতে বাধ্য।' যেখানে কোনও অংশ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, সেখানে উত্তমর্ণ ইচ্ছা করিলে কোনও এক ব্যক্তির নিকট হইতে সমস্ত ঋণ আদায় করিতে পারেন; অথবা, কাহারও নিকট অল্প, কাহারও নিকট অধিক,—এইরূপ হিসাবেও ঋণ গ্রহণের অধিকারী; আবার তুল্যাংশে আদায় করিতেও তিনি সম্পূর্ণ যোগ্য;—দত্তবৃত্তঃ

সংহিতাকারের ইহাই অভিপ্রায়। বিষ্ণু-সংহিতায়ও ঐ অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে সংহিতার উক্তি ; যথা,—"বহবশ্চেৎ প্রতিভুবো দদ্যুস্তেঽর্থং যথাকৃতম্। অর্থেঽবিশেষিতে তেষু ধনিকচ্ছন্দতঃ ক্রিয়াঃ॥" অর্থাৎ,—বহু ব্যক্তি প্রতিভূ হইলে, যে যেরূপ অর্থ দিতে অঙ্গীকার করিবে, সে সেইরূপ অর্থ প্রদান করিবে। আর অর্থ সম্বন্ধে বিশেষ কোনও উল্লেখ না থাকিলে, ধনীর অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য হইবে।' ইহাই হইল সাধারণ নিয়ম। কিন্তু বিশেষ বিশেষ স্থলে প্রতিভূর উত্তরাধিকারিগণ পিতৃকৃত প্রাতিভাব্য ঋণ-প্রদানে বাধ্য হন না। পূর্ব্বে (৩০২ম পৃষ্ঠায়) যে 'মাক্ষিক' ঋণের বিষয়ে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা এই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। * মনু এতৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন,—'দর্শন-প্রতিভূ হেতু ধন দিতে হইলে, ভণ্ড প্রভৃতিকে পরিহাস জন্য বৃথা দানে, দ্যূতক্রীড়া বা সুরাপান নিমিত্ত দেয়, দণ্ডনিমিত্ত দেয় এবং শুল্কের অবশেষ—পিতৃকৃত এই সকল দেয় পুত্রকে দিতে হইবে না।' মনুসংহিতা হইতে নিম্নে এতৎসংক্রান্ত একটী শ্লোক (অষ্টম অধ্যায়, ১৫৯ম শ্লোক) উদ্ধৃত করিতেছি ; যথা,—

"প্রাতিভাব্যং বৃথাদানমাক্ষিকং সৌরিকঞ্চ যৎ।
দণ্ডশুল্কাবশেষঞ্চ ন পুত্রো দাতুমর্হতি॥"

যাজ্ঞবল্ক্যের মতেও এই সকল পিতৃঋণ উত্তরাধিকারিগণ পরিশোধ করিতে বাধ্য নহেন। তিনিও বলিয়াছেন,—"সুরাকামদ্যূতকৃতং দণ্ডশুল্কাবশিষ্টকম্। বৃথাদানং তথৈবেহ পুত্রো দদ্যান্ন পৈতৃকম্॥" গৌতমের মতে উত্তরাধিকারী ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য; তবে সে ঋণ যদি পিতার জামিনী জন্য হয়, অথবা পিতার বাণিজ্যের জন্য যদি কিছু রাজকর দেয় থাকে, কিম্বা মদের দোকানে বা দ্যূতকারীর নিকট পিতা যদি ঋণী হইয়া পরলোক গমন করেন, অথবা পিতার যদি কিছু রাজদণ্ড দেয় থাকে, তাহা হইলে পুত্র বা উত্তরাধিকারিগণ সে ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য হইবে না। গৌতম বলিয়াছেন,—"ঋক্‌থভাজি ঋণং প্রতিকুর্য্যুঃ। প্রাতিভাব্যবণিকশুল্কমদ্যদ্যূতদণ্ডান্ পুত্রানধ্যাভবেয়ুঃ॥" বসিষ্ঠেরও ঐরূপ আদেশ। তিনিও বলিয়াছেন,—"প্রতিভাব্যং বৃথাদানমাক্ষিকং সৌরিকঞ্চ যৎ। দণ্ডশুল্কাবশিষ্টেন ন পুত্রো দাতুমর্হতীতি॥" অর্থাৎ,—'পিতার প্রাতিভাব্য বা দর্শন ও প্রত্যয় প্রতিভূ-জনিত দেয় অর্থ, বৃথা দান, দ্যূত-ঋণ, সুরা-ঋণ, রাজদণ্ডের অবশিষ্ট দেয় এবং শুল্কের অবশিষ্ট দেয় আর পুত্র দিতে বাধ্য নহে।' বিষ্ণু-সংহিতায় ইহার কোনও উল্লেখ নাই। তাহাতে মনে হয়, সে সময় এ বিধানের কঠোরতা অনেকটা শিথিল হইয়াছিল। কিন্তু আজি-কালি যে প্রকার ঋণই হউক না কেন, উত্তরাধিকারিগণ তাহা দিতে বাধ্য। এখন পূর্ব্ব-বিধি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতাও অনুভূত হয়। আক্ষিক ঋণের বা বৃথা-দানের অজুহাতে সকল প্রকার ঋণই অনাদেয় হইতে পারে। প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করিতে পারিলেই যখন ঋণমুক্ত হওয়ার পক্ষে কোনও সংশয় ছিল না ; তখন প্রমাণবলে যৌক্তিক ঋণকেও আক্ষিক, সুরাপান-জনিত বা বৃথাদান-জনিত ঋণ প্রভৃতির পর্য্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারিত। বোধ হয় এই সকল বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা করিয়াই

---

* এই গ্রন্থের ৩০২ পৃষ্ঠায় 'মাক্ষিক' শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে। 'মাক্ষিক' শব্দ ব্যবহার-শাস্ত্র-সম্মত নহে। 'আক্ষিক' শব্দ মুদ্রাকর-প্রমাদে 'মাক্ষিক' রূপে মুদ্রিত হইয়াছে।

পরবর্ত্তিকালে ব্যবহার-শাস্ত্রকারগণ সর্ব্বপ্রকার ঋণে উত্তরাধিকারীর বা স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির দায়িত্বের বিষয় বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

প্রতিভূর অপর পর্য্যায়—আধি। প্রাচীন ব্যবহার-শাস্ত্রে আধি—বন্ধকীয় দ্রব্য বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঋণাদান প্রভৃতি প্রসঙ্গেই প্রধানতঃ ইহার উল্লেখ। সংহিতা-শাস্ত্রকার ও অর্থশাস্ত্রকার ঋণ-প্রসঙ্গে আধির উপযোগিতার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

কৌটিল্য-মতে আধি।

স্থাবর-অস্থাবর ভেদে আধি দ্বিবিধ। আধি সম্বন্ধে কৌটিল্য স্বতন্ত্র-ভাবে বিশেষ কোনও নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন নাই। তবে ঋণ এবং নিক্ষেপ ও উপনিধি প্রসঙ্গে তিনি যে সকল বিধি-বিধান প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহা হইতে 'আধির' বিধান সম্বন্ধে কিছু কিছু আভাষ পাওয়া যায়। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী সংহিতাকারগণ 'আধি' সম্বন্ধে বিশেষ বিধি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। আধি বা বন্ধকীয় দ্রব্য যদি উত্তমর্ণ ব্যবহার করেন অথবা বিক্রয় করেন, অন্যত্র বন্ধক দেন অথবা হারাইয়া ফেলেন, কিংবা যদি তাঁহার নিকট হইতে ঐ দ্রব্য দস্যুতে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়; তাহা হইলে উত্তমর্ণ তাহার কিরূপ ক্ষতিপূরণ করিবেন এবং আধি প্রত্যর্পিত না হইলে অধমর্ণ ঋণ-পরিশোধে বাধ্য হইবে কি না;—কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে তৎসংক্রান্ত কতকগুলি সাধারণ বিধি দৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে তিনি যে কয়টী নিয়ম নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, তাহা এই;—'উত্তমর্ণ বন্ধকীয় দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারিবেন—এরূপ সর্ত্ত হইলে, বন্ধকদাতা অধমর্ণ যে কোনও সময়ে তাহা ফিরাইয়া লইতে পারিবেন; আর তৎকৃত সেই ঋণের জন্য উত্তমর্ণকে কোনও সুদ দিতে হইবে না। কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ বন্দোবস্তের অবিদ্যমানে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বন্ধকীয় দ্রব্য প্রতিগ্রহণ করিবার ব্যবস্থা। আর সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের যে বৃদ্ধি বা সুদ হইবে, উত্তমর্ণ তাহা প্রাপ্ত হইবেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অধমর্ণ যদি উহা ফিরিয়া পাইবার প্রার্থনা করে, আর উত্তমর্ণ যদি তাহা ফিরাইয়া না দেন; তাহা হইলে কৌটিল্য তাঁহার বার পণ দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। উত্তমর্ণের বিদেশে থাকা সময়ে অধমর্ণ যদি তাঁহার বন্ধকীয় দ্রব্য গ্রহণ করিতে যান, তাহা হইলে উত্তমর্ণের প্রাপ্য ঋণ, গ্রামবৃদ্ধগণের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া, তিনি তাঁহার আধি লইতে পারিবেন। অন্যপক্ষে, বন্ধকীয় দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া, ঋণের পরিবর্ত্তে তাহা উত্তমর্ণকে বুঝাইয়া দিতে পারেন। এইরূপ ব্যবস্থা হইলে পরে আর তাঁহাকে কোনও সুদ দিতে হইবে না। কালবশে বন্ধকীয় দ্রব্যের মূল্যের হ্রাস হওয়ার সম্ভাবনা বুঝিলে, বিচারালয়ের অনুমতি লইয়া 'আধিপাল' বা বন্ধকপরিদর্শনকারীর সমক্ষে উহা নিলাম-বিক্রয় হইতে পারিবে। এইরূপ বিক্রয় উত্তমর্ণের বা বিশিষ্ট রাজ-কর্ম্মচারীদিগের সমক্ষে হইবার বিধান, অর্থ-শাস্ত্রকার প্রদান করিয়াছেন। স্থূলতঃ, আধি বা বন্ধক সম্বন্ধে কৌটিল্যের ইহাই অভিমত ছিল। কৌটিল্যের মতে স্থাবর আধি—দ্বিবিধ। বিনা-পরিশ্রমে যাহা হইতে ভূস্বামীর কিছু সঞ্চয় হয়,—তাহা প্রথম পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। আর পরিশ্রমের দ্বারা যাহা হইতে কিছু সঞ্চয় করা যায়, তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। এইরূপ দ্বিবিধ আধি বন্ধক দিয়া ঋণ-গ্রহণের ব্যবস্থা অর্থশাস্ত্রকার বিহিত করিয়াছেন। উৎপন্ন দ্রব্যে সুদ সমেত মূলধন পরিশোধ হইলে উত্তমর্ণ ঐ আধি অধমর্ণকে ফিরাইয়া

দিবেন। অধমর্ণের সম্মতি ভিন্ন উত্তমর্ণ যদি বন্ধকীয় দ্রব্য উপভোগ করেন; তাহা হইলে সুদ সমেত মূলধন পরিশোধ হইবার পর ক্ষতিপূরণ সহ অধমর্ণকে সে আধি প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।* ভূমি প্রভৃতি বন্ধক দেওয়া সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—ভূস্বামী ভিন্ন অর্থাৎ যাঁহার জমিজমা আছে তিনি ভিন্ন, অপর কাহারও নিকট ভূমি প্রভৃতি আধিরূপে প্রদান করিবে না। 'ব্রহ্মদেয়' বা ব্রহ্মোত্তর ভূমি ব্রহ্মোত্তরধারীর নিকটই বন্ধক দেওয়া বিধেয়।

সংহিতাদির বিধান কৌটিল্যের বিধান হইতে কিছু ব্যাপক। মনুর মতে, আধি ভোগ করা বিধেয় নহে। তবে যদি অধমর্ণ ভোগার্থ কোনও দ্রব্য উত্তমর্ণের নিকট বন্ধক রাখিতে চায়, তাহা হইলে উত্তমর্ণ সে আধি ভোগ করিবার অধিকারী। সে ক্ষেত্রে উত্তমর্ণ তাঁহার প্রদত্ত ঋণের জন্য কোনও সুদ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। অপিচ, বহুকাল গত হইলেও উত্তমর্ণ ঐ বন্ধকীয় দ্রব্য স্থানান্তরিত বা বিক্রয় করিবার অধিকারী নহেন। অধমর্ণ যদি বলপূর্ব্বক আধি ভোগ করেন, তাহা হইলে ঋণের সুদ তো তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতেই হইবে; অধিকন্তু তাঁহার ভোগ-হেতু যদি আধির অন্যথা হয়, তাহা হইলে অধমর্ণকে উহার প্রকৃত মূল্য দিয়া সন্তুষ্ট করিতে হইবে। চাহিবামাত্রই অধমর্ণকে গচ্ছিত বস্তু প্রদান করা বিধেয়। উত্তমর্ণ সে সম্বন্ধে কালবিলম্ব করিবেন না। এতদ্বিষয়ে মনু-সংহিতার উক্তি (অষ্টম অধ্যায়, ১৪৩ম—১৪৫ম শ্লোক); যথা,—

সংহিতা-মতে আধি।

"ন ত্বেবাধৌ সোপকারে কৌসীদীং বৃদ্ধিমাপ্নুয়াৎ। নচাধেঃকালসংরোধান্নিসর্গোঽস্তি নবিক্রয়ঃ॥
ন ভোক্তব্যো বলাদাধির্ভুঞ্জানো বৃদ্ধিমুৎসৃজেৎ। মূল্যেন তোষয়েচ্চৈনমাধিস্তেনোঽন্যথা ভবেৎ॥
আধিশ্চোপনিধিশ্চাভৌ ন কালাত্যয়মর্হতঃ। অপহার্য্যৌ ভবেতাং তৌ দীর্ঘকালমবস্থিতৌ॥"

বিষ্ণু-সংহিতায় অনেক স্থলে ইহার অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। বিষ্ণু-সংহিতা মতে, স্থাবর আধির ব্যবস্থা অন্যরূপ। বিষ্ণু বলেন,—আধিকৃত ক্ষেত্রাদির আয়ে সুদ পরিশোধ হইয়া যদি কিছু উদ্বর্ত্ত থাকে; তাহা হইলে, অধমর্ণের সহিত আধি পরিত্যাগের কোনও সর্ত্ত না থাকিলে, উত্তমর্ণ উহা পরিত্যাগ করিবেন না। আর সুদ পরিশোধ হইয়া উদ্বর্ত্ত অংশে আসলও পরিশোধ হইবে—অধমর্ণের সহিত উত্তমর্ণের যদি এইরূপ বন্দোবস্ত থাকে; তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে ঋণ পরিশোধ হওয়ার পরই উত্তমর্ণকে ঐ আধি পরত্যাগ করিতে হইবে। যে স্থাবর সম্পত্তি মাত্র সুদ পরিশোধ হওয়ার জন্য আধিরূপে প্রদান করা হয়, সুদ পরিশোধ হইয়া গেলেই সে আধি প্রত্যর্পণ করিবার বিধি বিষ্ণু-সংহিতায় বিধিবদ্ধ আছে। বলপূর্ব্বক আধি-ভোগের বিষয়ে বিষ্ণুও নিষেধাজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। বন্ধকীয় দ্রব্য উপভোগ করিতে থাকিলে যে উত্তমর্ণ সুদ পাইবেন না,—বিষ্ণুরও তাহা অভিমত। দৈবোপদ্রবে বা রাজোপদ্রবে আধি নাশ হইলে অধমর্ণ সে আধির দাবী করিতে পারিবে না। কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্য কারণে উহা নষ্ট হইলে উত্তমর্ণ তাহা প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য। এ সম্বন্ধে বিষ্ণু-সংহিতার (ষষ্ঠোঽধ্যায়, ৫ম—৯ম শ্লোকঃ) উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল; যথা,—

* যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার (দ্বিতীয় অধ্যায়, ৬৮ম শ্লোক) এতদনুরূপ উক্তি আছে। পরবর্ত্তী অংশে তাহার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

"আধুপভোগে বৃদ্ধ্যভাবঃ। দৈবরাজোপঘাতাদৃতে বিনষ্টমাধিমুত্তমর্ণো
দদ্যাৎ॥ অন্তবৃদ্ধৌ প্রবিষ্টায়ামপি। ন স্থাবরমাধিমৃতে বচনাৎ।
গৃহীতধনপ্রবেশার্থমেব যৎ স্থাবরং দত্তং তদগৃহীতধনপ্রবেশে দদ্যাৎ।"

এ সম্বন্ধে বসিষ্ঠ বিশেষ কোনও অভিমত ব্যক্ত করেন নাই। গৌতমও অতি সংক্ষেপে তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি কেবলমাত্র বলিয়াছেন,—"মুক্তাধির্নবর্দ্ধতে দিৎসতোঽবরুদ্ধস্য চ চক্রকালবৃদ্ধিঃ কারিতাকায়িকাশিখাধিভোগাশ্চ কুসীদং।" অর্থাৎ,—আসল পরিশোধ করিয়া বন্ধকীয় বস্তু ছাড়াইলে আর সুদ বাড়িবে না। পরিশোধ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি যদি উত্তমর্ণ কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়, অর্থাৎ উত্তমর্ণ যদি পরিশোধ করিয়া না লয়, তাহা হইলেও তাহার সুদ বাড়িবে না। কালবশে চক্রবৃদ্ধির ব্যবস্থা হইতে পারে। ঋণকর্ত্তার শারীরিক পরিশ্রম বা বন্ধকীয় বস্তুর ভোগ সুদের মধ্যে গণ্য হইতে পারে।' এতদ্ভিন্ন গৌতমে আর অধিক উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যবস্থা বহুব্যাপক। অর্থশাস্ত্রোক্ত সকল ব্যবস্থার বিধানই তন্মধ্যে দৃষ্ট হয়। আধি সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য (দ্বিতীয় অধ্যায়, ৫৯ম—৬৫ম শ্লোক) বলিয়াছেন,—

"আধিঃ প্রণশ্যেদ্দ্বিগুণে ধনে যদি ন মোক্ষ্যতে। কালকালকৃতং নশ্যেৎ ফলভোগ্যো ন নশ্যতি॥
গোপ্যাধিভোগে নো বৃদ্ধিঃ সোপকারেঽথহাপিতে। নষ্টো দেয়ো বিনষ্টশ্চ দৈবরাজকৃতাদৃতে॥
আধেঃ স্বীকরণাৎ সিদ্ধী রক্ষ্যমানোঽপ্যসারতাম্। যাতশ্চেদন্য আধেয়ো ধনভাগ্ বা ধনী ভবেৎ॥
চরিত্রবন্ধককৃতং সবৃদ্ধ্যা দাপয়েদ্ধনম্। সত্যঙ্কারকৃতং দ্রব্যং দ্বিগুণং প্রতিদাপয়েৎ॥
উপস্থিতস্য মোক্তব্য আধিস্তেনোঽন্যথা ভবেৎ। প্রয়োজকেঽসতি ধনং কুলেন্যস্যাধিমাপ্নুয়াৎ॥
তৎকালকৃতমূল্যো বা তত্র তিষ্ঠেদবৃদ্ধিকঃ। বিনাধারণকাদ্বাপি বিক্রীণীত সসাক্ষিকম্॥
যদা তু দ্বিগুণীভূতমৃণমাধৌ তদা খলু। মোচ্য আধিস্তদুৎপন্নে প্রবিষ্টে দ্বিগুণে ধনে॥"

অর্থাৎ,—'বৃদ্ধি বা সুদ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেলেও অধমর্ণ যদি আধি মোচন না করে, তাহা হইলে সে বন্ধকীয় দ্রব্য নষ্ট হইয়া যায়। তাহাতে অধমর্ণের আর কোনও স্বত্ব থাকে না। যদি নির্দ্দিষ্ট সময়ে বন্ধক মোচন করিবার প্রতিশ্রুতি থাকে, আর যদি সেই নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে আধি মোচন করা না হয়; তাহা হইলে নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে সে আধিতে আর পূর্ব্বস্বামীর অধিকার থাকিবে না। যে আধির বা বন্ধকীয় দ্রব্যের ভোগ হয়, তাহাতে অধমর্ণের স্বত্ব কদাচ নষ্ট হয় না। অপ্রকাশ্য আধি ভোগ করিলে এবং প্রয়োজনীয় আধি অব্যবহার্য্য করিয়া দিলে, সেই আধি প্রত্যর্পণের সময় পূর্ব্ববৎ করিয়া দিতে হইবে; অর্থাৎ অধমর্ণ যে অবস্থায় প্রদান করিয়াছিল, উত্তমর্ণকে সেই অবস্থায় তাহা ফিরিয়া দিতে হইবে। একেবারে নষ্ট হইয়া গেলে অধমর্ণকে তাহার উপযুক্ত মূল্য দিতে হইবে। কিন্তু দৈবকৃত বা রাজকৃত উপদ্রবে বিনষ্ট হইলে, সে আধি আর ফিরাইয়া দিতে হইবে না। উপভোগেই আধিগ্রহণ সপ্রমাণ হয়। আধি যত্নপূর্ব্বক রক্ষিত হইলেও যদি অসার হইয়া পড়ে অর্থাৎ সুদ সমেত আসলের তুলনায় মূল্য অল্প বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে অন্য আধি বন্ধক রাখিবে অথবা উত্তমর্ণকে কিছু ধন দিতে হইবে। উত্তমর্ণকে নির্ম্মলচরিত্র জানিয়া অধমর্ণ যদি অধিক মূল্যের দ্রব্য বন্ধক রাখে এবং তত্তুলনায় কম ধন গ্রহণ করে, তাহা হইলে দ্বিগুণ সুদ সমেত মূলধন দিয়া বন্ধক-দ্রব্য মোচন করিয়া লইতে পারিবে;

অর্থাৎ গৃহীত ঋণ-পরিমাণের দ্বিগুণ সুদ হওয়া পর্য্যন্ত আধি উত্তমর্ণের নিকট থাকিতে পারিবে; আর তাহাতে সে আধি নষ্ট হইবে না। সে স্থলে উত্তমর্ণের সহিত সে সম্বন্ধে কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়মে আবদ্ধ না হইলেও চলিবে। আবার সত্য স্থলে অর্থাৎ যদি সর্ত্ত হয় যে, দ্বিগুণ সুদ হইলেও অধমর্ণ তাহা প্রদান করিয়া আধি ফিরাইয়া লইবে, তাহার প্রদত্ত বন্ধক দ্রব্যের যেন কোনও অপলাপ না হয়; সে স্থলে সত্যমত দ্বিগুণ দিয়া অধমর্ণ আধি মোচন করিতে পারিবে। সুদসমেত মূলধন লইয়া উপস্থিত হইলে উত্তমর্ণ বন্ধক বস্তু ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু যদি সে তাহা না ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে উত্তমর্ণ চোরের স্থায় দণ্ডনীয় হইবে। উত্তমর্ণ উপস্থিত না থাকিলে, উত্তমর্ণের বিশ্বস্ত লোকের নিকট ঐ ধন দিয়া অধমর্ণ তাহার আধি ফিরাইয়া লইবে। কিন্তু অধমর্ণ প্রদত্ত ধন গ্রহণ করিবার উপযুক্ত লোক উপস্থিত না থাকিলে কিম্বা আধি বিক্রয়ের দ্বারা অধমর্ণের ঋণ পরিশোধ করিবার ইচ্ছা করিলে, উত্তমর্ণের অনুপস্থিতি হেতু স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিবার ব্যবস্থা ছিল। সেরূপ ক্ষেত্রে ঐ আধির মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার বিধান আছে। আধির উপযুক্ত মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া, উত্তমর্ণের প্রত্যাবর্ত্তন কাল পর্য্যন্ত উহা পূর্ব্ববৎ উত্তমর্ণের নিকট রাখিবার নিয়ম, আর সে অবস্থায় উত্তমর্ণের মূলধনের সুদ চলিবে না। 'মূলধন সুদে বৃদ্ধি পাইয়া দ্বিগুণ হইলেও, দ্বিগুণ বৃদ্ধি দিয়া আধি গ্রহণ করিব; কিন্তু আধি যেন নষ্ট না হয়'—ঋণগ্রহণ-কালে অধমর্ণ যদি এইরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়; আর দ্বিগুণ বৃদ্ধির পরও যদি মায় সুদ মূলধন প্রদান করিয়া আধি ফিরাইয়া না লয়; তাহা হইলে, অধমর্ণের অনুপস্থিতি-কালেও, উত্তমর্ণ সাক্ষী প্রমাণাদি রাখিয়া আধি বিক্রয় করিতে পারিবে। যখন বিনা-বন্ধক ঋণ বৃদ্ধি পাইয়া দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়াইবে, তখন ক্ষেত্রাদি বন্ধক রাখিতে হইবে। তদুৎপন্ন দ্রব্য দ্বারা উত্তমর্ণের উক্ত ঋণ পরিশোধ হইবার পর উত্তমর্ণ ঐ আধি ছাড়িয়া দিবেন। 'এই আধি হইতে অধিক উৎপন্ন হয় তোমার লাভ; অল্প উৎপন্ন হয়, তোমার ক্ষতি';—অধমর্ণ যদি এরূপ কিছু সর্ত্ত না করিয়া থাকে, আর যদি সেই আধিতে দ্বিগুণ ফল উৎপন্ন হয়; তাহা হইলে ঋণ-শোধের পর উত্তমর্ণ ঐ আধি ছাড়িয়া দিবেন।' অর্থশাস্ত্রের ও স্মৃতিশাস্ত্রের আলোচনায় বন্ধকীয় দ্রব্য সম্বন্ধে যে কয়টী বিধানের আভাষ পাই, তাহা অধুনাতন প্রচলিত ব্যবহার-শাস্ত্রের ভিত্তি-স্থানীয় বলা যাইতে পারে। আধি বা বন্ধক দ্রব্য ভোগ করিলে, ভোগের অনুপাতে উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধ হইবে, এতদ্বিষয় যেমন প্রাচীন ভারতের ব্যবহার-শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছিল, তেমনই আধুনিক ব্যবহার-শাস্ত্রেও বিহিত আছে। বন্ধকীয় সম্পত্তি হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের দ্বারা সুদ পরিশোধ হইয়া গেলে অবশিষ্ট উদ্‌বৃত্তাংশ হইতে মূলধন পরিশোধের ব্যবস্থা ব্যবহার-শাস্ত্রপ্রণেতৃগণ করিয়া গিয়াছেন। ইংরেজ-রাজ-প্রবর্ত্তিত অধুনা প্রচলিত ব্যবহার-শাস্ত্রের বিধান সেই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলা যাইতে পারে।

বন্ধক সম্বন্ধে 'হস্তান্তর বিষয়ক' আইনে (Transfer of Property Act) বিশেষ বিশেষ নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে। তদনুসারে বন্ধক দ্বিবিধ; প্রথম—সাধারণ (Simple) এবং দ্বিতীয়—ফলভোগাধিকার- (Usufructuary)। যেখানে ঋণকারী বন্ধকীয় সম্পত্তি ঋণদাতাকে প্রদান করেন না; অথচ তাহার সহিত

গচ্ছিত সম্বন্ধে কৌটিল্যের বিধান কতকাংশে আধি-সংক্রান্ত বিধি-নিষেধের অনুসারী। ঋণ-সংক্রান্ত ব্যাপারে আধির উপযোগিতা। অন্যান্য বিশেষ বিশেষ স্থলেও উহার সার্থকতা অনুভূত হয় বটে; কিন্তু ঋণ-সংক্রান্ত বা তৎসদৃশ ব্যাপার বিষয়ে আধির বা বন্ধকের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা বিশেষভাবে উপলব্ধি হয়। গচ্ছিত বিধি—সেরূপ নহে। গচ্ছিত-ব্যবহারে ঋণের বা তৎসদৃশ বিষয়-ব্যাপারের উপযোগিতা পরিলক্ষিত হয় না। যে কোনও ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে আপনার বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট মূল্যবান দ্রব্যাদি গচ্ছিত রাখিতে পারেন; আর সেজন্য ঋণ-গ্রহণের বা ঋণ-দানের কোনও প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় না। গচ্ছিত দ্রব্যের ও আধির ইহাই পার্থক্য। উভয় ব্যাপার সম্পর্কে প্রায় একইরূপ বিধি। তবে স্থল-বিশেষে তাহার পার্থক্য আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এবং মন্বাদির সংহিতায় এতৎসম্বন্ধে প্রায় অনুরূপ বিধান প্রবর্তিত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে গচ্ছিত দ্বিবিধ—নিক্ষেপ ও উপনিধি। * উপনিধির সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ-কল্পে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—

কৌটিল্য মতে নিক্ষেপ ও উপনিধি।

"বাসনস্থমনাখ্যায় হস্তেঽন্যস্য যদর্পিতম্।
দ্রব্যং তদৌপনিধিকং প্রতিদেয়ং তথৈব তৎ॥"

অর্থাৎ,—বিশেষ বিবরণ না বলিয়া যে সকল বস্তু করণ্ডপেটিকাদির মধ্যে রাখিয়া অপরের হস্তে ন্যস্ত হয়, তাহার নাম—ঔপনিধিক।' বাক্স-সিন্দুকাদির মধ্যে বন্ধ করিয়া সহি-মোহরাঙ্কিত ভাবে যাহা কিছু প্রদান করা যায়—তাহাই উপনিধি-পর্য্যায়ভুক্ত। এরূপস্থলে গচ্ছিত গ্রহণকারী জানিতে পারেন না যে, ন্যাসকারী তাঁহার হস্তে কি সামগ্রী ন্যস্ত রাখিতেছেন। সুতরাং

এইরূপ চুক্তি-সর্ত্তে আবদ্ধ হন যে, যদি তিনি ঋণ পরিশোধ না করেন, তাহা হইলে ঋণদাতা বন্ধকীয় দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করিয়া লইবেন; সে স্থলে এইরূপ বন্ধক বা আধি সাধারণ বন্ধক পর্য্যায়ভুক্ত। আর, যেস্থলে বন্ধকীয় সম্পত্তির উপস্বত্ব দ্বারা সুদ ও ঋণ পরিশোধ হওয়ার সর্ত্ত সাব্যস্ত হয়, তাহা ফলভোগাধিকার বন্ধক মধ্যে গণ্য। যথা,—"Where the mortgagor delivers possession of the mortgaged property to the mortgagee, and authorises him to retain such possession until payment of the mortgage-money, and to recieve the rents and profits accruing from the property, and to appropriate them in lieu of interest, or in payment of the mortgage-money, or partly in lieu of interest, and partly in payment of the mortgage money, the transaction is called a usufructuary mortgage and the mortgagee a usufructuary mortgagee."

"In the case of a usufructuary mortgage, the mortgagor has a right to recover possession of the property—(a) where the mortgagee is authorised to pay himself the mortgage-money from the rents and profits of the property—when such money is paid; (b) where the mortgagee is authorised to pay himself from such rents and profits the interest of the principal money—when the term (if any) prescribed for the payment of the mortgage-money has expired, and the mortgagor pays or tenders to the mortgagee the principal money, or deposits it in court as hereinafter provided." এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বিশেষ বিধান সম্পত্তি হস্তান্তর বিষয়ক আইনে দ্রষ্টব্য।

* নিক্ষেপ—Open deposit; উপনিধি—Sealed deposit.

তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। 'নিক্ষেপ'—উপনিধির বিপরীত। সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে কোনও বস্তু কাহারও নিকট অর্পণ করিলে তাহা নিক্ষেপ পর্য্যায়ভুক্ত হয়। নিক্ষিপ্ত দ্রব্য নিক্ষেপকারীকে উপনিধির ন্যায় কোনও প্রকার বাক্স-সিন্দুকাদিতে আবদ্ধ করিয়া দিতে হয় না। নিক্ষেপ-গ্রহণকারী নিক্ষেপের আকার, প্রকৃতি, গুণ প্রভৃতি সকল বিষয়ই অবগত হন; আর স্বচক্ষে দেখিয়া তিনি উহা গ্রহণ করিতে পারেন। ইহাই হইল—নিক্ষেপ ও উপনিধির সাধারণ সংজ্ঞা। উভয়ের পার্থক্য—ঔপনিধিক দ্রব্যের বিষয় গ্রহণকারী অনবগত এবং নিক্ষিপ্ত দ্রব্যের বিষয় তিনি অবগত হন। গচ্ছিত দ্রব্য মাত্রই বিশেষ সাবধানতার সহিত রক্ষিত হওয়া বিধি। স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক ইহা সংরক্ষিত হইবার নিয়ম। এ বিষয়ে গ্রহণকারীর বাধ্য-বাধকতা কিছুই নাই। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার দায়িত্ব অত্যন্ত অধিক। গচ্ছিত দ্রব্য নষ্ট হইলে তিনি সে জন্য দায়ী হইবেন। কৌটিল্য এ সম্বন্ধে কয়েকটী বিধির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—'রক্ষাকারী গচ্ছিত দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারিবেন না। তাঁহার ব্যবহারের দরুণ গচ্ছিত দ্রব্যের কোনও ক্ষতি হইলে, তিনি সে ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য। অপিচ, সে ক্ষেত্রে তাঁহার বার পণ দণ্ড হইবে। গ্রহণকারীর অনবধানতায় বা দ্রব্যের ব্যবহারে উহার মূল্য হ্রাস হইলে, গচ্ছিত-গ্রহণকারী সে ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবেন। সে ক্ষেত্রে দণ্ডের পরিমাণ দ্বিগুণ হইবে। গচ্ছিত-দ্রব্য বন্ধক দিলে অথবা বিক্রয় করিলে চতুর্গুণ 'পঞ্চবন্ধ' দণ্ডের ব্যবস্থা। গচ্ছিত-দ্রব্য নষ্ট করিয়া ফেলিলেও তৎসম্বন্ধেও পূর্ব্বোক্ত বিধি বলবৎ হইবে। কিন্তু গ্রহণকারী যদি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উহা ফেলিয়া নষ্ট করেন, অথবা বিনিময়ে অন্য দ্রব্য গ্রহণ করেন; তাহা হইলে গচ্ছিত-দ্রব্যের যথা-নির্দ্দিষ্ট মূল্য ন্যাসকারীকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। তবে "প্রেতব্যসন গতং বা নোপনিধিমভ্যাভবেৎ।" বৈদেশিক আক্রমণকারী অথবা অন্য কোনও শত্রু কর্ত্তৃক দেশ ধ্বংস হইলে, বন্যার জলপ্লাবনে দেশ ভাসিয়া গেলে কিংবা সমুদ্র-যাত্রা-কালে জলদস্যু কর্ত্তৃক অপহৃত হইলে, সে গচ্ছিতের জন্য গ্রহণকারী দায়ী হইবে না। ন্যস্তকারী চাহিবামাত্র গচ্ছিত ফিরাইয়া দিবার বিধি। কিন্তু গচ্ছিত-রক্ষাকারী যদি সে বিষয় অস্বীকার করে, তাহা হইলে গচ্ছিত-নির্ণয়ের বিবিধ উপায় কৌটিল্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গচ্ছিত-রক্ষাকারী গচ্ছিত বিষয় অস্বীকার করিলে, বিচারকের অনুমতি লইয়া ন্যাসকারী নিম্নলিখিত পন্থা-সমূহ অবলম্বন করিবেন। যথা,—নিরপেক্ষ কয়েক জন ব্যক্তিকে লইয়া ন্যাসকারী গ্রহীতার বাড়ীর চতুঃপার্শ্বে গোপনীয় স্থান-সমূহে অবস্থান করাইবেন। ন্যাসকারীর সহিত নিক্ষেপ-গ্রহীতার যে কথাবার্ত্তা হইবে, তাঁহারা যেন সে কথাবার্ত্তা শুনিতে পান—এমনই ভাবে তাঁহারা অবস্থান করিবেন। অতঃপর ন্যাসকারী গ্রহীতার নিকট যাইয়া গচ্ছিত-সম্পর্কে কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইবে। কথাবার্ত্তার সময় সত্য কথা বাহির করিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। কথা-প্রসঙ্গে গ্রহীতা যদি এমন কোনও কথা বলিয়া ফেলে, যাহা ন্যাসকারীর প্রমাণ বিষয়ে সহায়তা করে; আর নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ যদি তাহা শুনিতে পান এবং সেইরূপ সাক্ষ্য প্রদান করেন; তাহা হইলে বিচারক গ্রহণকারীর দণ্ডবিধান করিয়া নিক্ষেপকারীকে ঐ গচ্ছিত দ্রব্য দিতে বাধ্য করাইবেন।' গচ্ছিত-নির্ণয়ের অন্য ব্যবস্থা—গুপ্তচর নিয়োগে।

উহা মনুর ব্যবস্থার অনুরূপ। বৃদ্ধ জরাযুক্ত বণিকের বেশে চরগণ নিক্ষেপগ্রহণকারীর নিকট উপস্থিত হইবে। পর্য্যটনে শ্রান্ত ক্লান্ত—এইরূপ ভাণ করিয়া, বিশিষ্ট-চিহ্নাঙ্কিত আপনার বাক্স-সিন্দুকাদি তাহার নিকট রাখিয়া আসিবে। কয়েক দিন বা কিছুক্ষণ পরে তাহার ভ্রাতা বা পুত্রকে সেই গচ্ছিত দ্রব্য ফিরাইয়া আনিতে পাঠাইবে। গচ্ছিত-রক্ষাকারী উহা সরল চিত্তে প্রদান করিলে, তাহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া গ্রহণ করিবে। আর যদি সে উহা প্রত্যর্পণ না করে, তাহা হইলে তাহাকে উভয় ব্যাপারে দোষী সাব্যস্ত করিয়া গচ্ছিত দ্রব্য দেওয়াইবে। পরন্তু চৌর্য্যের অপরাধে তাহার দণ্ড হইবে। তৃতীয় উপায়ও গুপ্তচর-বিষয়ক। এ ক্ষেত্রে গুপ্তচর বিশিষ্ট ভদ্রলোকের পরিচ্ছদে উপস্থিত হইবেন। যেন তিনি সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া তাঁহার সমস্ত ধন-সম্পত্তি গচ্ছিত রাখিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এইরূপে রক্ষিত গচ্ছিত দ্রব্য যদি গ্রহণকারী চাহিবা মাত্র প্রদান না করে, তাহা হইলে তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তৎপ্রতি উচিত দণ্ডের বিধান করিতে হইবে। বর্ব্বর সাজিয়া গুপ্তচর রাত্রিকালে উপস্থিত হইবে। গভীর রাত্রিতে গমনাগমনের জন্য শান্তিরক্ষকের ভয়ে ভীত হইয়া গুপ্তচিহ্ন-সমন্বিত নিক্ষেপ তাহার হস্তে ন্যস্ত করিতেছে—এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবে। পরিশেষে শান্তিরক্ষক কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া সে তাহার গচ্ছিত দ্রব্য ফিরিয়া চাহিবে। গ্রহণকারী যদি শঠতা-পূর্ব্বক ঐ নিক্ষেপ প্রত্যর্পণ না করে, তাহা হইলে সে দণ্ডনীয় হইবে। গচ্ছিত দ্রব্য-বিষয়ে কৌটিল্যের ইহাই বিধান। ঋণ-সম্পর্কীয় বিধান-প্রসঙ্গে এতৎসংক্রান্ত অপরাপর বিধি বিধিবদ্ধ আছে। ঋণ-সম্পর্কে তদ্বিষয় আলোচিত হইবে। নিক্ষেপ ও উপনিধি প্রসঙ্গের আলোচনায় একটী বিষয় মনে আসিতে পারে। কৌটিল্যও তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে, যে কোনও প্রকার গচ্ছিত সাক্ষ্যাদির সমক্ষে রক্ষিত হওয়াই বিধেয়। তাহা না হইলে, অনেক সময় বিবিধ বিতর্ক-বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। রাষ্ট্রবিপ্লব, জলপ্লাবন প্রভৃতি ব্যতীত অন্য অবস্থায় উহা নির্ণয়-পক্ষে অনেক বেগ পাইতে হয়। তাই সাক্ষ্যাদির সমক্ষে নিক্ষেপাদি সংরক্ষণের বিহিত আদেশ অর্থশাস্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে।

নিক্ষেপ ও উপনিধি সংক্রান্ত কৌটিল্যের বিধান—অনেকাংশে স্মৃতি-শাস্ত্রের অনুসারী। স্মৃতিশাস্ত্রে বিশেষ বিশেষ স্থলে এ সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ বিধান বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কৌটিল্য বলিয়াছেন,—গচ্ছিত যে ভাবে গ্রহণ করিবে, ঠিক সেই ভাবেই প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। সংহিতাকারগণেরও তাহাই অভিমত। মনু বলিয়াছেন,—'দান যেরূপ হইবে, গ্রহণও সেইরূপ হওয়া চাই। যে ব্যক্তি যেরূপে যাহার হস্তে যে দ্রব্য নিক্ষেপ করিবে, লইবার সময় উহাকে সেই দ্রব্য সেইরূপ ভাবেই দিতে হইবে।' "যে যথা নিক্ষিপেদ্ধস্তে যমর্থং যস্য মানবঃ। স তথৈব গ্রহীতব্যো যথা দায়স্তথা গ্রহঃ॥" যাজ্ঞবল্ক্যেরও তাহাই অভিমত,—"প্রতিদেয়ং তথৈবতৎ।" কৌটিল্য বলিয়াছেন,—রাষ্ট্রবিপ্লবে, দৈবদুর্ঘটনায়, জলপ্লাবন প্রভৃতিতে উপনিধি নষ্ট হইলে উহা আর দিতে হইবে না। মনু প্রভৃতিরও উহাই অভিমত। মনু বলিয়াছেন; যথা,—

সংহিতা-গ্রন্থে তৎসংক্রান্ত বিধি-নিয়মাদি।

"চৌরৈর্হৃতং জলেনোঢ়মগ্নিনা দগ্ধমেব বা। ন দদ্যাদ্যদি তস্মাৎ স ন সংহরতি কিঞ্চন॥"

উপানিধির মধ্য হইতে যদি নিজে কিছু না লয়, তাহা হইলে চোরে চুরি করিলে, জল দ্বারা ধৌত হইলে, অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলে, গচ্ছিত দ্রব্য দিতে হয় না।' যাজ্ঞবল্ক্যেরও উহাই অভিমত। তিনিও বলিয়াছেন,—'রাজা, দৈব বা তস্করের উপদ্রবে বিনষ্ট হইলে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে না। কিন্তু যদি ন্যাসকারী উক্ত দ্রব্য প্রার্থনা করিলে না দেয় এবং তাহার পর রাজাদির উপদ্রবে উহা বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার মূল্য দিতে হইবে এবং গ্রহণকারীকে রাজা তন্মূল্য-পরিমিত অর্থদণ্ড করিবেন।' (দ্বিতীয় অধ্যায়, ৬৭ম শ্লোক); যথা,—

"ন দাপ্যোঽপহৃতং তত্তু রাজদৈবিকতস্করৈঃ।
ভ্রেষশ্চেন্মার্গিতেঽদত্তে দাপ্যো দণ্ডঞ্চ তৎসমম্‌॥"

মনুতে বা কৌটিল্যের বিধানে এ বিশেষ বিধির উল্লেখ নাই। নিক্ষেপ ও উপনিধি সম্বন্ধে মনুতে একটী বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। অন্যান্য স্মৃতি-গ্রন্থে বা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে তৎসম্বন্ধে তাহা দৃষ্ট হয় না। মনুর মতে নিক্ষিপ্ত দ্রব্য নিক্ষেপকারী ভিন্ন অপর কাহাকেও দিতে নাই। এমন কি, নিক্ষেপকারীর স্ত্রী, পুত্র ও উত্তরাধিকারীর নিকট উহা প্রদান করিতে মনু নিষেধ করিয়াছেন। যদি নিক্ষেপাদি গ্রহণকারী চাহিবামাত্র গচ্ছিত দ্রব্য প্রদান না করে; অথবা সে তাহার অপলাপ করে;—তাহা হইলে তাহার রাজদ্বারে দণ্ড হইবার ব্যবস্থা যেমন কৌটিল্যাদি প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তেমনি যাজ্ঞবল্ক্যও সে ব্যবস্থা বিহিত করিয়াছেন। বাণিজ্যের দ্বারা নিক্ষেপাদি বৃদ্ধি করিলে বা নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার দ্বারা অপলাপ করিলে, দণ্ডের ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা সংহিতাকারগণ সকলেই বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে নিক্ষেপাদি চারি প্রকার; যথা—(১) যাচিত অর্থাৎ বিবাহাদি উৎসবে পরিধান করিবার জন্য অপরের নিকট হইতে যে সকল বস্ত্রালঙ্কারাদি চাহিয়া লওয়া যায়। (২) অন্বাহিত—গচ্ছিত অবস্থায় রক্ষিত যে দ্রব্য অপরের নিকট গচ্ছিত রাখা হয়। (৩) ন্যাস—প্রথমে গৃহস্বামীকে দেখাইয়া যাহা পরিবারের অপর ব্যক্তির নিকট দেওয়া যায়। (৪) নিক্ষেপ—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনও ব্যক্তির নিকট কোনও বস্তু অর্পণ করা। এই চতুর্ব্বিধ নিক্ষেপ সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য একই ব্যবস্থা বিহিত করিয়াছেন।

"আজীবন্‌ স্বেচ্ছয়া দণ্ড্যো দাপ্যস্তঞ্চাপি সোদয়ম্‌।
যাচিতাং বাহিতন্যাসনিক্ষেপাদিষয়ং বিধিঃ॥"

নিক্ষিপ্ত দ্রব্য অপহ্নব করিলে, উহা ফিরাইয়া পাইবার কোনও উপায় যাজ্ঞবল্ক্যে নির্দ্ধারিত হয় নাই। অসাক্ষিক অর্থাৎ সাক্ষিশূন্য স্থলে, মনুমতে গুপ্তচর দ্বারা নিক্ষেপ-নির্ণয়ের ব্যবস্থা বিহিত আছে।* চুক্তি-প্রসঙ্গে তদ্বিষয় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। মনু আরও বলিয়াছেন,—নিক্ষেপকারী পরলোকগত হইলে যদি উপনিহিত দ্রব্য স্বেচ্ছায় প্রত্যর্পিত হয়, তাহা হইলে সেস্থলে আর অতিরিক্ত দাবী চলিবে না। যে ব্যক্তি গচ্ছিত রক্ষা করে, তৎকর্ত্তৃক গচ্ছিত দ্রব্যের দান বা বিক্রয় ব্যবহার-স্থিতিতে সিদ্ধ হয় না। এরূপ দান-বিক্রয় ব্যবহার-শাস্ত্রমতে দণ্ডনীয়। চোরের প্রতি যে দণ্ড, দান-বিক্রয়কারীর প্রতি সেই দণ্ডের বিধি।

---

* এই গ্রন্থের ৩১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। চর প্রভৃতি দ্বারা আধি ও নিক্ষেপ নির্ণয়ের ব্যবস্থা বিষয়ে মনুর মত সেস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—০*০—

ঋণাদান-বিধানে আদর্শ।

[ঋণাদান প্রসঙ্গ,—ঋণ-সম্বন্ধে হিন্দুর ধারণা ;—ঋণ-সম্বন্ধে কৌটিল্যের বিধান.—সুদের হার প্রভৃতি,—বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যবস্থা ;—অর্থশাস্ত্র-মতে ঋণ-সংক্রান্ত দায়,—পুত্র ও উত্তরাধিকারী পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য,—স্বামীর ঋণ পরিশোধে স্ত্রী বাধ্য নহে,—ব্যাধ, শৈলূষ প্রভৃতি জাতীয় স্ত্রী-সম্পর্কে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ;—সংহিতোক্ত ঋণাদান বিধি,—মনু. যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু, গৌতম, বসিষ্ঠ প্রভৃতির মতের উল্লেখ,—কৌটিল্যের মত ঐ সকল মতের অনুসারী ;—সংহিতা-মতে ঋণ আদায় বিধি ;—প্রতীচ্যে কুসীদ-প্রসঙ্গ,—বাইবেলে মোজেস-প্রবর্ত্তিত নীতিতে তাহার পরিচয় ;—প্রাচীন রোমে. গ্রীসে ও মিশরে কুসীদের ব্যবস্থা,—তৎসংক্রান্ত ইতিবৃত্ত ;—ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আয়র্লণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে তৎসংক্রান্ত বিধান,—প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিবরণ ;—সংহিতাদিতে ও অর্থশাস্ত্রে ভোগ প্রমাণ,—তামাদি-সংক্রান্ত বিধানের উল্লেখ প্রভৃতি প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতের ব্যবহার-বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপন ;—আধুনিকে প্রাচীনের অনুসরণ ;—পাশ্চাত্যে ঋণ-প্রসঙ্গ,—রাজকীয় ঋণাদির বিষয়।]

প্রাচীন ভারতের ব্যবহার-বিধানে ঋণাদানবিধি প্রথম ও প্রধান স্থানীয়; শ্রুতি-স্মৃতি-অর্থশাস্ত্র—সর্ব্বত্রই ব্যবহার-প্রসঙ্গে ঋণাদানের বিষয় বিশদভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। সূত্র-গ্রন্থের প্রাচীনত্ব অবিসম্বাদিত। গৌতম-সূত্র—সূত্রগ্রন্থের অন্যতম। গৌতমের সূত্র-গ্রন্থে ব্যবহার-প্রসঙ্গে দেওয়ানী-সংক্রান্ত ব্যবহারের মধ্যে কেবল ঋণাদানের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতিও ব্যবহার-প্রসঙ্গে ঋণাদানের বিষয় প্রথম উল্লেখ করিয়াছেন। বিষ্ণু-সংহিতার আরম্ভ—দণ্ডনীতি ঋণ-সংক্রান্ত বিধান লইয়া। তন্মধ্যে ঋণ প্রধান-স্থানীয়। এইরূপ, শাস্ত্রগ্রন্থাদির আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, ঋণাদান ব্যাপার লইয়াই প্রাচীন ভারতের ব্যবহার-শাস্ত্রের আরম্ভ ও পরিণতি। আর, তাহারই আনুষঙ্গিকরূপে অপরাপর ব্যবহার-বিধির অবতারণা। প্রাচীন ভারতের আর্য্য-হিন্দুগণ ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন; তাঁহাদের সকল অনুষ্ঠান ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাদের বিশ্বাস—ঋণ-গ্রহণ করিয়া প্রত্যর্পণ না করিলে পাপ হয় এবং পরলোকে কঠোর শাস্তি বিহিত হইয়া থাকে। সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহারা কতকগুলি অবশ্য-কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান ঋণ-পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন; আর তাহাদের অননুষ্ঠান পাপজনক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ—আনুষ্ঠানিক ঋণ-পর্য্যায়ভুক্ত। তদ্ভিন্ন অন্যান্য ঋণ—লৌকিক ঋণ। পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ ঋণ ব্যবহার-বহির্ভূত। সুতরাং বক্ষ্যমাণ-প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। লৌকিক ঋণ—ব্যবহারের বিষয়। তৎসংক্রান্ত বিধি-বিধানের আলোচনায় এতদ্বিষয়ের অবতারণা। যে আর্য্যহিন্দুগণ বিহিত কার্য্যের অননুষ্ঠানে সর্ব্বত্র পাপাশঙ্কা অনুভব করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ব্যবহার-শাস্ত্রে যে ঋণ-সংক্রান্ত বিধান সর্ব্বাগ্রে স্থানপ্রাপ্ত হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? এ হিসাবে, ঋণাদান-বিধি অতি প্রাচীন এবং দেওয়ানী-সংক্রান্ত ব্যবহার মধ্যে ইহাই আদি।

ঋণাদান প্রসঙ্গ।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ঋণ-সংক্রান্ত ব্যবহার এক প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। কৌটিল্যের মতে, ঋণ-বিষয়ক বিধানের উপর রাজ্যের অর্থ-নৈতিক উন্নতি-অবনতি নির্ভর করে। অর্থশাস্ত্রের তৃতীয় খণ্ডে ঋণাদান-প্রকরণে 'রাজন্যযোগক্ষেম' শব্দের প্রয়োগে তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। কৌটিল্যের মতে, দরিদ্র নিরীহ ব্যক্তি ঋণের পেষণে ঋণদাতা কর্তৃক অযথা পিষ্ট না হয়,—এই জন্য রাজা ঋণের সুদ-পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন। নির্দ্ধারিত বিধির অন্যথায় রাজা রাজদণ্ড বিহিত করিবেন। কৌটিল্য শতকরা মাসিক সওয়া পণ কুশীদ লইবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। সবন্ধক ঋণের সম্বন্ধে কৌটিল্যের এই বিধান। কিন্তু বন্ধকহীন ঋণ-সম্বন্ধে তাঁহার বিধান অন্যরূপ। সে ক্ষেত্রে শতকরা পাঁচ পণ পর্য্যন্ত কুশীদ গ্রহণ করা যাইতে পারে। সমুদ্র-গামী বণিকগণের এবং বনপ্রয়াণকারী কাষ্ঠ-ব্যবসায়ীর সম্বন্ধে যথাক্রমে শতকরা মাসিক ২০ পণ ও ১০ পণ সুদ লইবার ব্যবস্থা অর্থশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। "দশপণা কান্তারকাণাং"—কৌটিল্যের এই বিধান। অন্যান্য স্থলে ঋণদানের দায়িত্ব হিসাবে সুদের ব্যবস্থা হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট হারের অধিক সুদ গ্রহণ করিলে, ঋণদাতা, ঋণসংগ্রহকর্ত্তা এবং সাক্ষী—সকলেই রাজদ্বারে দণ্ডিত হইবেন। "ততঃ পরং কর্ত্তুঃ কারয়িতুশ্চ পূর্ব্বস্‌সাহসদণ্ডঃ। শ্রোতৃণামেকৈকং প্রত্যর্ধদণ্ডঃ।" এতদ্ব্যতীত যে স্থলে ঋণগৃহীত শস্যের সুদ শস্যে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, তাহার বিধান ভিন্নরূপ। সে ক্ষেত্রে, প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইলে, শস্যের দ্বারা যে সুদ পরিশোধ করা হইবে, সে শস্যের মূল্য মূলধনের মূল্যের অর্দ্ধেক হইবে। অর্থাৎ,—৫০৲ মণ ধান্য ঋণ লইলে তাহার সুদ প্রচুর উৎপন্নের বৎসরে ২৫ মণ ধান্যের মূল্যের সমান হইবে,—অর্থ-শাস্ত্রকারের ইহাই অভিমত। যৌথ-ব্যবসায়ে যাহারা মূলধন প্রদান করে, তাহার সুদ সেই মূলধন হইতে যাহা আয় হয়, তাহার অর্দ্ধেক হইবে। অর্থাৎ,—দশ জন ব্যবসায়ী প্রত্যেকে যদি ১০০৲ করিয়া টাকা দিয়া যৌথ-কারবার আরম্ভ করেন, তাহা হইলে প্রত্যেকের প্রদত্ত ঐ ১০০৲ টাকায় বৎসরান্তে যাহা লাভ হইবে, তাহারই অর্দ্ধেক ঐ টাকার সুদ মধ্যে গণ্য। এইরূপ সুদ প্রতি বৎসর পরিশোধ করিবার নিয়ম। কিন্তু "চিরপ্রবাসং স্তম্ভপ্রবিষ্টো বা মূল্যদ্বিগুণং দদ্যাৎ।" অর্থাৎ,—যে অংশীদার বহুদিন অনুপস্থিত অথবা চিররোগী বলিয়া বিষয়-ব্যাপারে যোগদান করিতে অসমর্থ, তাহার প্রদত্ত মূলধনের দ্বিগুণ প্রদান করিলেই তাহার অংশ বিলুপ্ত হইবে। অতঃপর পূর্ব্বোক্ত বিধির ব্যত্যয়ে দণ্ডের ব্যবস্থা। প্রাপ্য না হইলে যদি কুসীদের দাবী করা যায়, অথবা মূলধন ও কুসীদ একত্র করিয়া মূলধন হিসাবে তাহা দাবী করিলে, দাবীকৃত পরিমাণের চতুর্গুণ দণ্ড হইবে। মিথ্যা দাবীর দণ্ডও ঐরূপ। ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা উভয়েই যদি আপনাদের প্রাপ্য ও দেয় ঋণ-পরিমাণের অপলাপ করে, তাহা হইলে ঋণদাতার অপেক্ষা ঋণ-গ্রহীতার তিন গুণ অধিক অর্থদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। ঋণদান ও ঋণ-প্রতিগ্রহণ বিষয়ে কৌটিল্য কয়েকটী বিশেষ বিধির অবতারণা করিয়াছেন। তদনুসারে ঋণদাতা যদি উপযুক্ত সময়ে তাঁহার প্রাপ্য গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে তাঁহার বার পণ অর্থ দণ্ড হইবে। সে অবস্থায় অধমর্ণ যদি তাহার দেয় মায় সুদ সমস্ত টাকা গ্রামবৃদ্ধগণের নিকট আমানত-স্বরূপ রক্ষা করে; তাহা

কৌটিল্যের বিধান।

হইলে ঋণদাতা টাকা আমানতের দিন হইতে আর সুদ পাইবেন না। দশ বৎসরের মধ্যে যদি প্রদত্ত ঋণ আদায় না করা যায়, তাহা হইলে কৌটিল্যের মতে সে ঋণের দাবী লোপপ্রাপ্ত হয়। ঋণ-সংক্রান্ত তামাদি সম্বন্ধে কৌটিল্যের ইহাই ব্যবস্থা। তবে ঋণকারী বা ঋণদাতা পীড়িত, ব্যসনী, প্রবাসী, মৃত, অপ্রাপ্তব্যবহার, দেশত্যাগী অথবা রাজ-ব্যবস্থায় অনুপযুক্ত হইলে এ বিধি প্রযোজ্য নহে। সে স্থলে দশ বৎসরের পরও দাবী উপেক্ষিত হইবে না। কৌটিল্যের মতে পরোপকার-ব্রতধারী, স্বার্থত্যাগী, বিদ্যার্জ্জনে গুরুগৃহবাসী, অপ্রাপ্তব্যবহার ব্যক্তি, ব্যাধিগ্রস্ত ও দরিদ্র ব্যক্তি কুশীদ-প্রদানে বাধ্য হইবে না। এতদ্বিষয়ে অর্থশাস্ত্রের তৃতীয় খণ্ডে (৩য় অধ্যায়, ১৭৪ম পৃষ্ঠা) পরিব্যক্ত কৌটিল্যের অভিমত নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা,—

"সপাদপণা ধর্ম্ম্যা মাসবৃদ্ধিঃ পণশতস্য। পঞ্চপণা ব্যবহারিকী। দশপণা কান্তারকাণাং। বিংশতিপণা সামুদ্রাণাং। ততঃ পরং কর্ত্তুঃ কারয়িতুশ্চ পূর্ব্বসাহসদণ্ডঃ। শ্রোতৃণামেকৈকং প্রত্যর্ধদণ্ডঃ। রাজন্যযোগক্ষেমবহে তু ধনিকধারণীকয়োশ্চরিত্রমপেক্ষেত। ধান্যবৃদ্ধিঃসস্যনিষ্পত্তাবুপার্ধাবরং মূল্যকৃতা বর্দ্ধেত। প্রক্ষেপবৃদ্ধিরুদয়াদর্ধং সন্নিধানসন্না বার্ষিকী দেয়া চিরপ্রবাসং স্তম্ভপ্রবিষ্টো বা মূল্যদ্বিগুণং দদ্যাৎ। অকৃত্বা বৃদ্ধিং সাধয়তো বা মূল্যং বা বৃদ্ধিমারোপ্য শ্রাবয়তো বন্ধচতুর্গুণো দণ্ডঃ। তুচ্ছচতুরশ্রাবণায়ামভূতচতুর্গুণঃ। তস্য ত্রিভাগমাদাতা দদ্যাৎ। শেষং প্রদাতা। দীর্ঘসত্রব্যাধিগুরুকুলোপরুদ্ধং বালমসারং বা নর্ণমনুবর্ধেত। মুচ্যমানমৃণমপ্রতিগৃহ্ণতো দ্বাদশপণো দণ্ডঃ। কারণাপদেশেন নিবৃত্তবৃদ্ধিকমন্যত্র তিষ্ঠেৎ। দশবর্ষোপেক্ষিতমৃণমপ্রতিগ্রাহ্যমন্যত্রবালবৃদ্ধব্যাধিতব্যসনিপ্রোষিতদেশত্যাগরাজ্যবিভ্রমেভ্যঃ॥"

ঋণসংক্রান্ত ব্যবহার-কালে সাক্ষী প্রভৃতি দ্বারা ঋণ-সপ্রমাণের যে বিধান কৌটিল্য বিহিত করিয়াছেন, তাহার আভাষ যথাস্থানে প্রদত্ত হইয়াছে। সে সম্বন্ধে কৌটিল্যের উক্তি;—

"প্রাত্যয়িকাশ্শুচয়োঽনুমতা বা ত্রয়োঽবরার্ধ্যাঃ। পক্ষানুমতৌ বা দ্বৌ ঋণং প্রতি ন ত্বেবৈকঃ। প্রতিষিদ্ধাস্স্যালসহায়াবদ্ধধনিকধারণিকবৈরিন্যঙ্গধৃতদণ্ডাঃ। পূর্ব্বে চাব্যবহার্যাঃ রাজশ্রোত্রিয়গ্রামভৃতকুষ্ঠিব্রণিনঃ পতিতচণ্ডালকুৎসিতকর্ম্মাণোঽন্ধবধিরমূকাহংবাদিনঃ স্ত্রীরাজপুরুষাশ্চান্যত্র স্ববর্গেভ্যঃ। পারুষ্যস্তেয়সঙ্গ্রহণেষু তু বৈরিস্যালসহায়বর্জ্জাঃ। রহস্যব্যবহারেষ্বেকা স্ত্রী পুরুষ উপশ্রোতা উপদ্রষ্টা বা সাক্ষী স্যাৎ রাজতাপসবর্জ্জম্। স্বামিনী ভৃত্যানামৃত্বিগাচার্য্যাশ্শিষ্যাণাং মাতাপিতরৌ পুত্রাণাং চানিগ্রহেণসাক্ষ্যং কুর্য্যু তেষামিতরে বা। পরস্পরাভিযোগে চৈষামুত্তমা। পরোক্তা দশবন্ধং দদ্যুরবীরাঃ পঞ্চবন্ধম্। * * * একমন্ত্রাস্সত্যমনুপহরতেঽনুপহরতাং সপ্তরাত্রাদূর্ধ্বং দ্বাদশপণো দণ্ডঃ। ত্রিপক্ষাদূর্ধ্বমভিযোগং দদ্যুঃ।"

সাক্ষী প্রভৃতির বিধান উল্লেখ করিয়া ব্যবহার বিচারে জয়পত্র প্রদান সম্বন্ধে কৌটিল্য যে বিধি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, অর্থশাস্ত্র হইতে নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল; যথা,—

"সাক্ষিভেদে যতো বহবঃ শুচয়োঽনুমতা বা ততো নিযচ্ছেয়ুঃ। মধ্যং বা গৃহ্নীয়ুঃ। তদ্বা দ্রব্যং রাজা হরেৎ। সাক্ষিণশ্চেদভিযোগাদূনং ব্রূয়ুরতিরিক্তস্যাভিযোক্তা বন্ধং দদ্যাৎ অতিরিক্তং বা ব্রূয়ুস্তদিরিক্তং রাজা হরেৎ। বালিশ্যাদভিযোক্তবা

স্তুঃশ্রুতং সুলিখিতং প্রেতাভিনিবেশং বা সমীক্ষ্য সাক্ষিপ্রত্যয়মেব স্যাৎ। 'সাক্ষিবালিশ্যেষ্বেব পৃথগনুপযোগে দেশকালকার্য্যাণাং পূর্ব্বমধ্যমোত্তমা দণ্ডাঃ' ইত্যৌশনসাঃ। 'কূটসাক্ষিণো যমর্থমভূতং বা নাশয়েয়ুস্তদ্দশগুণং দণ্ডং দদ্যুরিতি' মানবাঃ। 'বালিশ্যাদ্বা বিসংবাদয়তাং চিত্রো ঘাতঃ' ইতি বার্হস্পত্যাঃ। 'ন' ইতি কৌটিল্যঃ। ধ্রুবং হি সাক্ষিভিঃ শ্রোতব্যম্। অশৃন্বতাং চতুর্বিংশতি পণো দণ্ডঃ ততোঽর্দ্ধমব্রুবাণাম্। দেশকালাবিদূরস্থান্ সাক্ষিণঃ প্রতিপাদয়েৎ। দূরস্থানপ্রসারান্বা স্বামিবাক্যেন সাধয়েৎ।"

ঋণ-সংক্রান্ত দায় সম্বন্ধে কৌটিল্যের বিধান স্মৃতিশাস্ত্রের অনুসারী। কৌটিল্যের বিধান—'প্রেতস্য পুত্রাঃ কুসীদং দদ্যুঃ। দায়াদা বা রিকৃথহরাস্সহগ্রাহিণঃ প্রতিভুবো বা।" অর্থাৎ—

ঋণসংক্রান্ত দায়।

ঋণকারীর মৃত্যুর পর তৎপুত্রগণ মায় সুদ পিতৃঋণ পরিশোধ করিবে। পুত্রের অভাবে দায়াদ বা সম্পত্তির উত্তরাধিকারিগণ সে ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য। তদভাবে প্রতিভূগণ ঋণ পরিশোধ করিবেন। কতিপয় ব্যক্তি একত্র হইয়া ঋণ করিলে কোনও এক ব্যক্তির মৃত্যুর পর অন্যান্য সকলকে সে ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি প্রতিভূ হইবে না। যে ক্ষেত্রে প্রতিভূর বা জামিনের কালাকাল বা স্থানাদি নির্দ্দিষ্ট না থাকিবে, সে স্থলে প্রতিভূর পুত্র, পৌত্র বা উত্তরাধিকারিগণ ঋণ পরিশোধ করিবে। একই ব্যক্তি বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট ঋণ করিলে, একাধিক ঋণদাতা এককালে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারিবেন না,—অর্থশাস্ত্রে এইরূপ ব্যবস্থার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু 'প্রতিষ্ঠমান' অধমর্ণের সম্বন্ধে এ বিধি প্রযুক্ত হইবে না। স্বামী স্ত্রী, পিতা-পুত্র এবং একান্নবর্ত্তী ভ্রাতৃগণ পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে যে ঋণ গ্রহণ করিবেন, তদ্বিষয়ে ব্যবহার-স্থাপন চলিবে না। কাজ করিবার সময়ের মধ্যে কৃষকগণ বা রাজকর্ম্মচারিগণ ঋণদায়ে ধৃত হইবেন না। গোপালক এবং কৃষাণদিগের নিকট বেতন বাবদ যে ঋণ হইবে, স্ত্রী তাহা পরিশোধ করিবেন। এতদ্ব্যতীত স্বামীর অপর কোনও ঋণ, স্ত্রী পরিশোধ করিতে বাধ্য নহেন। অন্যপক্ষে স্ত্রীকৃত ঋণ, স্বামী পরিশোধ করিতে বাধ্য। স্ত্রী-কৃত ঋণ পরিশোধ করিবার উপায় নির্দ্ধারণ না করিয়াই যদি স্বামী পলায়ন করেন, তাহা হইলে তাঁহার উত্তমসাহস দণ্ড হইবে। ঋণের বিষয় অস্বীকার করিলে সাক্ষী প্রভৃতি দ্বারা সে ঋণ সপ্রমাণ করিবার বিধি। স্বামীর ঋণগ্রহণের বিষয় অবগত থাকিলেও স্বামীর সে ঋণ স্ত্রী পরিশোধে বাধ্য হন না। কিন্তু গোপালক, শৌণ্ডিক, রজক প্রভৃতির স্ত্রী অনেক বিষয়-কার্য্যে স্বামীর সহায়তা করিয়া থাকে; সংসারের অনেক ব্যয়ভারও তাহারা বহন করে। সুতরাং তাহাদের পরস্পরের কৃত ঋণের জন্য তাহারা পরস্পর দায়ী। ঋণাদান ও তৎসংক্রান্ত দায় সম্বন্ধে কৌটিল্যের বিধান সংক্ষেপতঃ এইরূপ বিবৃত হইয়াছে; যথা,—

"প্রেতস্য পুত্রা কুসীদং দদ্যুঃ। দায়াদা বা রিকৃথহরাস্সহগ্রাহিণঃ প্রতিভুবো বা। ন প্রাতিভাব্যমন্যদসারং বালপ্রাতিভাব্যম্। অসংখ্যাতদেশকালং তু পুত্রাঃ পৌত্রা দায়াদা বা রিকৃথং হরমাণা দদ্যুঃ। জীবিতবিবাহভূমিপ্রাতিভাব্যমসংখ্যাতদেশকালং তু পুত্রাঃ পৌত্রা বা বহেয়ুঃ। নানার্ণসমবায়ে তু নৈকো দ্বৌ যুগপদভিবদেয়াতাং

অন্যত্র প্রতিষ্ঠমানাৎ। তত্রাপি গৃহীতানুপূর্ব্যা রাজশ্রোত্রায় দ্রব্যং বা পূর্ব্বপ্রতি-পাদয়েৎ। দংপত্যোঃ পিতাপুত্রয়োঃ ভ্রাতৃণাং চাবিভক্তানাং পরস্পরকৃতমৃণমসাধ্যম্। অগ্রাহ্যঃ কর্ম্মকালেষু কর্ষকা রাজপুরুষাশ্চ। স্ত্রী বা প্রতিশ্রাবণী পতিকৃতং ঋণং অন্যত্র গোপালকাদ্ধসীতিকেভ্যঃ। পতিস্তু গ্রাহ্যঃ স্বীকৃতং ঋণমপ্রতিবিধায় প্রোষিত ইতি সম্প্রতিপত্তাবুত্তমঃ। অসম্প্রতিপত্তৌ তু সাক্ষিণঃ প্রমাণম্।"

সংহিতোক্ত ঋণ সংক্রান্ত বিধি কৌটিল্যের বিধানের ভিত্তিস্থানীয় বলা যাইতে পারে। আনুষ্ঠানিক ঋণাদি ব্যতীত ব্যবহার-বিষয়ক ঋণ-সংক্রান্ত বিধি সংহিতা-গ্রন্থে নানা ভাবে আলোচিত হইয়াছে। মনুর মতে অধিক হারে সুদ লওয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ। অশাস্ত্রীয় সুদ গ্রহণও তাঁহার মতে নিষিদ্ধ। মনু বলিয়াছেন,—'চক্রবৃদ্ধি' বা সুদের সুদ, 'কালবৃদ্ধি' বা মূলের দ্বিগুণ অধিক বৃদ্ধি, 'কারিতা' বা আপৎকালে স্বীকৃত বৃদ্ধি এবং কায়িকাবৃদ্ধি বা পীড়নাদি দ্বারা বৃদ্ধি—এই চারি প্রকার অশাস্ত্রীয় বৃদ্ধি গ্রহণ করা বিধেয় নহে। মাসিক বা দৈনিক হিসাবে সুদ লওয়ার বন্দোবস্ত থাকিলে, ঐ সুদ মূলধনের অধিক হইবে না,—মনুর ইহাই অভিমত। তবে ধান্য প্রভৃতি স্থলে পাঁচ গুণ বৃদ্ধি লইবার বিধান মনুসংহিতায় দৃষ্ট হয়। অশাস্ত্রীয় বৃদ্ধি মনুসংহিতায় 'কুসীদ-পথ' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ঐরূপ বৃদ্ধি শতকরা মাসিক পাঁচ পণের অধিক হইবে না। সবন্ধক ঋণস্থলে মনুর ব্যবস্থা অন্যরূপ। সেরূপ অবস্থায় শতকরা অশীতিভাগের এক-ভাগ সুদের ব্যবস্থা। কিন্তু দুই পণের অতিরিক্ত সুদ গ্রহণ মনুর মতে সর্ব্বত্র নিষিদ্ধ।

সংহিতোক্ত ঋণাদান-বিধি।

"বশিষ্ঠবিহিতাং বৃদ্ধিং সৃজেদ্বিত্তবিবর্দ্ধিনীম্। অশীতিভাগং গৃহ্নীয়াম্মাসাদ্বার্দ্ধুষিকঃ শতেঃ॥
দ্বিকং শতং বা গৃহ্নীয়াৎ সতাং ধর্ম্মমনুস্মরন্। দ্বিকং শতং হি গৃহ্নানো ন ভবত্যর্থকিল্বিষী॥"

মনুর মতে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র-ভেদে বৃদ্ধি-গ্রহণের একটা হার নির্দ্দিষ্ট ছিল। সে হিসাবে, ব্রাহ্মণ অধমর্ণের নিকট শতকরা দুই পণ, ক্ষত্রিয়ের নিকট তিন পণ, বৈশ্যের নিকট চারি পণ এবং শূদ্রের নিকট শতকরা পাঁচ পণ সুদ লওয়ার ব্যবস্থা। যথা,—
"দ্বিকং ত্রিকং চতুষ্কঞ্চ পঞ্চকঞ্চ শতং সমম্। মাসস্য বৃদ্ধিং গৃহ্নীয়াদ্বর্ণানামনুপূর্ব্বশঃ॥" কিন্তু বন্ধকীয় দ্রব্য ভোগ করিলে উত্তমর্ণ সুদ পাইবার অধিকারী নহেন,—আধি-প্রসঙ্গে মনু তাহা বিহিত করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির বিধান এতদপেক্ষা প্রাঞ্জল। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—'সবন্ধক ঋণ স্থলে প্রতি মাসে শতকরা অশীতিভাগের এক ভাগ সুদ বা বৃদ্ধি পাইবে। বন্ধকশূন্য ঋণ হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ভেদে যথাক্রমে শতকরা শত ভাগের দুই ভাগ, তিন ভাগ, চারি ভাগ এবং পাঁচ ভাগ বৃদ্ধি।' এরূপ স্থলে, বিষ্ণুর মতেও শতকরা দুই ভাগ, তিন ভাগ, চারি ভাগ ও পাঁচ ভাগ বৃদ্ধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তবে সুবর্ণাদি বিষয়ে তাঁহার ব্যবস্থা অন্যরূপ। তিনি (ষষ্ঠ অধ্যায়, ১১শ—১৭শ) বলিয়াছেন,—

"হিরণ্যস্য পরা বৃদ্ধির্দ্বিগুণা। ধান্যস্য ত্রিগুণা। বস্ত্রস্য চতুর্গুণা। রসস্যাষ্টগুণা।
সন্ততিঃ স্ত্রীপশূনাম্। কিণ্বকার্পাসসূত্রচর্ম্মায়ুধেষ্টকাঙ্গারাণামক্ষয়া। অনুক্তানাং দ্বিগুণা॥"

অর্থাৎ,—'সুবর্ণের চরম বৃদ্ধি দ্বিগুণ; ধান্যের তিন গুণ ও বস্ত্রের চারি গুণ বৃদ্ধি। রসের অর্থাৎ ঘৃত-তৈলাদির আট গুণ এবং স্ত্রী-পশুর বৎসা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি বিহিত। কিণ্ব, কার্পাস, সূত্র, চর্ম্ম,

আয়ুধ, ইষ্টক এবং অঙ্গারের অক্ষয় বৃদ্ধি অর্থাৎ ইহাদের সুদ চিরকাল চলিবে। অনুক্ত দ্রব্যের বৃদ্ধি দ্বিগুণ।' যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তিও এতদনুরূপ। তাঁহার এ ব্যবস্থা বহুকালস্থিত ঋণ-সম্পর্কীয়। উত্তমর্ণ যদি ইহার সুদ মধ্যে মধ্যে প্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে ইহাই হইল—বৃদ্ধির শেষ সীমা। যতকালই অতীত হউক না কেন, উত্তমর্ণ এতদতিরিক্ত বৃদ্ধির দাবী করিতে পারিবেন না। মিতাক্ষরা-মতেও অনুরূপ বিধান বিহিত হইয়াছে। পোষণ জন্ম গাভী প্রভৃতি প্রদত্ত হইলে একটী বৎস সহ গাভী প্রত্যর্পণ করিলেই অধমর্ণের ঋণ পরিশোধ হইবে,—ইহা মিতাক্ষরা-সম্মত। গৌতম বলিয়াছেন,—সুদ ন্যায্য মত বিংশতি ভাগের হিসাবে বাড়িতে পারে। কিন্তু ঋণ যদি এক বৎসরের অধিক কালের জন্য না হয়, তাহা হইলে সুদ প্রতি মাসে পাঁচ মাষা হিসাবে বাড়িবে। কালবশে চক্রবৃদ্ধির ব্যবস্থা হইতে পারে। ঋণকর্ত্তার শারীরিক পরিশ্রম এবং বন্ধকী বস্তুর ভোগ সুদের মধ্যে গণ্য। পশু, উপল অর্থাৎ মূল্যবান প্রস্তর, লোম, ক্ষেত্র এবং শতবাহ্য বস্তুতে পাঁচ গুণের অধিক সুদ হইবে না।' এতদ্বিষয়ে গৌতমের উক্তি (ত্রয়োদশ অধ্যায়, ১২ম সূত্র); যথা,—

"কুসীদ বৃদ্ধির্ধর্ম্ম্যা বিংশতিঃ পঞ্চমাষকী মাসং নাতিসাংবৎসরীমেকে চিরস্থানে
দ্বৈগুণ্যং প্রয়োগস্য মুক্তাধির্নবর্দ্ধতে দিৎসতোঽবরুদ্ধস্য চ চক্রকালবৃদ্ধিঃ কারিতা-
কায়িকাশিখাধিভোগাশ্চ কুসীদং পশূপজলোমক্ষেত্রশতবাহ্যেষুর্নাতিপঞ্চগুণম্॥"

নারদের মত বসিষ্ঠের মতের অনুসারী। বসিষ্ঠ বলিয়াছেন,—'উত্তমর্ণ মূলধন ব্যতীত প্রতি মাসে আশী ভাগের এক ভাগ সুদ প্রাপ্ত হইবেন। বৃহস্পতিরও সেই অভিমত। সংহিতাদির আলোচনায় বুঝা যায়, সুদ-সম্বন্ধে সংহিতাকারগণ সকলেই এক অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। দুই এক স্থলে সামান্য পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও সকলেরই যে অভিপ্রায় একরূপ, তাহা বেশ উপলব্ধি হয়। কৌটিল্যের মতে ন্যূনকল্পে সুদের পরিমাণ শতকরা পাঁচ পণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা,—"সপাদপণা ধর্ম্ম্যা মাসবৃদ্ধিঃ পণশতস্য" শাস্ত্রকারগণের অনেকেরই মতে সবন্ধক ঋণের সুদ-পরিমাণ সওয়া পণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কৌটিল্যের ন্যায় সংহিতাশাস্ত্র-প্রণেতৃগণও কান্তার ও সমুদ্রগামী বাণিজ্যার্থীর সুদের পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা দশ ও বিশ পণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্যে (দ্বিতীয় অধ্যায়, ৩৯শ শ্লোক দ্রষ্টব্য); যথা,—

"কান্তারগাস্তু দশকং সামুদ্রা বিংশকং শতম্।
দদ্যুর্ব্বা স্বকৃতাং বৃদ্ধিং সর্ব্বে সর্ব্বাসু জাতিষু॥"

মন্বাদির শাস্ত্রকারগণের বিধান অনুসারে স্থলপথ বা জলপথ গমনকুশল দেশকালার্থদর্শী বণিকদিগের সম্বন্ধে সুদ-সংক্রান্ত এই বিধি বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

ঋণ-আদায় সম্বন্ধে অসমর্থ পক্ষে মনু পুনরায় লেখ্যাদি প্রদানের ব্যবস্থা দিয়াছেন। সুদ প্রদান করিয়া মূলধনের জন্য অধমর্ণ পুনরায় লেখ্যপত্র দিতে পারেন। সমুদায় বৃদ্ধি প্রদানে অসমর্থ হইলেও অবশিষ্ট বৃদ্ধি ও মূলধন একত্র করিয়া লেখ্য-পত্র দিবার বিধান মনু প্রদান করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতিরও সেই একই ব্যবস্থা। তবে যাজ্ঞবল্ক্যাদির মতে, অধমর্ণ যে সময়ে যে ঋণ প্রদান করিবে, তাহা ঐ লেখ্যের পৃষ্ঠদেশে লিখিয়া রাখা কর্ত্তব্য। নিজ-হস্তাক্ষরে উত্তমর্ণ লেখ্যপৃষ্ঠে তাহার

ঋণ-আদায় বিধি।

প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন। সমস্ত ঋণ পরিশোধ হইয়া গেলে ঐ লেখ্য ছিঁড়িয়া ফেলিবে। আর যদি ঋণ পরিশোধ না হয়, তাহা হইলে শুদ্ধির জন্য ঐ লেখ্য-পত্র পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে।

"লেখ্যস্য পৃষ্ঠেঽভিলিখেদ্দত্ত্বা ধনং ঋণী। ধনী চোপগতং দদ্যাৎ স্বহস্তপরিচিহ্নিতম্॥
দত্ত্বর্ণং পাঠয়েল্লেখ্যং শুদ্ধ্যৈ বান্যত্তু কারয়েৎ। সাক্ষিমচ্চ ভবেদ্‌যদ্বা তদ্দাতব্যং সসাক্ষিকম্॥"

এতদ্ব্যতীত লোক-সমক্ষে যে ঋণ গ্রহণ করিবে, লোকসমক্ষেই তাহা পরিশোধ করিবার বিধি। "লিখিতার্থে প্রবিষ্টে লিখিতং পাটয়েৎ"—বিষ্ণুরও এই অভিপ্রায়। এতদ্ব্যতীত, বিষ্ণুর ও যাজ্ঞবল্ক্যের মতে ঋণদাতা যে কোনও উপায়ে প্রদত্ত ঋণ আদায় করিতে পারেন। সে সম্বন্ধে উত্তমর্ণ রাজদ্বারে দণ্ডিত হইবেন না। যিনি ঋণপ্রদানে সমর্থ অথচ ঋণদায় হইতে মুক্ত হইবার জন্য রাজদ্বারে আবেদন করেন,* রাজবিধান অনুসারে তিনি গৃহীত ধনের সমপরিমাণ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। আর উত্তমর্ণ কর্ত্তৃক আবেদিত হইয়া রাজা যদি সাক্ষী লেখ্যাদি প্রমাণ গ্রহণে ঋণ সাব্যস্ত করেন; তাহা হইলে অধমর্ণ তাঁহার গৃহীত ঋণের দশমাংশ এবং উত্তমর্ণ তাঁহার প্রদত্ত ধনের বিংশতি অংশ রাজকোষে দণ্ড-স্বরূপ প্রদান করিবেন। এ সম্বন্ধে নারদও অনুরূপ ব্যবস্থা বিহিত করিয়াছেন। তাঁহারও মতে,—

"ঋণিকঃ সধনো যস্তু দৌরাত্ম্যান্ন প্রযচ্ছতি। রাজ্ঞা দাপয়িতব্যঃ স্যাৎ গৃহীত্বাংশন্তু বিংশকম্।"

স্বজাতীয় বা নিকৃষ্ট জাতীয় অধমর্ণ নির্ধন হইলে, তাহার শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা ঋণাদায়ের বিধান, মনু বিহিত করিয়াছেন। আর যদি অধমর্ণ উৎকৃষ্ট জাতি হন, তাহা হইলে তাঁহার আয় অনুসারে ক্রমে ক্রমে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা মনুতে দৃষ্ট হয়। অধমর্ণ নির্ধন হইলে, তাহার ঋণ শোধের ব্যবস্থা যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় এইরূপ বিহিত হইয়াছে; যথা,—হীনজাতি বা সমজাতি নির্ধন হইলে তাহার ঋণ-পরিশোধনার্থ রাজা তাহার দ্বারা যথাযোগ্য উত্তমর্ণের কর্ম্ম করাইয়া দিবেন এবং ব্রাহ্মণ নির্ধন হইলে তাঁহার আয় অনুসারে ক্রমে ক্রমে ঋণ পরিশোধ করাইবার ব্যবস্থা করিবেন। (যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, ২য় অধ্যায়, ৪৪ম শ্লোক); যথা,—

"হীনজাতিং পরিক্ষীণমৃণার্থং কর্ম্ম কারয়েৎ।
ব্রাহ্মণস্তু পরিক্ষীণঃ শনৈর্দ্দাপ্যো যথোদয়ম্॥"

এ সম্বন্ধে বৃহস্পতিও বলিয়াছেন,—"নির্ধনং ঋণিকং কর্ম্ম গৃহমানীয় কারয়েৎ। শৌণ্ডিকান্তং ব্রাহ্মণস্তু দাপনীয় শনৈঃ শনৈঃ॥" কিন্তু অধমর্ণ ঋণ পরিশোধ করিতে আসিলে যদি উত্তমর্ণ সুদ-বৃদ্ধির জন্য উহা গ্রহণ না করেন, এবং অধমর্ণ ঐ ধন মধ্যস্থের নিকট গচ্ছিত রাখেন, তাহা হইলে ঐ সময় হইতে আর সুদ দিতে হইবে না। আবার অনেক উত্তমর্ণ একযোগে একই অধমর্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারিবেন না। সেরূপ ক্ষেত্রে ঋণ-গ্রহণের পৌর্ব্বাপর্য্য অনুসারে রাজা এক এক জন উত্তমর্ণের ঋণ-পরিশোধের ব্যবস্থা করাইবেন। বিভিন্ন বর্ণীয় অনেক উত্তমর্ণ একসঙ্গে অভিযোগ উপস্থিত করিলে অভিযোক্তৃগণের বর্ণানুসারে ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা বিহিত হইবে। রাজা প্রথমে ব্রাহ্মণ উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধ করাইবেন।

* এরূপ ক্রিয়া—আধুনিক দেউলিয়া (Insolvency) সংক্রান্ত ক্রিয়াদির সহিত উপমিত হইতে পারে। প্রাচীন-কালে দেউলিয়া স্থির না হইলে রাজদণ্ড ভোগ করিতে হইত। কিন্তু এখন রাজদণ্ডের বিধান নাই। দেউলিয়া সাব্যস্ত না হইলে ঋণাদায়ের ব্যবস্থা আছে।

তার পর ক্ষত্রিয়, তার পর বৈশ্য এবং সর্ব্বশেষে শূদ্র উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা। কৌটিল্যের মতে পরোপকারী, দরিদ্র ও ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে কুসীদ বৃদ্ধি হইবে না। অপিচ, পীড়িত, ব্যসনী, প্রবাসী ও পলাতক ব্যক্তিগণ যদি দশ বৎসরের মধ্যে ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা না করেন; তাহা হইলেও তাঁহাদের প্রদত্ত ধন নষ্ট হইবে না। সংহিতা-গ্রন্থে কৌটিল্য বর্ণিত এই সকল বিধান নাই। অন্যান্য সকল বিষয়েই কৌটিল্য স্মৃতি-শাস্ত্রের অনুসরণ করিয়াছেন, অর্থশাস্ত্রের ও সংহিতাগ্রন্থের তুলনায় সমালোচনা করিলে তাহা উপলব্ধি হয়। কৌটিল্য বলিয়াছেন, গচ্ছিত-গ্রহণকারী মরিয়া গেলে তদ্বিষয়ে ব্যবহার-স্থাপনা চলিবে না। দুরারোগ্য পীড়ায় আক্রান্ত হইলেও তাঁহার সেইরূপ ব্যবস্থা। কিন্তু এ বিষয়ে একটা আপত্তি উঠিতে পারে। গ্রহণকারীর পরলোকগমনে উত্তরাধিকার-সূত্রে পুত্রপৌত্রগণ অন্যান্য সম্পত্তির সহিত গচ্ছিত দ্রব্যও প্রাপ্ত হন। সে অবস্থায় কৌটিল্যের এ বিধান যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। কারণ, ঋণ-বিষয়ক দায়-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, পুত্র বা দায়াদগণ ঋণকারীর ঋণ পরিশোধ করিবেন। তাহা হইলে পুত্রগণ কেন সে ঋণ পরিশোধ করিবেন না বা গচ্ছিত ফিরাইয়া দিবেন না,—তাহা বুঝিতে পারা যায় না। দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হইলে গচ্ছিত প্রত্যর্পণ বিষয়ে কোনও বাধা জন্মিতে পারে না। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত অপরেও সে কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে। উপনিধি-বিধানে কৌটিল্যের উক্তি; যথা,—

"উপনিধিঃ ঋণেন ব্যাখ্যাতঃ। পরচক্রাটবিকাভ্যাং দুর্গরাষ্ট্রবিলোপে বা, প্রতিরোধকৈর্বা গ্রামসার্থব্রজবিলোপে, চক্রযুক্তে নাশে বা, গ্রামমধ্যাগ্ন্যুদকাবধে বা কিঞ্চিদমোক্ষ্যমাণেকুপ্যমনির্হার্য্যবর্জমেকদেশমুক্তদ্রব্যে বা, জ্বালাবেগোপরুদ্ধে বা, নাবি নিমগ্নায়াং মুষিতায়াং স্বয়মুপরূঢ়ো নোপনিধিমভ্যাভবেৎ। উপনিধিভোক্তা দেশকালানুরূপং ভোগবেতনং দদ্যাৎ। দ্বাদশপণং চ দণ্ডম্। উপভোগনিমিত্তং নষ্টং বাহভ্যাভবেচ্চতুর্বিংশতিপণশ্চ দণ্ডঃ। অন্যথা বা নিষ্পতনে। প্রেতব্যসনগতং বা নোপনিধিমভ্যাভবেৎ। আধানবিক্রয়াপব্যয়নেষু চাস্য চতুর্গুণপঞ্চবন্ধো দণ্ডঃ। পরিবর্ত্তনে নিষ্পাতনে বা মূল্যসমঃ। তেন আধিপ্রণাশোপভোগবিক্রয়াধানাপহারা ব্যাখ্যাতাঃ। নাধিস্সোপকারঃ সীদেন্ন চাস্য মূল্যং বর্দ্ধেত। নিরূপকারস্সীদেন্মূল্যং চাস্য বর্দ্ধেত। উপস্থিতস্যাধিমপ্রযচ্ছতো দ্বাদশপণো দণ্ডঃ। প্রযোজকাসন্নিধানে বা গ্রামবৃদ্ধেষু স্থাপয়িত্বা নিষ্ক্রয়মাধিং প্রতিপদ্যেত। নিবৃত্তবৃদ্ধিকো বাধ্যধিস্তৎকালকৃতমূল্যস্তত্রৈবাবতিষ্ঠেত। অনাশবিনাশকরণাধিষ্ঠিতো বা ধারণসন্নিধানে বা বিনাশভয়াদুদ্গতার্ঘং ধর্ম্মস্থানুজ্ঞাতো বিক্রীণীত। আধিপালপ্রত্যয়ো বা। স্থাবরস্তু প্রয়াসভোগঃ ফলভোগ্যো বা প্রক্ষেপবৃদ্ধিমূল্যশুদ্ধমাজীবমমূল্যক্ষয়েণোপনয়েৎ॥ অনিসৃষ্টোপভোক্তা মূল্যশুদ্ধমাজীবং বন্ধং চ দদ্যাৎ। শেষমুপনিধিনা ব্যাখ্যাতম্। এতেনাদেশোঽন্বাধিশ্চ ব্যাখ্যাতৌ। সার্থেনান্বাধিহস্তো বা প্রদিষ্টাং ভূমিমপ্রাপ্তশ্চৌরৈর্ভগ্নোৎসৃষ্টো বা নান্বাধিমভ্যাভবেৎ। অন্তরে বা মৃতস্য দায়াদোঽপি নাভ্যাভবেৎ। শেষমুপনিধিনা ব্যাখ্যাতম্। যাচিতকমবক্রীতকং বা যথাবিধং গৃহ্ণীয়ুস্তথাবিধমেব অর্পয়েয়ুঃ॥ ভ্রেষোপনিপাতাভ্যাং দেশকালোপরোধি দত্তং নষ্টং বিনষ্টং বা নাভ্যাভবেয়ুঃ॥ শেষমুপনিধিনা ব্যাখ্যাতম্।"

পাশ্চাত্য দেশে সুদ সম্বন্ধে প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়—মোজেস প্রবর্ত্তিত নীতি-সমূহে। মোজেস সুদ-গ্রহণের ঘোর প্রতিবাদী ছিলেন। * সুদ-গ্রহণ বা তদনুরূপ কোনও অর্থ-গ্রহণ, তাঁহার মতে ন্যায়-বিগর্হিত ও ঈশ্বরের অননুমোদিত বলিয়া বিহিত হইয়াছিল। মোজেসের বিধানে প্রতিভু প্রভৃতির পরিচয়ও পাওয়া যায়।

পাশ্চাত্যে সুদ-প্রথা।

সুদ-সংক্রান্ত বাইবেলের ঐ অংশ-সমূহের আলোচনায় অনেকে মনে করেন, সে সময় অত্যধিক পরিমাণে সুদ-গ্রহণের প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল। সুদের পীড়নে প্রপীড়িত

---

* বাইবেলের অনেক স্থলে মোজেস-প্রবর্ত্তিত নীতি-সমূহে সুদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বাইবেলের অন্তর্গত এক্সোডাস, ডিউটারনমি, সাম, প্রভার্ব, ইজিকিল, নেহিমিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন অংশে এতদ্বিষয়ক উক্তি দৃষ্ট হয়। যথা—"If thou lend money to any of my people with thee that is poor, thou shalt not be to him as a creditor ; neither shall ye lay upon him usury....If thou at all take thy neighbour's garment to pledge, thou shalt restore it upon him by that the sun goeth down —*Exodus*, *XXII*, 25—26. "And if thy brother be waxen poor, and his hand fail with thee ; then thou shalt uphold him : *as* a stanger and a sojourner shall he *live with* thee....Take thou no usury of him or increase ; but fear thy God ; that thy brother may live with thee....Thou shalt not give him thy money upon usury, nor give him thy victuals for increase."—*Leviticus*, XXV. 35—37. "And if thy brother be waxen poor with thee, and sell himself unto thee ; thou shalt not make him to serve as a bond servant : as an hired servant, and as a sojourner, he shall be with thee" &c.—*Ibid*, 39—40. Thou shalt not lend upon usury to thy brother ; usury of money, usury of victual, usury of anything that is lent upon usury : but unto foreigner thou mayest lend upon usury : but unto thy brother thou shalt not lend upon usury."—*Deuteronomy*, XXIII, 19—20." বাইবেলের আরও কয়েক স্থানে সুদের বিষয় উল্লিখিত আছে; যথা,—"Then I consulted with myself and contended with the nobles and the rulers, and said unto them : Ye exact usury, every one of his brother "—*Nehemiah*, V. 6. "He that putteth not out his money to usury, Nor taketh reward against the innocent." *The Psalms*, XV. 5. "Take his garment that is surety for a stranger, and hold him in pledge *that is surety* for strangers. The king by judgment establisheth the land : But he that exacteth gifts overthroweth it."—*The Proverbs*, XX. 16 & XXIX, 4. "He that augmenteth his substance by usury and increase, gathereth it from him that hath pity on the poor."—*Ibid*, XXVIII, 8. "He that hath not given forth upon usury, neither hath taken any increase, &c."..."Hath given forth upon usury and hath taken increase ; shall he then live ? he shall not live ; he hath done all these abominations ; he shall surely die."...That hath withdrawn his hand from the poor, that hath not received usury nor increase hath executed my judgment &c.'—*Ezekiel*, XVIII, 8, 13, 17. "In thee have they taken bribes to shed bloods ; thou hast taken usury and increase and thou hast greedily gained of thy neighbours by oppression &c.'—*Ezekiel*, XXII, 12.

হইয়া লোকে অশেষ কষ্ট-যন্ত্রণা ভোগ করিত। সেই জন্য, নির্ম্মম নিষ্ঠুর কুসীদজীবিগণের হস্ত হইতে দরিদ্রগণকে পরিত্রাণের জন্য, মোজেস তাঁহার নীতি-সমূহের মধ্যে সুদের নিন্দা-বাদ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, পাশ্চাত্যদেশে সুদ-গ্রহণের প্রথা যে বহু পূর্ব্ববর্ত্তী ও অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত আছে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আমরা যেমন আমাদের বেদকে ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকি; খৃষ্টানগণও তাঁহাদের 'বাইবেল' সম্বন্ধে সেইরূপ ধারণা সেইরূপ বিশ্বাস পোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে, খৃষ্ট-জন্মের মাত্র কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছিল। সে হিসাবে সেই সময় হইতেই বাইবেলের অস্তিত্ব মানিয়া লইতে হয়। সেই বাইবেলে যখন সুদের বিষয় উল্লিখিত আছে; তখন বুঝা যায়—প্রতীচ্যেও অতি সুপ্রাচীন কাল হইতে সুদ-গ্রহণ-প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল। প্রাচীন রোমের ও প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়, মধ্যযুগে, খৃষ্টজন্মের ৫৯৪ বৎসর পূর্ব্বে, সোলনের নীতিসমূহ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সোলন সে সময় শতকরা বার্ষিক ষোল মুদ্রা হিসাবে সুদের হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। প্লুটার্ক এতদ্বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে কোরিসা নগরে এক নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। তদনুসারে সবন্ধক ঋণে শতকরা চব্বিশ মুদ্রা সুদের হার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু সে সময় এথেন্স নগরে সাধারণতঃ তৎকাল-প্রচলিত মুদ্রার হিসাবে ১২ হইতে ১৮ মুদ্রা পর্য্যন্ত সুদ লওয়া হইত। ঐতিহাসিক গ্রোট এ বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যাহা হউক, এই সকল বিবরণ হইতে বুঝা যায়, প্রাচীন গ্রীসে তৎকালে অত্যধিক পরিমাণে সুদ লওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কুসীদজীবিগণের প্রপীড়নে আর্ত্তগণ বিশেষ সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়া-ছিলেন। আর সেইজন্য সোলন প্রভৃতি রাজনীতিকগণ ঋণসংস্কারের আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই অনুভাবনার ফলে গ্রীসে কুসীদের হার নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। প্রাচীন রোমেও ঐরূপ অত্যধিক কুসীদ-গ্রহণ-প্রথার বিদ্যমানতার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকগণ বলেন;—অত্যধিক পরিমাণে কুসীদ গ্রহণ জন্য জনসাধারণের কষ্টের ও যন্ত্রণার অবধি ছিল না। তাই সুদের হার নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য ব্যবস্থা-বিধানের আবশ্যক হয়। আর সেই উপলক্ষে ৪৫১-৪৫০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে রোমে 'টুয়েলভ টেবল' আইন বিধিবদ্ধ হইয়া যায়। তদনুসারে মূলধনের দ্বাদশ ভাগের এক ভাগ কুসীদের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল,—ঐতিহাসিক টাসিটস এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ৩৭৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে রোমে সুদের পরিমাণ শতকরা পঞ্চমুদ্রা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ৩৪২ খৃষ্টাব্দে ঐরূপ হারে সুদগ্রহণও নিষিদ্ধ হইয়া যায়। এই হইতে প্রাচীন রোমে সুদ-গ্রহণ-প্রথা একেবারে উঠিয়া গিয়াছিল। এই ভাবে বহু-দিন অতীত হয়। কিন্তু সুদ-গ্রহণ সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞার ফলে নানা অসুবিধা হইতে থাকে। এমন কি, রাজপ্রয়োজনেও ঋণ-গ্রহণের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। তখন আবশ্যকমত অর্থ-সংগ্রহে এবং তৎ-সরবরাহে অনেক বিশৃঙ্খলা ও অসুবিধা উপলব্ধি হইতে লাগিল। অতঃপর কর্ণেল সুলা এবং রিউফাস পুনরায় সুদ-গ্রহণ-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলেন। তাঁহাদের নির্দ্দেশমত তৎকাল-প্রচলিত মুদ্রার হিসাবে শতকরা বার্ষিক দ্বাদশ মুদ্রা সুদের হার নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল। তাহার অধিক কেহ কাহারও নিকট হইতে সুদ লইতে পারিবে না, সর্ব্বত্র এই আদেশ প্রচারিত হইল। ৫০ পূর্ব্ব-

খৃষ্টাব্দ হইতে সুদের ঐ হারই রোম-সাম্রাজ্যে প্রবর্ত্তিত ছিল এবং রাজাদেশে উহা নির্দ্দিষ্ট সুদের হার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। প্রাচীন মিশরের পুরাবৃত্তে কুসীদ সম্বন্ধে যে বিধি বিহিত ছিল, রোমের ও গ্রীসের বিধান হইতে তাহা স্বতন্ত্র। খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর মধ্য-ভাগে ডিওডোরাস মিশর-ভ্রমণে গমন করেন। তাঁহার গ্রন্থে মিশরের সুদ-সংক্রান্ত বিধানের কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়। ডিওডোরাসের গ্রন্থে প্রকাশ—লেখ্য গ্রহণ করিয়া যাঁহারা ঋণ-দান করিতেন, তাঁহারা মূলধনের দ্বিগুণের অতিরিক্ত সুদ কোনও অবস্থায়ই গ্রহণ করিতে পারিতেন না। ঋণ অনাদেয় হইলে অধমর্ণের বিত্তাদি বিক্রয় করা হইত বটে; কিন্তু কায়িক পরিশ্রম দ্বারা ঋণ আদায়ের কোনও বিধি ছিল না। পরিশ্রম দ্বারা অধমর্ণের স্বোপার্জ্জিত বিত্ত অথবা তাঁহার নিজের প্রাপ্য সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় হইতে পারিত। কিন্তু নিজ সম্পত্তি ভিন্ন অন্য কোনও বিত্ত-সম্পত্তি সে ঋণদায়ে আবদ্ধ হইত না।

বিভিন্ন দেশে সুদের বিধান।

ইউরোপীয় অন্যান্য দেশের পুরাতত্ত্বের আলোচনায় কুসীদ-সংক্রান্ত বিধান সম্বন্ধে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। ইংলণ্ডের প্রাচীন ইতিহাসে সুদের কঠোরতার বিষয় উল্লিখিত আছে; আর সেই কঠোরতা নিবারণ-কল্পে যে নানারূপ বিধি-বিধান প্রবর্ত্তনার আবশ্যক হইয়াছিল, তাহা উপলব্ধি হয়। অতি প্রাচীন কাল হইতে অষ্টম হেনরীর রাজত্ব-কাল পর্য্যন্ত কুসীদ গ্রহণ ইংলণ্ডে বিশেষ দণ্ডার্হ এবং ঈশ্বরাদেশ-বিরুদ্ধ বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছিল। কিন্তু য়িহুদী ও বৈদেশিকগণের সম্বন্ধে সে ব্যবস্থা প্রযোজ্য ছিল না। তাঁহারা যথেচ্ছ সুদ গ্রহণ করিতেন, আর সেই জন্য রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়া রাজকোষে বহু অর্থ প্রদান করিতে বাধ্য হইতেন। এইরূপ দণ্ডের বিধানে তাঁহাদের প্রতি রাজকর্ম্মচারিগণের পীড়ন এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে কুসীদ-সংক্রান্ত বিধি বিধিবদ্ধ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িল। তখন হইতে ব্যবস্থা হইল—শতকরা বার্ষিক ১০ পাউণ্ড সুদ-গ্রহণ ন্যায়ানুমোদিত; উহার অতিরিক্ত সুদ-গ্রহণ রাজদ্বারে দণ্ডনীয়। অতঃপর ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের রাজত্বকালে, ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে, এই বিধি পরিবর্ত্তিত হইল। তাঁহার আদেশে কুসীদগ্রহণ একেবারে নিষিদ্ধ হইয়া গেল। কিন্তু এ ব্যবস্থায় পুনরায় ন্যায়বিগর্হিত অনুষ্ঠানের অবতারণা হইতে লাগিল। ফলে, কুসীদজীবিগণ শতকরা ১৪ পাউণ্ড হিসাবে সুদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সুতরাং পুনরায় এই বিধি পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা অনুভূত হইল। ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে, রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে, এতৎসংক্রান্ত বিধি বিধিবদ্ধ হইয়া গেল। * অষ্টম হেনরির প্রবর্ত্তিত বিধান অনুসারে ব্যবস্থাপকগণ বার্ষিক সুদের পরিমাণ শতকরা ১০ পাউণ্ড নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। এই সময়ে ইংলণ্ডে প্রসিদ্ধ সংস্কারক কলভিনের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। তিনি ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের আদেশের অসারত্ব সপ্রমাণ করেন এবং তাঁহারই চেষ্টার ফলে সুদ-সংক্রান্ত

---

* 13 Elizabeth, cap. 8. এই আইনের মুখপাতে লিখিত আছে,—"That the probibiting act of King Edward VI had not done so much good as was hoped for; but that rather the vice of usury hath much more exceedingly abounded, to the utter undoing of many gentlemen, merchants, occupiers and others and to the importable hurt of the Commonwealth."

আইনের পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। যাহা হউক, রাণী এলিজাবেথের বিধি প্রবর্ত্তিত হইলে প্রসিদ্ধ নীতিবিৎ ডক্টর জন উইলসন সে বিধির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। পার্লামেণ্ট মহাসভায় বক্তৃতা-কালে তিনি বুঝাইলেন,—'সুদগ্রহণই যে কেবল দোষাবহ এবং ঈশ্বরের নীতিবিরুদ্ধ তাহা নহে। অল্পই হউক, আর অধিকই হউক, লাভের হিসাবে সুদগ্রহণ ও ঋণদান সর্ব্বপ্রকারে ঈশ্বরের নিকট দণ্ডনীয়। চৌর্য্য নরহত্যা অপেক্ষা ইহা কোনও অংশে হীন নহে।' উইলসনের উত্তেজনার ফলে তাৎকলিক ধর্ম্মপ্রাণ পুরোহিতগণ (বিশপগণ) সকলেই উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা সকলে একবাক্যে ঘোষণা করিলেন,—'সুদগ্রহণ ভগবানের আইনে নিষিদ্ধ এবং দণ্ডনীয়।' তখন দেশময় বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইল। তাহার ফলে, পরিশেষে বিশপ দিগের সন্তোষের জন্য, ব্যবস্থাপকগণ ঋণদান ও ঋণ-গ্রহণ একেবারে নিষিদ্ধ বলিয়া একটী ধারা ঐ আইনে সন্নিবিষ্ট করিলেন। মাত্র পাঁচ বৎসরের জন্য কুসীদ বিষয়ক ঐ আইন প্রবর্ত্তিত হইবার ব্যবস্থা হইয়া গেল। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই ঐ ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়া উহা স্থায়ী আইন-রূপে পরিণত হইয়াছিল। অতঃপর প্রথম জেম্‌সের রাজত্বকালে সুদের হার আরও কমিয়া যায়। তিনি শতকরা ৮ পাউণ্ড সুদের হার-পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া দেন। কমন্‌ওয়েল্‌থের প্রভুত্বকালে, ক্রমওয়েলের প্রাদুর্ভাবে, সুদের হার ছয় পাউণ্ড হইয়াছিল। দ্বিতীয় চার্লস ঐ হারই প্রচলিত রাখিয়াছিলেন। পরিশেষে রাণী য়্যানের রাজত্বকালে ঐ সুদের হার আরও কমিয়া যায় এবং শতকরা পাঁচ পাউণ্ড হিসাবে নির্দ্দিষ্ট হয়। রাণী য়্যান আরও নিয়ম করিয়া দেন,—নির্দ্দিষ্ট হারের অতিরিক্ত সুদ গ্রহণ করিলে ঋণদাতাকে তাঁহার সমস্ত ঋণের তিন গুণ অর্থদণ্ড প্রদান করিতে হইবে।* 'রিফরমেশন' বা সংস্কারের পূর্ব্বে স্কটলণ্ডে সুদ-গ্রহণের প্রথা ছিল না। 'রিফরমেশন' বা সংস্কার প্রবর্ত্তনার পর স্কটলণ্ডের ধর্ম্মবিষয়ক বাধ্য-বাধকতা কিছু শিথিল হইয়া পড়ে। তাহার ফলে, ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে, পার্লামেণ্ট মহাসভায় এক আইন

---

* 12 Annie, Cap. 16—মুখবন্ধে আছে,—"Whereas the reducing interest to ten, and from thence to eight and thence to six, in the hundred, hath from time to time, by experience, been found very beneficial to the advancement of trade and the improvement of lands, it is become absolutely necessary to reduce the high rate of interest of six per cent. to a nearer proportion to the interest allowed for money in foreign states." কিন্তু নির্দ্দিষ্ট হারের অতিরিক্ত সুদ গ্রহণের উল্লেখ থাকিলে সর্ব্বপ্রকার লেখ্য বা চুক্তি প্রভৃতি অসিদ্ধ হইবে, এই আইনে তাহা বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত দণ্ডের বিধানও বিহিত হইয়াছিল; যথা,—"That all persons who should after that time receive, by means of any corrupt bargain, loan, exchange, chevizance, or interest, of any wares, merchandise, or other thing whatever, or by any deceitful way or means, or by covin, engine, or deceitful conveyance for the forbearing or giving day of payment, for one whole year, for their money or other thing, above the sum of L.5 for L.100 for a year, should forfeit, for every such offence, the *triple* value of the monies or other things so lent, bargained &c."

বিধিবদ্ধ হয়। তদনুসারে সুদের পরিমাণ শতকরা দশ পাউণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। প্রায় এক শত বৎসর ঐ হারে সুদ-গ্রহণের ব্যবস্থা চলিতে থাকে। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে সুদের হার কিছু কমাইয়া দেওয়া হয়। তখন উহা আট পাউণ্ড হিসাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে সুদের হার শতকরা ছয় পাউণ্ড হয়। পরিশেষে রাণী য়্যানের রাজত্বকালে স্থায়ী সুদের হার পাঁচ পাউণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। আয়র্লণ্ডের পুরাবৃত্তেও ঐ একই অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানেও ১৬৩১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোনও সুদ লওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। ঐ খৃষ্টাব্দে দশ পাউণ্ড সুদ গ্রহণের বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। অতঃপর সুদের হার ক্রমশঃ কমিতে থাকে। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে শতকরা আট পাউণ্ড, ১৭২২ খৃষ্টাব্দে সাত পাউণ্ড, ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে ছয় পাউণ্ড সুদের হার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ইংলণ্ডে এই সুদ সম্বন্ধে একটী বিশেষ নিয়ম পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে সুদ দেওয়া সম্বন্ধে কোনও বাধা-বাধকতা নাই। ইংলণ্ডের 'কমন ল' অনুসারে, সুদ দেওয়ার বিষয়ে অধমর্ণের স্বীকারোক্তি না থাকিলে, বিবাদস্থলে বিচারক ইচ্ছা করিলে অধমর্ণকে সুদ-প্রদানে বাধ্য না করিতেও পারেন। ঋণদাতা যদি বিচারপ্রার্থী হন, আর বিবাদী যদি বিচারকের নিকট সময় প্রার্থনা করে, তাহা হইলে ঋণদাতা সে সময়ের জন্যও সুদ পাইবার অধিকারী নহেন। তবে এ সম্বন্ধে কয়েকটী বিশেষ বিধি বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। সওদাগর বা ব্যবসায়ীদিগের ব্যবহার-বিচারে সুদের কথা স্পষ্ট উল্লিখিত না থাকিলেও, বিচারক জুরিগণ, প্রতিপক্ষকে সুদ দিতে বাধ্য করিতেন; এরূপ স্থলে সুদ দেওয়া বা না-দেওয়া জুরিদিগের বিবেচনাধীন ছিল। ঋণগ্রহণকালীন লেখা, প্রতিভূ প্রভৃতি সম্বন্ধে অনুরূপ বিধি প্রযোজ্য। কুশীদের হার-পরিমাণ বিষয়ে ফরাসী রাজ্যে এবং লিভোনিয়া প্রভৃতি স্থানে একই অবস্থার বিষয় উল্লিখিত আছে। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে ফরাসী-রাজ্যে সুদের পরিমাণ শতকরা বার্ষিক পাঁচ ফ্রাঙ্ক নির্দ্দিষ্ট ছিল। বিপ্লবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঐ হিসাবেই ফরাসী-রাজ্যে সুদ গ্রহণ করা হইত। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসী-রাষ্ট্রনীতিবিৎ লাভার্ডি সুদের ঐ হার কমাইয়া চারি ফ্রাঙ্ক করেন। তাহাতে বিষময় ফল উৎপন্ন হয়। বাজার দর না কমিয়া ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে এবং সময় ও অবস্থা বিশেষে শতকরা ছয় ফ্রাঙ্ক সুদ সাধারণ্যে গৃহীত হইতে আরম্ভ হয়। সুতরাং লাভার্ডি-বিহিত সুদ-সংক্রান্ত বিধি অচিরে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ইহার পর সুদের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট হার গ্রহণের বিধি বিধিবদ্ধ হয়। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে লিভনিয়ায়ও সেইরূপ অবস্থা সংঘটিত হইয়াছিল। রাণী ক্যাথারিন ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে সুদের হার কমাইয়া শতকরা ছয় মুদ্রা স্থলে পাঁচ মুদ্রা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ফলে, রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সংঘটিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে যাহারা শতকরা ছয় মুদ্রা সুদ দিয়া অব্যাহতি পাইত, ঐতিহাসিক ষ্টর্ক বলেন, রাণীর এই বিধানের ফলে, তাহারা প্রায়ই শতকরা সাত, আট মুদ্রা বা ততোধিক সুদ দিতে বাধ্য হইয়াছিল।* মধ্যযুগে সুদের হার বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা অধিক ছিল না। কিন্তু কুসীদজীবিগণের উপর এত অত্যাচার অবিচার হইত যে, বাধ্য হইয়া তাহারা অধিক হারে সুদ গ্রহণ করিত।† বাণিজ্যসংক্রান্ত ইতিবৃত্তে

---

* Vide, Storch, *Traite d'Economic Politique.*

† "But the clamour and persecution raised against those who took interest for

ম্যাক্ফারসন এইরূপ অত্যাচারের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। রাজপুরুষের অত্যাচারের ফলে শতকরা পঞ্চাশ এবং স্থলবিশেষে শত মুদ্রা পর্য্যন্ত সুদের কমে কুসীদজীবিগণ কাহাকেও ঋণদান করিত না। মধ্যযুগের ইতিহাসে ঐতিহাসিক হ্যালাম তৎকাল-প্রচলিত কুসীদ-প্রথার কিঞ্চিৎ আভাষ প্রদান করিয়াছেন। * তাঁহার বর্ণনা হইতে বুঝা যায়,—১২২৮ খৃষ্টাব্দে শতকরা সাড়ে বার মুদ্রা হিসাবে ভেরোনায় সুদের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে জেনোয়া রাজ্যে শতকরা সাত হইতে দশ মুদ্রা পর্য্যন্ত সুদ দিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। ১৪৩৫ খৃষ্টাব্দে সবন্ধক ঋণ সম্পর্কে বার্সিলোনায় শতকরা দশ মুদ্রা সুদের পরিমাণ বিহিত হইয়াছিল। এই সময় ইটালিতে ও ক্যাটালোনিয়ায় সুদ-গ্রহণের বিধান ছিল। কিন্তু অন্যান্য দেশের সুদপরিমাণের তুলনায় ইংলণ্ডে ও ফরাসী-রাজ্যে অধিক পরিমাণে সুদ লওয়া হইত। ম্যাথু পারিস বলেন, সপ্তম হেন্‌রির রাজত্বকালে প্রতি দুই মাস অন্তর অধমর্ণকে শতকরা দশ মুদ্রা সুদ দিতে হইত। যাহা হউক, সুদ-সংক্রান্ত বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বিধানের আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, অবিবেচক অর্থগৃধ্ন কুসীদজীবীর কবল হইতে জনসাধারণের পরিত্রাণের চেষ্টা অতি প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। বিবিধ রাজবিধির প্রবর্ত্তনায় সে বিষয়ে সাফল্য-লাভও ঘটিয়াছে। দেশ ক্রমে যতই সভ্য-সমুন্নত হইয়া আসিয়াছে, এতদ্বিষয়ে চেষ্টাও তত অধিক হইয়াছে। পরিশেষে সুশিক্ষার প্রভাবে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সুদের একটা নির্দ্দিষ্ট হার বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন ভারতের বিধি এ বিষয়ে আদর্শ-স্থানীয়।

the use of money was so voilent, that they were obliged to charge it much higher than the natural price, which, if it had been let alone, would have found its level, in order to compensate for the opprobrium, and frequently the plunder, which they suffered ; and hence the usual rate of interest was what we should now call most exorbitant and scandalous usury."—*Vide*, Macpherson's *History of Commerce*, Vol. I, p. 400.

* It is impossible to form any very accurate estimate of the rate of profit in the middle ages ; yet several striking facts may be adduced in support of the opinion advanced in the text. At Verona, in 1228, the interest of money was fixed by law at twelve and a half per cent. Towards the end of the fourteenth century, the republic of Genoa paid only from seven to ten per cent. to her creditors ; and the average discount on good bills at Barcelona, in 1435, is stated to have been about ten per cent. But whilst the rate of interest in Italy and Catalonia, where a considerable degree of freedom was allowed to the parties concerned in bargaining for a loan, was thus comparatively moderate, it was, in dispite of its total prohibition, incomparably higher in France and England. Mathew Paris mentions that in the reign of Henry III. the debtor paid ten per cent. every two months ; and this, though absolutely impossible as a general practice, may not have been very far from the average interest charged on the few loans that were thus contracted for."—*Vide* Hallam's *History of the Middle Ages*, Vol. III., p. 402.

অন্যান্য দেশের বহু পূর্ব্বে যে ভারতবর্ষ সভ্যতার শীর্ষ-সোপানে আরোহণ করিয়াছিল, তত্তদ্দেশের কুসীদ-বিধানের সহিত ভারতীয় কুসীদ-ব্যবস্থার তুলনায় তাহা বেশ উপলব্ধি হয়।

ঋণ-সংক্রান্ত দায় সম্বন্ধে কৌটিল্যের বিধান স্মৃতির অনুসারী। স্মৃতি-গ্রন্থের আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, পিতৃঋণ পরিশোধ করা পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে পুত্র ধর্ম্মে পতিত হন। পিতৃ-পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারত্ব প্রাপ্ত না হইলেও পিতৃঋণ পরিশোধ করা পুত্রের ধর্ম্ম। কিন্তু উত্তরাধিকারীর পক্ষে বিধান অন্যরূপ। সম্পত্তির উত্তরাধিকারী না হইলে, এক পুত্র ভিন্ন, অন্য কেহ ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য নহে। পুত্রের কর্ত্তব্য পিতার মৃত্যুর পরই প্রকট হয়। এ হিসাবে, পুত্রের স্বত্ব বর্ত্তমান থাকিলেও, পিতার জীবিতকালে বা তাঁহার মৃত্যুর পর, উত্তমর্ণ পৈত্রিক সম্পত্তি দ্বারা ঋণ আদায় করিবার অধিকারী। কিন্তু হিন্দুর ব্যবহার-বিধানে উত্তরাধিকারী মাত্রেই পূর্ব্বকৃত ঋণদায়ে দায়ী। যাজ্ঞবল্ক্য (দ্বিতীয় অধ্যায়, ৫১ম শ্লোক) বলিয়াছেন,—

ঋণদায়ে দায়োল্লেখ।

"পিতরি প্রোষিতে প্রেতে ব্যাসনাভিপ্লুতেঽথবা। পুত্রপৌত্রৈর্ঋণং দেয়ং নিহ্নবে সাক্ষিভাবিতম্॥
ঋক্থগ্রাহ ঋণং দাপ্যো যোষিদ্‌গ্রাহস্তথৈব চ। পুত্রোঽনন্যাশ্রিতদ্রব্যম্ পুত্রহীনস্য ঋক্থিনঃ॥"

'পিতৃপিতামহ কৃত ঋণ পুত্র-পৌত্রাদি পরিশোধ করিতে বাধ্য। তাহারা পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী না হইলেও তাহারাই ঐ ঋণ প্রদান করিবে।' পিতার মৃত্যু হইলে, দূরদেশে গমন করিলে, বিশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার সন্ধান না পাওয়া গেলে, অথবা দুশ্চিকিৎস্য রোগাদি ব্যসনে অভিভূত হইলে, ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব পুত্র-পৌত্রাদির উপর ন্যস্ত হইবে। যাহারা উত্তরাধিকার সূত্রে ঋক্থ বা সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবে, তাহারাই ঋণ পরিশোধ করিবে। তবে পিতার অন্যায়কৃত ঋণ কেহই পরিশোধ করিতে বাধ্য হইবে না। মিতাক্ষরারও ইহাই অভিমত। ঋণাদান বিষয়ে হিন্দুর ব্যবহার-শাস্ত্রে ধর্ম্মপ্রাণতার অশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুর বিশ্বাস, ঋণ পরিশোধ না হইলে ঋণকারীর আত্মার সদ্গতি হয় না। মহর্ষি মনু (মনুসংহিতা, অষ্টম অধ্যায়, ১৬৬ম—১৬৭ম শ্লোক) বলিয়াছেন,—

"গ্রহীতা যদি নষ্টঃ স্যাৎ কুটুম্বার্থে কৃতো ব্যয়ঃ। দাতব্যং বান্ধবৈস্তৎস্যাৎপ্রবিভক্তৈরপি স্বতঃ॥
কুটুম্বার্থেঽধ্যধীনোঽপি ব্যবহারং যমাচরেৎ। স্বদেশে বা বিদেশে বা তং জ্যায়ান্ন বিচালয়েৎ॥"

এ হিসাবে পুত্রগণ তো পিতৃঋণ পরিশোধ করিবেনই; তাহা ছাড়া অবিভক্ত বা বিভক্ত পরিবারের সকলেই ঐ ঋণ দিতে বাধ্য—যদি সে ঋণ সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ গৃহীত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন কুটুম্ব-ভরণ-পোষণের জন্য যদি দাসও ঋণ করে, তাহাও ধনস্বামী পরিশোধ করিবেন। তিনি স্বদেশেই থাকুন আর বিদেশেই থাকুন, এরূপ ঋণ তিনি পরিশোধ করিতে বাধ্য। পিতার প্রাতিভাব্য ঋণ বিষয়ে ঐ একই নিয়ম মনু বিধান করিয়াছেন। প্রতিভূ-প্রসঙ্গে তদ্বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ঋণ-সংক্রান্ত দায় বিষয়ে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যবস্থা,—

"অবিভক্তৈঃ কুটুম্বার্থে যদৃণন্তু কৃতং ভবেৎ। দদ্যুস্তদৃক্থিনঃ প্রেতে প্রোষিতে বা কুটুম্বিনি॥
ন যোষিৎ পতিপুত্রাভ্যাং ন পুত্রেণ কৃতং পিতা। দদ্যাদৃতে কুটুম্বার্থান্ন পতিঃ স্ত্রীকৃতং তথা॥
গোপশৌণ্ডিকশৈলূষরজকব্যাধযোষিতম্। ঋণং দদ্যাৎ পতিস্তেষাং যস্মাদ্বৃত্তিস্তদাশ্রয়া॥
প্রতিপন্নং স্ত্রিয়া দেয়ং পত্যা বা সহ যৎ কৃতম্। স্বয়ং কৃতং বা যদৃণং নান্যৎ স্ত্রী দাতুমর্হতি॥"

অর্থাৎ,—পরিবার-ভরণার্থ অবিভক্ত অবস্থায় যে ঋণ-গ্রহণ করা যায়, তাহা অভিভাবক কর্ত্তা পরিশোধ করিবেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে বা তিনি দীর্ঘপ্রবাসী হইলে, ঐ পরিবারের অন্তর্গত সকল অংশীদার উহা পরিশোধ করিবেন। পতিকৃত ঋণ স্ত্রীকে, পুত্রকৃত ঋণ মাতা-পিতাকে এবং স্ত্রীকৃত ঋণ পতিকে পরিশোধ করিতে হইবে না।* তবে যদি ঐ ঋণ পরিবার-প্রতিপালনার্থ হইয়া থাকে, তাহা দিতে হইবে। গোপ, শৌণ্ডিক, শৈলূষ, রজক ও ব্যাধ—এই সকল জাতির স্ত্রী যে ঋণ করিবে, উহাদিগের পতি তাহা পরিশোধ করিতে বাধ্য। কেন-না, তাহাদের উপরও অনেকাংশে জীবিকার্জ্জন নির্ভর করে। ঐ সকল জাতীয় স্ত্রীলোকেরাও উপায়ক্ষম। অঙ্গীকৃত ঋণ, স্বামীর সহিত কৃত ঋণ এবং নিজকৃত ঋণ—স্ত্রীলোক পরিশোধ করিতে বাধ্য। তাহাকে অন্য ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে না। কিন্তু কৌটিল্যের মতে ব্যাধ, শৈলূষ প্রভৃতি জাতীয় স্ত্রী ব্যতীত অপর কোনও জাতীয় স্ত্রীই স্বামীর ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য নহে। এতদ্ব্যতীত ঋক্‌থগ্রাহী, তদভাবে ভার্য্যাগ্রাহী, তদভাবে অনন্যাশ্রিতদ্রব্য পুত্র ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য। উত্তমর্ণের নিকট ঋণ পরিশোধ করার নিয়ম। তাঁহার লোকান্তরে তাঁহার পুত্রপৌত্রাদির বা উত্তরাধিকারীর নিকট সে ঋণ পরিশোধ করিবে। ঋণ-সংক্রান্ত দায়-বিষয়ে সংক্ষেপে যাজ্ঞবল্ক্যের হইাই ব্যবস্থা। বিষ্ণুর ব্যবস্থাও প্রায় এতদনুরূপ। তবে ঋণ-পরিশোধ-ব্যাপার, দ্বাদশ বর্ষের পর উত্তরাধিকারীদিগের বা স্থলাভিষিক্তগণের ইচ্ছাধীন বলিয়া তিনি বিহিত করিয়াছেন। ঋণাদায় সম্বন্ধে তাঁহার ব্যবস্থা (বিষ্ণু-সংহিতা, ষষ্ঠ অধ্যায়, ১৭ম শ্লোক—৩৯ম শ্লোক); যথা,—

> "ঋণগ্রাহিণি প্রেতে প্রব্রজিতে দ্বিদশসমাঃ প্রবসিতে বা তৎপুত্রপৌত্রৈর্ধনং দেয়ম্। নাতঃ পরমনীপ্সুভিঃ॥ সপুত্রস্য বা পুত্রস্য বা ঋক্‌থগ্রাহী ঋণং দদ্যাৎ। নির্দ্ধনস্য স্ত্রীগ্রাহী। ন স্ত্রী পতিপুত্রকৃতম্। ন স্ত্রীকৃতং পতিপুত্রৌ। ন পিতা পুত্রকৃতম্। অবিভক্তৈঃ কৃতমৃণং যস্তিষ্ঠেৎ স দদ্যাৎ। পৈতৃকমৃণমবিভক্তানাং ভ্রাতৄণাঞ্চ বিভক্তাশ্চ দায়ানুরূপমংশম্। গোপশৌণ্ডিকশৈলূষরজকব্যাধ স্ত্রীণাং পতির্দদ্যাৎ। বাক্‌প্রতিপন্নং কুটুম্বিনা দেয়ম্। কস্যচিৎ কুটুম্বার্থে কৃতঞ্চ॥"

গৌতমের বিধি তেমন বিস্তৃত নহে। তিনি কেবলমাত্র বলিয়াছেন,—"ঋক্‌থভাজি ঋণং প্রতিকুর্য্যুঃ"; অর্থাৎ,—উত্তরাধিকারীরা ঋণ পরিশোধ করিবে।

সংহিতাদি গ্রন্থে ঋণ-সংক্রান্ত দায়-বিষয়ে যে ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে, তাহার সহিত তুলনায় কৌটিল্যের বিধান-সমূহ আলোচনা করিলে প্রতিপন্ন হয়—কৌটিল্যের বিধান স্মৃতিশাস্ত্রের অনুসারী। তাহা হইতে আরও বুঝা যায়, কৌটিল্যের সকল ব্যবস্থাই সনাতন ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। কৌটিল্য বলিয়াছেন,—দশ বৎসরের মধ্যে আদায় না লইলে বা দখল না করিলে ধন বা বিত্ত সম্বন্ধে আর দাবী চলিবে না। সে হিসাবে কৌটিল্যের মতে ঋণ-সম্বন্ধে দশ বৎসরই তামাদির শেষ

তামাদি ও ভোগ-প্রসঙ্গ।

* কৌটিল্য কিন্তু স্পষ্টই বলিয়াছেন,—স্ত্রীকৃত ঋণ পতি পরিশোধ করিতে বাধ্য। স্বামী যদি ঋণ পরিশোধের উপায় নির্দ্দেশ না করিয়া পলায়ন করেন, তাহা হইলে তাঁহার অর্থদণ্ড হইবার ব্যবস্থা অর্থশাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। ঋণাদান প্রসঙ্গে এতদ্বিষয় দ্রষ্টব্য।

সীমা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত 'সম্বামিসম্বন্ধ'-প্রকরণে স্থাবরাদির তামাদি-কাল উল্লেখ-প্রসঙ্গে, কৌটিল্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা বিহিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন; যথা,—

"ভোগানুবৃত্তিরুচ্ছিন্নদেশানাং যথাস্বং দ্রব্যাণাম্। যৎ স্বং দ্রব্যমন্যৈর্ভুজ্যমানং দশ বর্ষাণ্যুপেক্ষেত, হীয়েতাস্য অন্যত্র বালবৃদ্ধব্যাধিতব্যসনিপ্রোষিতদেশত্যাগ-রাজবিভ্রমেভ্যঃ। বিংশতিবর্ষোপেক্ষিতমনুবসিতং বাস্তু নানুযুঞ্জীত। জ্ঞাতয়-শ্রোত্রিয়াঃ পাষণ্ডা বা রাজ্ঞামসন্নিধৌ পরবাস্তুষু বিবসন্তো ন ভোগেন হরেয়ু। উপনিধিমাধিং নিধিং নিক্ষেপং স্ত্রিয়ং সীমানং রাজশ্রোত্রিয়দ্রব্যানি চ।"

বাস্তু ব্যতীত অন্য দ্রব্য স্বামীর সমক্ষে দশ বৎসর উপভুক্ত হইলে, স্বামী যদি তাহাতে বাধা প্রদান না করেন, তাহা হইলে ভোগকর্ত্তার তাহাতে স্বত্ব জন্মে। কিন্তু অপ্রাপ্ত-ব্যবহার, বৃদ্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত, ব্যসনাভিভূত, দেশত্যাগী, প্রব্রজিত ও শ্রোত্রিয় ব্যক্তির প্রাপ্য এবং রাজপ্রাপ্য ধন দশ বৎসর উপেক্ষিত হইলেও তামাদি হইবে না। কিন্তু স্থাবর সম্পত্তির মেয়াদ বিংশ বর্ষ। বিশ বৎসর স্থাবর সম্পত্তি অন্য কর্ত্তৃক উপভুক্ত হইলে, ভূস্বামীর তাহাতে আর কোনও স্বত্ব থাকিবে না। কিন্তু স্বজাতি, কুলপুরোহিত এবং শ্রোত্রিয় কর্ত্তৃক উহার অধিক কাল কোনও বাস্তু উপভুক্ত হইলে তাহাতে বাস্তুস্বামীর স্বত্ব লোপ হইবে না। সংহিতা-শাস্ত্রে অবস্থা-ভেদে ব্যবস্থা-ভেদ পরিলক্ষিত হয়। সংহিতা-মতে, ভোগ, সাক্ষী ও দলিল প্রমাণ মধ্যে গণ্য। সে মতে নির্দ্দিষ্ট ভোগকালের পর আর ধনস্বামীর তাহাতে স্বত্ব থাকে না। অজ্ঞাতস্বামিক ধনসম্পর্কে মনুর মতে তামাদির কাল তিন বৎসর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ সময়ের মধ্যে যদি ধনস্বামী প্রমাণাদি দ্বারা তাহাতে তাঁহার স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে সে ধন তাঁহাকে দেওয়া হইবে। ঐ সময় অতীত হইলে আর তাঁহার দাবী গ্রাহ্য হইবে না। অজ্ঞাতস্বামিক ধন সম্বন্ধে এই বিধি। ধনস্বামীর সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে যদি কেহ তাঁহার কোনও সম্পত্তি দশ বৎসরের অধিক কাল ভোগ করে, এবং তিনি সে ভোগ নিবৃত্ত না করেন; তাহা হইলে দশ বৎসরের পর উক্ত দ্রব্যে তাঁহার স্বামিত্ব লোপপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু পোগণ্ড, জড় প্রভৃতির বিত্ত-সম্পত্তি এইরূপে উপভুক্ত হইলেও তাহাতে তাহাদের স্বত্ব নষ্ট হইবে না। এতদ্ব্যতীত বন্ধকীয় দ্রব্য, ভূম্যাদির সীমা, উপনিধি, নিক্ষেপ, দাসদাসী প্রভৃতি, রাজধন ও বিদ্বান ব্রাহ্মণের ধন, বহুকাল উপভুক্ত হইলেও, তাহাতে ধনস্বামীর স্বত্ব থাকিবে। প্রীতি-বশতঃ, যদি কাহাকেও কিছু ভোগ করিতে দেওয়া যায়, তাহার স্বত্ব বহুকাল পর্য্যন্ত নষ্ট হয় না। তামাদির কাল, গৌতমের মতেও, দশ বৎসর নির্দ্দিষ্ট। তিনি বলিয়াছেন,—"জড়াপোগণ্ড-ধনং দশবর্ষভুক্তং পরৈঃ সন্নিধৌ ভোক্তুঃ শ্রোত্রিয়প্রব্রাজিতরাজন্যধর্ম্মপুরুষৈঃ পশুভূমিস্ত্রীণামনতি-ভোগ।" অর্থাৎ,—জড় ও পোগণ্ডের ধন ব্যতীত অন্যের ধন যদি ধনস্বামীর সম্মুখে দশ বৎসর ভোগ করে, তাহা হইলে ঐ ধনে ভোক্তার অধিকার জন্মিবে। কিন্তু শ্রোত্রিয়, প্রব্রজিত, রাজন্য এবং ধর্ম্মনিরত পুরুষের ধন যদি কেহ ঐরূপ সম্মুখে দশ বৎসর ভোগ করিতে থাকে, তাহাতে ভোক্তার অধিকার হইবে না। পশু, ভূমি এবং দাসী প্রভৃতির অত্যন্ত ভোগ না হইলে আর উহাতে ভোক্তার অধিকার সিদ্ধ হয় না। গৌতমের অভিমত হইতেও বুঝা গেল, দশ বৎসর পরে স্বামিত্ব লোপপ্রাপ্ত হয়। বসিষ্ঠও দশ বৎসর তামাদির কাল

নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা,—"তত্রভুক্তে দশবর্ষমেবোদাহরন্তি।" নিক্ষেপ ও উপনিধি প্রভৃতির যথেচ্ছ-ভোগ স্বামিত্বহানিকর নহে—এ অভিমত তিনিও ব্যক্ত করিয়াছেন। বিষ্ণুর বিধানে ভোগাদি-সংক্রান্ত তামাদির বিধি দৃষ্ট হয় না। তিনি এইমাত্র বলিয়াছেন যে, তিন পুরুষ যথাবিধি ভোগ হইলে চতুর্থ পুরুষ তাহা প্রাপ্ত হইবে। সে সম্বন্ধে লিখিত দলিলের কোনও আবশ্যক হইবে না। ক্রয়প্রতিগ্রহাদি ক্রমে সাগমভোগ সহকারে ভূম্যাদি যাহার দখলে থাকিবে, অন্যের তাহাতে স্বত্ব হইবে না। (বিষ্ণু-সংহিতা, পঞ্চম অধ্যায়) যথা,—

"সাগমেন চ ভোগেন ভুক্তং সম্যগ্‌যদা ভবেৎ। আহর্ত্তা লভতে তত্র নাপহার্য্যন্তু তৎ ক্বচিৎ॥"

"ত্রিভিরেব চ যা ভুক্তা পুরুষৈর্ভূর্যথাবিধি। লেখ্যাভাবেঽপি তাং তত্র চতুর্থং সমবাপ্নুয়াৎ॥"

তামাদির বা স্বত্বহানির কাল সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। মনু প্রভৃতির মতে, দশ বৎসর পরে ধনস্বামীর স্বত্বনাশের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য অবস্থাভেদে বিংশ ও দ্বাদশ বৎসর তামাদির কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা হইতে এতৎসংক্রান্ত কয়েকটী শ্লোক (দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৪ম—৩০ম শ্লোক) উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

"পশ্যতো ব্রুবতো ভূমের্হানির্বিংশতিবার্ষিকী। পরেণ ভুজ্যমানায়া ধনস্য দশবার্ষিকী॥
আধিসীমোপনিক্ষেপজড়বালধনৈর্বিনা। তথোপনিধিরাজস্ত্রীশ্রোত্রিয়াণাং ধনৈরপি॥
আধ্যাদীনাং বিহর্ত্তারং ধনিনে দাপয়েদ্ধনম্। দণ্ডঞ্চ তৎসমং রাজ্ঞে শক্ত্যপেক্ষমথাপি বা।
আগমোঽভ্যধিকো ভোগাদ্বিনা পূর্ব্বক্রমাগতাৎ। আগমোঽপি বলং নৈব ভুক্তিস্তোকাপি যত্র নো॥
আগমস্তু কৃতো যেন সোঽভিযুক্তস্তমুদ্ধরেৎ। ন তৎসুতস্তৎসুতো বা ভুক্তিস্তত্র গরীয়সী॥
যোঽভিযুক্তঃ পরেতঃ স্যাত্তস্য রিক্‌থী তমুদ্ধরেৎ। ন তত্র কারণং ভুক্তিরাগমেন বিনাকৃতা॥
আগমেন বিশুদ্ধেন ভোগো যাতি প্রমাণতাম্। অবিশুদ্ধাগমো ভোগঃ প্রামাণ্যং নৈব গচ্ছতি॥"

অর্থাৎ,—নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তি বিংশতি বর্ষ ভোগ করিলে সে উপভুক্ত সম্পত্তিতে স্বামীর স্বত্ব বিলুপ্ত হইবে। অস্থাবর সম্পত্তিতে দশ বৎসর ভোগ হইলেও পূর্ব্বস্বত্বাধিকারী তাহাতে আর দাবী করিতে পারিবে না। দশ বৎসর পরে তাঁহার সে দাবী অগ্রাহ্য হইবে। কিন্তু এই সাধারণ নিয়মেরও আবার বিশেষ বিধি ছিল। বন্ধকীয় দ্রব্য, সীমাস্থান, উপনিক্ষেপ (সংখ্যানামাদি সংযুক্ত নিক্ষেপ দ্রব্য), জড় ও নাবালকের সম্পত্তি, উপনিধি, রাজস্ব, দাস্যাদি, শ্রোত্রিয়ের ধন প্রভৃতি অপর কর্ত্তৃক বিংশ বৎসর বা দশ বৎসর উপভুক্ত হইলেও তাহাতে অধিস্বামিগণ নিঃসত্ব হইবেন না। এই সকল বিষয় অধিস্বামীর বিনা অনুমতিতে কেহ ভোগ করিতেছে দেখিলে বিচারক তাহা প্রতিনিবৃত্ত করিবেন। আর উপভোক্তাকে অর্থদণ্ড করিয়া, ধনস্বামীকে তাঁহার সম্পত্তি ফিরাইয়া দিবেন। ক্রয়-প্রতিগ্রহাদি দ্বারা সম্পত্তি-লাভ—ভোগের অপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ। অর্থাৎ—দশ বৎসর বা বিশ বৎসর সম্পত্তি ভোগের পর সম্পত্তি বিক্রীত হইলে, ভোগকর্ত্তার স্বত্ব বিলুপ্ত হইবে; ক্রয়কারী তাহাতে স্বত্ববান্ হইবেন। কিন্তু যে সম্পত্তিতে পিতাপ্রপিতামহাদি ক্রমে তিন পুরুষ ভোগ হয়, সে স্থলে ক্রয়াদি স্বত্ব অপেক্ষা ভোগ-স্বত্বই প্রামাণ্য। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, তৃতীয় পুরুষের পর চতুর্থ পুরুষ স্থলে ভোগের প্রমাণ বলবৎ। কিন্তু প্রথম পুরুষে অর্থাৎ পিতামহাদির পক্ষে আগম বা ক্রয়-প্রতিগ্রহাদি-জনিত স্বত্ব প্রমাণ মধ্যে গণ্য। যেখানে আদৌ ভোগপ্রমাণ

নাই, অথচ আগম প্রমাণ আছে; সেখানে তুলনায় স-ভোগ আগম প্রমাণই সিদ্ধ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষে এই নিয়ম। বিষয়টী বিশদ করিবার জন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—ক্রয়-প্রতিগ্রহাদি-জনিত স্বত্বে স্বত্ববান ব্যক্তি রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলে যদি তিনি ক্রয়-প্রতিগ্রহাদি সপ্রমাণ করিতে পারেন, তাহা হইলেই সম্পত্তিতে তাঁহার স্বত্ব সিদ্ধ হইবে। কিন্তু তাঁহার পুত্র কি পৌত্রের সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটিবে না। সে ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে আগম তো প্রমাণ করিতে হইবেই; সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তি যে তাঁহাদের ভোগে আছে, তাহাও তাঁহাদের সপ্রমাণ করা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে পুত্র-পৌত্রাদির সাগম ভোগ প্রমাণ মধ্যে গণ্য। অন্যপক্ষে ক্রয়-প্রতিগ্রহাদিকারী পরলোকগত হইলে, তাঁহার উত্তরাধিকারী সে আগমাদি সপ্রমাণ করিবেন। সাক্ষীর দ্বারা আগম সপ্রমাণ না হইলে সে স্থলে কেবল ভোগের প্রমাণ বলবৎ হইবে না। কিন্তু আগম যদি বিশুদ্ধ হয়, তাহা হইলে প্রমাণিত ভোগ প্রামাণ্য মধ্যে পরিগণিত হইবে। অন্যথায় কেবলমাত্র ভোগ-প্রমাণে স্বত্ব সাব্যস্ত হইবে না। অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে তামাদির কাল, মনু, গৌতম, যাজ্ঞবল্ক্য, বসিষ্ঠ প্রভৃতি দশ বৎসর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দশ বৎসরের পর ধনস্বামীর সে ধনে আর স্বত্ব থাকিবে না,—সকলেরই এই অভিমত। ঋণ-সম্পর্কে কৌটিল্যের বিধান এতদনুসারী। তিনিও বলিয়াছেন, বিশেষ বিশেষ স্থল ব্যতীত অন্যত্র দশ বৎসরের পর সর্ব্বপ্রকার ঋণই তামাদির মধ্যে গণ্য হইবে। কিন্তু স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে যাজ্ঞবল্ক্যের মতে বিশ বৎসর পর্য্যন্ত তামাদির কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কৌটিল্যের মতও এতদনুসারী। এ সম্বন্ধে অন্য কোনও সংহিতাকার কোনও অভিমত প্রকাশ করেন নাই। ভোগাধিকার সকলের মতেই প্রমাণ। বিষ্ণুর ও যাজ্ঞবল্ক্যের বিধানে সম্ভোগ ক্রয়প্রতিগ্রহাদি—কেবলমাত্র ভোগ অপেক্ষা অধিকতর বলবৎ বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছে। হৃত বা প্রাপ্ত সম্পত্তি সম্পর্কে মহর্ষি মনুর তিন বৎসর তামাদির কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য সে স্থলে এক বৎসরের অধিক কালের বিধান বিহিত করেন নাই। * স্থলবিশেষে সংহিতাকারগণের পরস্পর-বিরুদ্ধ মতপরম্পরার আলোচনায়

* আধুনিক বিধান অনুসারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তামাদির কাল বিভিন্নরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভারতীয় তামাদি সংক্রান্ত আইনে সে পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। গচ্ছিত-দ্রব্য কেহ বন্ধক দিলে সেই গচ্ছিত দ্রব্যের জন্য গচ্ছিতরক্ষাকারীর বিরুদ্ধে বার বৎসর মধ্যে মকদ্দমা স্থাপন করা যাইতে পারে। বার বৎসর পর আর স্থাসকারীর উহাতে স্বত্ব থাকিবে না। সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া ঋণদাতা যে ঋণ প্রদান করেন, সেই বন্ধকীয় সম্পত্তির জন্য ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ব্যবহার-স্থাপন বিধি। এইরূপ বৎসর গণনা সুদ বা আসল আংশিকরূপে দিবার শেষ দিন হইতে গণনা করিবার নিয়ম। বিশেষ বিশেষ স্থলে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর ৬০ বৎসরের মধ্যে স্থাবর সম্পত্তির দাবী চলিতে পারে। একান্নবর্ত্তী পরিবারের কেহ সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব হইতে বঞ্চিত হইলে, তিনি বার বৎসরের মধ্যে সম্পত্তির দাবী করিয়া ব্যবহার স্থাপন করিতে পারেন। 'মালিকানা' এবং 'হক' প্রভৃতিও বার বৎসরের মধ্যে নষ্ট হয় না। হিন্দু রমণীর ভরণপোষণের দাবী বার বৎসর পরে নষ্ট হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত মামলা মকদ্দমাদি বিভিন্ন বিষয়ে অবস্থাভেদে তিন বৎসর, এক বৎসর, ছয় মাস, ত্রিশ দিন তামাদি-কালের সংখ্যা-পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে। Vide, *Indian Limitation Act* and *Shedules*. এইরূপ, বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নরূপ তামাদির কাল ভারতীয় তামাদি-সংক্রান্ত আইনে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। তবে সকলেরই মূল ভিত্তি যে আর্য্য হিন্দুগণের প্রাচীন ব্যবহার-শাস্ত্র, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

অনেকের মনে ভ্রম ধারণা জন্মিবার সম্ভাবনা। কিন্তু দেশকালপাত্রভেদে ব্যবস্থা-ভেদ চিরকালই চলিয়া আসিতেছে। বিশেষ বিশেষ স্থলে সংহিতাশাস্ত্রোক্ত বিরুদ্ধ-মত সম্বন্ধে অনেকে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন।

নীতিবিদ্‌গণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সমাজের আদিম অসংস্কৃত অবস্থায় ঋণের পীড়ন অতি ভয়াবহ—অতি অমানুষিক। ক্রমে জাতি যত উন্নত শিক্ষিত হয়, যতই তাহার নৈতিক চরিত্র বিগঠিত হইতে থাকে; বর্ব্বরতা তত হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, পীড়নাদির মাত্রাও ততই কমিয়া আসে। পাশ্চাত্যদেশের ঋণ-সম্পর্কীয় ইতিবৃত্তের আলোচনায় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অতি প্রাচীন কালে ঋণদান ও ঋণগ্রহণ বিষম ভয়াবহ ছিল। ব্যবস্থা-প্রণালীও এত অপরিপক্ক ছিল যে, ঋণদাতা বা ঋণগ্রহীতা কেহই আপন লাভালাভ বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহাদের বিত্ত-সম্পত্তিও তখন নিরাপদ ছিল না। ঋণদাতার প্রভুত্ব-ক্ষমতা এত অধিক ছিল যে, তাঁহারা অবস্থা-বিশেষে ঋণগ্রহণকারীর প্রাণ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে পারিতেন। কখনও কখনও ঋণদান ও ভিক্ষাদান একই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া তাঁহাদের মনে হইত। কিন্তু তাহা হইলেও সুদ বা মূলধন আদায়ে দরিদ্রের প্রতি অতি অমানুষিক অত্যাচার করিতে কুসীদজীবিগণ কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। ক্রমে ক্রমে ঋণদাতার অসীম প্রভুত্ব-ক্ষমতায় বাধা দিবার সুযোগ উপস্থিত হইল বটে; কিন্তু সে বিষয়ে কিরূপ ন্যায্য পন্থা অবলম্বন করা বিধেয়, তাহা স্থির হইল না। তখন বিষম কঠোরতার সহিত ঋণ আদায়ের অভিনয় চলিতে লাগিল। দরিদ্র অধমর্ণের বিত্ত-সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া ঋণদাতা ঋণ আদায় করিলেন। বিত্তহীন অধমর্ণ দাসরূপে উত্তমর্ণের সেবা করিতে লাগিল। দাস হইলেই প্রভু তাহার জীবন-মরণের কর্ত্তা হন। দেহ করতলগত হইলে, প্রাণও তাঁহার আয়ত্তাধীন হয়। আধুনিক কাল অপেক্ষা প্রাচীন যুগে পাশ্চাত্য-দেশে পারিবারিক সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ ছিল। সুতরাং পরিবারের প্রধান ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্ত্রী-পুত্রাদিও নির্ম্মম উত্তমর্ণের দাসদাসীরূপে পরিগণিত হইত। ঋণদাতা এইরূপে ঋণগ্রহণকারীর ও তাহার পরিবারবর্গের জীবন-মরণের অধিকারী হইতেন। ইহাতে এক দিকে যেমন ঋণদাতার দয়াপ্রবণতার পরিচয় পাওয়া যাইত, অন্যপক্ষে তাঁহার নিষ্ঠুরতার বিষয়ও স্মরণ করাইয়া দিত। কঠোরতা-বিমিশ্র দয়ার দৃষ্টান্ত মোজেস-প্রবর্ত্তিত নীতি-সমূহেই প্রথম পাওয়া যায়। সে বিধানে দেখিতে পাই—ইজরেল-জাতির কেহ নিরন্ন দরিদ্র হইলে, কর্ত্তব্যানুরোধে অপরাপর ব্যক্তি তাহাকে ঋণ প্রদান করিতেন। সে ঋণের জন্য কেহ তাঁহার নিকট সুদ লইতেন না। কিন্তু বৈদেশিকগণের সম্বন্ধে তাঁহাদের বিধান অন্যরূপ ছিল। বৈদেশিকগণের নিকট হইতে সুদ-গ্রহণ মোজেসের বিধানে অশাস্ত্রীয় বা নীতি-বিগর্হিত ছিল না। সাত বৎসরের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করিবার নিয়ম ছিল। কিন্তু সে সাত বৎসরের মধ্যে যদি কেহ ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিত, প্রতি সপ্তম বর্ষে সে ঋণদায় হইতে মুক্ত হইত। তাহাকে পূর্ব্ব-ঋণদায়ে আর দায়ী হইতে হইত না। স্বজাতীয়গণের মধ্যেই ইজরেলদিগের এই বিধি ছিল। একবার ঋণ দিতে পারে নাই বলিয়া যে পুনরায় তাহাকে কেহ ঋণ দিবে না, তাহা নহে; যত বার তাহার আবশ্যক হইবে, তত বার তাহাকে ঋণ দিবার বিধি ছিল।

প্রতীচ্যে ঋণ-প্রসঙ্গ।

স্বজাতি সম্পর্কে পুনরায় ঋণ না দেওয়া ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া মোজেস ঘোষণা করিয়াছিলেন।* মোজেসের বিধানে জামিন বা বন্ধকের ব্যবস্থাও বিহিত দেখি। শস্যপেষণ-যন্ত্রের উপরিভাগস্থ প্রস্তর সকলে পবিত্র বলিয়া জানিত। প্রতিভূ-স্বরূপ তাহা গ্রহণ ধর্ম্মবিরুদ্ধ ছিল। কারণ, তাহা অধমর্ণের জীবিকাহানিকর। পোষাক-পরিচ্ছদ বন্ধক রাখিলে, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তাহা ফিরাইয়া দিবার নিয়ম ছিল। কারণ, ঐ একমাত্র বস্ত্রের অভাবে বিনা-আচ্ছাদনে ঋণকারীর কষ্ট হইতে পারে। পতিহীনা রমণীর বস্ত্রাদি বন্ধক রাখা মোজেসের নীতির অনুমোদিত নহে। যাহা হউক, এইরূপ সার্ব্বজনীন নীতির প্রবর্ত্তনা করিয়াও ঋণ-জন্য ঋণকারীর ক্রীতদাস রূপে বিক্রীত হওয়ার বিষয়ে মোজেস উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, বিত্তশালী ব্যক্তি অধমর্ণকে দাসরূপে গ্রহণ করিবেন বটে; কিন্তু তাহার কার্য্যের জন্য তাহাকে পারিশ্রমিক দিতে হইবে। মোজেস আরও বলিয়াছিলেন, 'জুবিলি' বৎসরে ক্রীতদাস-দিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে। বিচারকের নিকট ঋণের বিচার-বিষয়ক ক্রম-পদ্ধতির উল্লেখ মোজেসের নীতি-সমূহে দৃষ্ট হয় না। তবে তিনি আপিল-সংক্রান্ত বিস্তৃত বিধি বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কৌটিল্যের বিধানে যেমন সংগ্রহণ, দ্রোণমুখ, স্থানীয় প্রভৃতি বিচারালয়ের উল্লেখ আছে; মোজেসের নীতিতেও তেমনি দশগ্রামিক, পঞ্চদশ গ্রামিক, শতগ্রামিক ও সহস্র গ্রামিক প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। পৌর্ব্বাপর্য্য অনুসারে আপিলের ব্যবস্থা। সর্ব্বশেষ আপিল মোজেসের নিকট হইত। জুবিলি বৎসরে † ইজরেল জাতির প্রত্যেকেই আপনার পৈতৃক সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার অধিকারী।

* At the end of every seven years thou shalt make a release. And this is the manner of the release : every creditor shall release that which he hath lent unto his neighbour ; he shall not exact it of his neighbour and his brother, because the Lord's release has been proclaimed. Of a foreigner thou mayest exact it : but whatsoever is with thy brother thine hand shall release....If there be with thee a poor man, one of thy brethren, within any of thy gates in thy land which the Lord thy God giveth thee, thou shalt not harden thine heart, nor shut thine hand from thy poor brother ; but thou shalt surely open thine hand unto him, and surely lend him sufficient for his need in that which he wanteth. Beware that there be not a base thought in thine heart, saying, The seventh year, the year of release is at hand and thine eye be evil aganist thy poor brother, and thy give him nought ; and he cry unto the Lord against thee and it be sin unto thee. Thou shalt surely give him, and thine heart shall not be grieved when thou givest unto him, because that for this thing the Lord thy God shall bless thee in all thy work, and in all that thou pullest thine hand unto. For the poor shall never cease out of the land ; therefore, I command thee, saying 'Thou shalt surely open thine hand unto thy brother, to thy needy, and to thy poor, in thy land."—Vide, *Deuteronomy*. XV. 1—11.

† প্রতি সপ্তম বর্ষ—বাইবেলে 'জুবিলি' বৎসর বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। পরমেশ্বর বলিতেছেন—ছয় বৎসরের কর্ষণে ভূম্যাদি প্রপীড়িত হয়। সুতরাং এক বৎসর বিশ্রাম দেওয়া উচিত। সপ্তম বর্ষে ভূম্যাদি কর্ষিত হইত না এবং ফসলাদি উৎপন্ন করিবারও আদেশ ছিল না। ক্ষেত্রাদির ঐ বিশ্রামের বৎসর—বাইবেলের মতে—জুবিলি

সুতরাং বৃক্ষাদির ফল প্রভৃতি এবং দ্বিচত্বারিংশবিধ শস্যাদির দাবী ভিন্ন উত্তমর্ণ কাহারও পৈতৃক সম্পত্তির দাবী করিতে পারিতেন না। কিন্তু লিভাইট ব্যতীত অপরাপর সকলেরই গৃহাদি বিক্রয় দ্বারা ঋণ পরিশোধ হইতে পারিত।* কখনও কখনও সন্তান-সন্ততি বন্ধক রাখিয়া ঋণ গ্রহণ করা হইত। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সন্তানগণ ঋণ-পরিশোধার্থ ক্রীতদাস মধ্যে গণ্য হইতেন।† মিশর হইতে বন্ধনমোচনের পর ইজরেল জাতির দরিদ্র ব্যক্তিগণ ঋণের পেষণে জর্জ্জরীভূত হইয়া পড়েন। তাঁহাদের অসহনীয় দুঃখ-যন্ত্রণা-দর্শনে নেহিমিয়ার হৃদয় বিগলিত হয়। তিনি সর্ব্বসাধারণের ঋণমুক্তির জন্য জিদ করিতে থাকেন। ধনিগণকে একত্র সমবেত করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করেন যে, অতঃপর আর কখনও তাঁহারা ঋণের জন্য দরিদ্রগণের উপর অত্যাচার করিবেন না।‡ ঋণ-পরিশোধার্থ স্ত্রী-পুত্র-

---

বৎসর। এতৎসম্বন্ধে বাইবেলের উক্তি,—"And the Lord spake unto Moses in mount Sinai, saying, speak unto the children of Israel and say unto them, When ye come into the land which I give you, then shall the land keep a sabbath unto the Lord. Six years thou shalt sow thy field, and six years thou shalt prune thy vineyard and gather in the fruits thereof; but in the seventh year shall be a sabbath of solemn rest for the land, and sabbath unto the Lord: thou shalt neither sow thy field, nor prune thy vineyard."—*Leviticus.* XXV., 1—4.

* বাইবেলের 'লেভিটিকাস' অংশের পঞ্চবিংশ অধ্যায় এতদ্বিষয়ক উপদেশে নিয়োজিত। বিক্রীত সম্পত্তি এক বৎসরের মধ্যে ফিরাইয়া লওয়ার ব্যবস্থা সে স্থলে উক্ত হইয়াছে। যথা,—"And if a man sell a dwelling house in a walled city, then he may redeem it within a whole year after it is sold; for a full year shall have the right of redemption. And if it not be redeemed within the space of a full year, then the house that is in the walled city shall be made sure in perpetuity to him that bought it, throughout his generations: it shall not go out in the Jubilee"—*Leviticus,* XXV. 29—30. লিভাইটদিগের সম্বন্ধে এ নিয়ম নহে। যথা,—"Neverthless the cities of the Levites, the houses of the cities of their possession, may the Levites redeem at any time. And if one of the Levites redeem, then the house that was sold and the city of his possession, shall go out in the Jubilee," &c.—*Ibid,* 32—33.

† "There are that pluck the fatherless from the breast, And take a pledge of the poor.'—*Job,* XXIV. 9. "Now there cried a certain woman of the wives of the sons of the prophets unto Elisha, saying, Thy servant my husband is dead: and thou knowest that thy servant did fear the Lord: and the creditor is come to take unto him my two children to be bondmen"—II *Kings,* IV. 1.

‡ বাইবেলের অন্তর্গত নেহিমিয়া অংশের পঞ্চম অধ্যায়ে এতদ্বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। কুসীদজীবী য়িহুদীগণ ঋণের জন্য দেশবাসীর খাদ্যশস্যাদি এমন কি পুত্রকন্যাদিগকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইত. ঐ অংশে তাহার বিবরণ আছে। দেশবাসীর করুণ ক্রন্দন এবং ঋণদাতার বিষম অত্যাচার প্রভৃতি নিবারণ-কল্পে নেহিমিয়ার চেষ্টার অশেষ পরিচয় ঐ অংশে দেদীপ্যমান। Vide, *Nehemiah,* Chap. V.

পরিজন ও ধন-সম্পত্তি সহ ঋণকারী বিক্রীত হইতেছে, বাইবেলের ম্যাথু অংশে যীশুখৃষ্টের উক্তিতে তাহা উপলব্ধি হয়। * এইরূপ বিক্রয়-প্রথা যে কেবল ইজরেল জাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল, তাহা নহে; পাশ্চাত্য-দেশের সকল জাতির মধ্যেই অতি প্রাচীন-কাল হইতে এ প্রথা বিদ্যমানতার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রীস ও রোম সাম্রাজ্যের পুরাবৃত্ত আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, সে সময়ে তত্তদ্দেশে অধমর্ণের দেহের উপর ঋণদাতার আধিপত্য অতি প্রবল ছিল। অপিচ, তিনি অধমর্ণের দণ্ডমণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন। ইজরেল জাতির ঋণদাতাগণ অতি প্রাচীন-কালে যেমন ঋণদায়ে অধমর্ণের প্রাণ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিবার অধিকারী ছিলেন; প্রাচীন রোমে ও প্রাচীন গ্রীসে সেইরূপ অত্যাচার-অবিচার সে সময়ে প্রচলিত ছিল। সোলনের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঋণদাতার অত্যাচার এতই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার ফলে রোমের তাৎকালিক 'প্লিবিয়ান' ও 'প্যাট্রিসিয়ান' সম্প্রদায়দ্বয়ের মধ্যে বিষম সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ঋণ-সংক্রান্ত ব্যভিচার-বিশৃঙ্খলার প্রাবল্যে দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে দেখিয়া মহামনা রাজনীতিক সোলন তন্নিবারণে বদ্ধপরিকর হন। 'টুয়েলভ টেবল' আইনের প্রবর্ত্তনায় সোলন এক বিধি বিধিবদ্ধ করেন। ঋণকারী ঋণের বিষয় স্বীকার করিলে অথবা বিচারালয়ে ঋণ-ব্যবহার নিষ্পন্ন হইলে, ঋণ-পরিশোধের জন্য অধমর্ণকে ত্রিশ দিন সময় দেওয়ার বিধি ঐ আইনে বিধিবদ্ধ হইয়া যায়। ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণকারী ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হইলে তাহাকে ঋণদাতার হস্তে সমর্পণ করিবার ব্যবস্থা হয়। ঋণদাতা ষাট দিন কাল অধমর্ণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখিতেন এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় তাহাকে সময় সময় রাজপথে বাহির করিয়া ঋণের বিষয় বাদ্যাদি সহকারে ঘোষণা করিতেন। ষাট দিনের মধ্যে কেহ তাহার পরিত্রাণের জন্য অগ্রসর না হইলে, ঋণদাতা তাহাকে ক্রীতদাস রূপে বিক্রয় করিতেন, অথবা তাহার প্রাণবধ করিতেন। একই ব্যক্তি বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট ঋণ করিলে, ঋণের পরিমাণ অনুসারে তাহার দেহ খণ্ড খণ্ড করা হইত; আর ঋণদাতৃগণ আপন আপন ঋণের পরিমাণ অনুসারে খণ্ডিত অংশ-সমূহ গ্রহণ করিতেন। ঋণের জন্য ঋণকারীকে দাসরূপে গ্রহণ করাই সাধারণ বিধি ছিল। পিতার সঙ্গে সঙ্গে সন্তান-সন্ততিগণও দাসরূপে গৃহীত হইয়া উত্তমর্ণের আদেশানুরূপ কার্য্য সম্পাদন করিত। ৩২৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে 'লেক্স পিটোলিয়া' বিধানের প্রবর্ত্তনায় রোমে এই অমানুষিক প্রথার পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। তদনুসারে সরাসরিভাবে অধমর্ণকে কারারুদ্ধ করিবার প্রথা লোপ প্রাপ্ত হয় এবং ভবিষ্যতে তাঁহাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়ার আশঙ্কাও বিদূরিত হয়। সে সময় রোমে রাজকীয় বন্দিশালা ছিল না। উত্তমর্ণগণই অধমর্ণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া আপন গৃহে রাখিয়া দিতেন। ক্রমশঃ সভ্যতা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এ নিয়মের পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। নীতিশাস্ত্রবিদ্গণের অশেষ আয়াসের ফলে ঋণদাতার ক্ষমতা হ্রাস হইয়া আসে,

---

* বাইবেলের নিউ-টেষ্টামেণ্টের অন্তর্গত 'ম্যাথু' অংশে যীশুখৃষ্টের উক্তিতে এতদ্বিষয় পরিব্যক্ত। পিটারের প্রশ্নের উত্তরে যীশু বলিতেছেন,—"But forasmuch as he had not *wherewith* to pay, his lord commanded him to be sold, and his wife and children and all that he had, and payment to be made."—*St. Mathew*, XVIII, 25.

ঋণকারীর পরিত্রাণ হয় এবং সুদের হার কমিয়া যায়। মহামনা সোলন ও লেসিনিয়াস প্রভৃতির ব্যবস্থার ফলে রোমে এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। 'ফিউডেল' প্রথা প্রবর্ত্তনার পূর্ব্বে ইংলণ্ডেও ঋণদায়ে ঋণকারী দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইত। কিন্তু ঐ প্রথা প্রচলিত হইলে এ নিয়ম রহিত হয়। তখন অধমর্ণকে ঋণদায়ে কারারুদ্ধ করা অথবা দাসরূপে গ্রহণ করা একেবারে নিষিদ্ধ হইয়া যায়। ১২৮২ খৃষ্টাব্দে বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিধান বিধিবদ্ধ হয়। তদনুসারে ঋণকারী লর্ড মেয়রের নিকট আসিয়া ঋণের বিষয় স্বীকার করিত এবং ঋণ-পরিশোধের দিন নির্দ্ধারিত করিয়া যাইত। লর্ড মেয়রের আদেশ অনুসারে স্বীকার-পত্র লেখা হইত এবং তাহাতে ঋণকারীর স্বাক্ষর করিত। পরে রাজকীয় মোহরাদি দ্বারা উহা চিহ্নিত করিবার বিধি ছিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধ না করিলে ঋণদাতা ঐ দলিলের বলে ঋণকারীকে ধৃত করিয়া 'টাওয়ার' কারাগারে আবদ্ধ করিবার আবেদন করিতেন। এইরূপে, দেউলিয়া সংক্রান্ত বিধি বিধিবদ্ধ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের কারাগার-সমূহ ঋণ-সংক্রান্ত বন্দীতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে আট মাসের মধ্যে ইংলণ্ডের বিচারালয় সমূহ হইতে ঋণ-সংক্রান্ত ১০১০০০ ডিক্রী প্রচারিত হয়।

পাশ্চাত্যদেশের ঋণ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকগণ জাতীয় বা রাজকীয় ঋণের বিষয় উত্থাপন করিয়া থাকেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপের বিভিন্ন জনপদে রাজকীয় ঋণের পরিমাণ কত ছিল, সে আলোচনা হইতে তাহার আভাষ পাওয়া যায়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে গ্রেট-ব্রিটেন যুক্ত-সাম্রাজ্যের জাতীয় ঋণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। তখন ঐ ঋণের পরিমাণ—৭৩১০ লক্ষ পাউণ্ড হয়। ফরাসী রাজ্যের জাতীয় ঋণ, ফরাসী বিপ্লবের সময় হইতে অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। বিপ্লবের সময় ফরাসী-রাজ্য একরূপ দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছিল। 'এসাইনাট' প্রভৃতির আলোচনায় তাহা উপলব্ধি হয়। 'কন্সিউলেট' সভার শাসন সময় হইতে পুনরায় ফরাসী-রাজ্যে ঋণ-গ্রহণ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ইহার পর 'বুরবন' বংশের রাজত্বকালে, ওয়াটার্লু সময়ের পূর্ব্বে, ফরাসী-রাজ্যের জাতীয়-ঋণের একটা হিসাব প্রকাশ করা হয়। তাহাতে বুঝা যায়, ঐ সময় জাতীয় ঋণের পরিমাণ—১২৩০ লক্ষ পাউণ্ড হইয়াছিল। 'ফ্রাঙ্কো-জর্ম্মণ' যুদ্ধের পূর্ব্বে ফরাসী-রাজ্যের জাতীয় ঋণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ৪৬০০ লক্ষ পাউণ্ড হয়। ১৮৭০-১৮৭২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ঐ ঋণ-পরিমাণ ৭৪৯০ লক্ষ পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছিল। এ হিসাবে, ইটালিরাজ্যের আয়-পরিমাণে জাতীয় ঋণের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ঐ ঋণের পরিমাণ ৩৬১০ লক্ষ পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছিল। অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যের জাতীয় ঋণ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই তারিখের হিসাবে ৩১৮০ লক্ষ পাউণ্ড দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত ঐ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে বৈদেশিক রাজ্য হইতে ১২০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছিল। এই সকল ঋণ ব্যতীত আরও ২৭০ লক্ষ পাউণ্ড অষ্ট্রিয়ার অপ্রকাশ্য ঋণ ছিল। ইউরোপের মধ্যে স্পেন-রাজ্য গুরুঋণভারাক্রান্ত। দেশের আয়-পরিমাণের তুলনায় ঋণ-পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে স্পেনের জাতীয় ঋণের পরিমাণ—২৬১০ লক্ষ পাউণ্ড হয়। ঐ বৎসর 'বজেট' উপলক্ষে বক্তৃতার সময় রাজস্ব-সচিব বলিয়াছিলেন,—'আর অল্পকাল পরেই

রাজকীয় ঋণ।

স্পেনরাজ্য দেউলিয়া হইয়া যাইবে।' তুরস্ক-সাম্রাজ্যের জাতীয় ঋণের পরিমাণ—১৯১০ লক্ষ পাউণ্ড। তন্মধ্যে ১৫৭০ লক্ষ পাউণ্ড বৈদেশিক রাজ্যের নিকট হইতে ধার লওয়া হইয়াছিল। রুশিয়ার জাতীয় ঋণ—১৩৩০ লক্ষ পাউণ্ড এবং হলণ্ডের জাতীয় ঋণ—১০০০ পাউণ্ড। কিন্তু হলণ্ডের সুবন্দোবস্তে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে উহা পরিশোধ হইয়া ৭৮০ লক্ষ পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছিল। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে রুশিয়া সাম্রাজ্যের জাতীয় ঋণ—৪৫০ লক্ষ পাউণ্ড নির্দ্ধারিত হয়। উহার তিন বৎসর পূর্ব্বে সৈন্য-বিভাগের ও নৌ-বিভাগের উন্নতিবিধানে জর্ম্মণ সম্রাট ৩৫০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই সে ঋণ পরিশোধ হইয়া যায়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের জাতীয় ঋণের পরিমাণ—২,২৩২,২৮৯,৫৩১ ডলার ছিল। ইংলণ্ডে পার্লামেণ্টের প্রাধান্য-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ঋণের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডের টিউডর ও ষ্টুয়ার্ট বংশের রাজত্বকালে রাজার ক্ষমতা অত্যন্ত অধিক ছিল। সে সময় রাজা যদি স্থায়ী সৈন্যদল সংগঠনে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার ক্ষমতার অবধি ছিল না। কিন্তু রাজা যাহাতে স্থায়ী সৈন্যদল সংগঠনে সমর্থ না হন, তৎপ্রতি জনসাধারণের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। রাজশক্তি হ্রাস করিবার জন্য পার্লামেণ্টের কমন্স-সভা সর্ব্বদাই বদ্ধপরিকর ছিলেন। রাজা যাহাতে জাতীয় ঋণ সংগ্রহ করিতে না পারেন এবং তদ্দ্বারা স্থায়ী সৈন্যদল পোষণে সমর্থ না হন, কমন্স সভার সভ্যগণ তদ্বিষয়ে স্বতঃপরতঃ চেষ্টা করিতেন। 'রিভলিউশন' বা বিপ্লবের পর পার্লামেণ্টের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হইলে, ইংলণ্ডে জাতীয় ঋণের সূত্রপাত হয়। ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে এতৎসক্রান্ত প্রথম ঋণ গৃহীত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের প্রধান ব্যাঙ্ক—'ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড' প্রতিষ্ঠায় ঐ ঋণ নিয়োজিত হয়। তখন উহার মূলধন—১,২০০,০০০ পাউণ্ড ছিল। উহাই তাৎকালিক জাতীয় ঋণের পরিমাণ। অতঃপর যুদ্ধবিগ্রহাদি কারণে ঐ জাতীয় ঋণ ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে 'রিসউইগ' সন্ধির পর ইংলণ্ডের জাতীয় ঋণ-পরিমাণ ২০০ লক্ষ পাউণ্ডের অধিক হইয়াছিল। ঐ ঋণ-পরিমাণ ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে ৫০০ লক্ষ পাউণ্ড, ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ৭৫০০০০০০ পাউণ্ড, ১৭৬৩ এবং খৃষ্টাব্দে ১৪০ লক্ষ পাউণ্ড হয়। অতঃপর ফ্রান্স, স্পেন ও আমেরিকার সহিত যুদ্ধে ইংলণ্ডের অনেক অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসী-বিপ্লবের প্রভাবে ইউরোপব্যাপী মহাসমর সংঘটিত হয়। তখন ইংলণ্ডের জাতীয় ঋণ অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছিল। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে এমিন্সের সন্ধির পর ঐ ঋণের পরিমাণ—৬২০০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ওয়াটার্লু যুদ্ধের অবসানে ভিয়েনা নগরীর সন্ধির পর ৮৮৫০ লক্ষ পাউণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। অতঃপর ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ৩১এ মার্চ্চের হিসাব অনুসারে ঐ ঋণ-পরিমাণ—৭৩১,৪৪৬,৩০৭ পাউণ্ড নির্দ্ধারিত হইয়াছে। জাতীয় ঋণের পরিমাণ এত অধিক হইলেও রাজনীতিক ও অর্থনীতিকগণের মতে উহা উপেক্ষনীয়। প্রকৃতপক্ষে ঐ টাকা ধার করা হয় না, অথবা কেহ উহা পাইবার অধিকারী নহে। কারণ, ঋণদানকারী শতকরা নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট হন; মূলধনের কখনও দাবী করেন না। ঋণ-পরিমাণের অনুপাতে মুদ্রা-পরিমাণ মজুত রাখা সম্বন্ধে তাঁহারা সময় সময় জিদ করিয়াছেন বটে; কিন্তু তাহা কখনও সম্ভবপর হয় নাই। গ্রেট-ব্রিটেনের জাতীয় ঋণের সুদ শতকরা

পাঁচ টাকা করিয়া বাড়াইয়া দিলে প্রতি বৎসর চারি কোটি টাকা সুদ দিবার আবশ্যক হয়। শতকরা তিন পাউণ্ড ও সাড়ে তিন পাউণ্ড হিসাবে সে সুদের পরিমাণ—২৮০-২৯০ লক্ষ পাউণ্ড দাঁড়ায়। অর্থনীতিবিদ্‌গণের অনেকেই জাতীয় ঋণের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহাদের কেহ কেহ জাতীয় ঋণ একেবারে উঠাইয়া দিবার প্রস্তাবও করিয়া থাকেন। কিন্তু কোনও কোনও অর্থনীতিবিৎ আবার তাঁহাদের এ যুক্তি ভিত্তিহীন বলিয়া মনে করেন। জাতীয় ঋণ কেবল দেশের উন্নতির জন্য ব্যয়িত হয় না। দেশের উন্নতিতে যে অংশ ব্যয় করা হয়, কোন-না-কোনও আকারে উহা ফিরিয়া আসে। কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহাদির জন্য গোলাগুলি-বারুদে যাহা ব্যয় করা হয়, তাহা ফিরিয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং পুনরায় ঋণ-গ্রহণে তাহার স্থান পূরণ করিতে হয়। দেশের শিল্প, বাণিজ্য, রাজস্ব ও উৎপন্ন শস্য প্রভৃতির দ্বারা যাহা আয় হয়, আবশ্যকীয় ব্যয়-সঙ্কুলানের পর, তাহাতে জাতীয় ঋণের সমস্ত পরিশোধ হওয়া সম্ভবপর নহে। তদ্দ্বারা জাতীয় ঋণ পরিশোধ করিতে গেলে মূলধন অভাবে শিল্প-বাণিজ্যের বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা। তাই কেহ কেহ স্থির করিয়াছেন,—দুইটী উপায়ে জাতীয় ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা হইতে পারে ;—(১) সুদের হার পরিবর্ত্তন, (২) নূতন রাজকর সংস্থাপন। অত্যধিক কর গ্রহণে জনসাধারণের বিশেষ কষ্টের সম্ভাবনা। এদিকে আবার সুদের হার কমাইয়া দিলে ধার পাওয়াও কঠিন। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন,—জাতীয় ঋণ মহদুপকারী। ইহাতে একদিকে যেমন দেশরক্ষার পথ প্রশস্ত হয়, অন্যদিকে তেমনি শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিতে দেশের শ্রী-বৃদ্ধি সাধন করে। সাধারণ ঋণ সম্বন্ধে পূর্ব্বে ঋণকারীর কারারুদ্ধ হওয়ার বিষয় গ্রন্থ-পত্রে পাওয়া যায়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ঋণদায়ে ঋণকারীকে বন্দী করিবার প্রথা বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু একে একে সে নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। 'ডেটার্স য়্যাক্টের' প্রবর্ত্তনায় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে আয়র্লণ্ড হইতে এবং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে স্কটলণ্ড হইতে ঐ প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ফরাসী রাজ্যে, ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে বেলজিয়মে, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে নরওয়ে ও সুইডেনে এবং ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ইটালিতে বিশেষ বিশেষ বিধি বিধিবদ্ধ হওয়ায় কারাদণ্ড প্রথা একেবারে লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইংলণ্ডে এখন মাত্র একুশ দিনের জন্য ঋণগ্রহণকারীর প্রতি কারাদণ্ডের আদেশ হয়। কিন্তু তাহাতে তাহার ঋণ-পরিশোধের কোনও ব্যবস্থা হয় না। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে বিশেষ বিশেষ স্থলে, ঋণ জন্য কারারুদ্ধ করিবার বিধি আজিও প্রচলিত আছে। ঋণকারী যদি ঋণ অস্বীকার করিয়া তাহার বিষয় সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহাকে কারারুদ্ধ করিবার বিধান ব্যবহারশাস্ত্রকারগণ বিহিত করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীনকালে কারাদণ্ড-বিধানে যেরূপ কঠোরতা অবলম্বিত হইত, এখনকার বিধানে সে কঠোরতা দৃষ্ট হয় না। *

* বিলাতের আইনে ঋণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে—(১) Judgment debt, (২) speciality debt, (৩) simple contract debt. এতদ্ব্যতীত National Debt বা জাতীয় ঋণ আছে। প্রথমোক্ত ঋণ বিচারাদালত কর্তৃক নিষ্পন্ন, দ্বিতীয় প্রকারের ঋণ বিশেষ বিশেষ দলিলাদি সংক্রান্ত এবং তৃতীয় প্রকারের ঋণ চুক্তি-বিষয়ক। এই সকল ঋণ-সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ বিধি বিলাতের আইনে বিধিবদ্ধ আছে। তৎসমুদায়ের উল্লেখ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—○•○—

ক্রয়বিক্রয়াধিকার-বিধানে আদর্শ।

[শাস্ত্রে পূর্ব্বক্রয়াধিকার প্রসঙ্গ,—মনুসংহিতায় তাহার অভাব,—মিতাক্ষরায় তদ্বিষয়ক আলোচনা,—মহানির্ব্বাণতন্ত্রে পূর্ব্বক্রয়াধিকারের উল্লেখ ;—অর্থশাস্ত্রের বিধান,—কৌটিল্য প্রবর্ত্তিত বিধিবিধান-সমূহ ;—কৌটিল্যের মতে অস্থাবর বিক্রয় বিধি,—পণ্যাদির প্রসঙ্গ,—পণ্যের ত্রিবিধ দোষ,—উপনিপাত, আবিবন্ধ প্রভৃতি দোষের পর্য্যায়,—পণ্যবিক্রয়-সংক্রান্ত নানা বিধি ;—প্রতিনিধি নিয়োগে পণ্যবিক্রয় ব্যবস্থা,—তৎসংক্রান্ত বিধান-সমূহ ;—অর্থশাস্ত্রে অস্বামি-বিক্রয়-সংক্রান্ত ব্যবস্থা-বিধান ;—সংহিতায় অস্বামিবিক্রয় প্রসঙ্গ,—কৌটিলের বিধান স্মৃতির অনুসারী,—সদোষ দ্রব্য, নির্দ্দোষ বলিয়া বিক্রয়ে দণ্ডের ব্যবস্থা ;—ভেজাল প্রসঙ্গ,—তৎসংক্রান্ত কৌটিলের ও স্মৃতি-শাস্ত্রের বিধান-সমূহ,—আধুনিক বিধিতে প্রাচীনের আদর্শ-খ্যাপন,—মিতাক্ষরাদি মতে পূর্ব্বক্রয়াধিকার,—দায়ভাগ, বিজ্ঞানেশ্বর প্রভৃতির অভিমত ;—কর্ম্মকরকল্প-সংক্রান্ত বিবিধ বিধান,—দাসকল্প, সম্ভূয়-সমুত্থান প্রভৃতির প্রসঙ্গ ;—সংহিতাদিতে বিভিন্ন অবস্থায় তৎসংক্রান্ত বিভিন্নরূপ বিধি-বিধানের আলোচনা,—বিবিধ বিধানের উল্লেখ,—আদেশ ও অন্বাধি প্রভৃতির প্রসঙ্গে শ্রেষ্ঠ আদর্শের পরিচয়,—আধুনিকে প্রাচীনের অনুসরণ।]

পূর্ব্বক্রয়াধিকার—ব্যবহার-শাস্ত্রের এক বিশেষ বিধান। সংহিতা-শাস্ত্রোক্ত প্রাচীন ব্যবহার-বিধিতে স্বতন্ত্ররূপে এতৎসম্বন্ধে বিশেষ বিধি বিধিবদ্ধ হয় নাই। মনুর বিধানে কেবল 'প্রখ্যাত' * শব্দের উল্লেখ আছে। তাহাতে ঐ প্রথার বিদ্যমানতার বিষয় মনে আসে বটে ; কিন্তু তাহাও রাজন্য-পক্ষে প্রযুক্ত। মনিয়ার উইলিয়মসের মতে সংহিতা-শাস্ত্রে উহা পূর্ব্ব-ক্রিয়াধিকারের অভাব মাত্র। মিতাক্ষরা গ্রন্থে এতৎসংক্রান্ত একটী বিধান আছে। স্থাবর সম্পত্তি যে উপায়-পরম্পরা অবলম্বনে হস্তান্তর করা যাইতে পারে, তাহাতে সেই বিষয় পরিবর্ণিত। মিতাক্ষরার ঐ বিধানের আলোচনায় অনেকে মনে করেন, প্রাচীনকালে হিন্দুদিগের ব্যবহার-শাস্ত্রে পূর্ব্ব-ক্রয়াধিকার প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল। প্রতিবাসী ব্যক্তিবৃন্দের বিশেষ সম্মতি ব্যতীত স্থাবর সম্পত্তি-সংক্রান্ত দান-বিক্রয় কদাচ সিদ্ধ হইত না—মিতাক্ষরোক্ত বিধানে তাহা উপলব্ধি হয়। কিন্তু নিবন্ধকারগণ এতদ্বিষয়ে উপেক্ষা

শাস্ত্রে পূর্ব্ব-ক্রয়াধিকার প্রসঙ্গ।

---

* এতদ্বিষয়ে মনুসংহিতার সেই উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল ; যথা,—

"রাজ্ঞঃ প্রখ্যাতভাণ্ডানি প্রতিষিদ্ধানি যানি চ। তানি নির্হরতো লোভাৎ সর্ব্বহারং হরেন্নৃপঃ ॥"

এই শ্লোকের টীকায় কুল্লূক ভট্ট লিখিয়াছেন,—"রাজ্ঞঃ সম্বন্ধিতয়া যানি বিক্রেয় দ্রব্যাণি প্রখ্যাতানি রাজোপযোগীনি হস্ত্যশ্বাদিনী তদ্দেশোদ্ভবানি তথা যানি চ প্রতিষিদ্ধানি যথা দুর্ভিক্ষে ধান্যং দেশান্তরং ন নেয়মিতি তানি লোভাদ্দেশান্তরং নয়তো বণিজঃ সর্ব্বহরণং ন রাজা কুর্য্যাৎ ॥" সুতরাং বুঝা যাইতেছে, রাজনিষেধে যাহা ক্রয়-বিক্রয় করা নিষিদ্ধ, তাহা রপ্তানি করা দণ্ডনীয়। যে সকল পণ্যে রাজার প্রথম অধিকার, এস্থলে তাহার বিষয়ই বলা হইয়াছে। কিন্তু রাজ-সম্পর্কে যাহা প্রযোজ্য, সাধারণ সম্পর্কে সে বিধি চলে না। সুতরাং সাধারণের পূর্ব্ব-ক্রয়াধিকারের বিষয় মনুসংহিতার এতদুক্তিতে সূচিত হয় না ;—কেহ কেহ এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যাহা হউক, যে সম্বন্ধেই হউক, মনুর উক্তিতে যে পূর্ব্ব-ক্রয়াধিকারের অভাব বর্ত্তমান, তাহা উপলব্ধি হয়।

প্রদর্শন করিয়া পূর্ব্ব-ক্রয়াধিকার সম্বন্ধে কোনও অভিমত প্রকাশ করেন নাই। তাই কাহারও কাহারও মতে, প্রাচীনকালে এ প্রথা ব্যবহার-সম্মত ছিল না। একপরিবারভুক্ত এবং একঅন্নে প্রতিপালিত জ্ঞাতি বা সমস্বত্বাধিকারীদিগের সম্মতি দান-বিক্রয়ে অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে, তাঁহাদের সম্মতি ব্যতিরেকে, দান-বিক্রয় সিদ্ধ হয় না। কিন্তু মিতাক্ষরার নিবন্ধকারগণ সেরূপ বিধির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন নাই। যাহা হউক, নিবন্ধকারগণের টীকা-টিপ্পনীতে এতদ্বিষয়ের উল্লেখ না থাকিলেও, পূর্ব্ব-ক্রয়াধিকার-বিধি যে বহু প্রাচীন-কাল হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, মনুসংহিতোক্ত 'প্রখ্যাত' শব্দের আলোচনায় তাহা বেশ উপলব্ধি হয়। সংস্কৃত-ভাষায় ইহার কোনও সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। কিন্তু মিতাক্ষরাধৃত বৃহস্পতি প্রভৃতির অভিমত আলোচনায় পূর্ব্ব-ক্রয়াধিকার প্রথার বিদ্যমানতার বিষয় প্রতিপন্ন হইতে পারে। বৃহস্পতির মতে স্থাবর সম্পত্তি অবিক্রেয়। অংশীদারগণের সম্মতি লইয়া উহা বন্ধক দেওয়া যাইতে পারে মাত্র। ভিন্ন-পরিবারভুক্ত অথবা একান্নবর্ত্তী জ্ঞাতিগণের অসম্মতিতে কোনও স্থাবর সম্পত্তি অপরকে বিক্রয় করা নিষিদ্ধ, মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের দ্বাদশোল্লাসে তদ্বিষয় স্পষ্ট উল্লিখিত আছে ;—

"স্থাবরং ধনমন্যস্মৈ স্থিতে সান্নিধ্যবর্ত্তিনি। যোগ্যে ক্রেতরি বিক্রেতুং ন শক্তঃ স্থাবরাধিপঃ॥
সান্নিধ্যবর্ত্তিনাং জ্ঞাতিঃ সবর্ণো বা বিশিষ্যতে। তয়োরভাবে সুহৃদো বিক্রেতুরিচ্ছা গরীয়সী॥
নির্ণীতমূল্যোঽপ্যন্যেন স্থাবরস্য ক্রয়োদ্যমে। তন্মূল্যং চেৎসমীপস্থোরাতিক্রেতা ন চাপরঃ॥
মূল্যং দাতুমশক্তশ্চেৎ সম্মতো বিক্রয়েঽপি বা। সন্নিধিস্থস্তদান্যস্মৈ গৃহী শক্তোঽতিবিক্রয়ে॥
ক্রীতং চেৎ স্থাবরং দেবি পরোক্ষে প্রতিবাসিনঃ। শ্রবণাদেব তন্মূল্যং দত্ত্বাসৌ প্রাপ্তুমর্হতি॥
ক্রেতা তত্র গৃহারামান্ বিনির্ম্মাতি ভনক্তি বা। মূল্যং দত্ত্বাপি নাপ্নোতি স্থাবরং সন্নিধিস্থিতঃ॥"

অর্থাৎ—'নিকটে যোগ্য-ক্রেতা বর্ত্তমান থাকিতে স্থাবর-স্বামী স্থাবর ধন অন্য ব্যক্তিকে বিক্রয় করিতে পারিবেন না। নিকটস্থ ক্রেতাগণের মধ্যে জ্ঞাতি অথবা সবর্ণ প্রশস্ত ; তদভাবে বন্ধু। বহু বন্ধু ক্রয়েচ্ছু থাকিলে, বিক্রেতার ইচ্ছাই গরীয়সী অর্থাৎ যাহাকে ইচ্ছা বিক্রয় করা যাইতে পারে। স্থাবর ধনের মূল্য নির্দ্দেশ করিয়া অপর ব্যক্তি ক্রয় করিতে উদ্যত হইলে, নিকটস্থ ব্যক্তি যদি সেই মূল্য দেয়, তাহা হইলে নিকটস্থ ব্যক্তিই ক্রেতা হইবে, অপর ব্যক্তি হইবে না। যদি নিকটস্থ বক্তি মূল্যদানে অসমর্থ হইয়া অন্যের নিকট বিক্রয় করিতে সম্মতি দেয়, তাহা হইলে গৃহস্থ অপর ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিতে পারিবে। হে দেবী! প্রতিবেশীর অজ্ঞাতসারে অপরে যদি স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করে, তাহা হইলে ঐ প্রতিবেশী শ্রবণ করিবা-মাত্র সেই মূল্য দিলে সেই স্থাবর সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু ক্রেতা যদি তাহাতে গৃহ বা উপবন নির্ম্মাণ করে কিংবা ভগ্ন করে, তাহা হইলে নিকটস্থ ব্যক্তি মূল্য প্রদান করিলেও সে স্থাবর ধন প্রাপ্ত হইবে না।' মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের এই বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, জ্ঞাতি প্রভৃতির স্থাবর কিনিবার প্রথম অধিকার, তৎপরে প্রতিবেশী প্রভৃতির। কিন্তু তাঁহারা যদি কেহ ঐ সম্পত্তি গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হন, তাহা হইলে সে সম্পত্তি অপরকে বিক্রয় করা যাইতে পারে। যাহা হউক, ব্যবহার-বিধিতে তন্ত্রমত কদাচ সমাদৃত নহে। তাই তন্ত্রোক্ত ব্যবহার-বিধি ব্যবহার-শাস্ত্রে স্থানপ্রাপ্ত হয় নাই। পণ্ডিতগণের অনেকে বলেন, মুসলমানদিগের সময়েই ঐ প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল ; আর মুসলমানদিগের প্রভাব-প্রভুত্ব সময়েই হিন্দুগণ ঐ

প্রথার অনুসরণ করিয়াছিলেন। সেই জন্য তৎপূর্ব্ববর্ত্তী স্মৃতিশাস্ত্রের নিবন্ধকারগণের বিধানে পূর্ব্ব-ক্রয়াধিকার বিধি একেবারে অগ্রাহ্য হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের এ উক্তি সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। স্মৃতি-শাস্ত্রের ও কৌটিল্য-প্রণীত অর্থশাস্ত্রের আলোচনায় পণ্ডিতগণের ঐ উক্তি আদৌ ভিত্তিহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং তৎপ্রতি বলিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করা যাইতে পারে। মহাবীর আলেকজাণ্ডারের ভারত আগমন কাল হইতে পণ্ডিতগণ ভারতেতিহাসের আরম্ভ বলিয়া ঘোষণা করেন। মহামতি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র তাহারই সমসময়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সুতরাং সংহিতাদির বিষয় ছাড়িয়া দিয়া অর্থশাস্ত্র হইতে আরম্ভ করিলেও বুঝা যায়, প্রথম-ক্রয়াধিকার-প্রথা ভারতবর্ষে বহুকাল পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল। পৃথিবীর অপরাপর দেশ যখন আদিম অসংস্কৃত অবস্থায় অবস্থিত, ভারতবর্ষ তখন শিক্ষা-সমুন্নত—সভ্যতার উচ্চতম সোপানে সমারূঢ়। তখন হইতেই ভারতের ব্যবহার-বিধি পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত। তবে সময় সময় হয় তো অবস্থা-বিশেষের উপযোগী না হওয়ায় বিষয় বিশেষ সাময়িকভাবে অপ্রচলিত হইয়াছিল। আবার শাস্ত্র-গ্রন্থ-সমূহের প্রকৃত ব্যাখ্যার অভাবও অনুল্লেখের একতম কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তাহা না হইলে, আধুনিক ব্যবহার-শাস্ত্রের প্রায় সকল বিধানই যে ভারতবর্ষে কোন-না-কোনও আকারে অতি প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর সেই সকল বিধি-বিধান ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়াই যে আধুনিক ব্যবহার-শাস্ত্রের সৃষ্টি-পরিপুষ্টি, তাহাও বলা যাইতে পারে।

মহামতি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এই ক্রয়াধিকার বিষয়ে বিধি-ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে। স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়কালে, প্রথমে জ্ঞাতি, সামন্ত, ধনিক প্রভৃতির নিকট বিক্রয়ের প্রস্তাব করিতে হইবে,—কৌটিল্য তাহার বিধান দিয়াছেন। তাঁহার মতে ঐরূপ ক্রম-পর্য্যায় অনুসারে বাস্তু-বিক্রয়ের ব্যবস্থা না করিলে, সে বিক্রয় অসিদ্ধ হয়। জ্ঞাতিগণকে জিজ্ঞাসার পর, সামন্তদিগকে এবং সামন্তগণের পর ধনিকদিগকে বাস্তু কিনিবার জন্য অনুরোধ করিতে হইবে। জ্ঞাতিগণকে জিজ্ঞাসা করিবার কারণ—সে বাস্তুতে তাঁহাদের অংশ থাকিতে পারে। সন্নিকর্ষ-হেতু সামন্ত বা প্রতিবেশিগণ অন্য কর্ত্তৃক ক্রয়ে আপত্তি করিতে পারেন; অন্যত্র বিক্রয় সম্বন্ধে ধনিকের বা ঋণদাতার আপত্তির কারণ—সে বাস্তু তাঁহার নিকট বন্ধক থাকিতে পারে, অথবা তিনি সে বাস্তু গ্রহণ করিয়া বাস্তু-স্বামীকে ঋণদায় হইতে মুক্তি দিতে পারেন। এইরূপ পর্য্যায় অনুসারে কেহই যদি প্রস্তাবিত বাস্তু কিনিতে অগ্রসর না হন, তাহা হইলে বাস্তু-স্বামী যাহাকে ইচ্ছা সে বাস্তু বেচিতে পারিবেন। তাহাতে অন্য কেহ আপত্তি করিতে পারিবে না। এতৎসম্বন্ধে কৌটিল্যের উক্তি; যথা,—

কৌটিল্যের বিধান।

"জ্ঞাতিসামন্তধনিকাঃ ক্রমেণ ভূমিপরিগ্রহান্ ক্রেতুমভ্যাভবেয়ুঃ। ততোঽন্যে বাহ্যাস্‌সামন্তচত্বারিংশৎকুল্যা গৃহপ্রতিমুখে বেশ্ম শ্রাবয়েয়ুঃ। সামন্তগ্রামবৃদ্ধেষু ক্ষেত্রমারামং সেতুবন্ধং তটাকমাধারং বা মর্যাদাসু যথাসেতুভোগং 'অনেনার্ঘেণ কঃ ক্রেতা' ইতি ত্রিরাঘুষিতমব্যাহতং ক্রেতা ক্রেতুং লভেত॥"

কৌটিল্যের মতে "গৃহং ক্ষেত্রমারামস্‌সেতুবন্ধস্তটাকমাধারো বা বাস্তুঃ;" এবং "কর্ণকীলায়সম্বন্ধোঽনুগৃহং সেতুঃ।" গৃহ, ক্ষেত্র, উদ্যান, তড়াগ প্রভৃতি বাস্তু পর্য্যায়ভুক্ত, আর সর্ব্ব-

প্রকার অট্টালিকা সেতুবন্ধ বলিয়া অভিহিত। এইরূপ বাস্তু বিক্রয় কালে বিক্রয়ের বিষয় ঘোষণা করিবার নিয়ম ছিল। অন্ততঃ নিকটস্থ চল্লিশটী বসতি হইতে বহু লোক সমবেত হইলে বাস্তু বিক্রয়ের সংবাদ উচ্চৈঃস্বরে সমবেত জনমণ্ডলীর নিকট ব্যক্ত করিবার বিধি, কৌটিল্য বিহিত করিয়াছেন। 'এই নির্দ্দিষ্ট মূল্যে কে ইহা খরিদ করিবে'—তিন বার এতদ্বাক্য বিঘোষিত হইলে, যদি অপর কেহ বাস্তু-বিক্রয়ে বাধা না জন্মাইত, তাহা হইলে ক্রেতা সে বাস্তু ক্রয় করিতে পারিতেন। কিন্তু "স্বর্গবায়োর্বা মূল্যবর্ধনে মূল্যবৃদ্ধিঃ সশুল্কা কোশং গচ্ছেৎ।" প্রতিযোগিতায় যদি তাহার মূল্য ন্যায্য মূল্যের অধিক হইত, তাহা হইলে অতিরিক্ত অংশ রাজা গ্রহণ করিতেন। কৌটিল্যের বিধানে আরও দেখা যায়, বাস্তু প্রভৃতি হস্তান্তর করিবার পূর্ব্বে গ্রামবৃদ্ধদিগের দ্বারা উহার সীমানা নির্দ্দেশ করিয়া লইতে হইত। নচেৎ সে বাস্তু বিক্রয় হইতে পারিত না। বিক্রয়ের সময় 'প্রতিক্রোষ্টা' তিন বার উচ্চৈঃস্বরে ক্রয়েচ্ছুর নিকট বাস্তুস্বামীর নিরূপিত মূল্যাদির বিষয় ঘোষণা করিতেন।* কৌটিল্যের আর একটী বিধি—বিক্রেয় দ্রব্যের উপর শুল্ক-নির্দ্ধারণ। এই শুল্ক ব্যতীত নির্দ্দিষ্ট মূল্যের অতিরিক্ত অংশ রাজার প্রাপ্য। অর্থশাস্ত্রের দ্বিতীয় বিধি—প্রতিক্রোষ্টা বা ক্রেতা-আহ্বানকারীকে শুল্ক সংগ্রহ করিয়া রাজকোষে অর্পণ করিতে হইত। "বিক্রয়প্রতিক্রোষ্টা শুল্কং দদ্যাৎ।" অস্বামী বা স্বত্বাধিকারী ব্যতীত অপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক বাস্তু বিক্রীত হইলে তাহার চতুর্ব্বিংশতি পণ অর্থদণ্ড হইবার ব্যবস্থা ছিল। বাস্তু বিক্রয় হইয়া গেলে সাত দিনের মধ্যে বাস্তুস্বামী যদি উপস্থিত না হইতেন, তাহা হইলে ক্রেতাকে তাহাতে অধিকার প্রদান করা হইত। প্রকৃত ক্রেতা ভিন্ন অপরকে তাহার অধিকার প্রদান করিলে দুই শত পণ অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা বিহিত ছিল।

"অস্বামিপ্রতিক্রোশে চতুর্ব্বিংশতিপণো দণ্ডঃ। সপ্তরাত্রাদূর্ধ্বমনভিসরতঃ প্রতিক্রুষ্টো বিক্রীণীত। প্রতিক্রুষ্টাতিক্রমে বাস্তুনি দ্বিশতো দণ্ডঃ অন্যত্র চতুর্বিংশতিপণো দণ্ডঃ॥"

বাস্তু প্রভৃতি সম্বন্ধে সাধারণতঃ এইরূপ বিধান বিহিত ছিল বটে; কিন্তু অন্যান্য ভূমি সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ স্থলে কৌটিল্য বিশেষ বিশেষ বিধি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। শস্য বপন কালে কৃষক বা প্রতিবেশী অপরের ক্ষেত্র বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়া তাহাতে শস্য বপন করিলে তিনি দণ্ডনীয় হইতেন। এরূপ অবস্থায় কৃষকের বা প্রতিবেশীর দ্বাদশ পণ অর্থদণ্ড হইত। কিন্তু ঐরূপ অন্যায় অধিকারের উপযুক্ত কারণ থাকিলে তাহার কোনও দণ্ড হইত না। এতদ্ব্যতীত কৃষাণের জমি কেবলমাত্র কৃষাণের নিকট বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা ছিল। অন্য কেহ সে জমি খরিদ করিলে তাহা ব্যবহার-বিধানে সিদ্ধ হইত না; পরন্তু ক্রেতা দণ্ড ভোগ করিতেন। ব্রহ্মোত্তর ভূমি, ব্রাহ্মণের নিকট, করদাতার ভূমি করদাতার

* আজিকালি নিলামের যে ব্যবস্থা বিহিত আছে, তদনুসারে তৃতীয় বার ডাকে নিলাম-বিক্রয় মঞ্জুর হয়। কিন্তু দাবীর অতিরিক্ত মূল্য রাজকোষে যায় না; উহা বিবাদী পাইয়া থাকে। অর্থাৎ,—যাহার বাস্তু বিক্রীত হয়, মূল্যের বা দাবীর অতিরিক্ত টাকা তাহারই প্রাপ্য। বিক্রয়ের জন্য যে বাস্তু অধুনা নিলামে উঠে, ইস্তাহারে তাহার সীমাপরিমাণাদি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার নিয়ম, এখনকার বিধানেও বিহিত আছে। এখন বিক্রেয় দ্রব্যাদির উপর অন্য হিসাবে শুল্কাদি কিছু নির্দ্দিষ্ট নাই। তবে 'কোর্টফি' ও 'নিলামী ফি' প্রভৃতি শুল্ক-পর্য্যায়ভুক্ত কি না, তাহা বিচার-সাপেক্ষ।

নিকট বিক্রয় করিবার বা বন্ধক দিবার বিধি। কাহারও পতিত নিষ্কর ভূমিতে অপর কেহ শস্যাদি উৎপন্ন করিয়া তাহা পাঁচ বৎসর ভোগ করিতে পারিত। পাঁচ বৎসর অতীত হইলে উহা ভূস্বামীকে প্রত্যর্পণ করিবার বিধি। তবে কর্ষণাদির জন্য ভূমির উর্ব্বরতা-বৃদ্ধি-হেতু ভূস্বামী পারিতোষিক দানে কৃষাণের ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতেন। করদাতা কর্ত্তৃক নিষ্কর ভূমি গ্রহণ, কৌটিল্যের বিধানে দণ্ডণীয়। কোনও করদাতা অপর করদাতার বাস্তু প্রভৃতি ক্রয় করিলে বিক্রয়কারীর সকল সম্পত্তি ক্রেতার অধিকারে আসিত; কিন্তু তিনি গৃহাদি দখল করিতে পারিতেন না। অর্থশাস্ত্রের অন্তর্গত 'বিবীতক্ষেত্রপথহিংসা, সময়স্যানপাকর্ম চ' অংশ হইতে এতদ্বিষয়ক কৌটিল্যের বিধান নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা,—

"ক্ষেত্রিকস্যাক্ষিপতঃ ক্ষেত্রমুপবাসস্য বা ত্যজতো বীজকালে দ্বাদশপণো দণ্ডঃ অন্যত্র দোষোপনিপাতাবিষহ্যেভঃ॥ করদাঃ করদেষ্বাধানং বিক্রয়ং বা কুর্য্যুঃ। ব্রহ্মদেয়িকা ব্রহ্মদেয়িকেষু অন্যথা পূর্ব্বসাহসদণ্ডঃ। করদস্য বাঽকরদগ্রামং প্রবিশতঃ॥ করদং তু প্রবিশতঃ সর্ব্বদ্রব্যেষু প্রাক্রাম্যং স্যাৎ অন্যত্রাগারাৎ। তদপ্যস্মৈ দদ্যাৎ॥ অনাদেয়মকৃষতোঽন্যঃ পঞ্চবর্ষাণ্যুপভুজ্য প্রয়াসনিষ্ক্রয়েণদদ্যাৎ। অকরদাঃ পরত্র বসন্তো ভোগমুপজীবয়েয়ু॥"

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় সম্বন্ধে কৌটিল্যের বিধি-ব্যবস্থা একটু স্বতন্ত্র। সে ক্ষেত্রে গ্রামবৃদ্ধগণ আহূত হন না বা বিক্রেয় দ্রব্যের মূল্যের বিষয় সাধারণ্যে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণার আবশ্যক করে না। ধনস্বামীকে মূল্য প্রদান করিয়া বিক্রেয় দ্রব্য গ্রহণ করিলেই সে ক্রয় সিদ্ধ হয়। যে কোনও দ্রব্যের বিক্রয় বিষয়ে ক্রেতার সহিত অঙ্গীকারবদ্ধ হইলে, বিক্রয়কারী তাঁহার নিকট সে দ্রব্য বেচিতে বাধ্য; ক্রেতাও তাঁহার অঙ্গীকার অনুসারে সে দ্রব্য গ্রহণ করিতে বাধ্য। ব্যক্তিগত অস্থাবর সম্পত্তি এবং পণ্যাদি সংক্রান্ত দ্রব্য—উভয় সম্পর্কেই এ বিধি প্রযোজ্য। নির্দিষ্ট দ্রব্য কিনিবার বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়া ঐ দ্রব্য ক্রয় না করিলে, ক্রয়কারীর দ্বাদশ পণ অর্থদণ্ড হইত। বিক্রয়কারী যদি তাঁহার সে দ্রব্য বিক্রয় করিতে অস্বীকার করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতিও ঐরূপ দণ্ডের বিধান ছিল। যথা,—"বিক্রীয়পণ্যমপ্রযচ্ছতো দ্বাদশপণো দণ্ডঃ।" কিন্তু "অন্যত্র দোষোপনিপাতাবিষহ্যেভ্যঃ।" বিক্রেয় দ্রব্যে যদি কোনও দোষ থাকে, তাহা হইলে ক্রেতা চুক্তি সত্ত্বেও সে দ্রব্য গ্রহণ না করিতে পারেন। হৃত, গুণহীন পণ্য, উপনিপাতযুক্ত দ্রব্য প্রভৃতি খরিদ বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, ঐ সকল দোষবশতঃ ক্রেতা যদি তাহা গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে তাঁহার দণ্ড হইবে না;—'বিক্রীতক্রীতানুশয়ঃ' প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ আছে।—

অস্থাবর বিক্রয়-বিধি।

"পণ্যদোষো দোষঃ। রাজচোরাগ্ন্যুদকবাধ উপনিপাতঃ। বহুগুণহীনমার্ত্তকৃতং বাঽবিষহ্যম্। বৈদেহকানামেকরাত্রমনুশয়ঃ। কর্ষকাণাং ত্রিরাত্রম্। গোরক্ষকাণাং পঞ্চরাত্রম্। ব্যামিশ্রাণাং উত্তমানাং চ বর্ণানাং বিবৃত্তিবিক্রয়ে সপ্তরাত্রম্। আতিপাতিকানাং পণ্যানামন্যত্রাবিক্রেয়মিত্যবিরোধেনানুশয়ো দেয়ঃ। তস্যাতিক্রমে চতুর্বিংশতিপণো দণ্ডঃ পণ্যদশভাগো বা। ক্রীত্বা পণ্যমপ্রতিগৃহ্ণতো দ্বাদশপণো দণ্ডঃ, অন্যত্র দোষোপনিপাতাবিষহ্যেভ্যঃ। সমানশ্চানুশয়ঃ। স্ববিদোষমোপশায়িকং দৃষ্ট্বা সিদ্ধমুপা-

ষর্ত্তনম্। ন স্বৈবাভিপ্রজাতয়োঃ। কন্যাদোষমৌপশায়িকমনাখ্যায় প্রযচ্ছতঃ ষণ্ণবতির্দণ্ডঃ শুল্কস্ত্রীধনপ্রতিদানং চ। বরয়িতুর্বা বরদোষমনাখ্যায় বিন্দতো দ্বিগুণঃ শুল্কস্ত্রীধননাশশ্চ। দ্বিপদচতুষ্পদানাং তু কুষ্ঠব্যাধিতানামশুচীনামুৎসাহস্বাস্থ্যশুচীনামাখ্যানে দ্বাদশপণো দণ্ডঃ। আত্রিপক্ষাদিতি চতুষ্পদানামুপাবর্ত্তনম্। আসংবৎসরাদিতি মনুষ্যাণাম্। তাবতা হি কালেন শক্যং শৌচাশৌচে জ্ঞাতুমিতি। দাতাপ্রতিগ্রহীতা চ স্যাতাং নোপহতৌ যথা। দানে ক্রয়ে বাহনুশয়ং তথা কুর্য্যুস্সভাসদঃ॥"

বিক্রেয় দ্রব্যে অনেক দোষ থাকিতে পারে। তন্মধ্যে প্রথম—সাধারণ দোষ। দ্বিতীয় দোষ—উপনিপাত। জল দ্বারা সিক্ত বা অগ্নি কর্ত্তৃক দগ্ধ, রাজাদেশে বাজেয়াপ্ত, চৌর কর্ত্তৃক হৃত প্রভৃতি দ্রব্য উপনিপাত-দোষদুষ্ট। তৃতীয় দোষ—অবিষহ্য। যে সকল গুণের উল্লেখে ক্রেতাকে প্রথম অঙ্গীকার-বদ্ধ করা হয়, বিক্রেয় দ্রব্যে যদি সে সকল গুণ বর্ত্তমান না থাকে; অথবা বৃদ্ধ পীড়িত ব্যক্তি কর্ত্তৃক যদি উহা নির্ম্মিত হইয়া থাকে; তাহা হইলে সে দ্রব্য অবিষহ্যদোষ দুষ্ট হয়। সেই সকল দোষ বর্ত্তমান থাকিলে ক্রেতা প্রতিজ্ঞানিষ্পন্ন দ্রব্য গ্রহণ না করিতে পারেন। সে জন্য তিনি দণ্ডনীয় হইবেন না। অন্যপক্ষে চুক্তিবদ্ধ দ্রব্য ভঙ্গপ্রবণ হইলে এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্রেতা তাহা গ্রহণ না করিলে, বিক্রেতা অন্যের নিকট সে দ্রব্য বিক্রয় করিবার অধিকারী। তাহাতে তাঁহার কোনও দোষ হইবে না। বিক্রয় রহিত করিবার জন্য সময় দিবার বিধি অর্থশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। সে বিধানে বৈদেহকগণ এক রাত্রি, কৃষকগণ তিন রাত্রি, গোরক্ষকগণ পঞ্চরাত্রি এবং বিবৃতিবিক্রয়ে বণিকগণ সপ্তরাত্রি সময় পাইবার অধিকারী। কিছুদিন যে পণ্য অবিক্রীত থাকিলে কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, অন্য পণ্য বিক্রয় জন্য তাহার বিক্রয় কিছুকাল স্থগিত রাখা যাইতে পারে। কিন্তু বেশী দিন রাখিলে যে পণ্য নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা, তাহা সত্বর বিক্রয় করিয়া ফেলিবে। শেষোক্ত পণ্য বিক্রয় করিবার জন্য যদি পূর্ব্বোক্ত পণ্য-বিক্রয় বন্ধ রাখিতে হয়, তাহাও করা যাইতে পারিবে। কিন্তু প্রচলিত বিধির বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে চতুর্ব্বিংশতি পণ অর্থদণ্ড হইবে; অথবা দ্রব্য-মূল্যের দশমাংশ দণ্ডও বিহিত হইতে পারিবে। পূর্ব্বোক্ত কোনও দোষেই যদি বিক্রীত দ্রব্য দুষ্ট না হয়, আর সে দ্রব্য যদি ক্রয়কারী ফিরাইয়া দিতে যান, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি দ্বাদশ পণ দণ্ডের ব্যবস্থা বিহিত। কেবল পণ্যাদি বিষয়ে নহে, বিবাহাদি ব্যাপারেও এ বিধি প্রযুক্ত হইবে। কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত অথবা অব্যবহার্য্য দ্বিপদ বা চতুষ্পদ জন্তুকে সুস্থ সবল ও ব্যবহারের উপযুক্ত বলিয়া বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। এরূপ ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধির অন্যথায় দ্বাদশ পণ দণ্ডের বিধান। এরূপ ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাহার করিবার কাল—দ্বিপদের পক্ষে এক বৎসর এবং চতুষ্পদের পক্ষে তিন পক্ষ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ কালের মধ্যে বিক্রয় অসিদ্ধ সাব্যস্ত করিবার বিধি। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলে সে সম্বন্ধে কোনও ব্যবহার-স্থাপনা চলিবে না। এবম্বিধ সর্ব্বপ্রকার দান ও ক্রয়-বিক্রয় রহিত ব্যাপার, কৌটিল্যের মতে, সভাসদ্গণ ন্যায়তঃ মীমাংসা করিয়া দিবেন। যাহাতে কোনও পক্ষেরই ক্ষতি না হয়, তৎপ্রতি তাঁহারা দৃষ্টি রাখিবেন। 'বৈয়াবৃত্তবিক্রয়'-প্রসঙ্গে 'এজেণ্ট' বা প্রতিনিধির দ্বারা বিক্রয়ের বিধি অর্থশাস্ত্রে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কৌটিল্যের এ বিধান চুক্তি-পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

উপনিধি-সংক্রান্ত বিধি-বিধান-সমূহ এতদ্বিষয়ে প্রযুক্ত হইতে পারে। সঙ্ঘবদ্ধ বণিকগণ পণ্য-বিক্রয় কালে বা চুক্তি-সম্পাদন সময়ে 'এজেণ্ট' বা প্রতিনিধি-নিয়োগে তৎকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। এতাদৃশ 'এজেণ্ট'-সংক্রান্ত বিধানে কৌটিল্য বলিয়াছেন,—

"বৈয্যাবৃত্তকরা যথাদেশকালং বিক্রীণানাং পণ্যং যথাজাতমূল্যমুদয়ং চ দদ্যুঃ॥ শেষমুপনিধিনা ব্যাখ্যাতম্। দেশকালাতিপাতেন বা পরিহীণং সম্প্রদানকালিকেন অর্ঘেণ মৌল্যমুদয়ং চ দদ্যুঃ। যথাসম্ভাষিতং বা বিক্রীণানা নোদয়মধিগচ্ছেয়ুঃ মূল্যমেব দদ্যুঃ। অর্ঘপতনে বা পরিহীণং যথাপরিহীণমূল্যমূনং দদ্যুঃ॥ সাংব্যবহারিকেষু বা প্রাত্যয়িকেষ্বরাজবাচ্যেষু ভ্রেষোপনিপাতাভ্যাং নষ্টং বিনষ্টং বা মূল্যমপি ন দদ্যুঃ। দেশকালান্তরিতানাং তু পণ্যানাং ক্ষয়ব্যয়শুদ্ধমূল্যমুদয়ং চ দদ্যুঃ। পণ্যসমবায়ানাং চ প্রত্যংশম্। শেষমুপনিধিনা ব্যাখ্যাতম্॥ তেন বৈয্যাবৃত্তবিক্রয়ো ব্যাখ্যাতঃ॥"

যাঁহারা পাইকারী ভিন্ন খুচরা বিক্রয় করেন না, তাঁহারা প্রায়শঃ এজেণ্ট বা প্রতিনিধি দ্বারা পণ্যাদি বিক্রয় করাইয়া থাকেন। প্রতিনিধিগণ তৎকাল-প্রবর্ত্তিত ও তৎস্থান-প্রচলিত হার-পরিমাণে বিক্রীত দ্রব্যের মূল্য ব্যবসায়ীর নিকট বুঝাইয়া দিতেন। বিক্রয়কারী প্রতিনিধি যদি ভ্রমবশতঃ বা অসাবধানতা-প্রযুক্ত প্রচলিত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করেন, তাহা হইলে পণ্যগ্রহণকালীন চুক্তি-সিদ্ধ মূল্য তাঁহাকে মহাজনের নিকট প্রদান করিতে হইত। কিন্তু ব্যবসায়ী মহাজন যদি স্বেচ্ছাক্রমে কম মূল্য লইতে স্বীকার করিতেন, বিক্রয়কারী তাহাই প্রদান করিতে পারিত। ভ্রেষোপনিপাত জন্য বিক্রেয় দ্রব্য দুষ্ট হইলে, উপনিপাত দোষে অর্থাৎ স্থলপথে বা জলপথে সংবাহিত হইবার সময় যদি উহা নষ্ট হইয়া যায় এবং সে বিষয় যদি রাজকীয় ঘোষণাদি দ্বারা সমর্থিত হয়, তাহা হইলে আর মহাজনকে সে পণ্যের মূল্য প্রদান করিতে হইবে না। সে পণ্য যদি কোনও সময়ে কোনও স্থানে বিক্রয় হয়, তাহা হইলে আবশ্যকমত তাহার ক্ষয়ব্যয় বাদ দিয়া অবশিষ্ট অংশ ধনী মহাজন প্রাপ্ত হইবেন। সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়িগণ প্রত্যেকে আপনাদের অংশ অনুসারে এইরূপ দ্রব্যের বিক্রীত মূল্যের লাভ-ক্ষতির অংশ প্রাপ্ত হইবেন।

অস্বামী বা অনধিকারী কর্ত্তৃক বিত্ত-সম্পত্তি বিক্রয় সম্বন্ধে কৌটিল্যের বিধান বহুব্যাপক। ন্যায়তঃ যে বস্তুতে যাঁহার অধিকার নাই, তিনি সে বস্তু সম্পর্কে অস্বামিপদবাচ্য। অস্বামিবিক্রয় চৌরাদির ন্যায় দণ্ডনীয়। এমন কি, কোনরূপে উহার সন্ধান পাইলে রাজ আদেশে তিনি ধৃতযোগ্য। স্থান-কাল-অবস্থা-ভেদে রাজ-আদেশ গ্রহণের সুবিধা না থাকিলে, অধিস্বামী স্বয়ং তাহাকে ধৃত করিতে পারিতেন।

অস্বামিবিক্রয়।

তাহাতে তিনি দণ্ডনীয় হইতেন না। অস্বামিবিক্রয় সম্বন্ধে কৌটিল্য এক বিস্তৃত বিধি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। অর্থশাস্ত্রের তৃতীয় খণ্ডে, ষষ্ঠ অধ্যায়ে, তদ্বিষয়ক উল্লিখিত হইয়াছে; যথা,—

"নষ্টাপহৃতমাসাদ্য স্বামী ধর্মস্থেন গ্রাহয়েৎ। দেশকালাতিপত্তৌ বা স্বয়ং গৃহীত্বোপহরেৎ। ধর্মস্থশ্চ স্বামিনমনুযুঞ্জীত—'কুতস্তে লব্ধমিতি।' স চেদা চারক্রমং দর্শয়েত, ন বিক্রেতারং তস্য দ্রব্যস্যাতিসর্গেণ মুচ্যেত। বিক্রেতা চেদৃশ্যেত, মূল্যং স্তেয়দণ্ডং চ স চেদপসারমধিগচ্ছেদপসরেদাপসারক্ষয়াদিতি ক্ষয়ে মূল্যং স্তেয়দণ্ডং চ দদ্যাৎ। নাষ্টিকং

চ স্বকরণং কৃত্বা নষ্টপ্রত্যাহৃতং লভেৎ। স্বকরণাভাবে পঞ্চবন্ধো দণ্ডঃ। তচ্চ দ্রব্যং রাজধর্ম্মং স্যাৎ। নষ্টাপহৃতমনিবেদ্যোৎকর্ষতঃ স্বামিনঃ পূর্ব্বঃ সাহসদণ্ডঃ। শুল্কস্থানে নষ্টাপহৃতোৎপন্নস্তিষ্ঠেৎ। ত্রিপক্ষাদূর্ধ্বমনভিসারং রাজা হরেৎ, স্বামী বা। স্বকরণেন পঞ্চপণিকং দ্বিপদরূপস্য নিষ্ক্রয়ং দদ্যাৎ। চতুষ্পণিকমেকখুরস্য; দ্বিপণিকং গোমহিষস্য; পাদিকং ক্ষুদ্রপশূনাং; রত্নসারফল্গুকুপ্যানাং পঞ্চকং শতং দদ্যাৎ। পরচক্রাটবীভৃতং তু প্রত্যানীয় রাজা যথাস্বং প্রযচ্ছেৎ। চোরহৃতমবিদ্যমানং স্বদ্রব্যেভ্যঃ প্রযচ্ছেৎ। প্রত্যানেতুমশক্তো বা স্বয়ংগ্রাহেণাহৃতং প্রত্যানীয় তন্নিষ্ক্রয়ং বা প্রযচ্ছেৎ। পরাবেষয়াজা বিক্রমেণানীতং যথাপ্রদিষ্টং রাজ্ঞা ভুঞ্জীতান্যত্রার্য্যপ্রাণেভ্যো দেবব্রাহ্মণতপস্বিদ্রব্যেভ্যশ্চ॥"
অপহৃত সম্পত্তির সন্ধান পাইলে সম্পত্তির প্রকৃত অধিকারী বিচারকের আদেশ অনুসারে তাহাকে ধৃত করিবেন। স্থানকাল অনুসারে যদি বিচারকের আদেশ গ্রহণ সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে দ্রব্যস্বামী স্বয়ংই তাহাকে ধৃত করিতে পারিবেন এবং অপহৃত দ্রব্য-সম্পত্তি আদায় করিয়া লইবেন। 'কি উপায়ে সে ঐ দ্রব্য প্রাপ্ত হইল'—বিচারক তাহা জিজ্ঞাসা করিবেন। সে যদি প্রকৃত বিষয় বলিতে পারে, তাহা হইলে বিক্রয়কারীকে উপস্থিত করিতে না পারিলেও সে মুক্তিলাভ করিবে। কিন্তু বিত্তসম্পত্তি সে পাইবে না। অন্য পক্ষে যদি বিক্রয়কারী উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বিক্রেতা উহার মূল্য প্রদান করিবে; অধিকন্তু সে চৌর্য্যাপরাধে অপরাধী হইবে। কিন্তু সে যদি পলায়ন করিয়া অপহৃত সম্পত্তি ব্যয় করিয়া ফেলে, সে অবস্থায়ও সে ঐ সম্পত্তির মূল্য প্রদান করিতে বাধ্য এবং চৌর্য্যাপরাধে দণ্ডনীয়। সম্পত্তিস্বামী যদি তাহাতে তাঁহার স্বত্ব সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হন, সে সম্পত্তি তাঁহার প্রাপ্য। অসামর্থ্য-পক্ষে তাঁহার প্রতি সম্পত্তির মূল্যের পাঁচ গুণ দণ্ডের বিধান। অধিকন্তু সে সম্পত্তি রাজ-সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবার বিধি। বিচারকের বিনা অনুমতিতে হৃত দ্রব্য গ্রহণ করিলে দ্রব্য-স্বামীর 'প্রথম সাহস' দণ্ডের বিধান বিহিত হইয়াছে। ধনস্বামী ভিন্ন অপর কেহ হৃত বা নষ্ট দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে, প্রথমতঃ সে দ্রব্য শুল্ক-স্থানে আমানত রাখিবার বিধি। তিন পক্ষের মধ্যে কেহ দাবী না করিলে, রাজা সে দ্রব্য গ্রহণ করিবেন। অপহৃত দ্বিপদ জন্তুতে স্বত্ব সপ্রমাণ করিলে ঐ জন্তু ফিরিয়া লইবার সময় গ্রহণকারীকে পাঁচ পণ 'নিষ্ক্রয়' বা শুল্ক প্রদান করিতে হইবে। অশ্বাদি একখুর জন্তু সম্বন্ধে চারি পণ, গোমহিষাদির দুই পণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তুর সিকি পণ এবং মূল্যবান প্রস্তরাদি সম্পর্কে শতকরা পাঁচ পণ হিসাবে এইরূপ শুল্ক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

স্মৃতিশাস্ত্রের ক্রয়-বিক্রয় বিধান প্রধানতঃ পণ্য দ্রব্য সম্বন্ধে বিহিত। ব্যক্তিগত স্থাবর-অস্থাবর সম্বন্ধে সংহিতায় সেরূপ বিস্তৃত বিধি বিধিবদ্ধ হয় নাই। অস্বামিবিক্রয়-প্রসঙ্গে সংহিতাকারগণ যে বিধি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা এক হিসাবে স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার বিত্ত-সম্পত্তি সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে। অস্বামিবিক্রয় প্রসঙ্গে মনু বলিয়াছেন,—অনধিকারীর দান-বিক্রয় ব্যবহারসিদ্ধ বা শাস্ত্রসম্মত নহে। তাঁহার বিধান হইতে বুঝা যায়, সমবেত বহু ব্যক্তির সমক্ষে দান-বিক্রয় প্রশস্ত। সেরূপ দান বা বিক্রয় অসিদ্ধ হয় না। "বিক্রয়াদ্যো ধনং কিঞ্চিদ্‌গৃহ্ণীয়াৎ কুলসন্নিধৌ।

সংহিতায় অস্বামিবিক্রয় প্রসঙ্গ।

ক্রয়েন স বিশুদ্ধং হি ন্যায়তো লভতে ধনম্॥" নতুবা, অস্বামিবিক্রয়-জনিত দোষ বর্ত্তিতে পারে এবং রাজবিধানে দণ্ড হওয়াও সম্ভবপর। অপরাপর স্মৃতি-গ্রন্থে স্থাবর-অস্থাবর বিক্রয় বিধি বিশেষ সীমাবদ্ধ।* অস্বামিবিক্রীত দ্রব্য সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যে বিভিন্ন বিধির উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহার অধিকাংশই অস্থাবর সম্বন্ধে প্রযুক্ত। বসিষ্ঠ ও গৌতম এতদ্বিষয়ে কোনও বিশেষ অভিমত প্রকাশ করেন নাই। এতৎসংক্রান্ত বিষ্ণুর বিধি দণ্ডমূলক। অস্বামিবিক্রয় ব্যবস্থায় কৌটিল্য যে সকল বিধি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ যাজ্ঞবল্ক্যের মতানুসারী। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—

"স্বং লভতান্যবিক্রীতং ক্রেতুর্দোষোঽপ্রকাশিতে। হীনাদ্রহো হীনমূল্যে বেলাহীনে চ তস্করঃ॥
নষ্টাপহৃতমাসাদ্য হর্ত্তারং গ্রাহয়েন্নরম্। দেশকালাতিপত্তৌ চ গৃহীত্বা স্বয়মর্পয়েৎ॥
বিক্রেতুর্দর্শনাচ্ছুদ্ধিঃ স্বামী দ্রব্যং নৃপো দমম্। ক্রেতা মূল্যমবাপ্নোতি তস্মাদ্যস্তস্য বিক্রয়ী॥
আগমেনোপভোগেন নষ্টং ভাব্যমতোঽন্যথা। পঞ্চবন্ধো দমস্তত্র রাজ্ঞে তেনাবিভাবিতে।
হৃতং প্রনষ্টং যো দ্রব্যং পরহস্তাদবাপ্নুয়াৎ। অনিবেদ্য নৃপে দণ্ড্যঃ স তু ষণ্নবতিং পণান্॥
শৌল্কিকৈঃ স্থানপালৈর্ব্বা নষ্টাপহৃতমাহৃতম্। অর্ব্বাক্ সংবৎসরাৎ স্বামী হরতে পরতো নৃপঃ॥
পণানেকশফে দদ্যাচ্চতুরঃ পঞ্চ মানুষে। মহিষোষ্ট্রগবাং দ্বৌ দ্বৌ পাদং পাদমজাবিকে॥"

যাজ্ঞবল্ক্যের এই উক্তি হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, প্রকৃত ধনস্বামী আপনার নষ্ট বা হৃত দ্রব্য অন্যের নিকট দেখিতে পাইলেই তিনি তাহা উদ্ধার করিতে পারিতেন; আর বহুজনসমক্ষে ক্রয় বা বিক্রয় প্রশস্ত ছিল। তাহা না হইলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই দোষী হইতে পারেন। কৌটিল্যের বিধানে দেখিয়াছি,—"বাহ্যাসামন্ত চত্বারিংশকুল্যা গৃহপ্রতিমুখে বেশ্ম শ্রাবয়েয়ুঃ।" মনুর বিধানেও তাহাই উপলব্ধি হইয়াছে; আবার যাজ্ঞবল্ক্যও সেই একই বিধি বিহিত করিলেন। সুতরাং বেশ বুঝা গেল, দশ জনের সম্মুখে যে দানবিক্রয় হয়, প্রাচীন কালে তাহাই প্রশস্ত ছিল। যাজ্ঞবল্ক্য আরও বিহিত করিয়াছেন,—যদি হৃত দ্রব্য সদুপায়ে পাইবার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে সে দ্রব্য গোপনে ক্রয় করিবে না। রাত্রিকালে, গোপনে, অল্পমূল্যে এতাদৃশ দ্রব্য ক্রয় করিলে ক্রেতা চৌরপদবাচ্য হন। এরূপ স্থলে ক্রেতা যদি হৃত দ্রব্যের সন্ধান পান, তাহা হইলে তিনি বিক্রেতাকে ধরাইয়া দিবেন। এতদ্ব্যতীত, যদি বিক্রেতা কোনও অজ্ঞাতদেশে গিয়া থাকে বা মরিয়া যায়; তাহা হইলে ক্রেতা তাঁহার ক্রীত-দ্রব্য প্রকৃত ধনস্বামীর নিকট প্রদান করিবেন। কৌটিল্য বলিয়াছেন,—"ন বিক্রেতারং তস্য দ্রব্যস্যাতিসর্গেণ মুচ্যেত। বিক্রেতা চেদ্‌দৃশ্যেত, মূল্যং স্তেয়-দণ্ডং চ।" যাজ্ঞবল্ক্যও বিধান করিলেন,—বিক্রেতাকে দেখাইয়া দিলেই অপহৃত-দ্রব্যক্রেতা দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইবে; আর প্রকৃত দ্রব্যস্বামী তাঁহার দ্রব্য ফিরাইয়া পাইবেন; অপিচ, ক্রেতাকে বিক্রেতা মূল্য ফিরাইয়া দিবেন। এরূপ ক্ষেত্রে বিক্রেতা রাজদণ্ড ভোগ করিবেন।

---

* ভারতীয় চুক্তি-সংক্রান্ত আইনের সপ্তম অধ্যায়ে অস্থাবর বিক্রয়-সংক্রান্ত নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ আছে। সে সকলের আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, ঐ অধ্যায়ের অন্তর্গত বিধি-বিধান-সমূহ—প্রাচীন হিন্দুর ব্যবহার-শাস্ত্রের অনুসারী। পণ্য-দ্রব্যের ক্রয় ও বিক্রয়ের অধিকার এবং পদ্ধতি-সংক্রান্ত ঐ অংশ আলোচনা করিলে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়; আর বুঝা যায়,—চুক্তি বিষয়ক স্মৃত্যাদির বিধান তাহার ভিত্তিস্থানীয়। বাহুল্য-ভয়ে সে বিস্তৃত বিধি এস্থলে উল্লিখিত হইল না। Vide, Indian Contract Act, Chap. VII.

অন্যান্য বিধান-প্রসঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—ক্রয় কিংবা উপভোগের প্রমাণ দিয়া দ্রব্যস্বামী নষ্ট বা অপহৃত দ্রব্য নিজের বলিয়া সপ্রমাণ করিবেন। তিনি যদি এরূপ প্রমাণদানে অসমর্থ হন, তাহা হইলে তাঁহার দাবীকৃত দ্রব্যের একপঞ্চমাংশ অর্থদণ্ড হইবে। রাজাকে না জানাইয়া হৃত কি প্রনষ্ট দ্রব্য গ্রহণ করিলে ষোল পণ দণ্ডের বিধি। বিষ্ণু-সংহিতায়ও এতদনুরূপ বিধান দৃষ্ট হয়। বিষ্ণু বলিয়াছেন (পঞ্চম অধ্যায়, ১৫৯ম—১৬১ম শ্লোক দ্রষ্টব্য),—"অজ্ঞানানঃ প্রকাশং যঃ পরদ্রব্যং ক্রীণীয়াৎ তত্র তস্যাদোষঃ॥ স্বামী দ্রব্যমাপ্নুয়াৎ॥ সত্বপ্রকাশং হীনমূল্যঞ্চ ক্রীণীয়াৎ তদা ক্রেতা বিক্রেতা চ চৌরবচ্ছাস্যৌ॥" প্রকাশ্যভাবে পরদ্রব্য ক্রয় করিলে, ক্রেতার কোনও দোষ হয় না। দ্রব্য নির্ণীত হইলে দ্রব্যস্বামী তাহা প্রাপ্ত হইবেন। অর্থাৎ,—এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির দ্রব্য অপহরণ করিয়া তৃতীয় ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিল। বিক্রেতা উপস্থিত হইলে বা চোর ধরা পড়িলে, ক্রেতা তৃতীয় ব্যক্তি দণ্ডনীয় হইবেন না। দ্রব্যস্বামী সে দ্রব্য ফিরিয়া পাইবেন, বিক্রেতা চোরের নিকট ক্রেতা টাকা ফিরাইয়া পাইবেন। কিন্তু যদি অপ্রকাশ্যভাবে ও হীনমূল্যে ঐ অপহৃত দ্রব্য ক্রয় করা হয়, তাহা হইলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই দণ্ড হইবে। সে ক্ষেত্রে বিক্রেতা ধৃত হইলেও ক্রেতা মুক্তি পাইবেন না। * রাজনিয়োজিত শুল্কাধিকারী প্রভৃতি যদি অপহৃত বা নষ্ট দ্রব্য আহরণ করিয়া রাজ-ভাণ্ডারে স্থাপন করেন; তাহা হইলে ধনস্বামী উপযুক্ত প্রমাণাদি দিয়া এক বৎসরের মধ্যে উহা গ্রহণ করিতে পরেন। কিন্তু ঐ সময় অতীত হইলে সে দ্রব্যে তাঁহার কোনও অধিকার থাকিবে না। প্রনষ্ট বা হৃত অস্বামিক দ্রব্য লাভ সম্বন্ধে গৌতমও অনুরূপ বিধান বিহিত করিয়াছেন।

---

* এতদংশে বর্ণিত বিধান-সমূহ চোরাই মাল গ্রহণের (Receiving stolen property) বিধানের অনুরূপ। প্রাচীন বিধান অনুসারে চোরাই মাল গ্রহণকারী বিক্রেতাকে দেখাইয়া দিতে পারিলেই মুক্তি লাভ করিতেন; তাঁহার প্রতি কোনও দণ্ডের আদেশ হইত না। কিন্তু আধুনিক দণ্ডবিধি আইনের (The Indian Penal Code) বিধানমতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই চৌর্য্যাপরাধে দণ্ডনীয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এতৎ-সংক্রান্ত দণ্ডবিধি আইনের বিধান নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা,—"Whoever dishonestly receives or retains any stolen property, knowing or having reason to believe the same to be stolen property, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years or with fine, or with both." Sec. 411, "Whoever dishonestly receives or retains any stolen property, the possession whereof he knows or has reason to believe to have been transferred by the commission of dacoity, or dishonestly receives from a person whom he knows or has reason to believe to belong or to have belonged to a gang of dacoits, property which he knows or has reason to believe to have been stolen, shall be punished with trasportation for life or with rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine."—Sec. 412, এতদ্ব্যতীত দণ্ডবিধি আইনের ৪১৩ ও ৪১৪ ধারায় চোরাই মাল গ্রহণের এবং চোরাই মাল বিক্রয়ে সহায়তার জন্য দণ্ড বিহিত হইয়াছে। Vide, *The Indian Penal Code*.

অস্বামিক দ্রব্য পাইলে মনুর বিধানে সেই সংবাদ যেমন রাজসমীপে জ্ঞাপন করার বিধি বিহিত আছে, গৌতমের বিধানেও সে বিধি বিধিবদ্ধ হইয়াছে। গৌতম বলিয়াছেন,—

প্রণষ্টমস্বামিকমধিগম্য রাজ্ঞে প্রব্রূয়ুর্বিখ্যাপ্য সংবৎসরং রাজ্ঞো রক্ষ্যমূর্দ্ধ-
মধিগন্তুশ্চতুর্থং রাজ্ঞঃ শেষঃ স্বামী ঋক্থক্রয়সংবিভাগ পরিগ্রহাধিগমেষু॥"

অর্থাৎ,—'কোনও প্রকার অস্বামিক ধন লাভ করিবামাত্রই রাজাকে সংবাদ প্রদান করিবে, রাজাও রাজ্যমধ্যে ঐ ধন-প্রাপ্তির বিষয় ঘোষণা করিবেন এবং এক বৎসর পর্য্যন্ত আপনার নিকট উহা রাখিবেন। যদি ঐ সময়ের মধ্যে ধনস্বামী স্থির না হয়, তাহা হইলে ঐ সময়ের পর যে ব্যক্তি প্রথমে ধন পাইয়াছিল, তাহাকে চতুর্থাংশ প্রদান করিয়া অবশিষ্ট অংশ রাজকোষে গৃহীত হইবে। উত্তরাধিকার-সূত্রে লব্ধ এবং ক্রয়, বিভাগ অথবা পরিগ্রহ দ্বারা প্রাপ্ত সম্পত্তিতে সকলের সমান অধিকার। গৌতম আরও বলিয়াছেন,—চৌর্য্যকার্য্যে যে সহায়তা করে বা জ্ঞানপূর্ব্বক অন্যায়রূপে গৃহীত বস্তু গ্রহণ করে, সে চৌরতুল্য দণ্ডনীয়। অপরাধের ন্যূনাধিক্য অনুসারে তাহার দণ্ডের বিধান হইবে, প্রনষ্ট দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে তাহা রক্ষণের জন্য রাজাকে কিঞ্চিৎ শুল্ক প্রদান করিতে হইত। বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন রূপ শুল্কের বিধান ছিল। যথা,—অশ্বাদি একশফ জন্তুতে চারি পণ, মনুষ্যে পাঁচ পণ, মহিষ উষ্ট্র ও গরুতে দুই দুই পণ, ছাগ ও মেষ সম্বন্ধে পণপাদ করিয়া শুল্ক প্রদানের বিধি বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। * কৌটিল্যের বিধান অনুসারেও "স্বকরণেন পঞ্চপণিকং দ্বিপদরূপস্য নিষ্ক্রয়ং দদ্যাৎ। চতুষ্পণিকমেকক্ষুরস্য; দ্বিপণিকং গোমহিষস্য; পাদিকং ক্ষুদ্রপশুনাং; রত্নসারফল্গু-কুপ্যানাং পঞ্চকং শতং দদ্যাৎ।" ক্রয় বা বিক্রয় করিয়া অনুতাপ উপস্থিত হইলে, ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাহারের ব্যবস্থাও সংহিতাকারগণ বিধান করিয়াছেন। মনু বলিয়াছেন; যথা,—

"ক্রীত্বা বিক্রীয় বা কিঞ্চিদ্ যস্যেহানুশয়ো ভবেৎ। সোঽন্তর্দশাহাৎতদ্দ্রব্যং দদ্যাচ্চৈবাদদীত বা॥
পরেণ তু দশাহস্য ন দদ্যান্নাপি দাপয়েৎ। আদদানো দদচ্চৈব রাজ্ঞাঃ দণ্ড্যঃ শতানি ষট্॥"

অর্থাৎ,—'ক্রয় বা বিক্রয় করিয়া যে পশ্চাৎ অনুতাপ করে, সে সেই দ্রব্য দশ দিনের মধ্যে ফিরিয়া দিবে বা ফিরাইয়া লইতে পারিবে। কিন্তু দশ দিন পরে ফিরাইয়া দিতে বা ফিরাইয়া লইতে পারিবে না। যদি কেহ বলপূর্ব্বক সে দ্রব্য ফিরাইয়া দেয় বা ফিরিয়া লয়, রাজা তাহাকে ছয় শত পণ অর্থদণ্ড করিবেন।' যাজ্ঞবল্ক্যাদিও এইরূপ বিধি বিহিত করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত আরও কতকগুলি বিধান আছে। তাহাও কম কৃতিত্বের নিদর্শন নহে। বিক্রেতা প্রদান করিতে চাহিলে ক্রেতা যদি ক্রীত দ্রব্য গ্রহণ না করে, আর রাজোপদ্রবে বা দৈবোপদ্রবে তাহা বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে ক্রেতা তাহার ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী নহেন। পক্ষান্তরে, ক্রেতা ক্রীত দ্রব্য গ্রহণ করিতে চাহিলে বিক্রেতা যদি তাহা প্রদান না করে, আর রাজ বা দৈব উপদ্রবে তাহা নষ্ট হয়; সে

---

* শাস্ত্রোক্ত এ বিধান খোঁয়াড়-সম্পর্কীয় বিধির অনুরূপ। পশু হিসাবে শুল্কের হার নির্দ্দিষ্ট আছে। গো-মহিষাদি পশু রাজকীয় খোঁয়াড়ে (Pound) আবদ্ধ হইলে, তাহা ছাড়াইয়া লইবার সময় প্রকৃত স্বামীকে সেই শুল্ক খোঁয়াড়রক্ষককে প্রদান করিতে হয়। প্রাচীন কালের ব্যবহার বিধানই যে আধুনিক বিধি-ব্যবহার ভিত্তিস্থানীয়, কৌটিল্যাদির ব্যবস্থার আলোচনায় তাহা মনে হয়।

জন্য বিক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। ক্রেতা তাঁহার প্রদত্ত মূল্য ফিরিয়া পাইবেন। এতদ্ব্যতীত এক জনের নিকট বিক্রীত দ্রব্য বিক্রেতা যদি অপরের নিকট বিক্রয় করে এবং সদোষ দ্রব্য নির্দ্দোষ বলিয়া দেয়, তাহা হইলে সে বিক্রীত দ্রব্যের মূল্যের দ্বিগুণ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। সাধারণ দোষ, উপনিপাত ও অবিষহ্য—কৌটিল্যের মতে পণ্যদোষ এই তিন প্রকার। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য পণ্যের দোষ বিষয়ে কোনও প্রকার-ভেদ নির্দ্দেশ করেন নাই। অন্যান্য বিষয়ে সংহিতাদিতে যে ব্যবস্থা আছে, কৌটিল্যও সেইরূপ বিধি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

যাজ্ঞবল্ক্যে বিক্রয়াদি সম্বন্ধে এক বহুবিস্তৃত বিধি বিধিবদ্ধ আছে। তাহার আলোচনায় প্রাচীন-কালের ক্রয়-বিক্রয়াদি প্রণালী সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়। বিকৃত দ্রব্য-বিক্রয়-প্রসঙ্গে শাস্ত্রকারগণ কঠোর বিধি-বিধান-সমূহ ব্যবস্থিত করিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের সকলেরই এক অভিমত। বিকৃত দ্রব্য বিক্রয় যে পরকালে পাপজনক এবং ইহকালে দণ্ডণীয়, সকলের উক্তিতেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। মনু বলিয়াছেন,—'এক দ্রব্য অন্য দ্রব্যে মিশাইয়া বিক্রয় করিবে না। অসার দ্রব্যকে সার বলিয়া বিক্রয় করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। যাহা দিবে বলিয়া স্বীকার করিয়াছ, তাহার ন্যূন দিবে না। দূরে বা লুক্কায়িত অবস্থায় কোনও দ্রব্য বিক্রয় করিবে না। "নান্যদন্যেন সংসৃষ্টরূপং বিক্রয়মর্হতি। ন চাসারং ন চ ন্যূনং ন দূরে ন তিরোহিতম্॥" এতৎসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিধানে যাজ্ঞবল্ক্য দ্রব্যজাতের নামোল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—'ঔষধ, ঘৃত-তৈলাদি স্নেহ দ্রব্য, লবণ, কুঙ্কমাদি গন্ধ, ধান্য, গুড় প্রভৃতি পণ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশ্রিত করিলে ষোল পণ দণ্ড হইবে।' * যাজ্ঞবল্ক্যের মতে তাই—

ভেজাল বিক্রয়।

"ভেষজ-স্নেহ-লবণ-গন্ধ-ধান্য-গুড়াদিষু।
পণ্যেষু প্রক্ষিপন্ হীনং পণান্ দাপ্যস্তু ষোড়শঃ॥'

বিষ্ণুর বিধানেও ভেজাল-বিক্রয় এবং পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি করা দণ্ডণীয়। তাঁহার মতে—যে তুলাদণ্ড বা দ্রোণপ্রস্থাদি মানবস্তু ন্যূনাধিক করে এবং নকল জিনিষ আসল বলিয়া বিক্রয় করে, তাহার উত্তম সাহস দণ্ড হইবে। অকূট দ্রব্য কূট বলিয়া উল্লেখ করিলে এবং কূট দ্রব্য অকূট বলিয়া বিক্রয় করিলেও সেইরূপ দণ্ডের বিধান।' কৌটিল্যও ভেজাল দ্রব্য বিক্রয় করা সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন। তাঁহারও মতে প্রতারণা সহকারে মন্দ দ্রব্য ভাল

---

* সংহিতোক্ত ভেজাল প্রভৃতির প্রসঙ্গের আলোচনায় বুঝা যায়, প্রাচীন ভারত ব্যবহার-বিষয়ে কত উন্নত এবং তাহার অভিজ্ঞতা কত অধিক ছিল। ভেজাল নিবারণ কল্পে তুলনায় মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইংরেজ-রাজ ভেজাল-বিষয়ক বিধি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। কিন্তু সে বিধি ভারতবর্ষে বহু পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও সংহিতাদি গ্রন্থের আলোচনায় তাহা প্রতিপন্ন হয়। কম ওজন দেওয়া বা কম ওজনে বিক্রয় করা দণ্ডণীয়। এ বিধি ইংরেজ-রাজ আমলে প্রবর্ত্তিত আছে বটে; কিন্তু প্রাচীন ভারতের বিধি তত্তুলনায় যে বহু পূর্ব্ববর্ত্তী তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। পূর্ণ-পরিণতি না ঘটিলে এত বিভিন্নমুখী সূক্ষ্ম-বিধানের প্রবর্ত্তনা সম্ভবপর নহে। প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-গবেষণা দিগন্ত-প্রসারী এবং বহুমুখী ছিল, এতদালোচনায় তাহা প্রতিপন্ন হয়। ভেজাল বিষয়ক বিধান সম্বন্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ২৭২—২৭৫ ধারা দ্রষ্টব্য। Vide, Indian Penal Code, Sects. 272—275.

বলিয়া বিক্রয় করা দণ্ডনীয়। এতদ্ব্যতীত অর্থশাস্ত্রে ও স্মৃতিগ্রন্থে আর একটি বিধি দৃষ্ট হয়। তাহা তুলাদণ্ডাদি-সংক্রান্ত। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—তুলাদণ্ড, শাসনপত্র ও দ্রোণপ্রস্থ প্রভৃতি মান এবং মুদ্রাচিহ্নিত নিষ্কাদি যে ব্যক্তি কূট করে এবং যে ব্যক্তি ঐ সকল কূট দ্রব্য ব্যবহার করে, তাহার উত্তম সাহস দণ্ড হইবে। ভেজাল প্রভৃতি সম্বন্ধে এবং পরিমাপের তারতম্য বিষয়ে মহামতি কৌটিল্য যে বিধি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল ; যথা,—

"তুলামানাভ্যামতিরিক্তাভ্যাং ক্রীত্বা হীনাভ্যাং বিক্রীণানস্য ত এব দ্বিগুণা দণ্ডাঃ। গণপণ্যেষ্বষ্টভাগং পণ্যমূল্যেষ্বপহরতঃ ষণ্ণবতির্দণ্ডঃ। কাষ্ঠলোহমণিময়ং রজ্জুচর্ম্মমৃন্ময়ং সূত্রবল্করোমময়ং বা জাত্যমিত্যজাতং বিক্রয়াধানং নয়তো মূল্যাষ্টগুণো দণ্ডঃ। সারভাণ্ডমিত্যসারভাণ্ডং, তজ্জাতমিত্যতজ্জাতং, রাধাযুক্তমুপধিযুক্তং সমুৎপরিবর্ত্তিমং বা বিক্রয়াধানং নয়তো হীনমূল্যং চতুষ্পঞ্চাশৎপণো দণ্ডঃ। পণমূল্যং দ্বিগুণো দ্বিপণমূল্যং দ্বিশতঃ। তেনার্ঘবৃদ্ধৌ দণ্ডবৃদ্ধির্ব্যাখ্যাতা। কারুশিল্পিনাং কর্ম্মগুণাপকর্ষমাজীবং বিক্রয়ং ক্রয়োপঘাতং বা সম্ভূয় সমুত্থাপয়তাং সহস্রং দণ্ডঃ। বৈদেহকানাং বা সম্ভূয় পণ্যমবরুদ্ধ্য তামনর্ঘেণ বিক্রীণতাং ক্রীণতাং বা সহস্রং দণ্ডঃ। তুলামানান্তরমর্ঘবর্ণান্তরং বা ধরকস্য মাপকস্য বা পণমূল্যাদষ্টভাগং হস্তদোষেণাচরতো দ্বিশতো দণ্ডঃ। তেন দ্বিশতোত্তরা দণ্ডবৃদ্ধির্ব্যাখ্যাতা। ধান্যস্নেহক্ষারলবণগন্ধভৈষজ্যদ্রব্যাণাং সমবর্ণোপধানে দ্বাদশপণো দণ্ডঃ।"

ক্রয়কালীন যে ব্যক্তি ওজনে অধিক পরিমাণ লইয়া বিক্রয় কালে কম ওজনে বিক্রয় করে, ক্রীত ও বিক্রীত দ্রব্যের মূল্যের দ্বিগুণ তাহার অর্থদণ্ড হইবে। গণপণ্য বা সাধারণ পণ্যের অষ্টম ভাগ অপহরণ করিলে, সে পণ্য মূল্য অপহৃত হইবে এবং বিক্রয়কারী ষণ্ণবতি পণ অর্থদণ্ড প্রদান করিবে। হীনমূল্য কাষ্ঠ লৌহ বা মণিময় দ্রব্য, রজ্জু চর্ম্ম বা মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দ্রব্য, সূত্র বল্কল বা রোমময় পণ্য, অধিক মূল্যে বিক্রয় করিবার জন্য তাহার কৃত্রিম উৎকর্ষ সাধন করিলে, তত্তৎ-দ্রব্যের মূল্যের আট গুণ অর্থদণ্ড হইবে। এতদ্ব্যতীত সার দ্রব্যকে অসার করিলে এবং অসার দ্রব্য সার বলিয়া বিক্রয় করিলে দ্রব্যমূল্যের দ্বিগুণ অর্থদণ্ডের বিধি। কৃত্রিম প্রস্তুত কস্তুরিকাদি সারভাণ্ড অথবা পরিবর্ত্তিত মুদ্রিত পেটিকাদি বিক্রয় করিলে চতুঃপঞ্চাশৎ পণ দণ্ড এবং নিম্নলিখিত হারে তাহার দণ্ডনির্ণয় হইবে ; যথা,—এক পণের ন্যূন মূল্যে বিক্রয়াদি করিলে পঞ্চাশৎ পণ, এক পণের মূল্যে উহা করিলে শত পণ, দুই পণ মূল্যে উহা বিক্রয় করিলে দ্বিশত পণ দণ্ড হইবে। ইহার অতিরিক্ত মূল্যে করিলে উক্ত রীতি অনুসারে দণ্ডেরও বৃদ্ধি হইবে। একত্রবদ্ধ বণিকবৃন্দ রাজনিরূপিত মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি দ্বারা কারু ও শিল্পিগণের কষ্ট প্রদান করিলে তাহাদের সহস্র পণ দণ্ড হইবে। কারুকর ও শিল্পিকর অপকৃষ্ট দ্রব্য উৎকৃষ্ট করিয়া বিক্রয় করিলে, তাহাদেরও সহস্র পণ দণ্ড। দ্রব্য পরিমাপের সময় হস্তকৌশলে ওজনের তারতম্য সাধন করিলে পরি-মাপকের এবং ধারকের দুই শত পণ হিসাবে দণ্ড হইবে। ধান্য, স্নেহ, ক্ষার, লবণ, ভেষজ প্রভৃতি দ্রব্য ভেজাল মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করিলে বিক্রয়কারীর দ্বাদশ পণ দণ্ডের বিষয় অর্থ-শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। ভেজাল প্রভৃতি সংক্রান্ত আলোচনায় বুঝা যায়, প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-গবেষণা বহুব্যাপী ছিল। তাহা না হইলে এত বিভিন্ন বিষয়িণী জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি কদাচ

সম্ভবপর হইত না। তদ্ব্যতীত প্রজা-সাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি রাজপুরুষগণের যে বিশেষ দৃষ্টি ছিল, এতদ্দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হয়। দেশে পণ্য-দ্রব্যের মূল্য অযথা বৃদ্ধি হইলে, প্রকৃতিপুঞ্জের পীড়া জন্মিতে পারে—এই আশঙ্কায়, প্রাচীন-কালে রাজা পণ্য-দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন। রাজনির্দ্ধারিত মূল্য অপেক্ষা বর্দ্ধিত মূল্যে পণ্যাদি বিক্রয় করিলে পণ্যব্যবসায়িগণ রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইতেন।* প্রজাসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে এতাদৃশ প্রয়াস যে আদর্শ-রাজ্যের একতম শ্রেষ্ঠ আদর্শ, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। প্রাচীন ভারত জগৎ সমক্ষে সে মহান্ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল; আর সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে জগৎকে উপদেশ দিয়াছিল। তাই তাহার ঐশ্বর্য্য-সম্পৎ, জ্ঞান-গবেষণা, শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতির মহত্ত্বদর্শনে জগৎ আজি বিস্ময়-বিমুগ্ধ;—তাহার নিকট অবনত মস্তক।

---

* এতৎসম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যাদির অভিমত উল্লেখ-যোগ্য। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—"রাজা প্রত্যহ পরিদর্শন পূর্ব্বক যেরূপ মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন, প্রত্যহ তদনুসারে ক্রয়-বিক্রয় হইবে।...রাজা পণ্যের প্রকৃত মূল্য এবং আনয়নাদি ব্যয় হিসাব করিয়া এইরূপ মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন, যাহাতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই ক্ষতি না হয়। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায়, (দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৫৪ম ও ২৫৫ম শ্লোক দ্রষ্টব্য) এতদ্বিষয়ে নিম্নরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়; যথা,—

রাজনি স্থাপ্যতে যোহর্ঘঃ প্রত্যহং তেন বিক্রয়ঃ। ক্রয়ো বা নিঃস্রবস্তস্মাদ্বণিজাং লাভকৃৎ স্মৃতঃ॥
পণ্যস্যোপরি সংস্থাপ্য ব্যয়ং পণ্যসমুদ্ভবম্। অর্ঘোঽনুগ্রহকৃৎ কার্য্যঃ ক্রেতুর্বিক্রেতুরেব চ॥"

বিষ্ণু-সংহিতায়ও রাজা কর্তৃক পণ্য-মূল্য-নির্দ্দেশের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। মনুও এতৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"আগমং নির্গমং স্থানং তথা বৃদ্ধিক্ষয়াবুভৌ। বিচার্য্য সর্ব্বপণ্যানাং কারয়েৎ ক্রয়বিক্রয়ৌ॥
পঞ্চরাত্রে পঞ্চরাত্রে পক্ষে পক্ষেঽথবা গতে। কুর্ব্বীত চৈষাং প্রত্যক্ষমর্ঘসংস্থাপনং নৃপঃ॥
তুলামানং প্রতিমানং সর্ব্বঞ্চ স্যাৎ সুলক্ষিতম্। ষট্‌সু ষট্‌সু চ মাসেষু পুনরেব পরীক্ষয়েৎ॥

(মনুসংহিতা, অষ্টম অধ্যায়, ৪০১ম—৪০৩ম শ্লোক)।

মনুর উক্তিতেও বুঝা যায়, পণ্যদ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ রাজা করিয়া দিবেন আর পাঁচ দিন বা এক পক্ষ অন্তে মূল্যবেত্তাগণের সমক্ষে উহার বাজার দর নির্ণয় করিবেন। তুলামান, প্রতিমান প্রভৃতি ওজনের দ্রব্য রাজা স্থির করিয়া দিবেন এবং প্রতি ছয় মাস অন্তর তাহা পরীক্ষা করিবেন। এতদ্ব্যতীত নিষিদ্ধ দ্রব্য বিক্রয় সংহিতা-মতে নিষিদ্ধ হইয়াছে। ঐ নিষিদ্ধ-দ্রব্য বিক্রয় করিলে ক্রয়কারীর সমস্ত দ্রব্য রাজকোষে বাজেয়াপ্ত হইবে। যথা—"রাজবিনিষিদ্ধং বিক্রীণতস্তদপহারঃ॥"

বিবাহাদি বিষয়ে এক কন্যা দেখাইয়া অপর কন্যা সম্প্রদান সে সময়ে দণ্ডনীয় ছিল। মনু বলিয়াছেন,—

"যস্তু দোষবতীং কন্যামনাখ্যায় প্রযচ্ছতি। তস্য কুর্য্যান্নৃপো দণ্ডং স্বয়ং ষণ্ণবতিং পণান্॥"

শাস্ত্রোক্ত এই সকল বিধানের আলোচনায় পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন, প্রাচীন-কালে ভেজালাদি বিক্রয় অত্যধিক মাত্রায় প্রচলিত ছিল। আর প্রতারণা-প্রবঞ্চনা বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু শাস্ত্রকারগণের বিধান-সমূহ হইতে তাঁহাদের দূরদর্শিতারই পরিচয় পাওয়া যায়। ভবিষ্যকালে ধর্ম্মহানির আশঙ্কায় তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই বিধি-নিষেধ-সমূহের প্রবর্ত্তনায় সে পথ রুদ্ধ করিয়াছিলেন। মানুষের ধর্ম্মজ্ঞানহ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে নানা কদাচার বিরুদ্ধাচারের অনুষ্ঠান হওয়া সম্ভবপর। তন্নিবারণকল্পে তাঁহাদের এই সকল বিধি-বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ত্রিকালদর্শী—তাঁহারা। কলিতে ধর্ম্মহানির বিষয় তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাহা উপলব্ধি করিয়াই তাঁহারা ধর্ম্মহানিকর অবস্থা-নিবারণে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।

সংহিতা-গ্রন্থে পূর্ব্বক্রয়াধিকার-সংক্রান্ত বিধি স্পষ্টতঃ দৃষ্ট হয় না। কৌটিল্য যেমন বলিয়াছেন—বাস্তু প্রভৃতি বিক্রয় কালে প্রথমে জ্ঞাতিকে, তার পর প্রতিবেশীকে, তার পর ধনিককে বাস্তুক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ করিতে হইবে, মম্বাদির উক্তিতে সেরূপ বিধানের উল্লেখ নাই। পরবর্ত্তী ব্যবহারশাস্ত্রধৃত ব্যাস বচনে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়। ব্যাসের বিধান অনুসারে স্থাবর-সম্পত্তিতে সগোত্রের সমান অধিকার। সেই জন্য পরস্পরের সম্মতি না লইয়া সে সম্পত্তি দান-বিক্রয় করা বিধেয় নহে। পরিবার বিভক্তই হউক আর অবিভক্তই হউক, স্থাবর সম্পত্তিতে সপিণ্ডগণের পূর্ব্বক্রয়ের দাবী একইরূপ। দান ও বিক্রয়ে পূর্ব্বক্রয়াধিকারের দাবী সকলেরই সমান। যথা,—

পূর্ব্ব-ক্রয়াধিকার।

"ন চ স্থাবরস্য সমস্তস্য গোত্রসাধারণস্য চ। নৈকঃ কুর্য্যাৎ ক্রয়ং দানং পরস্পরমতং বিনা॥
বিভক্তা অভিভক্তা বা সপিণ্ডাঃ স্থাবরে সমাঃ। একো হ্যনীশঃ সর্ব্বত্র দানাধমনবিক্রয়ে॥"

দায়ভাগ-প্রকরণে নিবন্ধকার ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—"একস্য দানবন্ধকবিয়ক্রাধিকারঃ ইতি বাচাং যথেষ্টবিনিয়োগার্হত্বরূপস্য স্বত্বস্য দ্রব্যান্তর ইবাত্রাপ্যবিশেষাৎ বচনঞ্চস্বামিত্বেন দুর্ব্বৃত্ত-পুরুষ গোচরবিক্রয়াদিনা কুটুম্ববিরোধাদধর্ম্মজ্ঞাপনার্থনিষেধরূপং ন তু বিক্রয়াস্বনিষ্পত্যর্থং।" এই অংশের টীকায় মিতাক্ষরার নিবন্ধকার বিজ্ঞানেশ্বর বলিয়াছেন,—"স্থাবরে বিক্রয়ো নাস্তি কুর্য্যাদাধিমনুজ্ঞয়া। ইতি স্থাবরস্য কেবল বিক্রয়প্রতিষেধাৎ এবং ভূমি যঃ প্রতিগৃহ্লাতীত্যাদিবচনে দানপ্রশংসাদর্শনাচ্চ বিক্রয়েঽপি কর্ত্তব্যে সহিরণ্যমুদকং দত্বা দানরূপেণ স্থাবরবিক্রয়।" প্রকৃতপক্ষে অবিভক্ত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিষিদ্ধ। কিন্তু যে ক্ষেত্রে বিক্রয় না করিলে চলে না, সে ক্ষেত্রে সে সম্পত্তি বিক্রয় করিতে বাধা নাই। পূর্ব্বপুরুষার্জ্জিত নষ্ট সম্পত্তির উদ্ধার করিলে, সে সম্পত্তি উদ্ধার-কর্ত্তার স্বোপার্জ্জিত বলিয়া গণ্য হয়। পুত্রাদির অবর্ত্তমানে তাহা বিক্রয় হইতে পারে। কিন্তু পুত্রাদি বর্ত্তমান থাকিলে স্বোপার্জ্জিত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করাও মিতাক্ষরার ব্যবহার মতে নিষিদ্ধ হইয়াছে। যথা,—

"স্থাবরং দ্বিপদঞ্চৈব যদ্যপি স্বয়মর্জ্জিতম্।
অসম্ভূয় সুতান্ সর্ব্বান্ ন দানং ন চ বিক্রয়ম্॥"

একমাত্র স্থাবর সম্পত্তি কদাচ দান-বিক্রয় হইতে পারিবে না। কিন্তু আপৎকালে, কুটুম্ব পোষণ জন্য এবং ধর্ম্ম-সাধনের উদ্দেশ্যে এ বিধি লঙ্ঘন করা যাইতে পারিবে। যথা,—

একোঽপি স্থাবরে কুর্য্যাদ্দানাধমনবিক্রয়ম্।
আপৎকালে কুটুম্বার্থে ধর্ম্মার্থে চ বিশেষতঃ॥"

ক্রয়-বিক্রয় আলোচনায় সম্ভূয়-সমুত্থান, কর্ম্মকরকল্প, দাসকল্প, ভৃতকাধিকার প্রভৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতে পারে। কর্ম্মকর, দাস, ভৃত্য প্রভৃতি তাহাদের পরিশ্রম বিক্রয় করিয়া তাহার বিনিময়ে পারিশ্রমিক পাইয়া থাকে। প্রভুর কার্য্য-সম্পাদনে পরিশ্রম বিক্রয় এবং তদ্বিনিময়ে প্রভুর নিকট পারিশ্রমিক গ্রহণ, প্রাচীনকালের ব্যবস্থাপকগণ ক্রয়-বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের এই শ্রেণিবিভাগ এক হিসাবে, ক্রয়বিক্রয় বিষয়ে বিশেষ উপযোগী বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়। সম্ভূয় সমুত্থান—যৌথ বাণিজ্য বিষয়ক। বণিক সম্প্রদায় কিরূপে একত্রবদ্ধ হইবেন এবং

কর্ম্মকর প্রভৃতি বিধান।

শত্রুঞ্জয়-পর্ব্বতের জৈন মন্দির।

একত্রবদ্ধ হইয়া কি পদ্ধতি অনুসারে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালন করিবেন ; অপিচ, স্বদেশীয় ও বিদেশীয় পণ্যের আমদানি-রপ্তানি দ্বারা কি প্রকারে স্বদেশের ও স্বজাতির অর্থ-সম্পৎ বৃদ্ধি করিবেন ;—সম্ভূয়-সমুত্থান প্রকরণে সেই বিধি বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কৃষকগণ ও ব্যবসায়িগণ সকলেই এইরূপ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত করিয়া কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে পারেন। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহারা যে ভাবে কার্য্য-ব্যবস্থা করিবেন, অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন অংশে তাহার আভাষ পাওয়া যায়। লাভ ও অংশ বিভাগ এবং কার্য্য-পরিচালন বিষয়ে কৌটিল্য নিম্নরূপ বিধি নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"কর্ষকবৈদেহকা বা সস্যপণ্যারম্ভপর্য্যবসানান্তরে সন্নস্য যথাকৃতস্য কর্ম্মণঃ প্রত্যংশং দদ্যুঃ। পুরুষোপস্থানে সমগ্রমংশং দদ্যুঃ। সংসিদ্ধে তু ধৃতপণ্যে সন্নস্য তদানীমেব প্রত্যংশং দদ্যুঃ। সামান্যা হি পথি সিদ্ধিশ্চাসিদ্ধিশ্চ॥ প্রক্রান্তে তু কর্ম্মণি স্বস্থস্যাপক্রমতো দ্বাদশ-পণো দণ্ডঃ। ন চ প্রাকাম্যমপক্রমেণ॥ চৌরং ত্বভয়পূর্ব্বং কর্ম্মণঃ প্রত্যংশেন গ্রাহয়েদ্দদ্যাৎ প্রত্যংশমভয়ং চ। পুনস্তেয়ে প্রবাসমন্যত্র গমনে চ। মহাপরাধে তু দুষ্যবদাচরেৎ॥"

সঙ্ঘপ্রবিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রতি-কার্য্যের লাভালাভ হিসাব করিয়া যে যেরূপ কার্য্য করিয়াছে, তদনুপাতে লাভালাভের অংশ গ্রহণ করিবে। প্রতিনিধি দ্বারা কার্য্য সম্পাদন করিলেও ঐরূপ বিধি। পণ্যজাত বিক্রয় হইয়া গেলে, বিক্রয়লব্ধ অর্থের লভ্যাংশ বণিকগণ আপন আপন অংশ অনুসারে বিভাগ করিয়া লইবেন। আমদানি-রপ্তানি-কালে পণ্যের ক্ষতি হইলে প্রত্যেকে সে ক্ষতির অংশভাগী হইবেন। প্রত্যেকেই সঙ্ঘ-সংক্রান্ত যথানির্দ্দিষ্ট আপন-আপন কার্য্য সম্পাদন করিবেন। কোনও অংশীদার সেই নিরূপিত কার্য্য সমাধা না করিয়া চলিয়া গেলে, তাহার প্রতি দ্বাদশ পণ অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে। অংশীদার-গণের কেহ চুরি করিলে তাহার প্রথম দোষের জন্য সে ক্ষমার্হ। কিন্তু দ্বিতীয় বার ঐরূপ করিলে তাহাকে আর ক্ষমা করা হইবে না। তাহাকে সে জন্য সঙ্ঘ বা সমবায় হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিবে। সঙ্ঘ-সংক্রান্ত গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইলে সে দস্যু-তস্করের মধ্যে পরিগণিত হইবে এবং সেই হিসাবে তাহার প্রতি দণ্ডদানের বিধি বিহিত হইয়াছে। কর্ম্মকরকল্প প্রভৃতির ব্যবস্থা-বিধানে কৌটিল্য নিম্নরূপ বিধি বিহিত করিয়াছেন; যথা,—

"গৃহীত্বা বেতনং কর্ম্ম অকুর্ব্বতো ভৃতকস্য দ্বাদশপণো দণ্ডঃ। সংরোধশ্চাকরণাৎ। অশক্তঃ কুৎসিতে কর্ম্মণি ব্যাধৌ ব্যসনে বা অনুশয়ং লভেত। পরেণ বা কারয়িতুম্। তস্য ব্যয়ং কর্ম্মণা লভেত। 'ভর্ত্তা বা কারয়ন্নান্যস্ত্বয়া কারয়িতব্যো ময়া বা নান্যস্য কর্ত্তব্যম্' ইত্যপরে। ভর্ত্তুরকারয়তো ভৃতকস্যাকুর্ব্বতো বা দ্বাদশপণো দণ্ডঃ। কর্ম্মনিষ্ঠাপনে ভর্ত্তুরন্যত্র গৃহীতবেতনো নাসকামঃ কুর্য্যাৎ॥ 'উপস্থিতমকারয়তঃ কৃতমেব বিদ্যাৎ' ইত্যাচার্য্যাঃ॥ 'ন' ইতি কৌটিল্যঃ। কৃতস্য বেতনং, নাকৃতস্যাস্তি। স চেদল্পমপি কারয়িত্বা ন কারয়েৎ। কৃতমেব অস্য বিদ্যাৎ। দেশকালাতিপাতনেন কর্ম্মণামন্যথা করণে বা ন সকামঃ কৃতমনুমন্যেত। সম্ভাষিতাদধিকক্রিয়ায়াং প্রয়াসাম্মোঘং কুর্য্যাৎ॥"

প্রভুর নিকট হইতে বেতন গ্রহণ করিয়া ভৃত্য যদি কার্য্যে অবহেলা করে, তাহা হইলে তাহার দ্বাদশ পণ অর্থদণ্ড হইবে। তবে অশক্ত, কুৎসিৎ কর্ম্মে নিযুক্ত, পীড়িত বা বিপদ-গ্রস্ত ভৃত্যের সম্বন্ধে এ বিধি প্রযুক্ত হইবে না। কার্য্যের উপযুক্ত হইলে প্রভু তাহার দ্বারা

কার্য্য করাইয়া লইবেন। অন্যপক্ষে ভৃত্য যদি কাজ করিবার জন্য স্বীকার করিয়া সাময়িক অসামর্থ্য হেতু কিছু দিনের জন্য কার্য্য স্থগিত রাখিতে বলে; প্রভু তাহা স্থগিত রাখিবেন। সে কার্য্যের জন্য অন্য ভৃত্য নিযুক্ত করা বিধেয় নহে। ভৃত্যও সে কার্য্য সম্পাদন না করিয়া অপর স্থানে চাকুরী গ্রহণ করিতে পারিবে না। ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া তাহার দ্বারা কর্ম্ম না করাইলে প্রভুর দ্বাদশ পণ অর্থদণ্ড হইবে; আবার ভৃত্য যদি কাজ করিবে বলিয়া স্বীকার করে এবং পরে তৎসম্পাদনে অস্বীকার হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতিও ঐরূপ দণ্ডের বিধান। বেতন গ্রহণের পর কার্য্য সমাধা না করিয়া ভৃত্য বা শ্রমজীবী অন্যত্র গমন করিতে পারিবে না। শ্রমজীবী কর্ম্ম করিবার জন্য প্রস্তুত আছে, কিন্তু প্রভু তাহার দ্বারা কর্ম্ম করাইবেন না; এ ক্ষেত্রে শ্রমজীবীর কর্ম্মকাল শেষ হইবে,—আচার্য্য এ বিধি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু কৌটিল্য তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিয়াছেন,—কর্ম্মের জন্যই যখন বেতন নির্দ্ধারিত, তখন কর্ম্ম না করিলে বেতন দেওয়া হইবে কেন? কর্ম্মকর যদি কর্ম্ম-সম্পাদন করিতে প্রস্তুত থাকে, তাহার দ্বারা আংশিকরূপে কার্য্য করাইয়া প্রভু সে কার্য্য স্থগিত রাখিতে পারেন— কারণ, দেশ-কাল-স্থান প্রভৃতির অবস্থা আলোচনা করিয়া এবং শ্রমজীবীর যোগ্যতা অযোগ্যতার বিষয় অনুধাবন করিয়া, তাহার কার্য্যে প্রভুর সন্তুষ্ট না হওয়া বিচিত্র নহে; আবার শ্রমজীবী, নিরূপিত কার্য্যের ন্যূনাধিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, প্রভুর ক্ষতি করিতে পারে। সঙ্ঘভৃত্য সম্বন্ধে কৌটিল্যের বিধান একটু স্বতন্ত্র। সঙ্ঘভৃত বা সমবায়ে নিযুক্ত ভৃত্যগণ সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ণিত বিধি-ব্যবস্থা প্রযুক্ত হইবে। তদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি বিধি কৌটিল্য বিহিত করিয়াছেন।

"তেন সঙ্ঘভৃতা ব্যাখ্যাতাঃ। তেষামাধিঃ সপ্তরাত্রমাসীৎ। ততোঽন্যমুপস্থাপয়েৎ। কর্ম্মনিষ্পাকং চ। ন চানিবেদ্য ভর্ত্তুঃ সঙ্ঘঃ কিঞ্চিৎপরিহরেৎ, অপনয়েদ্বা। তস্যাতিক্রমে চতুর্ব্বিংশতিপণো দণ্ডঃ। সঙ্ঘেন পরিহৃতস্যার্ধদণ্ডঃ॥ সঙ্ঘভৃতাঃ সন্তূয়সমুত্থাতারো বা যথাসম্ভাষিতং বেতনং সমং বা বিভজেরন্॥"

সঙ্ঘভৃত্যগণ নিরূপিত সময়ে কার্য্য-সম্পাদনে অসমর্থ হইলে, আরও সপ্ত রাত্রি তাহাদিগকে ঐ কার্য্য সম্পাদন জন্য সময় দিবার নিয়ম। সপ্তরাত্রি সময় পাইয়াও যদি তাহারা সে সময়ের মধ্যে কার্য্য সম্পাদন করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহারা অন্য লোক নিযুক্ত করিয়া সে কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিবে। প্রভুর অনুমতি ব্যতীত তাহারা কর্ম্মস্থান হইতে কোনও দ্রব্য স্থানান্তরিত করিতে পারিবে না, কিংবা কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া চলিয়া যাইবে না। শেষোক্ত বিধির অন্যথায় তাহাদের প্রতি দ্বাদশ পণ এবং পূর্ব্বোক্ত বিধির অন্যথায় চতুর্ব্বিংশতি পণ দণ্ডের বিধান বিহিত হইয়াছে। যেরূপে কর্ম্মকরের বেতনাদি নির্দ্দেশ করিতে হইবে, তৎসংক্রান্ত কৌটিল্যের বিধি নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা,—

"কর্ম্মকরস্য কর্ম্মসম্বন্ধমাসন্না বিদ্যুঃ। যথাসম্ভাষিতং বেতনং লভেত। কর্ম্মকালানুরূপমসম্ভাষিতবেতনম্। কর্ষকঃ সস্যানাং, গোপালকঃ সর্পিষাং বৈদেহকঃ পণ্যানামাত্মনা ব্যবহৃতানাং, দশভাগমসম্ভাষিতবেতনো লভেত॥ সম্ভাষিতবেতনস্তু যথাসম্ভাষিতম্॥ কারুশিল্পিকুশীলবচিকিৎসকবাগ্জীবনপরিচারকাদিরাশাকারিকবর্গস্তু যথাঽন্যস্তদ্বিধঃ কুর্য্যাৎ, যথা বা কুশলাঃ কল্পয়েয়ুঃ তথা বেতনং লভেত

সাক্ষিপ্রত্যয়মেব স্যাৎ। সাক্ষিণামভাবে যতঃ কর্ম্ম ততোঽনুযুঞ্জীত॥ বেতনাদানে দশবন্ধো দণ্ডঃ। ষট্‌পণো বা। অপব্যয়মানে দ্বাদশপণো দণ্ডঃ পঞ্চবন্ধো বা॥

ভৃত্যের বেতনাদি নির্দ্ধারণ-কালে প্রভু প্রেতিবেশিগণকে আহ্বান করিবেন। প্রতিবেশিগণ বেতনাদি বিষয়ক চুক্তির বিষয় অবগত থাকিবেন। ভৃত্য নির্দ্দিষ্ট বেতনের অতিরিক্ত বেতন পাইবে না। পরস্পর স্বীকার-নিষ্পত্তিতে যে বেতন ধার্য্য হইবে, ভৃত্য তদপেক্ষা অতিরিক্ত বেতনের দাবী করিলে দণ্ডনীয় হইবে। কিন্তু যেখানে বেতনাদি নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না, সে ক্ষেত্রে তৎকালপ্রচলিত হার-পরিমাণে কার্য্যের গুরুত্ব ও দায়িত্ব বুঝিয়া তাহার কার্য্যকালের বেতন নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। অন্যথায়, কৃষক তাহার উৎপাদিত শস্যের দশমাংশ গ্রহণ করিবে; গোপালক দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃত-মাখনাদির দশমাংশ এবং বণিকগণের প্রতিনিধি তাহাদের বিক্রীত পণ্যের দশমাংশ প্রাপ্ত হইবে। শিল্পী, বাদ্যকার, গায়ক, চিকিৎসক, পরিচারক প্রভৃতি তাহাদের সমব্যবসায়িদিগের ন্যায় কার্য্যানুরূপ বেতন বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করিবে। আর তাহাদের সহিত বেতন সম্বন্ধে কোনও চুক্তি না থাকিলে কুশলজ্ঞগণ যেরূপ বেতন নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন, তাহারা সেই নির্দ্দিষ্ট বেতন পাইবার অধিকারী। কিন্তু বেতন সমন্ধে মতভেদ ঘটিলে সাক্ষিগণের কথায় বিশ্বাস করিয়া বেতন নির্দ্দিষ্ট করা বিধেয়। সাক্ষীর অভাবে, ভৃত্যের কার্য্যের পরিমাণ অনুসারে তৎকাল-প্রচলিত এবং তৎকার্য্যোপযোগী বেতনের হার-পরিমাণে বেতন নির্দ্দিষ্ট করিবে। বেতন প্রদান না করিলে প্রভুর দশ পণ কিংবা ছয় পণ অর্থদণ্ড হইতে পারে। শঠতা সহকারে বেতন অস্বীকার করিলে তাঁহার দ্বাদশ পণ বা পঞ্চবন্ধ দণ্ড হইবে। কৃষকগণ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া যদি সে কার্য্য-সম্পাদনে অসম্মতি প্রকাশ করে, তাহা হইলে সে কৃষকের বেতনের দ্বিগুণ অর্থদণ্ড হইবে। দূরদেশাগত কৃষকের সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রে এইরূপ বিধি বিধিবদ্ধ আছে;—বেতনের দ্বিগুণ অর্থদণ্ড ব্যতীত তাহার খাদ্য-পানীয়ের দ্বিগুণ মূল্য দণ্ড-স্বরূপ তাহাকে প্রদান করিতে হইবে। উৎসবাদি কার্য্যে নিযুক্ত এইরূপ ভৃত্য কার্য্য-সম্পাদনে পরাঙ্মুখ হইলে তাহার বেতনের দ্বিগুণ অর্থদণ্ড হয়; আর সে অর্থ জনহিতকর অনুষ্ঠানে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এতৎসম্বন্ধে কৌটিল্যের উক্তি; যথা,—

> "কর্ষকস্য গ্রামমভ্যুপেত্যাকুর্বতো গ্রাম এবাত্যয়ং হরেৎ। কর্ম্মাকরণে কর্ম্মবেতনাদ্দ্বিগুণং হিরণ্যদানং প্রত্যংশদ্বিগুণং ভক্ষ্যপেয়দানে চ প্রহবণেষু দ্বিগুণমংশং দদ্যাৎ। প্রেক্ষায়ামনংশদঃ স্ব-স্বজনো ন প্রেক্ষেত। প্রচ্ছন্নশ্রবণেক্ষণে চ সর্বহিতে চ কর্ম্মণি নিগ্রহেণ দ্বিগুণমংশং দদ্যাৎ।"

সম্ভূয়-সমুত্থান, বেতনাদান, ভৃতকাধিকার প্রভৃতি সম্বন্ধে কৌটিল্য যে সকল বিধি-বিধান প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, স্মৃতি-শাস্ত্রের বিধান প্রায়ই তদনুরূপ। সম্ভূয়-সমুত্থান প্রকরণে কৌটিল্য যেমন সঙ্ঘভুক্ত বণিকদলের লাভালাভ হিসাবে এবং পরিশ্রম অনুসারে লাভালাভ ও পারিশ্রমিক গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন, সংহিতা-শাস্ত্রেও তত্তৎসংক্রান্ত বিধি প্রায় একইরূপ দৃষ্ট হয়। মনুর বিধান মতে যে ভৃত্য সুস্থ অবস্থায় অঙ্গীকৃত কার্য্য সম্পন্ন করে না, রাজা তাহাকে আট কৃষ্ণল দণ্ড করিবেন, আর সে কিছুমাত্র বেতন পাইবে না। এতৎসংক্রান্ত বিশেষ বিধির

সংহিতার মতে।

উল্লেখে মনু বলিয়াছেন,—যদি সে ভৃত্য যথার্থ পীড়িত হয় এবং আরোগ্য লাভের পর অঙ্গীকৃত কার্য্য সমাধা করে; তাহা হইলে সে অনেক দিন পীড়িত অবস্থায় থাকিলেও সে আরব্ধ কাল হইতে কার্য্য-সমাধা কাল পর্য্যন্ত সমস্ত সময়ের বেতন পাইবে। এতদ্ব্যতীত পীড়িত ও সুস্থ উভয় অবস্থায়ই যদি সে অপরের দ্বারা প্রভুর কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া দেয়, তাহা হইলেও সে সম্পূর্ণ বেতন পাইবার অধিকারী। কিন্তু সে কার্য্যের যদি অল্পমাত্রও অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে আর তাহাকে বেতন দেওয়া হইবে না। এতদ্বিষয়ে মনুসংহিতার উক্তি,—

"ভৃত্যো নার্ত্তো ন কুর্য্যাদ্যো দর্পাৎ কর্ম্ম যথোদিতম্। স দণ্ড্যঃ কৃষ্ণলান্যষ্টৌ ন দেয়ঞ্চাস্য বেতনম্॥
আর্ত্তস্তু কুর্য্যাৎ স্বস্থঃ সন্ যথাভাষিতমাদিতঃ। স দীর্ঘস্যাপি কালস্য তল্লভেতৈব বেতনম্॥
যথোক্তমার্ত্তঃ স্বস্থো বা যস্তৎ কর্ম্ম ন কারয়েৎ। তস্য বেতনং দেয়মল্পোনস্যাপি কর্ম্মণঃ॥"

ব্যাস-সংহিতায় এবং যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি বিধি দৃষ্ট হয়। কৌটিল্য বলিয়াছেন, বেতন নির্দ্ধারিত না করিয়া ভৃত্যের দ্বারা কার্য্য করাইলে তাহার কার্য্যের প্রকৃতি অনুসারে তৎকাল-প্রচলিত প্রথার অনুসরণে তাহার বেতন নির্দ্ধারিত হইবে। অপিচ, যে যে কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে, তাহার সেই কার্য্যের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যের দশমাংশ প্রদান করা বিধেয়। যাহারা বাণিজ্য বিষয়ে নিযুক্ত, তাহারা লভ্যাংশের দশমাংশ পাইবে; আর যাহারা কর্ষণ-কার্য্যে ব্রতী হইয়া থাকে, তাহারা উৎপন্ন শস্যের দশমাংশ লাভ করিবে। যাজ্ঞবল্ক্যের বিধানও তদনুরূপ। তিনিও বলিয়াছেন,—"দাপ্যস্তু দশমং ভাগং বাণিজ্যপশুশস্যতঃ। অনিশ্চিত্য ভৃতিং যস্তু কারয়েৎ স মহীক্ষিতা।" কিন্তু পণ্যদ্রব্য-সংক্রান্ত ব্যবস্থায় যাজ্ঞবল্ক্যের বিধান একটু স্বতন্ত্র। তাঁহার মতে, দেশকাল-প্রচলিত মূল্যের অধিক মূল্যে পণ্য-দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া ব্যয়বাহুল্যাদি দ্বারা ভৃত্য যদি লভ্যাংশ কমাইয়া ফেলে, তাহা হইলে ধনস্বামী ইচ্ছা করিলে তাহার বেতন দিতেও পারেন, না দিলেও তাঁহার অপরাধ হইবে না। অন্যপক্ষে, ন্যায্য ব্যয়-বাহুল্যের পর ভৃত্য যদি অতিরিক্ত লাভ দেখাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে ভৃত্যকে বেতন অপেক্ষা অধিক অর্থ দিতে হইবে। কিন্তু রাজোপদ্রব বা দৈবোপদ্রব নিবন্ধন পণ্য-হানি ঘটিলে ভৃত্য সে জন্য দায়ী হইবে না। এতদ্বিষয়ে বিষ্ণু কহিয়াছেন,—"তদ্দোষেণ যদ্বিনশ্যেৎ তৎ স্বামিনে। অন্যত্র দৈবোপঘাতাৎ॥" তাহার নিজের দোষে যাহা নষ্ট হইবে, সে তাহা ধনস্বামীকে প্রদান করিবে। কিন্তু দৈবোপদ্রবে নষ্ট হইলে, তাহা আর তাহাকে দিতে হইবে না। ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া নির্দ্দিষ্ট-কাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে ধনস্বামী যদি তাহাকে ছাড়াইয়া দেন, তাহা হইলে ভৃত্যকে তিনি চুক্তিবদ্ধ সময়ের সম্পূর্ণ বেতন প্রদান করিবেন; পরন্তু তাঁহাকে এক শত পণ অর্থদণ্ড দিতে হইবে। অন্যপক্ষে নির্দ্দিষ্ট কাল পূর্ণ না হইতেই ভৃত্য কার্য্য পরিত্যাগ করিলে, তাহার নির্দ্ধারিত বেতন স্বামীকে ফিরাইয়া দিবে এবং শত পণ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। "স্বামী চেদ্ভৃতকমপূর্ণে কালে জহ্যাৎ তস্য সর্ব্বং মূল্যং দদ্যাৎ। পণশতঞ্চ রাজনি। অন্যত্র ভৃতকদোষাৎ॥" যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায়ও এতদনুরূপ বিধি-বিধান আছে; কৌটিল্যও সেইরূপ বিধান বিহিত করিয়াছেন। কিন্তু উভয়ত্র দণ্ড বিষয়ে কিঞ্চিৎ পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। উৎসবাদি ব্যাপারে নিযুক্ত ভৃত্যের সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যবস্থা কৌটিল্যের বিধানের

অনুরূপ। এরূপ স্থলে কার্য্য করিতে অস্বীকার করিলে, ভৃত্য তাহার বেতনের দ্বিগুণ অর্থ-দণ্ড প্রদান করিবে। অন্যত্র, স্বামী কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া কার্য্য না করাইলে, ভৃত্যের নিরূপিত বেতনের সপ্তমাংশ প্রদান করিবেন। সঙ্ঘভুক্ত ভৃত্যগণ কোনও কার্য্য সম্পন্ন করিলে, কার্য্যের অনুপাত অনুসারে তাহাদিগকে বেতন প্রদান করিবার বিধি, যাজ্ঞবল্ক্য বিহিত করিয়াছেন। "যো যাবৎ কুরুতে কর্ম্ম তাবত্তস্য তু বেতনম্। উভয়োরপ্যসাধ্যঞ্চেৎ সাধ্যং কুর্য্যাদ্‌যথাশ্রুতম্॥" গৌতম-সংহিতায় এ সকল বিধি দৃষ্ট হয় না। কিন্তু তিনি একটী বিশেষ বিধির অবতারণা করিয়াছেন। ভৃত্য বৃদ্ধ হইয়া কর্ম্মে অক্ষম হইলে প্রভু তাহাকে তাহার বৃদ্ধাবস্থায় পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না; আবার প্রভুর হীনাবস্থায় ভৃত্য তাঁহার ভরণপোষণ করিবে। সম্ভূয়-সমুত্থান প্রকরণে সংহিতা-শাস্ত্রে বণিকসঙ্ঘ-সংক্রান্ত বিধি বিধিবদ্ধ হইয়াছে। সে আলোচনায় বণিক-সঙ্ঘ সংগঠন সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়। সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠা করিয়া বণিকগণ ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্রতী হইলে, প্রত্যেকে তাহাদের প্রদত্ত অংশ অনুসারে লাভ-ক্ষতির অংশভাগী হইবে। কোম্পানীর অন্তর্গত কোনও ব্যক্তি সাধারণের নিষিদ্ধ কার্য্য করিয়া পণ্যের ক্ষতি করিলে, সে ক্ষতি তিনি পূরণ করিয়া দিবেন। অনবধানতা-বশতঃ ক্ষতি করিলেও তৎসম্বন্ধে ঐরূপ বিধি। কিন্তু বিপদ আপদ উপস্থিত হইলে যিনি রক্ষা করিবেন, তিনি সাধারণ লভ্যাংশের দশমাংশ অতিরিক্ত প্রাপ্ত হইবেন। যে দ্রব্য বিক্রয় করিতে রাজা নিষেধ করিয়াছেন, তাহা বিক্রয় করিতে বসিলে রাজা তাহা গ্রহণ করিবেন। এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিধি সম্বন্ধে সংহিতাকার বলিয়াছেন,—

"মিথ্যা বদন্ পরীমাণং শুল্কস্থানাদপাসরন্। দাপ্যস্ত্বষ্টগুণং যশ্চ সব্যাজক্রয়বিক্রয়ী॥
তরিকঃ স্থলজং শুল্কং গৃহ্ণন্ দাপ্য পণান্ দশ। ব্রাহ্মণপ্রতিবেশ্যানামেতদেবানিমন্ত্রণে॥
দেশান্তরগতে প্রেতে দ্রব্যং দায়াদবান্ধবাঃ। জ্ঞাতয়ো বা হরেয়ুস্তদাগতাস্তৈর্বিনা নৃপঃ॥
জিহ্মং ত্যজেয়ুর্নির্লাভমশক্তোঽন্যেন কারয়েৎ। অনেন বিধিরাখ্যাত ঋত্বিক্‌কর্ষককর্ম্মিণাম্॥"

অর্থাৎ,—যে বণিক শুল্ক-বঞ্চনার্থ পণ্য দ্রব্যের পরিমাণ বিষয়ে মিথ্যা কথা কহে, শুল্ক-গ্রহণ স্থান হইতে পার্শ্বকর্ত্তন করিয়া পলায়ন করে এবং বিবাদীয় দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করে, তাহাদিগের পণ্য-মূল্যের আট গুণ অর্থদণ্ড বিধেয়। নৌশুল্ক-গ্রহণে নিযুক্ত ব্যক্তি যদি স্থলপথে সংবাহিত পণ্যের শুল্ক গ্রহণ করেন, তাঁহার প্রতি দশপণ দণ্ডের ব্যবস্থা।... সম্ভূয় বণিকগণের কেহ যদি দেশান্তরে প্রাণত্যাগ করে, সমবেত বাণিজ্যে তাহার যে মূলধন থাকিবে, তাহা তাহার পুত্রাদি, মাতুল, বন্ধু, জ্ঞাতি অথবা কোম্পানীর অপরাপর অংশীদারগণ প্রাপ্ত হইবেন। এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে মূলধন বিভাগ না হইলে পরে রাজা তাহা গ্রহণ করিবেন। কোম্পানীর অন্তর্গত কোনও ব্যক্তি বঞ্চনা করিলে তাহাকে বহিস্কৃত করিবার বিধি। * কোম্পানীর কেহই যদি ভাণ্ড (গুদাম) বা আয়-ব্যয় পরিদর্শন করিতে সমর্থ

* সম্ভূয় বণিকদিগের এই বিধান-সমূহ 'কোম্পানী-গঠন-সংক্রান্ত' বিধানে দৃষ্ট হয়। (Indian Companies Act) মৃত বণিকের মূলধন সম্বন্ধে সংহিতাকারগণ যে বিধি বিহিত করিয়াছেন, আজিকালিকার আইনে সে বিধির অনেকটা পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। ভারতীয় চুক্তিবিষয়ক আইনে এতৎসংক্রান্ত বিধি বিধিবদ্ধ আছে। তাহা জিম্মাদার ও জিম্মাগ্রহণকারীর সম্বন্ধে প্রযুক্ত।

না হন, তাহা হইলে অপরের দ্বারা সে কার্য্য সম্পাদনের বিধান, সংহিতাকারগণ বিহিত করিয়াছেন। পণ্যাদি ক্রয়-বিক্রয় বিষয়ে কৌটিল্য তৎপ্রণীত অর্থশাস্ত্রের 'পণ্যাধ্যক্ষ' ও 'শুল্কাধ্যক্ষ' প্রসঙ্গে বহুবিধ ব্যবস্থা বিহিত করিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে কৌটিল্য বলিয়াছেন,—

"শুল্কভয়াৎ পণ্যপ্রমাণং মূল্যং বা হীনং বুবতস্তদতিরিক্তং রাজা হরেৎ। শুল্কমষ্টগুণং বা দদ্যাৎ। তদেব নিবিষ্টপণ্যস্য ভাণ্ডস্য হীনপ্রতিবর্ণকেনার্ঘাপকর্ষণে সারভাণ্ডস্য ফল্গুভাণ্ডেন প্রতিচ্ছাদনে চ কুর্য্যাৎ। প্রতিক্রেতৃভয়াদ্বা পণমূল্যাদুপরি মূল্যং বর্দ্ধয়তো মূল্যবৃদ্ধিং রাজা হরেৎ, দ্বিগুণং বা শুল্কং কুর্য্যাৎ। তদেবাষ্টগুণমধ্যক্ষস্য ছাদয়তঃ। তস্মাদ্বিক্রয়ঃ পণ্যানাং ধৃতো মিতো গণিতো বা কার্য্যঃ তর্কঃ ফল্গুভাণ্ডানামানুগ্রাহিকাণাং চ। ধ্বজমূলমতিক্রমান্তানাং চাকৃতশুল্কানাং শুল্কাদষ্টগুণো দণ্ডঃ।"

সংহিতার ও কৌটিল্যের বিধি একই প্রকার বলিতে হয়। বিষয়-বিশেষে সামান্য একটু ইতর-বিশেষ দৃষ্ট হইলেও মূলতঃ বিশেষ কোনও পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। শুল্ক প্রদান না করিয়া শুল্কস্থান অতিক্রম করিলে, অথবা পণ্যের পরিমাণের ইতর-বিশেষ করিলে দণ্ডের বিধি উভয়ত্রই বিহিত হইয়াছে। আর সে দণ্ডের পরিমাণও অভিন্ন—অষ্ট পণ নির্দ্দিষ্ট। শুল্কাধ্যক্ষ শুল্কাদির বিষয় গোপন করিলে, তাঁহার প্রতিও দণ্ডের আদেশ হইয়াছে। অধিক সংখ্যক ক্রেতার সমাগম হইলে বণিকগণ যদি পণ্যের মূল্য বাড়াইয়া দিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের দণ্ডের বিধান ছিল। সে দণ্ডের কোনও পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। কিন্তু রাজা ইচ্ছা করিলে সমুদায় পণ্য রাজকোষে গ্রহণ করিতে পারিতেন। উৎকৃষ্ট পণ্যের উপরিভাগ নিকৃষ্ট পণ্যে আবৃত করিয়া শুল্ক-হ্রাসের চেষ্টা করিলে তাহার দণ্ড হইত। যাহা হউক, এই সকল বিধি-বিধানের আলোচনায় বেশ বুঝা যায়, কৌটিল্যের সময়ে এবং স্মৃতিশাস্ত্রাদির প্রবর্ত্তনা-কালে জনসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি রাজার এবং রাজপুরুষগণের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। বণিকগণ বা ব্যবসায়িবৃন্দ পণ্যের মূল্য অযথা বৃদ্ধি করিয়া সাধারণের পীড়া না জন্মাইতে পারেন, দেশপতি সম্রাট তাহার বিধান করিতেন। রাজা স্বয়ং পণ্যদ্রব্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার মূল্যাদি উপযুক্ত মত নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। নিরূপিত মূল্যের অতিরিক্ত মূল্যে পণ্যাদি বিক্রয় করিলে রাজা পণ্য-বিক্রেতৃগণের দণ্ড-বিধান করিতেন। বিক্রেয় দ্রব্যে প্রবঞ্চনা প্রতারণা না হয়, তৎপ্রতিও রাজার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। যেরূপ ওজন ও যেরূপ পরিমাপ প্রচলিত হইলে প্রজাসাধারণের অসুবিধা ও কষ্ট না হয়, রাজা তাহার বিধান করিয়া দিয়াছিলেন। বিশেষজ্ঞগণের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি ওজন-পরিমাপাদির বিষয় নির্দ্ধারিত করিতেন। কৃত্রিম দ্রব্যের সংমিশ্রণে অকৃত্রিম দ্রব্য বিকৃত হইয়া যায়; আর তাহাতে দেশের স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা। সেই জন্য ভেজাল-সংক্রান্ত নানা বিধি-নিষেধের প্রবর্ত্তনা। কৃত্রিম দ্রব্য অকৃত্রিম বলিয়া বিক্রয় এবং অকৃত্রিম দ্রব্য কৃত্রিম বলিয়া ঘোষণা করা, তাই রাজবিধানে দণ্ডনীয় ছিল। দাসকল্প, কর্ম্মকরকল্প প্রভৃতির উল্লেখেও জনহিতকর বিধিবিধানের অবতারণা। এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের বিধি-নিষেধ-সমূহ সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল-কামনায় এবং দেশের হিতসাধন-কল্পে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। আর, বাণিজ্য-বিষয়ে ভারতবর্ষ যে প্রাচীনকালে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহাও প্রতিপন্ন

হয়। অর্থশাস্ত্র হইতে বুঝা যায়, খৃষ্ট-জন্মের তিন শত বৎসর পূর্ব্বেও স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বাণিজ্যে ভারতবর্ষ বিশেষ লাভবান হইয়াছিল। স্বদেশীয় নানাবিধ শিল্প তৎকালে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। অর্থশাস্ত্রের অন্তর্গত 'শুল্কাধ্যক্ষ' ও 'পণ্যাধ্যক্ষ' প্রভৃতির আলোচনায় তাহা প্রতিপন্ন হইতে পারে। উহা হইতে আরও বুঝা যায়, জলপথে ও স্থলপথে সংবাহিত পণ্যাদির ব্যবস্থা-বিধান জন্য রাজনিরূপিত রাজকীয় বিভাগ-সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আর বাণিজ্যের উৎকর্ষ-সাধানে রাজা নানারূপ বিধি-বিধান-সমূহ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। এইরূপ জন-হিতকর বিবিধ বিষয়ক বিধি-বিধান-সমূহ—প্রাচীনকালের ব্যবস্থাপকগণের অলোক-সামান্য জ্ঞান-গবেষণা ও বহুদর্শিতার পরিচায়ক। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ ভারতের ঐশ্বর্য্য-সম্পদের পরিচয়ে তাই আজি বিস্ময়-বিমুগ্ধ। এমন কি, কৌটিল্যের বিধি-বিধান-সমূহের আলোচনায় তাঁহারা ম্যাকিয়াভেলি ও বিসমার্ক হইতেও কৌটিল্যকে উচ্চতর আসন প্রদান করিয়াছেন।

কৌটিল্যোক্ত চুক্তি-পর্য্যায়ের মধ্যে আদেশ ও অন্বাধি উল্লেখযোগ্য। ব্যবসা-বাণিজ্যের সৌকর্য্য-বিধানে উহার প্রয়োজনীয়তা অবিসম্বাদিত। বিভিন্ন দেশে পণ্য বিক্রয়ে এবং পণ্যের মূল্য আদান-প্রদানে আদেশ ও অন্বাধি বিশেষ সহায়তা করে।* বাণিজ্যাদির উৎকর্ষ-সাধনেও ইহা অল্প উপযোগী নহে। আদেশ—আধুনিক 'বিল অব এক্সচেঞ্জ' নামে অভিহিত হইতে পারে। এই 'আদেশ' সাহায্যে একদেশীয় বণিক ভিন্নদেশীয় বণিককে ক্রীত পণ্য-মূল্য প্রদান অতি সহজে এবং অতি অল্প সময়ে করিতে পারেন। 'আদেশ' অনুসারে ভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ ব্যবসায়ীকে তাঁহার

আদেশ ও অন্বাধি।

* কৌটিল্যোক্ত 'অন্বাধি'—Bailment for Delivery বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। ভারতীয় চুক্তি-বিষয়ক আইনের (*The Indian Contract Act*) নবম পরিচ্ছেদে এতদ্বিষয়ক বিধি বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কৌটিল্য, তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা পণ্যাদি সরবরাহের যে বিধান করিয়াছেন, চুক্তি-বিষয়ক ঐ আইনের বিধান-সমূহ প্রায়ই তদনুরূপ। তৃতীয় ব্যক্তি বা প্রতিনিধি উক্ত আইনে Bailee অভিধায়ে এবং ধনী মহাজন (যিনি তাহার জিম্মায় পণ্য প্রদান করিবেন) Bailor নামে অভিহিত আছেন। চুক্তি-বিষয়ক আইন অনুসারে ধনী ব্যবসায়ী প্রতিনিধির নিকট পণ্য-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার ব্যক্ত করিবেন। পণ্যে যদি কোনও দোষ থাকে, তৃতীয় ব্যক্তি ধনীকে তাহা প্রদর্শন করিয়া পণ্য গ্রহণ করিবেন। কিন্তু ধনী যদি প্রকৃত অবস্থা গোপন রাখিয়া সে পণ্য প্রদান করেন, আর পরে তাহাতে কোনও দোষ বাহির হয় এবং সে জন্য তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হন, তাহা হইলে পণ্য-বাহক দায়ী হইবেন না। অন্য পক্ষে জিম্বা লইয়া তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। চুক্তি সম্বন্ধে বিশেষ বাধ্য-বাধকতা না থাকিলে গ্রহণকারী তাহার ক্ষয়ব্যয়ের জন্য দায়ী হন না। তিনি যদি আপন পণ্যের সহিত ধনী ব্যবসায়ীর পণ্য মিশ্রিত করেন, তাহা হইলে সে পণ্যের লাভ-ক্ষতি উভয়ে বিভাগ করিয়া লইবেন। পণ্যের গুণাগুণ অনুসারে এই লাভ ক্ষতির হিসাব হইবে। কিন্তু ব্যবসায়ীর অসম্মতিতে বা অজ্ঞাতসারে পণ্যগ্রহণ-কারী যদি গৃহীত পণ্যের সহিত আপনার পণ্য-দ্রব্য এমনভাবে মিশ্রিত করেন যে, উভয় পণ্য পরস্পর পৃথক করা অসম্ভব; আর তিনি সে পণ্য ফিরাইয়া দেন; তাহা হইলে তৃতীয় ব্যক্তি তাহার ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবেন। কিন্তু স্বতন্ত্র করিবার সম্ভাবনা থাকিলে, স্বতন্ত্র করিবার ব্যয় মাত্র তাঁহাকে দিতে হইবে। ন্যস্তকারীর আদেশ মত ন্যস্ত দ্রব্য প্রত্যর্পণ করা বা অপরকে দেওয়া বিধেয়। তিনি যে ভাবে যাহাকে যে দ্রব্য দিতে বলিবেন, সে দ্রব্য সেইভাবে তাহাকে দিতে হইবে। অনেক ব্যক্তি একযোগে কোনও বস্তু ন্যস্ত করিলে, গ্রহণকারী তাহা তাঁহাদের যে কোনও ব্যক্তির নিকট সে দ্রব্য প্রত্যর্পণ করিতে পারেন। তাহাতে সকলের সম্মতি আবশ্যক করে না। যথা,—"If several joint owners of goods bail them, the bailee may deliver them

বিক্রীত পণ্যের মূল্য দেন; আবার ব্যবসায়িগণও 'আদেশ' প্রদর্শনে বৈদিশিক প্রতিনিধিগণের নিকট মূল্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। অন্বাধি—আদেশ হইতে স্বতন্ত্র। ইহাতে পণ্য আদান-প্রদানের সুবিধা হয়। ইহাও—অনেকাংশে আদেশের অনুরূপ। অন্বাধি—অপর ব্যক্তির বা বণিকের সাহায্যে পণ্য-সবরাহ করিবার ব্যবস্থা বিষয়ক। এতদ্বিধানে কৌটিল্য বলিয়াছেন,—

"সার্ধেনান্বাধিহস্তো বা প্রদিষ্টাং ভূমিমপ্রাপ্তশ্চৌরৈর্ভগ্নোৎসৃষ্টো বা নান্বাধিমভ্যাভবেৎ।

অন্তরে বা মৃতস্য দায়াদোঽপি নাভ্যাভবেৎ। শেষমুপনিধিনা ব্যাখ্যাতম্॥"

কোনও পণ্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হইলে, তৃতীয় ব্যক্তি বা সংবাহক যদি নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত না হন; কিম্বা পথিমধ্যে দস্যুগণ যদি তাহা লুণ্ঠন করিয়া লয়; অথবা সংবাহক যদি তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলে কিংবা পথিমধ্যে পরিত্যাগ করে; তাহা হইলে বণিকগণ সে জন্য দায়ী হইবে না। সংবাহক তৃতীয় ব্যক্তি যদি পথিমধ্যে মৃত্যু-মুখে পতিত হন, তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞাতিগণও সে জন্য দায়ী নহেন। এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিধি, উপনিধির বিধান-সমূহের অনুরূপ। অন্বাধি বিষয়ে কৌটিল্য আরও বলিয়াছেন,—

"যাচিতকমবক্রীতকং বা যথাবিধং গৃহ্নীয়ুস্তাবিধমেব অর্পয়েয়ুঃ।...প্রকীর্ণকং তু যাচিতকাবক্রীতকাহিতকনিক্ষেপকাণাং যথাদেশকালমদানে যামচ্ছায়া সমুপবেশসংস্থিতীনাং বা দেশকালাতিপাতেন গুল্মতরদেয়ং ব্রাহ্মণং সাধয়তঃ প্রতিবেশানুপ্রবেশয়োরুপরি নিমন্ত্রণে চ দ্বাদশপণো দণ্ডঃ।"

---

back to, or according to the directions of one joint owner without the consent of all, in the absence of any agreement to the contrary." ন্যাসকারীর স্বত্ব নাই—এমন কোনও দ্রব্য কাহারও নিকট ন্যস্ত করিলেন। গ্রহণকারী তাঁহার আপনার দ্রব্য জানিয়া বিশ্বাসের সহিত তাহা লইলেন এবং ন্যাসকারীর উপদেশ-মত যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রদান করিলেন। এ ক্ষেত্রে ন্যস্তকারী সে জন্য দায়ী; সরবরাহকারীর তাহাতে কোনও দোষ নাই। কিন্তু গ্রহণকারী যদি যথাস্থানে পণ্য পৌঁছাইয়া না দেন, অথবা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহা প্রত্যর্পণ না করেন, আর তাঁহার শৈথিল্যের জন্য যদি সে পণ্য নষ্ট হয়; তাহা হইলে তিনি সে জন্য দায়ী হইবেন। পণ্যে লাভ হইলে এবং বিশেষ কোনও সর্ত্ত না থাকিলে, লভ্যাংশ ন্যাসকারীর প্রাপ্য। এই সকল বিধি বিধান ভিন্ন, চুক্তি বিষয়ক আইনে ভাড়াটিয়া দ্রব্য, জামিনী বা বন্ধকী দ্রব্য প্রভৃতি সম্বন্ধেও নানা বিধি-বিধানের উল্লেখ আছে। তৎসমুদায়ও পূর্ব্ববর্ত্তী বিধি-সমূহের অনুরূপ। বাহুল্যভয়ে এস্থলে তাহা উল্লিখিত হইল না। যে দ্রব্য যাহাকে প্রদান করা যায়, প্রদানকারীকে দ্রব্য-সমূহের দোষগুণ দেখাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। দোষগুণ দেখাইয়া না দিলে এবং পরে তাহা প্রকাশ পাইলে গ্রহণকারী সে জন্য দায়ী হন না,—এ বিষয় পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। চুক্তি-সংক্রান্ত আইনের ১৫০ ধারায় এতদ্বিষয়ে যে বিধি আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল; যথা,—The bailor is bound to disclose to the bailee faults in the goods bailed, *of which the bailor is aware*, and which materially interfere with the use of them, or expose the bailee to extraordinary risks; and if he does not make such disclosure, he is responsible for damage arising in the bailee directly from such faults."

"If the goods are bailed for hire, the bailor is responsible for such damage whether he was or was not aware of the existence of such faults in the goodsbailed."—Vide, *the Indian Contract Act*, Chapter IX and Sections.

যে দ্রব্য যে ভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে, সে দ্রব্য সেই ভাবে প্রদান করিবার বিধি। উহা 'যাচিতক' বা ঋণ স্বরূপই লওয়া হউক, আর 'অবক্রীতক' ভাড়া স্বরূপই লওয়া হউক, লইবার সময় যে ভাবে যে অবস্থায় লওয়া হইয়াছিল, ফিরাইয়া দিবার সময়ও সেই ভাবে সেই অবস্থায় ফিরাইয়া দেওয়া আবশ্যক। নির্দ্ধারিত সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাইয়া দিবার অঙ্গীকারে কোনও পণ্যাদি গ্রহণ করিয়া শৈথিল্য-প্রযুক্ত যদি কেহ তাহা না দেয়, তাহার প্রতি দ্বাদশ পণ অর্থ-দণ্ডের বিধি বিহিত হইয়াছে। কৌটিল্যের এ বিধান হইতেও বুঝা যাইতেছে, পণ্য আদান-প্রদানে এবং মূল্যাদি সরবরাহে, বিবিধ উপায়ে সময়-সঙ্ক্ষেপের প্রয়াস চলিয়াছিল। আর, তদ্দ্বারা বাণিজ্যাদির বিবিধ উন্নতি সাধিত হওয়ায় সে সাম্রাজ্য সুখৈশ্বর্য্যের উচ্চ-চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

জনহিতকর বিবিধ বিধি প্রবর্ত্তনার সঙ্গে সঙ্গে অর্থশাস্ত্রে সাধারণের আমোদ-প্রমোদ ও হিতসাধন সংক্রান্ত বিধি-ব্যবস্থাও বিহিত হইয়াছে। সে সকল চুক্তি-পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

জনহিতকর বিধান।

সাধারণের আমোদ-প্রমোদ ব্যবস্থায় অঙ্গীকারবদ্ধ হইলে প্রত্যেক ব্যক্তি আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। কিন্তু যদি কেহ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সে অনুষ্ঠানে যোগদান না করেন, তাহা হইলে তিনি এবং তাঁহার অনুচরবর্গ সে আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করিতে পারিবেন না। অধুনা ঐরূপ অনুষ্ঠানে অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়াও যদি কেহ প্রতিজ্ঞাপূরণে বিরত হন, তাহা হইলে তাঁহার কোনই অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু প্রাচীন কালের বিধি সেরূপ নহে। অঙ্গীকার-বদ্ধ হইলেই কার্য্য-সম্পাদনে বাধ্যবাধকতা জন্মে। সুতরাং তাহার অপূরণ চুক্তিভঙ্গ অপরাধের ন্যায় দণ্ডনীয়। সাধারণের হিতকর কোনও অনুষ্ঠানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া তাহাতে বিরত হইলেও দণ্ডভোগ করিতে হয়। অর্থশাস্ত্রের 'বিবীতক্ষেত্রপথহিংসা' প্রকরণে এতৎসম্বন্ধে কৌটিল্য যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল; যথা,—

"প্রেক্ষায়ামনংশদঃ স্বস্বজনো ন প্রেক্ষেত। প্রচ্ছন্নশ্রবণেক্ষণে চ সর্বহিতে চ কর্মণি নিগ্রহেণ দ্বিগুণমংশং দদ্যাৎ। সর্ব্বহিতমেকস্য ব্রুবতঃ কুর্য্যুরাজ্ঞাম্। অকরণে দ্বাদশপণো দণ্ডঃ।"

সাধারণেরআমোদ-জনক কার্য্যে সহায়তার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়া যদি কেহ তাহাতে সহায়তা করিতে বিরত হয়; তাহা হইলে সে ব্যক্তি বা তাহার স্বজনবৃন্দ সে আমোদ উপভোগ করিতে পারিবে না। প্রচ্ছন্নভাবে উপভোগ করিলে দ্বাদশ পণ অর্থদণ্ড হইবে। সাধারণের হিতকর কার্য্য-সম্বন্ধেও কৌটিল্য ঐরূপ বিধি বিহিত করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা অঙ্গীকৃত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন, কৌটিল্যের ব্যবস্থায় রাজা তাঁহাদিগের হিতসাধন করিবেন।

"রাজা দেশহিতান্ সেতূন্ কুর্বতাং পথি সংক্রমাৎ।
গ্রামশোভাশ্চরক্ষাশ্চ তেষাং প্রিয়হিতং চরেৎ॥"

জনহিতকর অনুষ্ঠানে কৌটিল্যের বিধান হইতে বুঝা যায়, যাঁহারা ঐ সকল কার্য্যে ব্রতী হইতেন, তাঁহারা রাজ-সাহায্য লাভ করিতেন। জনহিতব্রতধারী ব্যক্তিগণ রাজ-সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া দেশহিতকর কার্য্য সম্পাদনে স্বদেশের বিবিধ উন্নতি সাধিত করিয়াছিলেন।

———•———

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

রাজপথাদির ব্যবস্থায় আদর্শ।

[রাজপথাদি নির্ণয়ে আদর্শ,—পথাদির উপযোগিতা ;—অর্থশাস্ত্রে রাজপথাদির প্রসঙ্গ,—প্রশস্ত পথসমূহ,—কৌটিল্যের মতে উত্তর অপেক্ষা দক্ষিণ শ্রেষ্ঠ ;—বিভিন্ন রাজপথ,—রাষ্ট্রপথ, পশুপথ, মনুষ্যপথ, বিবীতপথ, সংযানপথ প্রভৃতি বিংশতি প্রকার পথের উল্লেখ ও তাহাদের আকৃতি পরিমাণাদি ;—রথপথ, মহাপশুপথ, অনংপথাদির বিবরণ ;—পথাবরোধে দণ্ডের বিধান ;—যান-বাহনাদির ব্যবস্থা ;—জলপথাদির প্রসঙ্গ ;—বিভিন্ন জলপথের উল্লেখ ;—জলযানাদির ব্যবস্থা ;—গতাগতির উৎকর্ষে বাণিজ্যোৎকর্ষ সাধনে আদর্শ-খ্যাপন।]

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গতিবিধির ব্যবস্থা—আদর্শ-রাজ্যের অন্যতম আদর্শ। রাজ্য-রক্ষার সুবন্দোবস্তে সুশিক্ষিত সেনাদল যেমন প্রয়োজন, শাসনের সুশৃঙ্খলা-বিধানে আদর্শ শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠা যেমন একান্ত আবশ্যক, রাজ্য-সংরক্ষণের ব্যবস্থা-বিধানে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গতিবিধির সৌকর্য্য-সাধনও তেমনই প্রগাঢ় নীতিকুশলতার পরিচায়ক। রাজধানীর সহিত বিভিন্ন বিভাগের সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থ-বন্দোবস্ত না থাকিলে, সে রাজ্য কদাচ নিরাপদ নহে। শাসন-প্রণালীরও তাদৃশ সুশৃঙ্খলা বিধান সম্ভবপর হয় না। রাজ্যে রাজপথের ব্যবস্থা—শাসন শৃঙ্খলার এক প্রধান অঙ্গ। রাজ্য-মধ্যে গতিবিধির সুবিধার জন্য তাই স্থল-পথ ও জল-পথ উভয়ই প্রয়োজন। তদ্দারা একদিকে যেমন দুর্ভিক্ষের প্রকোপ শান্ত হইতে পারে, ব্যবসা-বাণিজ্যের যেমন বিবিধ উৎকর্ষ সাধিত হয়, অন্যদিকে শাসন-শৃঙ্খলাও তেমনি সরল ও সুগম হইয়া আসে। গতিবিধির সুবিধা না থাকিলে রাজ্যের কোনও অংশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে তাহা নিবারণের সম্যক্ উপায় নির্দ্ধারিত হইতে পারে না ; আবার শত্রু কর্ত্তৃক রাজ্যের কোনও অংশ আক্রান্ত হইলে, তাহা রক্ষার কোনও সহজ উপায় নির্দ্দেশও অসম্ভব হইয়া পড়ে ; দস্যু-তস্করাদির উপদ্রবেও সদা শশঙ্কিত থাকিতে হয়। নীতিবিদ্‌গণ তাই রাজ্য-মধ্যে গতিবিধির সৌকর্য্য-সাধনে সর্ব্বথা প্রয়াস পাইয়া থাকেন।

রাজপথের আবশ্যকতা।

স্থলপথ ও যানবাহনাদি।

[জলপথ ও স্থলপথের প্রসঙ্গ,—এতদুভয়ের মধ্যে স্থলপথের শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপন,—দক্ষিণোত্তরপথয়োঃ দক্ষিণঃ শ্রেষ্ঠঃ ;—অর্থনীতি হিসাবে রাজপথের উপযোগিতা,—রাজপথাদির প্রসঙ্গ,—সেতুবনপথ প্রভৃতি এবং তাহাদের পরিমাণাদি ;—খরোষ্ট্র, চক্রপথ, অনংপথ প্রভৃতি ;—রথচর্য্যাসঞ্চার, প্রতোলী, চার্য্যা প্রভৃতি পথের নাম ;—পথাবরোধে দণ্ড,—বিভিন্ন পথ সম্বন্ধে বিভিন্ন বিধি ;—যানবাহনাদি,—দেবরথ, পুষ্পরথ, সাংগ্রামিক প্রভৃতি,—শিবিকা, পীঠিকাদি মনুষ্য-বাহিত যান,—রাজপথ-সমূহে বৃক্ষাদি রোপণ ; পণ্যবীথিকা স্থাপন, জলাশয় খনন ও পথ-সংস্কারের ব্যবস্থা।]

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাজপথ নির্ম্মাণের অশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হই। কৌটিল্য যে রাজ্যের মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সে রাজ্য বঙ্গোপসাগর হইতে আরব-সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এতাদৃশ বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন-সুশৃঙ্খলা-বিধানে সর্ব্বপ্রকার বিধি-ব্যবস্থাই কৌটিল্য প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। আর সেই সকল বিধি-বিধানের প্রবর্ত্তনায় সে রাজ্য আদর্শ রাজ্যমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। সুশিক্ষিত সৈন্যদল সংগঠিত হওয়ায় সে রাজ্য একদিকে যেমন উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল ; অন্যদিকে

অর্থশাস্ত্রে পথ-নির্দ্দেশ।

তেমনি আদর্শ শাসন-প্রণালীর প্রতিষ্ঠায় এবং রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের তথ্য-সংগ্রহের সুবন্দোবস্তে সে রাজ্য শ্রেষ্ঠ-রাজনীতিকের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা খ্যাপন করিতেছিল। সে রাজ্যে স্থলপথের যেমন বাহুল্য, জলপথেরও তেমনি প্রাচুর্য্য। নৌ-যান, বাষ্পীয়যান প্রভৃতিতে কেবল যে জলপথে দেশের বিভিন্ন স্থানে গতিবিধির সুবিধা ছিল, তাহা নহে; তদ্দ্বারা স্বদেশে ও বিদেশে সংবাদ আদান প্রদানের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল। আর তাহাতে বাণিজ্যাদির প্রসার প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব্ব-পশ্চিম ক্রমে রাজ্যের চতুর্দ্দিকে বহু রাজপথ—স্থলপথ ও জলপথ বর্ত্তমান ছিল। যাত্রীর বা পণ্য-সরবরাহের অনুপাত অনুসারে কৌটিল্য বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন রাজপথ নির্দ্দেশের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উত্তর দিক অপেক্ষা দক্ষিণ দিকে অধিক সংখ্যক রাজপথ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কৌটিল্য বুঝিয়াছিলেন, উত্তর দিক অপেক্ষা দক্ষিণ দিক হইতে পণ্যাদির প্রচুর আমদানী হইবে; আর তাহাতে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়া জনসাধারণ সুখ-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারিবে। দক্ষিণ ভারতে সে সময়ে বহুসংখ্যক খনি বর্ত্তমান ছিল; সেদিক হইতে বিভিন্ন প্রকারের বহু পণ্য রাজ্যমধ্যে আমদানি হইত। সুতরাং সেই দিকে গতিবিধি সম্বন্ধে বিশিষ্ট ব্যবস্থা বিহিত করা, কৌটিল্য বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত। তৎপ্রদেশ হইতে কেবলমাত্র চর্ম্ম, ঘোটক, কম্বল প্রভৃতি আমদানি হইত। কিন্তু দক্ষিণ ভারত হইতে হীরক ও অন্যান্য মূল্যবান প্রস্তর, সুবর্ণ, মুদ্রা, শুক্তি, মুক্তা প্রভৃতি বণিকগণ বিক্রয়ার্থ আনয়ন করিত। আর সেই সকল দ্রব্যে রাজ্যের আয় অধিক ছিল। সুতরাং অবস্থা-বিচারে যে ব্যবস্থা-ভেদ হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রদেশেও এইরূপ বিভিন্ন রাজপথ প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহারও প্রাচুর্য্য পণ্যাদির এবং আয়-ব্যয়ের উপর নির্ভর করিত। কৌটিল্য সেই আয় পরিমাণাদির এবং সুবিধা-অসুবিধার বিষয় অনুধাবন করিয়া 'কর্ম্ম-সন্ধি' প্রসঙ্গে জলপথ ও স্থলপথ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

> "তত্রাপি বারিস্থলপথয়োর্বারিপথঃ শ্রেয়ান্, অল্পব্যয়ব্যায়ামঃ প্রভূতপণ্যোদয়শ্চ ইত্যাচার্য্যাঃ। 'নেতি' কৌটিল্যঃ—সংরুদ্ধগতিরসার্ব্বকালিকঃ প্রকৃষ্টভয়যোনির্নিষ্প্রতিকারশ্চ বারিপথঃ; বিপরীতস্স্থলপথঃ। বারিপথে তু কূলসংযানপথয়োঃ কূলপথঃ পণ্যপট্টনবাহুল্যাচ্ছ্রেয়ান্নদীপথো বা সাতত্যাদ্বিষহ্যাবাধত্বাচ্চ। স্থলপথেঽপি—'হৈমবতো দক্ষিণাপথাচ্ছ্রেয়ান্ হস্ত্যশ্বগন্ধদন্তাজিনরূপ্যসুবর্ণপণ্যাস্সারবত্তরাঃ—ইত্যাচার্য্যাঃ।' 'নেতি' কৌটিল্যঃ—কম্বলাজিনাশ্বপণ্যবর্জ্জাঃ শঙ্খবজ্রমণিমুক্তাসুবর্ণপণ্যাশ্চ প্রভূততরা দক্ষিণাপথে। দক্ষিণাপথেঽপি বহুখনিস্সারপণ্যঃ প্রসিদ্ধগতিরল্পব্যায়ামো বা বণিক্পথঃ শ্রেয়ান্। প্রভূতবিষয়ো বা ফল্গুপণ্যঃ। তেন পূর্ব্বঃ পশ্চিমশ্চ বণিকপথো ব্যাখ্যাতঃ॥"

কৌটিল্যের এতদুক্তি হইতে বুঝা যায়, লাভালাভের তারতম্য অনুসারে রাজপথের সংখ্যাদি নিরূপিত হইয়াছিল। রাজ্যের যে অংশে অধিক আয়ের সম্ভাবনা, সেই অংশে রাজ-পথের বাহুল্যের বিষয় কৌটিল্যের বিধির আলোচনায় উপলব্ধি হয়। আর পূর্ব্বপশ্চিম-উত্তরদক্ষিণ চারি দিকে সীমান্ত পর্য্যন্ত সে রাজপথ বিস্তৃত থাকায় তত্তদ্দেশে রাজশক্তি পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং শত্রু কর্ত্তৃক রাজ্য আক্রমণের আশঙ্কা বিদূরিত হইয়াছিল, তাহাও বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়।

বিভিন্ন উপযোগিতার মধ্যে রাজপথের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উপযোগিতা অন্যতম। সুদূর সীমান্ত পর্য্যন্ত রাজশক্তি অনুভূত হইলে বহিঃশত্রুকর্তৃক রাজ্য-আক্রমণ আশঙ্কা অতি অল্পই উপলব্ধি হয়। কারণ, সেরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইলে তত্তৎস্থানে

পথের বিবরণ।

যুদ্ধোপকরণ, অস্ত্র-শস্ত্র, দূত, হস্তী, অশ্ব, যানবাহনাদি এবং সৈন্যদল প্রভৃতি প্রেরণে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। আর তাহাতে সহজেই শত্রুর আক্রমণ নিবারিত হইতে পারে। বণিকগণের গতিবিধির ও পণ্য-সরবরাহের পথ 'বণিকপথ' বলিয়া অভিহিত। সে পথে শত্রুর সন্ধান চলিত; আর অস্ত্র-শস্ত্র, বর্ম্ম যান বাহন প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ ক্রয় করা যাইতে পারিত। এইরূপ বিভিন্ন পথ বিভিন্ন কার্য্যের জন্য নিয়োজিত ছিল। "হীনশক্তিপূরণম্" অংশে এতদ্বিষয় কৌটিল্যের উক্তি; যথা,—

"জনপদস্সর্বকর্ম্মণাং যোনিঃ; ততঃ প্রভবঃ; তস্য স্থানমাত্মনশ্চ আপদি দুর্গম্॥ সেতুবন্ধস্সস্যানাং যোনিঃ; নিত্যানুষক্তো হি বর্ষগুণলাভঃ সেতুবাপেষু॥ বণিকপথঃ পরাতিসন্ধানস্য যোনিঃ; বণিকপথেন হি দণ্ডগূঢ়পুরুষাতিনয়নং শস্ত্রাবরণযানবাহন-ক্রয়শ্চ ক্রিয়তে। প্রবেশো নির্ণয়েন চ॥ খনিস্সংগ্রামোপকরণানাং যোনিঃ॥ দ্রব্যবনং দুর্গকর্ম্মণাং; যানরথয়োশ্চ॥ হস্তিবনং হস্তিনাম্॥ গবাশ্বরথোষ্ট্রাণাং চ ব্রজঃ॥"

এইরূপ রাজপথ-সমূহের শ্রেণি-বিভাগ ছিল এবং পর্য্যায় অনুসারে তাহাদের নামকরণ হইয়াছিল। মনুষ্য-চলাচল, যান-বাহনাদির গতিবিধি এবং ভারবাহী পশ্বাদির গতায়াত বুঝিয়া রাজ-পথ-সমূহের একরূপ নামকরণ হইয়াছিল; আবার দৈর্ঘ্য-প্রস্থাদির হিসাবে তাহারা অন্যরূপ অভিধায়ে অভিহিত হইত। অর্থশাস্ত্রের 'আত্মরক্ষিতকম্' প্রকরণে এইরূপ একটী রাজ-পথের উল্লেখ আছে। তাহা 'রাজমার্গ' রূপে বিশেষিত হইয়াছে। যথা,—"নির্যাণেঽভি-যানে চ রাজমার্গমুভয়তঃ কৃতারক্ষং দণ্ডিভিরপাস্তশস্ত্রহস্তপ্রব্রজিতব্যঙ্গং গচ্ছেৎ। ন পুরুষ-সম্বাধমবগাহেত। যাত্রাসমাজোৎসব প্রবহণানি চ দশবর্গিকাধিষ্ঠিতানি গচ্ছেৎ।" 'দুর্গ-নিবেশ' প্রসঙ্গেও মহামতি কৌটিল্য রাজপথ সম্বন্ধে এতদভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন; যথা,—

"ত্রয়ঃ প্রাচীনা রাজমার্গাস্ত্রয় উদীচীনা ইতি বাস্তুবিভাগঃ। স দ্বাদশদ্বারো যুক্তোদক-ভূমিচ্ছন্নপথঃ। চতুর্দণ্ডান্তরা রথ্যা রাজমার্গদ্রোণমুখস্থানীয়রাষ্ট্রবিবীতপথাঃ। সযোনীয়ব্যূহ শ্মশানগ্রামপথাশ্চাষ্টদণ্ডাঃ। চতুর্দণ্ডস্সেতুবনপথঃ। দ্বিদণ্ডো হস্তিক্ষেত্রপথঃ। পঞ্চারত্নয়ো-রথপথশ্চত্বারঃ পশুপথঃ। দ্বৌ ক্ষুদ্রপশুমনুষ্যপথঃ। প্রবীরে বাস্তুনি রাজনিবেশাঃ।"

এইরূপ বিভিন্ন প্রকার পথ নির্দ্দেশ করিয়া, দৈর্ঘ্যপ্রস্থ হিসাবে গতাগতি অনুসারে তাহাদের নাম-করণ হইয়াছিল। রাজা যে পথে গমন করিতেন, তাহার নাম—রাজপথ। উহার প্রস্থ—চারি দণ্ড। প্রতি দণ্ডের পরিমাণ—আট ফিট। সুতরাং রাজপথের বিস্তৃতি বত্রিশ ফিট ছিল। উৎসবাদি ব্যাপারে শোভাযাত্রা করিয়া রাজা যখন সে পথে গমন করিতেন, তখন লোকচলাচল বন্ধ হইত এবং সে পথের উভয় পার্শ্বে প্রহরী নিযুক্ত থাকিত। প্রতি নগরে এইরূপ রাজপথের সংখ্যা ছয়টী করিয়া। এতদ্ভিন্ন রথ্যা, (বিস্তৃতি পরিমাণ চারি দণ্ড বা বত্রিশ ফিট), বিবীতপথ, রাষ্ট্রপথ, ক্ষুদ্রপশুপথ (দ্বি-দণ্ড বা ষোল ফিট প্রস্থ), হস্তিক্ষেত্রপথ (প্রস্থ—দুই দণ্ড বা ষোল ফিট), সেতুবনপথ (প্রত্যেকের বিস্তৃতি—চারি দণ্ড বা বত্রিশ ফিট), রথপথ (ক্ষুদ্র রথের জন্য

নির্দ্দিষ্ট; বিস্তৃতি—পঞ্চারত্নী বা দশ ফিট), পশুপথ (বিস্তৃতি—চারি অরত্নী বা আট ফিট), মনুষ্যপথ (প্রস্থে—দুই অরত্নী বা চারি ফিট) প্রভৃতি বিভিন্ন পথের পরিচয় অর্থশাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'বিবীতক্ষেত্রপথহিংসা' প্রকরণে এই সকল পথের উল্লেখ আছে। সে স্থলে ঐ সকল পথ রোধ করিলে দণ্ডের ব্যবস্থা বিহিত। এতদ্বিষয়ে কৌটিল্য বলিয়াছেন,—

> "ক্ষুদ্রপশুমনুষ্যপথং রুন্ধতো দ্বাদশপণো দণ্ডঃ। মহাপশুপথং চতুর্ব্বিংশতিপণঃ। হস্তিক্ষেত্রপথং চতুষ্পঞ্চাশৎপণঃ। সেতুবনপথং ষটছতঃ। শ্মশানগ্রামপথং দ্বিশতঃ। দ্রোণমুখপথং পঞ্চশতঃ। স্থানীয়রাষ্ট্রবিবীতপথং সাহস্রঃ। অতিকর্ষণে চৈষাং দণ্ডচতুর্থা দণ্ডাঃ। কর্ষণে পূর্ব্বোক্তাঃ॥"

'কর্ম্মসন্ধি' প্রসঙ্গে কৌটিল্য আরও কয়েকটী পথের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন; যথা,—"তত্রাপি চক্রপাদপথয়োশ্চক্রপথো বিপুলারম্ভত্বাচ্ছ্রেয়ান্ দেশকালসম্ভাবনো বা খরোষ্ট্রপথঃ॥" খরোষ্ট্র-সংজ্ঞক পথ উষ্ট্র ও গর্দ্দভদিগের গতায়াত জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই সকল বিভিন্ন পথের আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, রাজ্য মধ্যে সে সময় বহু পথ নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং সর্ব্বত্র সংবাদ আদান-প্রদানের এবং যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা ছিল।

দুর্গনিবেশ, কর্ম্মসন্ধি, আত্মরক্ষিতক, দূতপ্রণিধি, হীনশক্তিপূরণ প্রভৃতি অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে রাজপথ-সমূহের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা হইতে প্রতিপন্ন হয়, বিভিন্ন নাম-সংজ্ঞায় বিভিন্ন প্রকারের বহু রাজপথ সে সময়ে রাজ্য-মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই সকল পথের নাম নিম্নরূপ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে; যথা,—

বিভিন্ন পথ।

(১) রাজমার্গ—প্রস্থে চারি দণ্ড বা বত্রিশ ফিট। (২) রথ্যা—বৃহৎ রথের গতিবিধির জন্য নির্দ্দিষ্ট, চারি দণ্ড বা বত্রিশ ফিট প্রশস্ত; (৩) রথপথ—ক্ষুদ্র রথের গতিবিধির নিয়োজিত এবং প্রস্থ পঞ্চারত্নী বা দশ ফিট; (৪) পশুপথ—সাধারণ পশুর গতিবিধি সম্পর্কীয়, চারি অরত্নী বা আট ফিট প্রশস্ত; (৫) মহাপশুপথ—বৃহৎ পশুর যাতায়াত বিষয়ক এবং (৬) ক্ষুদ্রপশুপথ; উভয়েরই প্রস্থ দুই অরত্নী বা চারি ফিট হিসাবে। (৭) খরোষ্ট্রপথ। এই সকল পথ এমনই সুকৌশলে প্রস্তুত হইয়াছিল যে, সকল কালে এবং সকল ঋতুতে তাহা ব্যবহৃত হইতে পারিত। তাহাতে কোনও অসুবিধা হইত না। এই সাত প্রকার পথ ব্যতীত আরও কতকগুলি পথ ছিল; যথা,—(৮) চক্রপথ—গো-যানাদি গমনাগমন জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। (৯) পাদপথ এবং (১০) মনুষ্যপথ; এতদুভয়ের বিস্তৃতি দুই অরত্নী হিসাবে। জনসাধারণের গতিবিধির জন্য নিয়োজিত। (১১) অসংপথ। এই সকল পথের মধ্যে চক্রপথ, পাদপথ, অসংপথ, খরোষ্ট্রপথ প্রভৃতি পণ্য সম্বন্ধে বিহিত হইয়াছিল। বাণিজ্য বিষয়ে প্রশস্ত পথের প্রয়োজন। বাণিজ্যের উৎকর্ষসাধনে সেই জন্য ঐ সকল প্রশস্ত রাজপথ নিয়োজিত ছিল। রাজনিয়োজিত এই সকল পথ ব্যতীত বিভিন্ন বিভাগে গমনাগমন জন্য বিভিন্ন নামধেয় আরও কতকগুলি পথের উল্লেখ অর্থশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। 'জনপদ-নিবেশ' প্রসঙ্গে, সেই সকল পথের বিষয়ে অর্থশাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

> "অষ্টশতগ্রাম্যা মধ্যে স্থানীয়ং, চতুশ্শতগ্রাম্যা দ্রোণমুখং,
> দ্বিশতগ্রাম্যা খার্বটিকং দশগ্রামীসংগ্রহেণ সংগ্রহণং স্থাপয়েৎ॥"

আট শত গ্রামের মধ্যে স্থানীয়, চারি শত গ্রামের মধ্যে দ্রোণমুখ, দুই শত গ্রামের মধ্যে সাৰ্বটিক এবং দশ গ্রামের মধ্যে সংগ্রহণ স্থাপনের বিধি কৌটিল্য ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন। দেশ-মধ্যে স্থানীয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া তত্তৎস্থানে গতিবিধির জন্য বিভিন্ন পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। দ্রোণমুখে পৌছিবার পথ—(১২) দ্রোণমুখপথ ; স্থানীয়-গমন-জন্য যে পথ নির্দ্দিষ্ট, তাহা (১৩) স্থানীয়-পথ ; কর্ষণ-ক্ষেত্রে পৌছিবার পথ—(১৪) সয়নীয়-পথ অভিধানে অভিহিত*। সৈনিকাবাসে গমনের জন্য যে পথ নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহা (১৫) ব্যূহপথ। (১৬) শ্মশানপথ—শ্মশানে বা সমাধিস্থানে এবং (১৭) গ্রামপথ—গ্রামের সর্ব্বত্র যাতায়াত জন্য তদ্বিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়াছিল। এই চতুর্ব্বিধ পথের বিস্তৃতি পরিমাণ—আট দণ্ড বা চৌষট্টি ফিট। বনাভিমুখে গমনের জন্য (১৮) বনপথ—চারি দণ্ড বা বত্রিশ ফিট বিস্তৃত; আর হস্তিবাসোপযোগী বনে যাতায়াতের পথ (১৯) হস্তিক্ষেত্রপথ—দুই দণ্ড বা ষোড়শ ফিট আয়ত ছিল। (২০) সেতুবন্ধপথের প্রয়োজনীয়তা—সেতু ও বাঁধ প্রভৃতি স্থানে যাতায়াতের জন্য ; ইহার বিস্তৃতি—চারি দণ্ড বা বত্রিশ ফিট। পূর্ব্বোক্ত বিংশতি প্রকারের বিভিন্ন পথ ভিন্ন দুর্গ-প্রকারাদিতে গমনাগমন জন্য স্বতন্ত্র পথ নির্দ্দিষ্ট ছিল। 'দুর্গবিধান' প্রসঙ্গে সেই সকল পথের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে,—

"রথচর্যাসঞ্চারং তালমূলমুরজকৈঃ কপিশীর্ষকৈশ্চাচিতাগ্রং পৃথুশিলাসহিতং বা শৈলং কারয়েৎ। ন ত্বেব কাষ্ঠময়মগ্নিরবহিতো হি তস্মিন্ বসতি। বিষ্কম্ভচতুরশ্রমট্টালকমুৎসেধসমাবক্ষেপসোপানং কারয়েৎ। ত্রিংশদ্দণ্ডান্তরং চ দ্বয়োরট্টালকয়োর্মধ্যে সহর্ম্ম্যদ্বিতলাং দ্ব্যর্ধায়ামাং প্রতোলীং কারয়েৎ। অট্টালকপ্রতোলীমধ্যে ত্রিধানুষ্কাধিষ্ঠানং সাপিধানচ্ছিদ্রফলকসংহতমিতীন্দ্রকোশং কারয়েৎ। অন্তরেষু দ্বিহস্তবিষ্কম্ভং পার্শ্বে চতুর্গুণায়ামমনুপ্রাকারমষ্টহস্তায়তং দেবপথং কারয়েৎ। দণ্ডান্তরা দ্বিদণ্ডান্তরা বা চার্যাঃ কারয়েৎ।"

অর্থশাস্ত্রের এই বর্ণনা হইতে আরও চারি প্রকার পথের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম—রথচর্য্যাসঞ্চার ; তালমূল হইতে তক্তা প্রস্তুত করিয়া সেই তক্তা দ্বারা অথবা বংশ-খণ্ডে এই পথ নির্ম্মিত। তৎসহ বৃহৎ প্রস্তর সন্নিবিষ্ট থাকিত। রথাদির যাতায়াত জন্য দুর্গস্থানে এইরূপ পথ নির্ম্মিত হয়। দ্বিতীয়—প্রতোলী ; বৃহৎ অট্টালিক'-দ্বয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত পথ। ত্রিংশ দণ্ড অন্তরে যে সকল অট্টালিকা অবস্থিত, এই পথ তাহারই মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। তৃতীয়—দেবপথ ; দেবমন্দিরে গমনাগমন জন্য নির্দ্দিষ্ট। ইহার আয়তন—অষ্টহস্তপরিমিত। এক বা দুই দণ্ড পরিমিত প্রস্থবিশিষ্ট পথ—চার্য্যা অভিধানে অভিহিত। অন্যান্য ক্ষুদ্র পথের মধ্যে স্কন্ধ, উপাধ্ব ও বিশিখা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'বিশিখা' সম্বন্ধে কৌটিল্য বলিয়াছেন,—"বিশিখমধ্যে সৌবর্ণিকং শিল্পবন্তমভিজাতং প্রাত্যয়িকং চ স্থাপয়েৎ।" এইরূপ রাজপথ যে কেবলমাত্র একটী ছিল, তাহা নহে ; রাজ্যের বিভিন্ন নগরে, বিভিন্ন জনপদে এবং বিভিন্ন পণ্যস্থানে বহু-সংখ্যক রাজপথ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং তদ্দ্বারা দেশমধ্যে ত্রিবিধ জনহিতকর বিধিব্যবস্থার প্রবর্ত্তনায় দেশের নানাবিধ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল।

---

* সহর, সহরতলী, নগর ও উপনগর-সমূহে এখন রাস্তাদির নাম নির্দ্দেশ করিবার প্রথা বর্ত্তমান আছে বটে ; কিন্তু দৈর্ঘ্য-বিস্তৃতি-পরিমাণ সম্বন্ধে বাঁধাবাঁধি কোনও নিয়ম নাই। এখন ইচ্ছামত দৈর্ঘ্যবিস্তৃতি নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। প্রাচীনকালে দৈর্ঘ্য-বিস্তার সম্বন্ধে বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল, রাস্তাদির বর্ণনা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

রাজপথে এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্যে নিয়োজিত পথ-সমূহে যাহাতে সকলে অবাধে গতিবিধি করিতে পারে, তাহার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। বিনা-কারণে পথ অবরুদ্ধ করিয়া গমনাগমনে বিঘ্ন উৎপাদন করিলে, বিঘ্নকারীর প্রতি রাজদণ্ড বিহিত হইত। পথ-সমূহের মধ্যে ক্ষুদ্রপশুপথ ও মনুষ্যপথ অবরুদ্ধ করিলে, বার পণ দণ্ড হইত। মহাপশুপথ অবরোধের জন্য চতুর্ব্বিংশতি পণ, হস্তিক্ষেত্রপথে চতুঃপঞ্চাশৎ পণ, সেতুপথ ও বনপথে ছয় শত পণ, শ্মশানপথ ও গ্রামপথ অবরোধে দুই শত পণ, দ্রোণমুখপথে পাঁচ শত পণ, স্থানীয়পথ রাষ্ট্রপথ বিবীতপথ প্রভৃতি অবরোধে সহস্র পণ দণ্ডের বিধান অর্থশাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। ঐ সকল রাজপথে গর্ত্ত খনন করিলেও ঐরূপ দণ্ডের বিধি। পথে গভীর গর্ত্ত খননে কৌটিল্য পূর্ব্বোক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড বিধান করিয়াছেন। "বিবীতক্ষেত্রপথহিংসা" প্রকরণে দণ্ডাদির উল্লেখে অর্থশাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

পথাবরোধে দণ্ড।

"ক্ষুদ্রপশুমনুষ্যপথং রুন্ধতো দ্বাদশপণো দণ্ডঃ। মহাপশুপথং চতুর্ব্বিংশতি-
পণঃ। হস্তিক্ষেত্রপথং চতুষ্পঞ্চাশৎপণঃ। সেতুবনপথং ষট্‌ছতঃ। শ্মশান-
গ্রামপথং দ্বিশতঃ। দ্রোণমুখপথং পঞ্চশতঃ। স্থানীয়রাষ্ট্রবিবীতপথং
সাহস্রঃ। অতিকর্ষণে চৈষাং দণ্ডচতুর্থা দণ্ডাঃ। কর্ষণে পূর্ব্বোক্তাঃ॥"

অর্থশাস্ত্রের বর্ণিত পথাদি এবং তদবরোধে দণ্ডাদির বিষয় অনুধাবন করিলে বুঝা যায়, সে সময় বাণিজ্যাদির বিশেষ প্রসার-প্রতিপত্তি ছিল। যান-বাহনাদির গতাগতি সুনিয়মে পরিচালনার বিশেষ ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছিল। আরও অনুমান হয়, সেই অসংখ্য যান-বাহনাদির এবং মনুষ্য পশু প্রভৃতির নিরাপদ বিধানকল্পে পথ-সমূহে প্রহরীর বন্দোবস্ত ছিল। দণ্ডাদির কল্পনায় প্রহরীর অনুমান এতদ্বিষয়ে স্বাভাবিক। তদভাবে অবরোধকারী নিশ্চয় করা সম্ভবপর নহে। এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, রাজ্যের সর্ব্বত্র গতাগতির জন্য এবং বাণিজ্যাদির সৌকর্য্য বিধানে, বিভিন্ন স্থানে লোকজনের যাতায়াতের সুব্যবস্থায়, আদর্শ বিধি-বিধান-সমূহ ব্যবস্থিত হইয়াছিল।

যান-বাহনাদি-সংক্রান্ত বিধি-ব্যবস্থায়ও সে পরিচয় পাওয়া যায়। এখন যেমন স্থলপথে গতিবিধির জন্য বিভিন্ন প্রকারের যান-বাহনাদি প্রচলিত আছে; প্রাচীন-কালে চাণক্যের ব্যবস্থায়ও তদনুরূপ যান-বাহনাদি প্রবর্ত্তনার আভাষ পাওয়া যায়। অর্থশাস্ত্রের রথাধ্যক্ষ, নাবধ্যক্ষ, গোহধ্যক্ষ, যুদ্ধভূময়ঃ, সন্ধিকর্ম্ম, গণিকাধ্যক্ষ, কোশাভিসংহরণ প্রভৃতিতে সে সকল বিষয়ের উল্লেখ আছে। ঐ সকল অংশের আলোচনায় বুঝা যায়, স্থলপথে ও জলপথে গমনাগমন জন্য বহু যান-বাহন প্রস্তুত হইয়াছিল। স্থলবাহী যানের মধ্যে রথ সর্ব্বপ্রধান। ইহার আকার পরিমাণাদি এবং প্রস্তুত-প্রণালী রথাধ্যক্ষ প্রকরণের লিপিবদ্ধ আছে। সে সময়ে যত প্রকার রথ ব্যবহৃত হইত, সে সকল প্রকারের রথই রথাধ্যক্ষগণের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইবার ব্যবস্থা ছিল। রথের নির্ম্মাণ-প্রণালী ও আকাদির বিষয়ে 'রথাধ্যক্ষ' প্রকরণে কৌটিল্য বলিয়াছেন,—

যানবাহনাদি।

"অশ্বাধ্যক্ষেণ রথাধ্যক্ষো ব্যাখ্যাতঃ। স রথকর্ম্মান্তান্ কারয়েৎ। দশপুরুষো
দ্বাদশান্তরো রথঃ। তস্মাদেকান্তরাবরা আষড়ন্তরাদিতি সপ্তরথাঃ। দেবরথ-
পুষ্পরথসাংগ্রামিকপারিযাণিকপরপুরাভিযানিকবৈনয়িকাংশ্চ রথান্ কারয়েৎ।"

অশ্বাধ্যক্ষের কর্ত্তব্য এবং রথাধ্যক্ষের কর্ত্তব্য একই প্রকার। রথনির্ম্মাণ কার্য্য তত্ত্বাবধান করা রথাধ্যক্ষের প্রধান কার্য্য। রথের মধ্যে উত্তম রথ প্রশস্ত। উহার উচ্চতা ও দৈর্ঘ্য পরিমাণ দশ পুরুষ এবং বিস্তৃতি দ্বাদশ পুরুষ। এতদ্ব্যতীত আরও ছয় প্রকার রথের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাদেরও বিস্তৃতি ছয় পুরুষ হইতে দশ পুরুষ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট। সেই সকল রথের নাম—দেবরথ, পুষ্পরথ, সাংগ্রামিক, পারিযানিক, পরপুরাভিযানিক, বৈনায়িক। এই সকল রথের মধ্যে সাংগ্রামিক এবং পুরপুরাভিযানিক রথ যুদ্ধকালে ব্যবহৃত হইত। অবরোধের সময় পুরপুরাভিযানিক রথের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়। বৈনায়িক রথ—যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষার জন্য শিক্ষাকালে নিয়োজিত ছিল; আর পারিযানিক রথ—ভ্রমণকালে ব্যবহৃত হইত। উৎসবাদির সময়ে পুষ্পরথ, এবং দেবমূর্ত্তির জন্য দেবরথ নির্দ্দিষ্ট ছিল। এতদ্ব্যতীত গো-যান, উষ্ট্রযান প্রভৃতি নানাবিধ যান ব্যবহৃত হইত। 'নাবধ্যক্ষ' প্রসঙ্গে শুল্কাদির উল্লেখে অর্থশাস্ত্রে ঐ সকল যানের বিষয় নিম্নরূপ উল্লিখিত হইয়াছে; যথা,—

"ক্ষুদ্রপশুমনুষ্যশ্চ সভারো মাষকং দদ্যাৎ। শিরোভারঃ কায়ভারো গবাশ্চ চ দ্বৌ। উষ্ট্রমহিষং চতুরঃ। পঞ্চ লঘুযানম্। ষড়্গোলিঙ্গম্ সপ্তশকটম্।"

কৌটিল্যের এতদুক্তি হইতে গো, মহিষ ও উষ্ট্র সংবাহিত যানাদি ব্যতীত আরও ত্রিবিধ যানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা—লঘুযান, গোলিঙ্গ ও শকট অভিধায়ে অভিহিত। 'কোশাভিসংহরণম্' প্রকরণেও শকটের উল্লেখ আছে। "ধান্যরসলোহপণ্যাঃ শকটব্যবহারিণশ্চ ত্রিংশৎকরা।" এস্থলে শকট বোঝাই করিয়া যাহারা ধান্যাদি বহন করিত, তাহাদের শকট প্রতি যে কর গ্রহণ করা হইত, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। রথ, শকটাদি এবং অপরাপর যান-সমূহ উষ্ট্র অশ্ব এবং গো-মহিষাদি দ্বারা সংবাহিত হইবার বিধি। গো-শকটাদি পরিচালক 'চক্রচর' নামে অভিহিত। হীনশক্তিপূরণম্, গোঽধ্যক্ষ, যুদ্ধভূময় প্রভৃতি প্রকরণে উক্ত হইয়াছে,—

"গবাশ্বরথোষ্ট্রাণাং চ ব্রজঃ। যানরথয়োশ্চ।" (হীনশক্তিপূরণম্)।..."কুর্য্যাদ্গবাশ্বব্যায়োগং রথেষশ্বহয়ো নৃপঃ।" (যুদ্ধভূময়ঃ)। খরোষ্ট্রশকটানাং বা গর্ভমল্পগজস্তথা॥...বৎসা বৎসতরা দম্যা বাহিনী বৃষা উক্ষাণশ্চ পুঙ্গবাঃ যুগবাহনশকটবহা বৃষভাসূনা মহিষা পৃষ্ঠস্কন্ধবাহিনশ্চ মহিষাঃ বৎসিকা বৎসতরো পষ্ঠৌহো গর্ভিণী ধেনুশ্চাপ্রজাতা বন্ধ্যাশ্চ গাবো মহিষশ্চমাসদ্বিমাসজাতাস্তাসামুপজা বৎসা বৎসিকাশ্চ। মাসদ্বিমাসজাতানঙ্কয়েৎ।" (গোঽধ্যক্ষ)

এতদ্বর্ণনায় উষ্ট্র, অশ্ব, গজ, গো, মহিষ, গর্দ্দভ প্রভৃতি সংবাহিত যানাদির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। "চক্রচরাণাং বা শকট বাটৈরপগচ্ছেৎ" (সন্ধিকর্ম্ম) চক্রচর বা শকটচালক সেই সকল যানাদি পরিচালন করিত। এতদ্ব্যতীত শিবিকা পীঠিকা প্রভৃতি মনুষ্য-সংবাহিত যান ছিল। 'গণিকাধ্যক্ষ' প্রসঙ্গে অর্থশাস্ত্রে তদ্বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে; যথা,—"সৌভাগ্যালঙ্কারবৃদ্ধ্যা সহস্রেণ বারং কনিষ্ঠং মধ্যমুত্তমং বাহয়ারোপয়েৎ। ছত্রভৃঙ্গারব্যজনশিবিকাপীঠিকারথেষু চ বিশেষার্থম্॥" এই সকল যানাদি ব্যতীত অশ্ব, উষ্ট্র, হস্তী, প্রভৃতিও বাহন রূপে ব্যবহৃত হইত। রাজার যানবাহনাদি সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবার ব্যবস্থা ছিল। হস্তিপৃষ্ঠে গমনকালে রাজনিয়োজিত সম্মার্জ্জক সম্মার্জ্জনী দ্বারা রাজপথ পরিষ্কার করিয়া দিত। হস্তীর বা অশ্বের পদতলে কিছু বিদ্ধ না হয়—এই জন্য সকলেই বিশেষ সতর্ক হইতেন। রাজার

অশ্ব বা হস্তী কাহারও দোষে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, তাহার প্রতি কঠোর দণ্ড বিহিত হইত। রাজদেহ নিরাপদ করিবার এইরূপ বিবিধ প্রয়াস কৌটিল্যের নীতি সমূহে পরিদৃষ্ট হয়।

"মৌলপুরুষাধিষ্ঠিতং যানবাহনমারোহেৎ। নাবং চাপ্তনাধিষ্ঠিতামন্যৈ প্রতিবদ্ধাং বাত-বেগবশাং চ নোপয়েৎ। উদকান্তে সৈন্যমাসীৎ।...নির্যানেঽভিযানে চ রাজমার্গ-মুভয়তঃ কৃতারক্ষং দণ্ডিভিরপাস্তশস্ত্রহস্তপ্রব্রজিতব্যঙ্গং গচ্ছেৎ। ন পুরুষসম্বাধমবগাহেৎ॥"

—আত্মরক্ষিতকম্, ৪৪ম পৃষ্ঠাঃ।

যান-বাহনাদির পরিচালনায় প্রাণিহিংসা না হয়, তৎপক্ষে রাজপুরুষগণের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। মনুষ্যপথ প্রভৃতিতে পদব্রজে গমনাগমনের যেরূপ সুচারু ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছিল; যানবাহনাদি পরিচালনের সুশৃঙ্খলায় তেমনি প্রাণিহিংসা নিবারণের বিশেষ বিধি প্রবর্ত্তিত ছিল। 'অতিচারদণ্ড' বিধানে মহামতি চাণক্য সে পক্ষে দণ্ডের ব্যবস্থা বিহিত করিয়া, যানাদি পরিচালনায় প্রাণিহিংসা-নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার বিধানে দেখা যায়,—

"ছিন্ননস্যমভগ্নযুগং তির্য্যক্প্রতিমুখাগতং প্রত্যাসরদ্বা চক্রযুক্তং যাতপশুমনুষ্যসম্বাধে বা হিংসায়ামদণ্ড্যঃ, অন্যথা যথোক্তং মানুষপ্রাণিহিংসায়াং দণ্ডমভ্যাভবেৎ। অমানুষ-প্রাণিবধে প্রাণিদানং চ॥ বালে যাতরি, যানস্থঃ স্বামী দণ্ড্যঃ; অস্বামিনি যানস্থঃ প্রাপ্তব্যবহারো বা যাতা। বালাধিষ্ঠিতমপুরুষং বা যানং রাজা হরেৎ॥.. শৃঙ্গিণা দংষ্ট্রিণা বা হিংস্যমানমমোক্ষয়তস্স্বামিনঃ পূর্ব্বস্সাহসদণ্ডঃ। প্রতিক্রুষ্টস্য দ্বিগুণঃ। শৃঙ্গিদংষ্ট্রিভ্যামন্যোন্যং ঘাতয়তস্তচ্চ তাবচ্চ দণ্ডঃ। দেবপশুমৃষভমুক্ষাণং গোকুমারীং বা বাহয়তঃ পঞ্চশতো দণ্ডঃ। প্রবাসয়ত উত্তমঃ। লোমদোহবাহনপ্রজননোপকারিণাং ক্ষুদ্রপশূনামাদানে তচ্চ তাবচ্চ দণ্ডঃ; প্রবাসেন চ অন্যত্র দেবপিতৃকার্য্যেভ্যঃ॥"

—অতিচারদণ্ডঃ, ২৩৩ম পৃষ্ঠাঃ।

শৈথিল্য-বশতঃ তির্য্যক্‌ভাবে, ছিন্ন ও ভগ্ন যুগ্ম সহকারে শকট-চালনায় মনুষ্যগতি রোধ করিলে অথবা প্রাণিহিংসা করিলে দণ্ডের বিধি বিহিত হইয়াছে। মানুষ ভিন্ন অন্য প্রাণী বিনষ্ট হইলে অনুরূপ প্রাণী প্রদান করার বিধি। আরোহী বালক হইলে যানস্থ স্বামীর দণ্ড হইবে। অস্বামিক যান হইলে রাজা সে যান-বাহন দণ্ড স্বরূপ গ্রহণ করিবেন। শকটাদি অপহরণকারীর দণ্ডের ব্যবস্থাও অর্থশাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে,—"চক্রযুক্তং নাবং ক্ষুদ্রপশুং বাহপহরত একপাদবধঃ ত্রিশতো বা দণ্ডঃ॥" রাস্তাপথ মেরামত প্রভৃতির বিষয়েও কৌটিল্য উপদেশ দিয়াছেন। অর্থশাস্ত্রের অন্তর্গত 'জনপদনিবেশ' এবং 'মুদ্রাধ্যক্ষ' প্রসঙ্গে রাজার কর্ত্তব্য-নির্দ্দেশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি এতদ্বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি; যথা,—

"পরচক্রাটবীগ্রস্তং ব্যাধিদুর্ভিক্ষপীড়িতম্। দেশং পরিহরেদ্রাজা ব্যয়ক্রীড়াশ্চ বারয়েৎ॥
দণ্ডবিষ্টিকরাবাধৈঃ রক্ষেদুপহতাং কৃষিম্। স্তেনব্যালবিষগ্রাহৈঃ ব্যাধিভিশ্চ পশুব্রজান্॥
বল্লভৈঃ কার্মিকৈস্স্তেনৈরন্তপালৈশ্চ পীড়িতম্। শোধয়েৎ পশুসঙ্ঘৈশ্চ ক্ষীয়মাণং বণিক্‌পথম্॥
এবং দ্রব্যং দ্বিপবনং সেতুবন্ধমথাকরান্। রক্ষেৎপূর্ব্বকৃতান্রাজা নবাংশ্চাভিপ্রবর্ত্তয়েৎ॥"

—জনপদনিবেশঃ, ৪৮ম অধ্যায়ঃ।

শত্রু ও অসভ্য জাতি কর্ত্তৃক যে সকল স্থান সহজে আক্রান্ত হইতে পারে, যেথায় মহামারী

ও দুর্ভিক্ষ প্রায়ই লাগিয়া আছে, সে সকল স্থান আক্রমণে রাজা বিরত থাকিবেন। যে ক্রীড়ায় বহু ব্যয়-বাহুল্য আবশ্যক, রাজা তাহা বারণ করিবেন। কৃষিরক্ষা-কল্পে রাজা দণ্ড, বৃষ্টি ও কর নিবারণের প্রয়াস পাইবেন। চোর, ব্যাঘ্র, সর্পাদি বিষাক্ত প্রাণী এবং পশুরোগ হইতে পশুপথ রক্ষা করিবেন। অন্তপাল সীমান্তরক্ষী, বল্লভ, কার্ম্মিক প্রভৃতি যাহাতে বণিকপথ অব্যবহার্য্য না করে, রাজা তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন এবং পশুসঙ্ঘ কর্ত্তৃক বণিক্‌পথ বিনষ্ট হইলে, তাহা মেরামত করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। এইরূপ ব্যবস্থা-বিধানে দ্বিপবন, গৃহাদি ও খনি-সমূহ রক্ষা করিয়া রাজা নূতন নূতন দ্বিপবন, গৃহাদি ও খনি প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত করিবেন। অপিচ, "মধ্যমবরং বা দুর্গসেতুকর্ম বণিক্‌পথশূন্যনিবেশখনিদ্রব্য-হস্তিবনকর্মোপকারিণং প্রত্যন্তমল্পপ্রাণ বা ন যাচেৎ" (কোষাভিসংহরণম্)। 'মুদ্রাধ্যক্ষ' ব্যবস্থায়েও পথাদি মেরামতের বিধান দৃষ্ট হয়; যথা,—"দ্রব্যহস্তিবনাজীবং বর্ত্তিনীং চৌররক্ষণম্।"

দেশের সর্ব্বত্র যেরূপ রাজপথাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল, তেমনি শ্রান্ত ক্লান্ত পথিকদিগের পথশ্রম নিবারণের জন্য পথের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষসারি রোপিত হইয়াছিল, বিশ্রামাগারসমূহ প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং জলাশয় প্রভৃতি খননের বিধি-ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছিল। শীতাতপে ক্লিষ্ট হইয়া পথিকগণের বিশেষ দুর্দ্দশা ও কষ্ট হয়। খাদ্য-পানীয় অভাবে তাহাদের প্রাণনাশেরও সম্ভাবনা। সুতরাং পথিকগণের সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ-নিবারণের জন্য অর্থশাস্ত্রে রাজার বিশেষ প্রয়াস দেখিতে পাই। রাজ-আদেশ অনুসারে পথের উভয় পার্শ্বে পণ্যপত্তন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষাদি রোপণ, এবং জলাশয় প্রভৃতি খননের বিষয় 'জনপদনিবেশ' প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। যথা,—

পথিকগণের সুবিধা।

"আকরকর্ম্মান্তদ্রব্যহস্তিবনব্রজবণিকপথপ্রচারান্ বারিস্থলপথপণ্যপত্তনানি চ নিবেশয়েৎ। সহোদকমাহার্য্যোদকং বা সেতুং বন্ধয়েৎ। অন্যেষাং বা বধ্নতাং ভূমি-মার্গবৃক্ষোপকরণানুগ্রহং কুর্য্যাৎ। পুণ্যস্থানারামাণাং চ সম্ভূয় সেতুবন্ধাদপ্রক্রামতঃ কর্মকরবলীবর্দাঃ কর্ম কুর্য্যুঃ। ব্যয়কর্ম্মণি চ ভাগী স্যাৎ ন চাংশং লভেত।"

—জনপদনিবেশঃ, ৪৭ম পৃষ্ঠাঃ।

পথিপার্শ্বে হোটেলাদি প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তদ্দ্বারা পথিকগণের খাদ্যাদি সরবরাহ হইত, উপরোক্ত বিবরণ হইতে তাহা উপলব্ধি হয়। আর বুঝা যায়, জনপদ-সমূহে "পুষ্পফলবাটষণ্ড-কেদারমূলবাপাস্‌সেতুঃ (সমাহর্ত্তৃসমুদয়প্রস্থানম্)" প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিতি ছিল এবং পথসমূহে "তুল্যশীলপুংশ্চলীপ্রাপাবিককথাবকাশভোজনদাতৃভি (বাক্যকর্ম্মানুযোগ)" স্থাপিত হইয়া-ছিল। 'মুদ্রাধ্যক্ষ' প্রকরণেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়; যথা,—"কূপসেতুবন্ধোৎসান্ স্থাপয়েৎ, পুষ্পফলবাটাংশ্চ।" কর্ষণ-ক্ষেত্রে গমনের জন্য অর্থশাস্ত্রে সযোনীয় পথের এবং দুর্গাদিতে গতিবিধির উদ্দেশ্যে 'ব্যূহ-পথের' ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে। রাজ্যমধ্যে কৃষি-শিল্পের বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছিল এবং অসংখ্য দুর্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল, এতদ্দ্বারা তাহা উপলব্ধি হয়। কৌটিল্য-প্রবর্ত্তিত নীতি-সমূহ জনহিতসাধনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। তাঁহার নিয়োজিত বিধি-ব্যবস্থা যে অশেষ বহুদর্শিতার ও সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচায়ক, বিবিধ বিধানে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

জলপথ ও জলযানাদি।

[জলপথের প্রসঙ্গ,—জলপথ ব্যবস্থায় সামরিক বিভাগ প্রতিষ্ঠা;—কূলপথ, নদীপথ প্রভৃতি;—জলযানাদির ব্যবস্থা,—সংযাতি, হিংস্রিকা, মহানাব, প্রবহণ, ক্ষুদ্রিকা প্রভৃতি বিভিন্ন জলযান;—কাষ্ঠসঙ্ঘাত, বেণুসঙ্ঘাত, দৃতি, প্লব প্রভৃতি জলযান;—সেতু ও যান পরিচালকগণের উল্লেখ;—নবধ্যক্ষের কর্ত্তব্য;—শুল্ক-গ্রহণের ব্যবস্থা।

স্থলপথে গতিবিধির সুব্যবস্থা যেমন বিবিধ উন্নতির পরিচায়ক, জলপথে গতাগতির সুবন্দোবস্তও তেমনি বিবিধ উৎকর্ষের পরিজ্ঞাপক। বিভিন্ন নামধেয় বহু রাজপথের সমাবেশে রাজধানীর সহিত প্রান্তদেশ পর্য্যন্তের সম্বন্ধ যেমন সুদৃঢ় হইয়াছিল; জলপথে বিভিন্ন যানবাহনাদির সুবন্দোবস্তে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বাণিজ্যের তেমনই উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। দেশের বিভিন্ন অংশের সহিত সম্বন্ধ রক্ষায় রাজনীতিশাস্ত্রে স্থলপথের প্রয়োজনীয়তা যেমন স্বতঃসিদ্ধ, জলপথের উপযোগিতাও তেমনি অবিসংবাদিত। ভারতবর্ষ—নদনদীবহুল। সুতরাং জলপথ ব্যতীত একমাত্র স্থলপথে সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া সম্ভবপর নহে। সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী মহামতি চাণক্য তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন; আর তাহা উপলব্ধি করিয়াই তিনি বিভিন্ন জলপথের এবং জলযানাদির ব্যবস্থা বিহিত করিয়াছিলেন। পরন্তু জলপথের ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের জন্য তিনি স্বতন্ত্র একটী সামরিক বিভাগের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন। জলপথে গমনাগমন ও পণ্য-সরবরাহ অপেক্ষাকৃত সুলভে হইতে পারিত। শুল্কাদির পরিমাণও কম ছিল। কিন্তু জলপথ অপেক্ষা স্থলপথ নিরাপদ বলিয়া কৌটিল্য স্থলপথেরই প্রাধান্য খ্যাপন করিয়াছেন। যথা,—

জলপথ।

"এতেন বণিক্পথো ব্যাখ্যাতঃ। তত্রাপি—'বারিস্থলপথয়োর্বারিপথঃ শ্রেয়ান্, অল্পব্যয়-ব্যায়ামঃ প্রভূতপণ্যোদয়শ্চ'—ইত্যাচার্য্যাঃ। নেতি কৌটিল্যঃ—সংরুদ্ধগতিরসার্ব্বকালিকঃ প্রকৃষ্টভয়যোনির্নিষ্প্রতিকারশ্চ বারিপথঃ; বিপরীতস্স্থলপথঃ। বারিপথে তু কূল-সংযানপথয়োঃ কূলপথঃ পণ্যপট্টণবাহুল্যাচ্ছ্রেয়ান্নদীপথো বা সাতত্যাদ্বিষহ্যাবাধত্বাচ্চ।"

—কর্ম্মসন্ধিঃ, ২৯৮ম পৃষ্ঠাঃ।

এতদ্দ্বারা বণিক্পথের বিষয় বিবৃত হইতেছে। আচার্য্যের মতে বারিপথ ও স্থলপথ এতদুভয়ের মধ্যে বারিপথ শ্রেয়ঃ। কারণ, বারিপথে অল্পব্যয়ে প্রভূত পণ্য সংবাহিত হইতে পারে। কিন্তু কৌটিল্য তাহার বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—বারিপথে নানা বিপদ-আপদের সম্ভাবনা। সকল ঋতুতে জলপথ সুগম নহে। সময় সময় জলগতি রুদ্ধ হইবার বিশেষ আশঙ্কা থাকে এবং বিপদ-আপদের প্রতিকার হওয়াও সম্ভবপর নহে। কিন্তু স্থলপথে সে সকল কোনও আশঙ্কাই নাই। বারিপথের মধ্যে কূলপথ ও সংযানপথ প্রশস্ত। এতদুভয়ের মধ্যে আবার কূলপথই শ্রেষ্ঠ। পণ্যপত্তন প্রভৃতির জন্য নদীপথ অনুপযোগী নহে।"

"তত্রাপি স্থলমৌদকং বেতিঃ? মহতঃ স্থলাদল্পমৌদকং শ্রেয়স্সাতত্যাদবস্থিতত্বাচ্চ ফলানাম্।...বারিস্থলপথভোগয়োরনিত্যো বারিপথভোগো নিত্যস্স্থলপথভোগ ইতি॥"

"অনবসিতসন্ধিঃ" প্রকরণের উল্লিখিত বর্ণনাদ্বয় হইতে দ্বিবিধ জলপথের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম—কূলপথ; দ্বিতীয়—সংযানপথ। কূলপথ—ক্ষুদ্র নদী ও খনিত নালা প্রভৃতি দ্বারা গমনাগমনের পথ। শুল্কাদির সুলভ হারের জন্য পণ্যব্যবসায়িগণ কূলপথই প্রধানতঃ ব্যবহার

করিতেন। সংযানপথ—মহাসমুদ্রাদি দ্বারা বিদেশে গমনাগমনের পথ। মহাসমুদ্র এবং সমুদ্র মধ্যে 'সংযানপথ' বিশেষরূপে চিহ্নিত ছিল। তাহা প্রাচীন ভারতের নৌ-বিভাগ-সংক্রান্ত শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের পরিচায়ক।

অর্থশাস্ত্রকার কেবলমাত্র জলপথের উল্লেখ করিয়াই নিরস্ত হন নাই। জলপথে গমনাগমনের জন্য তিনি যান-বাহনাদির ব্যবস্থাও বিহিত করিয়াছেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন,—'বারিপথ ভয়সঙ্কুল।' তাই সে ভয় নিবারণের জন্য তিনি বিবিধ উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই উপায়-পরম্পরা নির্দ্দেশেই জলযানাদির পরিকল্পনা। যানাদির মধ্যে জাহাজাদি বৃহৎ যান এবং তরণী প্রভৃতি ক্ষুদ্র যানের উল্লেখ অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইতে আরও প্রতিপন্ন হয়, সে সময়ে অতিদূরস্থিত বিদেশের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত ছিল। অর্থশাস্ত্রের অন্তর্গত 'অরুদ্ধবৃত্তমবরুদ্ধে চ বৃত্তিঃ' অংশে 'সার্থযানপাত্রানি' শব্দের আলোচনায় তাহা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। "নাবধ্যক্ষ" ও "আত্মরক্ষিতকম্" পরিচ্ছেদদ্বয়ের আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, সে সময় অষ্টবিধ জলযানের প্রচলন ছিল। আর সেই সকল জলযানের এক একটী এক এক উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইত। নাবধ্যক্ষ প্রভৃতি প্রকরণে জলযানাদি সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রে এক বর্ণনা দৃষ্ট হয়। তৎপ্রসঙ্গে মহামতি কৌটিল্য বলিয়াছেন,—

জলযানাদির ব্যবস্থা।

"সংযাতীর্নাবঃ ক্ষেত্রানুগতাঃ শুল্কং যাচেত। হিংস্রিকা নির্ঘাতয়েৎ। অমিত্রবিষয়াতিগাঃ পণ্যপত্তনচারিত্রোপঘাতিকাশ্চ। শাসকনিয়ামকদাত্ররশ্মিগ্রাহকোৎসেচকাধিষ্ঠিতাশ্চ মহানাবো হেমন্ত-গ্রীষ্মতার্য্যাসু মহানদীষু প্রযোজয়েৎ। ক্ষুদ্রকাঃ ক্ষুদ্রিকাসু বর্ষাস্রাবিণীষু। বদ্ধতীর্থাশ্চৈতাঃ কার্য্যাঃ রাজদ্বিষ্টকারিণাং তরণভয়াৎ। অকালেঽতীর্থে চ তরতঃ পূর্ব্বসাহসদণ্ডঃ কালে তীর্থে চ অনিসৃষ্টতারিণঃ পাদোনসপ্তবিংশতিপণঃ তরাত্যয়ঃ। কৈবর্ত্তকাষ্ঠতৃণভারপুষ্পফলবাটষণ্ডগোপালকানামনত্যয়সম্ভাব্যদূতানুপাতিনাং চ সেনাভাণ্ডপ্রচারপ্রয়োগানাং চ; স্বতরনৈস্তরতাং; বীজভক্তদ্রব্যোপস্করাংশ্চানুপগ্রামাণাং তারয়তাম্।...শঙ্খমুক্তাগ্রাহিণো নৌহাটকান্দদ্যুঃ স্বনৌভির্বা তরেয়ুঃ।"—নাবধ্যক্ষ, ১২৬ম পৃষ্ঠা॥ "মৌলপুরুষাধিষ্ঠিতং যানবাহনমারোহেৎ। নাবং চাপ্তনাবিকাধিষ্ঠিতামন্যনৌপ্রতিবদ্ধাং বাতবেগবশাং চ নোপযেৎ।"—আত্মরক্ষিতকম্, ৪৪ম পৃষ্ঠা॥ প্রবহণনিমিত্তমেকোঽমাত্যঃ সর্বানমাত্যানাবাহয়েৎ; (প্রবহণ—'সামুদ্রিকাঃ ব্যাপারিণঃ মহাসমুদ্রং প্রবহণৈস্তরন্তি' ইতি উত্তরাধ্যয়নসূত্রটীকায়াম্)"—উপধাভিশ্শৌচাশৌচজ্ঞানমমাত্যানাম্, ১৭ম পৃষ্ঠাঃ॥

উদ্ধৃত অংশ হইতে সাত প্রকার জলযানের পরিচয় পাওয়া যায়; যথা—(১) সংযাতীর্নাব; মহাসমুদ্রে গমনাগমনের জলযান। বন্দরে ইহার শুল্ক গ্রহণ করা হইত। (২) হিংস্রিকা—জলদস্যুগণের পোত বা তরণী। সমর-বিভাগ ইহাকে ধ্বংস করিবার আদেশ দিয়াছেন। দৃষ্টিমাত্র ইহার অনুসরণ করিয়া যেখানে সেখানে ধৃত করিতে হইবে। (৩) শত্রু-দেশীয় পোতের নাম—অমিত্রবিষযাতিগ। পণ্যপত্তনের নিয়মাদি লঙ্ঘন করার জন্য ইহাদের প্রতিও ঐরূপ দণ্ডের বিধান ছিল। (৪) মহানাব;—বৃহৎ নদনদী-সমূহে যাতায়াত করিত। সারা বৎসর ইহাদের

গতিবিধি অব্যাহত থাকিত। (৫) ক্ষুদ্রকা নাব—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী সমূহে বিচরণ করিত। শ্রাবণের বর্ষায় ক্ষুদ্র নদনদী-সমূহ প্লাবিত হইলে ইহাদের চলাচল আরম্ভ হইত। রাজার বিশ্বাসী নাবিক পরিচালিত যে যানে রক্ষি-পরিবেষ্টিত হইয়া রাজা আরোহণ করিতেন, সে যান (৬) 'আপ্তনাবিকাধিষ্টিত নৌ' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়াছে। সম্রাটের নিরাপদ জন্য অন্য তরণীর সহিত উহা সম্বন্ধ থাকিত। রাজা যে সময়ে জলযানে আরোহণ করিতেন, সে সময়ে তীরদেশে সৈন্য সুসজ্জিত থাকিবার ব্যবস্থা ছিল। জলবায়ু কর্ত্তৃক বিনষ্ট যানে তিনি কখনও আরোহণ করিতেন না। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েক প্রকার নৌ-যানের পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সমুদ্রগামী (৭) প্রবহণ এবং (৮) 'শঙ্খমুক্তাগ্রাহিণঃ নাবঃ' উল্লেখ করা যায়। শঙ্খ-মুক্তাগ্রাহিণঃ নাবঃ—সমুদ্র মধ্যে মুক্তা-শুক্তি সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত থাকিত। 'নৌহাটক' বা যথারীতি কর প্রদান করিলে, উহা সাধারণের ব্যবহারের জন্যও প্রদান করা হইত।

নদী-পথে গমনাগমন জন্য পূর্ব্বোক্ত যানাদি ব্যতীত আরও কতকগুলি নৌযান ব্যবহৃত হইত। সেগুলির আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। তাহার কতকগুলি ভেলা প্রভৃতি সদৃশ।

বিবিধ জলযান।

বাষ্পীয় পোতাদিতে যেমন জীবনরক্ষার উপযোগী পেটিকা সম্বন্ধ থাকে, কতকগুলি জলযান সেইরূপ আকৃতি-প্রকৃতি-বিশিষ্ট। অর্থশাস্ত্রের 'উপ-নিপাতপ্রতিকার' প্রকরণে সেই সকল জলযানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সেই সকল যানের নাম—কাষ্ঠসঙ্ঘাত, বেণুসঙ্ঘাত, অলাবু, চর্ম্মকরণ্ড, দৃতি, প্লব, গণ্ডিকা, বেণিকা প্রভৃতি। বিভিন্ন উপকরণে পূর্ব্বোক্ত যান নির্ম্মিত হইয়াছিল। কাষ্ঠসমষ্টি একত্রবদ্ধ করিয়া ভেলার ন্যায় যে যান প্রস্তুত হইত, তাহার নাম—কাষ্ঠসঙ্ঘাত; বংশখণ্ডের দ্বারা ঐরূপ প্রস্তুত যান—বেণু-সংঘাত। অলাবু-নির্ম্মিত জলযান—অলাবু আখ্যায়, চর্ম্মপরিবেষ্টিত পেটিকাকার যান চর্ম্মকরণ্ড নামে, কেবলমাত্র চর্ম্মনির্ম্মিত যান চর্ম্মকরণ্ড অভিধানে অভিহিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশীয় ডোঙ্গা বা শালতির আকৃতি-বিশিষ্ট জলযান—প্লব এবং গণ্ডার চর্ম্মে নির্ম্মিত জলযান—গণ্ডিকা নামে অভিহিত হইত। বেত্র দ্বারা বুনাইয়া যে যান প্রস্তুত করা হইত, তাহার নাম—বেণুকা। বেণুকা, গণ্ডিকা, অলাবু, চর্ম্মকরণ্ড প্রভৃতি জলযান অধুনা এতদ্দেশে দৃষ্ট হয় না। প্লব ও বেণুসঙ্ঘাত—কোনও কোনও স্থানে প্রচলিত আছে। কাষ্ঠসঙ্ঘাত—আধুনিক নৌকার আকারে পরিণত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। যাহা হউক, ঐ সকল জল-যান সম্বন্ধে কৌটিল্য নিম্নবিধ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। যথা,—

"বর্ষারাত্রমনুপগ্রামাঃ পূরবেলামুৎসৃজ্য বসেয়ুঃ। কাষ্ঠবেণুনাবশ্চাপগৃহ্নীয়ুঃ। উহ্যমান-মলাবুদৃতিপ্লবগণ্ডিকাবেণিকাভিস্তারয়েয়ুঃ। অনভিসরতাং দ্বাদশপণো দণ্ডঃ অন্যত্র প্লবহীনেভ্যঃ।"—উপনিপাতপ্রতীকারঃ, ২০৬ম পৃঃ॥ "হস্তিস্তম্ভসংক্রমসেতুবন্ধনৈ-কাষ্ঠবেণুসঙ্ঘাতৈঃ, অলাবুচর্ম্মকরণ্ডদৃতিপ্লবগণ্ডিকাবেণিকাভিশ্চোদকানি তারয়েৎ।"

জলযানাদি ভিন্ন অন্য উপায়েও নদী প্রভৃতি উত্তীর্ণ হওয়ার ব্যবস্থা ছিল। তদুদ্দেশ্যে নদীর উপর সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল, নৌ-সেতু ছিল এবং হস্তিদ্বারা সেতু প্রস্তুত করা হইত। যথা,—

নদীপর্ব্বতদুর্গীয়াভ্যাং নদীদুর্গীয়াভূমিলাভঃ শ্রেয়ান্। নদীদুর্গং হি হস্তিস্তম্ভ-সংক্রমসেতুবন্ধনৌভিস্সাধ্যমনিত্যগাম্ভীর্য্যমপস্রাবুদকং চ।"—ভূমিসন্ধিঃ, ২৯২ম পৃষ্ঠাঃ।

"শিবিরমার্গসেতুকূপতীর্থশোধনকর্ম্মস্থায়ুধাবরণোপকরণগ্রাসবহনমায়োধনাচ্চ প্রহরণা-বরণপ্রতিবিদ্ধাপানয়নমিতি বিষ্টিকর্ম্মাণি।"—পথ্যশ্চরথহস্তিকর্ম্মাণি চ, ৩৬৯ম পৃষ্ঠাঃ॥ যানাদি-পরিচালনায় যে লোকজনের আবশ্যক হইত, তাহাদের কেহ শাসক, কেহ নিয়ামক, কেহ দাত্ররশ্মিগ্রাহক, কেহ উৎসেচক প্রভৃতি নামে উক্ত হইয়াছে।* এই সকল কর্ম্মচারী যানাদির গতিবিধির নিয়ামক ছিলেন। 'নাবধ্যক্ষ' প্রকরণে এতৎসম্বন্ধে কৌটিল্য বলিয়াছেন,— "শাসকনিয়ামকদাত্ররশ্মিগ্রাহকোৎসেচকাধিষ্ঠিতাশ্চ।" নৌপথ এবং নৌযানাদির বিষয় আলোচনায়ও শ্রেষ্ঠ রাজনীতি বিষয়ে কৌটিল্যের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। সুশিক্ষিত কর্ম্মচারিগণের দ্বারা জলযান পরিচালিত না হইলে, জলপথে নানা বিপদের সম্ভাবনা। সে বিপদ-নিবারণের অশেষ প্রয়াস অর্থশাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়।

'নাবধ্যক্ষ' প্রকরণে অধ্যক্ষের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ হইয়াছে। নাবধ্যক্ষকে নৌ-বিভাগ-সংক্রান্ত সকল শিক্ষায় বিশেষরূপে শিক্ষা লাভ করিতে হইত, 'নাবধ্যক্ষ' অধ্যায়ের আলোচনায় তাহা বেশ উপলব্ধি হয়। জলযান-নির্ম্মাণ-কার্য্য পরিদর্শন ব্যতীত, তাঁহার আরও কতকগুলি কর্ত্তব্য ছিল। শুল্ক-সংগ্রহ, টোল আদায়, জাহাজ ও নৌক প্রভৃতি বিভিন্ন জলযানের সংস্কার, বৈদেশিকগণের গমনাগমন লক্ষ্য করা এবং সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিগণকে ধৃত করা প্রভৃতিও তাঁহার কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এ সকল কার্য্যের জন্য 'শুল্কাধ্যক্ষ' প্রভৃতি স্বতন্ত্র কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিলেন বটে; কিন্তু তথাপি এরূপ ব্যবস্থায় বুঝা যায়, রাজ্য-শাসন-সংক্রান্ত সকল কার্য্যের দায়িত্ব-ভার প্রায় সকল কর্ম্মচারীকেই বহন করিতে হইত। সুতরাং বিশৃঙ্খলা-ব্যভিচার প্রশ্রয় পাইত না। নাবধ্যক্ষের কর্ত্তব্য বিষয়ে অর্থশাস্ত্রকার যে আদেশ বিহিত করিয়াছেন, তাহার কতকগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

নাবধ্যক্ষের কর্ত্তব্য।

"নাবধ্যক্ষস্সমুদ্রসংযাননদীমুখতরপ্রচারান্ দেবসরোবিসরোনদীতরাংশ্চ স্থানীয়াদিষবেক্ষেত। তদ্বেলাকূলগ্রামাঃ কৢপ্তং দদ্যুঃ। মৎস্যবন্ধকা নৌকহাটকং ষড়্‌ভাগং দদ্যুঃ। পত্তনানুবৃত্তং শুল্কভাগং বাণিজো দদ্যুঃ। যাত্রাবেতনং রাজনৌভিস্‌থস্পতন্তঃ। মুক্তাগ্রাহিণো নৌহাটকান্দদ্যুঃ স্বনৌভির্ব্বা তরেয়ুঃ। অধ্যক্ষশ্চৈষাং খন্যধ্যক্ষেণ ব্যাখ্যাতঃ। শঙ্খপত্তনাধ্যক্ষনিবন্ধং পণ্যপত্তনচারিত্রং নাবধ্যক্ষঃ পালয়েৎ। মূঢ়বাতাহতাং তাং পিতেবানুগৃহ্ণীয়াৎ। উদকপ্রাপ্ত পণ্যমশুল্কমর্দ্ধশুল্কং বা কুর্য্যাৎ। তথা নির্দ্দিষ্টাশ্চৈতাঃ পণ্যপত্তনযাত্রাকালেষু প্রেষয়েৎ। সংযাতীর্নাবঃ ক্ষেত্রানুগতাঃ শুল্কং যাচেত।... ব্রাহ্মণপ্রব্রজিতবালবৃদ্ধব্যধিতশাসনহরগর্ভিণ্যো নাবাধ্যক্ষমুদ্রাভিস্তরেয়ুঃ। কৃতপ্রবেশাঃ পারবিষয়িকাঃ সার্থপ্রমাণা বা বিশেযুঃ।"—নাবধ্যক্ষ, ১২৬ম পৃষ্ঠাঃ॥

নাবধ্যক্ষের কর্ত্তব্য বিষয়ে এইরূপ আরও বিধান অর্থশাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। প্রসঙ্গক্রমে তাহার অধিকাংশ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিষয়ের আলোচনায় প্রদত্ত হইয়াছে। ফলতঃ, পণ্যাধ্যক্ষ,

* আধুনিক ব্যবস্থার সহিত তুলনা করিলে বুঝা যায়,—শাসক 'সারেঙ্গ' পদবাচ্য। নিয়ামক—হালচালনাকারী এবং পরিচালক। দাত্ররশ্মিগ্রাহক—রশ্মি দ্বারা যাহারা পোত আবদ্ধ করে; উৎসেচক—শুখানি প্রভৃতি। কর্ত্তব্য উভয়ত্র এক ছিল কি না, তাহা বলা যায় না। তবে শব্দ-সমূহের আলোচনায় এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

শুল্কাধ্যক্ষ প্রভৃতির কতকগুলি কর্ত্তব্য কার্য্য নাবধ্যক্ষকে সম্পন্ন করিতে হইত। যাহা হউক, উপরি-উদ্ধৃত 'কৃতপ্রবেশাঃ পারবিষয়িকাঃ সার্থপ্রমাণো বা বিশেয়ুঃ' বাক্য হইতে বুঝা যায়, যে সকল বৈদেশিক বণিক বহু বার পণ্যপত্তনে আগমন করিয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে শুল্ক গ্রহণ সম্বন্ধে কৌটিল্য নিষেধাজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যে ভারতীয় বাণিজ্য-প্রবাহে তৎকালে প্লাবিত হইয়াছিল এবং ভারতের বাণিজ্য-প্রসার যে অতি দূর-দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এতদ্দ্বারা তাহা উপলব্ধি হয়। অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন বিধি-নিষেধাদির উল্লেখ দৃষ্টে সে ধারণা বদ্ধমূল হইয়া যায়। তৎকালে সুদূর চীনদেশে ভারতের বাণিজ্য-প্রসার বিস্তৃত হইয়াছিল। * ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও প্রাচীন ভারতের প্রভাব-প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। ফলতঃ, কৌটিল্যের সমসময়ে প্রাচীন ভারত সর্ব্ব-বিষয়েই উন্নতির উচ্চ-চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিল।

শুল্কাদির বিষয় আলোচনা করিলেও বাণিজ্য-প্রসারের পরিচয় পাওয়া যায়। জলপথে এবং স্থলপথে গতিবিধির সুব্যবস্থা সম্বন্ধেও তাহা বিশেষ উৎকর্ষের নিদর্শন। স্থলপথ ও জলপথ উভয় পথে রাজ্য-মধ্যে যে সকল প্রকার পণ্য আমদানি রপ্তানি হইত, শুল্ক-ব্যবহার প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ আছে। আমদানি ও রপ্তানি উভয় কালে শুল্ক-প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। স্বদেশীয় ও বিদেশীয় পণ্যের শুল্ক-পরিমাণ বিভিন্নরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল এবং জলপথে যে পণ্য সংবাহিত হইত, তাহার মাশুলও অল্প ছিল। প্রতারণা পূর্ব্বক শুল্ক-বঞ্চনার চেষ্টা করিলে দণ্ড হইত। কোন্ জিনিষে কি পরিমাণ শুল্ক প্রদান করিতে হইবে, তাহার বিধি-ব্যবস্থায় কৌটিল্য বলিয়াছেন,—

শুল্ক নির্দ্ধারণ।

"শুল্কব্যবহারঃ বাহ্যমাভ্যন্তরং চাতিথ্যম্। নিষ্ক্রাম্যং প্রবেশ্যং চ শুল্কম্। প্রবেশ্যানাং মূল্যপঞ্চভাগঃ। পুষ্পফলশাকমূলকন্দপল্লিক্যবীজশুষ্কমৎস্যমাংসানাং ষড়্ভাগং গৃহ্নীয়াৎ শঙ্খবজ্রমণিমুক্তাপ্রবালহারাণাং তজ্জাতপুরুষৈঃ কারয়েৎ কৃতকর্মপ্রমাণকালবেতনফল-নিষ্পত্তিভিঃ। ক্ষৌমদুকূলক্রিমিতানকঙ্কটহরিতালমনঃশিলাহিঙ্গুলুকলোহবর্ণধাতূনাং চন্দনাগরুকটুককিণ্বাবরণানাং সুরাদন্তাজিনক্ষৌমদুকূলনিকরাস্তরণপ্রাবরণক্রিমিজাতা-নামৈড়কস্য চ দশভাগঃ, পঞ্চদশোভাগো বা। বস্ত্রচতুষ্পদদ্বিপদসূত্রকার্পাসগন্ধভৈষজ্য-কাষ্ঠবেণুবল্কলচর্মমৃদ্ভানাং ধান্যস্নেহক্ষারলবণমদ্যপক্বান্নাদীনাং চ বিংশতিভাগঃ পঞ্চবিং-শতিভাগো বা। দ্বারাদেয়ং শুল্কপঞ্চভাগ আনুগ্রাহিকং বা যথাদেশোপকারং স্থাপয়েৎ।"

প্রদেশজাত বাহ্যিক এবং নগরাভ্যন্তর জাত আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক—এই ত্রিবিধ পণ্যে শুল্ক গ্রহণ করিবে। আমদানি ও রপ্তানি উভয় কালেই শুল্ক গ্রহণ বিহিত। যে সকল পণ্য আমদানি হইবে, তাহার শুল্ক-পরিমাণ—মূল্যের একপঞ্চমাংশ। পুষ্প, ফল, শাক, মূল, কন্দ, পল্লিক, বীজ, শুষ্ক মৎস্য ও মাংস প্রভৃতিতে ষষ্ঠাংশ শুল্ক-গ্রহণের ব্যবস্থা বিহিত ছিল। শঙ্খ, মণি ও মুক্তা সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। ঐ সকল দ্রব্য আহরণ করিতে যে সময়ের

* প্রাচীন ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের আলোচনা প্রসঙ্গে অর্থশাস্ত্রের অন্তর্গত ঔপনিধিকম্, ঋণাদানম্, পণ্যাধ্যক্ষ, নাবধ্যক্ষ, মুদ্রাধ্যক্ষ, একাঙ্গবধনিষ্ক্রয়ঃ, অবরুদ্ধবৃত্তমবরুদ্ধে চ বৃত্তিঃ, বৈদেহকরক্ষণম্, কর্ম্মসন্ধিঃ, কোশ-প্রবেশ্যরত্নপরীক্ষাঃ, দুর্গনিবেশ প্রভৃতি অংশ দ্রষ্টব্য।

আবশ্যক হইয়াছে, যে ব্যয় পড়িয়াছে এবং যে বেতন দিতে হইয়াছে—তাহা হিসাব করিয়া, অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহার শুল্ক নির্দ্ধারণ করিতেন। ক্ষৌম, দুকুল, ক্রিমিতান, কঙ্কট, হরিতাল, মনঃশিলা, হিঙ্গুল, লৌহবর্ণ ধাতু, চন্দন, অগরু, কটুক, কিণ্ব, আবরণ, মদ্য, হস্তি-দন্ত, অজিন, ক্ষৌম, আস্তরণ, প্রাবরণ এবং ক্রিমিজাত অপরাপর দ্রব্যের মূল্যের ষোড়শাংশ শুল্ক গ্রহণের বিধি। কীটজাত দ্রব্য, মেষজাত পশম এবং তদ্বিধ অপরাপর দ্রব্যে দশমাংশ হইতে পঞ্চদশাংশ শুল্ক গ্রহণ করা যাইতে পারিত। এতদ্ব্যতীত, বস্ত্র, দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জন্তু, সূত্র, কার্পাস, গন্ধ, ঔষধ, বেণু, বল্কল, চর্ম্ম, মৃৎপাত্র, শস্য, তৈলাদি স্নেহ-দ্রব্য, ক্ষার, লবণ, মদ্য ও পক্কান্ন প্রভৃতি দ্রব্যজাতে বিংশাংশ হইতে পঞ্চবিংশাংশ পর্য্যন্ত শুল্ক লইবার ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছিল। দ্বারদেশে গৃহীত পণ্যের শুল্ক অন্যান্য পণ্যের শুল্ক অপেক্ষা এক-পঞ্চমাংশ কম। এই সকল ব্যবস্থা ব্যতীত, উৎপত্তি-স্থানে পণ্যাদি ক্রয় করা নিষিদ্ধ ছিল। রাজাদেশ লঙ্ঘন করিলে অর্থদণ্ড হইত। পণ্যাদির শুল্ক ব্যতীত রাজকীয় পারা-পারের স্থানে শুল্ক দিবার ব্যবস্থা ছিল। 'নাবধ্যক্ষ' প্রকরণে তদ্বিষয় উল্লিখিত আছে। সংহিতাদিতেও এইরূপ শুল্কাদির গ্রহণের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। মনু বলিয়াছেন,—

"পণং যানং তরে দাপ্যং পৌরুষার্দ্ধপণং তরে। পাদং পশুশ্চ যোষিচ্চপাদার্দ্ধং রিক্তকঃ পুমান্॥
ভাণ্ডপূর্ণানি যানানি তার্য্যং দাপ্যানি সারতঃ। রিক্তভাণ্ডানি যৎকিঞ্চিৎ পুমাংসশ্চাপরিচ্ছেদাঃ॥
দীর্ঘাধ্বনি যথাদেশং যথাকালং তরো ভবেৎ। নদীতীরেষু যদ্বিদ্যাৎ সমুদ্রে নাস্তি লক্ষণম্॥
গর্ভিণী তু দ্বিমাসাদিস্তথা প্রব্রজিতো মুনিঃ। ব্রাহ্মণা লিঙ্গিনশ্চৈব নদাপ্যাস্তারিকং তরে॥"

শকটাদি পার করিতে হইলে পারের মাশুল এক পণ লাগিবে। একজন পুরুষের বহনযোগ্য ভারে তাহার অর্দ্ধ পণ শুল্ক নাবিককে দিতে হইবে; পশু এবং স্ত্রীলোক পারে চতুর্থাংশ পণ এবং ভারশূন্য মনুষ্য পারে পণের অষ্টম ভাগ শুল্ক প্রদানের বিধি। দ্রব্যরহিতশুণ্য ডোল, ঢাক প্রভৃতি খালিভারে যৎকিঞ্চিৎ মাশুল লাগিবে। নদীমার্গে দূরাদূর যাতায়াত করিতে হইলে নদীর প্রবলতা ও স্থিরতা এবং গ্রীষ্মবর্ষাদি কাল বিবেচনায় তরমূল্য নির্দ্ধারণ করিবে। সমুদ্র সম্বন্ধে সম্ভবমত শুল্কগ্রহণের ব্যবস্থা। গর্ভিণী স্ত্রীলোক, পরিব্রাজক, বাণপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী ও ব্রাহ্মণের পারাপারে তরপণ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ। দ্রব্য-পরিপূর্ণ যান সকল পার করিতে হইলে, দ্রব্যের সারাসার অনুসারে শুল্ক গ্রহণ করিবে। অন্যান্য সংহিতা-গ্রন্থে পণ্য বা শুল্ক পরিমাণ বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। তবে শুল্কাদি গ্রহণের ব্যবস্থা বিহিত ছিল, তাহা সকল সংহিতায়ই দৃষ্ট হয়। যাজ্ঞবল্ক্য এবং বিষ্ণু শুল্ক-প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। নৌ-শুল্কাধ্যক্ষ স্থলজ শুল্ক গ্রহণ করিলে দণ্ডনীয় হইবেন—এইরূপ বিধি মাত্র বিহিত হইয়াছে। যাহা হউক, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে যে সকল প্রকার পণ্য-দ্রব্য উৎপন্ন হইত—বস্ত্র কার্পাস প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। কার্পাস হইতে সূত্র প্রস্তুত হইত, তদ্দ্বারা শিল্পিগণ বিবিধ সূক্ষ্ম ও বহুমূল্য বস্ত্র বয়ন করিতেন, এতদালোচনায় তাহা উপলব্ধি হয়। শিল্পাদি বিষয়ে এবং বাণিজ্যাদিতে প্রাচীন ভারত যে বিশেষ উন্নত ছিল, পৃথিবীর ইতিহাসের পূর্ব্ববর্ত্তী খণ্ড সমূহে তদ্বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। এতৎপ্রসঙ্গে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

জনহিতকর বিবিধ বিধানে আদর্শ।

[জনহিতকর বিবিধ বিধানে রাজ্যের আদর্শ খ্যাপন,—স্বাস্থ্যরক্ষায় আদর্শ,—তদ্বিধানে চিকিৎসার ব্যবস্থা,—ভেষজাগার, সূতিকা-চিকিৎসা, গর্ভব্যাধিসংস্থা প্রভৃতি;—আগুমৃতকপরীক্ষা,—সংক্রামক ব্যাধি নিবারণের বন্দোবস্ত,—মিতাচারিতা সম্পর্কীয় বিবিধ বিধান,—রাজ্য-মধ্যে জনসমূহের স্বাস্থ্যরক্ষা-কল্পে বিবিধ প্রয়াস;—বিষ-পরীক্ষা,—সর্পবিষ প্রতিকার;—জলাদির ব্যবস্থা, আয়শিদারাদি-সংক্রান্ত বিধি-বিধান;—খনি-সংক্রান্ত বিবিধ বিধি,—খনিজ ধাতু-সমূহের উল্লেখ,—তাহাদের আকৃতি বর্ণ প্রভৃতি;—জল-সরবরাহের ব্যবস্থা;—বায়ুবিজ্ঞান, পরিমাণ-বিজ্ঞানাদি বিবিধ ব্যবস্থায় এবং কৃত্রিম নদী নালা প্রভৃতি খননে দেশের বিভিন্ন স্থানে জল-সরবরাহের ব্যবস্থা;—জনহিতকর বিবিধ বিধানে সে রাজ্যের আদর্শ খ্যাপন।]

প্রাচীন ভারতে চিকিৎসা-বিদ্যা।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ চিকিৎসা-বিদ্যায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের অনেকে এ বিষয়ে সন্দিহান। তাঁহারা গ্রীসকে চিকিৎসা বিষয়ে আদিভূত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু কোনও কোনও পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রাচীন ভারতের প্রগাঢ় পারদর্শিতা লক্ষ্য করিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়াছেন। গ্রীসের পুরাতত্ত্বের আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, চিকিৎসা-শাস্ত্রে গ্রীসের অভিজ্ঞতার মূল—এই ভারতবর্ষ। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন,—'পীড়িত গ্রীকগণ পীড়া শান্তির জন্য ব্রাহ্মণদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। ব্রাহ্মণগণ অমানুষিক কৌশলে পীড়া শান্ত করিয়া দিতেন। গ্রীসদেশীয় প্রসিদ্ধ ভৈষজ্যতত্ত্ববিৎ ডিওস্কোরাইডস খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্রাচীন ভারতের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মৌলিকত্ব দর্শনে বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। চিকিৎসা-বিদ্যা-বিশারদ ডাক্তার রয়েল ও ওয়াইজ এবং প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ওয়েবার, এইচ এইচ উইলসন, সার উইলিয়ম হাণ্টার প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ হিন্দুজাতির চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আলোচনায় প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপন করিয়া গিয়াছেন। 'কিংস ইনষ্টিটিউট অব প্রিভেণ্টিভ মেডিসিন' নামক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা-কালে, অতি অল্প-দিন পূর্ব্বে, মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড এম্পথিল' যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, চিকিৎসা-বিজ্ঞানে প্রাচীন ভারতের যে যশঃগৌরব ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন,—তাহাতে চিকিৎসা-বিদ্যায় প্রাচীন ভারতের মৌলিকত্ব বিষয়ে সকল সন্দেহ বিদূরিত হয়। * প্রাচীন গ্রীস, প্রাচীন রোম—সকলেই চিকিৎসা বিষয়ে প্রাচীন ভারতের নিকট ঋণী। পাশ্চাত্য-পণ্ডিত-গণ মুক্তকণ্ঠে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। বাগদাদের কালিফ হারুণ-অল্-রসিদ হিন্দু ভিষক-

---

* পৃথিবীর ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ডে, 'প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চা' প্রসঙ্গে এ সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ঐ অংশের আলোচনায় চিকিৎসা-বিজ্ঞানে প্রাচীন ভারতের অশেষ পারদর্শিতার বিষয় হৃদয়ঙ্গম হইবে। সে প্রসঙ্গে মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড এম্পথিলের বক্তৃতার কিয়দংশ উল্লিখিত আছে। পৃথিবীর ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ডের ২০০ পৃষ্ঠা ও তৎপরবর্ত্তী পৃষ্ঠাসমূহ দ্রষ্টব্য।

গণের বিশেষ সমাদর করিতেন। আরবী ভাষায় লিখিত সরকারী কাগজ পত্রে দেখা যায়,—হারুণ-অল্-রসিদের রাজধানীতে দুই জন হিন্দু ভিষক প্রধান চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে, তাঁহাদের নাম—মানাক ও সালে। তাঁহারা হারুণ-অল্-রসিদের পীড়া শান্ত করিয়া বিশেষ যশস্বী হন এবং খালিফ তাঁহাদিগকে বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এইরূপ, আলোচনা করিয়া দেখিলে প্রতিপন্ন হয়, চিকিৎসা-বিজ্ঞানে প্রাচীন হিন্দুগণই আদি এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশ তদ্বিষয়ে প্রাচীন ভারতের নিকট ঋণী।

হিন্দু-শাস্ত্রে চিকিৎসা-বিজ্ঞান।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, শাস্ত্রগ্রন্থাদির আলোচনায় তাহা সপ্রমাণ হয়। ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া সংহিতা, পুরাণ, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি সর্ব্বত্রই চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন বিদ্যমান। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন হইয়া গেলে, কৃত্রিম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা তাহার স্থান পূরণ করা হইত, ঋগ্বেদে তদ্বিষয় উল্লিখিত আছে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে কীদৃশ পারদর্শিতা লাভ করিলে, এইরূপ গুরু দায়িত্বপূর্ণ অস্ত্র-চিকিৎসায় হস্তক্ষেপ করা যাইতে পারে, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে ষোড়শাধিক শততম সূক্তের পঞ্চদশ ঋকে এই ব্যবচ্ছেদ প্রণালীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। নিম্নে সেই ঋক উদ্ধৃত হইল,—

"চরিত্রং হি বেরিবাচ্ছেদি পর্ণম্ আজা খেলস্য পরিতক্‌ম্যায়াম্।
সদ্যো জংঘ্যামায়সীং বিশপলায়ৈ ধনে হিতে সর্ত্তবে প্রত্যধত্তম্॥"

ঋকের টীকায় টীকাকার সায়ণাচার্য্য যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল; যথা,—

'অগস্ত্য পুরোহিতঃ খেলো নাম রাজা তস্য সম্বন্ধিনী বিশপলানামস্ত্রী, সংগ্রামে শত্রুভিঃ ছিন্নপদা আসীৎ। পুরোহিতেন অগস্ত্যেন স্তুতৌ অশ্বিনৌ রাত্রৌ আগত্য আয়োময়ং পাদং সমধত্তাম্। তদেতদাহ 'আজা'—আজৌ, সংগ্রামে, অগস্ত্য পুরোহিতস্য—খেলস্য রাজ্ঞঃ সম্বন্ধিন্যাঃ বিশপলাখ্যায়া, 'চরিত্রং'—চরণং, 'বেরিব'—বেঃ পক্ষিণঃ, 'পর্ণং' পতত্রম্ ইব, 'অচ্ছেদি হি'—পুরা ছিন্নমভূৎ খলু। হে অশ্বিনৌ! যুবাং অগস্ত্যেন স্তুতৌ সন্তৌ, 'পরিতক্‌ম্যায়াং'—রাত্রৌ, আগত্য, 'সদ্যঃ'—তদানীমেব, 'সর্ত্তবে'—সর্ত্তুং গন্তুম্ ইত্যর্থঃ, বিশপলায়ৈ 'আয়সীং'—লোহময়ীম্, 'জংঘ্যাং' —জংঘোপলক্ষিতং পাদম্, 'প্রত্যধত্তম্'—সন্ধানম্ একীকরণমিত্যর্থঃ কৃতবন্তৌ।"

মহাভারতের আদিপর্ব্বে পরীক্ষিতের সর্পদংশনের বিষয় উল্লিখিত আছে। সর্পদংশন নিবারণ জন্য সেখানে চিকিৎসা-বিদ্যাবিশারদ ভিষক্‌গণের পরিচয় পাওয়া যায়।* আবার ভীষ্মপর্ব্বে দেখিতে পাই,—ভীষ্ম এক সময় যুদ্ধে আহত হইয়াছিলেন। অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ চিকিৎসকের

* পরীক্ষিতের তক্ষক-দংশন কাহিনী বিশেষ প্রসিদ্ধ। তক্ষক-দংশন-নিবারণে অশেষ প্রয়াসও অনেকের পরিজ্ঞাত। তখন বিষ-চিকিৎসায় পারদর্শী ভিষক্‌গণ সর্ব্বদা রাজসন্নিধানে বর্ত্তমান ছিলেন। মহাভারতের ঐ অংশের বর্ণনায় দেখা যায়, বিষসংশোধক সর্ব্বপ্রকার ঔষধ পরীক্ষিতের জীবনরক্ষার্থ সংগৃহীত হইয়াছিল।

"সংমন্ত্র্য মন্ত্রিভিশ্চৈব স তথা মন্ত্রতত্ত্ববিৎ। প্রাসাদং কারয়ামাস একস্তম্ভং সুরক্ষিতং।
রক্ষাং বিদধে তত্র ভিষজশ্চৌষধানি চ। ব্রাহ্মণান্মন্ত্রসিদ্ধাংশ্চ সর্ব্বতো বৈ ন্যবেশয়ৎ॥"

—মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৪২শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

দ্বারা তাঁহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। * মনুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে অস্ত্র-চিকিৎসার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। † মহানীলতন্ত্র, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিতেও হিন্দুগণের চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ে পারদর্শিতার অশেষ নিদর্শন পাওয়া যায়। স্মৃতি-শাস্ত্রাদিতে ভেষজাদির উল্লেখ আছে। সুতরাং প্রতিপন্ন হয়, প্রাচীনকালে হিন্দুগণ চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ও ভৈষজ্য-তত্ত্বে অশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদিতে বর্ণিত অতি প্রাচীনকালের বিষয়-সমূহ পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ-যুগের ইতিহাস আলোচনা করিলে বুঝিতে পারি, সে সময়েও চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ভারতবর্ষ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া ছিল। বৌদ্ধ-গ্রন্থাদিতে ভারতবর্ষে দুইটি বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটী তক্ষশীলায় ও অপরটী কাশী বা বারাণসী ধামে অবস্থিত ছিল। ঐ দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য শাস্ত্র আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা-শাস্ত্রের আলোচনা বিশেষভাবে চলিয়াছিল। 'মহাবগ্‌গ' নামক বৌদ্ধ-গ্রন্থে প্রকাশ—বুদ্ধদেবের অনুচর জীবক চিকিৎসা-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন। তিনি মস্তকের খুলি-সংক্রান্ত অস্ত্র-চিকিৎসায় যশঃ-খ্যাতি লাভ করেন। 'মালবিকাগ্নিমিত্রে' 'বিষবৈদ্যের' বিশেষ প্রশংসা পরিকীর্তিত আছে। ‡ বুদ্ধদেবের সমসময়ে বা তাহার কিছু কাল পূর্ব্বে আত্রেয় তক্ষশিলার বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিলেন। কথিত হয়, জীবক তাঁহার নিকট চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বুদ্ধদেব—খৃষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং ঐ সময়েও ভারতবর্ষ যে চিকিৎসা-বিদ্যায় অতি উচ্চ আসন লাভ করিয়া ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুশ্রুত-সংহিতা—চিকিৎসা-বিদ্যার প্রধান অঙ্গস্থানীয়। কথিত হয়, কাশীর বিশ্ববিদ্যালয়ে কাশীরাজ শিক্ষার্থীদিগকে সুশ্রুত শিক্ষা দিতেন। বৌদ্ধ-

---

* শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের ক্ষত-চিকিৎসার ব্যবস্থা বিষয়ে, মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে, ১২১ম অধ্যায়ে আছে,—

"উপাতিষ্ঠন্নথো বৈদ্যাঃ শল্যোদ্ধরণকোবিদাঃ। সর্ব্বোপকরণৈর্যুক্তাঃ কুশলৈঃ সাধু শিক্ষিতাঃ॥
তান্ দৃষ্ট্বা জাহ্নবীপুত্রঃ প্রোবাচ তনয়ং তব। ধনং দত্ত্বা বিসৃজ্যন্তাং পূজয়িত্বা চিকিৎসকাঃ॥
এবং গতে ময়েদানীং বৈদ্যৈঃ কার্য্যমিহাস্তি কিং। ক্ষত্রধর্ম্মে প্রশস্তাং হি প্রাপ্তোঽস্মি পরমাং গতিং॥
নৈষ ধর্ম্মো মহীপালাঃ শরতল্পগতস্য মে। এভিরেব শরৈশ্চাহং দগ্ধব্যোঽস্মি নরাধিপাঃ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য পুত্রো দুর্য্যোধনস্তব। বৈদ্যান্ বিসর্জ্জয়ামাস পূজয়িত্বা যথার্হতঃ॥

† অর্থ-চিকিৎসা ও মৃত-ব্যবচ্ছেদ সম্বন্ধে মনুসংহিতায় নিষেধাদেশ বিহিত হইয়াছে। মনু-সংহিতার, তৃতীয় অধ্যায়ে (১৫২ম শ্লোক) এবং চতুর্থ অধ্যায়ে (২১২ম শ্লোক) এতদ্বিষয় উল্লিখিত আছে,—

"চিকিৎসকান্দেবলকান্মাংসবিক্রয়িণস্তথা। বিপণেন চ জীবন্তো বর্জ্জ্যাঃ স্যুর্হব্যকব্যয়োঃ॥"
"চিকিৎসকস্য মৃগয়োঃ ক্রূরস্যোচ্ছিষ্টভোজিনঃ। উগ্রান্নং সূতিকান্নং চ পর্য্যাচান্তমনির্দ্দশম্॥"

অস্ত্র-চিকিৎসা নিন্দনীয় হইলেও সে সময়ে যে বিবিধ যন্ত্রাস্ত্রের সাহায্যে ব্যবচ্ছেদাদি চিকিৎসা প্রচলিত ছিল, এতদ্বারা তাহা সপ্রমাণ হয়।

‡ 'মালবিকাগ্নিমিত্রে' এতৎসম্বন্ধে নিম্নরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়; যথা,—

"সহি !—দেবীএ ইমং সিপ্পিসআসাদো আণীদণাগমুদ্দাসণাহং অঙ্গুলীঅঅং সিণিদ্ধং পিজ্জাঅন্তী তুহ উবালম্ভে পড়িদম্হি।"—প্রথম অধ্যায়।

"জয় !—জেদু জেদু ভট্টা। ধুবসিদ্ধী বিসবেজ্জো। উদকুম্ভবিধাণেণ সপ্পমুদ্দিআ কপ্পিদব্বা। তা অন্বেসীঅদু ত্তি।"
"ধারি !—এদং সপ্পমুদ্দঅম্ অঙ্গুলীঅঅম্। পচ্ছা মহ হত্থে পদ্ম।"—চতুর্থ অধ্যায়।

দিগের বিনয়পিটকাদি গ্রন্থেও হিন্দু জাতির চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন-সমূহ বর্ত্তমান রহিয়াছে। চরক, সুশ্রুত, অষ্টাঙ্গহৃদয়, বাগভট প্রভৃতি চিকিৎসা-গ্রন্থ আজিও চিকিৎসা বিষয়ে প্রাচীন হিন্দুজাতির শ্রেষ্ঠ গৌরব ঘোষণা করিতেছে।

বেদাদিতে অতি আদিকালের চিকিৎসাদির বিষয় পরিবর্ণিত। তৎপরবর্ত্তি সূত্র-সংহিতাদির দৃষ্টান্তও অতি প্রাচীন-কালের গৌরব ঘোষণা করে। সে সকল বিষয়ের বিচারে প্রবর্ত্তিত না হইয়া যীশুখৃষ্টের জন্মের কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বের অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি, তখনও চিকিৎসা-বিজ্ঞানে হিন্দুগণ পূর্ব্ব-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থের সহিত চাণক্যের অর্থশাস্ত্রের আলোচনায় এতদ্বিষয়ে দৃঢ় ধারণা বদ্ধমূল হয়। ঐতিহাসিক আরিয়ান বলিয়াছেন,—আলেকজাণ্ডার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন তাঁহার সহিত ভিষক্‌গণ আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু সর্পবিষচিকিৎসায় তাঁহারা কেহই পারদর্শী ছিলেন না। পঞ্জাব প্রদেশ সর্পবহুল। আলেকজাণ্ডারের সৈনিকগণের মধ্যে সর্পদংশনে প্রায়ই মৃত্যু সংঘটিত হইত। সুতরাং বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ভারতীয় বৈদ্যগণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। নিয়ার্কাসের বর্ণনায় প্রকাশ,—বৈদ্যগণের অলৌকিক ক্ষমতা দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, তাঁহাদের নিকট হইতে সর্পবিদ্যা-শিক্ষার জন্য আলেকজাণ্ডার গ্রীক-দেশীয় চিকিৎসকগণের প্রতি আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। মেগাস্থিনীসের বর্ণনায় প্রকাশ,—মহামতি চাণক্যের বিধানে তৎকালে বৈদেশিকগণের চিকিৎসাদির বিশেষ ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত ছিল। এমন কি, তাঁহাদের কাহারও মৃত্যু ঘটিলে এদেশীয়গণই তাঁহাদের সৎকার করিতেন। বিদেশীয়গণের প্রতি সে সময় হিন্দুগণ বিশেষ করুণা প্রদর্শন করিতেন, তাঁহাদের চিকিৎসাদির ও শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এ সকল বিধান প্রাচীন ভারতের মহত্ত্বের নিদর্শন, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, সর্পবিষ প্রতিকারে প্রাচীন ভারত অদ্বিতীয় ছিল, নিয়ার্কাসের বর্ণনা হইতে তাহা বেশ উপলব্ধি হয়। বিশাল রাজ্যের স্বাস্থ্যবিধান উদ্দেশ্যে মহামতি কৌটিল্য যে সকল বিধি-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন, অর্থশাস্ত্রে তাহার উল্লেখ আছে। প্রথমতঃ, ভিষক বা চিকিৎসকের বিষয়। অর্থশাস্ত্রে প্রধানতঃ ভিষক, চিকিৎসক, জাঙ্গলীবিৎ, গর্ভব্যাধি-সংস্থা বা সূতিকাগারচিকিৎসক, পশুচিকিৎসক—এই কয় প্রকার চিকিৎসকের পরিচয় পাই। নাগরক-প্রণিধি, নিশান্তপ্রণিধি, আত্মরক্ষিতক প্রভৃতি অধ্যায়ে চিকিৎসকগণের পরিচয়াদি লিপিবদ্ধ আছে। সে পরিচয়-প্রসঙ্গে অর্থশাস্ত্রের উক্তি নিম্নে প্রদত্ত হইল; যথা,—

অর্থশাস্ত্রে চিকিৎসা-ব্যবস্থা।

"সূতিকাচিকিৎসকপ্রেতপ্রদীপায়নমনাগরককর্তৃব্যপ্রেক্ষাগ্নিনিমিত্তমুদ্রাভিশ্চাগ্রাহ্যা॥"
—নাগরকপ্রণিধিঃ, ১৪৬ম পৃষ্ঠাঃ। "স্ত্রীনিবেশা গর্ভব্যাধিবৈদ্যপ্রখ্যাতসংস্থা। ন
চৈনাঃ কুল্যাঃ পশ্যেয়ুরন্যত্র গর্ভব্যাধিসংস্থাভ্যঃ।"—নিশান্তপ্রণিধিঃ, ৪১ম পৃষ্ঠাঃ।
"তস্মাদস্য জাঙ্গলীবিদো ভিষজশ্চাসন্নাঃ স্যুঃ।"—আত্মরক্ষিতকম্, ৪৩শ পৃষ্ঠাঃ।

সূতিকাচিকিৎসক—ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ; পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই এ বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। ভিষক ও চিকিৎসক—সাধারণ চিকিৎসক এবং জাঙ্গলীবিদ্‌ বিষপরীক্ষায় পারদর্শী ছিলেন। অধুনা যেমন বিশেষ বিশেষ চিকিৎসায় পারদর্শী চিকিৎসকগণ বিশেষ বিশেষ অভিধানে

অভিহিত হন, সে সময়েও বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পারদর্শী চিকিৎসকগণ বিশেষ বিশেষ নাম-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইতেন। 'আত্মরক্ষিতকম্' প্রকরণে যে 'জাঙ্গলীবিৎ' চিকিৎসকের উল্লেখ আছে, বিষপরীক্ষা ও বিষপ্রতিকার সম্বন্ধে পারদর্শিতা-লাভের জন্য তাঁহারা ঐ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। বিষ-পরীক্ষার বিবিধ সঙ্কেত ছিল। জাঙ্গলীবিৎ চিকিৎসকগণ সে সকল অবগত ছিলেন। রাজার খাদ্যাদির সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া কেহ তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা না করে, সেই জন্য জাঙ্গলীবিৎ চিকিৎসকগণ সর্ব্বদা রাজার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। বিষ-পরীক্ষার সঙ্কেতাদি সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রে নিম্নরূপ প্রক্রিয়ার বিষয় উল্লিখিত আছে; যথা,—

"অগ্নের্জ্বালাধূমনীলতা শব্দস্ফোটনং চ বিষযুক্তস্য,—বয়সাং বিপত্তিশ্চ,—অন্নস্যোষ্মা ময়ূরগ্রীবাভঃ শৈত্যং, আশুক্লিষ্টস্যেব বৈবর্ণ্যং সোদকত্বমক্লিন্নত্বং চ,—ব্যঞ্জনানামাশুশুষ্কত্বং চ ক্কাথশ্যামফেনপটলবিচ্ছিন্নভাবো গন্ধস্পর্শরসবধশ্চ,—দ্রবেষু হীনাতিরিক্তছায়াদর্শনং ফেনপটলসীমান্তোর্দ্ধরাজীদর্শনং চ,—রসস্য মধ্যে নীলা রাজী,—পয়সস্তাম্রা,—মদ্যতোয়য়োঃ কালী,—দধ্নঃ শ্যামা চ,—মধুনঃ শ্বেতা,—দ্রব্যাণামার্দ্রাণামাশুপ্রম্লানত্বমুৎপক্কভাবঃ ক্কাথনীলশ্যাবতা চ,—শুষ্কাণামাশুশাতনং বৈবর্ণ্যং চ,—কঠিনানাং মৃদুত্বং মৃদূনাং কঠিনত্বং চ,—তদভ্যাশে ক্ষুদ্রসত্ত্ববধশ্চ,—আস্তরণপ্রাবরাণানাং শ্যামমণ্ডলতা তন্তুরোমপক্ষ্মশাতনং চ,—লোহমণিময়ানাং পাকলোপদেহতা স্নেহরাগগৌরবপ্রভাববর্ণস্পর্শবধশ্চেতি বিষযুক্তলিঙ্গানি।"—আত্মরক্ষিতকম্, ৪৩ম পৃষ্ঠাঃ।

রাজার খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইলে প্রথমে সে খাদ্য অগ্নি-মধ্যে নিক্ষেপ করিবার নিয়ম। তার পর পশু ও পক্ষিগণকে দিয়া রাজা তাহা আহার করিবেন। যদি তাহাতে বিষ-সংযোগ থাকে, তাহা হইলে পক্ষিগণ উহা আহার করিবার পরই মরিয়া যাইবে, আর অগ্নির বর্ণ-বৈচিত্র্য ঘটিবে। বিষ-পরীক্ষা সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রের পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, বিষ-সংযুক্ত দ্রব্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে, অগ্নি ও ধূম নীলবর্ণ ধারণ করিবে, আর তাহা হইতে শব্দ উত্থিত হইবে। অন্নে বিষ মিশ্রিত থাকিলে সদ্যঃপ্রস্তুত অন্নের ধূম ও ময়ূর-কণ্ঠের ন্যায় নীলবর্ণ দেখা যায়, আর সে ধূমে শৈত্য অনুভব হয়। ব্যঞ্জনাদি অস্বাভাবিক বর্ণ ধারণ করে, জলীয় বস্তু শক্ত এবং হঠাৎ শুষ্ক হইয়াছে বলিয়া অনুভূত হয়। তখন অন্নব্যঞ্জনাদি গন্ধহীন ও স্বাদহীন হইয়া পড়ে এবং স্পর্শ দ্বারা তাহা অনুভূত হয় না। বিষ থাকিলে পাকপাত্রের ঔজ্জ্বল্যহানি ঘটে অথবা অধিক ঔজ্জ্বল্য-সম্পন্ন বলিয়া বোধ হয়। বিষ-মিশ্রিত অন্নব্যঞ্জনাদি পরীক্ষা সম্বন্ধে এই বিধি। কিন্তু রসাদি বিষসংযুক্ত হইলে, তাহার পরীক্ষা-প্রণালী অন্য প্রকার। বিষ-মিশ্রিত হইলে রসাদি নীলবর্ণ এবং মদ্য ও জল রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। দধিতে বিষ মিশাইলে উহা কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং মধু শ্বেতবর্ণ ধারণ করে। জলীয় খাদ্য-সমূহে বিষ থাকিলে তাহা অধিকতর সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া প্রতীতি জন্মে। শুষ্ক খাদ্য যখন নরম এবং নরম খাদ্য যখন শুষ্ক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তখনই বুঝিতে হইবে, উহা বিষ-মিশ্রিত। খাদ্যপূর্ণ পাত্রের সন্নিকটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃত জীবাণু দেখিলে এবং আস্তরে ও প্রস্তরে গোলাকার কৃষ্ণবর্ণ দাগ থাকিলে, উহা বিষ-সংসৃষ্ট বলিয়া বুঝিতে হইবে। বিষের সংযোগে মণিময় ও লৌহ পাত্র কলঙ্কিত ও দাগযুক্ত হয়। পাত্রের বর্ণ, পালিশ ও জ্যোতিঃ হীন

হইয়া পড়ে। স্পর্শ করিলে পাত্র অধিকতর কঠিন বলিয়া বোধ হয়। প্রাসাদ অভ্যন্তরে চিকিৎসা-ব্যবস্থার জন্য ধাত্রীবিদ্যা-বিশারদ চিকিৎসক ও ধাত্রীসমূহ নিযুক্ত ছিল, আল-বালসমূহে ভেষজাদি রোপিত হইয়াছিল, সর্পভয় নিবারণ জন্য প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে নানাবিধ সর্পৌষধি উৎপন্ন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রাসাদ-মধ্যে বিষ-পরীক্ষার জন্য ভিষকগণ পূর্ব্বোক্ত প্রণালী-সমূহ অবলম্বন করিতেন। তদ্ব্যতীত বিভিন্ন জাতীয় পক্ষী ও জন্তু থাকিত। তাহারা সর্পের বা বিষের সংস্পর্শে বিভিন্ন সঙ্কেত জ্ঞাপন করিত। সেই সকল পক্ষীর মধ্যে মার্জ্জার, ময়ূর,* ময়না, পারাবত, নকুল, হরিণ, বক, কোকিল, তিতির পক্ষী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ময়না ও পারাবত প্রভৃতি পক্ষী সর্প দেখিলেই উচ্চ চীৎকার করিয়া উঠে। বিষ সংস্পর্শে বক মূর্চ্ছা যায়, কোকিল মৃত্যুমুখে পতিত হয়; এবং বিষের গন্ধে তিতির পক্ষীর চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। 'নিশান্তপ্রণিধি' প্রকরণে অন্তঃপুরের কর্ত্তব্য-বিষয়ে কৌটিল্য যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা হইতে এতদ্বিষয় অবগত হওয়া যায়। যথা,—

"জীবন্তীশ্বেতামুষ্ককপুষ্পবন্দাকাভিরক্ষীপে জাতস্যাশ্বত্থস্য প্রতানেন বা গুপ্তং সর্পা বিষাণি বা ন প্রসহন্তে। মার্জ্জারময়ূরনকুলপৃষতোৎসর্গসর্পান্ ভক্ষয়তি (গাঃসর্পান্ ভক্ষয়ন্তি)। শুকশারিকা ভৃঙ্গরাজো বা সর্পবিষশঙ্কায়াং ক্রোশতি। ক্রৌঞ্চো বিষাভ্যাশে মাদ্যতি। গ্লায়তি জীবংজীবকঃ। ম্রিয়তে মত্তকোকিলঃ। চকোরস্যাক্ষিণী বিরজ্যেতে। ইত্যেবং অগ্নিবিষসর্পেভ্যঃ প্রতিকুর্বীত।"—নিশান্তপ্রণিধিঃ, ৪০ম পৃষ্ঠাঃ॥

সর্পবিষ নিবারণের বিবিধ উপায়-পরম্পরা নির্দ্ধারণ এবং বিষপরীক্ষার প্রণালী সমূহ নির্দ্দেশ যে বিশেষ বহুদর্শিতার পরিচায়ক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে এবং পশুচরিত্র-অধ্যয়নে পারদর্শিতা লাভ না করিলে, এতদ্বিষয়ে সম্যকরূপে জ্ঞান-সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর নহে। মহামতি কৌটিল্যের বিহিত পূর্ব্বোক্ত বিধান সমূহ এবং উপদেশ-পরম্পরা তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের এবং সর্ব্বশাস্ত্রদর্শিতার প্রকৃষ্ট পরিচয়। তাঁহার নীতি-সমূহের আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, খৃষ্ট-জন্মের প্রায় তিন শত পূর্ব্বেও চিকিৎসা-বিদ্যার সকল অঙ্গে প্রাচীন ভারত শ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন ছিল। তখনও সর্ব্ব-বিষয়ে তাহার মহীয়সী মহিমা দর্শন করিয়া জগৎ বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইত।

রোগ-চিকিৎসার জন্য চিকিৎসালয়, হাঁসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; ভেষজাগার, ভেষজ-উদ্যান প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল; আর তৎসমুদায় আবশ্যকীয় ভেষজাদিতে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকিত;—অর্থশাস্ত্রের আলোচনায় তাহা প্রতিপন্ন হয়।

প্রতিকারে বিধান।

এতদ্ব্যতীত সৈনিক বিভাগে স্বতন্ত্র চিকিৎসক ও স্বতন্ত্র ধাত্রী প্রভৃতির ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছিল,—অর্থশাস্ত্র হইতে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। অস্ত্র-চিকিৎসায় চিকিৎসকগণ সে সময় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, অর্থশাস্ত্রোক্ত অস্ত্রাদির নাম দৃষ্টে তাহা উপলব্ধি হয়। অর্থশাস্ত্রের অন্তর্গত দুর্গনিবেশঃ, আত্মরক্ষিতকম্, কূটযুদ্ধবিকল্পাঃ, সীতাধ্যক্ষ প্রভৃতি অংশে চিকিৎসা-সংক্রান্ত বিবিধ উৎকর্ষের পরিচয় দেদীপ্যমান

---

* কামন্দকীয় নীতিসারে আছে,—"ময়ূরপৃষতোৎসর্গে ন ভবন্তি ভুজঙ্গমাঃ।" ময়ূরের বিদ্যমানতা বুঝিলে, সর্প দূরে পলায়ন করে।

হইয়াছে। দুর্গের কোন্ অংশে কোন্ জনপদ প্রতিষ্ঠিত হইবে, সেই সেই অংশে কিরূপ স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা বিহিত হওয়া আবশ্যক, তদালোচনায় 'দুর্গনিবেশ' অংশে ভৈষজাগার প্রতিষ্ঠার পরিচয় আছে। তদ্বিষয়ে কৌটিল্য বলিয়াছেন,—"উত্তরপশ্চিমাং ভাগং পণ্য-ভৈষজ্যগৃহম্'; অর্থাৎ,—দুর্গের উত্তর-পশ্চিম অংশ পণ্যাগার ও ভৈষজ্যাগার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সেই সকল ভৈষজ্যাগার ও পণ্যাগার প্রভৃতি ক্ষয়-ব্যয় অনুসারে নব নব ভেষজে ও নব নব পণ্যসম্ভারে পরিপূর্ণ করিবে। ফলতঃ, একেবারে নিঃশেষিত হইয়া গেলে অভাব অনুভব করিতে না হয়, কৌটিল্যের তাহাই অভিপ্রায়। 'দুর্গনিবেশ' প্রসঙ্গে অন্যান্য ব্যবস্থা বিহিত করিয়া এতৎসম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল,—

"তেষু পুষ্পফলবাটষণ্ডকেদারান্ ধান্যপণ্যনিশ্চয়াংশ্চ অনুজ্ঞাতাঃ কুর্য্যুঃ। দশকুলীবাটং কূপস্থানং সর্পিস্নেহধান্যক্ষারলবণভৈষজ্যশুষ্কশাকযবসবল্লূরতৃণকাষ্ঠলোহচর্ম্মাঙ্গারস্নায়ু-বিষবিষাণবেণুবল্কলসারদারুপ্রহরণাবরণাশ্মনিচয়াননেকবর্ষাপভোগসহান্ কারয়েৎ। নবেনানবং শোধয়েৎ॥"—দুর্গনিবেশঃ, ৫৬ম পৃষ্ঠাঃ॥ "ভিষগ্ভৈষজ্যাগারাদাস্বাদ-বিশুদ্ধমৌষধং গৃহীত্বা পাচকপোষকাভ্যামাত্মনা চ প্রতিস্বাদ্য রাজ্ঞে প্রযচ্ছেৎ।"

—আত্মরক্ষিতকম্, ৪৪ম পৃষ্ঠাঃ॥

আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ সীতাধ্যক্ষ কর্তৃক অথবা ভৈষজ্যবিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিগণের সাহায্যে ভৈষজ্য বপনের বিধি বিধিবদ্ধ হইয়াছে। যে ভূমি উত্তমরূপে অনেক বার কর্ষিত হইয়াছে, সেই ভূমি ভৈষজ্যাদি বপনের উপযোগী। "গন্ধভৈষজ্যোশীরহ্রীবেরপিণ্ডালুকাদীনাং যথাস্বং ভূমিষু চ স্থাল্যাশ্চ অনুপ্যাশ্চৌষধীস্থাপয়েৎ।" ভৈষজ্য বপনের পক্ষে স্থলভূমি প্রশস্ত। যেখানে রৌদ্রবৃষ্টি সমভাবে বর্ষিত হয়, ভেষজ-বপনে সেই ভূমি বিশেষ উপযোগী। এতদ্ব্যতীত রাজকীয় ভূমিতে ভেষজাদি বপনের ব্যবস্থা ছিল। "কূটযুদ্ধবিকল্পাঃ" অংশে অস্ত্রচিকিৎসার এবং সামরিক চিকিৎসকের ও ধাত্রী প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। চিকিৎসকগণ শস্ত্র যন্ত্র, স্নেহ, অগদ, বস্ত্র প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতেন এবং ধাত্রীগণ অন্ন-পানীয় প্রভৃতি সহ তাঁহাদের অনুগামী হইতেন।* "চিকিৎকাঃ শস্ত্রযন্ত্রাগদস্নেহবস্ত্রহস্তাঃ স্ত্রিয়শ্চান্নপানরক্ষিণ্যঃপুরুষাণামুদ্ধর্ষণীয়া পৃষ্ঠতস্তিষ্ঠেয়ুঃ।'—(কূটযুদ্ধবিকল্পাঃ, ৩৬৭ম পৃষ্ঠাঃ॥) রাজার চিকিৎসার ব্যবস্থা অন্যরূপ। রাজা যে ঔষধ সেবন করিতেন, ভিষক প্রথমতঃ তাহা পরীক্ষা করিয়া দিতেন। তৎপরে পাচক তাহার স্বাদ গ্রহণ করিতেন। তাহার পর 'পোষক' তাহা আস্বাদন করিতেন। এইরূপে ঔষধের বিশুদ্ধতা সপ্রমাণ হইলে সে ঔষধ রাজার সেবনের বিধি ছিল। মনুষ্যাদির চিকিৎসা বিষয়ে যেরূপ বিবিধ ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছিল, পশ্বাদির চিকিৎসা এবং ব্যাধি-নির্ণয়েরও বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। ফলতঃ, প্রজাসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতি বিধানে রোগ-নিবারণ-কল্পে সে সময়ে যে বিশেষ আয়োজন চলিয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

---

* এতদংশে বর্ণিত শস্ত্র ও যন্ত্র—অস্ত্রচিকিৎসার ছুরিকা প্রভৃতির ন্যায়। অগদ, স্নেহ প্রভৃতি মালিশ প্রভৃতি এবং বস্ত্র ব্যাণ্ডেজ। চিকিৎসক ও ধাত্রীগণ এই সকল সরঞ্জাম লইয়া সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধকালে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতেন। সৈন্যগণের চিকিৎসাদির জন্য যাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতেন, তাঁহারা সামরিক চিকিৎসক (Army Surgeon) বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন।

রাজ্যের স্বাস্থ্যোন্নতির এবং প্রজা-সাধারণের রোগ-নিবারণ-কল্পে বিবিধ সুব্যবস্থা আদর্শ রাজ্যের এক শ্রেষ্ঠ আদর্শ। চিকিৎসকের চিকিৎসা-সংক্রান্ত বিবিধ বিধির প্রবর্ত্তনায় সে আদর্শ পূর্ণ প্রকটিত। রোগ-প্রতিকারে অবহেলা করিলে সে সময় চিকিৎসকের দণ্ড হইত। অচিকিৎসায় বা কুচিকিৎসায় প্রাণহানি ঘটিলে চিকিৎসক তাহার জবাবদিহি করিতেন। সংক্রামক ব্যাধির বিষয় রাজার গোচর করিবার বিধি ছিল। সে বিধির অবহেলায় চিকিৎসকগণ বিবিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইতেন। প্রাণনাশে বহুদর্শিতা-লাভ সে সুদূর অতীতকালে বিশেষ দণ্ডনীয় অপরাধ মধ্যে পরিগণিত হইত। চিকিৎসকগণও তাই রোগ-চিকিৎসায় কোনও শৈথিল্য বা অবহেলা প্রকাশ করিতে পারিতেন না। সে সময়ে চিকিৎসা-বিভাগ—রাজকীয় বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং রাজবিধি অনুসারে ঐ বিভাগের কার্য্য-প্রণালী তত্ত্বাবধান করা হইত। সে সময়ে রোগের পরিচয়, চিকিৎসার বিবরণ এবং রোগীর নাম-ধাম-সম্বলিত তালিকা রাজকীয় কার্য্যালয়ে দাখিল করিবার নিয়ম ছিল। সুতরাং চিকিৎসা-সংক্রান্ত সকল ত্রুটির বিষয় রাজা জানিতে পারিতেন এবং অপরাধের তারতম্য অনুসারে ত্রুটি-বিচ্যুতির দণ্ড বিধান করিতেন।

চিকিৎসকের দণ্ড-ব্যবস্থা।

"ভিষজঃ প্রাণাবাধিকমনাখ্যায়োপক্রমমানস্য বিপত্তৌ পূর্ব্বসাহসদণ্ডঃ। কর্ম্মাপরোধেন বিপত্তৌ মধ্যমঃ কর্ম্মবধবৈগুণ্যকরণে দণ্ডপারুষ্যং বিদ্যাৎ।"—কারুকরক্ষণম, ২০২ম পৃষ্ঠাঃ॥

"চিকিৎসকঃ প্রচ্ছন্নব্রণপ্রতীকারকারয়িতাপরমপথ্যকারিণং চ গৃহস্বামী চ নিবেদ্য গোপস্থা নিবেদ্য গোপস্থানিকয়োর্মুচ্যেতান্যথা তুল্যদোষস্স্যাৎ।"—নাগরকপ্রণিধি, ১৪৪ম পৃষ্ঠাঃ॥

চিকিৎসা-শৈথিল্যে রোগীর রোগ বৃদ্ধি হইলেও চিকিৎসকের দণ্ড হইত। * ভেষজাদিতে ভেজাল মিশ্রিত করিলে যে দণ্ডের বিধান ছিল,—ভেজাল-প্রসঙ্গে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। অর্থশাস্ত্রে, "বৈদেহকরক্ষণন্" প্রসঙ্গে, কৌটিল্য সে বিধি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। বহু জনাকীর্ণ নগরাদিতে স্বাস্থ্য-রক্ষার যে সকল প্রয়াসের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাও কম কৃতিত্বের নিদর্শন নহে। মহামারী নিবারণের উপায়-পরম্পরা নির্দ্ধারণ-প্রণালীও বিশেষ প্রশংসনীয়। নগর-সহরাদির রাজপথে জল জমিলে, কর্ম্মচারীদিগের দণ্ড হইত। মন্দির, প্রাসাদ, তীর্থস্থান, জলাশয় প্রভৃতিতে স্বাস্থ্যহানিকর কোনও কার্য্য করিলে দণ্ডের বিধান ছিল। নগরের মধ্যে মৃতদেহ বা অন্য কোনও প্রাণীর অস্থি-কঙ্কালাদি পতিত থাকিলে, রাজা তাহার দণ্ড বিধান করিতেন। মৃতদেহ সংবাহিত হইবার নির্দ্দিষ্ট

---

* চিকিৎসকের শৈথিল্য-বশতঃ রোগীর পীড়া বৃদ্ধি হইলে অথবা তাহার মৃত্যু হইলে চিকিৎসকগণ গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইতেন। সংহিতা-শাস্ত্রে তদ্বিষয়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এতৎপ্রসঙ্গে মনু বলিয়াছেন,—

"চিকিৎসকানাং সর্ব্বেষাং মিথ্যাপ্রচরতাং দমঃ। অমানুষেষু প্রথমো মানুষেষু তু মধ্যমঃ॥

চিকিৎসকেরা মিথ্যা চিকিৎসা করিলে পশুচিকিৎসা সম্বন্ধে তাহার 'প্রথম সাহস' এবং মনুষ্য-চিকিৎসা বিষয়ে 'মধ্যম সাহস' দণ্ডের বিধি মনু বিহিত করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্যের মতেও এই দণ্ডের বিধান বিহিত। তিনি বলিয়াছেন,—চিকিৎসক পশুদিগকে মিথ্যা চিকিৎসা করিলে প্রথম সাহস, মনুষ্যকে মিথ্যা চিকিৎসা করিলে মধ্যম সাহস এবং রাজপুরুষকে মিথ্যা চিকিৎসা করিলে উত্তম সাহস দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। যথা,—

"ভিষঙ্মিথ্যাচরন্ দাপ্যস্তির্য্যক্ষু প্রথমং দমম্। মানুষে মধ্যমং রাজমানুষেষূত্তমং দমম্॥"

'শ্মশানপথ' ছিল। তদ্ব্যতীত অন্য রাস্তা দিয়া উহা লইবার বিধি ছিল না। শ্মশানপথ ভিন্ন অন্য পথে মৃতদেহ সংবাহিত হইলে, দণ্ড ভোগ করিতে হইত; আর, নির্দ্দিষ্ট সমাধি-স্থান অতিক্রম করিয়া অন্য স্থানে মৃতদেহ সমাধিস্থ করিলে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম-ভঙ্গের অপরাধে রাজা দণ্ড-বিধান করিতেন। মহামারী উপস্থিত হইলে তাহার প্রতিকার বিধানে বিবিধ প্রয়াস চলিত। চিকিৎসকগণ তৎপ্রদেশে ঔষধ বিতরণের জন্য নিযুক্ত হইতেন, আর পুরোহিতগণ দেবদেবীর আরাধনায় নিরত থাকিতেন। অর্থশাস্ত্রের অন্তর্গত 'নাগরক-প্রণিধি' ও 'উপনিপাতপ্রতিকার' অংশদ্বয় হইতে এতদ্বিষয়ক নীতি-সমূহ উদ্ধৃত হইল; যথা,—

"পাংসুন্যাসে রথ্যায়ামষ্টভাগো দণ্ডঃ। পঙ্কোদকসন্নিরোধে পাদাঃ। রাজমার্গে দ্বিগুণঃ। পুণ্যস্থানোদকস্থানদেবগৃহরাজপরিগ্রহেষুপণোত্তরাবিষ্ঠাদণ্ডাঃ। মূত্রেষ্বর্ধদণ্ডাঃ। ভৈষজ্যব্যাধিভয়নিমিত্তমদণ্ড্যাঃ। মার্জ্জারশ্বনকুলসর্পপ্রেতানাং নগরস্যান্তরুৎসর্গে ত্রিপণো দণ্ডঃ। খরোষ্ট্রাশ্বতরাশ্বপশুপ্রেতানাং ষট্পণঃ। মনুষ্যপ্রেতানাং পঞ্চাশৎপণঃ। মার্গ-বিপর্যাসে শবদ্বারাচ্ছনয়তশ্ শবনির্ণয়নে পূর্ব্বসাহসদণ্ডঃ। দ্বাস্থানাং দ্বিশতম্। শ্মশা-নাদন্যত্র ন্যাসে দহনে চ দ্বাদশপণো দণ্ডঃ।'—নাগরকপ্রণিধিঃ, ১৪৫ম পৃষ্ঠাঃ।

"ব্যাধিভয়মৌপনিষদিকৈঃ প্রতীকারৈঃ প্রতিকুর্য্যুঃ। ঔষধৈশ্চিকিৎসকাঃ, শান্তিপ্রায়-শ্চিত্তৈর্ব্বা সিদ্ধতাপসাঃ। তেন মরকো ব্যাখ্যাতঃ। তীর্থাভিষেচনং মহাকচ্ছবর্ধনং গবাং শ্মশানাবদোহনং কবন্ধদহনং দেবরাত্রিং চ কারয়েৎ। পশুব্যাধিমরকে স্থানান্যর্থ-নীরাজনং স্বদৈবতপূজনং চ কারয়েৎ। দুর্ভিক্ষে রাজা বীজভক্তোপগৃহং কৃত্বানুগ্রহং কুর্য্যাৎ। দুর্গতকর্ম বা ভক্তানুগ্রহেণ ভক্তসংবিভাগং বা দেশনিক্ষেপং বা।"
—উপনিপাতপ্রতিকারঃ, ২০৬ম—২০৭ম পৃষ্ঠাঃ॥

সহর-সংক্রান্ত অর্থশাস্ত্রের এই সকল বিধান কতকাংশে আধুনিক মিউনিসিপাল ব্যবস্থার অনুরূপ বলিয়া বুঝা যায়। দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য যত প্রকার উপায় অবলম্বন আবশ্যক, সে সময়ে তাহার সকলই উদ্ভাবিত ও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি সহজে ও অল্প সময়ে নিবারিত হওয়ায় লোকে শান্তিসুখে কালযাপন করিত।

মৃতপরীক্ষা, শব-ব্যবচ্ছেদ—চিকিৎসা-শাস্ত্রের একটী প্রধান অঙ্গ। অর্থশাস্ত্রের আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়,—প্রাচীন ভারতে শবব্যবচ্ছেদের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। তদুদ্দেশ্যে সাধনে বিবিধ অস্ত্র-যন্ত্রাদির পরিচয় অর্থশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। অর্থশাস্ত্রের 'কূটযুদ্ধবিকল্পাঃ' অংশে যে শস্ত্রের ও যন্ত্রের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, শবব্যবচ্ছেদে এবং অস্ত্র-চিকিৎসায় সেই সকল শস্ত্র ও যন্ত্র ব্যবহৃত হইত। 'আশুমৃতকপরীক্ষা'—শবব্যবচ্ছেদ এবং মৃতপরীক্ষা সম্বন্ধে নিয়োজিত হইয়াছে। ঐ অংশের আলোচনায় বুঝা যায়, তৎকালে মৃতপরীক্ষার ও শবব্যবচ্ছেদের জন্য 'মরগ' বা মৃতপরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজ্যের প্রতি নগরে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। সন্দেহজনক মৃত্যুজনিত শব সেখানে পরীক্ষা করা হইত। উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিলে বা জলে ডুবিয়া মরিলে সে শব ব্যবচ্ছেদাগারে সংবাহিত হইবার বিধি ছিল; শ্বাস-প্রশ্বাস-রোধে যত প্রকার মৃত্যু সংঘটিত হইতে পারে, সকল স্থলেই শবদেহ পরীক্ষার

মৃত-পরীক্ষা।

জন্য পরীক্ষাগারে আনা হইত। পচনাদি নিবারণ জন্য শবদেহ তৈলে বা তৈলময় পদার্থে সিক্ত করিবার বিধি অর্থশাস্ত্রে বিধিবদ্ধ আছে। বিষভক্ষণে যাহারা প্রাণত্যাগ করিত, এবং যাহারা আত্মহত্যা করিয়া মরিত, তাহাদের মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদাগারে আনিবার বিধি ছিল। শবদেহ উপস্থিত হইলেই চিকিৎসকগণ তাহা পরীক্ষা করিতেন। বিভিন্ন প্রকার মৃত্যুর বিভিন্নরূপ লক্ষণ-সমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহারা মৃত্যুর কারণ নির্দ্দেশ করিবার প্রয়াস পাইতেন। শবপরীক্ষায় অবৈধউপায়-জনিত মৃত্যুর বিষয় সপ্রমাণ হইলে, তাহা বিচার আমলে আসিত। শবপরীক্ষা বিষয়ক এবং মৃত্যুর কারণ নির্দ্ধারণ সংক্রান্ত কৌটিল্যের বিধি, অর্থশাস্ত্রের 'আশুমৃতকপরীক্ষা" প্রকরণ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল; যথা,—

"তৈলাভ্যক্তমাশুমৃতকং পরীক্ষেত—নিষ্কীর্ণমূত্রপুরীষং বাতপূর্ণকোষ্ঠত্বকং শূণপাদপাণিমুন্মীলিতাক্ষং সব্যঞ্জনকণ্ঠং পীড়নানিরুদ্ধোচ্ছ্বাসহতং বিদ্যাৎ॥ তমেব সঙ্কুচিতবাহুসক্থিমুদ্বন্ধহতং বিদ্যাৎ॥ শূনপাণিপাদোদরমপগতাক্ষমুদ্বৃত্তনাভিমবরোপিতং বিদ্যাৎ॥ নিস্তব্ধগুদাক্ষং সন্দষ্টজিহ্বমাধ্মাতোদরমুদকহতং বিদ্যাৎ॥ শোণিতানুসিক্তং ভগ্নভিন্নগাত্রং কাষ্ঠৈ রশ্মিভির্ব্বা হতং বিদ্যাৎ॥ সম্ভগ্নস্ফুটিতগাত্রং বিক্ষিপ্তং বিদ্যাৎ॥ শ্যাবপাণিপাদদন্তনখং শিথিলমাংসরোমচর্ম্মাণং ফেনোপদিগ্ধমুখং বিষহতং বিদ্যাৎ॥ তমেব সশোণিতদংশং সর্পকীটহতং বিদ্যাৎ॥ বিক্ষিপ্তবস্ত্রগাত্রমতিবান্তবিরিক্তং মদনযোগহতং বিদ্যাৎ॥ অতোঽন্যতমেন কারণেন হতং হত্বা বা দণ্ডভয়াদুদ্বন্ধনিকৃত্তকণ্ঠং বিদ্যাৎ॥ বিষহতস্য ভোজনশেষং পয়োভিঃ পরীক্ষেত। হৃদয়াদুদ্ধৃত্যাগ্নৌ প্রক্ষিপ্তং চিটচিটায়দিন্দ্রধনুর্ব্বর্ণং বা বিষযুক্তং বিদ্যাৎ॥ দগ্ধস্য হৃদয়মদগ্ধং দৃষ্ট্বা বা তস্য পরিচারকজনং বা দণ্ডপারুষ্যাদতিমার্গেত॥ দুঃখোপহতমন্যপ্রসক্তং বা স্ত্রীজনং দায়নিবৃত্তিস্ত্রীজনাভিমন্তারং বা বন্ধুম্। তদেব হতোদ্বন্ধস্য পরীক্ষেত। স্বয়মুদ্বন্ধস্য বা বিপ্রকারমযুক্তং মার্গেত। সর্ব্বেষাং বা স্ত্রীদায়াদ্যদোষঃ, কর্ম্মস্পর্দ্ধা প্রতিপক্ষদ্বেষঃ পণ্যসংস্থা সমবায়ো বা বিবাদপদানামন্যতমদ্বা রোষস্থানং; রোষনিমিত্তো ঘাতঃ॥ স্বয়মাদিষ্টপুরুষৈর্ব্বা চোরৈরর্থনিমিত্তং সাদৃশ্যাদন্যবৈরিভির্ব্বা হতস্য ঘাতমাসন্নেভ্যঃ পরীক্ষেত যেনাহূতঃ সহস্থিতঃ প্রস্থিতো হতভূমিমানীতো বা, তমনুযুঞ্জীত। যে চাস্য হতভূমাবাসন্নচরাস্তানেকৈকশঃ পৃচ্ছেৎ 'কেনায়মিহানীতো বা কঃ সশস্ত্রঃ সঙ্গূহমানঃ উদ্বিগ্নো বা যুষ্মাভির্দৃষ্টঃ ইতি তে যথা ব্রূয়ুস্তথাঽনুযুঞ্জীত॥"—চতুর্থ খণ্ড, সপ্তম অধ্যায়, আশুমৃতকপরীক্ষাঃ, ২১৫ম—২১৭ম পৃষ্ঠাঃ।

রোগ-নিবারণ-কল্পে স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থায় যে প্রকৃষ্ট আদর্শের পরিচয় পাই, দুর্ভিক্ষ ও বন্যাদি নিবারণ কল্পে বিবিধ বিধির প্রবর্ত্তনায়ও সে আদর্শ দেদীপ্যমান। দুর্ভিক্ষ দূরীকরণে রাজপুরুষদিগের যেরূপ কতকগুলি কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, রাজার প্রতিও তেমনি কতকগুলি কর্ত্তব্য সম্পাদনের আদেশ বিহিত হইয়াছিল। রাজকীয় কোষাগারে রাজস্বের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার শস্য সঞ্চিত হইত। কৌটিল্য বিহিত করিয়াছিলেন যে, সেই সকল শস্যের অর্দ্ধাংশ দুর্ভিক্ষ-নিবারণ কল্পে ব্যয়িত হইবে। রাজকোষে অর্থসঞ্চয়েও ঐরূপ ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষের সময় শস্যাদির বীজ পর্য্যন্ত মিলিত না। প্রচুর শস্যোৎপাদন জন্য রাজা আপন কোষাগার

দুর্ভিক্ষ নিবারণে।

হইতে শস্যবীজ সরবরাহ করিতেন। কোনও প্রদেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, তৎপ্রদেশে রাজ-আদেশে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগের সাহায্যের ব্যবস্থা হইত। পীড়িতগণের কেহ মজুরাদির কার্য্যে নিযুক্ত হইত, কাহাকেও বা বিনা-পরিশ্রমে সাহায্য দিবার ব্যবস্থা ছিল। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিগণকে কখনও কখনও ভিন্নদেশে লইয়া যাইবারও বন্দোবস্ত হইত। অবস্থা-বিশেষে রাজা মিত্ররাজগণের সাহায্য গ্রহণ করিতেন, সম্পন্ন গৃহস্থগণের নিকট হইতেও সাহায্য লওয়া হইত। এতদ্ব্যতীত সমুদ্র বা নদী তীরে নূতন বসতি স্থাপন করাইয়া রাজা তথায় শস্যোৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন; কিংবা বহুশস্যপূর্ণ জনপদে দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগকে স্থানান্তরিত করা হইত। দুর্ভিক্ষ নিবারণ-কল্পে যেরূপ বিবিধ উপায় অবলম্বন করা হইত, জলপ্লাবন হইতে জনসাধারণের রক্ষণোপযোগী সেইরূপ উপায়-পরম্পরা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। নদীতীরে যাহারা বাস করিত, জলপ্লাবনের সম্ভাবনা বুঝিয়া তাহাদিগকে পূর্ব্ব হইতে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইত। রাজাদেশে তাহারা জলপ্লাবনের পূর্ব্বেই নদী-তীর পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ ভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিত। যাহাদের নৌ-যানাদি ছিল, আকস্মিক বিপদে সহায়তার জন্য রাজা তাহাদের প্রতি আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। অর্থশাস্ত্রের অন্তর্গত 'কোষ্ঠাগারাধ্যক্ষ' এবং 'উপনিপাতপ্রতিকার' প্রসঙ্গে কৌটিল্য সে সকল বিধি বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে তাহার কতকগুলি প্রদান করা হইল; যথা,—

"বিক্ষেপব্যাধিতান্তরারম্ভশেষং চ ব্যয়প্রত্যায়ঃ।"—কোষ্ঠাগারাধ্যক্ষঃ, ৯৪ম পৃষ্ঠাঃ॥ "দুর্ভিক্ষে রাজা বীজভক্তোপগ্রহং কৃত্বাঽনুগ্রহং কুর্য্যাৎ। দুর্গতকর্ম্ম বা ভক্তানুগ্রহেণ ভক্তসংবিভাগং বা দেশনিক্ষেপং বা। মিত্রাণি বা ব্যপাশ্রয়েৎ। কর্শনং বমনং বা কুর্য্যাৎ। নিষ্পন্নসস্যমন্যবিষয়ং বা সজনপদো যায়াৎ। সমুদ্রসরস্তটাকানি বা সং-শ্রয়েৎ। ধান্যশাকমূলফলাবাপান্ সেতুষু কুর্বীত। মৃগপশুপক্ষিব্যালমৎস্যারম্ভান্ বা।"—উপনিপাতপ্রতীকারঃ, ২০৭ম পৃষ্ঠা।..."বর্ষারাত্রমনুপগ্রামাঃ পূরবেলামুৎ-সৃজ্য বসেয়ুঃ। কাষ্ঠবেণুনাবশ্চাপগৃহ্ণীয়ুঃ।"—উপনিপাতপ্রতিকারঃ, ২০৬ম পৃষ্ঠাঃ॥

কীটপতঙ্গমূষিকাদির উপদ্রব নিবারণেরও ব্যবস্থা হইয়াছিল। মূষিকের উপদ্রব নিবারণে মার্জ্জার ও নকুল রক্ষার বিধি—"মূষিকভয়ে মার্জারনকুলোৎসর্জঃ"—(উপনিপাতপ্রতিকারঃ, ২০৭ম পৃষ্ঠা)। মূষিকাদির উপদ্রব নিবারণে যে ব্যবস্থা বিহিত, কীট-পতঙ্গাদি সম্বন্ধেও সেই বিধি বিধিবদ্ধ আছে। ব্যাঘ্র-ভয়-নিবারণে বিষ প্রয়োগের ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে; যথা,—"লুব্ধকাঃ শ্বগণিনো বা কূটপঞ্জরাবপাতৈশ্চরেয়ুঃ। আবরণিনঃ শস্ত্রপাণয়োব্যালানভিহন্যুঃ। অনভিসর্তুর্দ্বাদশপণো দণ্ডঃ। স এব লাভো ব্যালঘাতিনঃ।"—(উপনিপাতপ্রতিকারঃ, ২০৭ম পৃষ্ঠাঃ॥) জনহিতকর এবম্বিধ বিবিধ বিধানের সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিভয়নিবারণের বিবিধ প্রয়াসও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে সময়ে কাষ্ঠ-দ্বারা গৃহ-নির্ম্মাণের প্রথা প্রচলিত ছিল। সে গৃহ সহজেই অগ্নিদগ্ধ হইতে পারিত। অগ্নি-ভয় নিবারণের জন্য এবং গৃহাদির নিরাপদ-কল্পে অর্থশাস্ত্রে তাই বিবিধ প্রয়াস দেখিতে পাই। অগ্নি-প্রতিকার সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রের 'নাগ-রকপ্রণিধি' অংশে বিশেষ বিশেষ নিয়মের উল্লেখ আছে। তাহার কয়েকটী এই,—

"অগ্নিপ্রতিকারং চ গ্রীষ্মে মধ্যমযোরহ্নশ্চতুর্ভাগয়োঃ অষ্টভাগোঽগ্নিদণ্ডঃ। বহিরধি-

শ্রয়ণং বা কুর্য্যুঃ। পাদঃ পঞ্চঘটীনাং কুম্ভদ্রোণীনিশ্রেণীপরশুশূর্পাঙ্কুশকচগ্রহণীদৃতীনাং চ অকরণে। তৃণকটচ্ছন্নান্যপনয়েৎ। অগ্নিজীবিন একস্থান্ বাসয়েৎ। স্বগৃহপ্রদ্বারেষু গৃহস্বামিনো বসেয়ুঃ। অসংপাতিনো রাত্রৌ রথ্যাসু কটব্রজাঃসহস্রং তিষ্ঠেয়ুঃ। চতুষ্পথদ্বারে রাজপরিগ্রহেষু চ। প্রদীপ্তমনভিধাবতো গৃহস্বামিনো দ্বাদশপণো দণ্ডঃ। ষট্পণো বিক্রয়িণঃ। প্রমাদাদ্দীপ্তেষু চতুষ্পঞ্চাশৎপণো দণ্ডঃ। প্রদীপিকোঽগ্নিনা বধ্যঃ। পাংসুন্যাসে রথ্যায়ামষ্টভাগো দণ্ডঃ।"—নাগরকপ্রণিধিঃ, ১৪৫ম পৃষ্ঠাঃ।..."গ্রীষ্মে বহিরধিশ্রয়ণং গ্রামাঃ কুর্য্যুঃ। দশমূলীসংগ্রহেণাধিষ্ঠিতা বা। নাগরিকপ্রণিধাবগ্নিপ্রতিষেধো ব্যাখ্যাতঃ। নিশান্তপ্রণিধৌ রাজপরিগ্রহে চ।"—উপনিপাতপ্রতীকারঃ, ২০৫ম পৃষ্ঠাঃ॥

গ্রীষ্মকালে অগ্নির আশঙ্কা অধিক। অগ্নির উপদ্রব সেই সময়েই প্রবল হয়। সেই জন্য দিনমানকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া উহার মধ্যবর্ত্তী দুই ভাগে অগ্নি প্রজ্বলিত করা কৌটিল্য নিষেধ করিয়াছেন। সে আদেশ অপালনে এক পণের অষ্টমাংশ দণ্ড বিহিত হইয়াছে। অগ্নিভয়-নিবারণ-কল্পে প্রতি গৃহস্থকে পাঁচটী কলসী বা জলপাত্র, কুম্ভ, দ্রোণ, আরোহণী, পরশু, শূর্প, অঙ্কুশ, কচ ও গ্রহণী এবং চর্ম্মের থলি রাখিতে হইত।* যে গৃহস্থের গৃহে অগ্নি-নির্ব্বাপণোপযোগী ঐ সকল সরঞ্জাম না থাকিত, তিনি এক পণের চতুর্থাংশ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইতেন। যিনি ঐ সকল দ্রব্য সংরক্ষণে অসমর্থ, তিনি খড়তৃণাদি দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন না। বৃহৎ রাজপথে, চৌমাথায় এবং প্রাসাদ ও রাজকীয় কার্য্যালয় সম্মুখে শ্রেণিবদ্ধভাবে বহু কলসী সংরক্ষিত হওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কাহারও গৃহ অগ্নি-সংযুক্ত হইলে, সমবেত চেষ্টায় তাহা নির্ব্বাপিত করিতে হইত। অগ্নি-নির্ব্বাণে সহায়তা না করিলে, দ্বাদশ পণ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবার বিধি। অসাবধানতা বশতঃ কাহারও গৃহে অগ্নি-সংযোগ করিলে, চতুঃপঞ্চাশৎ পণ অর্থদণ্ড প্রদান করিতে হইত। ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐরূপ অগ্নি প্রদান করিলে তাহাকে অগ্নি-মধ্যে নিক্ষেপ করিবার ব্যবস্থা ছিল। যিনি গৃহস্বামী, তাঁহাকে গৃহের দ্বার-সান্নিধ্যে রাত্রিযাপন করিবার বিধি ছিল। সহর-

---

* অগ্নিভয়-নিবারণে 'দশমূলী সংগ্রহ' অর্থাৎ কলসী প্রভৃতি সংরক্ষা প্রতি গৃহস্থের একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঘট ও কুম্ভ জলসেচন জন্য রক্ষিত হওয়ার বিধি। দ্রোণী—কাষ্ঠনির্ম্মিত জলাধার; গৃহদ্বারে উহা সংরক্ষিত হইত। নিঃশ্রেণী—গৃহশীর্ষে গমন করিবার সিঁড়ি বা মই। পরশু—কুঠার; গৃহের কড়ি প্রভৃতি ছেদন জন্য ব্যবহৃত হইত। অঙ্কুশ—সাঁড়াশীর ন্যায় যন্ত্রবিশেষ। অগ্নিদগ্ধ কাষ্ঠাদি স্থানান্তরিত করিবার জন্য এবং নিম্নে অনয়নোদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত। শূর্প—ধূম-নিঃসারণ জন্য ফুৎকার দিবার যন্ত্র। কর্ম্মকার ও স্বর্ণকার প্রভৃতি অগ্নি প্রজ্বালন জন্য যে ফুৎকার দিবার যন্ত্র ব্যবহার করে, শূর্প অনেকাংশে সেই প্রকার। কচ—দড়ি প্রভৃতি। গ্রহণী—ইহার আকার ঝুড়ি প্রভৃতির মত। ভাঁড়ার হইতে দ্রব্যজাত স্থানান্তরিত করিবার পাত্র-বিশেষ। দৃতি—চামড়ার ব্যাগের মত। উহাও দ্রব্যজাত স্থানান্তরিত করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত। আজি-কালি প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতেই 'দশমূলীর' অধিকাংশ দ্রব্য সংরক্ষিত হয়। প্রাচীন কালে যেমন দশমূলী সংগ্রহ প্রতি গৃহস্থের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল, আর সে কর্ত্তব্য অপালনে দণ্ড ভোগ করিতে হইত; এখন সে সম্বন্ধে সেরূপ কঠোর বিধি প্রবর্ত্তিত নাই। দশমূলীর অন্তর্গত কুঠারাদি পাড়াগাঁয়ের প্রায় প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতেই সংরক্ষিত হয়; মই, কলসী, ঝুড়ি প্রভৃতিও সকলেই রাখিয়া থাকেন। অধুনা সহর নগরাদিতে স্থলবিশেষে দশমূলীর অধিকাংশ দ্রব্য সংগ্রহের প্রথা আছে।

নগরাদিতে চালাঘর প্রভৃতি নির্ম্মাণের আদেশ ছিল না। দহনশীল যে সকল বস্তু সহজে অগ্নিসংযুক্ত হয়, সেরূপ উপাদানে সহর-মধ্যে গৃহাদি নির্ম্মাণ অর্থশাস্ত্রের বিধান মতে নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

জনহিতকর বিধান প্রসঙ্গে মিতাচার, জায়গীর ও ব্রহ্মোত্তর প্রভৃতি দান, বন্দীর মুক্তি প্রভৃত প্রসঙ্গের উল্লেখ করা যাইতে পারে। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তিকে মদ্যাদি মাদক দ্রব্য সরবরাহের আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। এদিকে মাদক-দ্রব্য-সেবনে দণ্ডের ব্যবস্থাও বিহিত দেখিতে পাই। সওয়া কাচ্চা বা এক প্রস্থের অধিক মদ্য এক ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিবার বিধি ছিল না। পাশাপাশি ভাবে এক সঙ্গে কতকগুলি মদের দোকান রাজ্যের কুত্রাপি দৃষ্ট হইত না। মাদক দ্রব্য বিক্রয়ে অর্থশাস্ত্রের 'সুরাধ্যক্ষঃ' এবং 'বাক্যকর্ম্মানুযোগঃ' প্রসঙ্গে যে সকল বিধি বিধিবদ্ধ আছে, তাহা লঙ্ঘন করিলে দণ্ডের বিধান ছিল। 'সুরাধ্যক্ষ' প্রসঙ্গে (১১৯ম পৃষ্ঠাঃ) অর্থশাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—"একমুখমনেকমুখং বা বিক্রয়ক্রয়বশেন বা ষটছতমত্যয়মন্যত্র কতৃক্রেতৃবিক্রেতৄণাং স্থাপয়েৎ, গ্রামাদনির্ণয়নমসম্পাতং চ।" অর্থশাস্ত্রের সুরাধ্যক্ষ ব্যবস্থায় কৌটিল্যের অশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ ও তপস্বিগণকে ব্রহ্মোত্তর দানে পরিতুষ্ট করা হইত, আর রাজকর্ম্মচারী জায়গীর লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইতেন,—অর্থশাস্ত্রের 'ভূমিছিদ্রবিধান' এবং 'ভৃত্যভরণীয়' অংশদ্বয়ে এতদ্বিষয়ের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়; যথা—

জনহিতকর বিবিধ বিধান।

"প্রদিষ্টাভয়স্থাবরজঙ্গমানি চ ব্রাহ্মণেভ্যো ব্রহ্মসোমারণ্যানি তপোবনানি চ, তপস্বিভ্যো গোত্র(ত)পরাণি প্রযচ্ছেৎ।"—ভূমিছিদ্রবিধানম্, ৪৯ম পৃষ্ঠাঃ॥

কর্ত্তব্য-সম্পাদন-কালে কর্ম্মচারীর মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্রপরিজনের ভরণপোষণার্থ রাজা তাঁহাদিগকে বৃত্তি প্রদান করিতেন। মৃত ব্যক্তির পরিবার মধ্যে কেহ পীড়িত থাকিলে তাহাদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত হইত। অর্থাভাবে রাজার নিকট আবেদন করিলে, রাজা কর্ম্মচারীদিগের সাহায্য করিতেন, অবস্থা-বিশেষে তাঁহারা বন উপবন গৃহপালিত পশু বা জমীজমা পারিতোষিকরূপে প্রাপ্ত হইতেন। পর্দ্দানসীন স্ত্রীলোকদিগের অভাব অভিযোগ জানিবার জন্য স্ত্রীলোকগণ দূতরূপে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা অন্দরে অন্দরে ঘুরিয়া রাজার নিকট সকল তথ্য বিবৃত করিতেন। অর্থশাস্ত্রের 'ভৃত্যভরণীয়' প্রকরণ (২৪৫ম পৃষ্ঠাঃ) এই সকল বিধি-বিধানে নিয়োজিত। ঐ পরিচ্ছেদের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল; যথা,—

"ঋত্বিগাচার্য্যমন্ত্রিপুরোহিতসেনাপতিযুবরাজরাজমাতৃরাজমহিষ্যোঽষ্টচত্বারিংশৎ-সাহস্রা। এতাবতা ভরণেনানাস্বদ্যত্বমকোপকং চৈষাং ভবতি। দৌবারিকান্তর্বংশিকপ্রশাস্তৃসমাহর্তৃসন্নিধাতারশ্চতুর্বিংশতিসাহস্রাঃ। এতাবতা কর্ম্মণ্যা ভবন্তি। কুমারকুমারমাতৃনায়কাপৌরব্যবহারিককার্মান্তিকমন্ত্রিপরিষদ্রাষ্ট্রান্তপালাস্তপালাশ্চ দ্বাদশসাহস্রাঃ। স্বামিপরিবন্ধবল সহায়া হ্যেতাবতা ভবন্তি। শ্রেণীমুখ্যা হস্ত্যশ্বরথমুখ্যাঃ প্রদেষ্টারশ্চ অষ্টসাহস্রাঃ। স্ববর্গানুকর্ষিণী হ্যেতাবতা ভবন্তি।...কর্ম্মসু মৃতানাং পুত্রদারা ভক্তবেতনং লভেরন্। বালবৃদ্ধব্যাধিতাশ্চৈষামনুগ্রাহ্যা। প্রেতব্যাধিতসূতিকাকৃত্যেষু চৈষামর্থমানকর্ম কুর্যাৎ।

রাজার জন্মদিন উপলক্ষে বন্দিগণকে মুক্তি দিবার ব্যবস্থা ছিল। কখনও কখনও বালক, পীড়িত এবং বৃদ্ধ বন্দিগণকে তাহাদের দণ্ডকাল শেষ হইবার পূর্ব্বেই মুক্তি দেওয়া হইত। এতদ্ব্যতীত বন্দিশালায় যাহারা নির্ম্মল চরিত্রের পরিচয় দিতে পারিত, তাহারাও মুক্তিলাভ করিত। রাজার জন্মদিন ভিন্ন যুবরাজ-নির্ব্বাচন-কালে এবং রাজপুত্রাদির জন্মোৎসব উপলক্ষে এইরূপ বিধি বিহিত হইয়াছিল। এতদ্বিষয়ে কৌটিল্যের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা,—

"বন্ধনাগারে চ বালবৃদ্ধব্যাধিতানাথানাং চ জাতনক্ষত্রপৌর্ণ-
মাসীষু বিসর্গঃ। পুণ্যশীলাঃ সময়ানুবন্ধা বা দোষনিষ্ক্রয়ং দদ্যুঃ।
দিবসে পঞ্চরাত্রে বা বন্ধনস্থান্ বিশোধয়েৎ। কর্ম্মণা কায়দণ্ডেন হিরণ্যানুগ্রহেণ বা॥
অপূর্ব্বদেশাধিগমে যুবরাজাভিষেচনে। পুত্রজন্মনি বা মোক্ষো বন্ধনস্থ বিধীয়তে॥"
—অর্থশাস্ত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, (নাগরকপ্রণিধিঃ, ১৪৬ম—১৪৭ম পৃষ্ঠাঃ॥)

নূতন দেশ জয় হইলেও বন্দিদিগের মুক্তির ব্যবস্থা হইত,—অর্থশাস্ত্রের আলোচনায় এইরূপ প্রতিপন্ন হয়। জনহিতকর বিবিধ অনুষ্ঠানে রাজ্যের সুখৈশ্বর্য্য বর্দ্ধন করা রাজার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। যেমন তাঁহার দণ্ডের ব্যবস্থা, তেমনি তাঁহার পুরস্কারের বিধান। গ্রাম-সমূহে অসহায় বালক-বালিকাগণের রক্ষার ভার রাজা গ্রামবৃদ্ধগণের প্রতি ন্যস্ত করিয়াছিলেন, বিভিন্ন জনপদের জনসমূহের সুখস্বাস্থ্যের বিধানে তাহাদের প্রীতিশ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। ফলতঃ, জনহিতকর বিবিধ বিধানের প্রবর্ত্তনায় এবং সুশাসন-সুপালনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রতিষ্ঠায়, সে রাজ্য গৌরবের তুঙ্গ শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছিল।

বায়ুর্বিজ্ঞান। (Mateorology)

হিন্দুগণ সর্ব্ববিদ্যায় বিশারদ ছিলেন। কিবা চিকিৎসা-বিদ্যা, কিবা ব্যবহার-বিধান, কিবা কলা-বিদ্যা, কিবা খনিজ-বিদ্যা, কিবা জ্যোতির্বিজ্ঞান—সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বত্র তাঁহাদের অসামান্য জ্ঞান-গবেষণার পরিচয় দেদীপ্যমান। খনিজ-বিদ্যায় তাঁহারা যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, 'পৃথিবীর ইতিহাসের' তৃতীয় খণ্ডে তাহা বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। খৃষ্টজন্মের তিন শতাধিক বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থশাস্ত্রেও সে পরিচয় পূর্ণ-প্রকটিত রহিয়াছে। গণকার্য্য-বিভাগের সুশৃঙ্খলা-বিধানে কৌটিল্য বিবিধ বিধির প্রবর্ত্তনা করিয়াছেন। খনিজ-বিদ্যায় হিন্দুগণ সে সময়ে যেমন কৃতিত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন; পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতি খননে দেশের সর্ব্বত্র জল-সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া তেমনি দেশ-হিতৈষিণার প্রকৃত পরিচয় দিয়াছিলেন। কৌটিল্যের সুব্যবস্থায় বারুণ-ভূমি, বাণিজ্যপথ, পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতি খনন করা হইয়াছিল। চিকিৎসাদির সুব্যবস্থায় এবং কলকারাখানাদি স্থাপনে সে রাজ্যের গৌরব-প্রতিষ্ঠা অশেষরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। হিন্দুগণ যে বায়ুর্বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, অর্থশাস্ত্র হইতে তদ্বিষয়ে কয়েকটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। 'সীতাধ্যক্ষ' প্রকরণে এই সকল বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কোন্ মেঘে কিরূপ বর্ষণ হয়, কোন্ প্রদেশে কি পরিমাণ বারি পতিত হইয়া থাকে, অর্থশাস্ত্রের অন্তর্গত 'সীতাধ্যক্ষ' অধ্যায়ে তদ্বিষয় পরিবর্ণিত আছে। নিম্নে তাহার কতকাংশ উদ্ধার করা হইল,—

"ষোড়শদ্রোণং জাঙ্গালানাং বর্ষপ্রমাণমধ্যর্ধমানূপানাং দেশবাপানামর্ধত্রয়োদশাশ্মকানাং
ত্রয়োবিংশতিরবন্তীনামমিতমপরান্তানাং হৈমন্যানাং চ কুল্যাবাপানাং চ কালতঃ। বর্ষ-

ত্রিভাগঃ পূর্ব্বপশ্চিমমাসয়োঃ, দ্বৌ ত্রিভাগৌ মধ্যময়োঃ সুষমারূপম্। তস্যোপলব্ধির্বৃহস্পতেঃস্থানগমনগর্ভাধানেভ্যঃ শুক্রোদয়াস্ত ময়চারেভ্যঃ সূর্য্যস্য প্রকৃতিবৈকৃতাচ্চ। সূর্য্যাদ্বীজসিদ্ধিঃ। বৃহস্পতেঃসস্যানাং স্তম্বকরিতা। শুক্রাদ্‌বৃষ্টিরিতি। ত্রয়সপ্তাহিকা মেঘা অশীতিঃ কণশীকরাঃ। ষষ্টিরাতপমেঘানাং এষা বৃষ্টিসমাহিতা॥ বাতমাতপয়োগং চ বিভজন্যত্র বর্ষতি। ত্রীন্ কর্ষকাংশ্চ জনয়ন্ তত্র সস্যাগমো ধ্রুবঃ।"

—সীতাধ্যক্ষঃ, ১১৫ম—১১৬ম পৃষ্ঠাঃ॥

জাঙ্গাল-দেশে ষোড়শ দ্রোণ বৃষ্টি পতিত হয়। আনুপদেশে তাহার অর্দ্ধ পরিমাণ। মহারাষ্ট্রদেশে সাড়ে তের দ্রোণ, অবন্তী প্রদেশে তেইশ দ্রোণ বৃষ্টি পতিত হইয়া থাকে পশ্চিম প্রদেশে এবং হিমালয় অঞ্চলে 'কুল্যাব' বা নালা-প্রণালী খনিত হওয়ায় ঐ দেশে বারিপাতের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। বর্ষার প্রারম্ভে এবং বর্ষার শেষে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। সে সময় নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বারিপতনের একতৃতীয়াংশ বারিপাত ঘটে। মধ্য-ভাগে বারিপাতের পরিমাণ—দুই-তৃতীয়াংশ মাত্র। কিন্তু বারিপাত অপেক্ষাকৃত কম হইলেও সে সময়ে বারিপতনের ঐরূপ পরিমাণই যথেষ্ট বলিয়া মনে করিতে হইবে। অর্থাৎ—শ্রাবণ এবং কার্ত্তিক মাসে সাড়ে তের দ্রোণ বারিপাত হয়, আর আশ্বিন ও ভাদ্র মাসে ছাব্বিশ দ্রোণ জলবর্ষণ হইয়া থাকে। বৃহস্পতির অবস্থিতি ও গমন, শুক্রের উদয়াস্ত এবং সূর্য্যকিরণের প্রকৃতি-পরিমাণ হইতে বৃষ্টিপাতের আরম্ভ গণনা করা যাইতে পারে। রৌদ্রের প্রকৃতি হইতে বীজের অঙ্কুরোদ্গম অনুমান করা যায়। বৃহস্পতির অবস্থিতি-স্থান-নির্ণয়ে বীজের গঠন এবং শুক্রের গতি-নির্দ্ধারণে বারিপাতের সূচনা প্রতীয়মান হইতে পারে। মেঘ—তিন প্রকার। সেই তিন প্রকার মেঘ হইতে বারি পতন হয়। সেই তিন প্রকার মেঘ হইতে সাত দিন সাত রাত্রি অনবরত বৃষ্টি পতন হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত স্বল্পবারিসমন্বিত অশীতি প্রকার মেঘ আছে। সে সকল মেঘ হইতে ক্ষুদ্র-বিন্দুসমন্বিত বৃষ্টিপাত হয়। সূর্য্যকিরণের সহিত ষাট প্রকার মেঘ বিদ্যমান থাকে। যে মেঘের সহিত বায়ু প্রবাহিত হয় না এবং যদ্দ্বারা সূর্য্যকিরণ ঘনান্ধকারে আবরিত হয়, সেই মেঘে প্রচুর পরিমাণে বারিবর্ষণ হইয়া থাকে। আর তাহাতে তিন বার কর্ষণ কার্য্য সমাহিত হইতে পারে। এরূপ হইলে প্রচুর শস্যোৎপন্নের সম্ভাবনা। বারি পতন লক্ষ্য করিয়া সীতাধ্যক্ষ বীজ-রোপণের ব্যবস্থা করিবেন। কোন্ সময়ে কোন্ শস্য উৎপন্ন হয় এবং কোন্ সময়ে কোন্ শস্যের বীজ বপন করা প্রয়োজন, সীতধ্যক্ষে তাহারও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। উৎপন্ন শস্যে কর-প্রদানের প্রসঙ্গও সেস্থলে উত্থাপিত হইয়াছে। বৃষ্টির পরিমাণ নির্দ্ধারণ জন্য সে সময় এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হইত। 'সন্নিধাতৃচেয়কর্ম' প্রকরণে (৫৮ম পৃষ্ঠাঃ) তাহার উল্লেখ আছে,—"কোষ্ঠাগারে বর্ষমানমরত্নিমুখং কুণ্ডং স্থাপয়েৎ॥" বারিপাত পরীক্ষার জন্য কোষ্ঠাগারের সম্মুখভাগে অরত্নিমাত্র প্রশস্ত মুখবিশিষ্ট কুণ্ড স্থাপন করিবে। খৃষ্টজন্মের তিন শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ যে বায়ুবিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী ছিল, কৌটিল্যের এই সকল উক্তি হইতে তাহা সপ্রমাণ হয়। গণনা-পদ্ধতি তখন এত বিশুদ্ধ ছিল যে, শস্যাদি বপনে জনসাধারণ সে গণনায় নির্ভর করিতে পারিতেন; আর তদনুসারে শস্যাদি রোপণ ও আহরণ করিয়া তাঁহারা বিশেষ লাভবান হইতেন।

যেমন বায়ুবিজ্ঞানে, তেমনই খনিজ-বিদ্যায় কৌটিল্যের অসাধারণ পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। সে সময় খনিজ-পণ্যে রাজকোষে বহু অর্থ সঞ্চিত হইত, মেগাস্থিনীসের বর্ণনায় এবং অর্থশাস্ত্রের আলোচনায় তাহা বিশেষরূপে উপলব্ধি হয়। ভারতের ভূগর্ভে তখন যে অসংখ্য খনি ছিল এবং সেই সকল খনি হইতে বিবিধ প্রকারের ধাতু উত্তোলিত হইত। মেগাস্থিনীস তাহা মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"স্থল-প্রদেশে যেমন প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইত, ভূগর্ভে তেমনি নানাবিধ ধাতুর আকর ছিল। সেই সকল আকর হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীসক, লৌহ, টিন প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ধাতু আহরিত হইত। আকর-সমূহে তদ্ব্যতীত আরও বহু ধাতুর সমাবেশ ছিল।* দেশে তখন বিবিধ ধাতুর বহু খনি বিদ্যমান ছিল এবং প্রচুর পরিমাণে খনিজ পদার্থের আমদানি ও রপ্তানি হইত। সেই সকল ধাতু উত্তোলনের নিমিত্ত বিবিধ ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছিল। চাণক্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে সে সকল প্রক্রিয়ার উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থশাস্ত্রের বিবরণ হইতে বুঝিতে পারি, সে সময়ে স্থলে ও জলে উভয় প্রদেশেই খনি বিদ্যমান ছিল। খনি-সমূহের তত্ত্বাবধান জন্য তত্ত্বাবধায়কগণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তত্ত্বাবধায়কগণের দুইটী প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। প্রথমতঃ তাহাদিগকে নূতন নূতন খনি আবিষ্কার করিতে হইত; দ্বিতীয়তঃ, কোনও খনি একেবারে নিঃশেষ হইয়াছে কি না, ভস্মাদি বিবিধ সঙ্কেত পরীক্ষায় তাহা নির্ণয় করিতে হইত। সুতরাং রসায়ন-বিজ্ঞানে এবং ধাতুবিজ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ এ কঠোর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হইতেন না। খনির অধ্যক্ষ—'আকরাধ্যক্ষ' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। রাজ্যের কোনও স্থানে নূতন খনি আবিষ্কৃত হইলে, সে সংবাদ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে রাজার নিকট জ্ঞাপন করিতে হইত। সে খনি খননের উপযোগী বলিয়া বিবেচিত না হইলে, রাজা তাহা ব্যক্তি-বিশেষকে বা সম্প্রদায়-বিশেষকে বিলি করিতেন। যে খনির খনন-কার্য্যে অধিক ব্যয়-বাহুল্যের সম্ভাবনা, সেই খনি সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা বিহিত ছিল। রাজকীয় খনি-বিভাগে অভিজ্ঞ আরও বহু কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারও ঐ সকল কার্য্যে তত্ত্বাবধায়কের সহায়তা করিতেন। অধিকন্তু খনি-খননোপযোগী বিবিধ অস্ত্র-যন্ত্রাদি সংরক্ষিত হইবার ব্যবস্থা ছিল এবং খননকার্য্যের জন্য শ্রমজীবিগণ নিযুক্ত হইয়াছিল। বিভিন্ন ধাতু কিরূপে পরীক্ষা করা হইত, অধ্যক্ষগণ মিশ্রিত ধাতুর উপাদান-সমূহ কি ভাবে স্বতন্ত্র করিতেন,—অর্থশাস্ত্রের 'আকরকর্ম্মান্তপ্রবর্ত্তনম্' অংশে (৮২ম—৮৫ম পৃষ্ঠায়) তাহা পরিবর্ণিত আছে। ভূ-পৃষ্ঠের লক্ষণাদি দৃষ্টে খনির বিদ্যমানতা অনুমান করিতে হইত। যে সকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে যেরূপ খনি অনুমান

খনিজবিদ্যার উৎকর্ষ।

* And while the soil bears on its surface all kinds of fruits which are known to cultivation, it has also underground numerous veins of all sorts of metals, for it contains much gold and silver, and copper and iron in no small quantity, and even tin and other metals which are employed in making articles of use and ornament as well as the implements and accoutrements of war."—*Fragments*, Bk I.

করিবার বিধি ছিল, অর্থশাস্ত্রে তাহার বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সে বর্ণনায় বুঝা যায়, খনি ও খনিজ-পদার্থ সম্বন্ধে কৌটিল্যের গবেষণা এবং তাঁহার বহুদর্শিতা কত বহুব্যাপী ছিল।

"পর্বতানামভিজ্ঞাতোদ্দেশানাং বিলগুহোপত্যকাহলয়নিগূঢ়খাতেষন্তঃপ্রস্যন্দিনো জম্বুচূততালফলপক্কহরিদ্রাভেদহরিতালক্ষৌদ্রহিঙ্গুলুকপুণ্ডরীকশুকময়ূরপত্রবর্ণাস্সবর্ণোদকৌষধীপর্য্যন্তাশ্চিক্কণা বিশদা ভারিকাশ্চ রসাঃ কাঞ্চনিকাঃ। অপ্সু নিষ্ঠ্যুতাস্তৈলবদ্বিসর্পিণঃ পঙ্কমলগ্রাহিণশ্চ তাম্ররূপ্যয়োশ্শতাদুপরিবেদ্ধারঃ। তৎপ্রতিরূপকমুগ্রগন্ধরসং শিলাজতু বিদ্যাৎ।"—আকরকর্ম্মান্তপ্রবর্ত্তনম্, ৮১ম—৮২ম পৃষ্ঠাঃ॥

এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, সমতল ভূমির বা পর্ব্বতের সানুদেশের অস্বাভাবিক বর্ণ ও গন্ধ দ্বারা খনির বিদ্যমানতা অনুমান করা হইত। সে ক্ষেত্রে ভূমি ও সানুদেশ অধ্যক্ষগণ বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। সুবর্ণের আকর নিম্নবিধ সঙ্কেত দ্বারা অনুমান করা যাইত। ধাতু-সমূহের আকর-স্থান হইতে এক প্রকার গলিত পদার্থ নির্গত হয়। গলিত পদার্থের গুণ-ধর্ম্ম অনুসারে বিভিন্ন ধাতু পরিকল্পিত হইত। সুবর্ণের খনি হইলে, ঐ গলিত পদার্থ জম্বু বা আম্র ফলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয়; আর তাহা তৈলের ন্যায় পিচ্ছিল হইয়া থাকে। কখনও তাহার বর্ণ পক্ক হরিদ্রার মত, কখনও বা হরিতাল খদির ও সিন্দুর প্রভৃতির ন্যায়। গলিত পদার্থের ঔজ্জ্বল্য পদ্মের মত, শুক বা ময়ূর পক্ষীর ন্যায় হইলে স্বর্ণখনি অনুমান হয়। যে স্থান হইতে উক্তবিধ গলিত পদার্থ নির্গত হয়, সেই স্থানে যদি গুল্ম-লতা বর্ত্তমান থাকে, আর তাহাদের রঙ্গের সহিত যদি গলিত পদার্থের বর্ণের কোনও পার্থক্য উপলব্ধি না হয়; তাহা হইলে সে গলিত পদার্থকে উৎকৃষ্ট স্বর্ণের অংশ বলিয়া বুঝিতে হইবে। স্বর্ণের গলিত অংশ জলে নিক্ষেপ করিলে উহা তৈলের ন্যায় বিস্তৃত হইয়া পড়ে, কর্দ্দম ও ময়লা দ্বারা পুষ্ট হয় এবং লৌহ, তাম্র ও রৌপ্যের সহিত মিশিয়া যায়। শিলাজতুর গুণধর্ম্মও স্বর্ণের গুণধর্ম্মের অনুরূপ। শিলাজতুর গন্ধ অধিকতর উগ্র এবং উহা রসযুক্ত। স্বর্ণপরীক্ষায় আরও কতকগুলি সঙ্কেতের বিষয় অর্থশাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে। সেই সকল সঙ্কেত নিম্নরূপ নির্দ্দিষ্ট করা যায়,—

"পীতকাস্তাম্রকাস্তাম্রপীতকা বা ভূমিপ্রস্তরধাতবো ভিন্না নীলরাজীবন্তো মুদ্গমাষকৃসরবর্ণা বা দধিবিন্দুপিণ্ডচিত্রা হরিদ্রা হরিতকীপদ্মপত্রশৈবলযকৃৎপ্লীহানবদ্যবর্ণা ভিন্নাশ্চুঞ্চুবালুকালেখাবিন্দুস্বস্তিকবন্তঃ সুগুলিকা অর্চিষ্মন্তস্তাপ্যমানা ন ভিদ্যন্তে বহুফেনধূমাশ্চ সুবর্ণধাতবঃ প্রতীবাপার্থাস্তাম্ররূপ্যবেধনাঃ।"—আকারকর্ম্মান্তপ্রবর্ত্তনম্, ৮২ম পৃষ্ঠাঃ॥

আকরোত্থিত সুবর্ণ, তাম্রের ন্যায় পীত বা রক্তবর্ণ; অথবা মিশ্রিত উভয় বর্ণবিশিষ্ট। যে ধাতুতে বহু নীল রেখার সমাবেশ থাকে, কিন্তু দেখিতে মাষ মুগ বা তিলের মত; এবং যাহাতে দধি-বিন্দুর ন্যায় চিহ্ন বিদ্যমান; শৈবাল প্লীহা যকৃৎ, হরিদ্রা বা পদ্মের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট হয়;—তাহা উত্তম স্বর্ণ। উহার অভ্যন্তরে স্বস্তিক বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুলিকণা বর্ত্তমান থাকে। স্বর্ণ উত্তপ্ত হইলে ফাটিয়া যায় না। কিন্তু ফেণ ও ধূম উদ্গীরণ করে এবং তাম্র ও রৌপ্যের সহিত মিশ্রিত হয়। যাঁহারা ধাতু-সমূহের এই সকল গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া বিভিন্ন ধাতু নির্ব্বাচন করিতে পারিতেন, তাঁহারা অল্প শক্তিশালী ছিলেন না। অন্যান্য বিবিধ ধাতু পরীক্ষা সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রে বিভিন্ন পদ্ধতির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

সে সকল ধাতুর কি গুণধর্ম্ম, কিরূপ লক্ষণযুক্ত হইলে কোন্ ধাতু অনুমান করিতে হয়, অর্থশাস্ত্রে তৎসমুদায় বিবৃত আছে। তৎসম্বন্ধে কৌটিল্যের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

"শঙ্খকর্পূরস্ফটিকনবনীতকপোতপারাবতবিমলকময়ূরগ্রীবাবর্ণাঃ সস্যকগোমেদকগুড়মৎস্যণ্ডিকা বর্ণাঃ কোবিদারপদ্মপাটলীকলায়ক্ষৌমাতসীপুষ্পবর্ণাস্সসীসাঃ সাঞ্জনাঃ বিস্রা ভিন্নাঃ শ্বেতাভাঃ কৃষ্ণাঃ কৃষ্ণাভাঃ শ্বেতাঃ সর্বে বা লেখাবিন্দুচিত্রা মৃদবো ধ্মায়মানা ন স্ফুটন্তি বহুফেনধূমাশ্চ রূপ্যধাতবঃ।"—আকরকর্ম্মান্তপ্রবর্ত্তনম্. ৮২ম পৃষ্ঠাঃ॥

এস্থলে রৌপ্য পরীক্ষার বিষয় বলা হইতেছে। শঙ্খ, কর্পূর, স্ফটিক কিংবা নবনীত সদৃশ অথবা পারাবত, কপোত, বিমলক কিংবা ময়ূর প্রভৃতির কণ্ঠের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট আকর—রৌপ্যের আকর। যাহার দানা—শস্য, মণি, গুড় বা শর্করার দানার মত, তাহা রৌপ্যের আকর। যাহার বর্ণ কোবিদার, পদ্ম, পাটলি, কলায়, ক্ষৌম এবং আতসী পুষ্পের ন্যায়; পরন্তু যাহা সীসক ও লৌহের সহিত অতি সহজে মিশিয়া যায়, তাহাই রৌপ্যের আকর-বিদ্যমানতা জ্ঞাপন করে। আকরস্থিত রৌপ্যের গন্ধ—মাংসের গন্ধের ন্যায়। তাহা ধূসর অথবা শ্বেতাভ কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট। লেখ্যবিন্দু ও চিহ্নসমন্বিত ধাতু—রজত বলিয়া বুঝিতে হইবে। উত্তপ্ত হইলে রৌপ্য বিদীর্ণ হয় না, অথচ ফেণ ও ধূম উদ্গীরণ করে। তাম্র ও সীসক প্রভৃতি পরীক্ষা সম্বন্ধে বিবিধ বিধি দৃষ্ট হয়। তাম্র ও সীসক পরীক্ষা সম্বন্ধে কৌটিল্য বলিয়াছেন,—

"ভারিকস্স্নিগ্ধো মৃদুশ্চ প্রস্তরধাতুর্ভূমিভাগো বা পিঙ্গলো হরিতঃ পাটলো লোহিতো বা তাম্রধাতুঃ।...কাকমেচকঃ কপোতরোচনাবর্ণঃ শ্বেতরাজিনদ্ধো বা বিস্রস্সীসধাতুঃ। ...কাণ্ডভুজপত্রবর্ণো বা বৈকৃন্তকধাতুঃ।"—আকরকর্ম্মান্তপ্রবর্ত্তনম্, ৮৩ম পৃষ্ঠাঃ॥

আকরস্থ তাম্র গুরু, তৈলাক্ত ও স্নিগ্ধ; পিঙ্গল, সবুজ, হরিত, পাটল বা লোহিত বর্ণ-বিশিষ্ট। যে স্থানের গলিত পদার্থে ঐ সকল গুণধর্ম্ম বর্ত্তমান, সে স্থানে তাম্রখনির বিদ্যমানতা অনুমান করিতে হইবে। আকরস্থিত সীসকের গন্ধও কাঁচা মাংসের মত। উহার বর্ণ—কাকমেচক, পারাবত ও গোপিত্তের বর্ণের ন্যায়। উহাতেও শ্বেতবর্ণ রেখা-সমূহ সন্নিবিষ্ট থাকে। এই সকল গুণধর্ম্ম অনুমান করিয়া সীসকের খনি নির্দ্দেশ করিতে হয়। টিন, লৌহ প্রভৃতি ধাতুর আকর-নিরূপণেরও এইরূপ নানাবিধ প্রক্রিয়ার বিষয় উল্লিখিত আছে।

"উষরকর্বুর পক্ক লোষ্টবর্ণো বা ত্রপুধাতুঃ। কুরুম্বঃ পাণ্ডুরোহিতস্সিন্দুবারপুষ্পবর্ণো বা তীক্ষ্ণধাতুঃ। অচ্ছস্স্নিগ্ধঃ সপ্রভো ঘোষবান্ শীততীব্রস্তনুরাগশ্চ মণিধাতুঃ।"

ধাতুর আকরাদি নির্ণয়ে এই সকল ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে। আকর হইতে যে সকল ধাতু উত্তোলিত হয়, তাহার সহিত নানা দ্রব্য মিশ্রিত থাকে। সেই সকল মিশ্রিত দ্রব্য ধাতু হইতে পৃথক করিতে না পারিলে উহা বিশুদ্ধ হয় না; ধাতু বিশুদ্ধ না হইলে সে সকল ধাতু কোনও উপকারে আসে না। ধাতু উত্তোলনের সকল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। মহামতি কৌটিল্য তাই ধাতু-সমূহ বিশুদ্ধ করিবার উপায়-পরম্পরা অর্থশাস্ত্রে নিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার উদ্ভাবিত সেই সকল উপায়ের কতকগুলি প্রদত্ত হইল; যথা,—

"সর্বধাতুনাং গৌরববৃদ্ধৌ সত্ত্ববৃদ্ধিঃ—তেষামশুদ্ধা মূঢ়গর্ভা বা তীক্ষ্ণমূত্রক্ষারভাবিতা রাজবৃক্ষবটপীলুগোপিত্তরোচনা মহিষখরকরটমূত্রলণ্ডপিণ্ডবদ্ধাস্তৎপ্রতীবাপাস্তদবলেপা বা

বিশুদ্ধাস্রবন্তি। যবমাসতিলপলাশপীলুক্ষারৈর্গোক্ষীরাজক্ষীরৈর্বা কদলীবজ্রকন্দপ্রতীবাপো মার্দবকরঃ। মধুমধুকমজাপয়ঃ সতৈলং ঘৃতগুড়কিণ্বযুতং সকন্দলীকং—যদপি শতসহস্রধা বিভিন্নং ভবতি মৃদু ত্রিভিরেব তন্নিষেকৈঃ। গোদন্তশৃঙ্গপ্রতীবাপো মৃদুস্তম্ভনঃ।"

—আকরকর্ম্মান্তপ্রবর্ত্তনম্, ৮২ম—৮৩ম পৃষ্ঠাঃ॥

বিবিধ প্রক্রিয়ায় ধাতু বিশুদ্ধ করিবার নিয়ম ছিল। প্রথমতঃ—অন্যান্য কতকগুলি দ্রব্যের সহিত মিশাইয়া, দ্বিতীয়তঃ—অন্য দ্রব্যের সংমিশ্রণে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা, ধাতু বিশুদ্ধ করা হইত। পূর্ব্বপ্রকার প্রক্রিয়া-বিধানে তীক্ষ্ণ, মূত্র ও ক্ষার দ্বারা 'ভাবনা' দিতে হইত। তদ্ব্যতীত রাজবৃক্ষ, বট, পিপুল, গোপিত্ত, রোচনা এবং মহিষ, গর্দ্দভ ও হস্তীর মূত্র ও পিত্তের সহিত মিশাইয়া বা লেপ দিয়া আকরোত্থিত অপরিস্কৃত ধাতু পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ করিবার বিধান অর্থশাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। শেষোক্ত বিধি—রসায়ন-শাস্ত্রের বিধির অনুরূপ।* এতদনুসারে, যব, মাস, তিল, পলাশ, পীলু, ক্ষার, গোক্ষার, অজক্ষার, কদলী, বজ্র, কন্দ প্রভৃতির সহিত অবিশুদ্ধ ধাতু সিদ্ধ করিতে হইত। ধাতু বিশুদ্ধ হইলে বিভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষগণ তাহার সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করিতেন। আকর হইতে যে সকল ধাতু উত্তোলন করা হইত, সেই সকল ধাতুর জন্য রাজকর প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। রাজকরের উল্লেখ প্রসঙ্গে, 'আকরকর্ম্মান্তপ্রবর্ত্তনম্' অংশের উপসংহারে, কৌটিল্য বলিয়াছেন,—

"এবং মূল্যং বিভাগং চ ব্যাজীং পরিঘমত্যয়ম্। শুল্কং বৈধরণং দণ্ডং রূপং রূপিকমেব চ॥
খনিভ্যো দ্বাদশবিধং ধাতুং পণ্যং চ সংহরেৎ। এবং সর্ব্বেষু পণ্যেষু স্থাপয়েন্মুখসংগ্রহম্॥
আকরপ্রভবঃ কোশঃ কোশাদ্দণ্ডঃ প্রজায়তে। পৃথিবী কোশদণ্ডাভ্যাং প্রাপ্যতে কোশভূষণা॥"

আকর হইতে যে সকল পণ্যজাত উৎপন্ন হইত, সেই সকল পণ্যে রাজা দশ প্রকার রাজকর গ্রহণ করিতেন; যথা,—মূল্য, বিভাগ, ব্যাজী, পরিঘ, অত্যয়, শুল্ক, বৈধরণ, দণ্ড, রূপ এবং রূপিক। এই সকল বিষয়ে রাজার একাধিপত্য ছিল। খনি হইতে দ্বাদশবিধ ধাতু উৎপন্ন হইত। সে সকল ধাতুর উপরই এইরূপ কর-গ্রহণের বিধি বিহিত হইয়াছিল। খনি নিঃশেষ হইল কি না, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য অধ্যক্ষ ভস্মাদি পরীক্ষা করিতেন। তাহাও অধ্যক্ষগণের বিশেষ পারদর্শিতার নিদর্শন। এতৎপ্রসঙ্গে কৌটিল্য বলিয়াছেন,—"কিট্টমূষাঙ্গারভস্মলিঙ্গং বাহাকরং ভূতপূর্ব্বমভূতপূর্ব্বং বা ভূমিপ্রস্তররসধাতুমত্যর্থবর্ণগৌরবমুগ্রগন্ধরসং পরীক্ষেৎ॥" কিট্ট, কয়লা, ভস্ম প্রভৃতি দ্বারা অনুমান করিতে হইত,—পূর্ব্বে সে খনিতে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল কি না। অধ্যক্ষগণ এ সকল বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। তাঁহাদের জ্ঞান-গবেষণা ও বহুদর্শিতা কত গভীর ছিল, তাঁহাদের কার্য্যাবলী আলোচনায় তাহা প্রতীত হয়। সমুদ্রগর্ভে ও নদীগর্ভে মুক্তা, শুক্তি, প্রবাল, শঙ্খ প্রভৃতির আকর। সেখান হইতে মুক্তা, শুক্তি, প্রবাল, শঙ্খ আহরিত হইত। সামুদ্রিক

---

* ধাতু-বিশোধনের এ সকল প্রক্রিয়া আধুনিক ধাতুবিজ্ঞান-বিশারদগণের নিকট অতি অভিনব বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা এখন নানাবিধ রসায়নিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্তু ধাতু-সংশোধন-সংক্রান্ত কৌটিল্যের এ বিধান সে সময়ে যে অশেষ কার্য্যকরী হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

খনিজ-জ্ঞান সে সময়ে কত প্রগাঢ় ছিল, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। আরও বুঝা যায়, সে সময়ে নৌ-বিভাগের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল এবং নৌ-যানাদি নির্ম্মাণে সমুদ্র-পথে গতিবিধির উৎকর্ষ-সাধনে বৈদেশিক বাণিজ্য বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল;—প্রভৃত ধনাগমের সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ বিষয়ে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল।

আকর-ব্যবস্থার ন্যায় জল-সরবরাহের বন্দোবস্তেও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কৌটিল্যের সময়ে দেশমধ্যে জলসরবরাহের বহু বিশদ ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছিল, অর্থশাস্ত্রের আলোচনায় তাহা প্রতিপন্ন হয়। গ্রীকদূত মেগাস্থিনীস এতদ্বিষয় নিঃসংশয়ে সপ্রমাণ করিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় অবস্থিতি-কালে তিনি তাৎকালিক শাসন-প্রণালীর এক বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তাহাতে প্রকাশ,—রাজ্যমধ্যে বহুল পরিমাণে নদী-নালা-পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতি খনিত হইয়াছিল এবং তাহাতে জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হওয়ায় দেশে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইত। পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতি তত্ত্বাবধানের জন্য রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। দেশের সর্ব্বত্র সমভাবে জলসরবরাহ হয়, তৎপ্রতি তাঁহাদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। চতুর্ব্বিধ উপায় অবলম্বনে দেশে জল-সরবরাহের ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছিল। (১) হস্তপ্রাবর্ত্তিম্—হস্ত দ্বারা জলসেচন; (২) স্কন্ধপ্রাবর্ত্তিম্—ভার বা কলসী প্রভৃতির সাহায্যে স্কন্ধে করিয়া জলসংবাহন; (৩) স্রোতোযন্ত্রপ্রাবর্ত্তিম্—যন্ত্র-কলাদির সাহায্যে জলসেচন ও জলপ্রদান; এবং (৪) নদীসরস্তটাককূপীদ্ঘাটম্—নদী, হ্রদ, তড়াগ, পুষ্করিণী হইতে জল উত্তোলন এবং জলসরবরাহ। এতদ্ব্যতীত গো-মহিষাদির সাহায্যে জলসরবরাহের ব্যবস্থা ছিল; বাতপ্রবৃত্তিম্ বা বায়ুশক্তি সাহায্যে নল প্রভৃতির দ্বারা জল-উত্তোলনের ও জলসরবরাহের ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছিল। প্রথমোক্ত চতুর্ব্বিধ উপায়ে জলসরবরাহ করিতে শুল্ক বা কর প্রদান করিতে হইত। সেই করের হার যথাক্রমে উৎপন্ন শস্যের এক-পঞ্চমাংশ, এক-চতুর্থাংশ, এক-তৃতীয়াংশ এবং এক-চতুর্থাংশ। এতৎসম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রের উক্তি; যথা,—

জলসেচন ব্যবস্থা।

"হস্তপ্রাবর্ত্তিমুদকভাগং পঞ্চমং দদ্যুঃ। স্কন্ধপ্রাবর্ত্তিমং চতুর্থম্। স্রোতোযন্ত্রপ্রাবর্ত্তিমং চ তৃতীয়ম্। চতুর্থং নদীসরস্তটাক কূপোদ্ঘাটম্।"—সীতাধ্যক্ষঃ, ১১৭ম পৃষ্ঠাঃ॥

নূতন নূতন নালা ও পয়ঃপ্রণালী খনন-কালে অথবা পুরাতনের সংস্কার-সময়ে রাজকর-গ্রহণের নিয়ম ছিল না। 'বাস্তুবিক্রয়' প্রসঙ্গে সে বিধি বিধিবদ্ধ হইয়াছে। সেখানে 'বাতপ্রবৃত্তিম্' বায়ুযন্ত্র-সাহায্যে 'পম্প' করিয়া জল উত্তোলনের ও জল-সরবরাহের ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। এতৎপ্রণালীর ব্যবহার-বিধানে কৌটিল্যের উক্তি নিম্নে প্রদান করা গেল; যথা,—

"বাতপ্রবৃত্তিমনন্দিনিবন্ধায়তনতটাককেদারারামষণ্ডবাপানাং সস্যপর্ণ্যভাগোত্তরিকমন্যেভ্যো বা যথোপকারং দদ্যুঃ। প্রক্রয়াবক্রয়বিভাগভোগনিসৃষ্টোপভোক্তারশ্চৈষাং প্রতিকুর্য্যুঃ। অপ্রতিকারে হীনদ্বিগুণো দণ্ডঃ। সেতুভ্যো মুঞ্চতস্তোয়মপারে ষট্‌পণো দমঃ॥ পারে বা তোয়মন্যেষাং প্রমাদে নোপরুন্ধতঃ॥"—বাস্তুবিক্রয়ঃ, ১৭০ম পৃষ্ঠাঃ॥

উপরি-উদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝা যায়, ক্যানাল বা নালা-সমূহে দরজা ছিল। সেই দরজার সাহায্যে জল আনয়ন ও নিঃসারণ কার্য্য সম্পন্ন করা যাইত। সেই কপাট খুলিয়া দিয়া অতিরিক্ত

জল আনিয়া অপরের অনিষ্ট করিলে অথবা কপাট বন্ধ করিয়া জলপথ রুদ্ধ করিলে দণ্ডের ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছিল। 'সীতাধ্যক্ষ' ব্যবস্থায় কৌটিল্য কৃত্রিম খনিত নালার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। বৃষ্টিপাতের অনুপাত নির্দ্দেশে তিনি বলিয়াছেন,—"অপরান্তানাং হৈমন্তানাং চ কুল্যাবাপাণাং চ কালতঃ।" * যেখানে জলসরবরাহের জন্য নদী নালা খনিত হয়, সেখানে বারিপাতের পরিমাণ অধিক। অপরান্ত অর্থাৎ পশ্চিম-প্রদেশে এবং হিমবন্ত অর্থাৎ হিমালয় প্রদেশে বহু নদী-নালা খনিত হইয়াছিল। সুতরাং তত্তৎপ্রদেশে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইত,—কৌটিল্যের এই অভিমত। জলসরবরাহের জন্য যেমন নদী নালা খনন করা হইয়াছিল, জীর্ণ-সংস্কারেরও তেমনি ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত ছিল। "অপ্রতীকারে হীনদ্বিগুণো দণ্ডঃ।"—যাহারা এ কার্য্যে শৈথিল্য করিত, তাহাদের প্রতি গুরুদণ্ড বিহিত হইত। এতদংশের আলোচনায়ও কৌটিল্যের শ্রেষ্ঠ রাজনীতি-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। খনি-বিদ্যা বিষয়ে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, বায়ুবিজ্ঞানে এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞান-গবেষণা অমানুষিক ছিল, মিউনিসিপাল সংক্রান্ত ব্যবস্থায় তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল,—এ প্রসঙ্গের আলোচনায় তাহা উপলব্ধি হয়। আর বুঝা যায়, তিনি যে রাজ্যের কর্ণধাররূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সে রাজ্য সর্ব্ববিষয়ে উন্নতির উচ্চ-চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিল এবং তাঁহার বিধি-ব্যবস্থায় সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

---

* অর্থশাস্ত্রের অন্তর্গত 'সীতাধ্যক্ষ' ব্যবস্থায় যে 'কুল্যাব' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে কৃত্রিম নদী-নালা খননের বিষয় মনে হয়। পশ্চিম প্রদেশে এবং হিমালয় অঞ্চলে 'কুল্যাব' প্রস্তুত হইত, এবং কৃষির উৎকর্ষ সাধন জন্য তদ্দ্বারা জলসরবরাহ করিবার ব্যবস্থা ছিল, ঐ অংশে কৌটিল্য সেই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। হিমালয়-প্রদেশ ও পশ্চিমাঞ্চল পর্ব্বতবহুল। সে সকল স্থানে স্বাভাবিক নদী-নালার অপ্রাচুর্য্য আজিও পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং সেখানে কৃত্রিম নদীনালার সাহায্যে জলসরবরাহের ব্যবস্থা আধুনিক কালের ন্যায় প্রাচীন কালেও বিহিত হইয়াছিল। অপরান্ত এবং হিমবন্ত দেশে সেই জন্য বহুল পরিমাণে কৃত্রিম নদী-নালা প্রভৃতি খননের ব্যবস্থা কৌটিল্য বিহিত করিয়াছিলেন। সেই সকল নদী-নালায় দরজা সংযোজিত হইয়াছিল এবং আবশ্যকানুরূপ জল সরবরাহ করা যাইতে পারিত,—বাস্তুবিক্রয় অংশের 'সেতুভ্যোঃ' শব্দে তাহা সপ্রমাণ হয়। অধুনা 'ক্যানাল' বা কৃত্রিম নালা প্রভৃতিতে যে 'স্লুইস্-গেট' (Sluice Gate) দরজা থাকে, প্রাচীন কালের 'কুল্যাব' বা ক্যানাল সমূহের 'সেতু' তদনুরূপ বলিয়া অনুমান করা যায়। 'বাতপ্রবৃত্তিম্'—বায়ু-যন্ত্র সাহায্যে জল উত্তোলন করা। আজিকালি ষ্টিম (Steam) বা বাষ্প-শক্তি দ্বারা যেমন জল উত্তোলন ও জলসরবরাহ করিবার ব্যবস্থা আছে, প্রাচীনকালে বায়বীয় শক্তির সাহায্যে সে কার্য্য সমাহিত হইত। বিজ্ঞান বিষয়ে কতদূর উন্নত হইলে এই সকল বৈজ্ঞানিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। মেগাস্থিনীস বলিয়াছেন,—"Some superintend the rivers, measure the land as is done in Egypt, and inspect the sluices by which water is let out from the main canals into other branches, so that every one may have an equal supply of it."—Fragments XXXIV, Bk. III. সুতরাং আধুনিক যে ব্যবস্থার প্রতিই দৃষ্টিপাত করি না কেন, সে সকল ব্যবস্থারই প্রাচীনের অনুসৃতি বলিয়া উপলব্ধি হয়; আর তাহাতে পূর্ব্বকীর্ত্তির নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়া হৃদয় আনন্দ-রসে আপ্লুত হইয়া উঠে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

—০•০—

পশুপালন ব্যবস্থায় আদর্শ।

[ভারতে পশুপালন,—পশ্বাদির বাহুল্যে ঐশ্বর্য্য-বাহুল্য ;—পশুপালন বিষয়ে ব্যবস্থা-বিধান,—গোহধ্যক্ষ, অশ্বাধ্যক্ষ, হস্ত্যধ্যক্ষ, বিবীতাধ্যক্ষ, সূনাধ্যক্ষ প্রভৃতি পশু-বিভাগের বিভিন্ন কর্ম্মচারী ;—কর্ম্মচারিগণের কর্ত্তব্য ;—গোপালক,—বেতনানুসারে গোপালকের শ্রেণিবিভাগ,—বেতনোপগ্রাহিক, করপ্রতিকর, ভগ্নোৎসৃষ্টক, ভাগানুপ্রবিষ্টক প্রভৃতি,—পশুপাল-সংগঠন-প্রণালী ;—পশ্বাদির সংখ্যানিরূপণ এবং তালিকা-সংগ্রহ,—তাহাদের ষোড়শবিধ শ্রেণীর উল্লেখ ;—পশ্বাদির খাদ্য ব্যবস্থা,—খাদ্যাদির পরিমাণ,—দোহন সংক্রান্ত নিয়মাদি,—আহার পরিমাণে দুগ্ধ পরিমাণ,—চিকিৎসা-ব্যবস্থা ;—স্বাস্থ্যোন্নতি বিধানে অশেষ প্রয়াস,—চারণ ভূমির ব্যবস্থা,—চারণভূমি-রক্ষণ-প্রণালী,—স্বত্ব-বিষয়ক অন্যান্য ব্যবস্থা ;—অশ্বপালনে অশ্বাধ্যক্ষের কর্ত্তব্য,—আকৃতি প্রকৃতি অনুসারে তাহাদের তিনটী বিভাগ,—তীক্ষ্ণ, ভদ্র ও মন্দ,—অশ্বাদির আহার্য্য-ব্যবস্থা,—অশ্ব-পরীক্ষা,—অশ্বের শিক্ষাপ্রণালী,—গতি প্রভৃতির পরিচয়,—অশ্বশালার ব্যবস্থায় স্বাস্থ্যবিধানের পরিচয়,—চিকিৎসার অবহেলায় চিকিৎসকের দণ্ড ;—হস্তিপালন ব্যবস্থা,—তদুদ্দেশ্যে হস্ত্যধ্যক্ষ প্রভৃতি বিভিন্ন কর্ম্মচারী নিয়োগ,—তাঁহাদের কর্ত্তব্য ও কার্য্য-পরিচয়,—হস্তী ধৃত করিবার পদ্ধতি,—হস্তীর শিক্ষা বিধান,—উশৃঙ্খল হস্তীর শাস্তির উল্লেখ,—হস্তীর স্বাস্থ্য-বিধানে বিবিধ প্রয়াস,—গৃহ-নির্ম্মাণের নিয়মাবলি,—খাদ্যাদির ও স্নানের ব্যবস্থা,—চিকিৎসার বন্দোবস্ত,—নদীজ ও পার্ব্বতীয় হস্তী,—পক্ষী সংরক্ষণ ;—শিক্ষা-বিধানে ও শিক্ষাপ্রচারে উৎকর্ষের পরিচয় ;—সর্ব্ববিষয়ে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপন,—প্রাচীন হিন্দু জাতির গৌরব-প্রতিষ্ঠা।]

পশুপালন ব্যবস্থায়—কৌটিল্যের কৃতিত্বের আর এক নিদর্শন প্রকটিত। পশুপালনের সুবন্দোবস্ত আদর্শ-রাজ্যের আর এক আদর্শ দৃষ্টান্ত। ভারতবর্ষ—কৃষিপ্রধান। বেদাদি হইতে আরম্ভ করিয়া স্মৃতি-পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারতাদি শাস্ত্র-গ্রন্থের আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, ভারতের অপরাপর শিল্পের মধ্যে কৃষিশিল্প প্রধান স্থান অধিকার করিয়া ছিল ; আর কৃষিশিল্পের উন্নতির জন্য বিবিধ ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছিল। কৃষির উন্নতি-কল্পে গৃহপালিত পশু যে একান্ত প্রয়োজনীয়, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না। আজিও ভারতবর্ষে কৃষিকার্য্যের জন্য পাশ্চাত্য-দেশের ন্যায় কল-যন্ত্রাদি প্রবর্ত্তিত হয় নাই। কর্ষণ জন্য আজিও ভারতবর্ষে গো-মহিষাদি পশু ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং তাহাদের উপকারিতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। স্বর্ণপ্রসবিনী ভারতভূমি উর্ব্বরতার জন্য চিরপ্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। কর্ষণযোগ্য ভূমিও প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান। কিন্তু প্রাচীন কালের ন্যায় সেরূপ প্রচুর শস্য এখন আর উৎপন্ন হয় না। উপযুক্ত পশ্বাদির অভাবই তাহার একতম কারণ বলিয়া কৃষিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ঘোষণা করিয়া থাকেন। পশুপালনে চারণভূমি এবং উপযুক্ত খাদ্য-সরবরাহ বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু অধুনা ভারতে চারণভূমির একান্ত অভাব। খাদ্যাদি সরবরাহ সম্বন্ধেও কোনও বিশেষ ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় না। কর্ষণ-সমর্থ পশ্বাদি এখন প্রায়ই লোপ পাইতে বসিয়াছে দুর্ব্বল রুগ্ন হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। কিন্তু প্রাচীনকালে ইহার বিপরীত

ভারতে পশুপালন।

অবস্থা প্রত্যক্ষ করি। প্রাচীনকালে যেমন চারণ-ভূমির সুব্যবস্থা ছিল, তেমনি খাদ্যাদি-সরবরাহের বিধি-নিয়মাদি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। যেমন পশুচিকিৎসাদির বন্দোবস্ত ছিল, তেমনি তাহাদের স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত বিহিত হইয়াছিল। উপযুক্ত চারণভূমি, প্রচুর খাদ্য এবং স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা বিহিত হওয়ায় সুস্থ সবল পশুগণ দেশের সর্ব্বত্র বিচরণ করিত; আর তাহাতে কৃষি-বাণিজ্যের বিভিন্ন বিভাগে বিশেষ বিশেষ উন্নতি সাধিত হওয়ায় সে রাজ্য সুখৈশ্বর্য্যের উচ্চ চূড়ায় অধিরোহণ করিয়াছিল।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পশুপালন-সংক্রান্ত বিধি-ব্যবস্থার অশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। পশু-সংরক্ষণ উদ্দেশ্যে তিনি রাজকীয় স্বতন্ত্র একটী বিভাগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আর বিভাগীয় বিভিন্ন কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের জন্য বিভিন্ন নামধেয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বহুসংখ্যক চরণভূমির এবং প্রচুর আহার্য্যের ব্যবস্থা বিহিত হওয়ায় পশু-সংরক্ষণে ও পশুপালনে দেশের বিবিধ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। পশুসংরক্ষণ বিভাগে পাঁচ জন অধ্যক্ষ ছিলেন। 'গোঽধ্যক্ষ'—গোপালন সংক্রান্ত বিবিধ কার্য্য পরিদর্শন করিতেন। চারণভূমি পরিদর্শনের ভার—'বিবীতাধ্যক্ষের' প্রতি ন্যস্ত ছিল। 'সূনাধ্যক্ষ' শিকার-সম্পর্কীয় ব্যবস্থা বিধান করিতেন। 'হস্ত্যধ্যক্ষ'—হস্তিসংক্রান্ত বিভাগের উচ্চতম কর্ম্মচারী ছিলেন। বন ও বনজাত দ্রব্য পর্য্যবেক্ষণের ভার 'কুপ্যাধ্যক্ষ' প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অশ্বাদি পর্য্যবেক্ষণের দায়িত্ব 'অশ্বাধ্যক্ষের' প্রতি ন্যস্ত ছিল। বিশেষ বিশেষ কার্য্য-ব্যপদেশে এই সকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেও, নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ভিন্ন প্রত্যেককেই প্রত্যেক বিভাগীয় কোনও-না-কোনও কার্য্য সম্পাদন করিতে হইত। সুতরাং, তাঁহারা এক হিসাবে পরস্পরের কার্য্যের জন্য পরস্পর দায়ী ছিলেন। গো-পালনের ব্যবস্থা-বিধান গোঽধ্যক্ষের প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। তদ্ব্যতীত তাঁহাকে মেষ, ছাগ, মহিষ, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, শূকর, কুক্কুর, অশ্ব, অশ্বতর প্রভৃতিরও তত্ত্বাবধান করিতে হইত। তাঁহার কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য বিভিন্ন নামধেয় বহু কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। 'গোঽধ্যক্ষ' প্রকরণে তাঁহাদের নামোল্লেখ আছে; যথা,—

তদুদ্দেশ্যে ব্যবস্থা।

"গোপালকপিণ্ডারকদোহকমন্থকলুব্ধকাঃ শতং শতং ধেনূনাং হিরণ্যভৃতাঃ পালয়েয়ুঃ। ক্ষীরঘৃতভৃতা হি বৎসানুপহন্যুরিতি বেতনোপগ্রাহিকম্।"—গোঽধ্যক্ষঃ, ১২৮ম পৃষ্ঠাঃ॥

কর্ম্মচারিগণের কেহ দোহক, কেহ মন্থক এবং কেহ লুব্ধক নামে অভিহিত। তাঁহাদের প্রত্যেকের উপর এক শত হিসাবে গো-পালনের ব্যবস্থা ছিল। কর্ম্মচারিগণের কাহাকেও বেতনোপগ্রাহিক, কাহাকেও করপ্রতিকর, কাহাকেও ভগ্নোৎসৃষ্টক, কাহাকেও ভাগানুপ্রবিষ্টক—এইরূপ বন্দোবস্তে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। গোপালনে কর্ম্মচারিদিগের নিয়োগ-প্রথা সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রে যে বিধি বিহিত হইয়াছে, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল; যথা,—

"গোঽধ্যক্ষো বেতনোপগ্রাহিকং করপ্রতিকরং ভগ্নোৎসৃষ্টকং ভাগানুপ্রবিষ্টকং ব্রজপর্য্যগ্রং নষ্টং বিনষ্টং ক্ষীরঘৃতসঞ্জাতং চোপলভেত।…জরদ্‌গুধেনুগর্ভিণীপষ্ঠৌহী-বৎসতরীণাং সমবিভাগং রূপশতমেকঃ পালয়েৎ। ঘৃতস্যাষ্টৌ বারকান্ পণিকং পুচ্ছং অঙ্কচর্ম বার্ষিকং দদ্যাদিতি করপ্রতিকরঃ। ব্যাধিতান্যঙ্গানন্যদোহীদুর্দোহা-পুত্রঘ্নীনাং চ সমবিভাগং রূপশতং পালয়ন্তস্তজ্জাতিকং ভাগং দদ্যুরিতি ভগ্নোৎ-

স্পৃষ্টকম্। পরচক্রাটবীভয়াদনুপ্রবিষ্টানাং পশূনাং পালনধর্ম্মেণ দশভাগং দদ্যুরিতি ভাগানুপ্রবিষ্টকম্॥"—দ্বিতীয় খণ্ডঃ, ২১ম অধ্যায়, গোঽধ্যক্ষঃ, ১২৮ম—১২৯ম পৃষ্ঠাঃ।

গাভী-পালকগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। বেতনোপগ্রাহিক, করপ্রতিকর, ভগ্নোৎস্পৃষ্টক এবং ভাগানুপ্রবিষ্টক। বেতন অনুসারে তাহাদের ঐরূপ শ্রেণিবিভাগ হইয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট বেতন লইয়া যাহারা গোপালনে নিযুক্ত হইত, তাহারা বেতনোপগ্রাহিক। দ্বিতীয় শ্রেণীর গোপালককে এক শত পশু প্রদান করা হইত। জরদ্গু, দুগ্ধবতী গাভী, গর্ভিণী, পষ্ঠৌহী, বৎসতরী—এই পঞ্চ প্রকারের গাভী সমসংখ্যায় তাহাদের নিকট প্রতিপালনার্থ প্রদান করা হইত। তাহারা প্রতি বৎসর প্রভুকে আট ভার ঘৃত এবং মৃত পশুর পুচ্ছ-চর্ম্মাদি প্রদান করিত। এই শ্রেণীর পালক—'করপ্রতিকর' আখ্যায় অভিহিত। তৃতীয় শ্রেণীর গোপালক—'ভগ্নোৎস্পৃষ্টক'। চারি শ্রেণীর সমান সংখ্যক গবাদি তাহাদিগকে প্রদান করা হইত। ব্যাধিগ্রস্ত, অদোহ, দুর্দ্দোহ এবং পুত্রঘ্নী প্রভৃতি গাভী তাহাকে দিবার নিয়ম ছিল। তাহারা ব্যাধিগ্রস্ত পশুর চিকিৎসাদি করাইয়া সুস্থ ও সবল করিত;—সন্তাননষ্টকারী পশুকে বশে আনিত;—আর দুগ্ধহীন বা দুর্দ্দোহ গাভীর দুগ্ধ-দোহনের ব্যবস্থা করিত। পূর্ব্বোক্ত চারি শ্রেণীর পশুপালন বিশেষ আয়াসসাধ্য। সেই জন্য দুগ্ধোৎপন্ন দ্রব্যের নির্দ্দিষ্ট অংশ তাহারা গ্রহণ করিত। আর যাহারা নিজ নিজ গবাদির প্রতিপালনে অসমর্থ হইত, অথবা দস্যু-তস্করের ভয়ে রাজকীয় গোশালায় তাহা প্রদান করিত, কর-স্বরূপ তাহাদিগকে উৎপন্ন-দ্রব্যের দশমাংশ রাজসরকারে প্রদান করিতে হইত। তাহারা 'ভাগানুপ্রবিষ্টক' সংজ্ঞায় অভিহিত। পশ্বাদির দল-সংগঠন সম্বন্ধেও বিশেষ বিধি ছিল। গর্দ্দভ ও অশ্বতর এক দলে এক শতের অধিক প্রায়ই দৃষ্ট হইত না; আর তাহাদের মধ্যে মাত্র পাঁচটী পুং-জাতীয় পশু থাকিত। ছাগমেষাদির দলে ঐরূপ দশটী এবং গাভী, মহিষ ও উষ্ট্র প্রভৃতির দলে মাত্র চারিটী পু-জাতীয় পশু সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। যথা,—

"পঞ্চর্ষভং খরাশ্বানামজাবীনাং দশর্ষভম্।
শত্যং গোমহিষোষ্ট্রাণাং যূথং কুর্য্যাচ্চতুর্বৃষম্॥"

গো-মেষ-মহিষাদির সংখ্যা নিরূপণ করিয়া তাহার হিসাব-সংরক্ষণের ব্যবস্থা অর্থশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। রাজকীয় গো-শালার স্ত্রী ও পুং জাতীয় যে সকল পশু থাকিত, তাহাদের তালিকা প্রস্তুত করিয়া অধ্যক্ষ রাজচিহ্ন দ্বারা পশুসমূহ চিহ্নিত করিতেন।

সংখ্যা-নিরূপণ।

হৃত, মৃত, নষ্ট, বিনষ্ট সর্ব্বপ্রকার পশুর বিবরণ সেই তালিকায় সন্নিবিষ্ট করিবার বিধি ছিল। প্রকৃতির নিয়মানুসারে রোগাক্রান্ত হইয়া পঞ্চত্ব লাভ করিলে, অথবা বার্দ্ধক্যের পীড়নে কিংবা কোনও অস্বাভাবিক উপায়ে পশুগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, কিংবা অন্য কোনও কারণে তাহাদের মৃত্যু ঘটিলে, তালিকায় অধ্যক্ষগণ সে সকল বিবরণ সন্নিবিষ্ট করিতেন। পুং, স্ত্রী, যুবা ও বৃদ্ধ হিসাবে পশ্বাদির শ্রেণিবিভাগ হইত। তদনুসারে পশ্বাদির বহু শ্রেণীর পরিচয় অর্থশাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। সে পরিচয়; যথা,—

বৎসা বৎসতরা দম্যা বহিনী বৃষা উক্ষাণশ্চ পুঙ্গবাঃ যুগবাহনশকটবহা বৃষভাসূনা মহিষাঃ পৃষ্ঠস্কন্ধবাহিনশ্চ মহিষাঃ বৎসিকা বৎসতরী পষ্ঠৌহী গর্ভিণী ধেনুশ্চাপ্রজাতা

বন্ধ্যাশ্চ গাবো মহিষশ্চ মাসদ্বিমাসজাতাস্তাসামুপজা বৎসা বৎসিকাশ্চ। মাসদ্বিমাস-জাতানঙ্কয়েৎ। মাসদ্বিমাসপর্য্যুষিতমঙ্কয়েৎ। অঙ্কং চিহ্নং বর্ণং শৃঙ্গান্তরং চ লক্ষণ-মেবমুপজা নিবন্ধয়েদিতি ব্রজপর্য্যগ্রম্। চোরহৃতমন্যযূথপ্রবিষ্টমবলীনং বা নষ্টম্। পঙ্কবিষমব্যাধিজরাতোয়াধারাবসন্নং বৃক্ষতটকাষ্ঠশিলাভিহতমীশানব্যালসর্পগ্রাহদাবাগ্নি-বিপন্নং বিনষ্টং প্রমাদাদভ্যাভবেয়ুঃ।"—গোহধ্যক্ষঃ, ২১ম অধ্যায়, ১২৯ম পৃষ্ঠাঃ।
তালিকায় উল্লিখিত ষোড়শ প্রকার পশুর নাম—বৎস, বৎসতরা, দম্যা, বহিনী, বৃষ, উক্ষণঃ, পুঙ্গব, যুগবাহন বৃষভ, শকটবহ বৃষভ, সূনা, মহিষ, পৃষ্ঠস্কন্ধবাহিন মহিষ, বৎসিকা, বৎসতরী, পষ্ঠৌহী, গর্ভিণী, ধেনু, অপ্রজাতা, বন্ধ্যা, মাসদ্বিমাসজাতাস্তাসামুপজা বৎস ও বৎসিকা। * রাজ-পশুশালাস্থ এই সকল পশুর সহিত অস্বামিক পশুর গাত্রে রাজচিহ্ন-সমূহ প্রদান করিবার বিধি ছিল। শৃঙ্গদ্বয়ের দূরত্ব পরিমাণে, স্বাভাবিক চিহ্ন দ্বারা এবং বর্ণ অনুসারে চিহ্নিত পশুদিগের শ্রেণিবিভাগ হইত। গোহধ্যক্ষ স্বয়ং এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। ভারবাহী পশুর নাসারন্ধ্রে ছিদ্র করিয়া রশ্মি-সংযোজনের প্রথাও অর্থশাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। 'নস্য' নামে উহা অভিহিত হইয়া থাকে।

পশ্বাদির স্বাস্থ্যোন্নতি-কল্পে খাদ্য-সরবরাহের এবং চিকিৎসাদির ব্যবস্থায়ও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। নস্যযুক্ত ভারবাহী পশু এবং অন্যান্য পশুর খাদ্যাদি সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রে এক বিস্তৃত তালিকা লিপিবদ্ধ আছে। তদনুসারে ঐ সকল পশুকে নিম্নলিখিত পদ্ধতি-ক্রমে ওজন-পরিমাণে খাদ্য প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। অৰ্দ্ধ ভার যবস, এক ভার তৃণ, এক তুলা খোল, দশ আঢ়ক কণকুণ্ডক বা ভূষি, পাঁচ পল লবণ, এক প্রস্থ পানীয়, এক তুলা মাংস, যব বা মাস এক দ্রোণ, এক আঢ়ক দধি, এক আঢ়ক দুগ্ধ বা ক্ষীর, এক আঢ়ক সুরা, এক প্রস্থ তৈলাদি স্নেহ-পদার্থ, দশ পল ক্ষার বা গুড়, এক পল শৃঙ্গিবের (আদ্রক জাতীয় দ্রব্য) এবং নাসারন্ধ্রে মৰ্দ্দন করিবার জন্য এক কুড়ুম্ব তৈল। অন্যান্য পশুকেও পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য-সমূহ আহার্য্য স্বরূপ প্রদান করা হইত। কিন্তু তাহার হার-পরিমাণে তারতম্য ছিল। অশ্বতর, গাভী এবং গৰ্দ্দভ প্রভৃতিকে পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য-সমূহের পরিমাণের এক সিকি কম খাদ্য প্রদান করা হইত। মহিষ ও উষ্ট্রের পক্ষে দ্বিগুণ আহার্য্য প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। তৃণোদক পশ্বাদির প্রধান খাদ্য। সময় সময় অবস্থা-বিশেষে পূর্ব্ববিধ খাদ্য-পানীয় প্রদানের বন্দোবস্ত হইত। গোহধ্যক্ষে, যথা,—

খাদ্য ও স্বাস্থ্য-ব্যবস্থায়।

বলীবর্দানাং নস্যাশ্বভদ্রগতিবাহিনাং যবসস্যার্ধভারঃ তৃণস্য দ্বিগুণং; তুলা ঘাণপিণ্যাকস্য; দশাঢ়কং কণকুণ্ডকস্য; পঞ্চপলিকং মুখলবণং; তৈলকুড়ুম্বো নস্যং; প্রস্থঃ পানং; মাংসতুলা; দধ্নশ্চাঢ়কং; যবদ্রোণং, মাষানাং বা পুলাকঃ; ক্ষীরদ্রোণমর্ধাঢ়কং বা

* দম্যা ও বহিনী বৃষ—পোষমানান ও ভারবাহী বৃষ; উক্ষণঃ ও পুঙ্গবাঃ—গর্ভাধান জন্য রক্ষিত বৃষ; যুগবাহন ও শকটবহ বৃষভ—যুগ্ম-বন্ধনে যে বৃষ দ্বারা শকটচালনা করা হয়; সূনা—যাহাদের মাংস খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৎসিকা—বকনা বাছুর; বৎসতরী—কিশোরপ্রাপ্ত গাভী; পষ্ঠৌহী—যুবতী গাভী; ধেনু—দুগ্ধবতী গাভী; অপ্রজাতা—যাহাদের সন্তান হয় নাই; মাসদ্বিমাসজাতাস্তাসামুপজা বৎসাবৎসিকাশ্চ—এক মাস বা দুই মাস বয়স্ক বাছুর।

সুরায়াঃ; স্নেহপ্রস্থঃ; ক্ষারদশপলং; শৃঙ্গিবেরপলং চ প্রতিপানম্। পাদোনমশ্বতরগোখরাণাং দ্বিগুণং মহিষোষ্ট্রানাং কর্ম্মকরবলীবর্দানাং পায়নার্থানাং চ। ধেনূনাং কর্মকালতঃ ফলতশ্চ বিধাদানম্। সর্বেষাং তৃণোদকপ্রকাম্যমিতি গোমণ্ডলং ব্যাখ্যাতম্। পঞ্চর্ষভং খরাশ্বানামজাবীনাং দশর্ষভম্। শক্যং গোমহিষোষ্ট্রাণাং যূথং কুর্য্যাচ্চতুর্বৃষম্॥"

দুগ্ধদোহনাদি সম্বন্ধেও বিবিধ নিয়ম ছিল। বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত কালে প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুগ্ধ-দোহনের ব্যবস্থা ছিল। শীত ঋতুতে এবং বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে কেবলমাত্র প্রাতে দুগ্ধ দোহন করা হইত। স্বাস্থ্য-বিষয়ে এ ব্যবস্থাও কম উপযোগী নহে। এতদ্ব্যতীত কি পরিমাণ দুগ্ধে কি পরিমাণ ঘৃতাদি উৎপন্ন হয়, তাহাও কৌটিল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। এক দ্রোণ গো-দুগ্ধে এক প্রস্থ ঘৃত হয়। ঐ পরিমাণ মহিষের দুগ্ধে উহার অপেক্ষা অধিক এক-পঞ্চমাংশ অতিরিক্ত ঘৃত উৎপন্ন হইবে। ঐ পরিমাণ ছাগ-দুগ্ধে উহার দেড় গুণ ঘৃত উৎপন্ন হইতে পারে। খাদ্য পানীয়ের উপর দুগ্ধাদির পরিমাণ নির্ভর করে। অধিক পরিমাণে আহার্য্য প্রদান করিলে অধিক পরিমাণে দুগ্ধ-ঘৃতাদি উৎপন্ন হয়। আর খাদ্যাদির হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে দুগ্ধাদিরও হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। এতৎসম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রে নিম্নরূপ বিধি দৃষ্ট হয়,—

"বর্ষাশরদ্ধেমন্তানুভয়তঃ কালং দুহ্যুঃ। শিশিরবসন্তগ্রীষ্মানেককালম্। দ্বিতীয়কালদোগ্ধু রঙ্গুষ্ঠচ্ছেদো দণ্ডঃ। দোহকালমতিক্রামতস্তৎফলহানং দণ্ডঃ। এতেন নস্যদম্যযুগবিঙ্গনবর্ত্তনকালা ব্যাখ্যাতাঃ। ক্ষীরদ্রোণে গবাং ঘৃতপ্রস্থঃ; পঞ্চভাগাধিকো মহিষীণাং; দ্বিভাগাধিকোঽজাবীনাং; মন্থো বা সর্ব্বেষাং প্রমাণং ভূমিতৃণোদকবিশেষাদ্ধি ক্ষীরঘৃতবৃদ্ধির্ভবতি।"

মৃত গো-মহিষাদি পালিত পশুর চর্ম্ম, রোম, খুর, লাঙ্গুল প্রভৃতি হইতেও রাজকোষে অর্থাগম হইত। পশ্বাদির মৃত্যু হইলে অধ্যক্ষ ঐ সকল দ্রব্য গ্রহণ করিতেন। কৌটিল্যের উক্তি,—

"কারণমৃতস্যাঙ্কচর্ম্ম গোমহিষস্য কর্ণলক্ষণমজাবিকানাং পুচ্ছমঙ্কচর্ম চাশ্বখরোষ্ট্রাণাং বালচর্ম্মবস্তিপিত্তস্নায়ুদন্তখুরশৃঙ্গাস্থীনি চাহরেয়ুঃ।...অজাদীনাং যাম্যাবিকীমূর্ণাং গ্রাহয়েৎ। তেনাশ্বখরোষ্ট্রবরাহব্রজা ব্যাখ্যাতাঃ।"—গোঽধ্যক্ষঃ, ১৩০ম ও ১৩১ম পৃষ্ঠাঃ॥

পশ্বাদির স্বাস্থ্যবিধানের পূর্ব্বোক্ত নিয়মাবলী ভিন্ন চিকিৎসাদির বিবিধ ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছিল। পশুপালকগণ ঔষধাদি দ্বারা চিকিৎসা করিতেন। ঔষধের গুণহীনতার জন্য অথবা পালকের অসাবধানতা হেতু পশুর পীড়া বৃদ্ধি হইলে, চিকিৎসার ব্যয়ভারের দ্বিগুণ অর্থদণ্ড হইত। এতদ্ব্যতীত পশ্বাদির গাত্রে আঘাত করিলে দণ্ডের বিধান ছিল। আঘাতের তারতম্য ও প্রকৃতি অনুসারে রাজা শাস্তি প্রদান করিতেন। দণ্ডাঘাতে পশুকে কষ্ট দিলে এক বা দুই পণ, পশুর গাত্র হইতে শোণিতপাত করিলে দ্বিগুণ দণ্ড প্রদান করিতে হইত। ক্ষুদ্রপশু সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা বিহিত ছিল। বৃহৎ পশুর পক্ষে পূর্ব্বোক্ত হারের দ্বিগুণ অর্থদণ্ড দিতে হইত। অর্থশাস্ত্রের অন্তর্গত গোঽধ্যক্ষ, অশ্বাধ্যক্ষ ও দণ্ডপারুষ্য অংশত্রয়ে এতদ্বিষয়ের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। অর্থশাস্ত্র (১৯৭ম পৃষ্ঠাঃ) হইতে এতদ্বিষয়ক কৌটিল্যের নীতি নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা,—

"বালবৃদ্ধব্যাধিতানাং গোপালকাঃ প্রতিকুর্য্যুঃ।"—গোঽধ্যক্ষঃ, ১২৯ম পৃষ্ঠাঃ।..."অশ্বানাং চিকিৎসকাঃ শরীরহ্রাসবৃদ্ধিপ্রতীকারমৃতুবিভক্তং চাহারম্।...ক্রিয়াভৈষজ্যসঙ্গেন ব্যাধিবৃদ্ধৌ প্রতীকারদ্বিগুণো দণ্ডঃ। তদপরোধেন বৈলোম্যে পত্রমূল্যং দণ্ডঃ। তেন গোমণ্ডলং

খরোষ্ট্রমহিষমজাবিকং চ ব্যাখ্যাতম্।"—অশ্বাধ্যক্ষঃ, ১৩৪ম—১৩৫পৃষ্ঠাঃ ॥..."পথি ব্যাধিকর্ম্মমদজরাঽভিতপ্তানাং চিকিৎসকাঃ প্রতিকুর্য্যুঃ।"—হস্তিপ্রচারঃ, ১৩৯ম পৃষ্ঠাঃ ॥

"ক্ষুদ্রপশূনাং কাষ্ঠাদিভির্দুঃখোৎপাদনে পণো দ্বিগুণো বা দণ্ডঃ। শোণিতোৎপাদনে দ্বিগুণঃ। মহাপশূনামেতেষ্বস্থানেষু দ্বিগুণো দণ্ডঃ, সমুত্থানব্যয়শ্চ।"—দণ্ডপারুষ্যম্ ॥

চারণ-ভূমির ব্যবস্থা বিধান কৃতিত্বের আর এক নিদর্শন। পশুসংরক্ষণ বিষয়ে এবং তাহাদের স্বাস্থ্য-বিধানে চারণ-ভূমি একান্ত প্রয়োজনীয়। পশ্বাদির আহার্য্য-সরবরাহেও উহা অল্প উপযোগী নহে। আবদ্ধ অবস্থায় প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে মানুষের যেমন স্বাস্থ্যহানি ঘটে, আবদ্ধ অবস্থায় পশ্বাদিরও সেইরূপ স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া যায়। চরিয়া বেড়াইবার সুবিধা না পাইলে দেহপুষ্টি সম্ভব নহে। দেহপুষ্টিতে স্বাস্থ্যরক্ষা না হইলে অতি অল্পকাল মধ্যেই তাহারা কার্য্যের অনুপযোগী হইয়া পড়ে। সেই জন্য পণ্ডিতগণ পশুসংরক্ষণের জন্য চারণভূমির প্রয়োজনীয়তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অধুনা চারণ-ভূমির বিশেষ অভাব হওয়ায় পশ্বাদির সংখ্যা বহুল পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। আর সেই জন্য কর্ষণোপযোগী পশুর অভাবে ভারতের শস্য-পরিমাণ অনেকাংশে কমিয়া গিয়াছে। প্রাচীন ভারতে চারণ-ভূমি সম্বন্ধে কিরূপ বিধান বিহিত হইয়াছিল, বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে তৎপ্রদর্শনের প্রয়াস পাইব। কৌটিল্যের নীতির আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, সে সময়ে দেশের সর্ব্বত্র বহু চারণ-ভূমি ছিল। চারণভূমি নির্ম্মাণের, তাহা সংরক্ষণের এবং তাহার উন্নতিবিধানের বিবিধ বিধি কৌটিল্য বিহিত করিয়াছিলেন। সে বিধি-ব্যবস্থায় স্বতন্ত্র এক তত্ত্বাবধায়ক বা অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি 'বিবীতাধ্যক্ষ' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। চারণভূমি পর্য্যবেক্ষণ করা এবং তৎসংক্রান্ত বিধি বিধান প্রয়োগ, তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। কোন্ স্থানে কিরূপ ভাবে পশুচারণ করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে কিরূপ সুবিধা-অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা, তন্নিরূপণ তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। বিবীতাধ্যক্ষ এক এক ঋতুতে এক এক চারণভূমিতে পশুচারণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। এইরূপে দেখা যায়, সে সময় দেশের সর্ব্বত্র বহু চারণভূমি সংরক্ষিত হইয়াছিল এবং তাহাতে পর্য্যায়ক্রমে একটীর পর অপরটি হিসাবে পশুচারণের ব্যবস্থা ছিল। প্রতি পল্লীতে এবং প্রতি জনপদে বহুসংখ্যক চারণভূমি সে সময় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পালকগণ নিজ নিজ সুবিধা অসুবিধা অনুসারে চারণ-ভূমি নির্ব্বাচিত করিতেন। প্রধানতঃ, তাঁহারা দুইটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। প্রথম—পশুপালের শারীরিক সামর্থ্য; দ্বিতীয়—বিপদ-আপদের তারতম্য। যেখানে বিপদের সম্ভাবনা অল্প; পরন্তু যে স্থান অপেক্ষাকৃত অধিক নিরাপদ;—পালকগণ সাধারণতঃ সেই সকল স্থানের চারণভূমিই পশুচারণ জন্য নির্ব্বাচিত করিতেন। বন্য-প্রদেশে, অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে, বন্যশ্বাপদসঙ্কুল স্থানের মধ্যস্থলে চারণ-ভূমি নির্ব্বাচনের প্রথা ছিল। তাহাতে একদিকে যেমন পশ্বাদির স্বাস্থ্যোন্নতির সুবিধা হইয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি পতিত অনুর্ব্বর ক্ষেত্রও ক্রমশঃ শস্যোৎপাদনোপযোগী হইয়া আসিয়াছিল। অর্থশাস্ত্র হইতে এতৎসংক্রান্ত বিধি-বিধান নিম্নে উল্লেখ করা হইল; যথা,—

"লুব্ধকশ্বগণিভিরপাস্তস্তেনব্যালপরবাধভয়মৃতুবিভক্তমরণ্যং চারয়েয়ুঃ।"—গোঽধ্যক্ষঃ,

১৩০ম পৃষ্ঠাঃ ॥...অকৃষ্যায়াং ভূমৌ পশুভ্যো বিবীতানি প্রযচ্ছেৎ।”—ভূমিচ্ছিদ্র-বিধানম্, ৪৯ম পৃষ্ঠাঃ।...“ভয়ান্তরেষু চ বিবীতং স্থাপয়েৎ।”—বিবীতাধ্যক্ষঃ, ১৪১ম পৃষ্ঠাঃ ॥...ঋতুবিভক্তমরণাম্ চারয়েয়ু।”...“উপনিবেশদিগ্বিভাগে গো-প্রচারান্ বলান্বয়তে বা গবাং রক্ষাসামর্থ্যাচ্চ।”—গোঽধ্যক্ষঃ, ১৩১ম পৃষ্ঠাঃ ॥

চারণ-ভূমিতে সর্ব্বপ্রকার গৃহপালিত পশু চরিতে পারিত। তৎকালে সর্ব্বপ্রকারের পশু রাজার ঐশ্বর্য্য-সম্পদের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল। পশ্বাদির স্বাস্থ্যের উপর দেশের পণ্যশস্তের প্রাচুর্য্য, উৎপত্তি এবং রাজশক্তি নির্ভর করিত। সুতরাং তৎসম্পর্কীয় ব্যবস্থা-বিধানে সর্ব্বদা রাজার খরদৃষ্টি ছিল। চারণক্ষেত্রে হিংস্রজন্তুর উপদ্রব এবং পশুহানি নিবারণ জন্য শিকারী নিযুক্ত হইয়াছিল। পশুচারণকালে তাহারা শঙ্খ ও কুকুর সমভিব্যাহারে চারণক্ষেত্র-সান্নিধ্যে উপস্থিত থাকিত। সর্প, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর উপস্থিতি অনুভব করিলে বিবিধ সঙ্কেতে তাহারা সাবধানতা পরিজ্ঞাপক ধ্বনি করিত। শঙ্খ ও দামামা ধ্বনিতে চৌর ও ব্যাঘ্রের আগমন-বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত হইত। অসভ্য বৈদেশিক জাতির উপস্থিতি-সংবাদ তাহারা রাজ-মুদ্রাঙ্কিত পারাবত সাহায্যে সংবাদ প্রেরণ করিত; অথবা অনবরত অগ্নি প্রজ্বালিত করিবার বিধি ছিল। বিপদ-বার্ত্তা রাজার গোচরীভূত করিবার এইরূপ বিবিধ উপায় অবলম্বন করা হইত। এতদ্ব্যতীত পশুপালকগণ বিবিধ উপায়ে সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। তাঁহারা গোমহিষাদির গলদেশে ঘণ্টা বাঁধিয়া দিতেন। তাহাতে একদিকে ঘণ্টাধ্বনিতে যেমন সর্পাদি হিংস্র জন্তু দূরে পলাইত, তেমনি পলায়িত পশু সন্ধানেরও সুবিধা হইত। স্নান করাইবার আবশ্যক হইলে কর্দ্দম ও কুম্ভীর পরিশূন্য জলাশয়ে তাহাদিগকে স্নান করাইবার ব্যবস্থা ছিল।

“তস্করামিত্রাভ্যাগমে শঙ্খদুন্দুভিশব্দমগ্রাহ্যাঃ কুর্য্যুঃ। শৈলবৃক্ষবিরূঢ়া বা, শীঘ্রবাহনা বা অমিত্রাটবীসঞ্চারং চ রাজ্ঞো গৃহকপোতৈর্ম্মুদ্রাযুক্তৈর্হারয়েয়ুঃ ধূমাগ্নিপরংপরয়া বা। দ্রব্যবস্তিবনাজীবং বর্ত্তিনীঃ চোররক্ষণম্। সার্থাতিবাহ্যং গোরক্ষ্যং ব্যবহারং চ কারয়েৎ।”—বিবীতাধ্যক্ষঃ, ১৪১ম পৃষ্ঠাঃ ॥...সর্পব্যালত্রাসনার্থং গোচরানুপাতজ্ঞানার্থং চ ত্রস্নূনাং ঘণ্টাতূর্য্যং চ বধ্নীয়ুঃ। সমব্যূঢ়তীর্থমকর্দমগ্রাহমুদকমবতারয়েয়ুঃ পালয়েয়ুশ্চ।”

—গোঽধ্যক্ষঃ, ১৩০ম পৃষ্ঠাঃ ॥

চরাইবার সময় বর্ণানুসারে পশুগণের দল বিভক্ত করিতে হইত। ইহাতে অনেক বিষয়ে সুবিধা ছিল। বিভিন্ন দল এক সঙ্গে মিশিয়া গেলেও পালকগণ আপনার পশুদল সহজেই বাছিয়া লইতে পারিতেন।

গবাদির ন্যায় হস্ত্যশ্বাদি পালনে একই নীতি অনুসৃত হইত। অশ্বপরিদর্শনের জন্য অশ্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অশ্বাদির রীতি-প্রকৃতি নির্ব্বাচনে তাঁহার প্রতি কতকগুলি গুরুকার্য্যের ভার ন্যস্ত ছিল। অশ্বসমূহের তালিকা সংরক্ষণ; জন্ম,

অশ্ব-ব্যবস্থা।

বয়স, বর্ণ ও চিহ্ন অনুসারে তাহাদিগের শ্রেণিবিভাগ; আস্তাবল সংক্রান্ত নিয়মাদি প্রতিপালন; অশ্বের খাদ্য-পরিমাণ নির্দ্ধারণ; অশ্বগণের উপযুক্ত শিক্ষা দান; তাহাদের উপযুক্ত চিকিৎসা-বিধান; অন্যান্য বিবিধ উপায়ে অশ্বগণের যত্ন-শুশ্রূষা করা;—অশ্বাধ্যক্ষগণের প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। অশ্বগণ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইত।

জন্মস্থান-হিসাবে তাহাদের একরূপ বিভাগ নির্দ্দিষ্ট ছিল, আবার আকৃতি-প্রকৃতি অনুসারে তাহাদের বিভাগ অন্যরূপ নির্ণীত হইয়াছিল। এতদ্বিষয়ে অর্থশাস্ত্রের উক্তি; যথা,—

"তেষাং তীক্ষ্ণভদ্রমন্দবশেন সান্নাহ্যমৌপবাহ্যকং বা কর্ম্ম প্রযোজয়েৎ॥...
প্রয়োগ্যানামুত্তমাঃ কাম্বোজকসৈন্ধবারট্টজবানায়ুজাঃ। মধ্যমাবাহ্লীকপাপেয়কসৌবীরকতৈতলাঃ। শেষাঃ প্রত্যবরাঃ।"—অশ্বাধ্যক্ষঃ, ১৩৩ম পৃষ্ঠাঃ।

আকৃতি-প্রকৃতি অনুসারে অশ্বের যে বিভাগ হইত, তাহার মধ্যে আবার তিনটী উপবিভাগ দৃষ্ট হয়,—তীক্ষ্ণ, ভদ্র এবং মন্দ। জন্মস্থান হিসাবে সে বিভাগ অষ্ট প্রকার,—কাম্বোজক, সৈন্ধব, আরট্টজ, বানায়ুজ, বাহ্লীক, সৌবীরক, পাপেয়ক এবং তৈতল। এতন্মধ্যে প্রথম চারি স্থানের অশ্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অন্যান্য স্থানের অশ্ব দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। বিবিধ উপায়ে যে সকল অশ্ব সংগৃহীত হইতে পারিত। সেই সকল উপায়ের কতকগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

"অশ্বাধ্যক্ষঃ পণ্যাগারিকং ক্রয়োপাগতমাহবলব্ধমাজাতং সাহায্যকাগতকং পণস্থিতং যাবৎকালিকং বাঽশ্বপর্য়গ্রং কুলবয়োবর্ণচিহ্নবর্গাগমৈর্লেখয়েৎ। অপ্রশস্তন্যঙ্গব্যাধিতাংশ্চাবাদয়েৎ।"—অশ্বাধ্যক্ষঃ, ১৩২ম পৃষ্ঠাঃ॥

গোমহিষাদির যেমন বিবিধ আহার্য্য দেওয়া হইত, অশ্বাদি সম্বন্ধেও সেই একইরূপ বিধানের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যেক উৎকৃষ্ট অশ্বকে নিম্নরূপ হার-পরিমাণে আহার্য্য প্রদান করা হইত,—

"উত্তমাশ্বস্য দ্বিদ্রোণং শালিব্রীহিযবপ্রিয়ঙ্গুণামর্ধশুষ্কমর্ধসিদ্ধং বা মুদ্গমাষাণাং বা পুলাকঃ। স্নেহপ্রস্থশ্চ পঞ্চপলঃ লবণস্য মাংসং পঞ্চাশৎপলিকং রসস্যাঢ়কং দ্বিগুণং বা দধ্নঃ পিণ্ডক্লেদনার্থঃ ক্ষারঃ পঞ্চপলিকঃ সুরায়াঃ প্রস্থঃ পয়সো বা দ্বিগুণঃ প্রতিপানং; দীর্ঘপথভারক্লান্তানাং চ স্বাদনার্থং স্নেহপ্রস্থোঽনুবাসনং কুড়ুবো নস্যকর্ম্মণঃ যবসস্যার্ধভারঃ তৃণস্য দ্বিগুণঃ ষড়রত্নিঃ পরিক্ষেপঃ পুঞ্জীলগ্রাহো বা।"—অশ্বাধ্যক্ষঃ, ১৩৩ম পৃষ্ঠাঃ॥

চাউল, যব, প্রিয়ঙ্গু, মুগ বা মাষ ইহার যে কোনও একটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট অশ্বকে দুই দ্রোণ হিসাবে দেওয়া হইত। তদ্ব্যতীত এক প্রস্থ তৈলাদি স্নেহ-পদার্থ, পাঁচ পল লবণ ও ক্ষার, এক প্রস্থ সুরা, দুই প্রস্থ পয়স ক্ষীর বা দধি প্রভৃতি প্রদান করিবার নিয়ম ছিল। যে সকল অশ্ব অধিক দূর গমনাগমন করিত, অথবা ভারবহনের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত খাদ্যের সঙ্গে এক প্রস্থ ঘৃত, এক কুড়ুব তৈল বা ঘৃত, অর্দ্ধ ভার যবস বা টাটকা ঘাস প্রদান করিবার বিধি বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। তাহাদের শয্যারচনার জন্য এক ভাগ খড় দেওয়া হইত। শয্যার পরিমাণ—ছয় অরত্নি বা দ্বাদশ ফিট। মধ্যম বা ক্ষুদ্রাকার অশ্বের

(১) পণ্যাগারিক—Those that are kept in sale-house for sale. (২) ক্রয়োপাগত—Those that are received by purchase. (৩) আহবলব্ধ—Those that have been captured in wars. (৪) অজাত—Those that are of local breed. (৫) সাহায্যকাগত—Those that are sent for help by the Allies. (৬) পণস্থিত—Those that are morigaged or those that are fresh from the forest. (৭) যাবৎকালিক—Those that are in stable only for a short while." 'পণস্থিত' স্থলে 'বনস্থিত' পাঠও দৃষ্ট হয়। উহার অর্থ—Wild and fresh from the frorest.

আহার্য্য পরিমাণও ঐরূপ ছিল। তবে তাহারা পূর্ব্বোক্ত পরিমাণের এক চতুর্থাংশ কম আহার পাইত। 'বড়বা' এবং 'পারশমানা' অশ্বের আহার্য্য পূর্ব্বোক্ত পরিমাণের অপেক্ষা এক পাদ পরিমাণ অল্প নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। "পাদাবরমেতন্মধ্যমাবরয়োঃ। উত্তমসমো রথ্যো বৃষশ্চ মধ্যমঃ। মধ্যমসমশ্চাবরঃ। পাদহীনং বড়বানাং পারশমানাং চ।" অশ্বাদির খাদ্য-সমূহ বিপাচক, সূত্রগ্রাহক ও চিকিৎসক প্রভৃতি আস্বাদন করিতেন। রাজপুরীতে যেমন বিষপরীক্ষার নিয়ম ছিল এবং সর্পভয় নিবারণ জন্য যেমন বিভিন্ন জাতীয় প্রাণী রক্ষিত হইত, অশ্বশালার কর্ম্মচারিগণ সে সকল বিষয়ে তদ্রূপ নিয়ম প্রতিপালন করিতেন। তদ্ব্যতীত অশ্ব-পরীক্ষারও নানারূপ প্রক্রিয়া ছিল। সে পরীক্ষা-প্রণালী—উৎকৃষ্ট অশ্বের মুখের পরিমাণ বত্রিশ অঙ্গুলি। দৈর্ঘ্য—মুখ-পরিমাণের পাঁচ গুণ। জঙ্ঘাস্থি—বিংশাঙ্গুলি। উচ্চতা—জঙ্ঘাস্থির চতুর্গুণ। তদপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার অশ্বের অঙ্গাদির পরিমাপ, উৎকৃষ্ট অশ্বের পরিমাপাদি অপেক্ষা পঞ্চাঙ্গুলি হিসাবে কম। সর্ব্বোৎকৃষ্ট যে অশ্ব, তাহার দেহ-পরিমাপ শতাঙ্গুলি হিসাবে।

"দ্বাত্রিংশদঙ্গুলং মুখমুত্তমাশ্বস্য, পঞ্চমুখান্যায়ামঃ, বিংশত্যঙ্গুলা জঙ্ঘা, চতুর্জ্জঙ্ঘঃ উৎসেধঃ, ত্র্যঙ্গুলাবরং মধ্যমাবরয়োঃ, শতাঙ্গুলঃ পরিণাহঃ, পঞ্চভাগাবরং মধ্যমাবরয়োঃ।" ১৩২ম পৃষ্ঠাঃ॥

অশ্বশালা ও অশ্বের শিক্ষাবিধান-সংক্রান্ত ব্যবস্থা—পারদর্শিতার নিদর্শন। কৌটিল্য বলিয়াছেন,—প্রত্যেক অশ্বের গৃহ, অশ্ব অপেক্ষা চারি গুণ দীর্ঘ এবং চারি গুণ বিস্তৃত হইবে। কাষ্ঠ-

অশ্বের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা-প্রণালী।

ফলকে বা তক্তা দ্বারা গৃহভূমি আবৃত করিবে। মূত্র এবং পুরীষ নির্গমনের স্বতন্ত্র পথ রাখা প্রয়োজন। সে গৃহে খাদ্যাদি থাকিবে না। পূর্ব্ব বা উত্তরাভিমুখী দরজা রাখিবে। বিভিন্ন প্রকারের অশ্ব বিভিন্ন স্থানে থাকিবে। ফলতঃ, গৃহাদিতে আবর্জ্জনা জমিয়া অশ্বের স্বাস্থ্য-হানি না হয়, অশ্বশালা-নির্ম্মাণে স্বাস্থ্য-রক্ষা-বিষয়ক সে সকল ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছিল। সূত্রগ্রাহক, বন্ধনকারী, পাচক, পালক, কেশকারক এবং জাঙ্গুলীবিৎ চিকিৎসক—সকলেই অশ্বের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। "সূত্রগ্রাহকাশ্ববন্ধকযাবসিকাবিধাপাচকস্থানপালকেশকারজাঙ্গুলীবিদশ্চ স্বকর্ম্ম-ভিরশ্বানারাধয়েয়ুঃ।" অশ্বশালার এই সকল ব্যবস্থা বিধানে কৌটিল্য বলিয়াছেন; যথা,—

"অশ্বায়ামচতুরস্রশ্লক্ষ্ণফলকাস্তারং সখাদনকোষ্ঠকং সমূত্রপুরীষোৎসর্গমেকৈকশঃ প্রাঙ্মুখমুদঙ্মুখং বা স্থানং নিবেশয়েৎ। শালাবশেন বা দিগ্বিভাগং কল্পয়েৎ। বড়বাবৃষকিশোরাণাং একান্তেষু।"—অশ্বাধ্যক্ষঃ, ১৩২ম পৃষ্ঠাঃ।

এইরূপ অশ্বাদির শিক্ষা বিষয়েও বিবিধ বিধান বিহিত হইয়াছে। অশ্বগণের শিক্ষা-কৌশল সকল সময়েই উপযোগী। বিশেষতঃ যুদ্ধকালে সুশিক্ষিত অশ্ব ভিন্ন কার্য্যসিদ্ধি সুকঠিন হইয়া পড়ে। তাই অশ্বের শিক্ষা-বিধান প্রথা চিরদিনই বর্ত্তমান আছে। অশ্বের গতি দ্বিবিধ,—ঔপবাহ্যক এবং সান্নাহ্য। ঔপবাহ্যক গতি আবার পাঁচটী প্রধান অংশে বিভক্ত,—বল্গন, নীচৈর্গত, লঙ্ঘন, ধোরণ এবং নারোষ্ট্র। এই পঞ্চ বিভাগের মধ্যে আবার নানা উপবিভাগ আছে। বল্গন বা বৃত্তাকার গতি পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়। যথা,—(১) উপবেণুক বা এক হস্ত পরিমিত ব্যাসযুক্ত বৃত্তের মধ্যে চক্রাকারে ভ্রমণ, (২) বর্দ্ধমানক বা বৃত্তাকারমার্গে অগ্রসর হওয়া, (৩) যমক বা পরস্পর-সংযুক্ত বলয়াকার পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া অগ্রসর হওয়া; (৪) আলীঢ়প্লুত বা শরীরের সম্মুখ-

ভাগের গতি, এবং (৫) তৃবচালী বা শরীরের পাশ্চাত্তাগের গতি। এইরূপ নীচৈর্গতি আবার ষোড়শ ভাগে বিভক্ত,—(১) প্রকীর্ণক, (২) প্রকীর্ণোত্তর, (৩) নিষণ্ণ, (৪) পার্শ্বানুবৃত্ত, (৫) ঊর্ম্মিমার্গ, (৬) শরভক্রীড়িত, (৭) শরভপ্লুত, (৮) ত্রিতালী, (৯) বাহ্যানুবৃত্ত, (১০) পঞ্চাপাণি, (১১) সিংহায়ত, (১২) স্বাধূত, (১৩) ক্লিষ্ট, (১৪) শ্লাঘিত, (১৫) বৃংহিত এবং (১৬) পুষ্পাভিকীর্ণ। লঙ্ঘন শব্দেই গতির বিষয় উপলব্ধি হয়। উল্লম্ফনে গমনের নাম—লঙ্ঘন। লঙ্ঘন গতি সাত প্রকার;—কপিপ্লুত, ভেকপ্লুত, একপ্লুত একপাদপ্লুত এবং কোকিলসঞ্চারি, উরস্য ও বকচারী। অশ্বদিগকে কপি ও ভেক প্রভৃতির ন্যায় লম্ফ-প্রদান শিক্ষা দেওয়া হইত। আকস্মিক ঝম্প, একপাদ ঝম্প, কোকিলের ন্যায় গমন, ভূমি-সংলগ্ন হইয়া দৌড়ান এবং বকের ন্যায় ঝম্প-প্রদান শিক্ষা দিবার নিয়ম ছিল। কাক, বারিকাক, ময়ূর, অর্দ্ধময়ূর, নকুল, অর্দ্ধনকুল, বরাহ, অর্দ্ধবরাহ প্রভৃতি 'ধোরণ' গতির অন্তর্ভুক্ত। আর সঙ্কেত-অনুসারী গতি—নারোষ্ট্র। আরোহীর সঙ্কেত বুঝিয়া তদনুসারে গমন—এই 'নারোষ্ট্র' পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। প্রধান এই পঞ্চপ্রকার শিক্ষা ব্যতীত আরও কয়েক প্রকারের গতি শিক্ষা দিবার বিধি ছিল। তাহা মার্গ ও ধারা পর্য্যায়ের অন্তর্গত। এ সকলও আবার নানা উপবিভাগে বিভক্ত। এই সকল শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে যুদ্ধের জন্য অশ্বদিগকে শিক্ষাদান করা হইত। অর্থশাস্ত্র হইতে নিম্নে এতদ্বিষয়ক কৌটিল্যের মন্তব্য প্রদান করা হইল; যথা,—

> তেষাং তীক্ষ্ণভদ্রমন্দবশেন সান্নাহ্যমৌপবাহ্যকং বা কর্ম্ম প্রযোজয়েৎ। চক্রমশ্রং কর্ম্মাশ্বস্য সান্নাহ্যম্। বল্গনো নীচৈর্গতো লঙ্ঘনো ধোরণো নারোষ্ট্রশ্চোপবাহ্যাঃ। তত্রোপবেণুকো বর্দ্ধমানকো যমক আলীঢ়প্লুত পৃথগস্তৃবচালী চ বল্গনঃ। স এব শিরঃকর্ণবিশুদ্ধো নীচৈর্গতঃ, ষোড়শমার্গো বা—প্রকীর্ণকঃ প্রকীর্ণোত্তরো নিষণ্ণঃ পার্শ্বানুবৃত্ত ঊর্ম্মিমার্গঃ শরভক্রীড়িতশ্শরভপ্লুতঃ ত্রিতালো বাহ্যানুবৃত্তং পঞ্চাপাণিস্সিংহায়তস্স্বাধৃতঃ ক্লিষ্টঃ শ্লাঘিতো বৃংহিতঃ পুষ্পাভিকীর্ণশ্চেতি নীচৈর্গতমার্গাঃ। কপিপ্লুতো ভেকপ্লুত একপ্লুত একপাদপ্লুতং কোকিলসংচার্য্যুরস্যো বকচারী চ লঙ্ঘনঃ। কাকো বারিকাকো ময়ূরোঽর্দ্ধময়ূরো নাকুলোঽর্দ্ধনাকুলো বারাহোঽর্দ্ধবারাহশ্চেতি ধোরণঃ। সংজ্ঞাপ্রতিকারো নারোষ্ট্র ইতি। ষণ্ণব দ্বাদশেতি যোজনান্যধ্বা রথ্যানাং পঞ্চযোজনান্যর্দ্ধাষ্টমানি দশেতি পৃষ্ঠবাহ্যানামশ্বানামধ্বা। বিক্রমো ভদ্রাশ্বাসো ভারবাহ্য ইতি মার্গাঃ বিক্রমো বল্গিতমুপকণ্ঠমুপজবো জবশ্চ ধারাঃ।"—অশ্বাধ্যক্ষঃ, ১৩৩ম—১৩৪ম পৃষ্ঠাঃ।

অশ্বগণের চিকিৎসাদির বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। যেমন মানুষের পক্ষে তেমনি পশ্বাদির পক্ষে,—চিকিৎসার বিধান সর্ব্বত্র অভিন্ন। চিকিৎসকগণ চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের দৈহিক উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। অচিকিৎসার বা কুচিকিৎসার পীড়া বৃদ্ধি হইলে, এ ক্ষেত্রেও দণ্ড প্রদানের বিধি বিহিত হইয়াছিল। চিকিৎসার দোষে অশ্বাদি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে চিকিৎসকগণকে তাহার ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতে হইত। এইরূপ দণ্ডের বিধি বিধিবদ্ধ হওয়ায় চিকিৎসকগণ বা পালকগণ সকলেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য-সম্পাদনে সর্ব্বদা প্রযত্নপর থাকিতেন। অশ্বাদির মঙ্গলকামনায় ঈশ্বরারাধনা প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। কৌটিল্যের বিধানগুণে সে প্রাচীন-কালে পশুপক্ষী কীটপতঙ্গও সুখ-স্বচ্ছন্দে কালযাপন

করিতে পারিত;—তাহাদের সুখ-স্বাস্থ্য-বিধানে এমনই সুনীতি-সমূহ কৌটিল্য বিহিত করিয়াছিলেন! ফলতঃ, সর্ব্বপ্রকার হিতকর বিধানে সে রাজ্য যে অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ আদর্শের অবতারণা করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

যেমন অশ্বপালন সম্বন্ধে তেমনি হস্তিপালন বিষয়ে সুব্যবস্থা ছিল। যুদ্ধের বিবিধ সরঞ্জামের স্থায়, হস্তী তৎকালে যুদ্ধের এক প্রধান উপকরণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। প্রাচীনকালে যুদ্ধক্ষেত্রে হস্তির উপযোগিতা রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হয়। সে সময় যাঁহার যত অধিক পরিমাণ যুদ্ধ-হস্তী ছিল, তিনি তত অধিক ক্ষমতাশালী ছিলেন। সেইজন্য হস্তিসংরক্ষণ ও হস্তিপালন তখন এক প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। কেহ হস্তী হত্যা করিলে তাই সে সময় তাহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিবার বিধি বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে হস্তিপালন ও হস্তিসংরক্ষণ বিষয়ে যে উপদেশ-পরম্পরা বিহিত হইয়াছে, তাহা হইতে এতদ্বিষয়ে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়। সে সময় হস্তিপালন ও হস্তিসংরক্ষণ জন্য স্বতন্ত্র একটী রাজকীয় বিভাগ প্রতিষ্ঠিত ছিল। হস্ত্যধ্যক্ষ ছিলেন—সেই বিভাগের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী। তাঁহার অধীনে, কার্য্যের প্রকৃতি-পর্য্যায়-অনুসারে, নাগবনপাল, নাগবনাধ্যক্ষ, হস্তিতক, পাদপাশিক, সৌমিক, পারিকর্ম্মিক, বনচরক ও অনীকস্থ প্রভৃতি বিভিন্ন নামধেয় উচ্চ নীচ বহু কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অর্থশাস্ত্রের মতে হস্ত্যধ্যক্ষের কার্য্য নিম্নরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—

হস্তিপালন ব্যবস্থা।

"হস্ত্যধ্যক্ষো হস্তিবনরক্ষাং দম্যকর্ম্মক্ষান্তানাং হস্তিহস্তিনীকলভানাং শালাস্থানশয্যা-কর্ম্মবিধায়বসপ্রমাণং কর্ম্মস্বাযোগং বন্ধনোপকরণং সাংগ্রামিকমলঙ্কারং চিকিৎস-কানীকস্থোপকস্থায়ুকবর্গং চানুতিষ্ঠেৎ।"—দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ, হস্ত্যধ্যক্ষঃ, ১৩৫ম পৃষ্ঠাঃ॥

হস্ত্যধ্যক্ষের কার্য্য—হস্তিবনরক্ষার ব্যবস্থা-বিধান; হস্তিশয্যা বিহিত করা, তাহাদের দৈনিক আহারাদি প্রদানের বন্দোবস্ত করা; অলঙ্কার, শিক্ষা, যুদ্ধসজ্জা প্রভৃতি সরবরাহ করা; চিকিৎসক, শিক্ষক ও পরিচারকগণের কার্য্য তত্ত্বাবধান। বিভাগীয় উপরোক্ত কর্ম্ম-চারিগণ ব্যতীত হস্তিশালার জন্য আরও একাদশবিধ কর্ম্মচারীর পরিচয় অর্থশাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহারা আপন আপন কার্য্য অনুসারে যথাক্রমে চিকিৎসক, অনীকস্থ, আরোহক আধোরণ, হস্তিপক, উপচারিক, বিধাপাচক, পাদপাশিক, কুটীরক্ষ এবং উপশায়িক নামে অভিহিত হইয়াছেন; যথা,—"চিকিৎসকানীকস্থারোহকাধোরণ হস্তিপকৌপচারিক-বিধাপাচকযাবসিকপাদপাশিককুটীরক্ষকৌপশায়িকাদিরৌপস্থায়িকবর্গঃ॥"

কর্ম্মচারিগণের কর্ত্তব্য বিষয়ে বিবিধ বিধানের পরিচয় অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায়। নাগ-বনপালগণ—হস্তিবন (যে বনে হস্তি বাস করে) রক্ষা করিতেন। নাগবন-রক্ষা-কল্পে যে কিছু উপায় অবলম্বন আবশ্যক, তাহা উদ্ভাবন করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য ছিল। উপযুক্ত-রূপে বনসমূহ সুরক্ষিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে কি না, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহারা অধ্যক্ষের নিকট বিজ্ঞাপিত করিতেন। এই সকল কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহের জন্য তাঁহার অধীনে আবার 'নাগবনাধ্যক্ষ' নামধেয় কতকগুলি কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহারা হস্তিবন-সমূহের সীমা-পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতেন।

কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য।

হস্তী সংগ্রহ করিবার ভার তাঁহাদের উপর ন্যস্ত ছিল। মাহুতগণ—'হস্তিপক' নামে এবং বন্ধনকারী—পাদপাশিক অভিধায়ে অভিহিত হইয়াছেন। অনীকস্থ কর্ম্মচারিগণ হস্তি-বিদ্যা-বিশারদ ছিলেন। কোন্ হস্তী ধরিবার উপযুক্ত এবং কোন্ হস্তী ধরিবার অনুপযুক্ত, দৃষ্টিমাত্র তাঁহারা তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেন। মূঢ়, ব্যাধিত, গর্ভিণী, ধেনুকা, মৎকুণ, বিক্ক প্রভৃতি হস্তী ধৃত করা নিষিদ্ধ ছিল। "বিক্কো মূঢ়ো মৎকুণো ব্যাধিতো গর্ভিণী ধেনুকা হস্তনী চাগ্রাহ্যাঃ।" হস্তী ধৃত করিবার জন্য গ্রীষ্মকালই প্রশস্ত। গ্রীষ্মকালে 'অনীকস্থ' নামধেয় কার্য্যচারী পাঁচটী বা সাতটী 'হস্তিবন্ধকী' বা হস্তিনী সহ হস্তিবনে প্রবেশ করিয়া বন্য হস্তী ধৃত করিতেন। মূত্র, পুরীষ, পদচিহ্ন, শয্যাস্থান প্রভৃতি চিহ্ন দ্বারা হস্তিযূথ সন্ধান করিয়া হস্তী ধরিবার আয়োজন চলিত। "গ্রীষ্ম গ্রহণকালঃ। বিংশতিবর্ষো গ্রাহ্যঃ।" বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমের হস্তী ধৃত করিবার নিয়ম ছিল। হস্তী ধৃত করিবার প্রণালী-পরম্পরা অতি কৌতূহলপ্রদ। 'অনীকস্থ' কর্ম্মচারী হস্তি-সংগ্রহের জন্য এক সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তাঁহারা হস্তিবন-পার্শ্বে তৃণবৃক্ষাদি পরিশূন্য বিস্তৃত সমতল ভূমি নির্ব্বাচন করিয়া তাহার চারি দিকে বৃত্তাকারে পরিখা খনন করাইতেন। পরিখার বিস্তৃতি প্রায় দুই শত গজের অধিক হইত। গভীরতাও তদনুরূপ ছিল। তাঁহারা পরিখার উপরিভাগে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত স্বল্প-পরিসর সেতু নির্ম্মিত করিতেন। এই বেষ্টনীর অন্তর্গত সমতল ক্ষেত্রে অতি সুশিক্ষিত তিন চারিটী হস্তিনী রাখা হইত। দিবাভাগে বন্যহস্তী সেই বেষ্টনী সন্নিকটে আগমন করিত না। রাত্রিকালে হস্তিযূথ একে একে বেষ্টনী মধ্যে প্রবেশ করিলে, সেতু স্থানান্তরিত করা হইত। অতঃপর তাঁহারা যুদ্ধ-কৌশল-পারদর্শী বলবান হস্তী ছাড়িয়া দিতেন। দ্বন্দ্বযুদ্ধে বন্যহস্তিযূথ পরাভূত হইত। আহার্য্যাভাবেও তাহারা ক্ষীণবল হইয়া আসিত। বন্যহস্তিসমূহ শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, মাহুত-গণ হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অতি সতর্কতার সহিত অবতরণ করিয়া আপন আপন হস্তীর উদরের নিম্নদেশে উপস্থিত হইতেন। সেখান হইতে তাঁহারা বন্যহস্তীর উদরের তলদেশে গমন করিয়া পালিত হস্তীর পদের সহিত বন্যহস্তিগণের পদ-সমূহ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দিতেন। এইরূপে হস্তী ধৃত করিবার প্রথা সে সময়ে বর্ত্তমান ছিল।

হস্তিগণের শিক্ষাদান-প্রণালীও কম কৃতিত্বের নিদর্শন নহে। শিক্ষানুসারে হস্তি-সমূহ দম্য, সান্নাহ্য, ঔপবাহ্য, ব্যাল—এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইত। পালিত হস্তীর সংসর্গে বন্যহস্তীর হিংস্র-স্বভাব দূর হইলে তাহাদের শিক্ষা দান আরম্ভ হইত। হস্তিগণের পূর্ব্বোক্ত চারি শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন উপবিভাগ বর্ত্তমান ছিল। তাহাদের সেই সকল বিভাগ ও উপবিভাগ সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রকার যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, ('হস্ত্যধ্যক্ষঃ' ১৩৭—১৩৮ম পৃষ্ঠাঃ) নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল,—

হস্তীর শিক্ষা বিধান।

"কর্ম্মস্কন্ধাঃ চত্বারঃ দম্যসান্নাহ্য ঔপবাহ্যো ব্যালশ্চ। তত্র দম্য পঞ্চবিধঃ—স্কন্ধগতঃ স্তম্ভগতো বারিগতোঽপপাতগতো যূথগতশ্চেতি। তস্যোপবিচারো বিক্ককর্ম্ম। সান্নাহ্যস্সপ্তক্রিয়াপথঃ—উপস্থানং সংবর্তনং সংযানং বধাবধো হস্তিযুদ্ধং নাগরায়ণং সাংগ্রামিকং চ। তস্যোপবিচারঃ। কক্ষ্যাকর্ম্ম গ্রৈবেয়কর্ম্ম যূথকর্ম্ম চ। ঔপবাহ্যোঽষ্ট-

বিধঃ—আচরণঃ, কুঞ্জরোপবাহ্যঃ, ধোরণঃ, আধানগতিকঃ, যষ্ট্যুপবাহ্যঃ, তোত্রোপবাহ্যঃ, শুদ্ধোপবাহ্যঃ মার্গায়ুকশ্চেতি। তস্যোপবিচারঃ শারদকর্ম হীনকর্ম নারোষ্ট্রকর্ম চ। ব্যাল একক্রিয়াপথঃ। তস্যোপবিচার আযম্যৈকরক্ষঃ কর্মশঙ্কিতোবরুদ্ধো বিষমঃ প্রভিন্নঃ প্রভিন্নবিনিশ্চয়ো মদহেতুবিনিশ্চয়শ্চ। ক্রিয়াবিপন্নো ব্যালঃ।"

—হস্তিপ্রচারঃ, ১৩৮ম পৃষ্ঠাঃ।

হস্তিগণকে প্রথমতঃ পৃথগত করিবার নিয়ম। দলের সহিত একত্র থাকিতে অভ্যস্ত হইলে, শিক্ষা-দানের সুবিধা হয়। অতঃপর স্কন্ধারোহণ অভ্যাস করিবার বিধি। বিনা-আপত্তিতে যখন তাহারা স্কন্ধে চড়িতে দেয় এবং তাহাদিগকে স্তম্ভে আবদ্ধ করিতে পারা যায়, তখনই তাহাদের পোষমানান কার্য্য শেষ হইয়া থাকে। যুদ্ধের জন্য শিক্ষাদান-পদ্ধতি স্বতন্ত্র। তদুদ্দেশ্যে তাহাদিগকে উপস্থান অর্থাৎ উত্থান, উল্লম্ফন ও দোলন প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। সংবর্ত্তন—গতিপরিবর্ত্তন, সংযান—অগ্রসর হওন, দলন—শত্রু-পদদলিত করা, অপর হস্তীর সহিত যুদ্ধ প্রভৃতি শিক্ষা দিবার বিধি। বেষ্টনী দ্বারা স্তম্ভে আবদ্ধ করা, গ্রীবাবন্ধন এবং অপরাপর হস্তীর সহিত কার্য্যাভ্যাস—ইহাই হইল শিক্ষার প্রথম স্তর; দ্বিতীয় স্তর—পৃষ্ঠে আরোহণ, গতি-সংযমন, বিবিধ প্রকার অঙ্গচালনা শিক্ষা দেওয়া, যষ্ঠি বা অঙ্কুশ আঘাতে সঙ্কেত দ্বারা পরিচালিত করা। এইরূপ নানা ভাবে হস্তিগণের শিক্ষার বিষয় অর্থশাস্ত্রে পরিব্যক্ত হইয়াছে। যে সকল মত্ত হস্তী সহজে পোষ মানিত না, তাহাদিগকে শাস্তি দিবার ব্যবস্থা ছিল। কখনও তাহাদিগকে কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করা হইত, কখনও বা তাহাদিগকে কিছু-দিনের জন্য বনমধ্যে নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাঁধিয়া রাখিবার নিয়ম ছিল। অবাধ্য বা মদমত্ত হস্তী ত্রিবিধ;—"শুদ্ধসুব্রতো বিষমঃ সর্বদোষপ্রদুষ্টশ্চ"—শুদ্ধ, সুব্রত ও বিষম। এই ত্রিবিধ হস্তীই বিশেষ অনিষ্টকারী। ইহাদিগকে দমনে রাখিবার জন্য আলান, দ্বিবিধ শৃঙ্খল, বন্ধনী ও বল্গা প্রভৃতি প্রশস্ত। অঙ্কুশ, বংশদণ্ড এবং যন্ত্র প্রভৃতিও এতৎপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

"তেষাং বন্ধনোপকরণমনীকস্থপ্রমাণং আলানগ্রৈবেয়কক্ষ্যাপারায়ণপরিক্ষেপোত্তরাদিকং বন্ধনং; অঙ্কুশবেণুযন্ত্রাদিকমুপকরণং।"—হস্তিপ্রচারঃ, ১৩৮ম পৃষ্ঠাঃ।

হস্তিপরীক্ষা সম্বন্ধেও বিশেষ নিয়ম ছিল। হস্ত্যধ্যক্ষের উহা একটী প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আয়তন এবং উচ্চতা অনুসারে হস্তী উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইত। কৌটিল্য বলিয়াছেন,—যে হস্তী উচ্চে সাত অরত্নি, দৈর্ঘ্যে নয় অরত্নি এবং যাহার দেহ-পরিধি দশ অরত্নি, সেই হস্তী শ্রেষ্ঠ। আবার সেইরূপ চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমবিশিষ্ট হস্তী সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ত্রিশ বৎসর বয়স্ক হস্তী মধ্যম এবং পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়স্ক হস্তী নিকৃষ্ট পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। "সপ্তারত্নিরুৎসেধো নবায়মো দশ পরিণাহঃ। প্রমাণতশ্চত্বারিংশদ্বর্ষো ভবত্যুত্তমঃ। ত্রিংশদ্বর্ষো মধ্যমঃ। পঞ্চবিংশতি বর্ষোঽবরঃ। তয়ো পাদাবরো বিধাবিধিঃ।" জন্মস্থান হিসাবেও হস্তিপরীক্ষা হইত। অর্থশাস্ত্রের 'ভূমিবিভাগ' প্রকরণে এতদ্বিষয় পরিবর্ণিত হইয়াছে। সেখানে যুদ্ধের সময় হস্তীর উপযোগিতার বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। হস্তিবননিবেশে হস্তীর গতাগতি নিরূপণ করিয়া হস্তিবন-নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা। হস্তির মলমূত্র দেখিয়া তল্লতকী

পরীক্ষা ও আহারাদির বিধান।

বৃক্ষের ভগ্ন শাখা-প্রশাখা লক্ষ্য করিয়া নদনদীর তীরে ভগ্ন মৃত্তিকাদি প্রভৃতি পরীক্ষায় হস্তিপকগণ হস্তির অবস্থিতি নির্ণয় করিতেন। জন্মস্থান হিসাবে যে হস্তির শ্রেণিবিভাগ হইত, তৎসম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রের 'ভূমিছিদ্রবিধানম্' প্রকরণে নিম্নরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়; যথা,—

"কলিঙ্গাঙ্গগজাঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাচ্যাশ্চেতি করুশজাঃ। দশার্ণাশ্চাপরান্তাশ্চ দ্বিপানাং মধ্যমা মতাঃ॥
সৌরাষ্ট্রিকাঃ পাঞ্চজনাঃ তেষাং প্রত্যবরাস্মৃতাঃ। সর্বেষাং কর্মণা বীর্যং জবস্তেজশ্চ বর্ধতে॥"

কলিঙ্গ, অঙ্গ, করুশ এবং বঙ্গদেশীয় হস্তী উত্তম; পশ্চিম দেশীয় হস্তী মধ্যম এবং সৌরাষ্ট্র ও পাঞ্চজন্য দেশীয় হস্তী অধম বা নিকৃষ্ট। জন্মস্থান হিসাবে এইরূপে পরীক্ষা করিয়া হস্তিগণের শ্রেণিবিভাগ হইত। শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট অনুসারে হস্তিগণের খাদ্যের ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রেষ্ঠ হস্তিগণের খাদ্যের বিধানে দেখিতে পাই,—এক দ্রোণ তণ্ডুল, অর্দ্ধ ছটাক তৈল, তিন প্রস্থ ঘৃত, দশ পল লবণ, পঞ্চাশ পল মাংস, এক আঢ়ক রস বা দ্বিগুণ পরিমাণ দধি, দশ পল ক্ষার, এক আঢ়ক মদ্য অথবা দ্বিগুণ পরিমাণ দুগ্ধ, দুই ভার উত্তম তৃণ, সওয়া দুই ভার শষ্প, ষষ্ঠাংশ ভার শুষ্ক তৃণ এবং প্রচুর পরিমাণ কদঙ্করবৃন্ত প্রত্যেক হস্তীকে আহার্যরূপে প্রদান করিবার নিয়ম ছিল। তদ্ব্যতীত হস্তীর গাত্রে মর্দ্দন করিবার জন্য এক প্রস্থ তৈল দিতে হইত। হস্তিশালায় প্রদীপ জ্বালিবার জন্য যে তৈল দিবার ব্যবস্থা ছিল, তাহার পরিমাণ—এক প্রস্থের অষ্টমাংশ। যাহাদের উচ্চতা আট অরত্নি, তাহাদিগকেও এই হিসবে খাদ্য প্রদান করিতে হইত। কিন্তু যাহাদের উচ্চতা তদপেক্ষা অল্প, তাহাদের আকৃতি পরিমাণ অনুসারে আহার্য্য-পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইত। যথা,—

"অরত্নৌ তণ্ডুলদ্রোণঃ, অর্ধাঢ়কং তৈলস্য, সর্পিষস্ত্রয়ঃ প্রস্থাঃ, দশপলং লবণস্য, মাংসং পঞ্চাশৎপলিকং, রসস্যাঢ়কং, দ্বিগুণং বা দধ্নঃ পিণ্ডক্লেদনার্থং ক্ষারং দশপলিকং মদ্যস্য আঢ়কং দ্বিগুণং বা পয়সঃ প্রতিপানং গাত্রাবসেকস্তৈলপ্রস্থঃ শিরসোঽষ্টভাগঃ প্রাদীপিকশ্চ, যবসস্য দ্বৌ ভারৌ সপাদৌ শষ্পস্য শুষ্কস্যার্ধতৃতীয়ো ভারঃ কড়ঙ্করস্যা-নিয়মঃ। সপ্তারত্নিনা তুল্যভোজনোঽষ্টারত্নিরত্যরালঃ। যথাহস্তমবশেষঃ ষড়রত্নি পঞ্চা-রত্নিশ্চ। ক্ষীরযাবসিকো বিকঃ ক্রীড়ার্থং গ্রাহ্যঃ।"—হস্ত্যধ্যক্ষঃ, ১৩৬ম—১৩৭ম পৃষ্ঠাঃ।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও কর্ম্মচারিগণের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। স্নানবিধির আলোচনায় এবং গৃহাদি নির্ম্মাণের সুব্যবস্থায় তাহা প্রতিপন্ন হয়। দিনমানকে আট ভাগে বিভক্ত করিয়া মহামতি কৌটিল্য তাহার প্রথম ও শেষ ভাগে হস্তীর স্নান-কাল নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। দুই বার আহার প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। স্নানের পর ঐ আহার প্রদান করিতে হইত। পূর্ব্বাহ্ন ব্যায়ামের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, আর অপরাহ্নে তাহাদিগকে শিক্ষাদান করা হইত। রাত্রি-কালের আট ভাগের মধ্যে দুই ভাগ নিদ্রায় অতিবাহিত হইত। অবশিষ্ট জাগরণে কাটিত।

"প্রথমসপ্তমাবষ্টমভাগাবহ্নস্নানকালৌ, তদনন্তরং, বিধায়াঃ, পূর্ব্বাহ্নে ব্যায়াম-কালঃ, পশ্চাহ্নঃ প্রতিপানকালঃ। রাত্রিভাগৌ দ্বৌ স্বপ্নকালৌ, ত্রিভাগস্-সংবেশনোত্থানিকঃ, গ্রীষ্মে গ্রহণকালঃ।"—হস্ত্যধ্যক্ষঃ, ১৩৬ম পৃষ্ঠাঃ॥

হস্তির বাসোপযোগী গৃহ-ব্যবস্থায়ও স্বাস্থ্য-বিধি-সমূহ অনুসৃত। কৌটিল্য বলিয়াছেন,—হস্তিশালার উচ্চতা হস্তীর উচ্চতার দ্বিগুণ এবং প্রস্থ তাহার অর্দ্ধেক হইবে। হস্তিনী-

গণের জন্ম স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণ করা প্রয়োজন। দ্বার-সমূহ উত্তর বা পূর্ব্বাভিমুখী হওয়াই বিধেয়। প্রবেশ-দ্বারে সপ্রগ্রীবা এবং অভ্যন্তরে কুমারি বা বন্ধনকাষ্ঠ রাখিতে হইবে। যাহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিবে, তাহাদের সম্মুখে দৈর্ঘ্যের অনুযায়ী সমচতুষ্কোণ স্থান রাখা বিধেয়। আর সেখানে মল মূত্র নিঃসারণ জন্ম সছিদ্র কাষ্ঠখণ্ডসমূহ স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত। হস্তীর শয়ন-স্থানের দৈর্ঘ্য তাহার দৈর্ঘ্যের অনুরূপ হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে তাহারা সহজে শয়ন করিতে পারিবে। তাহাদিগের হেলান দিবার জন্ম শয়ন স্থানে কাষ্ঠমঞ্চ নির্ম্মাণ করিবার বিধি বিহিত হইয়াছিল। এতৎসংক্রান্ত বিধানে কৌটিল্য বলিয়াছেন,—

"হস্ত্যায়াম দ্বিগুণোৎসেধবিষ্কম্ভায়ামাং হস্তিনীস্থানাধিকাং সপ্রগ্রীবাং কুমারীসংগ্রহাং প্রাঙ্‌মুখীমুদঙ্‌মুখীং বা শালাং নিবেশয়েৎ। হস্ত্যায়ামচতুরশ্রশ্লক্ষ্ণালানস্তম্ভফলকান্তরকং মূত্রপুরীষোৎসর্গস্থানং নিবেশয়েৎ।"—হস্ত্যধ্যক্ষঃ, ১৩৬ম পৃষ্ঠাঃ॥

তাহাদের চিকিৎসাদির ব্যবস্থায়ও স্বাস্থ্য-রক্ষার বিবিধ নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। গো-মহিষাদির চিকিৎসা বিষয়ে যেরূপ ব্যবস্থার বিষয় পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, হস্তিচিকিৎসার বিধিও তদনুরূপ। অচিকিৎসায় বা কুচিকিৎসায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, চিকিৎসক দণ্ড-ভোগ করিতেন। হস্তিশালায় অধিক ধূলা জমিলে, শয্যারচনায় উপযুক্ত পরিমাণ তৃণাদি না দিলে, অসময়ে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিলে, শক্ত বা অনুপযুক্ত স্থানে শয়ন করাইলে, রক্ষকের দণ্ড হইত। ফলতঃ, পশ্বাদি প্রতিপালনে স্বাস্থ্য-রক্ষা ও শরীরপালন সংক্রান্ত সকল বিধি অনুসৃত হইবার ব্যবস্থা ছিল। হস্তীর সাজসজ্জা এবং তাহার নানাবিধ অলঙ্কার সে সময়ে প্রচলিত ছিল,—অর্থশাস্ত্রে সে সকলের উল্লেখ আছে।

"স্থানস্থাণ্ডিকির্যব সস্যাগ্রহণং স্থলে শায়নমভাগে ঘাতঃ পরারোহণমকালে-যানমভূমাবতীর্থেঽবতারণং তরুষণ্ড ইত্যত্যয়স্থানানি। তমেষাং ভক্তবেতনাদাদদীৎ॥…বৈজয়ন্তীক্ষুরপ্রমালাস্তরণকুথাদিকং ভূষণং। বর্মতোমরশরাবাপযন্ত্রাদিকস্সাংগ্রামিকালঙ্কারঃ।"—হস্তিপ্রচারঃ, ১৩৮ম ও ১৩৯ম পৃষ্ঠাঃ।

হস্তীর দন্তচ্ছেদন প্রসঙ্গে পার্ব্বতীয় ও নদীজ হস্তীর বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে জল-হস্তীর কথা মনে আসে। সে সময়ে জলহস্তী-সমূহ ধৃত করা হইত, আর তাহাদের শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা ছিল,—কৌটিল্যের উক্তি হইতে তাহা বুঝা যায়। যথা,—"দন্তমূলপরীণাহদ্বিগুণং প্রোৎস্থ কল্পয়েৎ। অব্দে দ্ব্যর্ধে নদীজানাং পঞ্চাব্দে পর্ব্বতৌকসাম্॥" নদীজ হস্তীর বা জলহস্তীর দন্ত আড়াই বৎসর পরে এবং পার্ব্বতীয় হস্তীর দন্ত পাঁচ বৎসর পরে কর্ত্তন করিবার নিয়ম। নদীহস্তীর দন্ত অল্প সময়ে অধিক বৃদ্ধি পায়, সেই জন্যই এ ব্যবস্থা।

যেমন পশু বিষয়ে তেমনি পক্ষী সম্বন্ধে বিবিধ বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। 'সূনাধ্যক্ষ' প্রকরণে সে পরিচয় প্রাপ্ত হই। ঐ অংশের আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, সে বিধানে বিশেষ বিশেষ পশুপক্ষী ধৃত করা দণ্ডনীয় ছিল। রাজা তাহাদের রক্ষার জন্ম অশেষ প্রয়াস পাইতেন। যে সকল পশু বা পক্ষী দ্বারা মানুষের প্রাণহানি হইবার সম্ভাবনা ছিল না, যে সকল পশুপক্ষী বিশেষ যত্নের সহিত সংরক্ষিত হইত। সারস, ক্রৌঞ্চ, চক্রবাক, শুক, সারী, কোকিল, চাতক, চকোর

পক্ষি-সংরক্ষণ।

প্রভৃতি বিবিধ জাতীয় পক্ষী এইরূপে রাজসহায়তা লাভে সুখে বিচরণ করিত। সে সময় রাজরক্ষিত অরণ্য ছিল। রাজা সেই অরণ্যে শিকার-কৌতূহল চরিতার্থ করিতেন। সাধারণের শিকারের জন্যও স্বতন্ত্র বনভূমি নির্দ্দিষ্ট ছিল। নির্দ্দিষ্ট বনভূমি ব্যতীত অন্যত্র শিকার করিলে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইতে হইত। অপরাধের তারতম্য অনুসারে সে দণ্ডের বিধান ছিল। ফলতঃ, সে প্রাচীনকালে মনুষ্য হইতে ক্ষুদ্র জীব-জন্তুর সুখ-বিধানের প্রতিও রাজার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। এতদ্বিষয়ে অর্থশাস্ত্রের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল,—

সামুদ্রহস্ত্যশ্বপুরুষবৃষগর্দ্দভাকৃতয়ো মৎস্যাঃ সারসা নাদেয়াস্তটাককুল্যোদ্ভবাঃবা। ক্রৌঞ্চোৎক্রোশকদাত্যূহংসচক্রবাকজীবঞ্জীবকভৃঙ্গরাজচকোরমত্তকোকিলময়ূরশুকমদনশারিকাঃ বিহারপক্ষিণো মঙ্গল্যাশ্চান্যেপি প্রাণিনঃ পক্ষিমৃগা হিংসাবাধেভ্যো রক্ষ্যাঃ। রক্ষাতিক্রমে পূর্ব্বসাহসদণ্ডঃ।"—সূনাধ্যক্ষঃ, ১২২ম পৃষ্ঠাঃ।

জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থায়ও আদর্শ নীতির পরিচয় পাই। প্রাচীন আর্য্য মনীষিগণ বুঝিয়াছিলেন,—অমৃততত্ত্বে সম্যক জ্ঞান লাভ শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য; আর আত্মায় আত্মসম্মিলন সে শিক্ষার চরম পরিণতি। ভারতীয় শিক্ষার ইহাই আদর্শ; ধর্ম্ম সে শিক্ষার প্রাণস্থানীয়। সেই শিক্ষায় সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত বলিয়া, তাহার রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি—কালের কঠোর কশাঘাত সহ্য করিয়া—বিপ্লবের শত ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যেও আজি পর্য্যন্ত পূর্ব্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। সর্ব্ববিষয়ে ধর্ম্মকে আদর্শরূপে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিল বলিয়াই আজিও ভারত গর্ব্বোন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান। আর্য্য মনীষিগণ সংসার-জীবন দুঃখময় মনে করিতেন না। তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানোন্নতি তৎপক্ষে তাঁহাদের সহায় ছিল। জ্ঞানোন্নতিতে চরিত্রোন্নতি সাধন করিয়া তাঁহারা ইহলোকেই সনাতন জীবন যাপন করিতেন। ধর্ম্ম তাঁহাদের শিক্ষার আদর্শ; সেই আদর্শের অনুসরণে তাঁহারা দেশবাসীর শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

শিক্ষার আদর্শ—ধর্ম্ম।

প্রাচীনকালের শিক্ষা-পদ্ধতির পরিচয় সকল শাস্ত্রগ্রন্থেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদ, আরণ্যক, উপনিষৎ, সূত্র সাহিত্য, সংহিতা, দর্শন, পুরাণ, উপপুরাণ সর্ব্বত্র সেই শিক্ষার মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত। শিক্ষার সে মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বিঘোষিত। শাস্ত্রগ্রন্থের সেই সনাতন শিক্ষা-পদ্ধতির অনুসরণ কৌটিল্যের শিক্ষা-বিধানে সম্পূর্ণ পরিস্ফুট। বিদ্যার উদ্দেশ্য-ব্যাখ্যানে তাই অর্থশাস্ত্রে প্রথমেই বেদ-বিদ্যার মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত দেখি। কৌটিল্য বলিয়াছেন,—শাস্ত্র চতুর্ব্বিধ;—আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্ত্তা এবং দণ্ডনীতি। মানুষ এই চারি শাস্ত্র হইতে ধর্ম্ম ও অর্থ শিক্ষা করিতে পারে। 'আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিশ্চেতি বিদ্যাঃ।...তাভির্ধর্ম্মার্থৌ যদ্বিদ্যাত্তদ্বিদ্যানাং বিদ্যাত্বম্।' এই চতুর্ব্বিধ ধর্ম্মের সাহায্যে সংসারে সকল জ্ঞান লাভ করা যায়। ত্রয়ী বা বেদত্রিতয় হইতে ধর্ম্মাধর্ম্ম, বার্ত্তা হইতে অর্থ ও অনর্থ, দণ্ডনীতি হইতে ন্যায়ান্যায় এবং আন্বীক্ষিকী হইতে সাংখ্যযোগ বিষয়ে জ্ঞান জন্মে। আন্বীক্ষিকী সর্ব্ববিদ্যার প্রদীপ

কৌটিল্যের বিধান তদনুসারী।

স্বরূপ। আন্বীক্ষিকী সকল কার্য্যের উপায় এবং সকল ধর্ম্মের আধার ও আধেয়।

"সাঙ্খ্যং যোগো লোকায়তং চৈত্যান্বীক্ষকী। ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ত্রয্যাম্। অর্থানর্থৌ বার্ত্তায়াম্।
নয়ানয়ৌ দণ্ডনীত্যাং বলাবলে চৈতাসাং হেতুভিরন্বীক্ষমাণা লোকস্যোপকরোতি,
ব্যসনেঽভ্যুদয়ে চ বুদ্ধিমবস্থাপয়তি, প্রজ্ঞাবাক্যক্রিয়াবৈশারদ্যং চ করোতি—
প্রদীপস্সর্ববিদ্যানামুপায়স্সর্বকর্মণাম্। আশ্রয়স্সর্বধর্মানাং শশ্বদান্বীক্ষকী মতা॥"

বিদ্যা-চতুষ্টয়ে রুচি পরিমার্জ্জিত হয়, চরিত্রের উন্নতি ঘটে, ইহলোকে মুক্তি এবং পরলোকে শান্তি লাভ হয়। সেই চতুর্ব্বিধ ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়াই কৌটিল্যের উদ্দেশ্য ছিল। আর সে পক্ষে তিনি বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

দ্বিজাতিগণের কর্ত্তব্য-নিরূপণ প্রসঙ্গে কৌটিল্যের বিধানে বিদ্যাশিক্ষা প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। বিদ্যাশিক্ষা দ্বিজাতিগণের প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। কৌটিল্য বলিয়াছেন,—সে কর্ত্তব্য-সম্পাদনে অনন্ত স্বর্গ ও অনন্ত সুখের অধিকারী হওয়া যায়। তাহার অসম্পাদনে নিরয়গামী হইতে হয়। এখানেও কৌটিল্য সেই ধর্ম্মের প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। জনসাধারণ এ কর্ত্তব্য হইতে ভ্রষ্ট না হয়, শিক্ষালাভে শৈথিল্য না করে, তদ্বিষয় রাজা লক্ষ্য রাখিতেন। ধর্ম্মপ্রাণ—তিনি। পাছে কর্ত্তব্যের অনমুষ্ঠানে ধর্ম্ম-হানি ঘটে, আর তাহাতে পৃথিবী লয়প্রাপ্ত হয়,—সেই আশঙ্কায় সর্ব্বদাই তিনি শঙ্কিত থাকিতেন। জনসাধারণেরও বিশ্বাস ছিল—জাতি ধর্ম্ম অনুসারে ঋষিপ্রবর্ত্তিত নিয়ম প্রতিপালনে জীবনাতিপাত করিতে পারিলে উভয় জন্মেই পরম সুখ লাভ হয়। ত্রিবেদানুসারী কার্য্যে সংসারের সকলেই যদি তৎপর, হন, তাহা হইলে পৃথিবী কোনও কালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে না; পরন্তু উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিবে;—এই ধর্ম্ম-বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই সে সময়ে সকলে নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালনে নিরত ছিলেন। দ্বিজাতিগণের কর্ত্তব্য-নির্দ্দেশে কৌটিল্য তাই বলিয়াছেন,—

শিক্ষার উদ্দেশ্য।

"স্বধর্ম্মো ব্রাহ্মণস্যাধ্যয়নমধ্যাপনং যজনং যাজনং দানং প্রতিগ্রহশ্চেতি।
ক্ষত্রিয়স্যাধ্যয়নং যজনং দানং শস্ত্রাজীবো ভূতরক্ষণং চ। বৈশস্যাধ্যয়নং যজনং
দানং কৃষিপাশুপাল্যে বণিজ্যা চ। শূদ্রস্য দ্বিজাতি শুশ্রূষা বার্ত্তা কারুকুশীলব-
কর্ম্ম চ।...স্বধর্ম্মস্বর্গায়ানন্ত্যায় চ। তস্যাতিক্রমে লোকস্সঙ্করাদুচ্ছিদ্যেত—
তস্মাৎস্বধর্ম্মং ভূতানাং রাজা ন ব্যভিচারয়েৎ। স্বধর্ম্মং সংদধানো হি প্রেত্য চেহ চ নন্দতি॥
ব্যবস্থিতার্যমর্যাদঃ কৃতবর্ণাশ্রমস্থিতিঃ। ত্রয্যা হি রক্ষিতো লোকঃ প্রসীদতি ন সীদতি॥"

দ্বিজাতির প্রধান কর্ত্তব্য—বিদ্যা শিক্ষা করা, এস্থলে কৌটিল্য তাহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। ছাত্রের কর্ত্তব্য-নির্দ্দেশেও শিক্ষার প্রাধান্য সমর্থিত হইয়াছে। চূড়াকরণের পর ছাত্রের লিপি, গণিতশাস্ত্র, বার্ত্তা এবং দণ্ডনীতি শিক্ষার বিষয় অর্থশাস্ত্রে বিহিত রহিয়াছে। যাঁহারা পণ্ডিত এবং বিশেষজ্ঞ, তাঁহাদের নিকট সে সময় বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

"বৃত্তচৌলকর্মা লিপিং সঙ্খ্যানং চোপযুঞ্জীত। বৃত্তোপনয়নস্ত্রয়ীমান্বী-
ক্ষকীং চ শিষ্টেভ্যঃ, বার্ত্তামধ্যক্ষেভ্যঃ, দণ্ডনীতিং বক্তৃপ্রযোক্তৃভ্যঃ।"

বিদ্যায় বিনয় অধিগত হয়,—চিত্ত-স্থৈর্য্য আনয়ন করে এবং ধারণা-শক্তি বৃদ্ধি পায়। শ্রুত্যাদি

শাস্ত্র-চতুষ্টয় অধিগত হইলে প্রজ্ঞা জন্মে; প্রজ্ঞায় যোগ এবং যোগবলে আত্ম-তত্ত্ব লাভ হয়। "শ্রুত্যাদি প্রজ্ঞোপজায়তে প্রজ্ঞয়া যোগো যোগাদাত্মবত্তেতি বিদ্যাসামর্থ্যম্।" যে শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য আত্মতত্ত্ব-লাভ—আত্মায় আত্ম-সম্মিলন, সে শিক্ষার সে আদর্শ কত মহান্, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। কৌটিল্যের বিধানে রাজা যেমন শিক্ষার দ্বারা বিনয় অধিগত করিয়া চরিত্রোন্নতি সাধন করিবেন, প্রজাগণের চরিত্রোন্নতি-বিধানে তিনি তেমনি বিবিধ ব্যবস্থা বিহিত করিয়া তৎপক্ষে সহায় হইবেন। রাজা সুমার্জ্জিত-রুচি এবং উন্নত-চরিত্র না হইলে প্রজাগণেরও চরিত্রহানি ঘটে। রাজা যদি নৈতিক হন, প্রজাগণও নৈতিক হয়। শিক্ষা-প্রভাবে বিনয়-সাহায্যে রুচি মার্জ্জিত এবং চরিত্র বিগঠিত না হইলে, নানা অনর্থ ঘটে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কৌটিল্য রাবণ, দুর্য্যোধন, জনমেজয়, তালজঙ্ঘ প্রভৃতির উপাখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন। শিক্ষা-প্রভাবে চরিত্র বিগঠিত না হওয়ায়, বিনয়-সাহায্যে ইন্দ্রিয়-দমন করিতে না পারায়, তাঁহারা সকলেই রাজ্য ও স্বজন সহ বিনষ্ট হইয়াছিলেন। সুতরাং রাজা নিজে যেমন বিনয়ী, শিক্ষিত ও নৈতিক হইবেন, প্রজাসাধারণের শিক্ষা-বিধানে তাহাদিগকেও তেমনি বিনয়ী, শিক্ষিত ও নৈতিক হইতে শিক্ষা দিবেন। তাহা করিতে পারিলে, ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ই তাঁহার অধিগত হইবে। কৌটিল্য তাই বলিয়াছেন,—

"বিদ্যাবিনীতো রাজা হি প্রজানাং বিনয়ে রতঃ।
অনন্যাং পৃথিবীং ভুংক্তে সর্ব্বভূতেহিতে রতঃ॥"

প্রজা-সাধারণের শিক্ষোন্নতি-বিধানে কৌটিল্যের বিশেষ প্রয়াস ছিল, তাঁহার নীতি-সমূহ হইতে তাহা স্পষ্ট সপ্রমাণ হয়। রাজার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে এবং দ্বিজাতির কর্ত্তব্য-নির্দ্দেশে সে বিষয়ে কৌটিল্যের প্রয়াস পূর্ণ প্রকটিত। শিক্ষার আদর্শ—ধর্ম্ম। ধর্ম্ম-শিক্ষা—সেকালের শিক্ষার চরম লক্ষ্য ছিল। প্রাচীন ভারত অনন্যাসক্ত হইয়া সেই লক্ষ্য-পথে ছুটিয়াছিল—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ত্রিবিধ তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাই আজিও তাহার সে গৌরব—সে গরিমা অক্ষুন্ন রহিয়াছে; তাই আজিও আধুনিক সকল অনুষ্ঠানেই সেই প্রাচীনের অনুসরণ প্রত্যক্ষ করিয়া গৌরব অনুভব করি।

প্রাচীন ভারতের আদর্শ সভ্যতার বিষয়ে আজিও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনেকেই সন্দিহান রহিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা প্রাচীন হিন্দুগণের মহীয়সী মহিমা দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া ভারতের গৌরব-গরিমার বিষয় মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন; তাঁহাদের সে সিদ্ধান্তও অনেকের নিকট আজি পর্য্যন্ত আদরণীয় নহে। কিন্তু একমাত্র 'অর্থশাস্ত্রের' আলোচনায় তাঁহাদের সে ভ্রম-ধারণা দূর হইতে পারে। তাঁহারা দিব্য-চক্ষে দেখিতে পান, খৃষ্ট-জন্মের তিনশতাধিক বৎসর পূর্ব্বেও হিন্দুগণ কিরূপ গৌরবমণ্ডিত ছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে সময় হইতে ভারতেতিহাসের আরম্ভ গণনা করিয়া থাকেন, অর্থশাস্ত্র সেই সময়ের গ্রন্থ। সর্ব্ব-শাস্ত্রদর্শী মহামতি চাণক্য সেই সময়েই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের হিসাবেও অর্থশাস্ত্রের ঐতিহাসিকত্ব বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। অর্থশাস্ত্র, কৌটিল্যের উক্তি-পরম্পরা, তাৎকালিক হিন্দুজাতির জ্ঞান-গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের নিদর্শন। সে সময়ে, সেই

সর্ব্ববিষয়ে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব-খ্যাপন।

সুদূর অতীতকালে, ভারত জগৎ-সমক্ষে যে আদর্শ প্রকটিত করিয়াছিল, আজিও অনেক আধুনিক সুসভ্য জাতি তাহার কণামাত্র প্রকটনে সমর্থ হন নাই। হিন্দু-জাতির শিক্ষা-দীক্ষা কিরূপ উচ্চ আদর্শে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল, অর্থশাস্ত্র সে নিদর্শন জগৎ-সমক্ষে প্রকটিত করিতেছে। রাজ্য-রক্ষার ও রাজ্যশাসন-প্রণালীর যে বিভাগের প্রতিই দৃষ্টিপাত করি না কেন, সকল দিকে—সকল বিভাগেই হিন্দু-জাতির অমানুষিক জ্ঞান-গবেষণা, অভাবনীয় উৎকর্ষের পরিচয়-সমূহ দেদীপ্যমান্ দেখিতে পাই। একদিকে যেমন কল্পনার পরাকাষ্ঠা প্রত্যক্ষ করি, অন্যদিকে তেমনি পরিণতির চরম দৃষ্টান্ত নয়ন-সমক্ষে প্রতিভাত হয়। একদিকে যেমন অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের চরম স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাই, অন্যদিকে তেমনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের—বস্তুতত্ত্বের চরম পরিণতি নয়নপথে প্রতিভাত হয়। কিবা দর্শন-বিজ্ঞান, কিবা রাজনীতি ধর্ম্মনীতি, কিবা গণনীতি সমাজ-নীতি—সর্ব্ববিধ নীতিশাস্ত্রেই প্রাচীন হিন্দুগণ কৃতিত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অর্থশাস্ত্রে নীতি-বিজ্ঞানের যে আদর্শ প্রকটিত দেখি, সে আদর্শ বুঝি কোনও দেশ কোনও কালে প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবেন না। কৃষিবিজ্ঞানের যে পরিণতি লক্ষ্য করিয়াছি, শিল্প-বিজ্ঞানের যে উন্নতি প্রকটিত হইয়াছে, লোকগণনায় সুশাসন-সুপালনে এবং জনহিতকর বিবিধ অনুষ্ঠানে প্রাচীন ভারত জগৎসমক্ষে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে, মনে হয়, পৃথিবীর কোনও জাতি কোনও কালে সে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইবে না। আজিও অনেক সুসভ্য জাতি সমাজের যে সকল জটিল সমস্যা-নিরসনে মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতেছেন, আজিও যাহার সম্যক্ মীমাংসায় তাঁহারা সমর্থ হইতেছেন না; প্রাচীন ভারত বহু পূর্ব্ব হইতেই সে সকল সমস্যা নিরসন করিয়া জনসাধারণের সুখের প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। অনেকের নিকট এ সকল বিষয় উপহাসাস্পদ বলিয়া উপেক্ষণীয় হইতে পারে; কিন্তু বিচার-মীমাংসায় প্রতিপন্ন হয়, কৌটিল্যের অসাধারণ ধী-শক্তি বলে অসম্ভব সম্ভব হইয়াছিল। তাই আজি শিক্ষিত সমাজ তাঁহাকে পাশ্চাত্য রাজনীতিক ম্যাকেয়াভেলি ও বিসমার্ক অপেক্ষা উচ্চ আসন প্রদান করিতেছেন; আর ভক্তিভরে তাঁহার চরণে নতশির হইতেছেন। এই স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমে একদিন সকলই ছিল। দর্শন ছিল, বিজ্ঞান ছিল, রাজনীতি ছিল, সমাজনীতি ছিল; কারুশিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধনৈশ্বর্য্য—সকলই ছিল। ভারতের শিক্ষা সনাতন ধর্ম্মানুসারী। ধর্ম্মশিক্ষাই—তাহার সকল শিক্ষার মূলীভূত। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান—আত্মতত্ত্বে সম্যক্ জ্ঞানলাভ—সে শিক্ষার প্রাণস্থানীয়। কালবশে ধর্ম্মগ্রন্থি শিথিল হওয়ায় ভারত এখন সে শিক্ষা হারাইয়াছে। কিন্তু সে আবার যখন প্রাচীনের দৃষ্টান্ত অনুসরণে ধর্ম্ম-প্রাণতায় গা ঢালিয়া দিতে শিখিবে, মহাজনগণ প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইয়া প্রাচীন গৌরবে গৌরবান্বিত হইবার স্পর্দ্ধা করিতে পারিবে, আর ধর্ম্মসাধনে তৎপর হইয়া আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ-সাধনে ধর্ম্মের অনুপ্রাণনায় জগৎ প্লাবিত করিবে; তখনই তাহার পূর্ব্বগৌরব পূর্ব্বগরিমা আবার ফিরিয়া আসিবে; আদর্শ-রাজ্যের আদর্শ বিধি-বিধানে যে দৃষ্টান্ত প্রকটিত হইয়াছে, সে আদর্শ জগৎ-সমক্ষে পুনরায় প্রকটন করিতে সমর্থ হইবে।
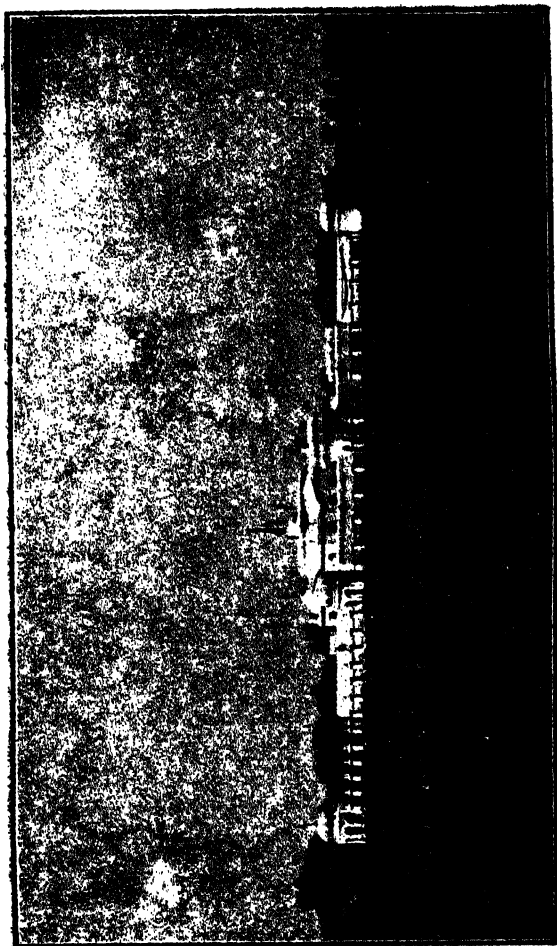
পাওয়া-পুরীর জলমন্দির (বিহার)।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

জৈন-স্থাপত্য।

[অর্থশাস্ত্রে চাণক্যের কৃতিত্ব,—তাহাতে চন্দ্রগুপ্তের শাসন-প্রণালীর উল্লেখ ;—চন্দ্রগুপ্তের শাসন-প্রণালীতে কৌটিল্যের উক্তি সমর্থিত ;—জৈন-স্থাপত্য,—বিভিন্ন স্থানে তাহার নিদর্শন ;—জৈন-প্রাধান্যে স্থাপত্যের চরমোন্নতি ;—চিত্র-কলায় জৈনগণের অদ্বিতীয়ত্ব,—চীনের প্রসঙ্গ,—তাহাতে ভারতের অনুসরণ ;—উপসংহার।]

অর্থশাস্ত্রে চাণক্যের কৃতিত্ব।

অর্থশাস্ত্র—চাণক্যের অদ্বিতীয় কীর্ত্তি। চাণক্য যে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত, অসাধারণ ধীশক্তিশালী এবং অমানুষিক জ্ঞানসম্পন্ন মহাপুরুষ ছিলেন, অর্থশাস্ত্রের আলোচনায় তাহা সপ্রমাণ হয়। চাণক্য যে সময়ে ভারতভূমে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সে সময় একদিকে বৈদেশিক আক্রমণের বিভীষিকায় এবং অন্যদিকে আত্মদ্রোহের বিষম বাত্যায়, ভারত-সিংহাসন টলটলায়মান হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত-রূপ অস্ত্র অবলম্বনে মহামতি কৌটিল্য সে সময় যে মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, জগতে তাহার তুলনা নাই। চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভারতের বিচ্ছিন্ন রাজশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিবার প্রয়াস—'পৃথিবীর ইতিহাসে' চাণক্যের মহিমা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে। তাঁহার মন্ত্রিত্ব-প্রভাবে তৎকালে ভারতের রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছিল। কিরূপ ঐকান্তিকতার সহিত কি ভাবে তিনি সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, মহাসমুদ্রবক্ষে তরঙ্গভঙ্গে বিচালিত ভারত-তরণীর কিরূপে তিনি উদ্ধার-সাধন করিয়াছিলেন, কিরূপে এবং কি ঐশীশক্তি প্রভাবে তৎকর্তৃক রাজ্যের শৃঙ্খলা এবং জনহিতকর বিধি-বিধান-সমূহ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল,—অর্থশাস্ত্রে তাহার পরিচয় দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

চন্দ্রগুপ্তের শাসন-বর্ণনা—অর্থশাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

চাণক্যের প্রভাবে চন্দ্রগুপ্ত-প্রতিভা প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। ইন্ধন-সংযোগ না হইলে যেমন অগ্নি প্রজ্বলিত হয় না, চাণক্যরূপ ইন্ধন-সংযোগ না হইলে চন্দ্রগুপ্ত-রূপ অগ্নি-স্ফুলিঙ্গেও তেমনি দিগ্দাহী অনলের সৃষ্টি হইত না। চাণক্য প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত না হইলে, চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বে আদর্শ সৃষ্টি অসম্ভব হইত। উপযুক্ত সময়ে জলসেচন না পাইলে প্রতিভা-বীজ অঙ্কুরেই শুকাইয়া যাইত। একদিকে চাণক্যের অসাধারণ ধী-শক্তি, অন্যদিকে জৈনধর্ম্মের নবীন উদ্দীপনা ;—চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-প্রতিষ্ঠায় এতদুভয়ের অপরিসীম প্রভাব ইতিহাসে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। কি অবস্থায় কি শক্তি প্রভাবে চন্দ্রগুপ্ত বিশাল সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছিলেন, তদালোচনা এতৎপ্রসঙ্গের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার রাজত্বের আদর্শ-প্রকটন, এতদালোচনার প্রধান লক্ষ্য। তদুদ্দেশ্য সাধনে চাণক্য প্রণীত 'অর্থশাস্ত্র' আমাদের প্রধান অবলম্বন। অর্থশাস্ত্র—দণ্ডমূলক। আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্ত্তা এবং দণ্ডনীতি—এই ধর্ম্মচতুষ্টয়ের

ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে মহামতি চাণক্য যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন; তাহাতে বুঝা যায়, সেই চারি শাস্ত্র বর্ণিত সকল বিষয়েই চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব উন্নতির উচ্চ-চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিল। কৌটিল্য বলিয়াছেন—বার্ত্তা ত্রিবিধ;—কৃষি, পশুচারণ এবং বাণিজ্য। বার্ত্তা প্রভাবে রাজকীয় কোষাগার পূর্ণ হয়, সৈন্য-সাহায্যে রাজ্যরক্ষা বিহিত হইয়া থাকে; আর দণ্ডনীতির সাহায্যে রাজ্যবৃদ্ধি, রাজ্যরক্ষা এবং রাজ্যোন্নতি সাধিত হয়। দণ্ডনীতির উপর পৃথিবীর উন্নতি, আন্বীক্ষিকী, বেদত্রিতয় এবং বার্ত্তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সুতরাং পৃথিবীর এবং রাজ্যের উন্নতি কামনা করিলে রাজা দণ্ডনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। যথা,—

> কৃষিপাশুপাল্যে বণিজ্যা চ বার্ত্তা; ধান্যহিরণ্যপশুকুপ্যবিষ্টিপ্রদানাদৌপকারিকী। তয়া স্বপক্ষং পরপক্ষং চ বশীকরোতি কোশদণ্ডাভ্যাম্।
> আন্বীক্ষিকীত্রয়ীবার্ত্তানাং যোগক্ষেমসাধনো দণ্ডঃ। তস্য নীতির্দণ্ডনীতিঃ;
> অলব্ধলাভার্থা, লব্ধপরিরক্ষণী, রক্ষিতবিবর্ধনী, বৃদ্ধস্য তীর্থেষু প্রতিপাদনী
> তস্যামায়ত্তা লোকযাত্রা। তস্মাল্লোকযাত্রার্থী নিত্যমুদ্যতদণ্ডঃস্যাৎ।
> চতুর্বর্ণাশ্রমো লোকো রাজ্ঞা দণ্ডেন পালিতঃ।
> স্বধর্মকর্মাভিরতো বর্ত্ততে স্বেষু বর্ত্মসু॥"

চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বে, কৌটিল্যের বিধানে, এ নীতি বর্ণে বর্ণে অনুসৃত হইয়াছিল,—অর্থশাস্ত্রের আলোচনায় তাহা সপ্রমাণ হয়। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের অশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল; প্রজাসাধারণের সুশিক্ষা বিধানে রাজা বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন; পয়ঃপ্রণালী খননে জল-সরবরাহের ব্যবস্থায় দেশবাসীর জলকষ্ট বিদূরিত হইয়াছিল। স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থায়, গতাগতির সুবন্দোবস্তে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য উন্নতির উচ্চ-চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিল। কিবা খনিজ-বিদ্যায়, কিবা পশুপালন-ব্যবস্থায় কিবা স্থপতি-বিদ্যায়—সে রাজ্যের যশঃগৌরব দিগ্দিগন্তে বিস্তৃত হইয়াছিল।

জৈন-স্থাপত্য।

প্রাচীন ভারতের কারুশিল্প চিরপ্রসিদ্ধ। ভারতের স্থাপত্যে আজিও অনেকে বিস্ময়ান্বিত। জৈনধর্ম্মের চরমোন্নতি সময়ে, চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে, ভারতের স্থাপত্য ও কারুশিল্প যে বিশেষরূপ উন্নত ছিল; অর্থশাস্ত্রের অন্তর্গত "কারুকররক্ষণম্" ব্যবস্থায় তাহা সপ্রমাণ হয়। খৃষ্টজন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই যে, স্থাপত্যে জৈনগণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। ভারতের স্থাপত্য এবং শিল্পকলা সম্বন্ধে তাঁহাদের গবেষণার অবধি নাই। জৈনগণের শিল্পোন্নতির বিষয় আলোচনা করিয়া তাঁহারা সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছেন। রাজস্থানের ইতিহাস-লেখক কর্ণেল টড বলিয়াছেন,—'নান্দোলে মহাবীর স্বামীর মন্দিরে যে স্থাপত্যের এবং শিল্পচাতুর্য্যের নিদর্শন বর্ত্তমান, তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তাহার সহিত তুলনায় প্রাচীন রোমের স্থাপত্য অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীতি জন্মে। তেমন কারু-সৌন্দর্য্য বুঝি বা জগতে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।*

* নান্দোলে মহাবীর স্বামীর মন্দিরের কারুকার্য্যে মুগ্ধ হইয়া রাজস্থানের ইতিহাস-লেখক কর্ণেল টড বলিয়াছেন,—"The temple of *Mahavira* at *Nandole*, the last of their twenty-four apos-

মথুরার সন্নিকটে 'কঙ্কালী টিলায়' জৈনগণের এক স্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত মনে করেন,—'খৃষ্ট-জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ঐ স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সে স্তূপ—ভারতের অতি প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন।' * জৈন-স্থাপত্যের বিশেষত্ব—তাহার স্বাভাবিকত্ব। আবু-পর্ব্বতস্থিত জৈনমন্দির-সমূহ শিল্পচাতুর্য্যে অতুলনীয়। শ্বেত মর্ম্মর-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত সেই মন্দির-সমূহ আজিও অনেকের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে। গম্বুজের অভ্যন্তর বিচিত্র-কারুখচিত চিত্রাদিতে বিভূষিত। প্রস্তর-গাত্রে খোদিত করিয়া এরূপ সুন্দর চিত্র নির্ম্মাণ—অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ-ভারতে জৈন ভাস্কর্য্যের বহু নিদর্শন বিদ্যমান। পণ্ডিতগণ বলেন—সে সকল জৈনগণের অশেষ কীর্ত্তি বিঘোষিত করিতেছে। প্রস্তর-গাত্রে এত সুচিক্কণ, এত জাঁকজমকবিশিষ্ট, এত সুন্দর চিত্রাদি অঙ্কন—কোনও দেশে পরিদৃষ্ট হয় না। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই জৈন ভাস্কর্য্যের নিদর্শন দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে ইলোরার গিরিগুহা এবং উড়িষ্যার উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, নীলগিরি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। কাথিবাড়ের অন্তর্গত পালিতানার নিকটবর্ত্তী শত্রুঞ্জয় পর্ব্বতের জৈন-মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। সে মন্দিরের ভাস্কর্য্যের এবং চিত্রশিল্পের সৌন্দর্য্য-গাম্ভীর্য্য দর্শনে সকলেই বিমুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া থাকেন। লতাপাতা-পুষ্প-পত্র-সমন্বিত শিল্পভূষণের সৌন্দর্য্য বিশেষ চিত্তাকর্ষক। প্রাচীন ভারতের শিল্পকলায় স্থপতিগণ যে সকল সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা ভাস্করবিদ্যার যে উৎকর্ষ সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেরূপ সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি—সেরূপ উৎকর্ষ-সাধন, অধুনা অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

জৈনগণের এবং বৌদ্ধগণের ভাস্কর্য্য-প্রণালী একরূপ অভিন্ন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জৈনতীর্থঙ্করগণের এবং বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি-সমূহের নির্ম্মাণ-প্রণালী অভিন্ন। তাই সময় সময় বৌদ্ধ ও জৈন স্থাপত্যের পার্থক্য-বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়;—একটীকে অপরটী হইতে বাছিয়া লওয়া কঠিন হইয়া উঠে। বুদ্ধদেবের এবং তীর্থঙ্করগণের মূর্ত্তি-সমূহ প্রায়ই পদ্মাসনে উপবিষ্ট। জৈন বা বৌদ্ধ প্রতিরূপক সম্প্রদায়গত পার্থক্যের নিদর্শন বর্ত্তমান না থাকিলে, উভয় মূর্ত্তির প্রভেদ-পরিকল্পনা সম্ভবপর নহে। সেই জন্য সময় সময় অনেক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীকে জৈনমূর্ত্তির এবং জৈনগণকে বৌদ্ধ-মূর্ত্তির উপাসনা করিতে দেখা যায়। জৈনতীর্থঙ্করগণের প্রতিমূর্ত্তি-সমূহ প্রায়ই পদ্মাসনে বা অর্দ্ধপদ্মাসনে উপবিষ্ট-অবস্থায় নির্ম্মিত হইয়া থাকে; কখনও বা 'কায়োৎসর্গ' অবস্থায় দণ্ডায়মান দেখা যায়। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের তীর্থঙ্করগণের ধাতুগঠিত প্রতিমূর্ত্তি-সমূহ "পঞ্চতীর্থী" (অর্থাৎ একই ধাতুফলকে পাঁচ জন জৈনতীর্থঙ্করের মূর্ত্তি) হিসাবে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্করের এক জনের প্রতিমূর্ত্তি তাহার মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত হয়।

জৈনস্থাপত্যের নিদর্শন।

---

tles, is a very fine piece of Architecture. Its vaulted roof is a perfect model of the most ancient style of dome in the East probably invented anterior to the Romans."

* "Hindu Art including Jain and Budhist, in the comprehensive term, is the real Indian Art.—" V. A. Smith, *History of Fine Arts in India and Ceylon.*

তিনি পদ্মাসনে উপবিষ্ট। মধ্যবর্ত্তী তীর্থঙ্করের উভয় পার্শ্বের দুইটি মূর্ত্তি 'কায়োৎসর্গ' অবস্থায় দণ্ডায়মান; আর দুইটী মূর্ত্তি, দণ্ডায়মান মূর্ত্তি দুইটীর পার্শ্বে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে পদ্মাসনে স্থাপিত হয়। এতদ্ব্যতীত দেবদেবীর মূর্ত্তি, এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট অবস্থায় চারণ গায়ক প্রভৃতির মূর্ত্তি-সমূহ এবং হস্তিমূর্ত্তি বিশেষ কৌতূহলপ্রদ। ভাস্কর্য্যের ন্যায় জৈনগণের চিত্রশিল্পও বিশেষ চিত্তাকর্ষক। সুচিক্কণ রেখাপাত—চিত্রশিল্পের প্রাণস্থানীয়। চিত্ররেখার সৌন্দর্য্য—আলঙ্কারিক চিত্রশিল্পের বিশেষত্ব। চিত্রকলায় জৈনগণের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন সর্ব্বত্র পরিস্ফুট। আলঙ্কারিক চিত্রকলায় চীনাগণের শ্রেষ্ঠত্ব অনেকেই খ্যাপন করিয়া থাকেন। কিন্তু চীনাগণ সে বিষয়ে ভারতের নিকট ঋণী,—এ কথা সকলেই এখন স্বীকার করিতেছেন। পৌরাণিক ঐতিহাসিক ঘটনাবলী জৈনগণ চিত্রসাহায্যে প্রকটিত করিতেন। চীনাগণের চিত্রশিল্পে তাঁহাদের অনুকরণ পরিস্ফুট, পণ্ডিতগণের ইহা অভিমত। যাহা হউক, ভাস্কর্য্যে এবং চিত্রশিল্পে জৈনগণ যে অদ্বিতীয় ছিলেন, গুহা-মন্দির প্রভৃতি হইতে তাহা নিঃসন্দেহে সপ্রমাণ হয়। ভাস্কর্য্য—ইতিহাসের একতম স্তর বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়। অন্যান্য উপাদানের মধ্যে প্রাচীন-কালের ভাস্কর্য্য এবং চিত্রশিল্প ইতিহাসের অন্যতম উপাদান। জাতীয় ইতিহাসের আলোচনায় ভাস্কর্য্যের ইতিহাস তাই আলোচনার বিষয়। জৈনগণ যেমন অধ্যাত্ম বজ্ঞানে তেমনি ভাস্কর্য্য-বিষয়ে বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন,—প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনায় তাহা প্রতিপন্ন হয়।

জৈনধর্ম্ম-সম্বন্ধে এবং চন্দ্রগুপ্ত-চাণক্য বিষয়ে বলিতে গেলে, আরও অনেক কথা বলিতে হয়। বলিতে হয়,—পাশ্চাত্য-মতে ভারতের ইতিহাসের যে আরম্ভ, তাহা ঐ তিনের সমবায়েই সংসূচিত হইয়াছিল! বলিতে হয়,—ভারতের 'প্রাগ্-ঐতিহাসিক কাল' বলিয়া পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ যে সময়টিকে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, সেই সময়ের নিয়ন্তা-রূপে ঐ তিনের প্রাধান্যই পরিদৃশ্যমান্ দেখি! বলিতে হয়,—ভারতের আধুনিক ধারাবাহিক ইতিহাসের যে ভিত্তিভূমি, ঐ তিনের সংযোগেই তাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল! আরও বলিতে হয়,—খৃষ্ট-জন্মের প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বে, অধুনা-সমুত্থিত সভ্য-সমুন্নত জাতি-সমূহের অস্তিত্বের অঙ্কুর যখন উদ্গত হয় নাই—তখনও, ভারতে সকল কলা, সকল বিদ্যা, সকল বিজ্ঞান যে স্ফূর্ত্তি-লাভ করিয়াছিল; তাহার নিদর্শন—জৈনধর্ম্মে, চন্দ্রগুপ্তে-চাণক্যে, আগম-সূত্রে ও অর্থ-শাস্ত্রে, কেমন অক্ষয় সূত্রে সংগ্রথিত রহিয়াছে! মহাভারতে কুরু-পাণ্ডবের মহাসমরে ভারতের ইতিহাসের একটী পরিচ্ছেদ যেমন শেষ হইয়াছে, জৈনধর্ম্মের সুপ্রতিষ্ঠায়—চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের অভ্যুদয়ে, তদ্রূপ আর একটী নূতন পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইয়াছে। ভারতের বিদ্যায়, জ্ঞানের, সভ্যতায়, গৌরবের—এ এক অভিনব স্তর।

উপসংহার।

নির্ঘণ্ট।

অ।

আ।

ই।

ঈ।

উ।

ঋ।

এ।

ও।

ক।

দ।

ধ।

ন।

প।

ভ।

ম।০

ল।

শ।

ষ।

স।

হ।

—— • ——

নিবেদন

"পৃথিবীর ইতিহাস" ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত হইল। এ খণ্ডও প্রাচীন ভারতবর্ষের বিবরণ সংবলিত। আমরা প্রথমেই অনুমান করিয়াছিলাম, অন্যূন দশ খণ্ডে ভারতবর্ষের বিবরণ সম্পূর্ণ করিতে সমর্থ হইব। এখনও সেই সিদ্ধান্তই অক্ষুণ্ণ রহিল। এই ষষ্ঠ খণ্ডেও ভারতবর্ষের বিবরণী প্রকাশিত হইল। আর চারি খণ্ডে ভারতবর্ষের ইতিহাস শেষ করিব।

এই গ্রন্থ প্রকাশ-পক্ষে যাঁহাদের নিকট হইতে পুঁথি-পত্রের ও পুস্তকাদির সাহায্য পাইয়াছি, তাঁহাদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এ বিষয়ে আমাদের একজন প্রধান সাহায্যকারী—শ্রীযুক্ত পুরাণচাঁদ নাহার, এম-এ-বি-এল, মহোদয়। জৈনধর্ম্মসংক্রান্ত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ-সমূহ তিনি তাঁহার পাঠালয় হইতে আমাদিগকে পাঠ করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন ; এবং জৈন-স্থাপত্য-সংক্রান্ত পাঁচ খানি 'হাফটোন্ ব্লক' আমাদিগকে ছাপাইতে দিয়াছেন। তাঁহার এবংবিধ সাহায্যের জন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরঋণী রহিলাম। আমাদের আর একজন প্রধান সাহায্যদাতা—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডক্টর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম-এ পি-এইচ-ডি মহাশয়। সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরী হইতে তিনি মূল 'অর্থশাস্ত্র' প্রভৃতি গ্রন্থ আমাদিগের ব্যবহারের জন্য প্রদান করায় আমরা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। তাঁহার সাহায্য-ঋণও অপরিশোধনীয়। আর আর যাঁহাদের গ্রন্থ-পত্রের সাহায্য লইয়াছি, তাঁহাদিগের নিকটও আমরা চিরঋণী আছি।

* * *

সম্পূর্ণ।